নব্যভারত

চত্বারিংশ খণ্ড] আষাঢ়, ১৩২৯ [১ম সংখ্যা।

কবিতা ও গানে হাফ্‌-টোন্‌।

এসেন্সের শিশির কর্ক যখন খোলা হয় তখন তার গন্ধ নগ্ন ও অপ্রস্তুতভাবে মনকে আহত করে,—তাতে অবকাশ বা অবসরের কোন ক্রমই নেই; কিন্তু বেলফুল যখন ফোটে তখন অর্দ্ধস্ফুট কলিকার লীলায়িত ক্রম উত্তরোত্তর মনকে আবিষ্ট ও বিভ্রান্ত করে' দেয়—তা' ধীরে ধীরে নানা হিল্লোলে রসবৈচিত্র্য সঞ্চার করে' আত্মপ্রকাশ করে।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মাঝেও এই অবসর ও ক্রম, এই মৃদু ব্যাপ্তি ও বিলোল রসসম্পাতের অপূর্ব্ব কারুতা, এই ছায়ান্তর-মাধুর্য্যের নিবিড় আকর্ষণ এক অপূর্ব্ব মাদকতা ঘনীভূত করে। আড়ালে আছে নিভৃত রূপশ্রী এক আশ্চর্য্য মহিমা লাভ করে—তা' ভাবেরই হোক্ কিম্বা বস্তুরই হোক্। এই মিশ্র ও ধূসর গোধূলি-রাজ্য সাহিত্যকে নানা দিক্ হ'তে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করে' ফেলেছে। এ যুগের নানা অভিনব ও বিভিন্নপন্থী কবিরা এই নিরুদ্দেশ রাজ্যের ক্ষুধিত ও গূঢ় আহ্বানে অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়েছেন। এ যুগের কাব্য ও কলার ঐশ্বর্য্য এই অভিনব মেঘরাজ্যে এক অপূর্ব্ব অলকা রচনা করেছে!

নগ্ন আলোক বস্তুকে প্রকাশ করে না,—ঢাকা দেয়। তা'তে আলোই দ্রষ্টব্য হয়ে পড়ে, জিনিষ নয়—এ জন্য চিত্রবিদ্যার কোন কোন শ্রেণীর শিল্পী শুধু আলোককে প্রকাশ করাই পরমার্থ করে' তুলেছেন। কিন্তু আলোক যেখানে উপলক্ষ্য মাত্র হয়, সেখানে ছায়া সঞ্চার কর্ত্তে হয়—সেখানে অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন—সেখানে পর্দ্দার অঞ্চল ভাল করে' টেনে দিতে হয়। ভাবরাজ্যে এ রকমের ব্যাপার আরও বেশী ঘটে' ওঠে। হৃদয়ের অসীম অন্তঃপুরে কত সুগুপ্ত ব্যথা-বীথিকা, অশ্রু-পর্য্যায় ও ক্ষুরধার পুলক রয়েছে তা'র ইয়ত্তা নেই। অতীত ও ভবিষ্যৎ সেখানে তো ডুবে রয়েছে—জলে ডোবা মণিমুক্তা-বোঝাই জাহাজের মত। শুধু বর্ত্তমানই জাগ্রত জ্ঞানরাজ্যে প্রতি মুহূর্ত্ত ভেসে উঠ্‌ছে—এ তো মনস্তত্ত্বেরই কথা। এ সমস্ত কারণে শুধু যা' প্রত্যক্ষ, যা' স্ফুট, যা' অস্ত্রোপচারীর মর্ম্মরটেবিলে ছুরিকাঘাতের জন্য সহস্র কিরণতলে সজ্জীকৃত—তা' বড় জিনিষ বা একমাত্র দ্রষ্টব্য ব্যাপার নয়; এমন কি অতি যৎসামান্য। ভাবের বর্ণচ্ছত্রে—spectrum এ—যা' দেখা যাচ্ছে, তা', যা' দেখা যাচ্ছে না বা সামান্য দেখা যাচ্ছে, তা'র তুলনায় অতি যৎসামান্য।

কাব্যে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড, সংহার 'স্বর্গচ্যুতি' বা 'নরকদর্শন' এসব স্পষ্ট সহজ উপায়ে আখ্যাত হয়েছে। একালের ট্র্যাজেডি এসব ভীষণ ও সরল রসসঞ্চারে রচিত হচ্ছে না। সেকালের মহাকাব্যের 'মোতিফ্' (motif) নিয়ে একালের খণ্ডকাব্যও রচিত হচ্ছে না,

কারণ একালে তা' অপ্রচুর ও অসম্ভব। মেয়্তেরলিঙ্ক্(Maeterlinck) এক জায়গায় তা' আধুনিকদের পক্ষ হ'তে ভাল করে' বুঝিয়েছেন। একালের ট্র্যাজেডিতে রক্তপাত নেই, যুদ্ধোদ্যম নেই —তা গৃহকোণের অবজ্ঞাত অন্ধকারে জন্মলাভ কচ্ছে। মানবের চঞ্চল ভাবমুহূর্ত্তকে তন্ন তন্ন করে' তলিয়ে দেখে' তা'রই আড়ালে ও অন্তরালে অসংখ্য গভীর ট্র্যাজেডির বার্ত্তা পাওয়া যাচ্ছে, —যা'র কাছে কয়েকটা হত্যাকাণ্ড অতি তুচ্ছ ব্যাপার। প্রতিদিনের মানব-জীবনের অসংখ্য বেদনা ও আনন্দস্তরের উপকণ্ঠে একটা গভীরতর জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ছে, যা' একালের কাব্যে কলায় শুধু প্রতিফলিত হয়েছে। একালের এই অপূর্ব্ব রসজগৎকে শুধু রহস্যলোক বল্‌বার যো' নেই, প্রয়োজনও নেই। মধ্যযুগের প্রাচীন দুর্গ ও উৎসবঘটা বা পারস্য মোগল প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলের রাজন্যদের আরামের নানা উপকরণ—প্রাসাদ, ফোয়ারা, স্নানাগার বা মধুর অত্যাচারের নানা সংগ্রহের ভিতর যে অসূর্য্যম্পৃষ্ট রহস্য আছে—তা'তে এ যুগ আরাম পাচ্ছে না। নব্য আইরিশ সাহিত্য একটা নূতন পুরাণকথা (Mythology) তৈরি করে বসেছে, কবি সিঞ্জ (Synge) য়্যারান্ (Aaran) দ্বীপে ঘুরেছেন, শিল্পী গোগ্যাঁ তাহিতি (Tahiti) দ্বীপে দিন যাপন করেছেন, কিন্তু এ সবের ভিতর এ যুগের প্রবল রস-ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হয়নি। বাইরে ঘুরে' এ নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হয় নি, জীবনের অন্তরতর প্রকোষ্ঠেই তা'র সন্ধান পাওয়া গেছে।

বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্যভক্ত রাস্কিন্ (Ruskin) হঠাৎ এক জায়গায় ভাবের খেয়ালে একটা বড় রকমের কথা বলেছেন যা' তলিয়ে দেখ্‌লে হয়তো তাঁর নিজেরই মাথা ঘুরে যেত! রাস্কিন্ বলেছেন যে, যে আর্টে নিপুণ ও তরল সূক্ষ্ম ভাবাবেশ নেই, যা delicate নয়, তা নিকৃষ্ট— "All bold art is bad art"—সাহসিক ও ধৃষ্ট আর্ট মাত্রই খারাপ। রাস্কিনের মতে শুধু নগ্ন জ্ঞানজগৎটাই কবির পক্ষে বড় কথা নয়; এ জগতের ভিতরই প্রেম ও আশঙ্কা, স্বপ্ন ও ভীতি ওতপ্রোত হয়ে আছে, যা' অলৌকিক রসসঞ্চার করে' আর্টকে এক অদ্ভুত অপূর্ব্বতা দেয়।

কাজেই হাতের তাস সব খুলে' বা খোলা তাস নিয়ে যে শুধু এ খেলা হয় না, তা' নয়, —রঙের তাসের দরকারও এ খেলায় খুব বেশী হয়ে পড়ে। যা'রা চায় দুনিয়ার ভাবের রাস্তাগুলি খুব চওড়া ও বাঁধান হবে, তা'তে অলিগলির ব্যাপার থাক্‌বে না, তাদের পক্ষে এ রকমের ছায়াপথের শতবীথিকা দুঃসহ সন্দেহ নেই, অথচ উপায়ও নেই।

অক্‌টোপাসের মত নিষ্ঠুর বিজ্ঞানের আক্রমণে কবিতার অধিকারের জায়গা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে পড়া সম্ভব অনেকের মনে এ রকম বিশ্বাসও দাঁড়িয়ে গেছে। রূপকথাই হোক্, পরীরাজ্যই হোক্, কবিতার অনেক প্রাচীন অট্টালিকা, বিজ্ঞান আজ ধূলিসাৎ করেছে। প্রাচীন কলা ও কবিতা নানা রকমের দেবলোক, দানবলোক প্রভৃতি নিয়ে এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য পুরী রচনা করেছিল সকল দেশে। সভ্যতার প্রথম উষালোক যে নিষ্ঠার ভিতর এ পুরীকে জন্ম দেয়, সে নিষ্ঠা এখন আর থাক্‌তে পারে না। সেটাও কবির মানস-অন্তঃপুরই ছিল—বৈজ্ঞানিকের শাণিত তরবারি আজ তা'কে একটা দিকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' তৃপ্ত হয়েছে। পুরাণ (Myth) ও পুরাণকথার (Mythology) ভিতর কবির স্বচ্ছন্দবিহার সকল দেশেই হয়েছে; একালে যা' হচ্ছে তা' এসবের 'মমি' নিয়ে, প্রাণ

নিয়ে নয়। তার পরে আখ্যান ও উপাখ্যানের যে একটা ছায়ালোক রচিত হয়, যা' "রাজা" "রাণীর" নানা কল্পিত কীর্ত্তিকে মুখরিত করে, তাও একটা অন্তর্নিহিত গুণ্ঠিত অবসর-পিপাসা হ'তে জন্ম লাভ করে। তা'ও বা কোথাও আরণ্য-দিবসের প্রখর সূর্য্যালোক হ'তে পালিয়ে একাদশ সহস্র রজনীর ধূসর অঞ্চলতলে আশ্রয় লাভ করে' অপূর্ব্ব নক্ষত্রলোক রচনা করেছে।

এ যুগটি এসে এসব তো চুরমার করে' দিয়েছে। এণ্ড্রু ল্যাঙের (Andrew Lang) পরীর কাহিনী এ জন্য বাজে বকুনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা' বলে' কি কবিতালক্ষ্মীকে একেবারে অন্তর্ধান কর্ত্তে হয়েছে বিজ্ঞানের ভ্রূকুটি দেখে? একেবারেই নয়। বিজ্ঞানের যেখানে অভিষেক হয়েছে, কি হতে পারে, কাব্য ও কলালোক তো কোনকালেই সেখানে আনাগোনা করে নি। যেটা প্রমাণ প্রমেয়ের রাজ্য, যেখানে প্রতি সন্দিগ্ধস্থলের উপর "বুল্‌স্‌-আই ল্যাণ্টরণ্" প্রয়োগ কর্ত্তে হয়, কবিতা ও কলাকে সেখানে কোনকালে পাওয়া যায় নি। একালেও বিজ্ঞান বা ফটোগ্রাফের ধর্ম্মে কবিতাকে পেয়ে বসে নি। কবিতা একটা নূতন জান্‌লা এ যুগের হৃদয়বেলার উপকণ্ঠে খুলেছে,—যা'র প্রাণাত্মক রসসম্পাত এক অসীম ও অব্যক্ত দেববানের মত এ কূল হ'তে অকূলের দিকে প্রসরিত হয়ে বিস্তৃত হয়েছে। কলা ও কবিতাকে বিজ্ঞানের খাঁচায় বন্ধ কর্ত্তে অনেক চেষ্টা হয়েছে—না হলেই আশ্চর্য্যের বিষয় হ'ত—কিন্তু কলালক্ষ্মী ঈষৎ হাস্য করে' এসবের বজ্রমুষ্টি হ'তে আত্মরক্ষা করে' এসেছেন।

এ যুগে কবিতা ও কলা নিয়ে নানা আন্দোলন হয়েছে। সাহিত্যে বস্তুবাদিতা, প্রত্যক্ষবাদিতা প্রভৃতির উদ্দাম ডমরু যখন বেজে উঠে তখন কবিহৃদয় সচকিত ও ভীত হয়ে' পড়ে। যেখানে কাব্যকে শুধু আখ্যানরূপে কেউ দেখেছে সেখানে বস্তুবাদিতার অভিনয় চলেছে। কিন্তু গীতিকবিতা ও গান আখ্যান নয়, কাজেই এ রকমের কবিতা পরখ করে দেখতে পাওয়া যায় যে প্রতিকূল আগ্নেয় তাণ্ডবের ভিতরও কি রকম আশ্চর্য্য ও নিপুণ উপায়ে কাব্য সুদূরে আপনার নিভৃত ও সুশীতল নীড় রচনা করে' অগ্রসর হয়েছে। কবিতা সহজেই প্রত্যক্ষবাদীর প্রখর আলোকসম্পাতকে ব্যঙ্গ করে সহস্র আড়ালে, ছায়ার পল্লবিত শত ইঙ্গিতের মাঝে মধুর আশ্রয় লাভ করেছে। এ যুগের কবিতায় যে নানা দিকে নানা ভাবে একটি হাফ্-টোন্ বা সূক্ষ্মতর টোনের ছায়াসম্পাত এসে তা'কে সুকুমার ও পেলব, অথচ গভীর ও মর্ম্মন্তুদ করেছে তা'তেই এরূপ একটা নূতন কল্পলোক সৃষ্টির আভাস ভাল রকমেই পাওয়া যাচ্ছে। বোদ্‌লেয়ার্ (Baudelaire), ফ্লোবেয়ার্ (Flaubert), গঁকুর্ (Goncourt), ভেয়ার্‌লেন্ (Verlaine), মেলার্মে (Mallarme), প্রভৃতি ভাবুকগণ আধুনিক ইম্প্রেসনিষ্ট্ (Impressionist), সিম্বলিষ্ট্ (Symbolist), ডেক্যাডেণ্ট্ (Decadent) সাহিত্যের নানা পথে এই নূতন ইথরের মত হাল্কা কাব্যনীড় রচনা করেছেন।

মুক্ত, নগ্ন, স্ফুটতম জ্যামিতিক জগতের অন্তরালে এরূপে আভাসে, ইঙ্গিতে, স্বপ্নময় মদিরতা ও তন্দ্রাজড় অর্দ্ধসুপ্তিতে এক অপরূপ ছায়ারাজ্য আধুনিক কবিতার সূক্ষ্মতম ভাবহিল্লোলে আশ্রয় লাভ করেছে—যা' সেকালে সম্ভব ছিল না! কবিতাও যে

নীতিশাস্ত্র, বা অধ্যাত্মতত্ব নয়, ছন্দের ও ভাবের লালিত্যকে আশ্রয় করে'ই যে তা'র সুষমা বিকশিত হয়, শুধু একালেই তা' ভালরকমে অনুভূত হয়েছে। ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও উপদেশ এসব কবিতার ব্যাপারই নয়। ছন্দের অপূর্ব্ব লালিত্য মনের দ্বারে আঘাত করে' যে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য-পুলক উপস্থিত করে তা'কে জ্ঞানগম্য তত্ব হতে আলাদা করে' দেখা এ প্রসঙ্গেই সম্ভব হয়েছে। সেকালেও কবিতার কাঁধে এসব গুরুভার সিন্ধবাদের মত চাপলেও কোন কোন কবি কাব্যের মুক্তির জন্য অজ্ঞাতসারে প্রচুর চেষ্টা করেছেন। কালিদাস আনন্দে মেঘদূতের প্রতি পদে এমন একটা সুললিত ও নিপুণ অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতা রক্ষা করেছেন যা' কাব্য হিসাবে মেঘদূতের মহিমা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতি পদেই মেঘদূতের রসার্থীর মনে হয় যে মেঘের এ রকমের দৌত্য সরকারী পেয়াদার লাল ফিতার বিষয়ই নয়—এ যক্ষের ক্লান্ত ও করুণ কোমলতা মানুষের মেজাজ ছাড়িয়ে গেছে—এবং যে পরিমাণে যক্ষপুরীটি গর্ব্বিত উজ্জয়িনীর কর্কশ বাস্তবতা পায় নি সে পরিমাণে তার লালিত্য অপরাজেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপে এ কাব্যের লালিত্য কবিকল্পনার আশ্রয় করে' যে সুশৃঙ্খলতা পেয়েছে তা' ভাবুকের কল্পনাবৃন্তেই বিকশিত হওয়ার যোগ্য—ভূতত্ব ও আকাশতত্ববিদের সমস্ত ব্যবস্থা তা' একান্তভাবে পরিহাস করেছে।

যে সমস্ত কারণে সেকালের কাব্য ও কবিতা বিশেষ কয়েকটি রূপ গ্রহণ করেছিল, সে সমস্ত অনিবার্য্য কারণে এ যুগের কবিতাও একটা নব্য কাব্যলোকের জন্ম দিয়েছে। একালের স্বপ্ন ও সৌন্দর্য্য ইন্দ্র-বরুণ বা এপলো-আটিসিস্ কল্পনা কর্ত্তে সঙ্কুচিত হয়—এমন কি ম্যাক্‌বেথ্ (*Macbeth*), ম্যান্‌ফ্রেড্ (*Manfred*) হ্যামলেট্ (*Hamlet*), বা ফাউষ্টকে (*Faust*) রচনা করলে এ যুগের হাস্যোদ্রেক হবে—সে সব অসম্ভব ও আজগুবী মানুষ, বাসন্ত-জোৎস্না ও নদীকল্লোল প্রভৃতির মত, এ যুগের ধূসরিত মানবত্বের জীবনপথে মেকি বলে ধরা পড়ে' গেছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আর একটা অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হয়ে একটা অভিনব পুরীর সন্ধান পাওয়া গেছে যা' পূর্ব্ববর্ত্তী সকল যুগেরই দুর্লক্ষ্য ছিল। তা' আরব্যোপন্যাসের যাদুকরের অট্টালিকার মতই সকলের অপ্রত্যাশিত বিস্ময় সঞ্চার করেছে। এ পুরীর অফুরন্ত সৌন্দর্য্যসম্ভার প্রখর রৌদ্রে রজনীগন্ধার মত মুদিত হয়ে পড়ে, অথচ তরল ছায়াহিল্লোলের শত কুঞ্চিত অবকাশে তা' একেবারে নগ্ননৃত্যে উদ্বেলিত হয়ে' ওঠে। এ নব্য সাহিত্য উপলব্ধিরও সাধনা চাই। এই হাফ্-টোন্ পুরীর লঘু ও সূক্ষ্ম ভাবাবেগ উর্ণনাভের মত যে সত্যোপেত কাব্যজাল রচনা করেছে তা' হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে হলে জীবনকেও লীলায়িত ক্রমে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তারহীন ভাববার্ত্তার জন্য মৃদু ও পেলব করা প্রয়োজন।

এ সমস্ত "finer shades" প্রকাশ এ যুগের কলা ও কাব্যের একটা নূতন অধিকার। নব্য দার্শনিকেরাও তা' নানা দিকে বলেছেন। ব্যার্গসঁ (Bergson) এক জায়গায় এই "finer shades" ও "half-tones" প্রভৃতির জগৎকে উদ্ঘাটন করা আর্টেরই অধিকার বলে' উল্লেখ করেছেন: "Art reveals in things a great number of qualities

জননী হন, শিশুটির কল্যাণ শুধু তাঁহার উপর নির্ভর করে না। শিশুটির পিতৃকুল মাতৃকুলের উৎকর্ষ-অপকর্ষ প্রতিবেশীদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ এবং জন্মভূমির স্বাস্থ্যকরতা বা অস্বাস্থ্যকরতার উপর, ভূমিষ্ঠ হইবার আগে হইতেই, তাহার কল্যাণ অকল্যাণ নির্ভর করে। অতএব শিশুটি জন্মগ্রহণ করিবার আগে হইতে এবং তৎপরে পরিবারের মধ্যে সুমাতৃত্ব চাই, পরিবারের বাহিরে সুমাতৃত্ব চাই। শিশুর কল্যাণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করার নাম সুমাতৃত্ব। পরিবারের মধ্যে রোগের সঞ্চার নিবারণ, পরিবারকে সুস্থ সবল জ্ঞানবান্ সদ্গুণশালী করিবার ও রাখিবার উপায় বিধান, সুমাতৃত্বের কাজ। আমরা যদি নিজের ঘর বাড়ী খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি, কিন্তু পাড়া, গ্রাম, নগর, দেশ, মহাদেশ অস্বাস্থ্যকর বা মহামারীগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে রোগের বীজ আমাদের বাড়ীতেও আসিতে পারে। সুতরাং শিশুর দেহবিষয়ে সুমাতৃত্ব তাহার কাম্‌রা, পরিচ্ছদ, খাদ্য, ঘরবাড়ীতেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না; সুমাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র গৃহস্থালীর বাহিরেও বিস্তৃত না হইলে গৃহস্থালীর মধ্যে উহা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে।

ইহা যে কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যসম্বন্ধেই সত্য তাহা নহে। হৃদয় মনের পক্ষেও ইহা সত্য। আমরা শৈশব হইতে কেবল পুস্তক হইতে বা শিক্ষক ও গুরুজনের মুখ হইতেই শিক্ষালাভ করি না; পাড়া প্রতিবেশী দেশবাসী বিদেশী সকলের নিকট হইতে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা পাই, সুগুণ দুর্গুণ আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। খুব চরিত্রবান্ পরিবারের শিশুরাও ভৃত্যদের ও পাড়াপড়সীর শিশুদের সংস্রবে কুকথা শিক্ষা করে ও কুকার্য্যে অভ্যস্ত হয়। শিশুর সমুদয় মানসিক পরিবেষ্টন তাহার জ্ঞান ও সুগুণলাভের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। এই দিকে দৃষ্টি রাখা ও তাহার ব্যবস্থা করা সুমাতৃত্বের কাজ।

সবাই সুখী না হইলে কেহ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না, সকলে জ্ঞানী না হইলে কেহই মূর্খতা ও কুসংস্কারের হাত হইতে পূর্ণ মুক্তি পাইতে পারে না, সকলে নীরোগ না থাকিলে কেহই সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হইতে পারে না, সকলে যথেষ্ট ভোজনে তৃপ্ত না হইলে অতি ধনীও দারিদ্র্যজনিত সংক্রামক রোগের কবলে পড়িতে পারে, সকলে নীতিমান্, সচ্চরিত্র, এবং চিন্তা ভাব কল্পনা কথা কাজ ও ভঙ্গীতে শুচি না হইলে সাধু ব্যক্তিদেরও শুচিতা ম্লান হইয়া যায়। এই সব কথা প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা শিশুদের জীবনে অধিকতর সত্য। তাহাদের দেহ ও মনে কল্যাণ অকল্যাণের কারণ প্রাপ্তবয়স্কদিগের অপেক্ষা অধিক সহজে সংক্রামিত ও সঞ্চারিত হয়। এই জন্য সন্তানের জননীরা কেবল নিজের শিশুগুলির দেহমন আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিলে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাঁহাদিগকে নিজের গৃহস্থালীতে মা হইতে ত হইবেই, পাড়ার, সমাজের, জাতির, দেশের, জগতের সুমাতৃত্বের কাজ তাঁহাদিগকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া করিতে হইবে।

এই ব্যাপক, ব্যাপকতর ও ব্যাপকতম মাতৃত্ব নানাবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা এবং সাধনা সাপেক্ষ। রান্নাবাড়া ও কাপড় সেলাই করা খুব দরকারী কাজ। কিন্তু শুধু তাহা জানিলেই, বাহিরের জগতের দূরে থাকুক, নিজের শিশুদেরও মাতৃত্ব করা যায় না। তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে পারা ত চাই-ই, অধিকন্তু তাহাদের ন্যায্য স্বাধীনতাতে হাত না দিয়া

তাহাদিগকে জ্ঞানী, সাহসী, পরার্থপর, পবিত্রচেতা হইবার সুযোগ দেওয়া চাই। এরূপ মাতৃত্ব সহজলভ্য নহে, স্বভাবসিদ্ধও নহে।

অতি দূরের অমঙ্গল কেমন করিয়া আমাদের শিশুদের পক্ষে সাংঘাতিক হয়, তাহা একটু ভাবিলেই আমরা স্থির করিতে পারি। ইনফ্লুয়েঞ্জায় আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে। উহার আধুনিক আক্রমণের উৎপত্তি নাকি স্পেনদেশে হইয়াছিল। তাহা ইউরোপে; অথচ সুদূর বাংলা দেশের কত গ্রাম উহাতে প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছে। এইরূপ মহামারী উন্মূলন একটি পাড়া, গ্রাম, নগর, জেলা, প্রদেশ বা দেশের লোকের দ্বারা হয় না; অন্তর্জাতিক চেষ্টা চাই। তাহার মূলে কাজ করিবে অন্তর্জাতিক সুমাতৃত্ব।

মাতৃত্বের ব্যাপকতম ক্ষেত্র সূচিত হওয়ায় কোন জননীর ভীত বা হতোৎসাহ হইবার কারণ নাই। বিশ্বে সূর্য্যের কাজ আছে, আবার পর্ণকুটীরের তমোনাশক মাটীর প্রদীপেরও কাজ আছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি ও সুযোগ অনুসারে কাজ করিলে তাহাতেই তাঁহার ও বিশ্বের মঙ্গল। যাঁহার মাতৃত্ব কেবল তাঁহার নিজের গৃহে আবদ্ধ, তাঁহার আত্মোৎসর্গের নৈবেদ্যও বিশ্বজননী গ্রহণ করেন। কিন্তু এরূপ জননী কেহ আছেন কি, যিনি অন্ততঃ নিজের পাড়াটির স্বাস্থ্য ও নৈতিক শুচিতার জন্য কিছু করিতে পারেন না?

মাতৃত্বের ব্যাপকক্ষেত্রে কাজ করিতে হইলে মাতৃজাতীয়াদিগকে দলবদ্ধ হইতে হয়। পৃথিবীর নানা দেশের মহিলা-সভ্য লইয়া অনেকগুলি মহিলা-সমিতি আছে। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সুরাপান দূর করা এইরূপ একটি সমিতির উদ্দেশ্য।

সমস্ত পৃথিবী মাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র বটে; কিন্তু এই ব্যাপকতম ক্ষেত্রে মাতৃত্ব করিবার স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিলে চলিবে না। জননীরা নিজের নিজের শিশুদের শরীর মন আত্মার পুষ্টি, স্বাস্থ্য পবিত্রতা ও আনন্দ বিধানের জন্য যাহা যাহা চান, হাতের কাছের আরও যতগুলি সম্ভব শিশুর জন্য তাহার আয়োজন করিতে চেষ্টা করুন। এইরূপ করিলে সুখের আলোক জীবন-পথ আলোকিত করিবে। সেই আলোকে চলিতে চলিতে মাতৃত্ব-শক্তি বাড়িবে। তাহাতে নিজের এবং অন্যের শিশুদের মঙ্গল হইবে।

মাতৃত্ব কেবল যে শিশুদের জন্য তাহা নহে, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও বটে। যেখানে দুঃখ দারিদ্র্য রোগ তাপ মলিনতা, মায়ের মঙ্গলহস্ত সেখানেই কাজ করিবে।

অনেকে ভাবিতে পারেন, জগতে পুরুষকর্ম্মী থাকিতে মহিলাদের উপর ডাক পড়ে কেন? ইহার সোজা উত্তর এই, যে, এই পৃথিবী একটি বৃহৎ পরিবারের গৃহস্থালী। ক্ষুদ্র গৃহস্থালীকে যেমন পুরুষ কর্ত্তা কেবল পুরুষ সহায়কদের সাহায্যে আনন্দনিকেতন ও মঙ্গলালয় করিয়া তুলিতে পারেন না, নারীর হৃদয় ও নারীর শক্তির সাহায্য লইবার প্রয়োজন হয়, তেমনই জগতের ইতিহাসের আধুনিক কাল পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, পুরুষ একা জগৎকে শুচিতা, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিতে পারে নাই, নারীর হৃদয় ও নারীর শক্তিকে জগতের ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপকতম ক্ষেত্রেও তেমনি মাতৃত্ব করিতে হইবে। অনেক দেশে প্রধানতঃ নারীদের সমবেত চেষ্টায় ঔষধার্থ ভিন্ন সুরার উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার নিবারিত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষ নারী শিশু সকলের কল্যাণ হইয়াছে; সৈনিকদের

স্বাস্থ্যের জন্ম তাহাদের চরিত্রভ্রংশ সুতরাং কতকগুলি অভাগিনী নারীর সর্ব্বনাশ একান্ত আবশ্যক, এই ধারণা ও তদনুরূপ নারকীয় ব্যবস্থা শ্রীমতী জোসেফিন্ বাট্‌লার প্রমুখ মহিলাদের প্রযত্নে উন্মূলিত হইয়াছে; যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকেরা যে উচ্ছৃঙ্খলতায় অভ্যস্ত হয়, তাহার ফলে সভ্যদেশ সকলে যে-সব করাল ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যুদ্ধের উচ্ছেদই যে তাহার একমাত্র প্রকৃষ্ট প্রতীকার, এই বিশ্বাসও মাতৃজাতীয়াদের সমবেত চেষ্টায় বদ্ধমূল হইতেছে; অনেক দেশে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্তা মহিলাদের চেষ্টায় শিশু কল্যাণ প্রচেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে, এবং বিনা ব্যয়ে সূতিকাগার এবং প্রসূতিদের সেবা শুশ্রূষা ও খাদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। শিশুদের ও বালকবালিকাদের যথেষ্টসংখ্যক ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যবস্থাও অনেক দেশে মাতৃজাতীয়াদের চেষ্টায় হইয়াছে।

পুরুষেরা হাজার হাজার বৎসর সকল ক্ষমতা ও সুযোগের অধিকারী থাকিয়াও এই সকল দিকে যথেষ্ট মন দিতে পারেন নাই। পুরুষহৃদয় বাস্তবিকই প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির জন্মই নারীহৃদয় অপেক্ষা অধিক ব্যগ্র কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হয়, যে, আপনা ভুলিয়া প্রীতিদয়াসেবা দিয়া অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য অতি উপেক্ষিতকেও রক্ষা করা মাতৃহৃদয়ের কার্য্য। এই মাতৃবৎ হৃদয় অনেক পুরুষেরও থাকিতে দেখা গিয়াছে।

এই মাতৃহৃদয়ের কাজ গৃহে ও গৃহের বাহিরে রহিয়াছে। মাতৃজাতীয়ারা যাহাদিগকে জন্ম দিয়াছেন, কেবল যে তাহাদেরই মাতৃত্ব করিতে পারেন, তাহা নহে; অপরেরও পারেন। আবার যাঁহারা দৈহিক অর্থে মাতা হন নাই, তাঁহারাও বহু শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবজীবনের কারণ হইয়া প্রকৃত মাতৃপদবাচ্য হইতে পারেন।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

তাই হোক্।

তাড়াতাড়ি গিয়াছ তুমি, তাই
দেরী করে' আমায় যেতে হবে,
স্বর্গে হ'ল তোমার তরে ঠাঁই,
আমি বন্দী রোদন ভরা ভবে।
তাই হোক্, তাই হোক্ তবে।
মাঝ পথে নামিয়ে রেখে গেলে
তোমার কাজ; কে আর তুলে লবে,
যাই বা আমি কেমন করে' ফেলে?
দু'য়ের বোঝা একাই বইতে হবে।
দেরী, তাতে অনেক দেরী হবে।
মুক্ত তুমি চড়ি পুণ্যরথ
দেব লোকে বিচরিবে যবে,
আমার কাঁটা-কাঁকর-ভরা পথ
রক্তাঙ্কিত, অশ্রুসিক্ত হবে—
তাই হোক্ তাই হোক্ তবে।

শ্রীকামিনী রায়।

সাধক প্রকাশচন্দ্রের স্মৃতি।

১

এ সংসারে স্মৃতি এত মধুময় কেন? কি সুখের স্মৃতি, কি দুঃখের স্মৃতি, কালের যবনিকার ভিতর দিয়া সবই মোহন বেশে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। অতীতের কথা ভাবিতে এতই মিষ্ট। পায় পায় জীবনের কত পথ মাড়াইয়া আজ বার্দ্ধক্যের দ্বারে এসে উপনীত হয়েছি —সেই শৈশবের খেলা ধূলার সুখের দিন, যৌবনের নিবিড় আনন্দময় সুখ দুঃখের দিন, যেন চল চিত্রের ছবির ন্যায় চক্ষের উপর ভাসিয়া যায়। সবই মধুর। এই বার্দ্ধক্যেও কি মধুর রসে রঞ্জিত হইতেছি?—না! কত স্মৃতিই প্রাণে গাঁথা আছে—কত পবিত্র ছবি! শুভক্ষণে প্রাণে যে দিন তাঁরা দেখা দিয়ে যান, সেদিন অনুভব করি যেন হৃদয়টা পবিত্র হইয়া গিয়াছে। এমন এক খানি পবিত্র ছবি আজ প্রাণে জাগিয়াছে—আজ প্রকাশচন্দ্রের কথা প্রাণ ভরিয়া বলিতে ছিলাম—কোথায় আরম্ভ কোথায় শেষ করিব জানি না—কতকথাই বলিয়া গেলাম! আমি যখন ৪।৫ বৎসরের বালিকা তখন আমার পিতা * হরিনাভি স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন—সেই সময় প্রকাশচন্দ্র দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া সপরিবারে কিছুদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন—সে কথা আমার মনে নাই। কিন্তু গুরুজনদিগের প্রাণে সে সুখের দিনের কথা গাঁথা ছিল, তাই কিছু মনে না থাকিলেও ভিতরে ভিতরে প্রকাশচন্দ্র ও তাঁর সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি প্রাণের একটা আকর্ষণ ছিল—

---

* স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়।

যখন কাহারো মুখে তাঁহাদের আদর্শ জীবনের পুণ্য কাহিনী শুনিতাম তখন তন্ময় হইয়া যাইতাম। একদিন যে প্রকাশচন্দ্র আমাদের গৃহে বাস করিবেন সে সৌভাগ্যের কথা কখন ভাবি নাই। কিন্তু মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি দেড় মাস আমাদের গৃহে আসিয়া বাস করিয়া আমায় যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা আমি এ জীবনে ভুলিব না। সৌভাগ্য আমার, তাই সাধু প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

আমি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে বাস করিয়া যাহা পাইয়াছি সেই কথাই আজ বলিব। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি কেহ নিখুঁৎভাবে সাধন করিয়া গিয়া থাকেন তবে সে প্রকাশচন্দ্র এবং তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী অঘোর কামিনী। সে আদর্শ কি? না নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনে, স্বীয় পরিবারে এবং সামাজিক ভাবে সর্ব্বশেষে বিশ্বজনীন ভাবে ধর্ম্ম—প্রেমের ধর্ম্ম—সাধন করিতে হইবে। এই সাধক দম্পতি—প্রথমে নিজ নিজ জীবনে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন, তৎপরে, পরিবারে ও সমাজে এবং শেষে তাহা বিশ্বজনীন আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহাদের দাম্পত্য প্রেম অতুলনীয় ছিল। এমন বুঝি আর হয় না। প্রকাশ চন্দ্র কখন আপনাকে একক ভাবিতেন না—তিনি ছিলেন—প্রকাশ চন্দ্র এবং অঘোরকামিনীর মিলন চিত্র—প্রয়াগে যেমন গঙ্গা যমুনার সঙ্গম হইয়াছে—দুইধারা মিলিত হইয়াছে—তেমনি মিলিত দুই জীবনধারা—অঘোরকামিনী-হৃদয় প্রকাশচন্দ্রের আলোকে চির উদ্ভাসিত ছিল—তিনিও আপনাকে বলিতেন "অঘোরপ্রকাশ" উভয়ে আপন আপন নাম স্বাক্ষর করিতেন "অঃ প্রঃ" অর্থাৎ অঘোর প্রকাশ বলিয়া। ইহাদের মিলিত জীবন দেখিলে প্রাণ বলিয়া উঠিত—"পতির ভিতর সতী দেখ—সতীতে পতি।" আমরা পতির ভিতর সতী দেখিয়াছি—সে কি উজ্জ্বল ভাবে প্রত্যক্ষ দেখা। প্রকাশচন্দ্রের মত ভালবাসিতে সহজে কেহ পারে না—দেখিয়াছি বটে আমার পিতৃদেবকে ভালবাসিতে—আর দেখিয়াছিলাম প্রকাশচন্দ্রের জীবনে—তাঁর জীবনের ইতিহাসই হইল প্রেমের ইতিহাস। হৃদয় লুটাইয়া কি করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা প্রকাশচন্দ্র জানিতেন। এতটা প্রেমের শক্তি সাধারণ মানুষের নাই। দ্বিতীয় গুণ সৌন্দর্য্য বোধ—অসুন্দর কিছু তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না—তাঁর কথা বার্ত্তা, চালচলন, ভাব ভঙ্গী, কায়দা কানুন, সমুদায় সুসঙ্গত, সুবিহিত, সুন্দর ছিল। যেমন তেমন করিয়া কাজ কর্ম্ম করা যেখানে সেখানে বসা, যেমন তেমন ভাবে স্নানাহার করা, যা মনে হয় তাই বলিয়া যাওয়া তাঁর স্বভাব ছিল না। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা হইতে উঠিতেন—উঠিয়া নামগান করিতেন—তৎপরে পারিবারিক উপাসনা স্থানে সকলকে লইয়া বসিতেন,—তাঁদের অতি সুন্দর পারিবারিক উপাসনার গৃহ ছিল,—প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট আসন ছিল—সে ঘরটী অতি পরিষ্কার, অতি পবিত্র, পুষ্প গন্ধে সুবাসিত, প্রত্যেকে নিজের নিজের আসনে উপবেশন করিলে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু হৃদয়গ্রাহী উপাসনা হইত,—যে দিন পরিবারে যে ভাব সকলের হৃদয়ে থাকিত সেইভাবে উপাসনা। আমাদের বাড়ীতে ভিন্ন উপাসনার ঘর ছিল না—কিন্তু প্রাতে বসিবার ঘরের মেজেতে আসন পাতিতে হইত—তিনি উপর্য্যুপরি অনেকগুলি আসন পাতিয়া বসিতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি এতগুলি আসন উপরি উপরি পাতেন কেন? তিনি বলিলেন "এগুলি সব আমার প্রিয়, এখানি দেবীজীর (পত্নীর) উপহার, এখানি অমুক নিজের হাতে করিয়া দিয়াছে—এখানি আমার ভাইঝি দিয়াছেন ইত্যাদি; সবগুলিই উপহার

ইহার উপর বসিতে আমার ভাল লাগে।" প্রতিদিন যাহা কিছু নূতন পাইতেন, তাহা উপাসনার সময় উপাসনার স্থানে আনিয়া ভগবানকে কৃতজ্ঞতা দিয়া গ্রহণ করিতেন। একদিন দেখি এক জোড়া নূতন জুতা লইয়া বসিয়াছেন। একদিন টাকা— যা কিছু পাইতেন সব জিনিষ— একদিন প্রাতে দুধ খাইতে গিয়া বলিলেন "এ পেয়ালাটী কি নিবেদন করা হয়েছে"—প্রত্যেক পার্থিব বস্তু ভগবানকে নিবেদন করিতেন, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কর্ম্ম, ভগবানকে নিবেদন করিতেন। আহার করিতেন, কি শুদ্ধ পবিত্র হইয়া—কি প্রসন্ন মনে—ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আহার্য্য বস্তু মুখে তুলিতেন, আহারান্তে আবার ধন্যবাদ করিতেন। অতি পরিপাটি করিয়া তাঁহাকে আহার্য্য সাজাইয়া দিতে হইত—সুভোজ্য সুপেয় দিয়া নহে—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া—সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিয়া—প্রতিদিন এক সময়ে, এক স্থানে, একই আসনে আহার করিতেন। ভাল জিনিষ, ভাল রান্না হইলে, কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন—বাঃ বেড়ে হয়েছে—বাঃ বড় সুন্দর—কি প্রসন্নতার সহিত আহার! স্নানও কি পবিত্র— দারজিলিংএ প্রতিদিন —ঠিক এক সময় স্নান করিতেন— তোয়ালে খানি শুভ্র চাই—বস্ত্রগুলি ধৌত চাই— পাত্রটী পরিষ্কার চাই। স্নানের সময় ভগবানের নাম করিতে করিতে স্নান করিতেন অপার আনন্দে মগ্ন হইয়া। একদিন স্নানের সময় আমার নিকট একখানি তোয়ালে চাইলেন—আমি একখানি তোয়ালে দিলাম। হাতে লইয়া বলিলেন "মা লক্ষ্মি! এখানা একেবারে পরিষ্কার ত—কারো ব্যবহৃত নয় ত?"— আমি বলিলাম "না এ সদ্য ধোপার বাড়ীর তোয়ালে"—সেই দিন দুপুরে আমায় একাকী পাইয়া বলিলেন "যে সকালে স্নানের সময় তোমায় তোয়ালের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তুমি কি ভাবলে বল্ত? কেন আমি ও রকম বলেছিলাম তার কারণ শুনবে? তোমায় বল্‌ছি আমি এ সব কথা সহজে কাউকে বলি না। একবার পঞ্জাবে এক জায়গায় দিবা দ্বিপ্রহরে আমি এক অতি দরিদ্র পরিবারে অতিথি হই। তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—কি করি আমায় বাধ্য হইয়া তাঁদের আতিথ্য লইতে হইয়াছিল। আমি কোট পেণ্টলান পরিয়া গিয়াছিলাম। স্নান করিব ভাবিয়া একখানি কাপড় ও গামছা চাইলাম, তাঁরা আমায় একখানি অতি মলিন কাপড়, আর একখানি অতি নোংরা গামছা স্নান করিবার জন্য দিলেন— তাঁদের তার চেয়ে পরিষ্কার আর দ্বিতীয় বস্ত্র বা গামছা ছিল না—অগত্যা কোট পেণ্টলন ছাড়িয়া সেই চিরকুট কাপড়খানি পরিলাম এবং মাথায় জল ঢালিয়া গা পুঁছিতে যাইব—অমনি দেবীজী (মৃত পত্নী) বলিলেন "কি কর—পরের দেহের ক্লেদ নিজের শরীরে মাখিও না।" আমি চমকাইয়া উঠিলাম এবং গামছা ব্যবহার না করিয়া সেই ভিজা গায়ে সার্ট কোট সব পরিলাম —সেই হইতে আর আমি কখন কারো ব্যবহার করা কোন জিনিষ স্পর্শ করি না—বুঝলে ত কিছু মনে করিও না"—আমি শুনে অবাক। প্রকাশচন্দ্রের মুখে সকল সময় এক পবিত্র জ্যোতি প্রসন্ন হাসিতে দেখা যাইত—আমার ছোট ছেলে কতবার বলিয়াছে "মা, Christএর মুখের চারিদিকে ছবিতে halo দেখা যায় প্রকাশ বাবুর মুখে সেই রকম আলো সব সময় দেখা যায় কেন"? সে আলো আমিও দেখিতাম—পবিত্রতা, প্রসন্নতা ও প্রেম তিন একত্র হইয়া সেই মুখে অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিত। বাস্তবিক বড় আশ্চর্য্য! বাড়ীর দাস দাসী এখন কি যমদূতের মত ডাণ্ডিওয়ালারাও প্রকাশচন্দ্রকে অতিশয় ভালবাসিত। যে তাঁর কাছে আসিত—প্রেমে

বশীভূত হইয়া পড়িত। আর এক কথা প্রকাশচন্দ্র সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিতে বড় ভাল বাসিতেন—স্নানের পর অনেক সময় সুগন্ধ মাখিয়া বলিতেন "আমি সুগন্ধ মাখিতে বড় ভালবাসি"—প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে একটু বিশ্রাম করিয়া উঠিয়াই magnifying glass লইয়া স্বর্গবাসিনী পত্নীর পুরাতন পত্রগুলি যত্ন করিয়া পড়িতেন; কখন কখন কপি করিতেন—প্রতিদিন কিছুক্ষণ একাজ করিতেন, এটী তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। একদিন আমার পতি মহাশয় আমায় হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে "প্রকাশ বাবু সত্যি তাঁর স্ত্রীর পূজা করেন, তাঁর নিকট অঘোরকামিনী দেবীই বটেন।" অপরাহ্নে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াই বেড়াইতে যাইতেন—তাঁর এই বেড়াইবার নিয়ম বড় আশ্চর্য্য ছিল—যে বাড়ীতে কেহ পীড়িত, যাঁদের হৃদয় শোকার্ত্ত—প্রকাশ চন্দ্রের পা দুটী সেই দিকেই ছুটিত।

শ্রীহেমলতা সরকার।

"ভালোই হবে"।

ভালোই হবে ভালোই হবে
আকাশ ভরা আঁধার যত
আলোই হবে—আলোই হবে!
আছে বলেই আঁধার কালো
তাইত প্রভাত এতই ভালো—
রাত্রিশেষে বল্‌তে হবে
ভাগ্যে নিশা এসেছিল!

আজকে কাঁটাই পড়ছে চোখে
পুষ্প হয়ে ফুটলে ক'ব
ভাগ্যে কাঁটা ছিল বুকে!
মন! খুসী হয়েই ওঠ রে আজি
বিশ্বখানি ফুলের সাজি
আঁধার কালো—সবই ভালো
একই সুরে উঠে বাজি॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

ওঁ

শ্রীগুরবে নমঃ

সমসাময়িক কথা।

১

বিষয়-সূচনা।

আমি ঠিক আমার নিজের জীবনচরিত লিখিতে বসি নাই। কিন্তু বিধাতার কৃপায় এই দীর্ঘ জীবনে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি এবং যাহার স্মৃতি এখনও জাগিয়া আছে, তাহাই, যদি গুরুদেব সময়, স্বাস্থ্য এবং সুযোগ দেন, লিখিয়া রাখিতে চাহি। অথচ আমার জীবন-ধারা হইতে পৃথক করিয়া এই স্মৃতিগুলি লিখিতে গেলে, তাহার জন্য অনেক নথী-পত্র ঘাঁটিতে হইত; আর দশজনের স্মৃতির সঙ্গে মিলাইয়া এগুলিকে সংশোধিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিতে হইত। ইতিহাস লিখার পথ এবং পদ্ধতি ইহাই। আমি এভাবে আমার সমসাময়িক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। তবে এক অর্থে এই স্মৃতি ইতিহাসও বটে। কারণ এইরূপ স্মৃতির মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াই ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন।

যৌবনের প্রথম অবস্থায় য়ুরোপীয় সাধনার যে দিকটা আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহাতে মহাপুরুষদিগের জীবনচরিতকেই মানবসমাজের সত্য ইতিহাসরূপে প্রচার করিয়াছিল। ইতিহাস আর কিছুই নয়, কেবল সমাজের মুখ্য ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত মাত্র। কার্লাইল প্রভৃতি এই ভাবটা প্রচার করেন। অপরের কথা বলিতে পারি না, আমি কিন্তু সেই প্রথম যৌবনেও জনসাধারণকে কিম্বা গণদেবতাকে উপেক্ষা করিয়া কেবল মহাপুরুষদিগের ভজনা করিতে পারি নাই। আমার প্রকৃতির মধ্যেই এ সকলের বিরুদ্ধে একটা সহজ দ্রোহীভাব ছিল। সুতরাং ইতিহাস যে কেবল বড়লোকের কথা লইয়াই গঠিত হয়, এ মত কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি নাই। আজ ত এই মতবাদকে ত্যনিয়াই বর্জ্জন করিয়াছে।

সত্য কথা এই যে কেবল বড়লোকের নহে, কিন্তু কোনও সমাজের ছোট বড় সকল লোকের জীবন চরিতের সঙ্গে সেই সমাজের ইতিহাস অতি ঘনিষ্টভাবে জড়াইয়া থাকে। কোনও সমাজের ইতিহাসকে একখানা কাপড়ের মত মনে করিলে সেই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনের এবং সমাজের সমষ্টিগত চিন্তার, ভাবের এবং কর্ম্মের ধারাকে এই কাপড়ের টানা এবং পড়েনের সঙ্গে তুলনা করিতে পারা যায়। তাঁতের লম্বা এবং আড়াআড়ি সুতাগুলা পরস্পরের সঙ্গে অনুস্যূত হইয়া, পরস্পরকে ধরিয়া ও বাঁধিয়া রাখিয়া, একে অন্যের নিকট হইতে শক্তি গ্রহণ ও একে অন্যকে শক্তিদান করিয়া, তবে কাপড়খানি প্রস্তুত করে। সেইরূপ

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন যদি টানার সূতার মতন হয়, তবে সেই সমাজের সমষ্টিগত জীবন পড়েনের সূতার মতন হয়, এবং এই দুই মিলিয়া সত্য ইতিহাসের ধারাকে ফুটাইয়া তোলে। ইহারা কেহই একেবারে স্বাধীন নহে। এ দু'য়ের একেকে ছাড়িয়া, অপরের প্রতিষ্ঠা ত দূরের কথা, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সম্ভব হয় না। এইভাবে যাঁহারা কোনও সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সেই সমাজের সমষ্টিগত জীবনের সম্যক আলোচনা করেন, তাঁহারা সেই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনধারা হইতে তাহার সমষ্টিগত ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারাকে পৃথক করিতে পারেন না। তাঁহারা জীবন-চরিতের মধ্যে ইতিহাস এবং ইতিহাসের মধ্যেই জীবনচরিতের আলোচনা করেন। ইহা ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের এবং সমষ্টিগত সামাজিক অভিব্যক্তির সনাতন প্রবাহের সন্ধান পাওয়া অসাধ্য।

আমরা কেহই এ সংসারে একান্ত একাকীত্বের মধ্যে, সর্ব্ব-সম্পর্ক-বিরহিত হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। মাতৃগর্ভে আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত কর্ম্মফলের বোঝা লইয়া সঞ্চারিত হই। পূর্ব্বপুরুষদিগের দোষ ও গুণ, সাধনা ও সিদ্ধি সকলই আমাদের প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ত এক নহেন, বহু। মাতৃকুল এবং পিতৃকুল—এই দুই কুলে ইঁহারা বিভক্ত। এই দুই কুলের সনাতন প্রাণধারা আসিয়া আমাদের প্রাণের সঙ্গে মিলিত হইয়া জীবনের সূচনাতে অপূর্ব্ব ত্রিবেণী-সঙ্গম রচনা করে। এই দুই কুলের সাধনা এবং সিদ্ধিও আমাদিগের মধ্যে অর্শে। এই মূলধন লইয়াই আমরা ভবের হাটে বেচাকেনা করিতে আসি। যে-সকল শক্তির সমবায়ে আমাদের জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি হয়, সে-সকল শক্তির মধ্যে অনেক পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে। সুতরাং পরিণামে আমরা যাহা পাই, তাহা অনেক কাটা-ছাঁটা হইয়া আসে। এই ভাবে জীবনের আদিতেই আমাদের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠে। এ-সকল রহস্যের কথা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। আর তখন একেবারে সরাসরিভাবে কোনও মানুষের দোষগুণের বা ভালমন্দের বিচার করিতে সাহস হয় না। কে ভাল, কে মন্দ—কে জানে? কোনও বিজ্ঞলোকে কহিয়াছেন, না মরিলে কোনও লোককে ভাল বলিও না। আমার মনে হয়, কাহারও পুত্র পৌত্রাদির চরিত্র যতক্ষণ না ফুটিয়া উঠিয়াছে, ততক্ষণ তাহার বিচার করিও না। পিতার মধ্যে যাহা গুপ্ত থাকে, এমন কি সাধনের দ্বারা যাহা পিতা নিজের ভিতরে চাপিয়া রাখেন, অনেক সময় তাহা পুত্রের মধ্যে ফুটিয়া উঠে এবং ফাটিয়াও পড়ে। পিতাপুত্রে মিলিয়া যে কুলধারা ধরিয়া চলিয়া আসে, সেই ধারার সঙ্গে তাঁহাদের কেবল নিজের জীবনধারা নহে, কিন্তু সমাজের ইতিহাসধারা পর্য্যন্ত, সাগরসঙ্গমের মত পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহে। এইজন্য ব্যক্তির ভিতর দিয়াই তাহার সমাজ-জীবনের আলোচনা করিতে হয়; এবং সেই সমাজ-জীবনের উপরে ফেলিয়াই সেই ব্যক্তির নিজের জীবনেরও কালি কষিতে হয়। এইভাবে দেখিলে, কেবল বড়লোকের জীবনচরিতের সঙ্গে নহে, কিন্তু সমাজের অতি অজ্ঞাত এবং হেয় ব্যক্তির জীবনের সঙ্গেও তাহার সমাজের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয়।

আমরা যতই ছোট হইনা কেন, আমাদের জীবন-চেষ্টার মধ্য দিয়া কখনও কেবল নিজেদেরই

আত্ম প্রকাশ করি না, তাহার সঙ্গেসঙ্গে আমাদের সমাজেরও আত্ম-প্রকাশ হইয়া পড়ে। সূর্য্য যেমন নিজেকে প্রকাশ করিতে যাইয়াই এই দৃশ্যমান জগতকে প্রকাশিত করেন, এবং এই জগতকে প্রকাশ করিতে যাইয়াই নিজেও প্রকাশিত হন; আমরাও সেইরূপ নিজেদের জীবনের সঙ্কীর্ণ খাতের ভিতর থাকিয়াই একদিকে নিজেকে এবং অন্যদিকে যে বিরাট সমাজের মধ্যে আমরা বাস করি, সেই সমাজকে প্রকাশিত করিয়া থাকি। এই সত্য যিনি বোঝেন, জীবন চরিত এবং ইতিহাস এই দুয়ের কোথায় কোনটার শেষ এবং অপরের আরম্ভ, তিনি কিছুতেই ইহা পরিষ্কার ভাগাভাগি করিতে পারেন না। তিনি নিজেরই হউক বা অপরেরই হউক, জীবন-কথা লিখিতে গেলেই ইতিহাসের জাল পাতিয়া বসিবেন; এবং ইতিহাস রচনা করিতে গেলেই সমাজের অন্তর্গত ছোট এবং বড় সকল শ্রেণীর লোকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রেরণা এবং চেষ্টা, সাধনা এবং সংগ্রাম, সফলতা এবং নিষ্ফলতার মধ্য হইতেই তাঁহার ইতিহাসের সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ করিবেন।

আমি ঠিক নিজের জীবনচরিত লিখিতেও বসি নাই; আবার ঠিক আমার সমসময়ের একখানি ইতিহাসও লিখিতে বসি নাই। কেবল প্রত্যেক সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে, তারা ছোটই হউক আর বড়ই হউক, তাহাদের সমসাময়িক সামাজিক অভিব্যক্তিধারার যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, ইহা মনে রাখিয়া, আমার ক্ষুদ্র জীবনের কাঠামের উপরে এই সামাজিক অভিব্যক্তির একটা মূর্ত্তি, যদি আমার সাধ্যে কুলায়, গড়িতে চাহি। আমার নিজের জীবনের ক্ষুদ্রতার সঙ্গে অপরের কাহারও কোনও সম্বন্ধ নাই। সে-সকল কথা বলিয়াও লাভ নাই, শুনিয়াও লাভ নাই। কিন্তু আবার এই ক্ষুদ্র জীবনের সমক্ষে, তাহার সঙ্গে স্বল্প-বিস্তর অনুস্যূত হইয়া, গত ষাট বৎসর কালের ভিতরে বাংলা-দেশে এবং ভারতবর্ষে যে নূতন চিন্তা, ভাব এবং কর্ম্মধারা প্রকাশিত হইয়াছে, সে-কথা বলিবার যোগ্যও বটে, আর যাঁহারা স্বদেশমাতৃকার এই নূতন রূপ দেখিবার জন্য লালায়িত, তাঁহাদের প্রণিধান করিবার বিষয়ও বটে। এইভাবেই এই কাহিনীটা লিখিতে বসিলাম। "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

২

শৈশব-স্মৃতি।

আমার একখানা কোষ্ঠী ছিল; প্রায় পোনের ষোল হাত লম্বা। বহুদিন হইল সেখানা কোথায় গিয়াছে, জানি না। কেবল এইমাত্র মনে পড়ে তাহাতে—শকাব্দাঃ ১৭৭৯।৬।২১।... এইভাবে আমার জন্মদিনের উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ ১৭৭৯ শকাব্দার ২২শে কার্ত্তিক আমার জন্ম হয়। এদিনের ঠিক কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করি, তাহার কথা মনে পড়ে না। শ্রীহট্টের অন্তর্গত বর্ত্তমান হবিগঞ্জ মহকুমার প্রায় তিন মাইল দূরে পইল গ্রামে পৈতৃক ভদ্রাসনবাটীতে আমি ভূমিষ্ঠ হই। সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের বংশাবলী পড়িয়া মনে হয়

যে হিরণ্য পাল নামে আমাদের এক পূর্ব্বপুরুষ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোট গ্রাম হইতে যাইয়া এই গ্রামের পত্তন করেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় তাঁর "উজানী" গ্রন্থে মঙ্গলকোটের উল্লেখ করিয়াছেন দেখিয়া, সেখানে বাৎস্য গোত্রের কোনও পাল-পরিবার আছেন কিনা, ইহার সন্ধান লইয়াছিলাম। কুমুদ বাবু আমাকে লিখিয়া পাঠান যে বর্ত্তমানে মঙ্গলকোটে কোনও কায়স্থ পাল-পরিবার নাই; তবে এক সময়ে এক সমৃদ্ধ পাল-পরিবার যে মঙ্গলকোটে ছিলেন, 'পালের দীঘি" নামে একটা প্রাচীন পুষ্করিণী তাহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। হিরণ্যপাল সস্ত্রীক পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে শ্রীহট্টে যাইয়া পড়েন এবং "বুড়ি-গঙ্গার" উত্তর দিকে এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া, তাহার নাম পইল রাখিয়া, সেখানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই হিরণ্য পাল হইতে আমার পিতা-ঠাকুর ৺রামচন্দ্র পাল পর্য্যন্ত পঁচিশ পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান অন্ততঃ সাত আটশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে আমাদের বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

আমার জন্মকালে বাবা বোধ হয় ঢাকায় সদরালার আদালতে পেষকারের কর্ম্ম করিতেন। তিনি সেকালের প্রথা অনুসারে পার্শী শিখিয়াছিলেন। পার্শীই তখনও এদেশে ইংরাজ কোম্পানীর আদালতে প্রচলিত ভাষা ছিল। এখন যেমন সরকারের চাকরী করিবার লোভে লোকে ইংরাজী শেখেন, একশত বৎসর পূর্ব্বে সেইরূপ লোকে আইন আদালতে চাকুরী করিবার জন্য পার্শী শিখিতেন। সুদূর পল্লীগ্রামেও মুসলমানের আমলে পার্শী, আরবী শিখিবার ব্যবস্থা ছিল। মুসলমান মৌলবীরা নিজেদের বাড়ীতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। শুনিয়াছি পার্শী ভাষাতে বাবার বেশ দখল ছিল; এবং মৌলবীরাও তাঁহার পার্শী এবারতের বা লিখন-রীতির বিশেষ প্রশংসা করিতেন।

আমার জন্মকালে বাবার অবস্থা মন্দ ছিল না। আজিকালি যেরূপ সঙ্গতি থাকিলে লোকে দালান-কোঠা নির্ম্মাণ করে, তখনকার টাকার দাম ধরিলে বাবার যে সেরূপ সঙ্গতি ছিল না, এমন বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে এক টুকরা ইট ছিল না। খড়ো ঘরের মাটির মেজেয় আমি ভূমিষ্ঠ হই। সে কালের লোকে সচরাচর বড় বড় দালান-কোঠা প্রস্তুত করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতে যাইত না। কেবল ভক্তিমান লোকে কখনও কখনও গৃহ-দেবতার জন্যই ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিতেন। আমাদের গ্রামটা খুব বড়। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ পরিবারের বাস। এই গণ্ডগ্রামে বোধ হয় আমার বাল্যকালে দেব-মন্দির ছাড়া একখানাও কোঠা বাড়ী ছিল না। লোকে তখন নিজেদের অভ্যুদয় জাহির করিবার জন্য অর্থব্যয় করিত না। আত্মীয়-কুটুম্ব প্রভৃতির প্রতিপালনের দ্বারাই নিজের অর্থের সার্থকতা সম্পাদন ও সমাজে যশঃঅর্জ্জন করিত।

সমাজের লোকেরাও এইরূপ ঐশ্বর্য্য বিস্তার সহ্য করিতেন না। প্রথম যৌবনে একটা ঘটনার কথা শুনিয়া তখনকার সমাজ প্রকৃতির এই পরিচয় প্রাপ্ত হই। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একজন বেশ বড় ধনী জমীদার ছিলেন। জাতিতে ইঁহারা তৈল-ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহাদের ও পদ 'পাল' ছিল। ছেলে বেলা লোকে আমাকে এই পাল-চৌধুরী দিগের জাতি বলিলে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিতাম। সম বয়স্করাও সর্ব্বদা এই বলিয়া

আমাকে ক্ষেপাইতে চেষ্টা করিত। সেকালে আমাদের অঞ্চলে এ সম্বন্ধে একটা কবিতাও প্রচলিত ছিল।

তেলিংয়ে পড়িলে পাল নমঃশূদ্রে চণ্ডাল
নাপিত পড়িলে হয় চন্দ।
এই তিন মতিনাশে যে করে বিশ্বাসে
বিধির সহিত তার দ্বন্দ্ব॥

এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াও সমবয়স্কেরা আমাকে ক্ষেপাইত। এই জাত্যাভিমানের কথা মনে পড়িলে এখন হাসি পায়। সে যাহা হউক, এই জমিদার পাল-চৌধুরী দিগের মতন ধনী লোক আমাদের আশে পাশে তখন কেউ ছিল না। এরূপ শুনা যায় যে একদিন ইঁহাদের বাড়ীতে জ্ঞাতিভোজনের নিমন্ত্রণ হয়। গৃহস্থ প্রায় শতাধিক কাঁসার থালা, বাটি, গ্লাস বাহির করিয়া আসন পাতিয়া অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছিলেন। পাত পাড়া হইলে গৃহস্বামী আসিয়া যথারীতি গললগ্নীকৃতবাস করজোড়ে আমন্ত্রিতদিগকে আহারের স্থানে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বয়োজ্যেষ্ঠেরা আগে আগে চলিলেন। দ্বারদেশে যাইয়া গৃহস্বামীর এই ঐশ্বর্য্য-বিস্তার দেখিয়া তাঁহারা থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ঘরে ঢুকিলেন না। গৃহস্বামী তখন তাঁর কি অপরাধ হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে, জ্যেষ্ঠেরা কহিলেন,—তোমার অনেক টাকা আছে জানি, তাতে আমরা খুসী। কিন্তু তুমি কি আমাদিগকে সেজন্য এরূপ ভাবে অপমান করিতে আজ ডাকিয়া আনিয়াছ? গৃহস্বামী আকাশ হইতে যেন পড়িয়া গেলেন। কোথায় যে তাঁর ত্রুটি হইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন না। কহিলেন, আমি আপনাদের পায়ের ধুলার সমান নই, আপনাদের অপমান করি এত বড় সাধ্য আমার কই? আপনাদের পায়ের ধুলা পড়িয়া আমার বাড়ী পবিত্র হইয়াছে। কি করিলে আপনাদের সন্তোষ হয় বলুন, তাহাই করিতেছি। জ্যেষ্ঠেরা তখন কহিলেন, তুমি যে এই থালা গেলাস বাহির করিয়াছ এবং আমাদের জন্য এই আসন পাতিয়া দিয়াছ, আমাদের বাড়ীতে যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করিব, তখন ত আমাদের তোমাকে এভাবে অভ্যর্থনা করা সম্ভব হইবে না। আমরা যে-ভাবে তোমাকে খাওয়াইতে বসাইতে পারিব না সেভাবে তোমার বাড়ীতে আমরা খাইতে রাজী নই। দশজনের বাড়ীতে যেমন জ্ঞাতি-ভোজন হয়, সে রীতি যদি তোমার বাড়ীতে না থাকে তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমাদের চলা অসাধ্য হইবে। তখন পাল-চৌধুরী মহাশয়কে আপনার ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিয়া দরিদ্রতম জ্ঞাতির বাড়ীতে যে ব্যবস্থা সম্ভব সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া তবে জ্ঞাতি-ভোজন করাইতে হইল।

পাকা দালান-কোঠা ছিল না বলিয়া আমাদের বাড়ীটা যে ঠিক পর্ণকুটীর ছিল, তাহাও নহে। আমাদের দেশে একপ্রকার সুন্দর, উলুখড় জন্মায়। ইহা একজাতীয় কুশ। এই উলুখড় বা উলুছন দিয়াই তিন পোয়া বা এক হাত পুরু করিয়া আমাদের চাল ছাওয়া হইত। চালের নীচের দিকে শরের দর্মা এবং সৌখীন লোকে শীতল পাটী পর্যন্ত দিতেন। এসকল ঘর বাঁধিতে দড়ির ব্যবহার হয় না। যে সরু এবং পালিশ বেত দিয়া এখন লোকে চৌকী বা কৌচ ছাইয়া থাকে, সেই বেত দিয়াই চাল বেড়া সব বাঁধা হয়। ঘরের খুঁটী হয় বাঁশের, না হয়

কাঠের। এ সকল ঘর দেখিতে অতি সুন্দর। এক এক বাড়ীতে এরূপ সাত-আট খানা ঘর থাকে। আমাদের বাড়ীতেও খোলা নাট-মন্দির ছাড়া সাত-আট-খানা ঘর ছিল।

আমার পিতৃপরিবার বড় ছিল না। বাবার শৈশবেই ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমা স্বর্গারোহণ করেন। বাবার এক খুড়া ছিলেন, তিনিও বেশী দিন বাঁচিয়া ছিলেন না। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা ছিলেন। আমার জন্মের বহু পূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়া যায়। বাবার নিজের সোদর কোনও ভাই-ভগিনী ছিলেন না। বাল্যে পিতৃহীন হইয়া তিনি একরূপ মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন। কিন্তু পরিবারবর্গ বেশি না থাকিলেও, স্বজনগণের অভাব ছিল না। বাবার ঢাকার বাসাবাড়ীতে বহু আত্মীয়েরা আসিয়া উমেদারী করিতেন। আমাদের ভদ্রাসন বাড়ীতে পরিবারবর্গের কেহই থাকিতেন না। কেবল পূজার ছুটিতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাবা বাড়ী যাইতেন। আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই বোধ হয় বাবা দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন। তাঁর জীবদ্দশাতে একবারও এ উৎসবের ব্যাঘাত ঘটে নাই।

আমার জন্মের অল্পদিন পরেই মা আমাকে লইয়া ঢাকা চলিয়া যান। ঢাকার কথা আমার একটু আধটু যেন মনে পড়ে। আমরা একটা পাকা কোঠা বাড়ীতে ছিলাম। সে-বাড়ীর সামনে খুব বড় একটা দেউড়ী ছিল, আর পাশেই একটা মস্‌জিদ ছিল। সেই মস্‌জিদে যখন 'আজান' পড়িত, যেন মনে হয় দুই বৎসরের শিশু আমি তখন আমাদের যে জানালাগুলো মসজিদ্‌বাড়ীর উঠানের দিকে খোলা ছিল, সেই জানালায় গিয়া দাঁড়াইয়া দুইহাতে দুই কান ধরিয়া 'আজান' দিতাম। তবে এটা ঠিক স্মৃতি না শ্রুতি বিচার করিয়া উঠিতে পারি না। কারণ জ্যেষ্ঠদিগের মুখে একটু বড় হইয়াও আমার এ অপকীর্ত্তির কথা শুনিতাম বলিয়া মনে হয়। তবে আমাদের বাড়ীর নিকটে একটা উল্লুক ছিল, তার ডাকের যে প্রতিধ্বনি আমি সর্ব্বদাই করিতে চেষ্টা করিতাম, ইহা শ্রুতি নহে স্মৃতি।

আমার মা, বাবার দ্বিতীয় পত্নী। প্রথম সংসারে সন্তান হয় নাই বলিয়া বড়মার পীড়াপীড়িতে বাবা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। সে এক আশ্চর্য্য কাহিনী। আমার মার মুখে শুনিয়াছি। বড়মা বাবাকে আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে প্রথমে বাবা কিছুতে রাজী হন না। তিনি বলেন, ভগবানের ইচ্ছা হইলে প্রথম সংসারেই তাঁহার বংশ রক্ষা হইত। দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেই যে হইবে, তাহারই বা স্থিরতা কি? আর ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তখনও বড়মার পক্ষে সন্তান ধারণ একেবারে অসম্ভব ছিল না। বহুদিন এই লইয়া স্বামীস্ত্রীতে কথা কাটাকাটি চলে। শেষে বড়মা তাঁর বাপের বাড়ী যাইয়া নিজের ভবিষ্যৎ সপত্নীর অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁর পিত্রালয়ের কাছেই আমার মাতুলালয়। এই কন্যার সন্ধান পাইয়া নিজে তাঁহাকে দেখিতে আসেন, এবং নিজেই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আপনার স্বামীর বিবাহ দেন। আমার মা খুব সুন্দরী ছিলেন। অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুসমাবেশে তিনি ডাকসাইটে সুন্দরী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বড়মাকে আমার মনে নাই; কিন্তু শুনিয়াছি আমার মায়ের মত তাঁর রূপ ছিল না। অথচ তিনি এই রূপলাবণ্যবতী বালিকাকে ডাকিয়া আনিয়া আপনার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

মার মুখে শুনিয়াছি যে একদিনের জন্য বড়মার সঙ্গে তাঁহার ঝগড়া-ঝাটি হওয়া ত দূরের কথা, সামান্য মনোমালিন্য পর্য্যন্ত হয় নাই। স্বামীর বংশরক্ষার জন্য সপত্নী ঘরে আনিয়া তিনি যেন সে সংসার হইতে নিজেকে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিসে আমার মা সতীনের ঘর করিতে আসিয়া কোনও প্রকারে ক্লেশ মাত্র না পান, বড়মা সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন। আমি জন্মিলে পরে আমার প্রতিপালনের ভার বড়মা নিজে গ্রহণ করেন। মাকে এক স্তন্যদান ব্যতীত আর কোনও প্রকারে আমার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় নাই। বড়মা-ই আমার সকল ঝঞ্ঝাট পোহাইতেন। আমার বয়স যখন প্রায় দুই বৎসর তখন বড়মা সংসার-লীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার গহনাপত্র সব আমার ভবিষ্যৎ পত্নীর জন্য মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়া যান। এসকল কথা আমি বড় হইয়া মায়ের মুখে শুনিয়াছি। বড়মার কথা উঠিলে মার মুখে তাঁর প্রশংসা ভরিয়া উঠিত।

বোধহয় আমার জন্মের অল্পদিন পরেই ইংরাজ সরকার প্রথমে এদেশে ওকালতী পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন। বাবা প্রথম বৎসরেই এই ওকালতী পরীক্ষা দেন। ঢাকা হইতে আরও অনেকে এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ঢাকার পরীক্ষার্থীদের সকল কাগজগুলি হারাইয়া যায়; কলিকাতায় পরীক্ষকদিগের নিকট আসিয়া পৌঁছে নাই। কিন্তু ইহাতে পরীক্ষার্থীদের কোনও ক্ষতি হইল না। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাঁরা যাঁরা পরীক্ষা দিয়াছিলেন সকলকেই ওকালতীর সনদ দেন। এই ভাবে ওকালতী করিবার অধিকার পাইয়া, বাবা পেষকারী ছাড়িয়া বোধহয় ঢাকাতেই প্রথমে ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁহাকে ওকালতী করিতে হয় নাই। কারণ আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসরও হয় নাই, তখনই বাবা প্রথমে যশোহরে এবং পরে বরিশালে মুন্সেফ হইয়া গমন করেন।

যশোহরে মুন্সেফী করিতে যাইয়া বাবা আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। যশোহরে কোথায় যে তিনি মুন্সেফী করিয়াছিলেন তাহার সন্ধানও জানি না। কিন্তু বরিশালের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। বরিশালের নলচিঠি বন্দরের নিকট কোটেরহাট বলিয়া একটা মহকুমা ছিল। এই মহকুমায়ই বাবা মুন্সেফ হইয়া যান। আমার বয়স তখন পাঁচ বৎসর হয় নাই। কারণ আমার বেশ মনে আছে, এই বরিশালেই প্রথমে আমার হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভ হয়। আর সে কালের রীতিঅনুসারে পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বে বালকের হাতে খড়ি দেওয়া হইত না। কোটেরহাট একটা নদীর ধারে ছিল। নদীর উপরেই বাবার কাছারীঘর ছিল। তার একটু দূরে আমাদের বাসা ছিল। বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন এবং গ্রামবাসী কর্ম্মের অন্বেষণে বরিশালে যাইয়া উপস্থিত হন। ইঁহারা প্রায় সকলেই মুন্সেফী আদালতে কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। ইহাতে স্থানীয় লোকের উপরে কতটা অবিচার করা হইয়াছিল বলিতে পারি না। অন্যপক্ষে সুদূর বিদেশ হইতে কোনও কর্ম্মচারীকে আনিলে [illegible] মফস্বল তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য তাঁর নিজের জনেরা যদি সঙ্গে না আসেন তবে তাঁর প্রতিও কিছু অত্যাচার করা হয়। সেকালে কোটেরহাট হইতে আমাদের বাড়ী যাইতে বোধ হয় প্রায় পনের দিন লাগিত। এতটা সুদূর প্রবাসে কেহ কেবল পুত্রকন্যা লইয়া বাস করিতে পারে না। এই দিক দিয়া দেখিলে দেশকাল বিবেচনায় বিদেশী মুন্সেফের সঙ্গে

সঙ্গে তাঁর কতকগুলি আমলা ও পেয়াদা আসিয়া জুটিয়াছিল বলিয়া বিশেষ আপত্তি করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু বাবা এসকল আত্মীয়-স্বজনগণের কর্ম্ম দিয়াই তাঁহাদের সঙ্গে সকল আত্মীয়তার একরূপ শেষ করিয়া দেন। তাঁর আমলাবর্গের মধ্যে কেহ তাঁহার সঙ্গে কোনও আত্মীয়তার দাবী করিতে পারিতেন না। আমার এখনও মনে পড়ে, আমার একজন কাকা—বাবার আপনার মাসতুত ভাই—স্থানীয় লোকের নিকটে তাঁর এই সম্বন্ধের কথাটা বলিয়াছিলেন এই অপরাধে বাবা তাঁহাকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দেন। এ সকল আত্মীয় স্বজনেরা আমাদের বাসার নিকটেই নিজেরা বাসা করিয়া থাকিতেন। মুন্সেফ মহাশয়ের বাসার লোক বলিয়া তাঁহারা পরিচিত হন এবং সেই পরিচয়ে স্থানীয় লোকের উপরে কোনও প্রকারে প্রভুত্ব করেন, বাবা কিছুতেই এই সুযোগ দিতে রাজী হন নাই।

সেকালে উপরি উপার্জ্জনটা আদৌ নিন্দনীয় ছিল না। চাকুরীয়াদিগকে সকলেই বেতন কত—ইহার সঙ্গে সঙ্গেই উপরি উপার্জ্জন কত, নিঃসঙ্কোচে ইহা জিজ্ঞাসা করিত। আর তাঁহারাও নিঃসঙ্কোচে এ প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত সুযোগ পাইলে উপরি উপার্জ্জন করিতে ছাড়িতেন না, এবং প্রকাশ্যভাবে নিজেদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে এই উপরি উপার্জ্জন করিবার সুবিধা করিয়া দিতেন। বাবা যখন ঢাকায় সদরালায় পেষকার ছিলেন, তখন এরূপ একটা ঘটনা হয়। সেকালে ঢাকায় ভাওয়ালের কালীনারায়ণ রায় আর ওয়াইস্ সাহেব ইহাঁরা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত জমীদার ছিলেন। ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মামলা-মোকর্দ্দমা প্রায় সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। প্রবাদ ইহাঁদের মধ্যে একটা দেওয়ানী মামলায় সরজমিন্ তদন্ত করিবার ভার সদরালা সাহেবের হুকুমে বাবার উপরে পড়ে। বাবা সরজমিনে উপস্থিত হইলে কালীনারায়ণ রায়ের লোকেরা দুই হাজার টাকা লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া তাহাদের পক্ষে রিপোর্ট দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করে। বাবা মহা সঙ্কটে পড়িলেন। টাকাটা ফেরত দিলে ইহারা ভাবিবে ওয়াইস্ সাহেব বেশী টাকা দিয়া ইহাকে বশ করিয়াছে; আর এই ধারণা জন্মিলে তাঁহার পক্ষে প্রাণ লইয়া ঢাকায় ফিরিয়া আসা কঠিন হইবে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি টাকাটা ঢাকায় পাঠাইয়া দিতে কহিলেন। এত টাকা লইয়া তাঁহার পক্ষে পথে চলা নিরাপদ হইবে না; বিশেষতঃ তাঁর রিপোর্ট তিনি ঢাকায় গিয়াই ত দিবেন। রিপোর্ট দিবার পরেই টাকাটা দিলেই ভাল হয়। এইরূপে তিনি তাহাদের হাত এড়াইয়া ঢাকায় আসিলেন। আর ইহাদের টাকা প্রত্যাখ্যান করিয়া সরজমিন্ তদন্তের যথাযথ রিপোর্ট দিলেন। এতটা টাকা তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন শুনিয়া সদরালা সাহেব প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার পেষকারের নির্ব্বুদ্ধিতার সমালোচনা করিয়াছিলেন।

যতদিন মুন্সেফী করিয়াছিলেন ততদিন নিজের পদের মর্য্যাদা রক্ষার দিকে বাবার [illegible] প্রখর দৃষ্টি ছিল বলিয়া মনে হয়। বরিশালের একটা ঘটনা জীবনে ভুলিব না। আমার [illegible] তখন পাঁচ বৎসর হইয়া গিয়াছে। আমি শিশু বোধে তখন ক, খ পড়ি। দু'বেলা আমি বাবার সঙ্গে তাঁহার পাতে বসিয়াই খাইতাম। একদিন সকালে তাঁহার সঙ্গে খাইতে বসিয়াছি। সেকালে রাঁধুনী বামুন রাখার প্রথা প্রচলিত হয় নাই। বাবা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কখনও

বেতন দিয়া রাঁধুনী বামুন রাখেন নাই। বেতনভোগী মাত্রেই ভৃত্যের পর্য্যায়ে পড়ে। এই জন্য ব্রাহ্মণকে বেতনভুক করিতে বাবার ধর্ম্মবুদ্ধিতে আঘাত পড়িত। কোটেরহাটে মা-ই রান্নাবান্না করিতেন। মা ভাত বাড়িয়া কল্মি শাক পরিবেশন করিলেন। বাবা এই শাক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শাক কোথায় পাইলে? মা কহিলেন, নদীর ওপার হইতে এক পাটুনী স্ত্রীলোক আনিয়া দিয়াছে। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, দাম দিয়াছ? মা কহিলেন, এ শাক আবার কেউ বেচে বা কেনে, এ ত শুনি নাই। সেও দাম চায় নাই, আমিও দিই নাই। এই কথা শুনিবা মাত্র বাবা পাত ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বাহির বাড়ীতে গিয়া পেয়াদা পাঠাইয়া তখনি সেই পাটুনি স্ত্রীলোককে ডাকিয়া আনাইলেন; এবং তার শাকের দাম দিয়া সে যেন কখনো আর তাঁহার বাড়ীতে আসে না, আসিলে গুরুতর শাস্তি পাইবে, এই ভয় দেখাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন। এই স্ত্রীলোকের একটা দুর্দ্দান্ত ছেলে ছিল। বাবার দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মামলার বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল। এই পাটুনী যুবক মাঝে মাঝে ফৌজদারীতে চালান হইয়া তাঁহার এজলাসে হাজির হইত। আর বিশেষ ভাবে এই কারণেই বাবা সামান্য কল্মি শাকের জন্য মা'র উপরে এতটা তম্বী করিয়াছিলেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বর্ষারম্ভে।

আজ যত সুখ দুঃখ যত হর্ষ শোক
তোমাতে মগন হোক, হে আনন্দ লোক!
উচ্ছুসিত হৃদয়ের, উৎস ধারা শত
পরিপূর্ণ বরষায় তটিনীর মত
মহা বেগে, মহাসিন্ধু! তোমা মুখি হ'য়ে
ধন্য হো'ক জন্ম মম, তোমাতে মিশিয়ে।
প্রেমের পরশ লাগি উন্মুখিত করি,
রাখ মোরে নিশিদিন প্রেমাস্পদ হরি
অন্তর কুসুমে মরে, ভাব ভাষাহীন
পরিপূর্ণ করি দাও আজিকার দিন।
সরে যাও ধরণীর ধূলি রাশি শত,
শাখা চ্যুত প্রাণ হীন, শুষ্ক পত্র মত।
শুদ্ধ করি আপনারে হোমানল জ্বালি
আমার উত্তপ্ত হৃদি, ঘৃত রূপে ঢালি
শুষ্কতা অনল জ্বালি শুচি হ'তে চাই
তুমি বিনা এ দীনার আর কেহ নাই।
এস মোর হে বাঞ্ছিত! সারা বিশ্ব জুড়ে
বাহির প্রাঙ্গন হ'তে, হৃদি অন্তঃপুরে।

শ্রীসরলাদত্ত।

নারীর কথার আর একদিক।

গত মাসে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর লিখিত নারীর কথা পড়িয়া মনে পড়িয়া গেল তাঁহার "ভারতবর্ষে" লেখা কতগুলি প্রবন্ধের কথা। সব কয়টিতেই যেন পুরুষদিগের সম্বন্ধে জ্বালার ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার মতে যেন মনে হয়, নারীজাতির সকল দুর্দ্দশার মূলে স্থির হইয়া আছে কেবল ঐ পুরুষ জাতিটা। তাই লেখিকা চাহিতেছেন বর্ত্তমান যুগের নারী জাতি যেন ভরসা করিয়া বলিয়া ওঠেন "তোমাকে হে পুরুষ, যদি ভগবৎ সাধনে অক্ষম, অলস, চঞ্চল চিত্ত, স্বাস্থ্যহীন, বিলাসী ও দুর্ব্বল করিয়া তুলিতে পারি তাহাতে আমার কোনও অধর্ম্ম হয় না, আমার প্রতি তোমার ব্যবহারের উচিত প্রতিফল দেওয়া হয়।" আজিকার এই অহিংসার সাধনার যুগে নারীর এই কি করালী, প্রতিহিংসার লোল জিহ্বা প্রসারিণী মূর্ত্তি তিনি মানস নেত্রে তুলিয়া ধরিতেছেন। এ কী ভীষণ জ্বালা অন্তরে তাঁহার।

'সবল' পুরুষ দুর্ব্বলা 'অবলাকে' জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া তাহার সকল অধিকার কাড়িয়া লইল—ইহাই কি সত্য এবং একান্ত সত্য? তাহাই, যদি হয় তবে অবলাতো নিজ মুখেই স্বীকার করিয়া লইতেছে যে সে দুর্ব্বল সে শক্তিহীন, জীবন যাত্রার মহাসমরে সে হারিয়াই যাইবার মত। তাহা হইলে তো দেশ এবং সমাজের কল্যাণের জন্য এই নারীর সৃষ্টির ও প্রয়োজন নাই—তাহা হইলে চাই তো নূতনতর জীব, নারী দেহের মধ্যে বিদ্যুৎ গর্ভা কাদম্বিনীর মতই যে তেজো রাশি ধরিয়া আছে—সঞ্চারিণী অগ্নিশিখা যে, শক্তিময়ী দুর্গা প্রতিমা যে।

শারীরিক বল আমাদের নাই সত্য, কিন্তু মনের বল তো কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। তাহা বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছিল যে, সে কি দূরদৃষ্টিসম্পন্না ছিল! ত্যাগকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র বলিয়া মাতৃভাবময়ী যে স্নেহশীলা প্রিয়জনের অসুবিধা হইবে মনে করিয়া নীরবে তাহার অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন, নিজকে অবিচার পীড়িতা হইতে দিয়াছিলেন, তিনিই কি তাহার ভবিষ্যদ্বংশীয়ার পায়ের বেড়ি নির্ম্মাণের সহায়তা করেন নাই? পশুবল দৃপ্ত হইয়াই পুরুষ যদি তাঁহার দিকে চোখ রাঙ্গাইয়াছিল শক্তি অংশ সম্ভূতা তিনি কি সত্যসন্ধ মহাপুরুষের ন্যায় সত্যাগ্রহকে জীবনে বরণ করিতে পারেন নাই? পুরুষের যে যথেচ্ছাচার বা যে স্বার্থ সুখ ভোগের সুবিধা হইবে বলিয়াই পুরুষ নারীকে পিঞ্জরে বান্ধনা করিয়াছিল সেই সুখভোগকে ত আত্মিক বলপ্রয়োগ দ্বারাই তিনি ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারিতেন—তিনি তাহা দিয়াছিলেন কি? নারীর ও আজ ভাবিবার সময় আসিয়াছে যে পুরুষের বল দর্পকে তিনি নীরবে কতখানি সহিয়া আসিয়াছেন। ক্ষমাই তো জীবনের চরম কথা নয়—অবিচারের বিরুদ্ধে জ্বলিয়া ওঠাও যে সমানই সুন্দর। শুধু অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতেই তো নারীরূপ সার্থকতা লাভ করে না—দুর্গা সিংহবাহিনী কেও যে জগৎ রক্ষায় সমান প্রয়োজন। লেখিকা জ্বলিয়া উঠিতে চাহিতেছেন—মলিনতা ধ্বংস কারিণী পাবনী অগ্নিশিখা রূপে নহে, খাণ্ডব দহন কারী ভীষণ বুভুক্ষু রসনা মেলিয়া পুরুষ জাতিটাকেই ধ্বংস মুখে ফেলিতে চাহিয়া।

মহিষাসুর নাশিনী মূর্ত্তি তাহার নয়, শিবকে পদতলে দলিত করিয়া ভীমা কালী মূর্ত্তিতে তিনি প্রকাশিতা হইতে চাহিতেছেন।

নারীকে আজ ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহার যে স্বভাবগত অধিকার ছিল তাহা হইতে সে বিচ্যুত হইল কেমন করিয়া? পুরুষ যদি অন্যায় করিয়া গায়ের জোরে তাহাকে অত্যাচার করিয়া থাকে তাহা হইলে তো সে সেই অত্যাচারকে ভালবাসার খাতিরে সহিয়া আসিয়াছিল, প্রতিকার করিবার চেষ্টা করে নাই, এবং সেই জন্য আজ সেও জীবন বিধাতার বিচারসভায় পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকেই করিতে হইবে।

তর্কের খাতিরে আপাততঃ মানিয়া লইলাম নিজের অসুবিধা হইবে বলিয়া পুরুষ নারীর চোখ ফুটাইবার চেষ্টা করিল না এবং তাহার আপনা হইতে ফুটিবার পথটাকেও বন্ধ করিয়া দিল। বুদ্ধি এবং দৈহিক শক্তি উভয়টাতেই শ্রেষ্ঠ না হইলে সে এরূপ বন্ধ করিয়া দিতে পারে না। তাহা হইলে যোগ্যতরের জয় লাভের যে নিয়ম প্রকৃতিতে পরিদৃষ্ট হয় তাহাই এখানে খাটিয়া গিয়াছে। নারীর গলা ফাটাইয়া চেঁচাইবার কিছু নাই—আছে শুধু আপনাকে উন্নততর জীবে বিবর্ত্তিত করিবার কাজ, কিন্তু একথা যে আমরা সত্য সত্যই মানিতে প্রস্তুত নই এবং তাইতো একা পুরুষের ঘাড়ে অদূরদর্শিতার দোষটা সমস্ত চাপাইয়া, মনকে প্রবোধ দিতে পারি না। দুজনারই অদূরদর্শিতার ফলে নিজে যে দিন সব হারাইয়া বসিলাম তখন সে হারাণোকে আদর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছিলাম—আমরাও তো। নিজেকে আর ভাবিতে হয় না, অপরের চর্ব্বিত চর্ব্বণ চিন্তাগুলিকে জগতের সার সত্য বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলাম আমরাই তো! পুরুষকে "পরশ পাথর" নাম দিয়া নিজেকে শ্রীচরণাশ্রিতা দাসী বানাইয়া গৌরব অনুভব করিলাম আমরা তো। আমাকে, সে যখন দাসী বলিল তখন খুসী হইয়া উঠিল আমারই মন, হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত অনুরাগে সে যখন আমাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিল তখনও তো আগ্রহের সহিত সেই ক্ষণিক উচ্ছ্বাসকে ভক্তের চিরন্তন পূজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম আমিই। আমিই তো ভুলিয়া বসিয়াছিলাম যে এক মানবত্বের মধ্যে সমান অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে আর আমি দুইটি প্রাণী। সবটাই তাহার সুখ ভোগ লালসা, তাহার স্বার্থপরতা তাহার অদূরদর্শিতা বলিলে চলিবে কেন? নিঃস্বার্থ আমি তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া যে ত্যাগ করিলাম তাহা জগতের এবং তাহার কি ক্ষতি করিল তাহা তো আমি দেখি নাই।

ক্ষতি যখন পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়া জীবনের সহজ গতির মুখে বাধা হইয়া দাঁড়াইল, তখন সে-ই কি কিছুটা চেতনা লাভ করে নাই! সে-ই তো প্রথমে আমাকে ডাকিয়া সচেতন করিয়া দিল। যাহাকে সে অনেক দিন বুঝিতে চেষ্টা করে নাই, সাঁদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য সত্ত্বেও যাহার সহিত তাহার অনেক পার্থক্য ও প্রভেদ আছে তাহাকে সে উঠাইতে চাহিতেছে বলিয়াই তো সে 'মহিলা মজলিস' 'মাতৃমঙ্গলের' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অ-নারী-সে এ অংশটুকু বাদ দিয়া যাইবে এ কথা সে ভাবিয়াছিল বলিয়াই মনে হয় না। তাহার নব জাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে, রহস্যময়ীর বৈশিষ্ট্য টুকুকে রক্ষা করিবার এই একমাত্র উপায়, প্রতিভাত হইয়াছিল তাই সে তাঁহাকে একটু খানি আলাহিদা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

বেশী বয়সে বিবাহ হইলেও যে নারী সন্তানপালন-কুশলা হইয়া উঠিবেন—এ কি কোন পরীক্ষিত সত্য? ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের অসংখ্য জাতির মধ্যে এমন প্রদেশ এবং এমন জাতি আছে যেখানে ও যাহাদিগের মধ্যে অধিক বয়সে বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে কিন্তু তাঁহারা সন্তান পালন সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এবং সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে ও অজ্ঞ থাকায় দরুণ সন্তানকে ঠিক প্রতিপালন করিতে পারেন না এবং তাহার অকাল মৃত্যু নিবারণে সক্ষম হন নাই। সন্তান পালন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ত সকল নারীরই; বয়স বেশীই হোক আর স্ফুটনোন্মুখ যৌবনেই তিনি থাকুন।

শিক্ষালাভ করিলেই কিম্বা বয়স বেশী হইলেই কি নারী পুরুষের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারেন? বয়স বেশী হইলেই যে পারেন না তাহা আমাদের দেশকে—এই মাতৃভক্তির দেশকে আর বুঝাইতে হইবেনা; ইহা যে প্রতিদিনের জীবন যাত্রায় জলন্ত সত্য হইয়া ফুটিয়া আছে।

নারী শিক্ষা লাভ করিয়া যদি পুরুষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে যান তবে যে Besant এর লিখিত Revolt of man কল্পনালোক হইতে বাস্তব জীবনে জাগিয়া উঠিবে না, ইহা তো মনে হয় না। পুরুষ নিজের অসুবিধার হাত হইতে এড়াইবার জন্য—দুইদিক হইতেই একথাটা মানিয়া লইলাম তাহার স্বার্থান্ধ সুখলালসার বা মানবজাতির জন্য তাহার আন্তরিক কল্যাণ আকাঙ্ক্ষার দিক্, যে দিক্‌টাই হউক না কেন—আজ নারীর কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে গিয়াছে বলিয়াই তো লেখিকার মনে বিদ্রোহের সুর জাগিয়া উঠিয়াছে? জাগিবারই যে কথা। নারীর কর্ত্তব্য একজন অ-নারী কেমন করিয়া নির্দ্দেশ করিবে, তাহার তো ভুল হইবার কথা-ই, সে তো নারীকে সৃজন করে নাই; তাহার সমস্ত মনের বৃত্তির ও সম্যক পরিচয় তো অ-নারীর নাই। অ-নারীর এই সভুল প্রয়াস দেখিয়াও তাহার সম্বন্ধে ঠিক সেই প্রকার ভুল করিবার সাধ নারীর হইবে কেন?

লেখিকা বলিতেছেন শিক্ষা প্রাপ্তা হইলে এবং বেশী বয়সে বিবাহ হইলে নারী সন্তানের প্রতি আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন—কিন্তু সেই নিঃশ্বাসেই বলিতেছেন পিতারা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালন করেন না। পিতা তো শিক্ষা প্রাপ্ত—তবে তাঁহার, এ দুর্দ্দশা কেন। আর তিনি যদি শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারও শিক্ষার দরকার এবং শিক্ষা পাইলে তো তিনি আপনা হইতেই আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন। নারীর তো প্রয়োজন হইবে না তাঁহাকে শিখাইয়া দিবার।

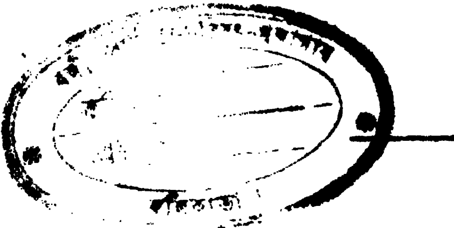
জননীকে সন্তান পালন কুশলা করিয়া তুলিবার যে এই প্রয়াস ইহার মূলে তো রহিয়াছে শিশুর সহিত জননীর সেই গভীর দৈহিক সম্বন্ধ যাহা পিতার নাই। পিতা সুস্থ দেহ, স্নেহশীল, সদাচার সম্পন্ন হইলেই চলে। জননীকে যে কত মাস আপনার দেহের ভিতরেই শিশুকে রক্ষা করিতে হয়, তাহার দেহ মনকে তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয় এবং তাহার পরও কতদিন তাহাকে আপনার সতর্ক স্নেহ দৃষ্টির নীচে রাখিয়া আপনারই বক্ষরসে পুষ্ট করিয়া সবল সুগঠিত দেহ করিয়া তুলিতে হয়। কাজেই পুরুষ যখন নারীকে এ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়াসবান্ হন তখন তাঁহারা শিশু প্রদর্শনী খুলিয়া তাহার চোখ ফুটাইবার উপায়কে নষ্ট করেন বলিয়া তো আমার মনে হয় না। আজকের নিদর্শন বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করিতে আমার

মন বলেনা। বরং ইহাই বলে যে এই খানেই পুরুষ নারীর মহীয়সী মাতৃমূর্ত্তির পূজা করিতেছে, বৈষ্ণব কবিকণ্ঠে যশোদার গান, র‍্যাফেলের তুলি অঙ্কিত ম্যাডোনা মূর্ত্তি বুঝি এই খানেই সার্থক হইয়া উঠিতেছে।

"পুরোশিক্ষা" কাহাকে বলে যে বেচারা বুঝিয়া উঠে নাই, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করিয়াই নারীর মাতৃরূপকে সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া যে অবুঝ ভুল করিয়া ফেলিতেছে, তাহাকে বিদ্রূপ না করিয়া, তাহার প্রচেষ্টাকে দূরে না ঠেলিয়া, লেখিকার প্রতি, আমার আজ এই একান্ত অনুরোধ যে, তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিন কি করিতে হইবে। চিন্তাশীল তিনি, আপনার বিচার বিবেচনা দিয়া পুরুষকে সাহায্য করুন। প্রকৃত সহধর্ম্মিনীর রূপ আজ প্রকটিত হইয়া উঠুক। জ্বালাময়ী ভাষা তাঁহার আছে, তাহা দ্বারা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলুন, তাঁহারই চেতনা-হারা স্বজাতীয়াকে যাহারা ঐ দিল্লীর হিন্দুস্থানী ভদ্রমহিলাগণের মতই বাহিরের আবরণের অন্তরালে লুকায়িত সত্যটুকুকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

"পুরোশিক্ষা" দাও বলিয়া না চেঁচাইয়া নিজেই তাহার পথ খুলিয়া দিন্ এবং নারীর কিসে সেই শিক্ষা হইবে তাহা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলুন—আমরা তাঁহার স্বজাতীয়ারাও জানিয়া লই কঃ পন্থা।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।



পোষ্ট-গ্রাজুয়েট-শিক্ষাপদ্ধতি।

শেষ প্রস্তাব।

আমরা দেখাইয়াছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল শিক্ষনীয় বিষয়ের বিধান করিয়া পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগটীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহাতে বিষয়-বাহুল্য হয় নাই। প্রাচীন ভারতে এক সময়ে সর্ব্বতোমুখিনী উন্নতি হইয়াছিল। কি বিজ্ঞান, কি গণিত, কি চিত্র-শিল্প, কি দর্শন, কি জ্যোতিষ,—সর্ব্ববিষয়েই বিস্ময় জনক উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল। এই সকল বিষয় জানা যে নিতান্তই আবশ্যক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কি আছে?

আমাদের দেশের অভিভাবকবর্গ যদি প্রকৃত-পক্ষে, তাঁহাদের ঘরের দ্বারে এই পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে কি কি কার্য্য-প্রণালী আরব্ধ হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে আমরা একথা নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সমুচিত প্রশংসা ও উৎসাহ না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। কয়েক বৎসর যাবৎ, অনেক বৈদেশিক কৃতবিদ্য ব্যক্তি, এই কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন যে, ভারতের হিন্দুজাতি কখনই বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত বিদ্যায় কোন প্রকার মৌলিকতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যে চিত্রবিদ্যার গৌরব করা হয়, সেই চিত্র বিদ্যাটীও গ্রীকদিগের নিকট

হইতে হিন্দুগণ ধার করিয়া লইয়াছিল! নাট্যবিদ্যার জন্যও, হিন্দুগণ গ্রীকদিগের নিকটে ঋণী। এমন কি, একথাও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অকুণ্ঠিত-চিত্তে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ভারতবাসী কদাপি স্বায়ত্ত-শাসন লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেনা। কেন না, ভারতে কোনদিনই প্রজাপুঞ্জের প্রতিনিধিমূলক শাসন-প্রণালী ছিল না! তাঁহারা আরো-বলেন যে,—ইহাদের নিজের অক্ষর পর্য্যন্ত ছিল না। অক্ষর-লিখনের প্রণালীটা পর্য্যন্ত ইহারা বৈদেশিক বণিকগণের নিকট হইতে শিখিয়াছিল! এই প্রকারে, বর্ত্তমানে কতকগুলি পণ্ডিত, সভ্যজগতের নিকটে, আমাদিগের প্রায় কোন মৌলিক বিষয়ই গৌরব করিবার যোগ্য ছিল না —ইহারা উদ্‌ঘোষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! এই সকল কথার প্রতিবাদ না হইলে এবং সুধু প্রতিবাদ নহে; আমাদের যে ঐসকল বিষয়ে প্রকৃতই মৌলিকতা ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণাদি সহ গ্রন্থরচনা করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে; আমরা নিশ্চয়ই অসভ্য অশিক্ষিত, বর্ব্বর জাতিরূপে সভ্যসমাজে পরিগৃহীত হইব! হইবার উপক্রমও হইয়াছে!

বাঙ্গালাদেশের অভিভাবকগণের মধ্যে কয়জন এই খবরটী রাখেন যে, একমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ই, পোষ্ট বিভাগের উপযুক্ত বিদ্বান্ অধ্যাপকগণকে এই সকল বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিবার জন্য কয়েকবৎসর হইতে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র যত্নের ফলেই, পূর্ব্ব কথিত বিষয় গুলি যে হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহারা যে এ বিষয়গুলির সম্যক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে এই সকল অধ্যাপক বহু অনুসন্ধান সহকারে মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং এই সকল গ্রন্থ নানা দেশে প্রচারিত হইয়া, ভারতের বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় আরো অনেক বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যাপকগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এ দেশের দর্শন-শাস্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নের জন্যও অধ্যাপক নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং তাঁহারা ইতি মধ্যেই মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়া ইউরোপেও সমাদর লাভে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় দার্শনিক মত-বাদ সম্বন্ধে কত বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকলের খণ্ডন করিয়া, প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াও, ইতিমধ্যেই দার্শনিক গ্রন্থ কয়েকখানি রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচারের এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের কত উপযোগিতা দাঁড়াইয়াছে, তাহা একমুখে বলিয়া ওঠা যায় না। এই প্রকার অনুসন্ধান না হইলে, ভারতের নানা দিগ্‌গামিনী প্রাচীন সভ্যতা অতি বিকৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া, সভ্য জগতের সম্মুখে ভারতবর্ষ অসভ্য মৌলিকতা বর্জ্জিত দেশ বলিয়াই পরিগণিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই মহৎ কার্য্যে আত্ম নিয়োজন করিয়াছেন। কেবল এই একটী মাত্র বিষয় বিবেচনা করিতে গেলেই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশনিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রেই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু কয়জন ব্যক্তি এই মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের খবর লইয়াছেন? যদি খবরই লইতেন, তাহা হইলে আমরা পত্রিকাগুলিতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের কেবলই নিন্দা উদ্‌ঘোষিত দেখিতাম না! যে বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান দ্বারা ভারতের পূর্ব্ব গৌরব জাগাইয়া তুলিতে ঔদাসীন্য করে, যে শিক্ষা-পদ্ধতিতে ভারতের বিলুপ্তরত্নের নষ্টোদ্ধার কার্য্যে উদ্যম

ও চেষ্টা পরিদৃষ্ট না হয়; সে বিশ্ববিদ্যালয়, সে শিক্ষাপদ্ধতি যে নিতান্তই ব্যর্থ—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এই নষ্ট সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কার্য্যে কিরূপ উদ্যমে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন;—এদেশের কয়জন ব্যক্তি সে সংবাদ রাখেন এবং রাখা প্রয়োজন মনে করেন?

আমরা এমনই পাশ্চাত্যভাবানুপ্রাণিত আমরা এমনই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব বিমুগ্ধ-চিত্ত যে,—এমন দিনও উপস্থিত হইয়াছিল যে, আমরা বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলিতে বা পত্রাদি লিখিতেও লজ্জা বোধ করিতাম! আমরা এমনই বিমোহিত-চিত্ত! এই জন্যই আশঙ্কা হয় যে, যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়টী একান্ত স্বদেশ-প্রেমিক স্যর আশুতোষের পরিচালনার অধীন না থাকিত, তাহা হইলে বোধকরি বা, এই পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ হইতে "ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও শিক্ষা" (Ancient Indian History and Culture) বিষয়ক বিভাগটী এবং "সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনাদিরবিভাগটী"—হয় ত একেবারেই স্থান পাইত কি না সন্দেহ! অথচ এই সেদিনও অসহযোগ-আন্দোলনের প্রথম উদ্যমের সময়ে, Lord Ronaldshay—পোষ্ট গ্রাজুয়েটের এই দুইটী বিভাগকে মুখ্যরূপে অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া, বঙ্গীয়ছাত্রবর্গকে দেখাইয়াছিলেন যে, "তোমরা স্বদেশী শিক্ষার কথা তুলিয়াছ; কিন্তু তোমাদের ঘরের দুয়ারেই সেই স্বদেশী শিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করা রহিয়াছে"! হয়ত বা, অন্যের পরিচালনায়, এই বিভাগ দুইটী নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই বিবেচিত হইত! অথচ যদি ভারতকে সভ্য-সমাজের সম্মুখে সগৌরবে দণ্ডায়মান করাইতে হয়, তাহা হইলে এই দুইটী বিভাগ দ্বারাই তাহা সম্পাদিত হইবে। অন্য কোন বিভাগের দ্বারাই ভারতের সম্মান ও গৌরব রক্ষিত হইতে পারিবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিভাগ দুইটীর যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া, ভারতের হৃত-সর্ব্বস্ব, মলিন মুখমণ্ডলকে, জগতের সমক্ষে পূর্ণ গৌরবে পুনঃ-প্রদীপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই যে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা পদ্ধতির "বিষয়-বাহুল্যের" কথাটা উত্থাপিত হইয়াছে, আমাদের মনে আশঙ্কা হয় যে, বোধ করি এই দুইটী বিভাগকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ বিষয় বাহুল্যের অভিযোগ লইয়া আসা হইয়াছে। হায়! হায়! দুরদৃষ্ট!

এই যে সেদিন কলিকাতা মহানগরীতে Oriental Conference হইয়া গেল, ঐ Conference এর যিনি সভাপতির কার্য্যনির্ব্বাহিত করিয়াছিলেন, সেই পাশ্চাত্যদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহাত্মা Sylvan Levi তাঁহার অভিভাষণে যে কথার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই কথাটী সকলেরই বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। চীন-ভাষা ও তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার উপযোগিতা কতদূর বেশী প্রমাণ সহকারে সেই কথাটাই তিনি উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, অনেক অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থ চীনে ও বিশেষতঃ তিব্বত দেশে, সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ হইতে পরিনীত হইয়াছিল। ঐ সকল অমূল্য গ্রন্থ তত্তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এখন আর ঐ সকল গ্রন্থের মূল সংস্কৃত গ্রন্থ কোথাও পাইবার উপায় নাই। কিন্তু উহাদের অনুবাদ তিব্বতীয় ও চীনীয় ভাষায় রহিয়া গিয়াছে। এই সকল গ্রন্থে যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত আছে, সেগুলি সংগৃহীত না হইলে, ভারত ইতিহাসের ও ভারতীয় সভ্যতার অনেক মূল্যবান অংশ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। কিন্তু উহার পুনরুদ্ধার করিতে

হইলেই তিব্বতীয় ভাষায় সুপণ্ডিত হইতে হইবে। নতুবা ঐ সকল গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে, প্রায় চল্লিশ-সহস্র সংখ্যা পরিমিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা তিব্বতীয় ভাষায় হস্তলিখিত, পড়িয়া আছে। এই রত্ন-রাজির উদ্ধার করিতে গেলে, তিব্বতীয় ভাষার জ্ঞান নিতান্তই প্রয়োজনীয়। Sylvan Levi দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, এইরূপ একখানা গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিতে গিয়া, অনুবাদক কি ভয়ঙ্কর ভুলই করিয়াছেন! অথচ সেই গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য-ভুক্ত করিয়াছেন। আমাদের সেই প্রসিদ্ধ হিতোপদেশের "দধি-মুখ" মার্জার বা শৃগালের কথা ভুলিয়া গিয়া, অনুবাদক এই "দধি-মুখ" শব্দটীর অনুবাদে, "Bad-mind curd-ear" শব্দ ব্যবহার করিয়া একেবারে হাস্যাস্পদ অর্থ করিয়াছেন! এ কেবল ভাষাজ্ঞান না থাকার ফল!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিব্বতীয় ভাষা-শিক্ষার পথ যেমন সুগম করিয়া দিয়াছেন, অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাহা করিতে পারেন নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা কি "বিষয় বাহুল্যের" নিদর্শন? তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিয়া কি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে? না, এই বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিয়া ভারতের ইতিহাস প্রণয়নের সুযোগ ও অঙ্গ-পুষ্টি করিতে বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য করিতেছেন?

আমরা সবিনয়ে বঙ্গদেশীয় অভিভাবকবর্গকে এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। এই সকল বিষয় ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে, কেহই "বিষয়বাহুল্যের" অভিযোগ আনিতে পারিবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই সকল বিষয় যদি শিক্ষা দিতে না সমর্থ হয়, তাহা হইলে Teaching Universityর সার্থকতা থাকে কোথায়? গত Convocation এর সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস্ চেন্সেলর যে কথাটী উচ্চারিত করিয়াছিলেন, উহার একটী বর্ণও অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

"It is undeniable that no Indian University can fully justify its existence as a free seat of national culture, unless it brings home to its students the solid contributions which were made in bygone days by Indian scholars to the solution of the eternal problems of mind and matter, of god and man and which ·········still continue to evoke feelings of respect and admiration in every civilised centre of learning and culture."

এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই এই সকল এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, একমাত্র "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন, এই সকল বিষয় সন্নিবেশিত আছে বলিয়াই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" বলিতে পারা যায়। বহু চিন্তার ফলে, বিপুল যত্ন ও একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের ফলে, স্বদেশ নিষ্ঠার পরিচায়করূপে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগটী ধীরে ধীরে রচনা করিয়া তোলা হইয়াছে। অর্থাভাবে যদি জাতির এই

প্রতিষ্ঠানটী ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা বাঙ্গালা দেশের যে সম্মান ও গৌরব বিনষ্ট হইবে, এরূপ আর কিছুতেই হইবে না।

আমরা এই প্রস্তাব-গুলিতে, পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের Science department সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না। কেন না, উহা প্রধানতঃ মহানুভব পালিত এবং মহাত্মা রাসবিহারীর অর্থদ্বারাই পুষ্ট। অর্থাভাবে উহা উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমরা বিবেচনা করি। এই প্রস্তাব গুলিতে কেবল Arts department সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। এই বিভাগ হইতে প্রাঃ মাসে মাসে যে এক খানা করিয়া Journal প্রকাশিত হইয়া থাকে, উহাতেও অনেক মৌলিক অনুসন্ধানের ফল স্বরূপ নানা বিষয়ক প্রবন্ধ বাহির হয়। অনেক প্রবন্ধে অনেক মূল্যবান্ রচনা পরিদৃষ্ট হয় এবং অনেক রচনা ইতিমধ্যেই বিদ্বৎ সমাজের সমাদর ও দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। ইহা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যতৎপরতার আর একটি নিদর্শন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ উঠিয়া গেলে, এই Journal খানি ও উঠিয়া যাইবে। এই সকল অনুসন্ধানের ফল হইতে কি তদ্দ্বারা দেশবাসীকে বঞ্চিত করা হইবে না?

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

জাতীয় শিক্ষা (তত্ত্বাংশ)

শিক্ষার গোড়ার কথা শিষ্যত্ব অর্থাৎ বিনয় ও নিষ্ঠা। শিষ্যোচিত সাধনাই শিক্ষার প্রাণ, তাহাতে শক্তিলাভ হয়। কিন্তু শক্তিলাভ সুশিক্ষার সর্ব্বস্ব নহে। বাঙ্গালী ছাত্র আজকাল নূতন ধরণের উপার্জ্জন শক্তি লাভ করিয়া স্বাস্থ্য মস্তিষ্ক ও সহৃদয়তায় জলাঞ্জলি দিতেছে। আর সমুদ্রপারে সাহেবগণ বিজ্ঞান বলে বলীয়ান্ হইয়া দেব দৈত্য মানবের ত্রাসোৎপাদন করিতেছে। সুতরাং সুশিক্ষার মধ্যে শক্তিলাভ ছাড়া আরও কিছু চাই; তাহা কল্যাণ। কল্যাণ শিক্ষার লক্ষ্য, শিষ্যত্ব তাহার পন্থা।

কিন্তু কল্যাণের স্বরূপ নির্ণয় সহজ নহে। পাত্রভেদে তাহা স্বতন্ত্র। আমরা ভাবি কুকুরকে অক্ষর চিনাইয়া, বানরকে চা ধরাইয়া, এবং ভালুককে নাচ শিখাইয়া তাহাদের বিশেষ কল্যাণ করা হইল,—বন্যতা হইতে যথা সম্ভব মুক্তিদান করিয়া তাহাদিগকে সুসভ্য মানবজাতির কাজকর্ম ও আমোদ প্রমোদের সহচর করিয়া লওয়া হইল, ইহা অপেক্ষা তাহাদের জীবনের আর কি সার্থকতা হইতে পারে? কিন্তু মানুষ নিজে যত বড়ই হউন না, তাঁহার এ অহঙ্কার অমার্জ্জনীয়। ভগবানের স্পষ্ট অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিবার অধিকার তাহার নাই। বন্যজন্তুগুলিকে অপূর্ণ মানব বলিয়া ধরিয়া লইলেও মানুষের দুই একটা অকিঞ্চিৎকর গুণের অধিকারী হইলেই তাহারা মানবত্ব লাভ করে না। তাছাড়া

যে জন্তু যে রূপ ও দেহ লইয়া ভূমিষ্ঠ তাহায় তদনুরূপ এক পূর্ণতা আছে,—সেই পূর্ণতা লাভই তাহার জীবনের সার্থকতা। এক কথায় স্বধর্ম্মলাভই প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য ও কল্যাণ, এবং যাহাতে কাহাকেও সেই স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করে তাহাই তাহার প্রকৃত শিক্ষা। আর যে তাহাকে প্রকৃত ভালবাসে অর্থাৎ নিকৃষ্ট বলিয়া কৃপার চক্ষে দেখে না বা নিজ প্রয়োজনে লাগাইয়া তাহাকে ধন্য করিতে চাহে না—সেই তাহার কল্যাণপথ আবিষ্কার করিতে পারে, সেই তাহার শিক্ষক হইবার অধিকারী। একথা মানুষ সম্বন্ধেও বিলক্ষণ খাটে।

মানুষ বাহিরে দেহ, ভিতরে আত্মা; দেহ সান্ত ও মরণশীল, আত্মা অনন্ত ও অমর। বৈজ্ঞানিকের প্রভাবে যেমন ইলেক্ট্রনতত্বে বিশ্বাস করিতে হয়, সাধুসন্তের মাহাত্ম্যেও তেমনি আত্মতত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। এই আত্মবস্তু আমাদের ভিতর আচ্ছন্ন ও মূর্চ্ছিত হইয়া আছেন—তাঁহাকে মোহমুক্ত করিয়া আত্মত্বে প্রতিষ্ঠিত করা এবং দেহকে সেই মহৎলক্ষ্যের অনুকূলভাবে চালিত করাই মানবের শিক্ষা। মস্তিষ্ক দেহ ও আত্মার মধ্যে সেতুভাবে অবস্থিত। মস্তিষ্ক যেমন দেহের সার এবং দেহ হইতে অল্পে অল্পে উদ্ভূত হইয়া কালে দেহার্জ্জিত সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কারকে উড়াইয়া দেয় ও আপন ইচ্ছামত সমস্ত দেহ ও যন্ত্রটিকে চালাইতে থাকে,—আত্মা ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধে তাহাই। মস্তিষ্কধারী জীবের, বিশেষতঃ মানবের মধ্যেই ইহার প্রথম বিকাশ, তাহার পর ইহার পরাক্রমে মস্তিষ্কের অধিকার সঙ্কুচিত এবং দেহ ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। শুনা যায় যোগমার্গে যাঁহারা যতদূর অগ্রসর কি বাহিরের কি ভিতরের সমস্ত দেহব্যাপারই তাঁহাদের ইচ্ছার অনুশাসনে সংসাধিত হয়। এই জন্যই মানবিক শিক্ষার দেহের স্থান আত্মার বহু নিম্নে এবং দেহের কর্ত্তব্য এই আত্মিক কল্যাণের অনুবর্ত্তন। এই আত্মিক শিক্ষাই প্রকৃত বিশ্বভারতী, ইহার প্রভাবেই ছাত্রগণ দূরে থাকিয়াও নিকট হয়, দেখা হইলেই পূর্ব্বপরিচয় না থাকিলেও তাহারা পরস্পরকে ভাই বলিয়া চিনিতে পারে। পক্ষান্তরে দেহগত প্রয়োজন ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন তাই দেহপ্রধান শিক্ষায় মানুষ পরস্পর হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইয়া পড়ে,—তখন আর কোন কৃত্রিম বন্ধন সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালী ইংরাজ ও ফরাসী ছাত্রকে এক সূত্রে বাঁধিয়া রাখা যায় না।

আত্মিক আদর্শের বিশেষত্ব যেমন দেহ ও আত্মার সম্মিলনে, আত্মিক শিক্ষার বিশেষত্ব ভোগ ও ত্যাগের সম্মিলনে। দেহ অপূর্ণ,—তাহার অভাব অনেক, ভোগই তাহার প্রকৃতি; আত্মা পূর্ণ,—তাহার কোন অভাবই নাই, ত্যাগই তাহার প্রকৃতি। তাই আত্মিকতার পথে যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের বিদ্যা আছে—অভিমান নাই, শক্তি আছে—আস্ফালন নাই, প্রীতি আছে—অসংযম নাই। গ্রীকেরা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়া এইরূপই এক মহাজাতির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিল। তাহারা সকলই পারিত—কিছুই চাহিত না, শক্তি ছিল—লোভ ছিল না, দিগ্বিজয়ীর বল ছিল—বাহিরে প্রকাশ ছিল না। কলাশিল্পে পর্য্যন্ত এ ভাবের অভিব্যক্তি আছে। চিত্রে নারীমূর্ত্তির কমনীয়তা সেবা বুদ্ধির মহিমায় মণ্ডিত ও তাহারই অন্তরালে লুক্কায়িত। তাম্রযো বীরমূর্ত্তির মধ্যে শক্তি ও ক্ষমার সুমধুর সম্মিলন;—বক্ষঃস্থল স্বাস্থ্যের আবাসভূমি, কিন্তু

মাংসপেশীর অতি বিকাশ তাহার মধ্যে নাই। সে বীরত্বে শ্রী আছে—দর্প নাই, জিগীষা আছে—পীড়ন নাই, পলায়িতের উপর অস্ত্রক্ষেপ নাই; যুদ্ধ যেন একটা খেলা মাত্র, ব্যাধের বাগুরার সহিত তাহার কোন সম্পর্কই নাই,—ক্রূর হৃদয় দুর্য্যোধন পর্য্যন্ত বরপ্রার্থী মধ্যমপাণ্ডবকে সর্ব্বস্ব দানে উদ্যত। এ চিত্রের তুলনা নাই—যে জাতি এ চিত্র আঁকিয়াছিল এবং ইহার উপকরণ যোগাইয়াছিল সে জাতিরও বোধ করি তুলনা নাই।

সে দিন গিয়াছে। আমরা এখন রণদুর্ম্মদ আত্মবিস্মৃত অভিমন্যুকে ভুলিয়া আমাদের ছাত্রনির্ম্মাণের কর্ম্মশালায় এক একটী ক্ষুদ্রকায় অতিচতুর অতিসতর্ক মানবকের সৃষ্টি করিতেছি। সাহেবী ধরণে, সাহেবী উচ্চারণে অনর্গল (ও প্রয়োজন মত মনরাখা) কথা বলিয়া দক্ষতার সহিত 'ধান্ধা' অর্থাৎ চাকরী, প্রশংসাপত্র বা অর্ডার, আদায় করাই এখন শিক্ষাসাফল্যের চরম প্রমাণ। ব্যাপকতা—যাহা জ্যাঠামি বলিয়া দেশে চিরনিন্দিত ছিল তাহাই এখন forwardness বা কর্ম্মকুশলতা বলিয়া আদৃত হইতেছে! স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা সারল্য ও নির্ভীকতা, বিনয় ও শিষ্টতা—এক কথায় নবীনতা ও সজীবতা ছাত্রের পক্ষে কবিকল্পনার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা যুগপৎ অকালবৃদ্ধ ও অকালপক্ক,—ইহাদিগকে স্নেহ করিতে সাহস হয় না, কারণ ইহারা স্নেহ চায় না, চায় টাকা। এ বিড়ম্বনার অবসান করিতে হইবে। আমরা যেমন কুকুরকে অক্ষর চিনাইয়া তৃপ্তি লাভ করি, বালককেও সেইরূপ ছোটখাট যুবক বানাইয়া তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করিতেছি। তাই যুবকের বিদ্যা ও মস্তিষ্ক-বিকাশ বালকের নিকট প্রত্যাশা করিয়া তাহাকে বিপদগ্রস্ত ও বিনষ্ট করিতেছি। পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের স্বাভাবিক যোগ্যতা তাহার নাই দেখিয়া Cramming এর সাহায্যে তাহাকে পণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাহার যে পাণ্ডিত্যের বয়স আজিও আসে নাই এ চিন্তাকে আমরা আমল দিতেই চাইনা। বালক স্বভাবতঃ জ্ঞানলাভ ঠিক অধিক করে না, কিন্তু জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ দেহ ও চরিত্র সে অর্জ্জন করে। এই মূলধনের উপর কারবার করিলে কালে যে সে সবই আপনা হইতেই পাইবে সে বিশ্বাস আমাদের নাই। অথচ ইহা অপেক্ষা স্বাভাবিক আর কি আছে? জীবনের বাল্যাদি চারিযুগকে যথাক্রমে দেহ প্রধান, মস্তিষ্ক প্রধান, কর্ম্মপ্রধান, ও তত্ত্বপ্রধান বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নয়। সকল যুগেই চতুর্ব্বিধ শিক্ষার সংযোগ থাকিবে, কিন্তু প্রত্যেক যুগেই এক একটা শিক্ষা প্রধান থাকিবে,—এই হিসাবে নাবালকত্বের অষ্টাদশবর্ষকে বাল্যযুগ ও দেহপ্রধান বিবেচনা করাই সঙ্গত। এই সময়ের মধ্যে দেহের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি প্রায় শেষ হইয়া যায়, তাহার পর সব নূতন বৃত্তির উদ্ভব হয়। ঐ ১৮ বৎসরের মধ্যে শরীরকে শিক্ষিত করিতে না পারিলে তাহা জন্মের মত অকর্ম্মণ্য থাকিয়া যায়। অথচ নীরোগ দেহই সতেজ মস্তিষ্কের মূল। তাহার উপর পরাধীন জাতির দেহ কেবল নীরোগ হইলেই চলে না, কর্ম্মঠ এবং বলিষ্ঠ হওয়াও আবশ্যক, কারণ তাহাকে অপমানাদি হইতে আত্মরক্ষার জন্য বহুসময়ই প্রস্তুত থাকিতে হয়। আমরা ভুলিয়া যাই যে জীবনের পনর আনা সংকল্প দেহের প্রতিকূলতায় ভাসিয়া যায়। শাসিত দেহ পূজনীয় বঙ্কিমবাবুর ভাষায় শাণিত খড়্গের মত, ইহাতে যুগপৎ পবিত্রতা ও নির্ভীকতার পথ সুগম করিয়া দেয়। যিনি কঠোরতম ক্লেশেও অভিভূত বা আদর্শভ্রষ্ট হন না মনুষ্যত্বের প্রাসাদ তাঁহারই জন্য।

আমরা কিন্তু বিনাশ্রমে,—ম্যাজিকে—তাহা গড়িতে চাই। তাই আমাদের বাল্য প্রতিভা চাপল্যে পরিসমাপ্ত ও শকরীত্বে পরিণত হয়। পূর্ণবিকাশ দান করিতে হইলে ইহাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড় করান চাই। বড় বাড়ীর জন্য পাকা ও গভীর বনিয়াদ্ আবশ্যক। ইহা তাড়াতাড়ির কাজ নহে। অসময়ে ডিম ফুটাইলে বিষ্ণুবাহন গরুড়ের সৃষ্টি হয় না। অনেকে বলেন তত সময় কই, তত পয়সা কই? তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ডিম্বস্থ শাবকের আহার যোগাইতে হয় না, ডিম ভাঙ্গিলেই সে প্রশ্ন উঠে। বাস্তবিক অকালপক্কতারই খরচ বেশী,—ক্যাসানের মহলা ও ইংরাজীর বার্ণিশ বিনা পয়সায় ও বিনা ঝঞ্ঝাটে আয়ত্ত হয় না। কিন্তু যে সমাহিত মনুষ্যত্ব ধীর গৌরবে নিত্যকর্ম্মের ভিতর দিয়া বিশাল অশ্বত্থের মতই গড়িয়া উঠিতেছে তাহার কোন উপদ্রব নাই।

আশ্রমিক শিক্ষার স্থান প্রণালী ও ব্যয়ের বিষয় এইখানে আলোচনা করিলে কথাটা সহজ হইবে। এই প্রণালী ভারতবর্ষেরই আবিষ্কার। স্পার্টা প্রভৃতি স্থানে কেবল সমরকুশল একটা কষ্ট সহিষ্ণু জাতি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, মানসিক বিশেষতঃ সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশের জন্য কোন চেষ্টাই হয় নাই। এই জন্য বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ভারতীয় প্রণালীরই পরিচয় দেওয়া হইবে। গৃহকে বিদ্যামন্দির না বলিয়া গুরুগৃহ বলা হইত,—কেবল নামে নয় কাজেও তাহা গৃহই ছিল। ছাত্রগণ সেখানে সন্তানের মত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিত। এই Disciplineএর দিনে স্বাধীনতার নামে অনেকে ভীত হইতে পারেন, কিন্তু তখন লোকে সেরূপ হইত না। চরিত্রের মধ্যে ভালমন্দ দুইই থাকে,—সঙ্গগুণে একটীর বা অপরটীর বিকাশ হয়। মন্দকে বর্জ্জন করিয়া ভালকে পরিপুষ্ট করাই অবশ্য সকলের লক্ষ্য। কিন্তু বলপূর্ব্বক এই বর্জ্জন ব্যাপার প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষটীকেও মারিয়া ফেলা হয়। স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে নাই। ফলও তাতে খারাপ হয় না,—কারণ আমাদের ভিতরে মন্দ বলিয়া যাহা আছে তাহাও ভালরই বিকার মাত্র,—সৎসঙ্গে যে কেবল ভালটীই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে তাহা নহে, মন্দটিও যে ভালর বিকার তাহাতেই ফিরিয়া যাইবে। শিক্ষাস্থানের পবিত্রতার উপর এই পরিণতি নির্ভর করিত। একদিকে গুরুদেবের উন্নত চরিত্র, অপর দিকে প্রকৃতিদেবীর নির্ম্মল প্রভাব এই উভয়ের মধ্যে স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইতে পারিত না। বেতনের হাঙ্গাম ছিল না,—শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মার বিকাশ,—দেহের জন্য যেমন জলবায়ু আত্মার জন্যও তেমনি শিক্ষার প্রয়োজন। ভগবান্ যেমন জলবায়ুর উপর টেক্স বসান নাই, প্রাচীন আচার্য্যগণও সেরূপ শিক্ষার উপর ট্যাক্স বসান নাই। সুতরাং প্রবেশের দ্বার সকলের নিকটই উন্মুক্ত ছিল। পাত্রবিচারপূর্ব্বক বিদ্যাদানের নিয়ম থাকায় শূদ্রের বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকিলেও আজকালকার মত খারাপ ছেলে না লইবার ব্যবস্থা ছিল না। এই বহিষ্কার নীতির শেষই বা কোথায়? আজ যে ভাল, কাল সে "খারাপ" হইতে পারে। তখন কি সে বর্জ্জনীয় হইবে? কঠিন রোগীকে সকল সময় আরাম করিতে পারা যায় না'—কিন্তু চিকিৎসক কি তাহাকে ত্যাগ করিবেন? করিলে কে তাহাকে দেখিবে? যাঁহারা পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইতে চাহেন ও বাহিরে সুনামের জন্য লালায়িত তাঁহাদের পক্ষেই এই বহিষ্কার নীতির সমর্থন সম্ভবপর, নতুবা নহে। পূর্ব্বে শিক্ষা

শিক্ষকের সাধন ও তপস্যা ছিল,—ব্যবসায় ছিল না, কাজেই সুনামের উপরেও তাঁহাদের লোভ ছিল না। ছাত্রগণের সেবা করিয়া তাঁহারা ধন্য হইতেন। তাহারা সন্তান ছিল, বাহিরের লোক ছিল না, এবং বাড়ীর ছেলের মতই চলিত, সেই খানেই থাকিত আহারের ব্যবস্থাও সেই খানেই হইত, দেশ খরচ যোগাইত। শিক্ষক প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ হইতেন, তাঁহার রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি থাকিত, তাহারই আয়ে আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এখন আর এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ রাজা এই প্রাচীন প্রণালীকে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা বলিয়া মনেই করেন না। সুতরাং এখন শিক্ষালয় সংলগ্ন ভূমি ও কর্ম্মশালা হইতে ছাত্রগণের সাহায্যে শিক্ষার খরচ তুলিতে হইবে। এ শিক্ষার আড়ম্বর ও অধিক হইবার প্রয়োজন নাই। এখন সাজগোজ করিয়া স্কুলে যাইতে হয় এবং সাজগোজধারী সুসভ্য শিক্ষকের সহিত সুমার্জ্জিত ভাষায় ও ভঙ্গীতে প্রশ্নোত্তর আদান প্রদান করিয়া বিদ্যাসংগ্রহ করিতে হয়। আগে বিদ্যা একটা বিশেষ জিনিষ বলিয়াই গণ্য হইত না—ইহা সুসম্পাদিত নিত্যকর্ম্ম ও সুনিয়ন্ত্রিত গার্হস্থ্য জীবনের সুনিশ্চিত দান বলিয়া বিবেচিত হইত। গৃহকর্ম্মগুলি সহজভাবেও শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিতে করিতে দেহলাবণ্য ও কর্ম্মদক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা কেমন করিয়া আসিয়াই পড়িত। মৎস্য যেমন জলে থাকিতে পাইলে আপনা হইতেই সাঁতার শিখে, আম্রবীজ যেরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্রে রোপিত হইলে আপনা হইতেই আম্রবৃক্ষে পরিণত হয়,—এখানেও সেইরূপ মানবশিশু হাসিখেলার মধ্য দিয়াই মানবত্ব লাভ করিত। বিদ্যা সহজভাবেই বিকশিত হইত স্মরণের দ্বার দিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক মনের ভিতরে প্রবেশ করান হইত না। তাই সে বিদ্যা ছিল শক্তি, আর এ বিদ্যা ভার। কিন্তু সহজ পথে গড়িয়া উঠার মত কঠিন ব্যাপার আর কিছুই নাই। এই পল্লীজনতার বাহিরে প্রকৃতির মঙ্গলময় ক্রোড়ে সাধনশীল কোন উন্নত পুরুষের গৃহস্থালী মধ্যে শিক্ষার স্থান নিরূপিত হইত। তিনি প্রকৃতির শান্ত নির্ম্মলতার সহিত ছন্দোরক্ষা করিয়া চলিতেন। তিনি জানিতেন প্রকৃতি সতী নারীর মত, প্রীতি যত নিষ্ঠাও তত,—স্নেহ অপেক্ষা দৃঢ়তা কিছু মাত্র কম নহে, সংযম তাঁহার সহিত কারবারের একমাত্র পন্থা, নতুবা হয় তাঁহার উপেক্ষায় কাফ্রির মত, নয় তাঁহার আদরে নন্দদুলালের মত মনুষ্যত্ব শূন্য হইতে হইবে। সংযমের এই রক্ষাকবচ প্রাচীন আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণকে রক্ষা করিত, তিনি নিজে ছিলেন গৃহী ব্রহ্মচারী; ছাত্রেরা ছিল অবিবাহিত ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীর দিনচর্য্যা কঠিন ছিল, কিন্তু সঙ্গ মাহাত্ম্যে সে কঠোরতা কেহ অনুভব করিত না। প্রাতরুত্থান প্রভৃতি যে সমস্ত অনুষ্ঠান আজকাল বিরল হইয়া পড়িতেছে ব্রহ্মচর্য্যের দিনে সে বিরলতা একেবারেই ছিল না। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ ও ভগবৎ স্মরণ, তাহার পর নাম গান ও স্নান, পরে পুষ্পচয়ন ও হোমাগ্নি নির্ম্মাণ তাহার পর পাঠ, পরে আশ্রমিক কার্য্য এবং মধ্যাহ্ন স্নান ও আহার ইত্যাদি যে যে ভাবে সমস্ত দিন ভাগ করা থাকিত তাহা সংহিতা গ্রন্থে সবিস্তর লিখিত আছে। দেখিলেই বুঝা যায় অধ্যয়ন অতি একটা ভয়ানক অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না, অপর দশটা কাজের মতই ইহা একটা কাজ ছিল, ইহার উপর কোন বিশেষ জোর দেওয়া ছিল না। ভিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, তাহাতে ছাত্রের গুরুভক্তি বাড়িত এবং সমাজেরও বিদ্যার্থিপালনের সুযোগ হইত। ছাত্রেরা

কাজ কর্ম্মের ভিতর দিয়াই শিক্ষালাভ করিত, প্রধানতঃ হাত পায়ের ও কাজ কর্ম্মের শিক্ষা। বুনো রামনাথের এক কাহিনী হইতে বুঝা যায় তিনি সশিষ্য জমিতে কাজ করিতে করিতে কাজের সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন। এই সমস্ত দৈনন্দিন কাজকর্ম্মে শাস্ত্রালোচনার সুবিধা করুক আর নাই করুক, তাহাতে যে চরিত্র লাভের সহায়তা করিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিক্ষা জ্ঞানপ্রধান ছিল না, চরিত্র প্রধানই ছিল। আশ্রমে যে কোন কাজই আসিয়া পড়িত ছাত্রেরা তাহাই করিয়া ফেলিত, তাহার দুরূহতা বিচার করিতে বসিত না। ইহাতেই তাহারা একটা আত্মপ্রত্যয় লাভ করিত, তাহাই চরিত্রের প্রধান উপাদান। শিক্ষকের গৃহস্থালী এবং সমস্ত তপোবনটীকে তাহারা একটী নন্দন কাননে পরিণত করিবার চেষ্টা করিত। তপোবনের সমস্ত বর্ণনাই মনোমুগ্ধকর। গৃহস্থালীর গোপালন, বোধ হয় রন্ধনাদিরও সহায়তা করা ছাত্রের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহাতেও কার্য্যকুশলতার সৃষ্টি করিত। ভাবী জীবনে পরমুখাপেক্ষিতা কমাইয়া দিত। তাহার পর সন্ধ্যাকালে গুরুদেব যখন ধ্যানান্তে ছাত্রদিগকে লইয়া গভীর ধর্ম্মকথায় উপদেশ দিতেন বা পৌরাণিক কোন উচ্চচরিত্রের ব্যাখ্যা করিতেন তখন সকলেরই হৃদয়ে দ্বিগুণ বেগে উহা আঘাত করিত। কারণ বর্ণনীয় বিষয় যেমন হৃদয়গ্রাহী, যিনি বর্ণনাকারী তিনিও তেমনিই। ছাত্রেরা নিজেদের ধ্যান লভ্য চিত্র চক্ষের সম্মুখে পাইয়া কৃতার্থ হইত। এইরূপে দীর্ঘকাল এক প্রবাসের পর তিনি যাহাদিগকে, উপযুক্ত বলিয়া বোধ করিতেন তাহাদিগকে বিদায় দিতেন। তাহারা পৈতৃক অর্থে নয়——আপনাদের তপস্যা ও পৌরুষ বলে— গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিত।

শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ।

স্বরাজ ও আমাদের দেশ।

কোন দেশ নিজস্ব হারাইয়া অধঃপতনের অন্তঃস্থলে ডুবিতে বসিলে ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাবে দশের চক্ষু ফুটিয়া উঠে, সে স্রোতের গতি ফিরিয়া যায় দেশের ললাট আবার নবীন গরিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠে।

একালেও যখন খ্রীষ্টিয়ান মিসনারীদিগের প্রভাবে দেশ ডুবু ডুবু, তখনই এক শুভ মুহূর্ত্তে মহাত্মা রামমোহনের আবির্ভাব; আবার যখন বিলাসিতায় ভারত মুহ্যমান, পরপণ্যে অযাচিত ভাবে নিজকে বিলাইয়া দিতে বসিয়াছিল, ঠিক সেই এক শুভক্ষণে এ দেশের শাসক স্বরূপে পূর্ণজ্যোতিতে লর্ড কর্জ্জনের অভ্যুদয়। তাঁহার নিদারুণ কশাঘাতে মোহতন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, পরপণ্য বর্জ্জনের সাড়া আসিল, দুদিন মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে সকলে চরিতার্থ হইল। চরিত্রহীন দুর্ব্বল চিত্তে এতকালের এ কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা কি সহজে ভাঙ্গিতে চায়? আবার রাজপুরুষদিগের অল্প বিস্তর ঘুম পাড়ান গানের সুখ-স্পর্শে সুনিদ্রায় চক্ষু মুদিয়া গেল।

সে দিন আবার হঠাৎ ময়মনসিংহে চিত্তরঞ্জনের প্রবেশ এবং মনোমোহন, চিত্তরঞ্জন ও তায়াবুদ্দিনের বক্তৃতা রাজাজ্ঞায় বন্ধ হইয়া গেল, দেশময় জেলাময় সকলে চকিত হইয়া উঠিল আবার জাগরণের সাড়া আসিল। উকীল মোক্তারগণ ধর্ম্মঘট করিলেন, মামলা মোকদ্দমা পরিচালনাভাবে স্থগিত হইল। দোকান পসারের দ্বারে অর্গল পড়িল, কুলীরা পর্য্যন্ত ময়ূরপুচ্ছ শোভিত নেটিভের মালও মস্তকে বহিতে সঙ্কুচিত হইল। এ একতা বাঙ্গালা দেশে অচিন্তনীয়, এ দৃশ্য কি মহান্।

সুখের বিষয় সৌভাগ্যের কথা এই সময় উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠিধ্বজী কেহ বঙ্গের কর্ণধার ছিলেন না। যিনি বঙ্গের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন দেশবাসী তাঁহার আগমনের পর হইতে শুধু সহানুভূতির কথাই পাইতেছিল। গবর্ণমেণ্ট ভ্রমটুকু সহজে উপলব্ধি করিলেন, ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফ্রেঞ্চের সহকারীর ন্যায়বর্জ্জিত আইনবিগর্হিত হুকুম অত্যল্প সময়ে রদ হইয়া গেল; কেন হইল? জামালপুরে হিন্দুর দেবতা বাসন্তীপ্রতিমার উপর লগুড়াঘাত, ১৯০৬ সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির বৈঠক ভঙ্গ, দেশপূজ্য দেবচরিত্র অশ্বিনীকুমার ও কৃষ্ণকুমারের নির্ব্বাসনের কথা আজই কে ভুলিতে পারিয়াছে? তখন ত গবর্ণমেণ্টকে অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে এমন ত্রস্ত ভাবে দাঁড়াইতে দেখি নাই। আমরা এ পর্য্যন্তও জানিতে পারি নাই, এব্যাপারে নূতন reform এর minister দের ও Executive council এর দেশীয় মেম্বারগণের কোন হাত ছিল কি না। এটুকু দেশে দেখা যাইতেছে তখন হইতেই দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিত জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল স্তরের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগরণের কেমন একটা সাড়া পাওয়া যাইতেছিল তাই গবর্ণমেণ্টকে এত লোকের উন্মুক্ত চক্ষুর সম্মুখে এত লজ্জিত এবং তাহা অপসারিত করিতে এত ত্রস্ত দেখিয়াছি। ইহা শাসক এবং শাসিত সকলের পক্ষেই মঙ্গলকর। ভ্রম, ত্রুটী মানুষের হওয়া সম্ভব। আমাদের যাঁহারা শাসক স্বরূপে এ দেশে আসেন তাঁহারা স্বর্গের দেবতা নহেন, আমাদের মতই ভ্রমত্রুটীপূর্ণ মানুষ। আমরা সেইটুকু, কেহবা অপ্রীতিভাজন হইবার আতঙ্কে কেহবা 'মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম' কথাটীর সার্থকতা রক্ষার জন্য, তাঁহাদিগকে বুঝিতে অবসর দেই না। তাঁহারাও বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা নিজেরা যেটুক বুঝেন বিলক্ষণ বাকীটুকু ভুল না বুঝাইয়া আমরা ঠিক কথা বুঝাইতে সচেষ্ট হইলে, দেশে বোধ হয় অর্দ্ধেক অশান্তি কমিয়া যায়। তাহারা তখন খাঁটী বুঝিয়াছিলেন, রুদ্রমূর্ত্তিতে শাক্ত শাসনে দেশে শান্তির হিল্লোল বহিবে না। তাই তখন অন্যায় আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন, ইহাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের উন্নত মস্তক জগতের সমক্ষে আরও উন্নত আরও গৌরবমণ্ডিত হইয়াছিল। নিজ ভ্রমত্রুটী স্বীকার করিলে যাঁহারা মস্তক অবনত হয় মনে করেন, তাহাদের অবস্থান মনুষ্য সংজ্ঞার কোন স্তরে, সভ্য সমাজে সুবিদিত। কিন্তু দেশেরই দুর্ভাগ্য, এ নীতি গবর্ণমেণ্ট দীর্ঘদিন চালাইতে সক্ষম হইলেন না এজন্য সর্ব্বথা গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করা যাইতে পারে না, দায়ী আমরাও। আর দায়ী দরিদ্র ভারতের অন্নপুষ্ট ভারতবাসীর বিপরীত-ভাবপন্ন শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়। ইহারা শাসক সম্প্রদায়ের স্বগণ, ইহাদের পূর্ণ প্রভাবের নিকট ভারতবাসী সদা বিপন্ন, শাসক সম্প্রদায় সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এ দেশবাসীকে কিছু দিতে ইচ্ছা করিলেই ইহাদের গেল গেল রবে সে সকল প্রচেষ্টা

ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। সে দিনও এই বণিক সম্প্রদায়ের মুখ পাত্র সার রবার্ট ওয়াটসন স্মিথ দেশবাসীর প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার টুকু দিবার বিরুদ্ধে যে তীব্র হলাহল উদ্গীরণ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনেও উদ্ভব হয় নাই। এ বিষ হজম করিবার মহাদেবও এ যুগে মিলে নাই। ইহার জ্বালায় অতি স্থির ধীর ভূপেন্দ্র নাথ ও কৃষ্ণগোবিন্দ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের ভাব যদি এইরূপই চলে তবে দেশে এখন হস্তপদ বিশিষ্ট নরাকৃতি জীবের আর প্রয়োজন নাই। এখন চাই পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ, যাহাদের চরিত্র বলের সম্মুখে ইহাদের সমুদয় দম্ভ নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

এইরূপে যদি দেশের মোহ তন্দ্রা কাটিয়া উঠে, দেশব্যাপী চরিত্রবল ও মনুষ্যত্বের সাড়া চলিতে থাকে, একতার বন্ধন ক্রমে দৃঢ় হয়, একের অসম্মানে অপরের গায়ে আঘাত লাগে তবে দাঢ্য সহকারে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে দিন গণিয়া না হোক সত্বর দেশে স্বরাজ আসিবে, গবর্ণমেণ্ট ও আগ্রহান্বিত হইয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্টকালের অনেক পূর্ব্বেই স্বরাজ দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। মান অভিমানে না খাইয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকিবার দরকার হইবে না, পাশ্চাত্যানুকরণে ধরণী বক্ষও রক্তস্রোতে কলুষিত হইবে না। চাই কিন্তু দেশে মানুষ। একালে সেকালে ত জগৎ শেঠ, মিরজাফর, রাজবল্লভের লজ্জাকর চিত্রেরই পুর্ণাভিনয় চলিতেছে। মানুষ কোথায়?

এ দিনেও কোন জমীদার প্রজার কতটুকু স্বার্থ দেখিতে ব্যস্ত, কোন প্রজাই বা ভূম্যাধিকারীর ন্যায্য স্বত্ব স্বার্থটুকু বজায় রাখিতে আগ্রহান্বিত, কোন উকীল কৌন্সিল জ্ঞাতসারে মিথ্যা মোকদ্দমার প্রশ্রয় দিয়া নিজ স্থূল উদরের প্রসার বৃদ্ধিতে অপ্রয়াসী, আর কোন চিকিৎসকই বা দুঃস্থ রোগীর গলায় ছুরী বসাইয়া পকেট ভর্ত্তি করিতে পশ্চাৎপদ, আবার কতজন দেখিতেছি দেশের কথা ভুলিয়া গিয়া শুধু নিজের নামের খাতিরে নেতার পরিচ্ছদে দেশ শিক্ষার ছলে এখনও জাতিতে জাতিতে শ্রেণীতে শ্রেণীতে অসৌহার্দ্দ বর্দ্ধনে সচেষ্ট। এখনও ভ্রাতার হাঁড়িতে দুঃস্থ ভ্রাতাটিরও অন্ন নাই, অথচ গড়াচর টণ্ডের প্রবল প্রতাপ, ডোম মেথরকে ধরিয়া অবাধ আলিঙ্গন, লোকদেখান প্রেম চলিতেছে; যখন এই আলিঙ্গন প্রকৃত আলিঙ্গনে পরিণত হইবে তখনই স্বরাজের আশা, পূর্ব্বে নহে।

চরিত্র গঠিত হইবার পূর্ব্বে স্বরাজ আসিতে পারে না। ইহা দৃশ্যতঃ মানুষের প্রচেষ্টায়ই অর্জ্জিত হয় সত্য, কিন্তু ইহা ভগবানের প্রকৃষ্ট দান। যোগ্য জনেই যোগ্য জিনিষ প্রাপ্ত হন, সুধা দেবগণই ভোগ করেন এইটুকু সর্ব্বদা স্মৃতিপটে রাখিয়া পরস্পরে হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া সকল স্তরে সমান ভাবে "দেশ বৈশিষ্টের অনুকূল শিক্ষায়" সকলকে সঞ্জীবিত করিতে পারিলে স্বরাজ অদূরে।

এই বিজিত দেশে আমরা দীর্ঘকালের পরাধীনতায় নির্জ্জিত জাতি, আমাদের অদৃষ্টে আরও সহিতে হইবে; তবে ত খাঁটী সোণা ফুটিয়া বাহির হইবে। তখন দান শৌণ্ড রাসবিহারী, ত্যাগী চিত্তরঞ্জন নথাগ্রে গণিতে হইবে না, তখন আর অনেক দিন "নিজ বাসভূমে পরবাসী" বলিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন।

কাগজের কথা।

সেকালে পাড়াগেঁয়ে লোকে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান করিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করিত। পৈত্রিক ক্রিয়াকর্ম্ম ও সমানঘরে বা "কুলকার্য্য" করিয়া পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে পারিলেই জীবনের কর্ত্তব্য শেষ হইত। পাশকরা ছেলের চাকুরী জোগাড় ও পাশকরা বর কেনার কড়ি সংগ্রহই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল না। এখন একটি বালকের শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হয়, মোটা ভাতকাপড় অপেক্ষা তাহার খরচ যে বড় একটা কম নহে, ইহা সাধারণ গৃহস্থ মাত্রেরই অনুভব করিবার কথা। "লেখা পড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে" একথা সেকালে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের ছিল। যাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়া গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। এখনকার শিশুদের মত শ্লেট, পেন্সিল, কাঠ-পেন্সিল প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবহার তাঁহাদের সে সময় ছিল না এবং এখনকার মত "হাতে খড়ি" হইতেই বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিয়া ঘরের পয়সা পরকে দিবার ব্যবস্থাও সে সময়ে হয় নাই। সাধারণতঃ সেকালে পাঁচবৎসর বয়সে "রাম খড়ি" নামক এক প্রকার খড়িমাটি হাতে দিয়া "হাতে খড়ি" হইত ও লোহার শলাকা বা কয়লা দিয়া ভূমিতে বর্ণমালা লিখাইতে অভ্যাস করান হইত। তারপর তালপাতায় এবং কলার পাতায় অনেক দিন লিখান হইত। হাত অনেকটা 'পাকা' হইয়া আসিলে "কাগজ ধরান" হইত। হাতে প্রস্তুত তুলট কাগজে লিখিবার অধিকার পাওয়ার দিন পাঠশালায় বালকের পক্ষে স্মরণীয় দিন ছিল! প্রাতঃস্নানের পর কপালে চন্দন মাখিয়া, শরের কলম হাতে—কাগজ ধরিতে যাওয়ার কথা এখনও মনে আছে। গুরু মহাশয় একটি টাকা পুরস্কার পাইয়া কেমন খুসী হইয়াছিলেন সেই চেহারা এখনও মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

এই প্রাচীন লিখন পদ্ধতি দেখিলেই লেখ্য বস্তুর ক্রমবিকাশের কাহিনী স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মানব-জ্ঞান-ভাণ্ডার যাহাদ্বারা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, যাহাদ্বারা মানব-চিন্তা অবিনশ্বর হইয়াছে, সেই কাগজের উৎপত্তি এবং আধুনিক প্রস্তুতপদ্ধতি আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

চলিত কথায় 'পাতা' বলিলে যাহা বুঝায় সংস্কৃত ভাষায় তাহাকে 'পত্র' বলে। কি ভাবে অক্ষর, পত্র এবং লিখনপ্রণালীর উৎপত্তি হইল, তৎসম্বন্ধে রঘুনন্দনের ব্যাখ্যা অতি সুন্দর—

"ষান্মাসিকে তু সংপ্রাপ্তে ভ্রান্তি সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥"

ছয়মাস অতীত হইলে ভ্রম উপস্থিত হইল দেখিয়া বিধাতাকর্ত্তৃক পুরাকালে অক্ষর-সৃষ্টি হইয়া পত্রারূঢ় হইল।

অতি প্রাচীনকালে নরগণ স্মরণীয় কার্য্যকলাপ স্মরণ রাখিবার জন্য বৃক্ষাদিরোপণ বা প্রস্তর স্তূপাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিত অথবা সেই সমস্ত ঘটনাবলী জনশ্রুতিতে এবং লোকমুখে প্রচারিত হইত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গহ্বরবাসী নরগণ পাথর কাঠ বা হাড়ের উপর মনোভাব প্রকাশের কোন সঙ্কেত খোদিত করিয়া গিয়াছেন কিনা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সভ্যতার প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরে চিত্রলিপি (picture-writing) আবিষ্কৃত হইয়া রক্ষিতব্য বিষয় সকল প্রস্তরে বা কাষ্ঠে খোদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পিরামিডের গাত্রে খোদিত অক্ষর মালাই ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন। সীরিয়ার উপকূলবর্ত্তী ফিনিসিয়ার অধিবাসীদের বর্ণমালা মিশরের অনুকরণে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণের ধারণা। Code of Hammurabi, হামুরবির নিয়মাবলী, ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এক প্রকার কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর খোদিত হইয়াছিল।

যে যুগে বেদের মন্ত্র সংহিতার আকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল, সে সময়েও অক্ষর ছিল; তবে সে ঠিক কোন্ সময়ে তাহা নিশ্চিত হয় নাই। খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে। এদেশে পাথরে খোদাই লিপি মৌর্য্যদের সময় হইতেই পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বের পাথর রক্ষিত না হওয়ায়, বলা দুঃসাধ্য যে কবে ভারতীয় লিপির সৃষ্টি হইয়াছে।

অক্ষরমালা পাথরে খোদাই করা অপেক্ষা মাটিতে অঙ্কিত করা সহজ। সেই কারণে কাঁচা ইঁটের উপর অক্ষর লিখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হইত। ব্যাবিলনের রাজকন্যার পাণি প্রার্থনা করিয়া ফ্যারাও (Pharaos) বংশীয় জনৈক রাজা যে মৃত্তিকা-ফলক-লিপি পাঠাইয়াছিলেন তাহা ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রেমলিপির নিদর্শন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৫৩০ সালে উক্ত লিপি লেখা হইয়াছিল, মনে হয়। ইহাও জানা গিয়াছে যে, রাজকর আদায়কারীরা খচ্চরের পিঠে বোঝাই করিয়া 'খোলাকুচি' (potsherd) লইয়া যাইত এবং শলাকাদ্বারা উহার উপর আঁচড়াইয়া রসিদ দিয়া আসিত। প্রাচীন কালদীয় (Chaldean) জ্যোতির্ব্বিদগণ তাঁহাদের গবেষণার ফলাফল এই প্রকার ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে সীসার পাত ও পিতলের পাত পিটিয়া পাতলা করিয়া লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত এবং উহার উপর দলিলাদিও লিখিত হইত। হাতীর দাঁতের পাত ও এই ভাবে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন রোমে এই সকল প্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল।

কাঠের তক্তার উপর খড়ি গোলা দিয়া লিখিবার পদ্ধতি এখনও মুদীর দোকানে দেখা যায়। ইহারা হিসাব টুকিয়া রাখিবার জন্য কাঠের উপর মোমের মিশ্রিত এক প্রকার প্রলেপ দিয়া রাখে এবং উহার উপর পেরেক দিয়া আঁচড়াইয়া হিসাব লিখে। পুরাকালে গ্রীকভাষার অনেক পুস্তক কাঠের উপর খোদিত হইয়াছিল। সোলোনের (Solon) আইন এইরূপ খোদিত ছিল। লিখিত কাষ্ঠ ফলকগুলি একত্রে বাঁধিয়া রাখিলে একখানা পুঁথি বা Codex বলিয়া গণ্য হইত।

নাগরী অক্ষরের বয়স খুব অল্প; বড় জোর খৃষ্ট পরবর্ত্তী নবম শতকে। প্রায় সেই সময়েই প্রাচীন অক্ষর হইতে বাঙলা অক্ষরের জন্ম। প্রাচীন ভারতের যে লিপি এখন পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে, তাহা খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর।

সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অনেক জাতিই বৃক্ষপত্র লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত। মিশরে সর্ব্ব প্রথমে তালপত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয় বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদগণের ধারণা। আমরা ছোটবেলায় তালপাতার পুঁথির বহুল প্রচলন দেখিয়াছি; এখনও অনেক পণ্ডিতদের বাড়ীতে তালপাতার পুঁথি রক্ষিত আছে। বৃক্ষবল্কল ও লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। পশুচর্ম্ম, এমন কি সর্পচর্ম্মের উপর ও লোকে লিখিতে ছাড়ে নাই। কথিত আছে যে, টলেমিয়াস ফিলাডেলফিয়াসের সময়ে মিশরের কোন পুস্তকালয়ে হোমারের মহাকাব্য "ইলিয়াড" ও "অডেসির" এক সংস্করণ স্বর্ণাক্ষরে সর্পচর্ম্মের উপর লিখিত ছিল। যেখানে পশুচর্ম্মের উপর লিখন কার্য্য চলিত, সেখানে ছাগল ও ভেড়ার চামড়াই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। এখনও দলিলাদি লিখিবার জন্য পার্চমেণ্টের ব্যবহার আছে। প্রাচীন ইহুদীদের আইন, মেষচর্ম্মের উপর লিখিত হইয়াছিল। আধুনিক কাগজ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষবল্কলেরই অধিক প্রচলন ছিল। ব্যবহারে সুবিধা থাকাতে উহাদের আদর ছিল। অস্মদ্দেশীয় ভূর্জ্জপত্রের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। গাছের আভ্যন্তরীণ ছাল ব্যবহার করিতে করিতে কাগজ আবিষ্কারের পথ ক্রমশঃ সুগম হইয়া আসিল।

কাগজের সৃষ্টি।

জলের অভাব হইলে যেমন প্রাণিগন বাঁচিতে পারেনা, কাগজের অভাব হইলে তেমনি বর্ত্তমান সভ্যতা এক মুহূর্ত্ত ও টিকিতে পারে না। জ্ঞানবিস্তারে মুদ্রাযন্ত্র বিশেষ সহায়তা করিতেছে, কিন্তু কাগজের অভাব হইলে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা মানব প্রতিভা বিস্তারের কোনই সাহায্য হইতে পারেনা।

'কাগজ' পারসীক শব্দ। ভারতবর্ষে ও এই নাম প্রচলিত। কোন কোন প্রাচীন তন্ত্র-গ্রন্থে 'কাগজ' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। ইংলণ্ডের লোকেরা ইহাকে 'পেপার' বলে, ফরাসী ও জার্ম্মানরা 'পেপিয়ার', পর্ত্তুগীজরা 'পেপেল' বলে এবং ইতালীদেশে কাগজের নাম 'চার্টা'।

ঐতিহাসিকগণের মতে মিশর দেশের "পেপিরস" (Papyrus) নামক তৃণের মৌলিক গুণ আবিষ্কৃত হওয়ায় কাগজ শিল্পের প্রথম সূত্রপাত হয়। কোন্ সময়ে এই আবিষ্কার হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু প্লিনি (Pliny) তাঁহার পুস্তকে নিউমার (Numa) লিখিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। নিউমা ৬৭০ খৃষ্ট পূর্ব্ব শতাব্দীর লোক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে 'পেপিরাস্' তৃণ কাগজাকারে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই তৃণের মূলদেশ হইতে প্রস্তুত কাগজই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা শরের ন্যায় নীলনদের জলা জমীতে জন্মে। ইহা প্রায় ৮।১০ ফিট দীর্ঘ হয়, কোন কোন গাছ আরও বড় হয়। ইহার পাতা কতকটা আমাদের ঝাউগাছের পাতার ধরণের। ওলের গাছের মত সরল হইয়া উঠে এবং ওলের পাতার মত ছত্রাকার ধারণ করে। গোড়ার অংশের ছাল অতি পাতলা ও মোচার খোলার মত। এই খোলা গুলি টেবিলের উপর রাখিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগে খুলিয়া লইয়া আড় ভাবে জুড়িয়া গেলেই সেকালের "'পেপিরি' প্রস্তুত হইত। যে গাছের গোড়া যতটা মোটা, 'পেপিরি' কাগজ ততটা চওড়া হইত। এক এক তা 'পেপিরি' তৈয়ার হইলে হয় হাতীর দাঁত

নয় পালিশ করা পাথর ঘসিয়া উহা মসৃণ করা হইত। গ্রীকেরা অতি পাতলা 'পেপিরিকে' "হেরেটিকা" বলিত। ইহার উপরে মিশরের ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্ম কথা লিখিয়া বিক্রয় করিত। বিদেশী বণিকের নিকট পাতলা কাগজ বিক্রয় করা নিষেধ থাকিলেও, হেরেটিকা বিক্রয় নিষেধ ছিল না। রোমসম্রাট্ অগষ্টাসের সময় রোমকেরা মিশর হইতে হেরেটিকা ক্রয় করিয়া, এক প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহার উপরকার লেখা ধুইয়া ফেলিত। এই প্রকারে ধৌত কাগজ রোমক বণিকেরা 'অগষ্টাস্' মার্কা কাগজ নাম দিয়া বিক্রয় করিত। তাহার পর রোমে নানা প্রকার "পেপিরি" প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। প্লিনি বলিয়াছেন যে সাধারণের এমন একটা ধারণা ছিল যে, নীলনদের জলে আঠাবৎ এমন কোন পদার্থ আছে যাহার গুণে সহজে সে দেশে পেপিরি প্রস্তুত হইত এবং সহজেই ছালগুলি জুড়িয়া যাইত। আসল কথা, পেপিরি ছাল ভিজাইলে উহা হইতে এমন এক প্রকার রস বাহির হইত যাহাতে আঠার কাজ করিত এবং শুকাইলেই দেখা যাইত যে ছাল গুলি জুড়িয়া গিয়াছে। আঠারজল দিয়াও অনেক সময় ছাল জোড়া হইত। রোমকেরা পেপিরাস্ দ্বারা অনেক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সকল কাগজের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছিল, যথা - Charta hieratica, Charta Emporetica, Charta Saitica। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে 'হিরাকুলিনম্' ধ্বংসাবশেষ খুঁড়িয়া বাহির হইলে কমবেশী ১৮০০ চোঙ্গাকারে গুটান (rolls) কাগজ পাওয়া গিয়াছিল। পেপিরাস হইতে মিশর দেশে চাটাই, দড়াদড়ি এমন কি পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত; কিন্তু ইহা লিখনের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় অতীতের ইতিহাস জানিবার সহায়তা হইয়াছে।

বহু গবেষণার ফলে ঠিক হইয়াছে যে, চীনেরাই প্রথমে অংশুমান (Cellulose) পদার্থ হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছে। প্রথমে ইহারা বাঁশের ভিতরকার ছালের উপর শলাকা দিয়া আঁচড়াইয়া লিখিত। পরে বাঁশের ছাল, তুলা, রেশম এবং অন্যান্য গাছের ছাল, মাছধরা জালের ছিন্নাংশও লইয়া, একত্র সিদ্ধ করিয়া মণ্ড (pulp) প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। চীনেরা অতি প্রাচীনকালে যে সমস্ত যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছিল তাহারই উন্নতি সাধন করিয়া ইউরোপে নানাবিধ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। "তুনরেচীন" এ কথার সার্থকতা, কাগজ উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায়; আবার এসিয়া ও ইউরোপের লোকের বিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতিতে কত প্রভেদ তাহাও ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে। ভারতে কোন সময়ে হাতে-গড়া কাগজ বানান আরম্ভ হয় তাহার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। তবে খৃষ্ট জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে একপ্রকার "তুলা-চাপড়ান" জিনিষের উপর যে ব্যবসায়ীরা হিসাব লিখিত তাহার কথা পাঞ্জাব বিজয়ী গ্রীকদিগের বিবরণে পাওয়া যায়। এই "তুলা চাপড়ান" জিনিষ এবং "তুলট" কাগজ একই জিনিষ কিনা, তাহা বলা যায় না। বাঙ্গালা দেশের কাগজ প্রস্তুত কারীরা "কাগজী" নামে অভিহিত। ইহারা প্রায়ই মুসলমান এবং অতি কষ্টে দিন গুজরান করিয়া আসিতেছে। ঢাকা-মুন্সীগঞ্জের অনেক গ্রামে অন্ততঃ হাজার ঘর কাগজীর বাস ছিল। এখন পেটের দায়ে তাহারা জাতব্যবসা ছাড়িয়া

অন্ত উপায়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'মেঘু কাগজীর' কাগজের আর আদর নাই! মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুরের অন্তর্গত কয়েক গ্রামে এখনও প্রায় পাঁচশ ঘর কাগজী নিজের ব্যবসায়ে কায়ক্লেশে দিন কাটাইতেছে। গত যুদ্ধের সময়, বেশীদামে কাগজ বিক্রয় করিয়া, ইহারা কতকটা স্বচ্ছল ভাবে দিন কাটাইতেছিল। কাগজের বাজার নরম পড়াতে আবার তাহাদের দুর্দ্দিন আসিয়াছে। পূর্ব্বে মালদহ জেলায় তুলট কাগজ বেশী পরিমাণে প্রস্তুত হইত এবং বিদেশেও এই কাগজ রপ্তানি হইত। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুরের অনেক গ্রামে কাগজীরা তুলট কাগজ ও অন্য এক প্রকার পাতলা কাগজ প্রস্তুত করিত। পুরানো হিসাবপত্র সমস্তই এই সকল কাগজে লিখিত রহিয়াছে। হাওড়া অঞ্চলে কাগজীরা এখনও কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। তাহারা আমাদের নিকট যে নমুনা দিয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, কোন রসায়নবিৎ (Chemist) চেষ্টা করিলে হাতে গড়া কাগজের ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে পারেন। হাতেগড়া কাগজের প্রধান দোষ এই যে, ইহার উপর ইংরাজী কালি পড়িলে চুপসাইয়া যায়। সাইজিং (sizing) এর দোষে ইহা ঘটিতেছে। সম্ভবতঃ ভাতের মাড়যোগে Sizing করিবার পর মুড়ী দিয়া তেলসহ হরিতাল ঘষায় এই দোষ ঘটিতেছে। আমাদের দেশের লোক সামান্য আয়ে সন্তুষ্ট। একজন B. Sc. বা M.Sc. যদি তুলট কাগজের দোষগুলি সংশোধন করাইয়া উন্নত প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত করাইতে পারেন তাহা হইলে হাতে গড়া কাগজের ব্যবসায়েও বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। তবে কলের কাগজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তুলট কাগজের ব্যবসায় যে নিরক্ষর কাগজীরা বেশীদিন চালাইতে পারিবে এমন আশা করা যায় না।

কলের কাগজের ইতিহাস।

ইংরাজিতে বলিলে বলা যায় যে "Paper is an aqueous deposit of vegetable fibre."। বাঙ্গলায় ঠিক এই ভাবের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়া বুঝান কঠিন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চীনেরাই সর্ব্ব প্রথমে বর্ত্তমান প্রণালীর কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। কথিত আছে যে ৭৫ খৃষ্টাব্দে 'ছাইলান' (Tsai-Lun) নামক জনৈক ব্যক্তি চীন সম্রাট হোটির (Ho-Ti) কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। অবসর সময়ের গবেষণার ফলে রেশমের উপর কালি দিয়া লিখন পদ্ধতি প্রচার করিতে সমর্থ হয়েন! তাহার পর ১০৫ খৃষ্টাব্দে গাছের ছাল, ছেঁড়া ন্যাকড়া এবং মাছধরা জালের ছিন্নাংশ হইতে মণ্ড (pulp) প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। এই আবিষ্কারের জন্য তাঁহাকে 'মার্কুয়িস' উপাধি দেওয়া হয়। ৭০৪ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দ নগরে প্রথম কাগজের কারখানা স্থাপিত হয়। ৭৫১ খৃষ্টাব্দে আরবেরা সমরকন্দ নগর জয় করিয়া কতকগুলি চীনা বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং এই বন্দীদের নিকট হইতে কাগজ শিল্প শিক্ষা করিয়া লয়। আরবেরাই প্রথম কাগজ প্রস্তুতে শ্বেতসার (starch) ব্যবহারের ব্যবস্থা করে এবং তাহারাই ছিন্ন বস্ত্র হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে কৃতকার্য্য হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী প্রথম প্রচলিত হয় এবং মুরেরা টলেডো সহরে প্রথমে কাগজের কল (Paper-Mill) স্থাপন করে। ক্রমে ইটালী ফ্রান্স এবং

ইংলণ্ডে কাগজ প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের হেনল্ট (Hainault) সহরে কাগজের কারখানা স্থাপিত হয় এবং তাহার পর ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে বহু কারখানা স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে উলম্যান ষ্টরমার (Ulman Stormer) নামক এক ব্যক্তি জার্ম্মানিতে এক কাগজের কারখানা স্থাপন করিয়া বহু কারিকর নিযুক্ত করেন। অন্য কাহাকেও কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবে না বলিয়া ইহাদের প্রত্যেককে প্রতিজ্ঞা পত্র দস্তখত করিতে হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা কাগজকল সম্পর্কীয় কোন দ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানির জন্য প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারিবে বলিয়া এক কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ড হইতে কাগজ আমদানী হইত। এই সকল দেশে মন্ত্রগোপনের যে প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহাতে ইংলণ্ডে বিলম্বে কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। কোন্ বৎসর ইংলণ্ডে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয় ঠিক বলা যায় না। জন টেট John Tate ষ্টেভেনেজ (Stevenage) সহরে এক কাগজের কল স্থাপন করেন। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে সপ্তম হেনরীর জমা খরচ পুস্তকে লিখিত রহিয়াছে—"Given in rewarde to Tate of the my line, 6s. 8d.। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে স্যার জন স্পিলমান (Sir John Spilman) নামক এক জন জারমান দেশীয় লোক বিলাতে এক কাগজের কল স্থাপন করেন এবং রাজ্ঞী এলিজবেথ তাঁহাকে দশ বৎসরের জন্য সমস্ত ছেঁড়া ন্যাকড়া সংগ্রহ করিবার অধিকার দিয়া এক সনদ দেন। টমাস চার্চইয়ার্ড (Thomas Churchyard) নামক এক কবি সুদীর্ঘ কবিতা লিখিয়া স্পিলমানের প্রশংসাবাদ করেন। এই কবিতা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

I prayse the man that first did paper make,
The only thing that sets all virtues forth ;
It showes new bookes, and keeps old workes awake,
Much more of price than all the world is worth :
It witness bears of friendship, time and troth,
And is the tromp of vice and virtue both ;
Without whose help no help nor wealth is won,
And by whose ayde great works and deedes are done.'

স্পিলম্যানের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে কাগজ শিল্পের বেশী উন্নতি হয় নাই এবং ফ্রান্স হইতেই প্রায় সমস্ত কাগজ আমদানি হইত। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ হিল্ড্ইয়ার্ড (Chirles Hildeyard) কাগজ প্রস্তুত করিবার সনন্দ পান। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে হিউজিনিয়টগণ (Hugeneotes) ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হওয়ায় ইংলণ্ডের জনসাধারণের অনেক উপকার হইয়াছিল, ইহা সকলেই জানেন। ইঁহারা ইংলণ্ডে আসিয়া কাগজের কল স্থাপনে বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছিলেন। তাহা হইলেও ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নাই। এই সময়ে হোয়াটম্যান (Whatman) নামক এক ব্যক্তি মেডেনষ্টোন নামক স্থানে এক কল স্থাপন করেন। এ সময়ে ছিন্নবস্ত্র হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া সুবিধাজনক না

থাকায়, যে পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত হওয়া উচিত তাহা হইতেছিল না। পক্ষান্তরে ওলন্দাজরা অতি দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে যাইতেছিল। তাহারা Wash Hollander নামক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ছিন্ন বস্ত্র হইতে ময়লা ধুইবার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার ফলে বেশ টেকসই এবং ভাল কাগজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। জার্ম্মানরা এবং ওলন্দাজেরা স্রোত-তাড়িত (Wafer mill) এবং বায়ু তাড়িত (Wind mill) কল প্রস্তুত করিয়া, বিলাতে যে পরিমাণ কাগজ ১২ ঘণ্টায় প্রস্তুত হইতেছিল সেই পরিমাণ কাগজ ২ ঘণ্টায় প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী মুঁসে ডিডো সকল প্রকার তন্তু হইতেই কাগজ প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। তিনি খুব লম্বা অবিচ্ছিন্ন এক তা কাগজ (one continuous sheet) প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ডিডোর শ্যালক গ্যাম্বল (Gamble) ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এই উপায় ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ফুর্ডিনিয়ার কোম্পানী কাগজ প্রস্তুত করিয়া একচেটিয়া কারবার করিতে সনদ পান। ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারা 'ফুর্ডিনিয়ার মেসিন' আবিষ্কার করিয়া হারফোর্ডসায়ারে প্রথম স্থাপন করেন। কিন্তু এই একচেটিয়া কারবার বেশী দিন লাভজনক থাকে নাই; কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁহাদের যন্ত্র অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছিল। এ কারণ ফুর্ডিনিয়ার কোম্পানীর ব্যবসায়ে লোকসান পড়িতে লাগিল। কাগজের কল স্থাপনে রাজকোষে বেশ কর আদায় হইতেছিল, তাই উক্ত কোম্পানীর ক্ষতি পূরণ জন্য পার্লিয়ামেণ্ট হইতে ১০০০ পাউণ্ড মঞ্জুর হইয়াছিল। ১৬৮৫ খৃঃ হইতে ১৭৩৯ খৃঃ পর্য্যন্ত ৫৪ বৎসরে ইংলণ্ডে ২৭৮টি কল স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল, আর আমরা আজও পর্য্যন্ত সাবেক প্রথার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হই নাই। কবি সত্যই বলিয়াছেন—"ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে।"

কাগজ প্রস্তুতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে, ভারতবাসী দ্বারা এ বিষয়ে কোন প্রকার উন্নতির চেষ্টা হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত কাগজশিল্প বিশেষজ্ঞ রেটসাহেব (Mr. Raitte) অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন যে, কাগজ প্রস্তুত করিবার এত মূল উপাদান (raw materials) এদেশে আছে যে সমস্ত পৃথিবীর ব্যবহারের জন্য যত কাগজ প্রয়োজন, উহা এক ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বত্র সরবরাহ হইতে পারে। অথচ এখানকার কাগজের কলের মালেকরা ১৯২০—২১ সালে ১৮৮,৭৯৯ হন্দর (যাহার মূল্য ৪৯৯১৮০ পাউণ্ড) কাগজ প্রস্তুত করিবার উপাদান বিদেশ হইতে আমদানি করিয়াছেন। ১৯১৯—২০সালেও ভারতবর্ষে সকল রকমের কাগজ ও পেষ্টবোর্ডের আমদানির পরিমাণ মোট ৭২৮৮৮০ হন্দর ও তাহার মূল্য মোট ২৩৪৪৫৭২ পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় চার কোটী টাকা। বিদেশ হইতে কাঠের মণ্ডের (wood-pulp) আমদানি ক্রমে কমিয়া যাইবার কথা, কেন না একটা গাছ পাল্পের (pulp) উপযুক্ত হইতে ২৫।৩০ বৎসর লাগে, তাহার পর কাঠের মণ্ড হইতে কিছুদিন হইল রেশমী কাপড়ও প্রস্তুত হইতেছে। আসামে নল খাগড়া (Savanna grass) প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং এই ঘাস হইতে প্রায় ২০,০০০০০ পাউণ্ড ওজনের মণ্ড (pulp) প্রস্তুত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত 'সাবাই ঘাস' এবং 'মুলীবাঁশ' ও প্রচুর পরিমাণে জন্মে; ইহা

হইতেও যথেষ্ট মণ্ড (pulp) প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু এত উপকরণের সুবিধা থাকিলেও আমরা এমনই অকর্ম্মণ্য যে এমন একটি লাভজনক ব্যবসায় চালাইবার কোন চেষ্টা করি নাই বা করিতেছি না।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্ররায় অগ্রণী হইয়া গৌহাটির নিকটবর্ত্তী পানিখাইটি মোকামে একটা কাগজের কল প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং বিশলক্ষ টাকা মূলধনে আসাম পেপার মিল্‌স্ লিমিটেড। নাম দিয়া একটি কোম্পানীও গঠিত হইয়াছে The Assam Paper Mills Ltd. এই নব প্রতিষ্ঠিত কাগজের কলের জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট ৩৫০০ একর নল-খাগড়ার জমী বন্দোবস্ত দিয়াছেন এবং প্রায় ৪০০ একর জমীর উপর কারখানা স্থাপনের বন্দোবস্ত হইতেছে। শীঘ্রই জার্ম্মানী হইতে কাগজের কল আসিয়া পৌঁছবার কথা। দেশের লোকের সহানুভূতি পাইলে, আশা করা যায়, পাইন খাঁইটী জঙ্গল কালে সমৃদ্ধিশালী কাগজের সহরে পরিণত হইবে। ভারতবর্ষে আরও ৮।৯টি কাগজের কল চলিতেছে। ১৯১৮ সালে যে ৯টি কল চলিতেছিল তাহার মূলধন ছিল ৫২,৪০,০০০ টাকা এবং কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল মোট ৩১,৪০০ টন। এই সমস্ত কলে ৫৭০০ শ্রমজীবী খাটিয়াছিল এবং ২,১১,১৮,০০০ টাকা লাভ হইয়াছিল। রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্যার জামাল বহুটাকা ব্যয় করিয়া একটা কাগজের কল প্রস্তুত করাইতেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহার কার্য্য শেষ হইবার সময় আগুনে পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

আশা করি আমাদের যুবকবৃন্দ কেবল চাকুরীর উমেদারীতে সময় নষ্ট না করিয়া ছোট ছোট pulp mill খুলিয়া কাগজ প্রস্তুতের সহায়তা করিয়া দেশের ধনধান্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন। বিলাত ও অন্যান্য দেশ হইতে আমাদের বহু বাঙ্গালী যুবক ব্যারিষ্টার, প্রোফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় একজনও কাগজশিল্প বিশেষজ্ঞ (paper expert) হইয়া আসেন নাই।

শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী

সভাপতির অভিভাষণ।

সমাগত সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরাগী সুধীবৃন্দ!

মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আমাকে সাদরে আজ যে আসন দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য জানিয়াও কেন যে, গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত। আমার শক্তি-সামর্থ্য কতটুকু, আমি যতটা জানি, অপরে ততটা জানেন না, বা অপরের জানিবার সুবিধা ততটা নাই। ইতিহাস-সৌধ-নির্ম্মাতাদিগের মধ্যে কোন মনীষী শিল্পীকে এ পদে বৃত হইতে দেখিলে আমাপেক্ষা অধিকতর সুখী বোধ হয় কেহই হইতেন না। তবে আমার পক্ষ হইতে একটা কথা বলিতে চাই, আপনাদের ভালবাসায়

* মেদিনীপুর সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

এই অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তি আমার নাই। এই সভাপতি মনোনয়ন-কার্য্যে বাঙ্গালা দেশ আপনাদের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা না করিতে পারে, কিন্তু আপনাদের মহানুভাবতার—অমানীকে মান দান করিবার শক্তি ও অহৈতুকী ভালবাসার যে পরিচয় পাইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর একটা কথা এখানে বলিলে বোধ হয় অশোভন হইবে না যে, পরমারাধ্য আদর্শ নৃপতি রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন-কার্য্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাঠ-বিড়াল আপনার সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য করিয়া যেরূপ ধন্য হইয়াছিল, আমিও সেইরূপ মাতৃ-মন্দিরের পরিকল্পিত ইতিহাস-কক্ষ নির্ম্মাণকার্য্যে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত মালমসলা যাহা বহন করিয়া আনিয়াছি, তাহাতেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। আর এ বিষয়ে আমার যে কতদূর যত্ন, চেষ্টা বা আগ্রহ আছে, তাহা আপনাদের ন্যায় বান্ধবদিগের অবিদিত নাই। কি বলিয়া আপনাদিগকে যে আজ ধন্যবাদ দিব, তাহার ভাষা ঠিক করিতে পারিতেছি না। হৃদয় যখন ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে, তখন ভাষা মূক হইয়া যায়। আমি বক্তা নই—বক্তৃতার ভাষায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতে পারিব না, আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রাণের কামনা।

আজ আমি যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ইতিহাস আলোচনার সুষ্ঠু প্রণালী বিবৃতি করিবার চেষ্টা করিব, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ইতিহাস-বিশ্রুত সেই মেদিনীপুর জেলা মহামতি দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত মেদিনীপুরের নাম যে চিরকাল গ্রথিত থাকিবে, তাহা প্রাচীন সাহিত্যানুশীলনকারীকে আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। এই স্থানে বসিয়াই ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম "চণ্ডী" মঙ্গলের অমরগীতি বাঙ্গালীকে শুনাইয়া গিয়াছেন। রামেশ্বরের "শিবায়ন", দুঃখী শ্যামদাসের "গোবিন্দমঙ্গল", ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গল", কাশীরামের "মহাভারত" প্রভৃতি বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় গ্রন্থরাজির সহিত মেদিনীপুরের নাম অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন পুরীর পথে ছুটিতেছিলেন, তখন তিনি এই মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র পদধূলিস্পর্শে দেশ ধন্য হইয়াছে ও ইহার রজঃ আমার ন্যায় বৈষ্ণব-দাসানুদাসের নিকট ব্রজের রজের ন্যায় পবিত্র।

প্রাচীনতার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই প্রদেশান্তর্গত তমলুকের পদ-চুম্বন করিয়া এককালে সমুদ্র প্রবাহিত হইত। পাশ্চাত্য ও এদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তকে আধুনিক তমলুক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারত, অথর্ব্বপরিশিষ্ট, বিষ্ণু বায়ু, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্যপুরাণ, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থে তাম্রলিপ্তের নাম আছে। মহাভারতে বহুবার তাম্রলিপ্ত ও তাহার নরপতির কথা পাওয়া যায়। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। এক সময়ে তাম্রলিপ্ত বাঙ্গলায় বন্দর ছিল। ভবিষ্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাম্রলিপ্ত প্রদেশ চংবর্গভীমা বিরাজতে।" অশোক এই স্থানে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে কালে সিংহলদ্বীপে যাত্রা করিতে হইলে এই স্থান হইতে যাইতে হইত। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হন, তখন ইহা গঙ্গার মোহানার নিকট অবস্থিত—সামুদ্রিক বন্দর ছিল। তিনি এখানে ২৪টী বৌদ্ধ মঠ

দেখিয়াছিলেন। দুই বৎসর এখানে অবস্থান করিয়া, ফা-হিয়ান ধর্ম্মগ্রন্থ-সকলের অবিকল প্রতিলিপি ও চিত্রিত মূর্ত্তিগুলির যথাযথ নক্সা অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। যুয়ন-চয়ঙ যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন ও তাম্রলিপ্ত ১৫০০ লি বা ২৫০ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখানে তিনি ৫০টী দেবমন্দির ও ১০টী বৌদ্ধমঠ দেখিয়াছিলেন। ই-চিঙ ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ হইতে এই বন্দরে আসিয়াছিলেন। তখন ভারত ও চীনের সঙ্গে যে বাণিজ্য সংঘটিত হইত, তাহার কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত। তৎপরে তাম্রলিপ্ত পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১০৩১ হইতে ১০২৩ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোড়দেব রাঢ় প্রদেশের দক্ষিণাংশ উৎখাত করিয়া ধনাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। ইহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে চোড়গঙ্গদেব মান্দারন নরপতিকে পরাস্ত করিয়া মেদিনীপুর অধিকার করিয়াছিলেন।

আফগান ও মোগল দিগের অনেক খণ্ডযুদ্ধ এই জেলার মধ্যেই সঙ্ঘটিত হইয়াছে। বহু যুদ্ধের স্মৃতি এই জেলা বহন করিয়া আসিতেছে।

অনেক দিন ধরিয়া দেশ হইতে শান্তি দূর হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে মোগলেরা রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু সে শান্তিও বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে এখানে তিনবার অশান্তির অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলোলুপ সম্রাট-কুমার খুরম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্যসহ উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হন। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। হিজলী অবরোধ ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার দেশে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরেজ বণিক্‌দিগের বাণিজ্য ব্যপদেশে তাহাদের সহিত নবাবের বিবাদ হয়। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভাসিংহের বিদ্রোহানলে তৃতীয় বার এখানে অরাজকতা ও অশান্তির প্রাদুর্ভাব হয়। শোভাসিংহ আফগান সর্দ্দার রোহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া মেদিনীপুর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবাঙ্গলা লুণ্ঠন করিতে থাকে। সম্রাট পুত্র আজিম উস্‌মান বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া দেশে শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দিখাঁর রাজত্ব প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে বর্গীর হাঙ্গামায় দেশ যখন উৎপীড়িত হইতেছিল তখন মেদিনীপুরের ভাগ্যে অনেক লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল। ইহাদের হাঙ্গামায় মেদিনীপুরের যত ক্ষতি হইয়াছিল বাঙ্গলার কোন জেলার তত ক্ষতি হয় নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ও উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে চুয়াড় হাঙ্গামায় মেদিনীপুরবাসীকে অনেক অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

মেদিনীপুর জেলার প্রত্নতত্ত্বের অনেক নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত কিয়ারচাঁদে দুই ফুট হইতে চার ফুট উচ্চ প্রায় হাজারটী ক্ষুদ্র স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ স্তম্ভ দক্ষিণ ভারতে ও পুরুলিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। কবে কাহার দ্বারা এ গুলি প্রথম প্রোথিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ জানিবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। অনেকের মতে এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অসভ্য বুনো জাতিদের কীর্ত্তি। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাঙ্গালার মন্দিরের কথা লিখিয়া বলিয়াছেন, এখানকার

অধুনাতন মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুরের মন্দিরের অনুকরণে তৈয়ারী। বগড়ীর পঞ্চরত্ন মন্দির, চন্দ্রকোণার লালজী মন্দির ও মেদিনীপুর সহরের প্রান্তভাগে নাড়াজোলরাজ-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিষ্ণুপুরের প্রভাব-নিদর্শন আছে। গড়বেতার সর্ব্বমঙ্গলা ও কামেশ্বর মন্দির, চন্দ্রকোণাগড়ের সহস্রলিঙ্গ মন্দির ও দাঁতনের শ্যামলেশ্বর মন্দির উড়িষ্যার মন্দিরের মত। প্রায় দুই শত বৎসর ওড়িয়ারাজদিগের প্রাধান্য এই জেলায় ছিল। এই প্রাচীন মন্দিরগুলি সেই সময়েরই বলিয়া মনে হয়। তমলুকের বর্গভীমার মন্দির সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে চান, এটীও উড়িষ্য-পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু এ মন্দির সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অন্যরূপ। যদিও মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর ইহলোকে নাই—কিন্তু আমার পরমসুহৃদ্ ওড়িয়ার স্থাপত্য-প্রণেতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায় সত্যানুসন্ধিৎসু এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সত্য নির্দ্ধারণের পথ সুগম হইয়া যাইবে। ওড়িষার রাজা কপিলেশ্বরদেবের সময়ে পঞ্চদশ শতকে কেশিয়ারির নিকট গঙ্গেশ্বরে একটা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে মুসলমানগণ উহা আপনাদের মসজিদে পরিণত করে।

মেদিনীপুর জেলায় দুর্গ, গড় ও পরিখার চিহ্ন যত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালার কোন জেলায় তত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল পুরাকীর্ত্তির বিবরণ ও দুর্গাধিপতিদের কাহিনী সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। ইতিহাস গঠনে এগুলি সহায়তা করিবে। এ বিষয়ে মেদিনীপুরের সহৃদয় ইতিহাসানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি।

এই সকল ঐতিহাসিক উপকরণ ইতিহাস গঠনে কিরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে এই প্রসঙ্গে আমি সংক্ষেপে ইতিহাসলোচনার কথা কিছু বলিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটা কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা দুইজন প্রতিভাশালী সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিককে হারাইয়াছি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ও মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ইঁহারা দুইজনে স্বনামধন্য। ইঁহাদের অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। এই সময় কয়জন প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ প্রতীচ্য পণ্ডিতেরও মৃত্যু হইয়াছে। আপনাদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত সেই সমস্ত জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতদেরও নাম এখানে না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে মনে করি। অধ্যাপক সেস্, মেস্পেরো, ক্লিট, ভিন্সেণ্ট স্মিথ, ভেনিস, কিড্, হোর্ণ্লে, এগ্‌গেলিঙ, কার্ণ এই সকল মৃত মহাত্মাদের সকলেই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

চারি দিকেই ইতিহাস আলোচনার একটা প্রকাণ্ড সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইতিহাস-বিজ্ঞানে একটা মস্ত ওলট্-পালট হইয়া গিয়াছে। শত বর্ষ পূর্ব্বে যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, আজ তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। মিসর, আসিরিয়া, কালডিয়া, বাবিলোনিয়া, চীন, মধ্য এসিয়া ও পারস্য দেশ যে সমস্ত লুপ্ত রত্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিল, অদম্য অধ্যবসায়শীল পণ্ডিতগণের চেষ্টায় সম্প্রতি তাহাদের কয়েকটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিহাসপাঠকদের মধ্যে অনেকে জানেন, প্রায় সার্দ্ধ সাত শত বৎসর পূর্ব্বে রাব্বি বেঞ্জামিন, বাবিলন ও নিনেভের ভগ্নাবশেষের কথা বলিয়া যাইবার পর হইতেই এই সকল

স্থানের লুপ্ত গৌরবের দিকে লোকে আকৃষ্ট হয়। ফলে ১৬শ শতকের শেষভাগ হইতে অনুসন্ধানের বিশেষ চেষ্টা হয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি। Sir Gardner Wilkinson এর কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রাচীন মিসরের সামাজিক আচারপদ্ধতি আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। অধ্যাপক Lepsius, প্রুসীয় Exploring Expeditionএর অধিনায়ক হইয়া সুডানে মিসর-প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন; এবং সেই দেশের ইতিহাস সঙ্কলনোপযোগী উপাদানসমূহ বার্লিনে লইয়া গিয়াছেন। তার পর Mariette মাটি খুঁড়িয়া Lepsiusএর কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করেন। অতঃপর Cairo Museum স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে আসিরিয়া ও বাবিলোনিয়ার প্রাচীন সভ্যতা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়াও অনুসন্ধান চলিতেছে। ফরাসী বোতা (P. E. Botta) ও ইংরেজ লেয়ার্ড (Layard) অকাড-রাজ সারগন ও সেনাখেরিব (Sennacherib) ও অন্যান্য অজ্ঞাতপূর্ব্ব বহু আসিরীয় রাজাদের প্রাসাদাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন। মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বাবিলোনিয়ার কয়েকটী প্রাচীন নগরের অস্তিত্বও জানা গিয়াছে। সেগুলি ইউরোপ ও আমেরিকায় সংরক্ষিত আছে। বাবিলন-মন্দিরগুলির গঠন প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহাও মন্দিরনির্ম্মাণকারী বাবিলন ও আসিরীয় রাজগণের লিপি হইতে জানা যায়। সম্প্রতি নিপ্পুর, বাবিলন ও আশুরে কয়েকখানি "ground plan" মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রত্নানুসন্ধান-ফলে আর্য্য ককেসীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হিটাইট্ নামক জাতির সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই হিটাইট জাতিদ্বারা মিতান্নিগণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। খৃষ্ট জন্মের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে এসিয়া মাইনরে মিতান্নিজাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। হিটাইটদের রাজার অনুগ্রহে বোগাজকোই-এর (Boghas-Kyoi) সন্ধিসূত্রে মিতান্নিরাজ দশরত্তপুত্র মত্তিউজ (Mattiuza) পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। অল্পদিনের মধ্যে প্রভাবশালী হিটাইট জাতি মিতান্নিরাজ্যকে আপনাদের রাজ্যের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিটাইটগণ এসিয়ামাইনরের উত্তর-পূর্ব্বে কাপ্পাডোকিয়ার (Cappadocia) আসিয়া উপস্থিত হন। ইঁহারা আসিরীয়দিগের নিকট "খত্তি" এবং মিসরবাসীদিগের নিকট "খেত" নামে পরিচিত ছিলেন। কালের প্রভাবে এই জাতির অধঃপতন ঘটে। আর্য্যজাতির আর এক শাখা আসিয়া ইঁহাদের হৃত রাজ্য অধিকার করে। কয়েকজন পণ্ডিত সম্প্রতি ইহাদের ভাষা পাঠ করিয়াছেন। মুগোজিন নামক একজন হঙ্গেরীয় পণ্ডিত ইঁহাদের এ পর্য্যন্ত দুর্ব্বোধ্য লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছে। বোগজকোই-এর গিরিস্থাপত্যে হিটাইটদের শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত স্মৃতিফলকগুলিতে কিছুদিন পূর্ব্বে (Mi-it-ra-as-si-il, U-ru w-ra-as-si-el, Inda-ra, Na-sa-at--it ia-an-na অর্থাৎ মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য, এই চারিটী দেবতার নাম পাওয়া গিয়াছিল। এখন আবারবিষ্ণু, শিব প্রভৃতির মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার শ্রদ্ধেয় প্রত্নত্ত্ববিদ্ বন্ধু শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সংবাদ দিয়াছেন। এ সমস্ত বিষয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিলে হিটাইটদের সঙ্গে খৃষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতীয় আর্য্যদের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহা বাহির হইয়া পড়িবে।

মধ্য-এশিয়ায় সার অরেল ষ্টাইনের নেতৃত্বে প্রাচীন কীর্ত্তির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক বৌদ্ধ-মূর্ত্তি, ইষ্টক, খরোষ্ঠী, ব্রাহ্মী, গুপ্তব্রাহ্মী প্রভৃতি বহু ভাষায় অক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্য-এসিয়া এক সময়ে গ্রীক, পারস্য ভারত ও চীনপ্রজাদের মিলনক্ষেত্র ছিল। আমরা এখন মহামতি ষ্টাইনের আবিষ্কারের ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, শিল্প ও ধর্ম্মব্যাপারে মধ্য-এসিয়ার উপর ভারতের প্রবল প্রভাব বহু দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। এই স্থানের ভাষা ও শাসনব্যাপারে কিছু কাল ভারত প্রভাবের প্রতাপ বড় কম ছিল না। মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্বে ভারত যে তাহার এসিয়ার প্রতিবেশীদিগের উপর সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ষ্টাইনের 'প্রাচীন খোটান' ও 'সের ইণ্ডিয়া' তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ দিকে অক্লান্তকর্ম্মা Sven Hedin তিব্বত ও মানস-সরোবরের কত অজ্ঞাতপূর্ব্ব ব্যাপার আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া, ভারত-গৌরব-কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। রলিন্‌সন্, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, ফুশে, ফোগেলপ্রমুখ পণ্ডিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ৯০০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ হইতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতালোকে ভারতবহির্ভূত অনেক জাতি প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আবার স্যর চার্লস এলিয়ট্‌প্রমুখ পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে, ভারতবহির্ভূত জাতির উপর ভারতের প্রভাব বড় অল্প নয়। এক জাতি যদি অন্যের সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে পরস্পর প্রভাবান্বিত হওয়া অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ অপর জাতির উপর ভারতের প্রভাবের কথা এই সমস্ত পণ্ডিত কিছু কিছু বলিয়াছেন।

ভারতের একটা কলঙ্ক আছে—ভারতবাসী দেশ ছাড়িয়া যাইতে চায় না; কিন্তু ইঁহারা দেখাইতেছেন যে, ভারতবর্ষ সমুদ্র ও পর্ব্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসী সমুদ্র ও পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, দেশ-দেশান্তরে যাইত ও নানা স্থানে ভারতীয় প্রভাব বিস্তার করিত। প্রাচীন ভারতবাসী ভারতের বাহিরে, সুদূর অঞ্চলেও দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছে, সাম্রাজ্য-স্থাপন করিয়াছে, এবং ভাব ও ভাষার বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের প্রভাব—ভারতের উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতবাসী যে ভারতের বাহিরে রাজ্যবিজয়ে অনভ্যস্ত ছিল না, শ্রীবিজয়ের বিবরণ ও রাজেন্দ্রচোড়ের লিপি তাহার দৃষ্টান্ত। ভারতবাসী ভারতের বাহিরে রাজ্যবিস্তার করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাববিস্তারের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। যবদ্বীপ, কম্বোজ, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে এক সময় হিন্দুসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, এক সময়ে সুদূর বোর্ণিওদ্বীপেও হিন্দুর বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইত। যবদ্বীপ ও মলয় অঞ্চলে ইসলাম-প্রভাব প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া, হিন্দুপ্রভাবকে ম্লান করিয়াছে সত্য, কিন্তু যবদ্বীপে ভারতীয় বর্ণমালা এখনও বর্ত্তমান, ভারতীয় রীতিনীতি এখনও প্রচলিত। সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম কম্বোজ, চম্পা ও যবদ্বীপে যে ধর্ম্ম, শিল্প, লিপি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাও হিন্দুদের নিকট হইতে গৃহীত। আর তিব্বতের কথা বলিতে গেলেও ঠিক একই কথা বলিতে হয়। পদ্মসম্ভব তিব্বতীদের মহামান্য লামাগুরু। ইঁহার অপর নাম পদ্মাকর। ওয়াডেল্ বলেন, তিনি ৭৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় একশত পণ্ডিত লইয়া তিব্বতে গমন করেন। এই ভারতবাসী তিব্বতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও লামার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার

পূর্ব্বে রাজা স্রোঙ্‌সনের (Srong-btsan) সময় হইতে (৬৫০ খৃঃ) ভারতবর্ষ ও চীন হইতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মধ্যে মধ্যে তিব্বতে গমন করিত। পদ্মসম্ভবের তত্ত্বাবধানে তিব্বতের অন্তঃপাতী সম্‌-য়াস প্রদেশে ভারতীয় নালন্দমঠের আদর্শে তিব্বতের প্রথম মঠ নির্ম্মিত হয়। তিনি তাঁহার আত্মীয় শান্তরক্ষিতকে সেই মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ভারতীয় প্রভাব ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল—কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে তেমন করে নাই। চীন, জাপান, কোরিয়া, আসাম প্রভৃতি স্থানে চৈনিক ভাবেরই প্রাদুর্ভাব বেশী। শিল্প, নীতি সাহিত্য—সকলই চীনের। চীন ভাষার বর্ণমালা খাঁটি চীনা। কিন্তু চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতেরই সম্পত্তি।

ফরাসী পণ্ডিত ফুরনোরা তাঁহার "প্রাচীন শ্যাম" পুস্তকে বলিয়াছেন, পুরাতন লিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে, পুরাকালে পূর্ব্ব উপদ্বীপ ছয়টী রাজ্যে বিভক্ত ছিল,—(১) টনকিন উপসাগর হইতে লাওস অঞ্চল পর্য্যন্ত প্রদেশ যবন দেশ নামে অভিহিত ছিল; (২) চম্পাদেশ বর্ত্তমান আনাম; (৩) উত্তর পশ্চিম সরমদেশ; (৪) কম্বুজদেশ, ইহা এখনকার কাম্বোডিয়া, (৫) রমন্যদেশ ও (৬) মলয় উপদ্বীপ—এই ছয়টি দেশে অল্পবিস্তর ভারতীয় সভ্যতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। কাবাতন, ফিনো, এমেনিএর, ফর্গুসনপ্রমুখ পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত দেশের জাতিদিগের মধ্যে হিন্দু-সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ধর্ম্ম সমাজ ও শিল্পে এগুলি তাঁহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। যবদ্বীপেও যে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা স্থলপথ দিয়া নয়, জলপথ দিয়া।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোক-অনুশাসন ও গুহা মন্দিরস্থ লিপি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু কোন পণ্ডিতই এ সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বাক্‌ট্রীয়দিগের ভারত আক্রমণ ও পঞ্জাবে রাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে কয়েকজন পণ্ডিত মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এসম্বন্ধে মূল গ্রন্থ, লিপি ও মুদ্রার সাহায্যে বিশেষ সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া আলোচনা না করিলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

বাক্‌ট্রীয়দিগের পর শক-জাতি আসিয়া কাটিয়াবাড় ও মালবে ২০০ বৎসরেরও অধিককাল শাসন করে। ইহাদের সম্বন্ধে খুব ভাল করিয়া অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। শকদিগের পর উত্তর ভারতে কুষাণদের আগমন। ইহাদের দুইটি বংশ ছিল, কণিষ্ক শেষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মহাযান-সাহিত্যে ইঁহার নাম অধিক প্রসিদ্ধ। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাঁহাকে সাধারণতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ফেলিয়া থাকেন। কিন্তু রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার বিশেষরূপ বিচার করিয়া তাঁহাকে তৃতীয় শতকের প্রথম পদে ফেলিয়াছেন। তিনি মালব ও অন্যান্য স্থানে আবিষ্কৃত কুষাণলিপির অব্দ পরীক্ষা করিয়া ইহার প্রারম্ভ ১০০ খৃষ্টাব্দেই স্থির করিয়াছেন। তবে তাঁহার এই মত অন্যান্য পণ্ডিতেরা মানিতে চান না। কণিষ্কের সময় সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক তার পর গুপ্তদের সময়ে কুষাণ, কাঠিয়াবাড় ও মালবের শকেরা হতবল হইয়া পড়ে। আর বিদেশীয়েরা ভারতে প্রবেশ করিতে থাকে। আভীরগণ দলে দলে আসিয়া হিন্দু হইয়া যায় এবং ভারতীয়দের শাখা বলিয়াই চলিয়া যায়। নাসিকে আভীরের একখানি লিপি দেখিয়া স্যর ভাণ্ডারকার বলেন, তাহারা মহারাষ্ট্র দেশে, সম্ভবতঃ খান্দেশে রাজত্ব করিত। গুর্জ্জরগণও বাহিরের জাতি—পঞ্জাবের

পথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া রাজপুতনায় তাহারা রাজ্য স্থাপন করে। সেখান হইতে কনৌজ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত করে। এইরূপ জাতিদের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আলোচনা হয় নাই। রাজপুতদেরও দুই একটা শাখা বাহির হইতে আসিয়াছে। ধারা ও উজ্জয়িনীর পরমার-বংশের বিবরণ এখনও ভাল করিয়া আলোচনা করা হয় নাই। ইহাদের অনেক উপাদান আছে। যৌধেয়দের সম্বন্ধে ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার অনেকগুলি নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। এই সমস্ত প্রত্নতত্ত্বালোচনা যাহা কিছু করা হইয়াছে, প্রধানতঃ মুদ্রা ও লিপির সাহায্যেই হইয়াছে।

সম্প্রতি মুদ্রা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করিবার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে। অনুবীক্ষণ সাহায্যে মুদ্রার ছায়াচিত্র গ্রহণ করিয়া কেহই এপর্য্যন্ত মুদ্রার লিপি অনুশীলন করেন নাই। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনুবীক্ষণ সাহায্যে অস্পষ্ট মুদ্রালিপি ও মুদ্রার অঙ্কিত মূর্ত্তি প্রভৃতির অনুশীলন করিয়া মুদ্রার নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। গার্ডনার একটি মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পুরু একটী হস্তীর উপর আসীন রহিয়াছেন ও আলেকসন্দর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হস্তে বল্লম লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় উহার ছায়াচিত্র অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিয়া বলিতেছেন যে, হস্তীর উপর আসীন যোদ্ধা অশ্বারোহী ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। এই একটি ঘটনা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, এই সব প্রণালীতে মুদ্রার ছায়াচিত্র গ্রহণ করিলে হয়ত মুদ্রাতত্ত্বের ইতিহাসে অনেক বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণে মুদ্রাতত্ত্ব ও লিপিতত্ত্বের উপযোগিতা কত বেশী তাহা প্রত্যেক ইতিহাস অনুশীলনকারীই অবগত আছেন।

মুদ্রা বা লিপি হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে মুদ্রা বা লিপি জাল কি না, অথবা কোন আমুক কর্ত্তৃক আরেষ্টাইনের ন্যায় পরীক্ষক প্রতারিত হইতেছেন কি না। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সঙ্কণিকা।

বৎসরের প্রথমে সর্ব্বাগ্রে বিশ্ববিধাতাকে স্মরণ করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে প্রণাম করি। তাঁহার অপার করুণায় নব্যভারত অশেষ বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করিয়া চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিতেছে।

ইহার প্রতিষ্ঠাতা, যিনি ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন, আজ তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তাঁহার অবর্ত্তমানে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র, যিনি ইহাকে নানা ভাবে সুসজ্জিত করিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

ইহার উন্নতিকামী কত সহৃদয় মহাপ্রাণ ব্যক্তিও ইহার উন্নতি ও সৌষ্ঠব সাধনার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে কত সাহায্য ও উপদেশে ইহাকে কৃতার্থ ও অশেষ উপকৃত করিয়াছেন। আজ সে সকল স্মরণ করিয়া হৃদয় তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা ভারে অবনত হইতেছে।

গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গের স্নেহ ও সহানুভূতি সিঞ্চনে নব্যভারত তাহার সেবাব্রত উদ্‌যাপনের চেষ্টায় অনেক সাহায্য পাইয়াছে। তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এত সব স্নেহ ও সাহায্য না পাইলে নব্যভারত এই দুর্দ্দিনে ইহার জীবনরক্ষা হয়তো সম্ভব হইত না। তাই সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে এই সব স্নেহ দয়া সহানুভূতি ও সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইব না এই আশায় বুক বাঁধিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি।

প্রেসআইন সংশোধন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বাধীনতাপ্রয়াসী কতকগুলি বিপ্লববাদী কাগজের প্রকাশ বন্ধকরিবার জন্য ১৯০৮সালে নিউজপেপারএক্ট হয়। এবং তার পর ১৯১০সালে লর্ড সিংহ যখন ল মেম্বর ছিলেন তখন দেশবাসী সকলের বিশেষ আপত্তি থাকা সত্বেও প্রেস আইন পাশ হয়। স্বাধীনমতের প্রচার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই ইহার উৎপত্তি। দেশের প্রচলিত আইনে কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতে পাইলে সরকার পক্ষ বোধহয় এইরূপ অভূতপূর্ব্ব ও অ-সাধারণ আইনের সৃজন করিয়া দেশব্যাপী একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে দিতেন না। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনের সহিত বুঝিতে গিয়া কর্ম্মচারীরা দেখিতে পাইলেন যে ভারতীয় পেনাল কোডের মধ্যেই এমন সকল ধারা আছে যাহাদ্বারা প্রেস সম্পর্কীয় এই সব আইন না থাকিলেও সহজে মুখ বন্ধ করা যায়। প্রকাশ্য ভাবে দমন নীতি তুলিয়া দিলে প্রজাসাধারণ খানিকটা সন্তুষ্ট হয় অথচ পেনাল কোডের এই নব প্রয়োগে পত্রিকার মুখ ও বন্ধ হইয়া যায়। তাই প্রেস আইন তুলিয়া দেওয়া সহজ হইয়াছে।

প্রেস আইন উঠিয়া গেল। ইহার ভাল দিক এই যে কোন পত্রিকায় বিদ্রোহজনক অশান্তিকর অথবা জাতিবিদ্বেষমূলক কথা প্রকাশিত হইলে তাহার জন্য মুদ্রাকর দায়ী হইবে না ও মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত হইবেনা। এবং সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য টাকা জমা দিতে হইবেনা। লেখা অপরাধজনক সাব্যস্ত হইলে তাহার জন্য লেখক ও সম্পাদকই দায়ী। সেজন্য ব্যবসায়ী মুদ্রাকরের দণ্ড হওয়া উচিত নহে। আইনে একটী নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে যে সম্পাদকের নাম প্রতিসংখ্যায় প্রকাশ করিতেই হইবে। সম্পাদকের নাম প্রকাশ করা সভ্যজগতের সাধারণ প্রথা নহে। বিলাতে অনেক কাগজ আছে যাহার সম্পাদক কে জানা থাকিলেও কাগজে সম্পাদকের নাম প্রকাশিত হয় না। ইহার নানা সঙ্গত কারণ আছে। এই ব্যবস্থাটী না হইলেই ভাল হইত। আর একটী নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে পুরাতন প্রেস আইন তোলা বা না তোলা, স্বাধীন মত প্রচারের পক্ষে সমান হইয়াছে। বরং ক্ষতি বেশী হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। নিয়মটী এই যে, সন্দেহ হইলে এতদর্থে মনোনীত ক্ষমতাপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার যে কোন কাগজকে যে কোন সময় যথাস্থানে প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। ইহাতে নানা রকম অসুবিধা হইবে। সাধারণতঃ পোষ্টমাষ্টার কি এমনই আইন বিশারদ যে তাঁহার সিদ্ধান্তটী শেষ বিচার বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? আইন আদালতে

ব্যবহার-জীবের সাহায্য লইয়াও যাহার বিচার দুরূহ হইয়া পড়ে সহরতলীর বা গ্রামের পোষ্টমাষ্টার তাহার বিচার সুসম্পন্ন করিবেন কিরূপে? ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ এরূপ ব্যবস্থার অনুমোদন কিরূপে করিলেন? আমরা এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।

* * *

দিল্লীতে যে সময় প্রেস এক্ট উঠিয়া যাইবার আলোচনা হইতেছিল প্রায় সেই সময়ই শ্রীহট্ট জেলার "জনশক্তি" পত্রিকার প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। শ্রীহট্টের পাঁচজন সুপ্রসিদ্ধ জননায়কের স্বাক্ষর সম্বলিত একটী আবেদন পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন "দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার অবিচার কাহিনী নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করাই জনশক্তির মুখ বন্ধের প্রধান কারণ"। কাগজ খানিকে রক্ষা করিবার জন্ম তাঁহারা সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন। মফঃস্বলে এইরূপ কাগজের প্রচার বন্ধ হইলে মফঃস্বলবাসীদের অনেক অসুবিধা ও ক্ষতি হয়। 'জনশক্তি' দক্ষতার সহিত দেশের ও দশের সেবা করিয়া আসিতেছিল। তাহাকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য। সাহায্যের টাকাকড়ি, সেক্রেটারী "দি সিলেট প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোম্পানী" শ্রীহট্ট এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

যে সময় গবর্ণমেন্ট প্রেসআইন তুলিয়া দিতে সম্মত হইলেন ঠিক সেই সময় এই প্রেসটী বাজেয়াপ্ত করা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। গবর্ণমেন্ট ইহা প্রত্যাহার করিলে ভাল হয়।

* * * * * *

গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে রেলের উন্নতির চেষ্টা করিবেন। তাহা করিতে গেলে দেড়শত কোটী টাকারও অধিক খরচ পড়িবে। এই উন্নতির সম্পর্কে ভারতগবর্ণমেণ্ট যেরূপ খরচ করিতে ইচ্ছুক তেমন অর্থ তাঁহাদের তহবিলে নাই। কাজেই তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে এই টাকা ধার করিবেন। পার্লামেণ্ট মহাসভায় সেদিন এ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে এই টাকা ইংলণ্ডের মহাজনদের নিকট হইতে ধার করা হইবে। অবশ্য টাকার সুদ এবং আসল অন্নবস্ত্রহীন ভারতবাসীদেরই যে জোগাইতে হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য। টাকাটা ভারতবর্ষের মহাজনদের নিকট হইতে ধার করা হইলে, সুদটা ভারতবাসীরাই পাইত কিম্বা যদি ভারতবর্ষের মহাজনেরা এই টাকা যোগাইতে না পারে, তাহা হইলে মার্কিন কিম্বা ইউরোপের অন্য কোন দেশ হইতে ইংলণ্ডের মহাজনদিগকে যে সুদ দিতে হইবে তাহা অপেক্ষা কম সুদে টাকা ধার করিবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু চেষ্টা হইবে কি না বলিতে পারি না। ইংলণ্ড টাকার সুদ তো ভোগ করিবেই উপরন্তু সেখান হইতে এই সম্পর্কে মালও কেনা হইবে। ভারতে এই রেলের উন্নতির সম্পর্কে ইংলণ্ড যে কতখানি লাভবান হইবেন পাঠক তাহা হিসাব করিয়া দেখিবেন।

* * * *

গত ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে রেলবিভাগের মালের মাশুল বাড়িয়াছে। মালের মাশুল এমনভাবে বাড়ান হইয়াছে যাহাতে বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশী মালের প্রতিযোগিতায় দেশীয়

শিল্পের প্রসার হওয়া শক্ত। প্রথমতঃ দেশীয় মিলে তৈয়ারী সুতার কথা ধরা যাউক। দেশীয় মিলে প্রস্তুত সুতা এবং বিদেশীয় বস্ত্রের একই মাশুল ধরা হইয়াছে। অথচ দেশীয় সুতার মূল্য বিদেশী বস্ত্র অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু দেশীয় সুতার মূল্য কম হইলেও এই নূতন মাশুল দিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করিতে তাহার মূল্য অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং সেই সুতাকে বস্ত্রে পরিণত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবার উপযোগী করিতে হইলে তাহার গড়পরতা মূল্য বিদেশী বস্ত্রের সহিত সমান অথবা বেশী হইয়া পড়িবে। এ ক্ষেত্রে বিদেশীয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় বস্ত্রশিল্প বাঁচিতে পারে না। যদি একটিমাত্র উপায় আছে সমস্ত দেশবাসী প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে যে দেশীয় বস্ত্র ছাড়া ব্যবহার করিব না। কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশবাসী তাহা রক্ষা করিতে পারিবে কিনা তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

দেশীয় গুড় ও বিদেশ হইতে আনীত চিনি সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অর্থাৎ গুড় আনাইয়া চিনি করিতে হইলে বিদেশ হইতে আনীত চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় তাহা দাঁড়াইতে পারিবে না। অন্যদিকে আটা ময়দা নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের মাশুল চড়াইয়া দিয়া গমের মাশুল কম রাখা হইয়াছে। আটা ময়দা বিদেশে রপ্তানি হয় না। গম বিদেশে রপ্তানি হয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এইজন্যই গমের মাশুল কম রাখা হইয়াছে। রেলবিভাগকে এইভাবে শাসন করা দেশীয় শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত ও বিদেশীয় শিল্পের প্রসারের সুবিধা হইতেছে। ইহাতে রেলবিভাগে শিল্পের দিক দিয়া আমাদের এই উপকার হইয়াছে। ইহার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আরো কতরূপ উপকার হইবে ভাবিলে শঙ্কা হয়।

*   *   *   *   *

মহাত্মা গান্ধী কারাগার হইতে তাঁহার যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা এক কথায় বলিতে গেলে—খদ্দর—যাহাতে খদ্দর প্রস্তুত ও তাহার বহুল প্রচার হয়, ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন বৃদ্ধি হয় ও অসহযোগ আন্দোলন অহিংসভাবে চলিতে থাকে দেশবাসী যেন বিশেষ ভাবে এ চেষ্টা করেন। তাঁহার উপযুক্ত সহধর্মিণী শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধী তাঁহার এই বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানেও তাঁহার নীতি ও ইচ্ছা অক্ষুন্নভাবে প্রতিপালিত হইতেছে জানিতে পারিলে কারাদণ্ড বহন করা তাঁহার পক্ষে দুঃখজনক হইবে না। কেন না তিনি বলিয়াছেন যে মুক্তি পাইলে ও তিনি আবার ইহাই করিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত।

তাঁহার চরকার আহ্বান বৃথা হয় নাই। চট্টগ্রামের অন্তর্গত চাকারিয়া প্রায় গ্রামে ১৫০০ শত মহিলা মিলিয়া তাঁত ও চরকার একটী প্রকাণ্ড কারখানা খুলিয়াছেন। যতদূর জানা গিয়াছে ইহা কেবলমাত্র মহিলাদিগের দ্বারা পরিচালিত। এ উদ্যম বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। দেশে দেশে এরূপ আরও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হউক।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় চরকা প্রচলনের জন্য যেরূপ অক্লান্ত উদ্যমে দেশের সেবায় আপন শক্তি নিয়োজিত করিয়া আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা প্রত্যেকের অনুকরণীয়। অনেকের মতন তাঁহারও পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে চরকা দ্বারা এ দেশের সুতার অভাব পূর্ণ হইবে না। কিন্তু তাঁহার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি চরকার প্রচারের জন্য কত বক্তৃতা করিতেছেন, প্রবন্ধ লিখিতেছেন। চরকা প্রতি গৃহের শিল্প ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ হইলে সুতার প্রশ্ন নিবারিত হইতে পারে। পূর্ব্বে এই চরকা হইতেই সূক্ষ্ম মসলিন ভারতের শিল্পগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল এবং সুদূর বিদেশ ইউরোপেও ইহার বিশেষ আদর ছিল। চরকাপ্রচলনে অনেক দরিদ্রের অন্নের সংস্থান হইবে। সাধারণতঃ আমাদের দেশের দরিদ্র পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির প্রতিদিনের আয় গড়ে এক আনা করিয়া। কিন্তু শোনা গিয়াছে যে ইচ্ছা করিলে একজন লোক চরকা দ্বারা ⁄১০ হইতে ৵০ পর্য্যন্ত আয় করিতে পারে। ইহাতে বিশেষ সুবিধার

কথা এই যে চরকা বাড়ীর ছোট ছোট বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই চালাইতে পারে। ইহা শ্রমসাধ্য বা কঠিন কাজ নহে। চাষীদের চাষের ঋতু ভিন্ন অন্য সময় বিশেষ কিছু কাজ থাকে না তখন তাহারা ও একাজ করিতে পারে, মেয়েরা ত সব সময়ই করিতে পারে। আন্তরিকতার সহিত সকলে মিলিয়া লাগিলে আবার যে বস্ত্রশিল্পের সেই দিন ফিরিয়া আসিবেনা কে বলিতে পারে? ক্ষুদ্র হইলে ও প্রতিদিনের নিষ্ঠাসহ সেবায় কমলা প্রসন্না হইয়া থাকেন।

মহাত্মার কারাদণ্ডের পর তাঁহার অবর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় চরকা ও খদ্দর প্রচারের কাজ গ্রহণ করিয়াছেন। গান্ধির অভাব পূর্ণ হইবার নহে কিন্তু তাঁহার পরিত্যক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তি দেখিয়া আমাদের হৃদয় আশান্বিত হইয়াছে।

* * *

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর চিরবিবাদ বলিয়া এ দেশে একটা প্রবাদ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কথাটা সত্যে গিয়া দাঁড়াইল দেখা যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত দুই বৎসর যাবৎ যে অবস্থা চলিতেছে তাহাতে ইহার জীবন সংশয় হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শোনা যায় পাঁচ লক্ষেরও অধিক টাকা ইহার ঋণ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশায় ইহার পরিচালকবর্গ ঋণ করিয়াই খরচ চালাইতেছিলেন। কিন্তু এবারকার বজেটে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখান নাই। ব্যয়বাহুল্য ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি না দেখাইবারজন্য কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় নাই। যে ব্যয়বাহুল্য তাঁহাদের বিরাগের কারণ—সেই ব্যয়বাহুল্য তাঁহাদের শাসনপ্রণালীর প্রতি বিভাগে রহিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ আয়ের ক্ষতি হইয়াছে সেইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের ক্ষতিও বড় কম হয় নাই। গত কয়েক বৎসরের ভিতর পাটনা, রেঙ্গুন, ঢাকাতে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হওয়াতে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে নানা গলদ আছে বলিয়া শোনা যায়। তাহা সত্ত্বেও ইহা যে দেশে কোনই কাজ করে নাই একেবারে একথাটা বলা যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রণালীতে হয়ত অনেক অপচয় হইতেছে, খরচ যে বেশী হইতেছে সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নাই—এ সকলই স্বীকার করিয়া লইয়াও ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়া ইহার সংশোধনের চেষ্টা করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। তবে তাঁহাদের ও হিসাবটা দিয়া দেওয়াই বোধ হয় ভাল এবং ব্যয় বাহুল্য কমাইয়া চলাই প্রশস্ত পথ বলিয়া মনে হয়। একটী জিনিষ তৈয়ার করিতে গেলে নানা ভুল ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। যখন সেই সব ধরা পড়িয়াছে, তখন যাহাতে ইহা ভ্রম প্রমাদশূন্য হইতে পারে তাহার বিধিমত চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য কি করিলে তাহা হইতে পারে তাহার উপায় স্থির করা দেশের মনীষীবর্গের হাতে। ইহাকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিয়া, ব্যয় বাহুল্য কমাইয়া দিয়া, শিক্ষাপ্রণালী সংস্কৃত করিয়া নেওয়া উচিত। কিন্তু ইহার আশু বিপদ হইতে রক্ষা না করিতে পারিলে দেশের শিক্ষার একটী উপায় যে বন্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই বলিলেই চলে। কাজে কাজেই যাহা আছে তাহাকে একবারে নষ্ট হইতে দেওয়া সঙ্গত নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানারূপ ত্রুটির কথা শোনা যায়। প্রায় প্রতি বৎসরই প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রে ও কিছু না কিছু ভুল থাকে। এবার ইংরাজীর প্রথম প্রশ্ন পত্রে বাংলা প্রশ্ন পত্রে (compulsory) ও মেয়েদের সংস্কৃতের বদলে বাংলা প্রশ্ন পত্রেও অনেক ভুল রহিয়াছে। পত্রে এত ভুল রহিয়াছে যে অনেক স্থলে তাহার কোন অর্থ বোধই হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইয়া সাধারণতঃই বালকগণ একটু ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে।

তাহার উপর প্রশ্ন পত্রে ভুল থাকিলে তাহারা আরও বিপন্ন হয়। প্রশ্ন পত্রে ভুল থাকিতে পারে ইহা অনেক বালক মনেই করিতে পারে না। বাংলা প্রশ্ন পত্রগুলিতে যথেষ্ট ভুল রহিয়াছে। বাংলা প্রশ্ন পত্রে ভুল সংশোধন করিবার জন্য যাহা দেওয়া হইয়াছে পাঠকবর্গ দেখিবেন তাহার কোন অর্থ বোঝা যায় কি না ও ইহা কিরূপ ভুল সংশোধনের পরীক্ষা। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"তিনি বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু টমাস যুদ্ধে আহত হইয়া আসিয়াছেন, মস্তকে আঘাত লাগাতে তাঁহার ধৃতি শক্তি একেবারে ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। এই জাই যেন ভয়ানক যুদ্ধ শগ্রি শেষ হইবে। যদিও সে আমার প্রতি বিরক্ত কিন্তু সে আমার কোন অনিষ্টাচরন করে না। আমার জ্বর হইয়া চটাচিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ স্থানের আবহাওয়ায় আমাদের সাস্থন্নোতি হইল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

প্রায়ই শোনা যায় কিছু না কিছু প্রশ্ন পরীক্ষার পূর্ব্বেই কাহারো কাহারো ভিতর জানাজানি হইয়া থাকে। এবারও কোন কোন প্রশ্ন পরীক্ষার পূর্ব্বেই অনেকে জানিতে পারিয়াছিল বলিয়া গুজব। ইহাতে মনে হয় যেরূপেই হউক প্রশ্ন পত্রের সহিত যাহাদের সহিত সম্পর্ক আছে তাহাদেরই কাহারও না কাহারও ত্রুটিতে ইহা বাহির হইয়া পড়ে। যাহাদের দায়িত্ব বোধ দেখিয়া ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গঠন করিবে তাঁহাদের এই সমস্ত ত্রুটিতে ছাত্রগণের কোমল মনে ক্ষতির বীজ কত গভীর ভাবে অঙ্কুরিত হইতে পারে তাহা ভাবা যায় না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আজকাল লোকে দিন দিন শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এইসব নানা ঘটনা দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিকে শিথিল করিয়া ফেলিতেছে।

* * * * *

বাঙ্গালার নূতন লাট লর্ড লিটন আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছি। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় যেদিন প্রথম গিয়াছিলেন—গিয়াই ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক নামঞ্জুর দুইটী প্রস্তাবের নামঞ্জুরী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আসিয়া দুই দিন না যাইতেই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করাতে বোঝা যাইতেছে বাতাসের গতি কোন দিকে। দুই দিন যাইতে না যাইতেই তিনি কি সমস্ত ব্যাপার এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন যে তিনি ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া দিলেন? এ পর্য্যন্ত ত এ দেশে বা ভারতের অন্য কোন প্রদেশে শাসনসংস্কার আইনপ্রদত্ত সার্টিফিকেট করিবার এই বিশেষ ক্ষমতা কোন গবর্ণর ব্যবহার করেন নাই। একটা ভোটে যে ব্যবস্থা পাস হইয়াছে তাহাকে তিনি তুচ্ছ বলিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয় কিন্তু যেখানে ভোট গণনার ব্যাপার সেখানে একটী ভোট ত তুচ্ছ ব্যাপার নয় বিশেষতঃ যেখানে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের লোক অধিক হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। আর তাহা ছাড়া তিনি নারীহিতৈষী বলিয়া এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে বিলাতের ২৭টী নারীসভার প্রতিনিধি হইতে অভিনন্দন পাইয়া আসিয়াছেন। ইহাতে মনে হইয়াছিল তিনি নারী নিগ্রহের পক্ষপাতী হইবেন না। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়,—এদেশে তাঁহার নারী হিতৈষণা না টিঁকিতেও পারে।

চাউলের রপ্তানি—এই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণ-কল্পে চাউলের রপ্তানি বন্ধ হইয়াছিল। এই অগ্নি মূল্যের দিনে দেশে চাউলের মূল্য কম হওয়াতে দেশের দরিদ্র-লোক দুবেলা খাইতে পাইবে আশা করিয়াছিল। কিন্তু কতগুলি চাউল ব্যবসায়ীর স্বার্থের হানি হওয়াতে তাহাদের চেষ্টায় চাউলের রপ্তানির প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে। রপ্তানির প্রচলনের আদেশ হইবার দশ দিনের মধ্যেই ২৪ পরগণার প্রসিদ্ধ চাউলের বাজার মগরাহাটে মণকরা ১৲ টাকা করিয়া চাউলের দাম, বাড়িয়া গিয়াছে। শীঘ্র আরও বৃদ্ধি পাইবে এমনও আশঙ্কা রহিয়াছে। দেশবাসী সকলের অন্ন সঙ্কুলান হইয়া অধিক

চাউল জন্মাইলে হিসাব করিয়া সেই টুকুই রপ্তানির জন্য দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু চাউলের অবাধ রপ্তানি হইতে দেওয়া এ দরিদ্র দেশে কিছুতেই চলিতে পারে না। দরিদ্র সাধারণের পক্ষ হইতে ইহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

* * * * *

এই ব্যাপারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যে মূল্য কতটুকু তাহা আরও বুঝা যায়। ভারতীয় বজেটে আয়ের অধিক যে ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা পূরণের জন্য অনেকগুলি নূতন কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ডাকমাশুল বৃদ্ধি একটী। ডাকবিভাগের মূল্য বৃদ্ধি—আগামী ২৪শে এপ্রেল হইতে ডাকবিভাগের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পোষ্টকার্ড ১০ টিকিট /০ (২॥০ তোলা পর্য্যন্ত) হইয়াছে। ইহার মধ্যে ডাকমাশুল বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ীদের ও খবরের কাগজও বইএর প্রচারের বিশেষ ক্ষতি হইবে। আজকাল ভিঃ পিতে বই বা পত্রিকা পাঠাইতে হইলে রেজেষ্ট্রী না করিয়া পাঠান যায় না। ইহাতে খরচ অনেক বেশী পড়ে। বই ও খবরের কাগজ মানুষের জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করে। ডাক মাশুলের এই বৃদ্ধিতে নানা রূপ অসুবিধা হইবে। জাতীয় উন্নতির অনেক অন্তরায় হইবে।

নববর্ষে।

নব বর্ষ আসে, এ নব্যভারতে
কি দিব তাহারি ডালি!
অতীত ভারত, স্বপনের মত
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা থালি!
বাঁচে না কি স্মৃতি না যদি গো নিতি
ইন্ধন যোগাও তারে,
যদি সে মুরতি পূজার আরতি
নাহি পায় বারে বারে!
ভাস্কর করে সুন্দর করে'
যতনে তুলিকা টানে,
বরণে রেখায় আলোক লেখায়
নূতন না করো আনি;
স্মৃতির স্বপন কে জানে গোপন
লুকান লতায় মূল,
আলোক লতার, ছায়া কোথা তার
কোথায় সুরভি ফুল!
হয় না ক মালা, পূজা পুষ্প ডালা
হয় না সাজানো তায়,
শুধু যে বাঁধনে হবে সে যতনে,
হিয়ার চেতনা হায়!
এই পর গাছা, সোণা মালা গাছা
যে তরুতে করে ভর,
সাজাবার ছলে, দেয় প্রাণ দলে'
করে তারে মর' মর'—

এ নব্য ভারত করে অবিরত
জাগিবার আরাধনা,
যে অনলশিখা সেই মন্ত্র লিখা
ম্লান আজি সে সাধনা!
অতীতের আজি কিরতন রাজি,
আছে আর গরবের?
গেছে জ্ঞান ধন, আছে আরাধন
তুচ্ছ অর্থ বিভবের!
আছে হিমাচল ভাগিরথী জল
অপার নীলাম্বু বটে,
শশঙ্কতপন তারা অগণন
অসীম আকাশ পটে,
নাই সেদিনের দেহের মনের
অজেয় অটুট বল,
শুধু ওষ্ঠাগত, আছে অবিরত
আজি বাঁচিবার ছল!
সে শব সাধনে কে গো আরাধনে
আসন নিরত হবে!
সর্ব্ব জয়ী বীর উচ্ছ্রিত শির
জীবনের এ আহবে!
তিল তিল করি বিঘ্ন অপসরি
সাধুক তরুণ প্রাণ,
করো মৃত্যুজিভা দিব্য-আশা-গাঁতা
এ নব্যভারতে দান।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ।

১

দ্বিতীয় সংখ্যার "শঙ্খে" শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদের সমালোচনা করিয়া এগুলিকে সমালোচনার যোগ্য মনে করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। সমালোচনা অর্থই সত্যাসত্য বিচার করা। অভিনিবেশ ব্যতীত বিচার হয় না। দুঃখ ত ইহাই যে বাঙ্গালী পাঠক এবং শ্রোতা এখন আর কোনও বিষয়ে অভিনিবেশ করেন না, বিচার ত দূরের কথা। লোকে যাহা পড়ে বা শুনে, সরাসরিভাবেই হয় তাহার বাহবা দেয় নয় নিন্দা করে। এ অবস্থায় যদি কোনও বিষয়ের সমালোচনার চেষ্টা হয়, তাহাও সুখের কথা, সন্দেহ নাই।

কিন্তু লেখকের সদুদ্দেশ্যকে ধন্যবাদ দিয়াও এ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তাঁহার সমালোচনাটী পরিষ্কার হয় নাই। কাহারও মতবাদের সমালোচনা করিতে বসিলে সকলের আগে সে মতবাদটা যে কি ইহা পরিষ্কার করিয়া ধরা এবং বলা প্রয়োজন হয়। আমার সমালোচক তাহা করেন নাই। সুতরাং যাঁদের আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে, তাঁরা এই সমালোচনাকে সরাসরিভাবে পাঠের অযোগ্য বলিয়া ফেলিয়া দিবেন। অন্য পক্ষে যাঁদের এই শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নাই তাঁরা ইহার বাহবা দিবেন। কোনও পক্ষই সত্যের সন্ধানে যাইবেন না।

আমার সমালোচক যাহা করেন নাই, আমি নিজেই তাহা করিব ভাবিয়াছি। অর্থাৎ আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ কি, তপশীল মাফিক তাহাই আমার সমালোচকদিগের নিকট নিবেদন করিতে চাই।

ক। আমি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাই; প্রথম যৌবন হইতেই চাহিয়া আসিয়াছি। স্বরাজ বলিতে আমি এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই বুঝি। স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী মহাশয় যে দিন আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় সাহিত্যে এই স্বরাজ শব্দের আমদানী করেন, সে দিন হইতে স্বরাজ বলিতে এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং এই স্বাধীনতার বহিরঙ্গরূপে একটা রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই বুঝিয়া আসিয়াছি।

খ। এই স্বরাজ শব্দে "স্ব" বলিতে আমি সর্ব্বদাই ভারতবর্ষের সমষ্টিগত মানবসমাজকে বুঝিয়া আসিয়াছি। এদেশের বহু জাতি ও বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়কে কল্পনাতেও ভারতের এই বিরাট "স্ব"এর স্থান বা অধিকার প্রদান করি নাই। সোজা কথায় বলিতে গেলে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক নরনারী যতদিন নিজেরা

নিজেদের শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা-সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিবার যথাযোগ্য অধিকার ও অবসর না পাইবে, ততদিন ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে না; চিরদিন আমি ইহাই ভাবিয়াছি ও বলিয়াছি।

গ। পনর বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় দলের কেহ কেহ স্বরাজের নামে ভারতে একটা অনন্ত-প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিতেছিলেন। আমি ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছি। স্বরাজ-বলিতে আমি কোনও দিন হিন্দুরাজ বুঝি নাই। প্যান-ইস্‌লামবাদ অথবা সর্ব্ব-মোসলেম-সঙ্ঘের আদর্শ তখনও মাথা তুলিয়া উঠে নাই। মুসলমান নেতৃগণ তখন বর্ত্তমান ব্রিটিশ রাজকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। ইংরাজ দপ্তর-তন্ত্রের বা বুরোক্রসীর হাত ধরিয়াই তাঁহারা তখন ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার চেষ্টায় ছিলেন। সুতরাং স্বরাজের নামে এদেশে আবার যে একটা মোসলেম-রাজ—মোগল বা পাঠানরাজ—প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে,—ইহা তখন কেহই ভাবেন নাই; মুখে বলা ত দূরের কথা।

ঘ। স্বরাজ বলিতে চিরদিন আমি গণতন্ত্র শাসন-প্রণালী বুঝিয়া ও বুঝাইয়া আসিয়াছি। ইংরাজীতে ইহাকেই Democracy বলে। যে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপরে কোনও ব্যক্তির বা সম্প্রদায়-বিশেষের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে গণতন্ত্র বলা যায় না। বর্ত্তমানে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ নিজেদের বুদ্ধি, বিবেচনা বা খেয়াল মাফিক আমাদের রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র চালাইতেছেন। ইংরাজ রাজপুরুষেরা সরিয়া গিয়া যদি একদল দেশীয় রাজকর্ম্মচারীই এই রাষ্ট্রযন্ত্রের যন্ত্রেশ্বর হইয়া বসেন, তাহাতে কেবল ইংরাজ-রাজেরই অবসান হইবে, আমি যাহাকে স্বরাজ বলিয়া চিরদিন বুঝিয়া আসিয়াছি, তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে না। ইংরাজের মন্ত্রীসমাজ বা প্রজা-প্রতিনিধি সভা কিম্বা ব্রিটিশ সম্রাটের সঙ্গে একেবারে কাটান ছাড়ান হইলেও বর্ত্তমান ব্রিটিশ দপ্তর-তন্ত্রের পরিবর্ত্তে একটা দেশীয় দপ্তর-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতে স্বরাজলাভ হইবে না। এ কথা নানা ভাবে ও নানা ভাষায় গত চল্লিশ বৎসর কাল প্রচার করিয়া আসিয়াছি।

ঙ। আমি সেই স্বরাজ চাহি যে স্বরাজের অধীনে ধনী-নির্ধন, জ্ঞানী-মূর্খ, স্ত্রী-পুরুষ, ভারতের প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক প্রজামাত্রেই, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নিজেদের শাসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিজেরা মিলিয়া করিবে; এ বিষয়ে সকলের সমান অধিকার থাকিবে। এইরূপে দেশের লোকমত বা বহুমতের দ্বারা দেশ শাসিত হইবে।

চ। আমি যে স্বরাজ চাহি, তাহার শাসন-যন্ত্র প্রত্যেক সভ্য সমাজের শাসন-যন্ত্রের মত দুইভাগে বিভক্ত থাকিবে। এক, ব্যবস্থা-বিভাগ, ইংরাজীতে যাহাকে Legislature কহে; দ্বিতীয়, কর্ম্মবিভাগ, ইংরাজীতে ইহাকে Executive কহে। ব্যবস্থাপকসভার সভ্যেরা সাধারণ প্রজামণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন, এবং প্রয়োজনমত নির্ব্বাচকেরা ইচ্ছা করিলে ইঁহাদের এ অধিকার কাড়িয়া লইতে পারিবেন। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকর্ত্তারা এই ব্যবস্থাপক সভার অধীন হইয়া রহিবেন। প্রয়োজনমত ব্যবস্থাপক সভা কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে পদচ্যুত বা স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের দুইটা বিভাগ; এক, সামরিক বিভাগ; ও অপর, দেশের সাধারণ শাসন-বিভাগ, ইংরাজীতে যাহাকে Civil বিভাগ কহে। রাষ্ট্রকর্ম্মের এই উভয় বিভাগের

উপরেই প্রজাসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপকসভার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে। ইহাই চিরদিন আমার নিকটে শাসনযন্ত্রের আদর্শ হইয়া আছে।

ছ। আমি ভারতে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাহি বটে; কিন্তু ভারত যখন স্বাধীন হইবে তখন দুনিয়ার অন্য কোনও জাতির সঙ্গে সে আপনার স্বাধীনতাকে পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়া সখ্যবদ্ধ বা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে না, এরূপ মনে করি না। আমার স্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে বাহিরের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। এ সংসারে সম্বন্ধ যেখানে সেখানেই একদিক দিয়া দেখিতে গেলে স্বাধীনতার কতকটা সঙ্কোচ হইয়া থাকে। আমি একাকী ঘর বাঁধিয়া বাস করিলে যতটা স্বাধীন থাকি, আর দশ জনের সঙ্গে মিলিয়া এক বাড়ীতে থাকিতে গেলে সে স্বাধীনতা আমার থাকে না, থাকিতেই পারে না। তখন আমার সঙ্গীদিগের মুখ চাহিয়া আমার ইচ্ছা, সুখ এবং স্বার্থকে সঙ্কুচিত করিতেই হয়। এক অর্থে যে একান্ত একাকীত্বের মধ্যে বাস করে সেই কেবল জগতে স্বাধীন। কিন্তু অন্য দিক দিয়া দেখিলে এই নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মধ্যে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না দশজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিলে তদপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা পাওয়া যায়। যেমন ব্যক্তি সম্বন্ধে, সেইরূপ জাতি সম্বন্ধেও। কোনও জাতি বা নেশন নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে থাকিলে তাহার আত্মরক্ষার জন্য যে পরিমাণে শক্তিক্ষয় করিতে হয় দু'পাঁচটা প্রতিবেশী মিত্ররাজ্যের সঙ্গে মিলিয়া থাকিলে সে পরিমাণ শক্তিক্ষয় করিতে হয় না। দশ জন ব্যক্তি একসঙ্গে থাকিলে পরস্পরের সাহায্যে সকলেই এমন অবসর পায়, যে অবসর একাকী থাকিলে কিছুতেই পাইত না। জাতি সম্বন্ধেও ইহা সত্য। আর অবসর স্বাধীনতার প্রধান বাহন। ব্যক্তির স্বাধীনতারও বাহন, জাতির স্বাধীনতারও বাহন। নিঃসঙ্গ একাকীত্বে যে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারা যায় তাহা সঙ্কীর্ণ এবং স্থির নহে। তার পর রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে দুনিয়াতে এখনও যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই আছে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রেষারেষি চলিয়াছে। কে কাহাকে টানিয়া নীচু করিবে এবং তাহার পতনের উপরে নিজের অভ্যুদয়ের প্রতিষ্ঠা করিবে, চারিদিকে ইহারই চেষ্টা হইতেছে। এ অবস্থায় জগতের যে জাতি স্বাধীনতার নামে নিঃসঙ্গত্বের অনুসরণ করিবে তাহার স্বাধীনতা লাভ বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। স্বাধীন হইয়া তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য এত ব্যস্ত থাকিতে হইবে যে সে কিছুতেই আত্মোন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারিবে না। এ অবস্থায় যে জাতি নিজের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আর পাঁচটা স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে সেই পূর্ণতর স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী হইবে। এই জন্য যদি আমার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ব্যাঘাত না হইয়া বর্ত্তমানে ইংরেজের এবং ব্রিটিশ উপনিবেশ সকলের সঙ্গে আমাদের যে যোগ আছে সে যোগ রক্ষা করিতে পারি তাহার জন্য আমার জাতীয় স্বাধীনতার খাতিরেই যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে চাহি।

জ। আমি বিশ্বাস করি যে যেখানে মানুষে মানুষে বা জাতিতে জাতিতে বিরোধ জাগিয়া রহে সেখানে কখনই সত্য স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। এ সংসারে এক অজাতশত্রুই প্রকৃত স্বাধীন। সুতরাং ভারতের শত্রুদল যত কমিবে ততই তাহার স্বাধীনতার বুনিয়াদ পাকা হইয়া উঠিবে। ইংরাজের সঙ্গে জোর করিয়া সকল সম্বন্ধ ছেদন করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সহজে এ আঘাত ভুলিবে না এবং বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতের শত্রু হইয়া থাকিবে। ইহার ফলে

স্বাধীন ভারতবর্ষকে সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া থাকিতে হইবে। সশস্ত্রের স্বাধীনতা কল্পনা মাত্র, সত্য বস্তু নহে। যে নিজেকে নিরাপদ ভাবিতে পারে না, তার স্বাধীনতা মুক্তির পর্য্যায়ে যায় না, বন্ধনেরই রূপান্তর হইয়া উঠে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া যদি স্বাধীন ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা সন্ধি ও সামঞ্জস্য হইতে পারে আমি তাহাই সর্ব্বতোভাবে কামনা করি। স্বাধীনতা চাই ; যদি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ না ছিঁড়িলে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব হয় তবে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সম্বন্ধ কাটিতেই হইবে। তখন ইহাতে কুণ্ঠিত হইব না। কিন্তু যতক্ষণ সন্ধির সম্ভাবনা আছে ততক্ষণ কোনও নীতি অবলম্বন করিতে চাহিনা যাহাতে এই সম্বন্ধটাকে জোর করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে।

ঝ। আমি স্বরাজ বলিতে ভারতের প্রজাসাধারণের রাজ কিম্বা প্রকৃষ্ট গণতন্ত্রশাসন-ব্যবস্থা বুঝি বলিয়া যথাসাধ্য ইংরাজের সঙ্গে কোনও প্রকারে মারামারি বা লাঠালাঠি করিয়া এই স্বরাজ লাভ করিতে চাহি না। মারামারি করিয়া স্বরাজ পাইতে গেলেই সৈন্যসামন্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এই মারামারির ফলে যদি ইংরাজ রাজত্বের ধ্বংসই হয় তাহাতে ভারতের শূন্য সিংহাসনে বিজয়ী বিদ্রোহী সেনার অধিনায়কই যাইয়া বসিবেন। সেখানে গণদেবতার প্রতিষ্ঠা হইবে না। সে অবস্থায় আমরা একজন সেনাপতির রাজত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিব, জনসাধারণের রাজত্ব আসিবে না। সেনানায়কত্ব সর্ব্বদাই আজি পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাতন্ত্র হইয়াছে। এক মার্কিণে ছাড়া কোথাও বিজয়ী বিদ্রোহী সেনা গণতন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। আর মার্কিণে গণতন্ত্রতার কাঠাম বিদ্রোহের পূর্ব্ব হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। যারা স্বাধীনতার লড়াই করিতে গেল, তারা গৃহস্থ, চাষা, দোকানী-পসারী, কিম্বা মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রলোক—অস্ত্রব্যবসায়ী ছিল না। আর এ সকল লোকও নিজ নিজ সহরের প্রতিনিধি হইয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্ম সংগ্রাম করিতে গিয়াছিল, একটা বিশাল সৈন্যদলভুক্ত হইয়া যায় নাই। এই জন্যই মার্কিণের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে এ বিষয়ে সাধারণ নিয়মের একটা ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। বিদ্রোহের দ্বারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে ইংরাজের উচ্ছেদ সাধন সম্ভব হইলেও এ পথে কিছুতেই সত্য গণতন্ত্র স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সে জন্য আবার একদিন ভবিষ্যৎবংশীয়দিগকে নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি মারামারি করিতেই হইবে। এই কারণে আমি সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরোধী।

ঞ। যে কারণে আমি সশস্ত্র বিদ্রোহকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সত্য স্বরাজ লাভের পরিপন্থী বলিয়া মনে করি, সেই কারণেই যে ভাবে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অসহযোগ আন্দোলন চালাইয়াছেন, তাহারও সমর্থন করিতে পারি নাই। ইহা আমি বহুদিন বুঝিয়াছি যে ইংরাজ আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় বন্ধন খুলিয়া দিবে না। রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয় কেবল স্বার্থের দ্বারা, পরার্থের বা পরমার্থের দ্বারা নহে। যতদিন না ইংরাজ বুঝিবে ভারতে স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা না হইলে তাহার নিজের সাম্রাজ্য-রক্ষাই দুষ্কর হইয়া উঠিবে, ততদিন সে কিছুতেই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ঘুচাইতে চাহিবে না। তাহার স্বার্থে আঘাত পড়িলেই কিম্বা পড়িবার আশু সম্ভাবনা দেখিলেই ভারতে ব্রিটিশ প্রভুশক্তি

আমাদিগের সঙ্গে আপোষ ও সন্ধি করিতে অগ্রসর হইবে। তার পূর্ব্বে সে সূচ্যগ্র পরিমাণেও নিজের স্বেচ্ছাতন্ত্রতা সঙ্কুচিত করিতে রাজী হইবে না। সুতরাং ইংরাজের দয়ার উপরে নির্ভর করিয়া আমরা কিছুতেই স্বরাজ পাইব না। এ কথা বহুদিন হইতেই বুঝিয়াছি ও দেশের লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইংরাজের সঙ্গে একটা সত্য বোঝাপড়া করিতে হইলে, নিজেদের শক্তি সংগ্রহ করা আবশ্যক; এবং সেই সংহত শক্তিকে ব্রিটিশ প্রভুশক্তির প্রতিকূলে সজ্জিত করাও প্রয়োজন। ইহা চিরদিনই জানি। কিন্তু অন্যদিকে এই শক্তি সংগ্রহ এবং সজ্জিত করিতে যাইয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি না করি যাহাতে হয় সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত বর্ত্তমান বিদেশী স্বেচ্ছাতন্ত্রশাসনের আমূল পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইবে, না হয় দেশব্যাপী অশান্তি ও অরাজকতা জাগিয়া উঠিবে—ইহাও সর্ব্বদাই চাহিয়াছি। ইংরাজরাজকে সরাইয়া আমরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই করিতে চাই, দেশে অরাজকতা আনিতে চাই না। অতএব ইংরাজের সঙ্গে বিরোধ করিতে যাইয়া বর্ত্তমান শাসন-যন্ত্রকে হঠাৎ একেবারে ভাঙিয়া দিতে চাহি না। ইহাকে বদলাইতেই কেবল চাহি। এই শাসন-যন্ত্রের উপরে ক্রমে ক্রমে এ দেশের প্রজাসাধারণের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াই আমরা স্বরাজের সাধনায় দেশব্যাপী সাংঘাতিক অরাজকতাকে দূরে রাখিতে পারিব। ইহার আর অন্য পথ নাই। এই কারণে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-নীতির সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারি নাই। এ পথের পরিণাম স্বরাজ নহে, কিন্তু অরাজকতা।

ট। স্বরাজের সংগ্রামে আমি বহুদিন হইতেই Passive Resistance নীতির অবলম্বনে পক্ষপাতী ছিলাম; এখনও আছি। এই অর্থেই আমি প্রথমে মহাত্মার Non-Co-operationএর প্রস্তাব সমর্থন করি। ১৯২০ ইংরাজীর সেপ্টেম্বর মাসের কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেসের প্রাক্কালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও এই Passive Resistance অর্থেই মহাত্মার প্রস্তাব সমর্থন করেন। Passive Resistance গভর্ণমেণ্টের মূল অধিকার ও দায়ীত্ব স্বীকার করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া চলে। দেশের ভিতরে শান্তি রক্ষা এবং বাহিরের আততায়ীর আক্রমণের প্রতিরোধ করাই প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের মুখ্য অধিকার ও দায়ীত্ব। যে গভর্ণমেণ্ট এই কর্ত্তব্য পালনে অপারগ বা পরাঙ্মুখ হয়, প্রজার আনুগত্য ও সাহচর্য্যের উপরে তাহার কোনওই দাবী থাকে না। Passive Resistance যে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, সেই গভর্ণমেণ্টের এই মুখ্য অধিকারকে মানিয়া চলে। দেশের ভিতরে শান্তি রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের যে সকল ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক হয়, Passive Resistance তাহার প্রতিরোধ করে না। এক কথায় বলিতে গেলে Passive Resistance সরকারের পুলিস-পাহারা, সৈন্য-সামন্ত কিম্বা ফৌজদারী আইন-আদালত নষ্ট করিতে চাহে না। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-প্রস্তাবে ইহা করিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই তাহার সমর্থন করিতে পারি নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই মুখ্য অধিকারগুলিকে ছাড়িয়া দিলেও আরও এমন অনেক পথ আছে, যে পথে তাহাকে বিনা উপদ্রবে কোনঠাসা করিতে পারা যায়। এগুলি নিরস্ত্র প্রতিরোধের বা Passive Resistanceএর পথ। এ পথেই একদিকে প্রজাশক্তিকে সংহত ও অন্যদিকে গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাতন্ত্রতাকে প্রতিহত করিতে পারা যায়। পনর বৎসর আগেকার স্বদেশী ও বয়কট

আন্দোলনের সময় আমরা এই পথেই চলিতে চাহিয়াছিলাম। এখনও বর্ত্তমানের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কোনও কোনও দিকে ঐ পরিচিত পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর মনে করি। পনর বছর আগেকার অবস্থা আর নাই। ইতিমধ্যে নানাদিকে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমাদের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সরকারের শাসন-যন্ত্রও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পনর বছর আগে যাহা সমীচীন ছিল, বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেও তাহা যে সেইরূপ সমীচীনই হইবে, ইহা বলা যায় না। পনর বছর আগে যে পরিমাণে এবং যে ভাবে আমরা লোক্যাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি এবং ব্যবস্থাপক-সভা প্রভৃতিকে বর্জ্জন করিয়া সরকারের কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে চাহিয়াছিলাম, আজ সেইরূপ করা প্রয়োজন কি না ভাবিবার কথা। পনর বছর আগে এ-সকলের উপরে রাজপুরুষদিগের নিরঙ্কুশ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; আজ তাহা নাই। আজ প্রজাশক্তি অন্ততঃ ছুঁচ হইয়া এইসকল শাসনযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এখন যাহাতে ইহা ফাল হইয়া বাহির হইতে পারে, সে পন্থা অবলম্বনেই নীতিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইবে। এখন এগুলিকে বর্জ্জন না করিয়া এগুলির ভিতর হইতেই নিরস্ত্র প্রতিরোধ কিম্বা Passive Resistance নীতির অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। এইরূপে নানাদিক দিয়া গভর্ণমেণ্টের মুখ্য শাসনযন্ত্রকে বিকল না করিয়াও প্রজাশক্তির অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠার দ্বারা বর্ত্তমান বিদেশীয় দপ্তরতন্ত্রকে ক্রমে দুর্ব্বল করিয়া শেষে নষ্ট করা যাইতে পারে। মহাত্মার অসহযোগের পথ এ নহে। এইজন্য এই অসহযোগের সমর্থন করিতে পারি না।

৫। মহাত্মা এবং তাঁহার বিশিষ্ট অনুচরেরা,—সকলে না হউন, অন্ততঃ অনেকেই—ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ুক, ইহা চাহেন না। মহাত্মা নিজে Dominion Home Ruleকেই স্বরাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী আছেন। এ অবস্থায় ভারতের বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের মুখ্য অঙ্গগুলিকে বাঁচাইয়া চলাই ত কর্ত্তব্য। এ-অঙ্গগুলি বিকল হইলে, দেশে অরাজকতা আসিবেই আসিবে। আর সেই দেশব্যাপী অরাজকতার মধ্য হইতে যদি স্বরাজ গড়িয়া উঠে, তাহার সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোনও সম্বন্ধ থাকিবার সম্ভাবনা আছে কি? ইংরাজের সঙ্গে আপোষে আমাদের স্বরাজের দাবীর নিষ্পত্তি হইলেই কেবল আমাদের পক্ষে Dominion Status কিম্বা ব্রিটিশ উপনিবেশ সকলের পদ ও অধিকার লাভ করা সম্ভব হইবে। আর বর্ত্তমান শাসনের মুখ্য অঙ্গগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিতে গেলে, রাজা প্রজায় যে সাংঘাতিক বিরোধ বাধিবে, সে বিরোধে প্রজাই জয়ী হউন বা রাজাই জয়ী হউন, আপোষের সম্ভাবনা কিছু থাকিবে না। আর সে বিরোধ নিরস্ত্র এবং অহিংসাত্মক বা Non-violent থাকিবারও কোনও সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় কিছুতেই মহাত্মার বর্ত্তমান নীতির অনুসরণ করিতে পারি না। মোটামুটী ইহাই আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ। ইহার মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে না, এমন স্পর্দ্ধা রাখি না। ভুল বুঝিলে যে এই মত পরিবর্ত্তিত করিব না, এমনও নহে। সমালোচকেরা যদি সরাসরিভাবে কেবল নিন্দা বা স্তুতি না করিয়া যথাযোগ্য যুক্তি দেখাইয়া আমার ভুল সংশোধন করিতে সাহায্য করেন, কৃতার্থ হইব। *

আমার এই গণতন্ত্রের আদর্শ এখনও ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় কিম্বা য়ুরোপের অন্য কোনও বড় দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। দুনিয়ার খবর ভাল করিয়া যখন পাই নাই, তখন ইংরাজের নিজের দেশে যে শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকেই সত্য-গণতন্ত্র-শাসন বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু ইংলণ্ডে বা আমেরিকাতেও যে আমার এই গণতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন এরূপ মনে করিনা। সুতরাং ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, এমন কি হয়ত বা পনের কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও যাহাই ভাবিয়া থাকি না কেন, গেল দশ বার বৎসর ধরিয়া ইংরাজের স্বদেশের শাসনব্যবস্থাকে সত্য স্বরাজের ব্যবস্থা বলিয়া ভাবি নাই। বিলাতের লোকেরাও যে স্বরাজ পায় নাই, বারম্বার তাহাদের মুখের উপরে একথা বলিয়াছি। একথাও তাহাদিগকে কহিয়াছি যে যতদিন ছোট ছোট গ্রাম্য ব্যবস্থাপক-সভা বা পার্লিয়ামেণ্টের উপরে দেশের শাসনযন্ত্র গড়িয়া না উঠিবে ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই ইংরাজ প্রজাসাধারণে প্রকৃত আত্মশাসনের অধিকার পাইবে না। যেখানে হাজার হাজার নির্ব্বাচক দিয়া এক একটা বৃহদায়তন নির্ব্বাচকমণ্ডলী বা Constituency গঠিত হয় সেখানে কিছুতেই সত্যভাবে প্রজা-প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারে না, এবং সে অবস্থায় কখনই প্রকৃত লোকমতের বা বহুমতের দ্বারা রাজকার্য্যও পরিচালিত হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং যাহাতে নির্ব্বাচনমণ্ডলী বা Constituencyগুলি ছোট হয় এবং নির্ব্বাচকেরা ও নির্ব্বাচিত উভয়ে একে অন্যের সঙ্গে অতি ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ও নানা প্রকারের নিকটতম সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকেন, ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের জনসাধারণকেও এইকথা কহিয়াছি।

আমাদের প্রাচীন গ্রাম্য জীবনে গ্রামবাসীদিগের মধ্যে এইরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আর ছিল বলিয়াই আমাদের প্রাচীন গ্রাম্য বা Village Communityর শাসন যে পরিমাণে সত্য আত্মশাসন ছিল সেরূপ আত্মশাসন ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় আজিও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া আমাদের গ্রাম্য সমাজে তাহা লোপ পাইয়াছে। কিন্তু এই আত্মশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সকলের আগে ছোট ছোট নির্ব্বাচকমণ্ডলী বা Constituency গঠন করিতে হইবে। এ সকল মণ্ডলী এমন হইবে যে নির্ব্বাচকেরা একে অন্যের নিকট পরিচিত থাকিবে এবং নির্ব্বাচনপ্রার্থী যাঁহারা তাঁহারাও বিদেশ হইতে আসিবেন না, কিন্তু নির্ব্বাচকদিগের বহুকালের পরিচিত লোক হইবেন। যিনি আপনার চরিত্রগুণে জনসাধারণের ভক্তি লাভ করিবেন তিনিই সেই ভক্তির জোরে তাহাদের বিশ্বস্ত আমমোক্তার, রূপে একা প্রতিনিধি সভায় যাইবেন। ইংলণ্ডের বা আমেরিকার বর্ত্তমান নির্ব্বাচন প্রণালী অনেক স্থলে একটা বিরাট মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মিথ্যাটা যতদিন না ভাঙ্গিয়াছে ততদিন সে দেশে সত্য গণতন্ত্রতার প্রতিষ্ঠা হইবে না। সু[illegible] দেশের অনুকরণে আমাদিগের স্বরাজ গড়িতে গেলে সেই বিদেশী মিথ্যাটাকেই [illegible] করিয়া লইব। এইজন্য বিলাতের বা আমেরিকার ছাঁচে আমাদে[illegible]র স্বাধীনতা বা স্বর[illegible]ত্ত চাহিনা। সে আদর্শ আমার স্বরাজের আদর্শ নহে।

[illegible] বিকাশ কিছুতেই সম্ভব হ[illegible]

৩

আমার স্বরাজের আদর্শে প্রত্যেক গণ্ডগ্রামের—কিম্বা পাশাপাশি দু'চারিটা ছোট গ্রাম থাকিলে তাহাদের মিলাইয়া একটা গণ্ডগ্রাম করিয়া তাহার গণমতের উপরেই আমাদের স্বরাজের প্রথম বুনিয়াদ গাঁথিতে হইবে। গ্রামে যদি স্বরাজের প্রতিষ্ঠা না হয় দেশে কখনও তাহা গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমে গ্রামে গ্রামে স্বরাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। গ্রামের শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা, গ্রামের কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুলিশ-প্রহরী, এ সকলের ব্যবস্থা গ্রামের লোকের সম্পূর্ণ আত্মস্বাধীনে থাকিবে। এসকলের উপরে জেলার বা প্রদেশের কেন্দ্রীভূত শাসনশক্তির কোনও অধিকার থাকিবে না। এই ভাবে গ্রাম্যজীবনকে গড়িয়া তুলিলে এই গ্রাম্য স্বরাজের উপরেই সমগ্র দেশে সত্য স্বরাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে।

কিন্তু তাই বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মধ্যে যে কোনও আদান-প্রদান রহিবে না, এমন নহে। সামাজিক, বার্ত্তিক, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় শিক্ষা এবং সাধনা সম্বন্ধে এক গ্রামের সঙ্গে অপর গ্রামের নিয়তই আদান প্রদান চলিবে। আর ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের কর্ম্ম ও অধিকার নির্দ্ধারণের ব্যবস্থারও প্রয়োজন হইবে। ইহার জন্য প্রত্যেক জেলায় এক একটা শাসনকেন্দ্র ও শাসনব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা করিবেন ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সমিতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা। এই সকল প্রতিনিধি সাক্ষাৎভাবে তাঁহাদের কর্ম্মাকর্ম্মের জন্য নিজেদের গ্রাম্য সমিতির নিকটে এবং পরোক্ষভাবে নিজেদের গ্রামের সাধারণ প্রজামণ্ডলীর নিকটে দায়ী থাকিবেন। গ্রামের পরে যেমন জেলা বহু গ্রামকে লইয়া গঠিত, সেইরূপ জেলার পরে প্রদেশ বহু জেলা লইয়া গঠিত। গ্রামের নিজের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ গ্রামবাসীদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে কিন্তু গ্রামের বাহিরের সম্বন্ধ ও স্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণের ভার জেলার সম্মিলিত প্রজাপ্রতিনিধিগণের উপরে ন্যস্ত হইবে, সেইরূপ প্রত্যেক জেলার ভিতরকার শাসনসংরক্ষণের ব্যবস্থার ভার জেলার সভার উপরেই থাকিবে, এ বিষয়ে অন্য জেলার কিম্বা প্রাদেশিক শাসনশক্তির হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে না। তবে ভিন্ন ভিন্ন জেলার মধ্যে সামাজিক, বার্ত্তিক, ব্যবসা-বাণিজ্যগত, রাষ্ট্রীয় এবং সাধারণ শিক্ষা ও সাধনাসম্পর্কীয় ব্যাপারে প্রাদেশিক প্রজা প্রতিনিধি-সভার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। আর প্রাদেশিক সভা জেলার নির্ব্বাচিত সভ্যগণের দ্বারাই গঠিত হইবে বলিয়া প্রকৃত পক্ষে সে কর্ত্তৃত্বটা বাহিরের নহে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জেলার নিজেরই কর্ত্তৃত্ব হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাও আত্মশাসনই হইবে। পরিণামে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক, ব্যবসাবাণিজ্যগত, রাষ্ট্র-ব্যাপার এবং সাধারণ শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে যে বিরাট সম্বন্ধ আছে এবং থাকিবে, সেই সম্বন্ধকে যথাযোগ্যভাবে রক্ষা করার এবং তাহাকে ফুটাইয়া তোলার ভার ও অধিকার সর্ব্ব-ভারত-ব্যবস্থাপক- ...লীর হাতে থাকিবে। প্রত্যেক গ্রাম যেমন নিজের অধিকারে স্বাধীন ও সপ্রতিষ্ঠ হইয়া ...রব না, ...ীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ গ্রামের সঙ্গে মিলিয়া জেলার শাসন গড়িয়া তুলিবে, প্রত্যেক ... যথাযোগ্য যুক্তি ... অধিকারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া অন্যান্য স্বাধীন ও স্বপ্রতি... হইয়া

প্রাদেশিক স্বরাজকে গড়িয়া তুলিবে এবং সেই স্বরাজের সাহায্যে সমষ্টিগত যে প্রাদেশিক সমাজ ও সাধনা তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবে, সেইরূপ প্রত্যেক প্রদেশ আপনার অধিকারে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে মিলিয়া সকলের শক্তি, সাধনা এবং স্বার্থের সমবায় ও সমন্বয়ের দ্বারা বিরাট জাতীয় জীবন ও সাধনাকে গড়িয়া তুলিয়া জগতের অন্যান্য স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ জাতির সমকক্ষ হইয়া ভূতলে ক্রমে বৈকুণ্ঠের প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহাই আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদে সত্য স্বরাজের আদর্শ।

৪

আমার নিকট স্বাধীনতা এক অখণ্ড বস্তু। স্বাধীনতার সাধক জীবনের কোনও সম্বন্ধে বা ব্যাপারে বন্ধন সহিতে পারেন না। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের বস্তু নহে, কেবল ভিতরের বস্তুও নহে। যে স্বাধীনতার সন্ধান পাইয়াছে সে সকলের আগে নিজের বুদ্ধিটাকে স্বাধীন করিতে চাহে। বুদ্ধির স্বাধীনতার মূল কথা, যাহা বুঝিব না তাহা মানিব না—শাস্ত্রের উপদেশেও নয়, গুরুর আদেশেও নয়। স্বাধীনতার দ্বিতীয় কথা, নিজের বিচারবুদ্ধির আলো নিভাইয়া কাহারও হাত ধরিয়া চলিব না। নিজের বুদ্ধির আলোক সামান্য হইলেও যতটুকু পথ দেখা যায়, সেই আলো লইয়া ততটুকু পথই চলিব, তাহার বেশি যাইবার আবদার করিব না। স্বাধীনতার তৃতীয় কথা, লোভে পড়িয়া—সে লোভ সংসারেরই হউক বা পরমার্থেরই হউক—কাহারও নিকটে আত্ম-বিক্রয় করিব না। এ সকল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল সূত্র। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে না গড়িয়া উঠিলে কখনই সত্য এবং সার্থক হইতে পারে না। সুতরাং আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদে স্বরাজের ভিত্তি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে। তবে একথা বলি না যে যতদিন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের প্রতিষ্ঠা না হইয়াছে ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বরাজের জন্য কোন চেষ্টা করিব না, কিম্বা ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বরাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। ব্যক্তিগত স্বরাজ এবং রাষ্ট্রীয় স্বরাজ, এ দুইই এক সঙ্গে চলে। সত্য ব্যক্তিগত স্বরাজ ব্যতীত খাঁটী রাষ্ট্রীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না; আবার খাঁটী রাষ্ট্রীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সম্যকরূপে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভও সম্ভব হয় না। পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া উভয়ই আংশিক ভাবে ফুটিয়া উঠে। এই জন্য আগে পরিপূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভ হইবে, তার পরে আমরা রাষ্ট্রীয় স্বরাজ সাধনায় প্রবৃত্ত হইব, এমন অদ্ভুত কথা কহি না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বরাজ লাভের জন্য যদি এমন কোনও পথ অবলম্বিত হয় যাহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মায় সে পথে যে প্রকৃত স্বরাজ পাওয়া যাইবে না, একথা মুক্ত কণ্ঠে কহিব। মাকাল বীজ পুঁতিয়া তাহা হইতে যেমন দেবভোগ্য অমৃত ফল উৎপাদন করা অসাধ্য, সেইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথ রোধ করিয়া দাসসেনাদলের কিম্বা গড্ডলিকা প্রবাহের দ্বারা প্রকৃত রাষ্ট্রীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করাও অসাধ্য।

আমি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা স্বরাজ চাহি এই জন্য যে এই স্বাধীনতা বা স্বরাজ ব্যতীত পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশ কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। আর আমার নিকটে পূর্ণ মনুষ্যত্বের

বিকাশ অর্থ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে দেবতা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন তাঁহাকে প্রকট করা। জীবনের অধিকাংশ সময়েই আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকি বটে, এবং সে সময়ে মানুষের মধ্যে নানা প্রকারের ভেদবিচারও করিয়া থাকি, ইহা সত্য। কিন্তু গুরুকৃপায় যখন কিঞ্চিন্মাত্র আত্মস্থ হইতে পারি তখন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আমার ইষ্টদেবতাকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করি। আমাদের কর্ত্তাভজাদের একটা গান আছেঃ—

কি আর বলব রে, কে করিবে প্রত্যয় ?
এই মানুষে আছে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।

ত্রিশ বৎসর কাল এই কথাগুলি আমার ইষ্টমন্ত্রের মতন হইয়া আছে। কর্ম্মদোষে এই নরদেবতার সঙ্গে দিবানিশি ঘুরিয়া ফিরিয়াও সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতে পারিলাম না, 'এই দুঃখ রহল মরমে।' পুত্রকন্যার মধ্যে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে, পরিচারক-পরিচারিকার মধ্যে, শত্রু-মিত্রের মধ্যে, আর পথে ঘাটে যে অগণ্য অচেনা নরনারী দেখিতে পাই তাহাদের মধ্যে আমার ইষ্টদেবতা তাহাদের দেহ-পুরে ও অন্তর-পুরে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছেন, কচিৎ মাহেন্দ্র ক্ষণে গুরু যখন ভাবের কাজল চোখে পরাইয়া দেন, তখন নিমেষের জন্য তাঁহাকে দেখিতে পাই বটে ; কিন্তু সে অনুভব দৃঢ়মুষ্টিতে অন্তরে বাহিরে ধরিয়া রাখিতে পারি না, এই ত জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দুঃখ। আর পারিনা এই জন্য যে ইহারা আমার ঠাকুরকে কেবল ঢাকিয়াই রাখে, খুলিয়া দেখায় না। খুলিয়া দেখাইতে পারেই না। কারণ নিজেদের সাধারণ পশুত্বের আবরণ উন্মোচন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ নরের মধ্যে নারায়ণ থাকিয়াও আত্মপ্রকাশ করিবার সূচ্যগ্র পরিমাণ অবসর প্রাপ্ত হন না। সাধারণ জনমণ্ডলীর ভিতরে এ অবস্থায় ইষ্ট দেবতাকে দেখিতে হইলে নিজের অন্তরের ভাবের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু সাধু মহাজনের চরণপ্রান্তে যখন উপস্থিত হই তখন আমাকে নিজের মনোভাবের উপরে নির্ভর করিতে হয় না। তাঁহাদের মধ্যে ভগবান আপনি আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন দেখিতে পাই। তাঁহাদের উপরে আমাকে ভাগবতী তনুর আরোপ করিতে হয় না। তাঁহাদের সাক্ষাৎকারে আমার অন্তরের অচেতন ভগবানই সচেতন হইয়া উঠেন। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যাহাদের বিকশিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে জীব ও শিব সর্ব্বদাই যুগপৎ প্রকাশিত হয়েন ও পরস্পরের সঙ্গে লীলা করেন। যে ভাগ্যবান এই মানুষকে পাইয়াছে তাহাকে আর মূর্ত্তি গড়িয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয় না—মাটির মূর্ত্তি গড়িয়াও নহে, মানস মূর্ত্তি গড়িয়াও নহে। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ যে দিন সমাজে হইবে সেদিন ঘটে ঘটে দেবতার প্রকাশ হইয়া সকলে সকলকে পূজা করিবে। সেদিন সংসারেই স্বর্গধামের প্রতিষ্ঠা হইবে।

এই মানুষই দেবতা। দেবতা বলিয়া সে নিত্য, সচেতন, অচেতন এবং অজ্ঞানতায় মধ্যে পড়িয়া থাকিতে পারে না। দেবতা বলিয়া সে বিশ্বম্ভর, ক্ষুধাতুর হইয়া মুষ্টি-অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না। দেবতা বলিয়া সে সুন্দর, রোগে শীর্ণ ও জরাতে জীর্ণ হইতে পারে না। দেবতা বলিয়া সে আনন্দময়, নিরানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারে না। আর দেবতা বলিয়াই তার স্বাধীনতা বা মুক্ত স্বভাব নিত্যসিদ্ধ, সে কখনও পরাধীন হইয়া

ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে সংসারে বাস করিতে পারে না। মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেবতাকে প্রকট করিতে হইলে তাহার অজ্ঞতা দূর করিয়া জ্ঞানেতে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, দারিদ্র্য ঘুচাইয়া প্রাচুর্য্যের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে, রোগ দূর করিয়া স্বাস্থ্য আনিয়া দিতে হইবে, নিরানন্দের হেতু নষ্ট করিয়া চির আনন্দধারার মধ্যে রাখিতে হইবে, অবসাদ নষ্ট করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে, এবং অন্তর বাহিরের সকল বন্ধন ছেদন করিয়া তাহার নিত্য-মুক্ত স্বভাবে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমি স্বরাজ চাই এই জন্য যে ইহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছি যে এই স্বরাজ ব্যতীত মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ কিছুতেই হইতে পারে না। আমার আদর্শের স্বরাজ তাহা যাহাতে সমাজ এবং রাষ্ট্রের এমন ব্যবস্থা হইবে যে ব্যবস্থার গুণে দেশে কোনও প্রজার কোনও অভাব অনাটন থাকিবে না, যাহার গুণে অজ্ঞান জ্ঞান লাভ করিবে, রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিবে, যারা ভয়ে ভয়ে নিজের দৈন্যের বোঝা মাথায় লইয়া চলে তারা উদ্ধত ভাবে নহে, কিন্তু সত্য মনুষ্যত্বের গৌরবে গরীয়ান হইয়া দুনিয়ার মাঝখানে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। স্বরাজ উপায় মাত্র—মূল লক্ষ্য পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ। এই লক্ষ্যটি বুঝিলে স্বরাজ লাভের লোভে আমরা এমন কোনও উপায় অবলম্বন করিতে পারিব না, যাহাতে মানুষের জ্ঞানকে বা বুদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করে, তাহার বিশ্বজনীন প্রেমকে সঙ্কীর্ণ করে, কিম্বা তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতা প্রবৃত্তিকে বিন্দু পরিমাণেও সঙ্কুচিত করিতে চাহে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সিদ্ধি।

কাব্যে যার গড়িয়াছি স্বপন প্রতিমা
ছন্দে যারে ক'রেছি সৃজন
কে জানিত একদিন শুভক্ষণে সেই
রূপ ধরি' দিবে দরশন।
ধ্যানে জ্ঞানে ধারণায়, কল্পনায়, গানে
জীবনের সর্ব্ব সুখে দুখে
বহিয়া তোমারি স্মৃতি, খুঁজেছি তোমারে
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, শৈলে সিন্ধুবুকে।
ভাবিয়াছি ধরা দিলে, গিয়াছি ছুটিয়া
নিবেদিতে রাতুল চরণে
সব ভাব, সব ভাষা, সব ভালবাসা
আজন্মের মননে, স্মরণে
চকিতে মিলায়ে গেছ ছায়াবাজি সম
নাহি জানি ভক্তেরে আবার
কোন্ নব পরীক্ষার দীপ্ত হোমানলে
সমর্পিয়া করিতে বিচার।
আজি আমি হইনু কি সফল সাধন
পূর্ণ ব্রত আজি কি আমার
আজি কি সার্থক মোর চির-আরাধন
ধন্য আমি—ধন্য শতবার
কে জানিত ছিলে তুমি হে মহিমময়ী
অনুরক্ত দীন ভক্ত লাগি
করে ল'য়ে বরাভয়, দূর নদীকূলে
মৃত্যুহীন অনুরাগে জাগি।
আজি যদি দেখা দিলে মুরতি ধরিয়া
বিকশিত হৃদি-শতদলে
প্রতি রেণুকণা তার হোক মধুময়ী
তব পদ-পরশে, বিমলে।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

সঙ্গীত সঙ্ঘ। *

যিনি এই সঙ্গীতসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী সেই প্রতিভা আজ পরলোকে। বাল্যকালে প্রতিভা আর আমি এক সঙ্গে মানুষ হয়েছিলুম। তখন আমাদের বাড়ীতে সঙ্গীতের উৎস নিরন্তর প্রবাহিত হ'ত। প্রতিভার জীবনারম্ভকাল সেই সঙ্গীতের অভিষেকে অভিষিক্ত হয়েছিল। সেই সঙ্গীত শুধু যে তাঁর কণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছিল তা নয়, এ তাঁর প্রাণকে পরিপূর্ণ করেছিল। এরই মাধুর্য্য প্রবাহ তাঁর জীবনের সমস্ত কর্ম্মকে প্লাবিত করেচে। তাঁর চরিত্রে যে ধৈর্য্য ছিল, শান্তি ছিল, নম্রতা ছিল, সংযমের যে গাম্ভীর্য্য ছিল তার সুর লয় ছিল যেনসেই সঙ্গীতের মধ্যে। সেই সঙ্গীতের মাধুর্য্যই তাঁর স্বাভাবিক ভগবদ্ভক্তিতে নিয়ত প্রকাশ পেত এবং এই সঙ্গীতের গভীর প্রভাব সাধ্বী স্ত্রীর সমস্ত কর্ত্তব্যকে সুন্দর করে তুলেছিল।

আমার বিশ্বাস যে সঙ্গীত কেবল চিত্ত বিনোদনে উপকরণ নয়, তা আমাদের মনে সুর বেঁধে দেয়, জীবনকে একটি অভাবনীয় সৌন্দর্য্য দান করে। আমি তাই মনে করি যে এই সঙ্গীতসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা প্রতিভার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। তাঁর আমরণ কালের সাধনাকে তিনি এই সঙ্ঘে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এখানে যে সঙ্গীতের উৎস উৎসারিত হবে তা বাংলা-দেশের নানা গৃহে প্রবাহিত হয়ে আমাদের দেশের প্রাণে মধু সঞ্চার করবে। এমনি করে এই গানের প্রবাহই তাঁর জীবনের স্মৃতিকে বহন করতে থাকবে। এর চেয়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠতর উপায় হতে পারে না। তিনি দেশের হৃদয়ের মধ্যে তাঁর জীবনের এই বাণীকে স্বয়ং স্থাপিত করেচেন।

যাঁরা আজ সঙ্গীত ও বাদ্য দিয়ে আমাদের আনন্দ দান করলেন তাঁদের আমি আশীর্ব্বাদ করছি। সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীনাপাণির পদ্মবনে তাঁরা মধু আহরণ করতে এসেছেন, তাঁদের সাধনা সার্থক হোক্, মাধুর্য্যের অমৃতরসের দ্বারা তাঁরা দেশের চিত্তে শক্তি সঞ্চারিত করুন। অনেকের ধারণা আছে যে বুঝি লড়াই করে, দ্বন্দ্বসংঘর্ষের মধ্য দিয়েই শক্তি প্রকাশিত হয়। তারা একথা স্বীকার করে না যে সৌন্দর্য্য মানুষের বীর্য্যের প্রধান সহায়। বসন্তকালে গাছপালার যে নবকিশলয়ের উদ্যম হয়, তা যেমন তার অনাবশ্যক বিলাসিতা নয়, বাস্তবিক পক্ষে সে যেমন তার বড় সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া; তেমনি বড় বড় জাতির জীবনে যে রসসৌন্দর্য্যের বিস্তার হয়েচে তা তাদের পরিপুষ্টিরই উপকরণ জুগিয়েছে। এই কলরসই জাতির জীবনকে নিত্য নবীন করে রাখে, তাকে জরার আক্রমণ থেকে বাঁচায়, অমরাবতীর সঙ্গে মর্ত্ত্যলোকের যোগ স্থাপন করে, এই রসসৌন্দর্য্যই মানবচিত্তে আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় বিকশিত হয়। পিপাসার জল আহরণ ও অন্ন বিতরণের ভার নারীদের উপরেই। তেমনি আমাদের মনের মধ্যে সঙ্গীতের যে রস পিপাসা আছে তাও পরিতৃপ্ত করবার ভার যদি নারীরাই

* গত ১৭ই মার্চ্চ য়ুনিভার্সিটি-ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে সঙ্গীত-সঙ্ঘের পুরস্কার বিতরণ-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

গ্রহণ করেন তাহলেই সেটা শোভন হয়। জাবের জীবনের ভার মেয়েদের উপর। কিন্তু কেবল দেহেরই নয়, মনেরও জীবন আছে, এই সঙ্গীত হচ্চে তারই তৃষ্ণার একটি পানীয়, এই পানীয়ের দ্বারা মনের প্রাণশক্তি সতেজ হ'য়ে ওঠে।

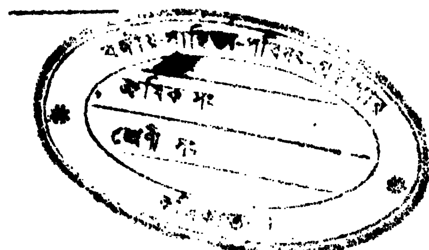
জীবন নীরস হলে সঙ্গে সঙ্গে তা নির্ব্বীর্য্য হয়ে পড়ে। কিন্তু শুষ্কতার কঠোরতাই যে বীর্য্য এমন কথা আমাদের দেশে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। অবশ্য বাহিরে বীর্য্যের যে প্রকাশ সেই প্রকাশের মধ্যে একটা কঠিন দিক আছে কিন্তু অন্তরের যে পূর্ণতা সেই কাঠিন্যকে রক্ষা করে সেই পূর্ণতার পরিপুষ্টি কোথা থেকে? এ হচ্চে আনন্দরস থেকে। সেইটে চোখে ধরা পড়ে না বলে তাকে আমরা অগ্রাহ্য করি, অবজ্ঞা করি, তাকে বিলাসের অঙ্গ ব'লে কল্পনা করি।

গাছের গুঁড়ির কাষ্ঠ অংশটাকে দিয়েই ত গাছের শক্তি ও সম্পদের হিসাব করিলে চলবে না। সেটাকে খুব স্থূলরূপে স্পষ্ট করে দেখা যায় সন্দেহ নেই, আর গূঢ়ভাবে তার অণুতে অণুতে যে রস সঞ্চারিত হয়, যে রসের সঞ্চারণই হচ্চে গাছের যথার্থ প্রাণশক্তি, সেটা স্থূল নয়, কঠিন নয়, বাহিরে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ নয় বলেই তাকে খর্ব্ব করা সত্যদৃষ্টির অভাববশতঃই ঘটে। গুঁড়ির সত্যটা রসের সত্যের চেয়ে বড় নয়, গুঁড়ির সত্যরসের সত্যের উপরেই নির্ভর করে এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

যখন দেখতে পাব যে আমাদের দেশে সঙ্গীত ও সাহিত্যের ধারা বন্ধ হয়েছে তখন বুঝব দেশে প্রাণশক্তির স্রোতও অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই প্রাণশক্তিকে নানা শাখা প্রশাখায় পূর্ণভাবে বহমান করে রাখবার জন্যেই, বিশ্বের গভীর কেন্দ্র থেকে যে অমৃতরস-ধারা উৎসারিত হচ্ছে তাকে আমাদের আবাহন করে আনতে হবে। ভগীরথ যেমন ভস্মীভূত সগর সন্তানদের বাঁচাবার জন্যে পুণ্যতোয়া গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন তেমনি মানসলোকের ভগীরথেরা প্রাণহীনতার মধ্যে অমৃতত্ব সঞ্চারিত করবার জন্য আনন্দরসের বিচিত্র ধারাকে বহন করে আনবেন।

সমস্ত বড় বড় জাতির মধ্যেই এই কাজ চল্‌চে। চল্‌চে বলেই তারা বড়। পার্লামেণ্টে বাণিজ্যের হাটে, যুদ্ধের মাঠে তাঁরা বুক ফুলিয়ে তাল ঠুকে বেড়ান বলেই তাঁরা বড় তা নয়। তাঁরা সাহিত্যে সঙ্গীতে কলা বিদ্যায় সকল দেশের মানুষের জন্যে সকল কালের রসস্রোত নিত্য প্রবহমান করে রাখচেন বলেই বড়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



* অভিভাষণ।

ভারতের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে কয়েকটি সমিতি বিশেষ কার্য্য করিয়াছে। লর্ড কার্জনের সময়ে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-সমিতির বিশেষ সংস্কার সাধিত হয়। ১৯১০ সালে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-মণ্ডলী ডাক্তার ফোগেল, কার্ণ প্রভৃতি মনীষীর সাহায্যে Punjab Historical Society স্থাপন করেন। এদিকে Behar and Orissa Research Society'ও খুব কাজ করিতেছেন। মৌর্য্যদের পূর্ব্বভারত ইতিহাস-সম্পর্কে ১৮২৫ সাল হইতে কলিঙ্গরাজ খারবেলের লিপি জানা ছিল। পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী হাতিগুম্ফায় উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করেন। প্যারিসের ষষ্ঠ কংগ্রেস বিবরণে এই পাঠোদ্ধার আছে। ১৬৫ মৌর্য্যাব্দে ইহা ক্ষোদিত বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফ্লীট ও লুডার্স এই অব্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। পরে ভিন্সেণ্ট স্মিথের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল খারবেল লিপির পুনরায় পাঠোদ্ধার করিয়া "১৬৫" মৌর্য্যাব্দে ইহা ক্ষোদিত হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন। ইহার ফলে ভিন্সেণ্ট স্মিথ শুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বের সমস্ত বিবরণ ৫০ বৎসর করিয়া পিছাইয়া দেন। এই লিপি সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্তও বাদানুবাদ চলিতেছে। এই লিপির সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইবার পূর্ব্বে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের দেখিতে হইবে, খারবেল নামক রাজার এই লিপি ব্যতীত অন্য কোথাও পরিচয় পাওয়া যায় কি না, বাহাপতি মিত্র ও পুষ্যমিত্র এক ব্যক্তি কি না, পুষ্যমিত্রের সহিত খারবেলের কোন সংঘর্ষ শুঙ্গবংশের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় কি না। এই বিষয়গুলি আমাদের ভাল করিয়া বিচার করিয়া এই লিপির সিদ্ধান্ত কতদূর গ্রহণযোগ্য তাহা দেখিতে হইবে।

এইবার আমরা আমাদের বঙ্গদেশের বিষয় কিছু বলিব। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার ইতিহাসের কিছু কিছু উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশাল গবেষণাক্ষেত্রের কোন কোন অংশে এখনও কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। মৃত্তিকাগর্ভে যে ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহ লুক্কায়িত আছে, তাহার উদ্ধারের জন্য যে অর্থ ও শক্তি নিয়োগ প্রয়োজন, তাহা এখনও বিশেষভাবে করা হয় নাই। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে মালদহ জেলার অন্তর্বর্ত্তী গৌড়, মুর্শিদাবাদে রাঙ্গামাটী ও পাঁচথুপী, বগুড়া জেলার মহাস্থান, পাহাড়পুর, বিহার ও মহীপুর, দিনাজপুরে জগদ্দল প্রভৃতি প্রাচীন স্থান ঐতিহাসিকগণের তত্ত্বাবধানে খনিত হইলে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য নিশ্চয়ই বাহির হইবে। বর্ত্তমান প্রণালীর ইতিহাস আলোচনা এ দেশে অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। উনবিংশ শতকে তাঁহাদের বিপুল প্রচেষ্টার ফলে প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অনেক লুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। এই শতকের শেষভাগে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী ও রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার-

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মেদিনীপুর-অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

প্রমুখ ভারতবাসী ঐতিহাসিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। অধুনা তাঁহাদের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া আরও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এক্ষণে বলিতে পারা যায়, ঐতিহাসিক গবেষণাক্ষেত্রে ভারতীয়ের কৃতিত্ব কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। পাদ্রে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিবার পর, রাজা রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থ-সংগ্রহে" বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। তারপর "বঙ্গদর্শনে" বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গের ইতিহাসের শুভ সূচনা করেন। শ্রদ্ধেয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও ছোটরকমের একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়া ফেলেন। 'বঙ্গদর্শন' উঠিয়া যাইবার সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইতিহাস আলোচনায় ব্রতী হন। ক্রমশঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের মৌলিক গবেষণা দ্বারা আমাদের দেশের ধারাবাহিক ইতিহাসের ভবিষ্যৎ লেখকগণের পথ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করিয়া দিতেছেন। অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ঐতিহাসিক আলোচনায় অগ্রণী হইয়া, এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, রাজসাহীতে আজ কয়েক বৎসর হইল, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে এই সমিতির কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে ইহার বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সকল বিভাগের পরিচয় দেওয়া এই অল্প সময়ে সম্ভবপর নয়। তবে উদাহরণস্বরূপ দুই চারিটী বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিব। গুপ্তরাজাদিগের কোন লিপি পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ছিল না, এক্ষণে তাঁহাদের একখানিমাত্র তাম্র-শাসন বঙ্গদেশে রাজসাহী জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানি প্রথম কুমারগুপ্তের লিপি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত—এই কয়জন গুপ্তরাজারও কয়েকটী মুদ্রার আবিষ্কার বাঙ্গালা দেশে হইয়াছে। এইরূপ প্রমাণ আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিকের দেখিবার সুবিধা হইবে, বঙ্গদেশ কোন দিন গুপ্তদিগের অধিকারভুক্ত ছিল কি না।

ভৌগোলিক সংস্থান-নির্ণয় ইতিহাসের একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। ভৌগোলিক সংস্থান স্থির না হইলে ঐতিহাসিক ব্যাপার লইয়া অনেক সময় নানা গোলে পড়িতে হয়। বঙ্গের কোন্ সময়ে কতটা সীমা ছিল, বঙ্গ নাম কেন হইল, বঙ্গে কত জাতির প্রভাব ছিল এবং বঙ্গের উপর অন্য জাতির প্রভাবের পূর্ব্বে ইহার অধিকারীরা কিরূপ ছিল, এই সমস্ত বিষয়েরও মীমাংসা করিতে হইবে। দশকুমারচরিতে পাওয়া যায়, "সুহ্মেষু দামলিপ্তী নাম নগরী॥" দামলিপ্তী বা তাম্রলিপ্তি মেদিনীপুরের তমলুক; দেখা যাইতেছে, ইহা এক সময়ে সুহ্মের রাজধানী ছিল; সুতরাং সেই সময়ে সুহ্মের সংস্থানও স্থির হইয়া যাইতেছে। কিন্তু বরাহমিহিরের সময় সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত পৃথক্ ছিল। কেন না, তিনি "তাম্রলিপ্তকাঃ" ও "সুহ্মাঃ" পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ দিকে মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠ, সুহ্ম ও রাঢ়ের একই অর্থ করিয়াছেন। পালি মহাবংশের নির্দ্দেশ হইতে বঙ্গ মগধের মধ্যে উত্তর-রাঢ়ের সংস্থিতি পাওয়া যায়। কাজেই নীলকণ্ঠের "রাঢ়" ও সুহ্ম অভিন্ন হইবার পক্ষে আপত্তি থাকে না। এইরূপে যে সমস্ত স্থানে সুহ্মের উল্লেখ আছে তৎসমুদয় একত্র

সমাবেশ করিয়া বিভিন্ন সময়ে সুহ্মের সংস্থান ঠিক করিতে হইবে এবং সুহ্ম বলিতে আসাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান বোঝা সম্ভব কি না, তৎসম্বন্ধে সমস্ত তর্কের সমাধানও করিতে হইবে। পুণ্ড্র, গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, সমতট প্রভৃতি স্থান লইয়াও অনেক তর্ক আছে। এই সমস্ত স্থানের সংস্থান লইয়া বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। এইগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার।

সমতটের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া এত দিন ঐতিহাসিকগণ নানারূপ মতবাদের অবতারণা করিতেছিলেন। সম্প্রতি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিল্‌কিনিয়া গ্রামে উৎকীর্ণ লিপি সমেত একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে বিল্বকিণ্ডকিয়' গ্রাম যে সমতটের অন্তর্গত, তাহা ক্ষোদিত আছে। সুতরাং ত্রিপুরা জেলা যে সমতটের অন্তর্গত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। "বাঙ্গালা নগরে"র সংস্থান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ১৯২০ সালে Hodivala ও ১৯২১ সালে Geographical Journal এ সম্বন্ধে কয়েকটী নূতন তথ্যের সংবাদ দিয়াছেন।

বাঙ্গালার রাজাদের সময় লইয়াও অনেক গোলমাল। ধর্ম্মপাল, হরিবর্ম্মা ও বল্লালসেনের সময় এখনও ঠিক হয় নাই। ১৯১৭ সালে এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় বিজয়সেনের তাম্রশাসনে "৬১" রাজ্যাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা "৩২" বলিয়া পাঠ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনের রাজ্যাঙ্ক "৬১" হইবে বলিয়া মনে হয়। এই রাজ্যাঙ্ক "৬১" হইলে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, বিজয়সেন ১১১৮—১১১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আসিয়া পড়েন। তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত লক্ষ্মণসেনের প্রথম রাজ্যাঙ্ক যে ১১১৮—১১১৯ খৃষ্টাব্দ তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এদিকে আবার মিথিলার সমস্ত পঞ্জিকার উল্লেখে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাঙ্কের আরম্ভ ১১০৬ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। মিথিলার যাবতীয় পুঁথিতেও এই সময়ই পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের সময় বিচারকালে এ বিষয়টীও উপেক্ষিত না হইয়া আলোচনার সহায়ক হইতে পারে।

সম্প্রতি চন্দ্রবংশের রাজাদেরও কালনিরূপণ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

কুলগ্রন্থকে কেহ কেহ একেবারেই ইতিহাসে স্থান দেন না। কুলগ্রন্থে যে সকল নৃপতির নাম আছে, সেগুলি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন না। কিন্তু যেমন পুরাণে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা হইতে পারে, সেইরূপ কুলশাস্ত্রও একেবারে উপেক্ষার জিনিস নয়। ইহাতেও ঐতিহাসিক মালমসলা আছে। তবে সেগুলি অতি সতর্কতার সহিত বিশ্লেষণ করা চাই। কুলগ্রন্থে বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ একেবারে নাই, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কুলগ্রন্থে অনেক সময় বিবরণে ভুল থাকে বটে, কিন্তু তাহা হইতেও সময় সময় সত্য বাছাই করিয়া লইতে পারা যায়।

কয়েকজন ঐতিহাসিক কুলগ্রন্থে উল্লিখিত আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্দেহ করিবার কারণও আছে। ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি আদিশূরের

অস্তিত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান্ বলিয়া কেহ কেহ লিখিয়াছেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিতে চাই যে, বাংলার ঐতিহাসিককে সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাঁহাকে বাংলার ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

এক্ষণে আমরা ইতিহাসের সংজ্ঞা ও প্রসার নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। আমাদের নিকট আজকাল যাহা "ইতিহাস", খুব প্রাচীন কালে "ইতিহাস" বলিলে ঠিক তাহা বুঝাইত না। পূর্ব্বকল্পে ঘটিয়াছিল, এইরূপ আখ্যায়িকা বুঝাইতে ঋগ্বেদে "ইতিহাস" শব্দের প্রয়োগ আছে। শতপথব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে ইতিহাসের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। সুদূর অতীতে কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে, সেই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলা হইত ইতি—হ—আস অর্থাৎ ইতি = ইহা, হ = নিশ্চয়, আস = হইয়াছিল। ঘটনা সত্য না হইলে কখনই তাহাকে ইতিহাস বলা হইত না। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই অর্থেরই ইঙ্গিত আমরা বুদ্ধঘোষ প্রণীত "সুমঙ্গলবিলাসিনী"র অম্বট্ঠ-সুত্ত-বণ্ণনা'য় এইরূপ পাই— "ইতিহাস-পঞ্চমং—অথব্বণবেদং। চতুত্থং কত্বা ইতি হ আস ইতি হ আসাতি ঈদিস-বচন পতিসংযুত্তো পুরাণকথাসংখাতো ইতিহাসো পঞ্চমো এতেসন্তি ইতিহাসপঞ্চমা। তেষং ইতিহাসপঞ্চমানং বেদানং।" কোন প্রাচীন কথার শেষে "ইতি হ আস" এই কথাটী বলা হইত। ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, তখন প্রধানতঃ চারিটী প্রণালীতে ঘটনা বিবৃত হইত,—প্রথম ইতিহাস, দ্বিতীয় পুরাণ; তারপর আর দুইটি হইতেছে—"শ্লোকাঃ" ও "নারাশংসী"। কোন ঘটনা সমাবেশে বড়লোকের কথা বলিয়া বহুবচনান্ত "শ্লোকাঃ" এইরূপ বলা হইত। অন্য কোন একপ্রকারের আখ্যায়িকার নাম ছিল "পুরাণ"। "ইতিহাস-পুরাণ" এক সঙ্গে কোথাও কোথাও আছে।

ইতিহাস-পুরাণের সকলের চেয়ে পুরাতন উল্লেখ আমরা পাই অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষ দিকে। কোন কোন জায়গায় "পুরাতন ইতিহাসেরও উল্লেখ আছে, তবে তাহা বৈদিক সাহিত্যের পরবর্ত্তী গ্রন্থেই পাওয়া যায়। অনুগীতায় নারদ ও দেবমতের "পুরাতন ইতিহাস" বিবৃত আছে। দেবমতের নাম বৈদিক সাহিত্যে কোথাও নাই। অনুগীতার সময় বৈদিক প্রবাদ পুরাণ' হইয়া যাওয়ায় সম্ভবতঃ "পুরাতন ইতিহাস" নাম হইয়া থাকিবে। বেদে "নারাশংসী" নামে একরূপ আখ্যায়িকা আছে। এগুলি অনেকটা "History"র মত। এগুলিতে প্রাচীন লোকদের বংশবিবরণ থাকিত, আর থাকিত তাহাদের গুণকীর্ত্তির গাথা। রাজপুতানা ও গুর্জ্জরের চারণদের গানে এগুলির কিছু আভাস পাওয়া যায়। নারাশংসীর ন্যায় "গাথা" বলিয়া একরূপ আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। এইগুলি বৈদিক যুগের পর নারাশংসীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া "নারাশংসী গাথা" বা শুধু গাথায় পরিণত হইয়াছিল। এই সমস্ত আখ্যায়িকার উপ-বিভাগ ও বৈদিক সাহিত্যে বিরল নয়। আখ্যান, অন্বাখ্যান, ব্যাখ্যান অনুব্যাখ্যান প্রভৃতি যে এই সমস্ত আখ্যায়িকার কোনরূপ উপ-বিভাগ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এগুলি কিরূপ ছিল, তাহা জানি না। প্রাচীন যুগের ইতিহাসের ধারা আলোচনা করিবার সময় এখনও

হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে দিগ্‌দর্শন হিসাবে একটু ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

ডিল্‌থে (W. Dilthey) ট্রএলট্‌শ্‌ (E. Troeltsch), ভুণ্ড্‌ট্‌ (W. Wundt), এনানডেল (C. Annandale) ও জর্জ্জ প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইতিহাস কি এবং তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। এ বিষয়ে দশজন পণ্ডিতে যে সমস্ত কাজের কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমি বিশেষ সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া, তাঁহাদের উক্তির সার নিষ্কর্ষ করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

গ্রীসদেশের সুপণ্ডিত হেরোডোটস্ ইতিহাস অর্থে ঘটনার বিবৃতি ও মানবের সামাজিক ও নাগরিক অবস্থার বর্ণনই বুঝিয়াছিলেন; বহুদিন ধরিয়া এই মনীষীর পথানুসরণ করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ ইতিহাসের এই সংজ্ঞাই নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিল। তারপর ইতিহাসের পরিসর আর একটু বাড়াইয়া দিয়া, পণ্ডিতেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনার বিবরণকে ইতিহাস নামে আখ্যাত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির অন্তঃস্থল তন্ন তন্ন করিয়া যে সমুদয় সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহাও প্রাকৃতিক ইতিহাস বা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইল। এই অর্থেই শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস, আবিষ্কারের ইতিহাস, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, এমন কি, জীবনবৃত্ত ও ইতিহাসের সুবিশাল গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিল। ক্রমে পণ্ডিতেরা বুঝিলেন, এই অতিবিস্তৃতিদোষদুষ্ট সংজ্ঞাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ইহাকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। অবশ্য উল্লিখিত বিষয়গুলির বিবৃতিকে যে ইতিহাস আখ্যা দেওয়া যায় না, তাহা নহে; ঐগুলি মানবের সহিত সংশ্লিষ্ট—সমাজবদ্ধ মানবের সুখদুঃখের অনুভূতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, এগুলি সমাজ-জীবনের তন্ত্রীতে যে ভাবে আঘাত দেয়, প্রকৃত ইতিহাস সে ভাবে আঘাত দেয় না। ইতিহাসের আঘাতে সমাজে যেরূপ সাড়া পাওয়া যায়, এগুলির আঘাতে সেরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইতিহাসকে কেবল ঘটনার ফিরিস্তি, রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের অধিনায়কদিগের জীবনের ঘটনার বিবৃতিতে পর্য্যবসিত না করিয়া ইহার সীমা এরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন যে, সেই ঘটনাই ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিবে—যাহা দ্বারা সমবেত মানব সমাজগঠনপ্রয়াসী হইয়া, তাহার মঙ্গলকামনায় মানবসঙ্ঘের উন্নতি বা অবনতির কারণ হইবে—মানব-সম্মেলনের ভাবধারাকে বংশপরম্পরায় সঞ্জীবিত রাখিবে; অবশ্য সেই ভাবধারা যে অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে, তাহা নহে—অবস্থা বিশেষে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। এই সম্মিলিত সমাজের কার্য্যাবলী, জাতি রাষ্ট্র, রাজ্য, প্রজাতন্ত্র, সাম্রাজ্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। আমরা কোন সমিতি সম্পর্কে 'সমিতির ইতিহাস' এইরূপ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি, কিন্তু সমিতি, ব্যবহার জীব-সমিতি, নাগরিক কর্পোরেশন, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনবৃত্ত বা বংশাবলীর কাহিনী প্রকৃত ইতিহাস-পদবাচ্য নহে। অবশ্য এগুলি যদি রাজনৈতিক উন্নতি বা অবনতির সহায় হয়, তাহা হইলে ইহারা ইতিহাস গঠনে উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে।

ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, ঘটনাবলী ও অনুষ্ঠাতাদিগের সংখ্যা অগণিত। ইতিহাস কেবল সাধারণ ঘটনার সমবায় নহে। কোন ঘটনাই আকস্মিক ব্যাপারে উদ্ভূত হয় না। যখন এইরূপ কতকগুলি সাধারণ ঘটনা কেন্দ্রাতিগ হয়, কিম্বা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধন করে, তখনই বিশেষ বিশেষ ঘটনা উৎপন্ন হয়। ইতিহাসের আলোচ্য হইতেছে এই বিশেষ ঘটনা। শুধু এইগুলির বিবৃতি করিয়া ইতিহাস ক্ষান্ত থাকে না, ইহাদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়। কোন্ ইচ্ছাশক্তির বলে ঘটনার সমবায় বা বিরোধ উপস্থিত হইল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টার নামই কারণ—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা Psychological motive বলিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক চিন্তা উদ্দেশ্যমূলক। অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সঙ্কল্প মানব-হৃদয়ে কেন উদ্ভূত হয়, তাহা বুঝিতে হইবে—আর বুঝিতে হইবে, কেনই বা মানব সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। বাস্তবিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ঘটনা ও ঘটনার নায়কদিগের সঠিক বিবরণ জানা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ, মানব যে ইচ্ছাশক্তি-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার সঠিক পরিচয় সহজে সকলে পায় না; কিন্তু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি কেন সমাজে চলিয়াছিল, তাহা চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

একটা চলিত প্রবাদ আছে, ঐতিহাসিক ঘটনার দর্শন পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায় (History repeats itself)। কথাটা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যতটা প্রযোজ্য, ততটা অন্য ঘটনা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কোন অবস্থাবশে কোন দেশে যে প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা হইয়াছিল, সেই অবস্থা-সমাবেশ যদি অপর দেশে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারি, প্রাগুক্তরূপ অনুষ্ঠান শেষোক্ত দেশেও কার্য্যকারী হইতে পারে। প্রকৃত ঐতিহাসিকের বহু দেশ ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সভ্যতা-ধারার অনুযায়ী অনুষ্ঠানগুলি কি অবস্থায় জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। এমিল রাইখ (Emil Reich) সত্যই বলিয়াছেন, "The untravelled historian is like a chemist who has no laboratory. Travel and sojourn in countries of different types of civilisation can alone give those object impressions of the forces of history without which the related facts can be neither interpreted nor co-ordinated" ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষাদ্বারা অবশেষে যেমন রাসায়নিক সত্য বাহির হইয়া থাকে, সেইরূপ বহু দেশের অনুষ্ঠানের পূর্ব্বাপর ঘটনা পরিদর্শন করিয়া আমরা তেমনই ঐতিহাসিক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। তর্কশাস্ত্রের মতে কারণ সেই অবশ্যম্ভাবী অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ব্বঘটনা বা ঘটনার সমাবেশ, যাহা কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। শুধু বর্ত্তমানের আলোচনা করিলে প্রকৃত ইতিহাস গড়িয়া উঠিবে না। বিগত শতকে আরণল্ডপ্রমুখ পণ্ডিতেরা বর্ত্তমানের উপর ইতিহাস গড়িবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বর্ত্তমানের দ্বারা অতীতকে বুঝিতে হইবে, আবার অতীতই যে বর্ত্তমানের কারণ, তাহাও ভুলিলে চলিবে না। তাই ঐতিহাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য, অতীত বর্ত্তমানের তুলনামূলক সমালোচনা করা। আর একটা কথা মনে রাখিতে

হইবে, অতীতের সমস্ত ঘটনা পরস্পর এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রাকারে গ্রথিত—শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোন একটী ঘটনাকে সেই শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত করা যায় না। প্রত্যেক ঘটনাই সমগ্রের অংশ—সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার কোনই অর্থ থাকে না। অধ্যাপক বুরী বলিয়াছেন, জীবদেহ হইতে কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন সেই অংশের কোন মূল্য থাকে না, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনা হইতে বিমুক্ত করিয়া কোন একটী ঘটনাকে পৃথক ভাবে দেখিলে তাহারও কোন মূল্য থাকে না। এ বিষয়ে আমরা দর্শনাভিমুখ ইতিহাস আলোচনা-কালে বিশেষ ভাবে বলিব। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইতিহাসের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য এবং এইগুলিই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু ইতিহাসের কতকগুলি গৌণ উদ্দেশ্যও আছে। মানবের কার্য্যাবলী লইয়া যখন ইতিহাসকে নাড়াচাড়া করিতে হয় তখন এই মানবের প্রকৃত তত্ত্ব বোঝাও আবশ্যক। নৃতত্ত্বে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। তার পর সমাজ বা জাতিতত্ত্বের আলোচনাও ইতিহাসের বিষয়ীভূত।

প্রধানতঃ ভূগোল, জীবনবৃত্ত, ব্যবহারশাস্ত্র, পুরাবৃত্ত, ধর্ম্ম, আচার ও সাধারণ জ্ঞান ইতিহাস রচনার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এগুলি গৌণভাবে ইতিহাস রচনার সহায়তা করিয়া থাকে। তার পর প্রাচীন বংশাবলীর প্রশস্তি প্রভৃতির সহিত পরিচয় না থাকিলে, মুদ্রাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে ইতিহাস রচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ইতিহাসের স্রোত ত্রিধা প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহার একটি ধারা কলাভিমুখী, অন্যটি বিজ্ঞানাভিমুখী, তৃতীয়টা দর্শনাভিমুখী। এই তিন ধারার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে ঐতিহাসিক প্রণালীর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। মানবই ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার শক্তির একটা সীমা আছে; সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে কলা বা আর্টের আবশ্যক। প্রকৃত ঐতিহাসিকের নিকট জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকা চাই—তিনিই প্রকৃত ঐতিহাসিক হইতে পারিবেন, যিনি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞানী হইয়াছেন। সাংসারিক বুদ্ধি যাঁহার যত বেশী, তিনি ঐতিহাসিক সত্য তত অল্প আয়াসে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন। ইতিহাসের লক্ষ্য সত্য নির্দ্ধারণ। ঘটনাবলী পাইলেই ঐতিহাসিক তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন না। তিনি তর্ক ও দর্শন-শাস্ত্রের কষ্টি পাথরে সেগুলি যাচাই করিয়া দেখেন—তাহারা খাঁটি সত্য কি না। তাই বলিতেছিলাম, ঐতিহাসিক হইতে গেলে তাঁহাকে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান ঐতিহাসিক আলোচনার পথকে দুর্গম করিয়া দিয়াছে। এখন শুধু ঘটনার তালিকা দিলেই ইতিহাস হয় না। অবশ্য ঘটনার তালিকা বা পৌর্ব্বাপর্য্য-সূচী যে ইতিহাসের অঙ্গ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা ইতিহাসের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না বা কেবল মাত্র ইহার উপর ইতিহাসের সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে না।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

ভ্রম সংশোধন—৪৫পৃঃ, ৬ষ্ঠ পংক্তি—১০৩১এর পরিবর্ত্তে ১০২১।

৪৭ পৃঃ, ১২শ পংক্তি—তন্মধ্যস্থ মৃৎপুস্তকের গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে

৪৭ পৃঃ, ২য় প্যারার ১২শ পংক্তি—মুগোজিনএর পরিবর্ত্তে রগোজিন ও আর একজন।

৪৮	পৃষ্ঠার	৩য়	পংক্তিতে	চীন প্রজাদের	পরিবর্ত্তে চীনপ্রভাবের
৪৯	পৃষ্ঠার	৬ষ্ঠ	পংক্তিতে	আসামএর	„ আনাম
„	„	১২শ	„	সরযদেশ	„ সয়মদেশ
„	„	২৫শ	„	কুষাণ, কণিকট	„ কুশাণ, কনিষ্ক
„	„	২৬শ	„	মহাযান	„ মহাযান

৫০ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ শেষের ২ পংক্তি—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে মুদ্রা বা লিপি জাল কিনা অথবা কোন ইসলাম আপুন কর্ত্তৃক অরেল ষ্টাইনের ন্যায় মুদ্রা বা লিপি পরীক্ষক প্রতারিত হইতেছেন কিনা।

যুধিষ্ঠিরের অধর্ম্মাচরণ

যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক আখ্যায় অভিহিত। ধর্ম্মের পুত্ররূপে পরিকল্পিত। মহাভারত খানা তাঁহার ধার্ম্মিকতার বর্ণনায় পবিত্রীকৃত। তিনি মধুর ভাষী অথচ সত্য পরায়ণ। তাঁহার অক্রোধ, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন নিরহঙ্কার জীবনের মাধুর্য্যে জগৎ আজও মুগ্ধ। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৎসল মাতৃভক্ত, বন্ধু-অনুরাগী, কর্ত্তব্যসাধনরত, ন্যায়নিষ্ঠ, প্রকৃতি পুঞ্জের অতিপ্রিয়। সত্যপালনের দৃঢ়তা তাহাতে অসাধারণ রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মহাভারতপাঠী প্রত্যেকেই তাহা অবগত আছেন। পরম শত্রু দুর্য্যোধনের বিপদেও তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে দেখা গিয়াছে; তাঁহার হৃদয় করুণা পীযূষে এত পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই নীতি ধর্ম্মের অনুগত হইয়া, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় সরোবরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে শুধু ধর্ম্মের অনুরাগ হেতু বৈমাত্রেয় সহোদরকে জীবিত করিবার জন্যই প্রার্থনা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বার্থপরতা মনে স্থান লাভ করে নাই। অবৈধ কার্য্যের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও বিরক্তি অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। বীরের সম্মান রক্ষায় ও তাঁহার আগ্রহের অভাব ছিল না। উরু ভঙ্গে ভূপতিত দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করায় ভীমকে তিনি পরুষ ভাষায় ভর্ৎসনা করিতে বিরত হন নাই। বনবাস ও রাজত্ব উভয়ত্রই তাঁহার নির্ব্বিকার চিত্তের অবস্থা অনুভব করা যায়। ফল কথা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের জীবনের ন্যায় উচ্চাদর্শময় জীবন অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার অলোকসামান্য সংযম, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, উদারতা, আশ্রিতবাৎসল্য ও সর্ব্বকার্য্যে অচঞ্চলতা বস্তুতঃই বিশ্বরাজ্যে দুর্ল্লভ। কিন্তু কি জানি এহেন চরিত্রবান দেবত্বের দ্যুতি সম্পন্ন যুধিষ্ঠিরের জীবনও কলঙ্ক কালিমার দাগ পরিশূন্য হইতে পারে নাই। ইহা হয়ত স্বাভাবিক। মানুষ যতই বড় হউক না কেন, তাহাতে দুই এক ফোঁটা কলঙ্কের চিহ্ন থাকিবেই থাকিবে, ইহা সুপ্রতিপন্ন করিবার জন্যই যেন যুধিষ্ঠিরের পুণ্যোজ্জ্বল জীবনে অধর্ম্মের ক্ষুদ্র রেখা পাত করা হইয়াছে।

যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের বধ সাধনের জন্য কৃষ্ণের আদেশে "অশ্বত্থামা হত" উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া যে অধর্ম্মাচরণ ফলে নরক দর্শন করিয়াছিলেন; তাহা সকলেই জানেন। তদ্ব্যতীত অন্য একটী অধর্ম্মাচরণের বিষয় আমরা বিবৃত করিতেছি। ইহার কোনরূপ শাস্তি লাভের কথা মহাভারতকার উল্লেখ করেন নাই। তাহা আত্মরক্ষার অনুরোধে অনুষ্ঠিত বলিয়া অধর্ম্ম আখ্যা লাভ করে নাই কিনা বলিতে পারিনা।

আমরা যুধিষ্ঠিরের মত একজন মহাপুরুষের আত্মরক্ষাকল্পেও স্বার্থপরতায় হৃদয়হীনতায় দৃষ্টান্ত দেখিলে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারি না। যে যুধিষ্ঠির আগন্তক অতিথি দেবতার প্রতি সভক্তি ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা অভ্যস্ত, তাহাদের তুষ্টি সাধন ও অপকার বিনাশন, যাঁহার আন্তরিক স্পৃহা, সেই যুধিষ্ঠির আত্মরক্ষার অনুরোধে আশ্রিত অতিথি বা আগন্তকদিগকে জানিয়া শুনিয়া দগ্ধীভূত হইয়া মৃত্যুর জন্য জতুগৃহে রাখিয়া পলায়ন করিলেন।* যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে ইহা অশোভন

* কপট ব্যবহার দ্বারা দুরাত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছি। সম্প্রতি আমাদের পলায়নের সময় উপস্থিত

ও দুর্মোচ্য অধর্ম্ম নয় কি? প্রতিহিংসাপরায়ণ দুর্য্যোধন বারণাবতে যতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া যুধিষ্ঠিরাদিকে পোড়াইয়া মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি বারণাবতে যতুগৃহে বাস কালীন দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধির বিষয় বিদুর কর্তৃক পরিজ্ঞাত হইয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করেন। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় ভীম যতুগৃহে অগ্নি প্রদান করেন। যতুগৃহ ভস্মীভূত হইয়া যায়। এ সংবাদ শ্রুত হইয়া দুর্য্যোধন বারণাবতে লোক প্রেরণ করেন এবং ছয়টী দগ্ধীভূত মৃতদেহের সংবাদ প্রাপ্তে যুধিষ্ঠিরাদির নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়া নিশ্চিন্ত হন। ঐ ছয়টী মানুষের দগ্ধাবয়ব যতুগৃহের ভস্মাবশেষের মধ্যে না থাকিলে যুধিষ্ঠিরাদির নিরাপদ হওয়া সম্ভব হইত না। দুর্য্যোধনের ষড়যন্ত্র তাঁহাদের বধ সাধনের জন্য অনলস ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। আগন্তুক ছয়জন মানুষকে পুড়িয়া মরিবার জন্য যতুগৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাই তাঁহারা কিছুদিন নিরুদ্বেগে ছিলেন।

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে এ ঘটনায় কলঙ্ক মুক্ত করা যায় কিনা? তিনি এঘটনার বিন্দু বিসর্গ না জানিলে ঐ ছয়জন আগন্তুক দৈব প্রেরণায় দগ্ধ হইয়া মরিলে তাহার কোন পাপ হইতনা। কিন্তু তিনি জানিয়া শুনিয়া ছয় জন মানুষকে যতুগৃহে রাখিয়া যাইবার সংকল্পই পূর্ব্ব হইতে করিয়াছিলেন যখন আমরা দেখিতে পাই, তখন এ মহাপাপের ভাগী তাঁহাকে ভিন্ন কাহাকে করা যাইতে পারে? অতিথি রক্ষা অপেক্ষা এখানে আত্মরক্ষার প্রাধান্য দেওয়ায় যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মবোধ লঘুতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে অতিথির মনোরঞ্জনের জন্য মহাত্মা কর্ণ স্বহস্তে পুত্রের শির করাতে কাটিতে কুণ্ঠিত হন নাই; ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য সেই অতিথির বিনাশ সাধন করাইলেন। এ কলঙ্কের গভীর চিহ্ন যুগযুগান্তে বিলীন হইবার নহে। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, গোলাপে কণ্টক আছে, তাই যুধিষ্ঠির ও অধর্ম্ম শূন্য হইতে পারেন নাই। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র যেন জগতে হইতে পারে না যুধিষ্ঠির তাহার অকাট্য প্রমাণ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

তৃষ্ণা।

"দে জল্ বলে" চাতক ডাকে!
চোখের নেশা, দারুণ তৃষা
কাহার আশায় প্রাণটা থাকে?
দারুণ গ্রীষ্ম তপ্ত ধরা,
মেঘে মেঘে আকাশ ভরা,
তড়িত বালা প্রাণের জ্বালা
জ্বালিয়ে দিয়ে মুখটা ঢাকে;

"দে জল্ বলে" চাতক ডাকে!
কত দিন আজ তারে ছাড়া
মেঘ কেন গো দেয়না ধারা?
নীল আকাশে ভেসে ভেসে
গুর্ গুরিয়ে কেবল ডাকে!
চোখের নেশা দারুণ তৃষা
চাতক হয়ে প্রাণ্টা থাকে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

হইয়াছে। অদ্য আয়ুধাগারে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক পুরোচনকে ভস্মসাৎ করিয়া ছয়জনকে এখানে রাখিয়া অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব। যতুগৃহ পর্ব্ব অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।
কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।

তাঁতের কথা।

আমাদের লজ্জা নিবারণের জন্য যত কাপড় চোপড়ের প্রয়োজন তাহা দেশেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, অন্য কোন দেশের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না—দেশময় এই আন্দোলন উঠিয়াছে। কি করিলে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে এই প্রশ্নের সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা এখনও হয় নাই। অনেকের মতে যে পর্য্যন্ত আমরা এদেশে যথেষ্ট কাপড়ের কল স্থাপন করিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত লজ্জা নিবারণের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। পক্ষান্তরে মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথ অনুসারে চরকা ও হস্ত চালিত তাঁতের সাহায্যে আমাদের লজ্জা নিবারণের জন্য যত বস্ত্রের প্রয়োজন তাহা আমরা চেষ্টা করিলেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারি—ইহাও অনেকের ধারণা। কোন মতের সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে আমার মনে হয় এ বিষয় কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে জানা থাকিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা কম হইতে পারে। আমি অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির সহিত কথা বলিয়া দেখিয়াছি; তাঁহাদের ধারণা এই যে তাঁতে কাপড় বোনার ব্যবসা এদেশ হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; এবং এই লুপ্তপ্রায় ব্যবসার পুনরুদ্ধার করিবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র; এ বিষয়ে প্রকৃত যাহা ঘটিতেছে সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব মনে করিয়াছি। মীমাংসা যাহা হয় আপনারা করিয়া লইবেন।

১৯১৩—১৪ সন পর্য্যন্ত হিসাব নিয়া দেখা যায় যে ঐ সময়ে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসরে প্রায় ৪৬৮ কোটী গজ কাপড়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ১৯১৯।২০ সন পর্য্যন্ত নানা কারণে ব্যবসা বাণিজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে এবং কাপড়ের দর বাড়িয়া যাওয়ায় ও লোকের ক্রয় করিবার শক্তি হ্রাস হওয়ায় সেই সময়কার হিসাব দ্বারা কোন প্রকৃত মীমাংসা করা সম্ভবপর নহে। এই জন্য যুদ্ধের পূর্ব্বেকার গড়পরতার হিসাব গ্রহণ করিতে হইল। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে এই যুদ্ধ না হইলে, এবং পূর্ব্বে যে ভাবে লোকের জীবনযাত্রা চলিতেছিল, সেই ভাবে চলিতে থাকিলে স্বাভাবিক নিয়মে কাপড়ের প্রয়োজন আরও বাড়িয়া যাইত এবং বৎসর ৪৬৮ কোটী গজের অধিক প্রয়োজন হইতে পারিত। এখন দেখা যাউক এই ৪৬৮ কোটী গজ কাপড় কি প্রকারে সরবরাহ করা হইত। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে প্রায় তিন শত কাপড়ের কল চলিতেছে। ঐ সময়ে গড়ে প্রতি বৎসর ঐ সকল কলে একশতদশ কোটী গজ কাপড় এবং তাঁতে একশতবার কোটী গজ কাপড় বোনা হইতেছিল। মোট দুইশত বাইশ কোটী গজ কাপড় ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতে ছিল। ইহা হইতে নয় কোটী গজ রপ্তানি হইত। সুতরাং ভারতবর্ষে ব্যবহারের জন্য ভারতবর্ষে প্রস্তুত কাপড় ২১৩ কোটী গজ অবশিষ্ট থাকিত। ৪৬৮ কোটী হইতে ২১৩ কোটী গজ বাদ দিলে বাকী ২৫৫ কোটি গজ বিদেশ হইতে আমদানি হইতেছিল সন্দেহ নাই।

মিলে যত কাপড় ও সুতা প্রতিমাসে তৈয়ারী হয় তাহার হিসাব প্রতিমাসে গবর্ণমেণ্টের

কাছে দিতে হয়। সুতরাং মিলের প্রস্তুত কাপড় ও সুতার পরিমাণ ৫ বছরের গড়পরতা হিসাব করা সহজ। তাঁতের বোনা কাপড়ের মোট পরিমাণ অন্য প্রকারে স্থির করা হয়। তাঁতের সকল কাপড়ই মিলে প্রস্তুত সুতা দ্বারা বোনা হইয়া থাকে ইহা ধরিয়া নেওয়া হয়। এই সকল সুতার অধিকাংশ এদেশের মিলে প্রস্তুত, এবং সামান্য পরিমাণ বিদেশের আমদানী। এদেশে যত সুতা তৈয়ার হয় উহার মোট পরিমাণ জানা আছে। তাহার কিয়দংশ রপ্তানি হয়। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা এদেশে মিলে ও তাঁতে কাপড় বোনার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ইহার পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। আমদানী করা সুতার কিয়দংশ পুনরায় এদেশ হইতে নানাস্থানে রপ্তানি হয়। বাদবাকী যাহা থাকে তাহা এদেশের মিলে ও তাঁতে বোনা হয়। সুতরাং ইহার পরিমাণ নির্ণয় করাও সহজ। উপরি লিখিত প্রণালীতে এদেশে মিলে ও তাঁতে মোট যত সুতা বোনা হয় তাহার হিসাব পাওয়া গেল। এখন মিল ও তাঁতের হিসাব পৃথক করিতে হইবে। মিলে কত সুতা ও তাঁতে কত সুতা লাগে তাহা স্বতন্ত্রভাবে নিরূপণ করিতে পারিলে তাহা হইতে তাঁতে মোট কত কাপড় বোনা হয় তাহা নির্ণয় করা যায়। এক পাউণ্ড সুতা হইতে গড়ে চারিগজ কাপড় বোনা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মিলে যত কাপড় তৈয়ার হয় তাহার হিসাব ঠিক আছে এবং এই হিসাব প্রতিমাসে গবর্ণমেণ্টে দাখিল করা হয়। সুতরাং প্রত্যেক চারি গজে এক পাউণ্ড সুতা লাগিলে মোট মিলের জন্য কত সুতা লাগিল তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করা যায়। মিলে ও তাঁতে যত সুতা লাগে তাহারও সমষ্টি জানা আছে। এই সমষ্টি হইতে মিলের জন্য যাহা ব্যবহৃত হইল তাহা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তাঁতে বোনা হয় বলা যাইতে পারে। এক পাউণ্ডে চারি গজ কাপড় হয় এই ভিত্তিতে হিসাব করিয়া তাঁতে মোট যত কাপড় তৈয়ার হইল তাহা পাওয়া যায়।

এই পদ্ধতি অনুসারে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে ১৯১৩।১৪ সনের পূর্ব্বে ৫ বছরের গড়পরতা নিলে প্রতিবৎসর এদেশে তাঁতে ১১২ কোটী গজ ও মিলে ১১০ কোটি গজ কাপড় তৈয়ার হইয়াছিল। অর্থাৎ তাঁতে দুই কোটী গজ বেশী তৈয়ার হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ঐ সময় প্রতিবৎসরে মোট ৪৬৮ গজ কাপড়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং যত কাপড় আবশ্যক তাহার প্রায় চারিভাগের একভাগ ভারতবর্ষেই তাঁতে প্রস্তুত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই হিসাব ১৯১৩।১৪ সনের পূর্ব্বেকার ৫ বৎসরের গড়পরতার হিসাব। এখন দেখা যাউক ১৯২০।২১ সনের তাঁতের অবস্থা কি। ঐ বৎসরে এদেশে মিলে ৬৬কোটী পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ৪.৭৩কোটী পাউণ্ড আমদানী হইয়াছে। এই দুয়ের সমষ্টি ৭০.৭৩ কোটী পাউণ্ড হইতে ৮.২৮ কোটি পাউণ্ড রপ্তানি হইয়াছে। বাদবাকী ৬২.৪ কোটী পাউণ্ড সুতা এই দেশের মিলে ও তাঁতে বোনা হইয়াছিল। ৩৩ কোটী পাউণ্ড সুতা মিলে ও বাকী ২৯.৪ কোটী পাউণ্ড তাঁতে কাপড় বুনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। গড়ে এক পাউণ্ড সুতাতে ৪ গজ কাপড় বোনা হয় এই হিসাবে ১৯২০।২১ সনে মোট তাঁতে বোনা কাপড়ের পরিমাণ ১১৮ কোটী গজ। ১৯১৩।১৪ সনের পূর্ব্বে প্রতি-বৎসর তাঁতে বোনা কাপড়ের পরিমাণ ছিল ১১২ কোটী গজ, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে

এই সাতবছরে তাঁতে বোনা কাপড়ের পরিমাণ প্রায় ৬ কোটি গজ বাড়িয়া গিয়াছে। মিলে বোনা কাপড়ের পরিমাণ ছিল ১১০কোটী গজ। ১৯২০।২১সনে উহা বাড়িয়া প্রায় ১৩২কোটী গজ হইয়াছে। অর্থাৎ ২২কোটী গজ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২০।২১ সনে চরকার সাহায্যেও কিছু সূতা প্রস্তুত হইয়াছে সন্দেহ নাই; এবং এই সূতাদ্বারা কাপড়ও বোনা হইয়াছে। ইহার পরিমাণ কত তাহা জানিবার উপায় নাই।

উপরি লিখিত হিসাব হইতে তাঁতে কাপড় বোনা লোপ পাইতেছে প্রমাণ হয় না। বরং তাঁতের উন্নতি হইতেছে ইহাই প্রমাণ হয়। যাঁহারা মনে করেন তাঁতের ব্যবসা এদেশ হইতে চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে, ইহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা বাতুলের কল্পনা মাত্র, আমি সসম্ভ্রমে তাঁহাদের দৃষ্টি পূর্ব্বোক্ত হিসাবের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁত এখনও ভারতবর্ষের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোকের লজ্জা নিবারণ করিতেছে। ইহাকে লুপ্তপ্রায় কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? অনেকে বলিতে পারেন যে কাপড়ের কলের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাপড় তাঁতে প্রস্তুত হইত, এখন মাত্র এক চতুর্থাংশ লোকের মত কাপড় তাঁতে প্রস্তুত হয়, সুতরাং কাপড়ের কলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁত কমিয়া যাইতেছে; এবং আর কিছুদিন পরে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; পূর্ব্বাপেক্ষা এদেশে অনেক অধিক কাপড় ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। আসল কথা দেখিতে হইবে যে তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ ক্রমে কমিতেছে কি বাড়িয়া যাইতেছে; উপরে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় যে তাঁতের প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভারতবর্ষের মিলের প্রস্তুত সূতা বহুল পরিমাণে তাঁতে ব্যবহার হইয়া থাকে। ১৯০১ সন হইতে ইহার পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। নির্দ্দয়ভাবে না মারিয়া ফেলিলে তাঁত মরিবার নহে ইহাই আমার বিশ্বাস। তাঁত ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্ব। তাঁত এদেশের সভ্যতা বিকাশের অনেক সহায়তা করিয়াছে; জাতীয় জীবনের সৌন্দর্য্য ও মধুরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি যাহাতে হয় সকলেরই তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের তাঁতীরা বহুকাল ধরিয়া মিলের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে। ইহারা দরিদ্র, কিছু বাঁচাইয়া ব্যবসার উন্নতি করিতে অক্ষম। সুতরাং ব্যবসায়ী মহাজনদের নিকট ইহারা ঋণে আবদ্ধ থাকার জন্য বেশী দরে সূতা কিনিতে বাধ্য হয়। ইহাতে লাভের অংশ এত কমিয়া যায় যে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়া আর কিছু থাকে না। ভাল তাঁতের প্রচলন আবশ্যক। তাঁতীদের অবস্থার উন্নতির জন্য মহাজনদের হাত হইতে ইহাদিগকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। এই জন্য প্রত্যেক বয়ন শিল্পের কেন্দ্রস্থলে সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় ক্রয় বিক্রয়ের সমিতি স্থাপন করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ১৯১৩।১৪ সনের পূর্ব্বে প্রতিবৎসর গড়ে ৪৬৮ কোটী গজ কাপড় লাগিত। তন্মধ্যে এদেশে মিলে ও তাঁতে একত্রে ২১৩ কোটী গজ প্রস্তুত হইত; বাকী ২৫৫ কোটী গজ বিদেশ হইতে আমদানী হইত। এই ২৫৫ কোটী গজের মধ্যে অধিকাংশ

গ্রেটবিটেন হইতে আমদানী হয়, এবং বাকী যাহা থাকে তাহার অধিকাংশ জাপান হইতে আইসে। গ্রেটবিটন হইতে যত আমদানী হয়, আনুমানিক তাহার তিন চতুর্থ ভাগ Egyptian ও American উৎকৃষ্ট তুলায় প্রস্তুত সূক্ষ্ম সুতার দ্বারা তৈয়ার হয়। এই তিন চতুর্থ ভাগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এখনও সম্ভবপর নহে। এক চতুর্থভাগের সহিত প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। কিন্তু জাপান হইতে যে সমস্ত কাপড় আসে তাহার প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি করা তুলায় প্রস্তুত; সুতরাং প্রায় সমস্তই অপেক্ষাকৃত মোটা। জাপান এদেশ হইতে অনেক তুলা লইয়া যায়। ১৯২০।২১ সনে মোট ৩৭০,৫৮৫ টন্ তুলা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৬৭,৬৮১ টন একলা জাপান লইয়া গিয়াছে। এই তুলার কতকাংশ কাপড় প্রস্তুত হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ১৯২০।২১ সনে ১৭ কোটী গজের অধিক কাপড় জাপান হইতে আমদানী হইয়াছে। এই ১৭ কোটী গজ কাপড় এদেশে তৈয়ার করিতে হইলে আরও মিলও আরও তাঁতের আবশ্যক। এদেশে যত তুলা উৎপন্ন হয় তাহা সমস্ত এদেশে ব্যবহার করিবার মত মিল ও তাঁত নাই। সুতরাং প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ তুলা রপ্তানি হইয়া যায়।

এখন চরকা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। এ পর্য্যন্ত তাঁতের কাজ চালাইবার জন্য মিলে প্রস্তুত সুতার উপরই প্রায় ষোল আনা নির্ভর করিতে হইয়াছে। মিলের উদ্বৃত্ত সুতার দ্বারা তাঁতের কাজ চলিতেছে। যদি মিলে কাপড় বোনার কাজ বাড়িয়া যায় অথবা বেশী দরে সুতা রপ্তানী হইয়া যায়, তাহা হইলে এই উদ্বৃত্ত সুতার পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং তাঁতের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপ অবস্থা হইবার আশঙ্কা যে নাই তাহা বলা যায় না। যুদ্ধের সময়ে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ ১১২ কোটী গজ হইতে কমিয়া মাত্র ৭ কোটী গজে আসিয়া দাড়াইয়াছিল।

ইহার কারণ ঐ সময়ে এদেশের মিলে অনেক অধিক কাপড় প্রস্তুত হওয়ায় উদ্বৃত্ত সুতার পরিমাণ এত কমিয়া গিয়াছিল যে তাঁতের কাজ প্রায় এক রকম বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইয়াছিল। তাঁতীদের ঘরে হাহাকার উঠিয়াছিল এবং কাপড়ের দাম অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় গরীব লোকদের কতদূর কষ্ট হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই দিক দিয়া দেখিলে চরকা দ্বারা তাঁতের অনেক সাহায্য হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয়, তাঁতকে কেবল মিলের সুতার উপর নির্ভর করিতে না হইলে বিপদের আশঙ্কা কমিয়া যায়, কিন্তু ইহা করিতে হইলে চরকাকে কেবল ভাবের স্রোতে চালাইলে হইবে না, ব্যবসার হিসাবে চালাইতে হইবে। আমাদের দেশে উৎপন্ন তুলার আঁশ ছোট, এক ইঞ্চিরও কম। ইহা হইতে ৩০ নম্বরের উপর সুতা প্রস্তুত হয় না। তাহার অর্থ এই যে এই তুলা হইতে ৩০ নম্বরের উপরে সুতা তৈয়ার করিলে তাহা নরম হইবে, জোর থাকিবে না। এবং সেই সুতা হইতে কাপড় প্রস্তুত করিলে তাহাও টেঁকসই হইবে না। সুতরাং এই তুলা হইতে সরু সুতা প্রস্তুত করিতে উৎসাহ দেওয়া একেবারেই উচিত নহে। যে পর্য্যন্ত আমরা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তুলা না উৎপন্ন করিতে পারি, সে পর্য্যন্ত মোটা কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী আপাততঃ মোটা কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকিতে বলিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে তিনি বিশেষ

ভাবে বুঝিয়াছিলেন যে, এই দেশের তুলা হইতে সরু সূতা প্রস্তুত করিলে ফল ভাল হইবে না।

এখন রংকরা সূতা সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। বাঙ্গালা দেশে ১৯১৯,২০ সনে ১৮ লক্ষ পাউণ্ডের উপর রংকরা সূতা বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। ইহার মূল্য ছিল কিছুকম ৫০ লক্ষ টাকা। এই সূতার অধিকাংশ ৩০ নম্বরের উপরে। এই ১৮ লক্ষ পাউণ্ড যে সমস্ত বাংলা দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে এমন নহে। ইহার কতকাংশ বেহার উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশে গিয়াছে। ধরিয়া লওয়া যাউক যে তিন ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ ১২ লক্ষ পাউণ্ড বাংলা দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বলা যাইতে পারে যে এই ১২ লক্ষ পাউণ্ড সূতার অধিকাংশই তাঁতের কাজে লাগিয়াছে। কারণ বাংলা দেশে যতগুলি মিল আছে, দুএকটী ব্যতীত সকল গুলিতেই Dye house আছে। তাহারা নিজেদের প্রয়োজন মত নিজেদের Dye house এ সূতা রং করিয়া লয়। সুতরাং আমদানী করা রঙ্গিন সূতা অধিকাংশই তাঁতে ব্যবহার হয়। ইহার মধ্যে পাকা রং ও কাঁচা রং দুই আছে। ধুতি, সাড়ির পাড়, নানাবিধ চেক ও লুঙ্গী প্রভৃতির জন্য যে গুলি বিশেষ পাকা রং সেই গুলিই ব্যবহার হয়। বলা বাহুল্য ইহার পরিমাণ খুব বেশী। এই রং গুলির কয়েকটি নমুনা আপনাদের দেখাইতেছি। দেশী গাছ গাছড়ার দ্বারা এই রংগুলি হয় না। তদ্ব্যতীত পাকা রং হিসাবে উল্লেখ যোগ্য দুএকটি রং এর বেশী নাই এবং তাহাও যোগাড় করা এত কষ্ট সাধ্য যে ব্যবসা হিসাবে তাহা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নহে। নীল রং এ এখনও এদেশে অনেক সূতা রঞ্জিত হইয়া থাকে। মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা পাকা লাল রং হইতে পারে বটে কিন্তু দেখিতে হইবে যে কত পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠা যোগাড় করিলে কতটুকু রং পাওয়া যায়। ১০০ পাউণ্ড মঞ্জিষ্ঠা হইতে ২॥০ কি ৩ পাউণ্ড রং পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই তিন পাউণ্ড রং এখন ঘরের দরজায় বসিয়া আড়াই টাকায় পাওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে বলিতে গেলে অনেক বলিতে পারা যায়, তাহার স্থান এ নহে। যদি সখ করিয়া কেহ করিতে চাহেন তিনি একটু কাপড় রং করিয়া লইতে পারেন কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ঠিক যে গাছগাছড়ার দ্বারা ১২ লক্ষ পাউণ্ড সূতা রং করা ব্যবসা হিসাবে চলে না। আমি বরাবর দেখিয়াছি যে, যখনই দেশে একটা বর্ত্তমান সময়ের মত আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখনই গাছগাছড়ার দ্বারা রং করিবার দিকে কতক লোকের চোক পড়ে। যদি তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা গুলি জানিয়া কাজ করেন, তবে এরূপ করিবেন না, ইহা আমার বিশ্বাস।

আমার মতে তাঁতিদের প্রত্যেক কার্য্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ঢাকা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, কৃষ্ণনগর, হাওড়া, হুগলী, শ্রীরামপুর, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে এক একটি করিয়া ছোট Dye house স্থাপন করিতে পারিলে এই বার লক্ষ পাউণ্ড রং করা সূতা বিদেশ হইতে আমদানী করার প্রয়োজন হয় না। একটী ছোট Dye house এ অনায়াসে বছরে একলক্ষ পাউণ্ড সূতা রং হইতে পারে। এইরূপ একটি Dye house করিতে ১৫ হাজার টাকার অধিক দরকার হয় না। ইহাতে তাঁতীদেরও খুব সুবিধা হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন।

ভবানীপুর শিল্পমেলায় পঠিত।

রাজর্ষি রামমোহন ও ইংরাজী শিক্ষা।

রাজা রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং তিনি ইংরাজী শিক্ষার ফল, এইরূপ যুক্তি কাহারও কাহারও মনে আসিয়াছে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অজ্ঞতা-প্রসূত। এই মীমাংসার মধ্যে গড্ডলিকা প্রবাহের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংরাজী শিক্ষার ফল হইলে যে কোন দোষ হয়, সে কথা উঠিতেছে না। কিন্তু ইতিহাসের অপলাপে যে প্রত্যবায় আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এবং ইতিহাস বলেন, যে ইংরাজী বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই রাজা তাঁহার ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই অতি সহজ সত্য কথাটা না জানা থাকায় যত গোল হইয়াছে। রাজা অতি বাল্যেই আরবি ফার্সী অধ্যয়নের জন্য পাটনা গিয়াছিলেন। সে সময়ে আরবি ফার্সী বর্ত্তমান কালের ইংরাজীর স্থান অধিকার করিত। এখন ইংরাজীর সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালিত হয়, তখন আরবি ফার্সীর সাহায্যে সে কার্য্য সম্পাদিত হইত। এই অতিবাল্যেই রামমোহন সুফী মোতাজালা মোহাদ্দী এবং সত্যবাদী ভ্রাতৃসম্প্রদায় (Sincere Brethren) যাহাদিগকে দশম শতাব্দীর বিশ্বসাধক (Encyclopeadists) নামে অভিহিত করা হইয়াছে সেই সব স্বাধীন মতাবলম্বী (Heterodox) মুসলমান সম্প্রদায় সকলের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পরিচিত হন। তখন ইংরাজীর নাম গন্ধও তিনি জানিতেন না। এই সময়েই তিনি কোরান ও সরিয়াৎ আয়ত্ত করেন। এই কোরাণ ও সরিয়াৎ এরিস্ততলের চিন্তা প্রণালীর ছাঁচে (Logical mould) ঢালা। তর্কযুদ্ধে এই চিন্তাপ্রণালীর শ্রেষ্ঠতা কোরাণ পাঠ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাজা যে তর্কযুদ্ধে অজেয় ছিলেন অতি বাল্যে এই চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে পরিচয় তাহার অন্যতম কারণ। উল্লিখিত মহম্মদীয় সম্প্রদায় সকলের স্বাধীন ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রথম পুস্তিকা প্রচার করেন। একটি কুসংস্কার আছে এবং প্রবাদ বলে, 'কুসংস্কার সহজে মরে না' যে এই পুস্তিকা বাংলা ভাষায় লিখিত। আসল কথা, পারস্য ভাষায় ইহা লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তিকা লিখিয়া তিনি পিতা কর্ত্তৃক গৃহ বহিস্কৃত হন। শাপে বর হইল। দেশ পর্য্যটনের সুযোগ পাইলেন। বিস্তৃতভাবে ভারতবর্ষ ও তাহার সীমার বাহিরে ভ্রমণ করিয়া অমূল্য অভিজ্ঞতা সমূহ অর্জ্জন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। ইতিমধ্যে পিতা অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। রামমোহনের গৃহ পরিত্যাগকে তিনি দ্বিতীয় রাম বনবাস বলিয়া আক্ষেপ করিতেন। সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি পিতা কর্ত্তৃক পুনর্গৃহীত হইলেন। এইবার হিন্দু শাস্ত্র বিশেষ ভাবে হিন্দু দর্শন অধ্যয়নের জন্য কাশীতে তিনি প্রেরিত হইলেন। এখনও ইংরাজী শিক্ষার কথাই উঠে নাই। কাশীতে রাজা ষড়দর্শন আয়ত্ত করিলেন। ষড়দর্শনে তিনি এমনই ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের সঙ্গে বিচারে তিনি যে এই সকলের সমন্বয় দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা দার্শনিক তত্ত্ববিচারে বাস্তবিকই অতুলনীয়। হিন্দুর শাস্ত্রীয় বিচারে তার পরম্পরাগত একটা বিচার প্রণালী আছে, যার সাহায্যে হিন্দুর শিক্ষা ও

সভ্যতার সনাতনত্ব চিরদিন বজায় রহিয়াছে। যাঁহারা ভাবেন হিন্দুসমাজ অচলায়তন, ইহা চিরদিন যেমন তেমনটাই আছে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—পরিবর্ত্তন কেবল এখনই হইতেছে সুতরাং সেই অপরিবর্ত্তনীয় প্রাচীনে প্রত্যাবর্ত্তন কর—তাঁহারা হিন্দুর ইতিহাস একেবারেই বুঝেন না, হয়তো জানেনই না। নিজের গুটিকতক সংকীর্ণ সংস্কারকেই হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম মনে করেন। শাস্ত্রকে সনাতন বলিয়া ধরিয়া লইয়া অবস্থানুযায়ী যুগে যুগে তাহার নব নব ব্যাখ্যা দ্বারা নূতন রীতির প্রবর্ত্তনা করিলে সনাতনত্বের কোন হানিই হয় না। ইহাই এই ব্যাখ্যাপ্রণালীর মূল তত্ব। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় রাজা তাহা চালাইয়াছিলেন। যে Lagslature এর পশ্চাতে executive নাই সে ব্যবস্থাপকের কোন মূল্য নাই। এক দিন এমন ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাও রাজার সাহায্যে চলিয়া গিয়াছে যাহার রামমোহনের পাদুকা বহনেরও যোগ্যতা নাই। কিন্তু আজ অধমাধম শূদ্রও রামমোহনের কথা বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে চায় না। এইখানেই দেশের সমাজ জীবনের ঘোর পরিবর্ত্তন। এ সম্বন্ধে 'সংস্কার ও সংরক্ষণ' গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করা গিয়াছে। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই রামমোহন শাস্ত্রীয় বিচারে অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাই প্রাচীনের রক্ষণশীলতার সঙ্গে নবীনের উন্নতিপ্রিয়তার সামঞ্জস্য। যাঁহারা 'যা আছে তাই সনাতন' এই মত লইয়া রাজার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সনাতনের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবার ভূমিই ছিল না। সমগ্রের একটা বিশেষ অংশকে তাঁরা সমগ্র বলিয়া ধরিয়া ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিলেন বা পড়িয়া রহিয়াছেন। এই খানেই প্রতিক্রিয়াবাদীদের দুর্ব্বলতা। কিন্তু রামমোহন প্রাচীনকে নবীনের আলোকে সংশোধন ও নবীন কে প্রাচীনের দ্বারা পরিপূরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বাহ্যাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক শিক্ষারূপ যে অস্ত্র পাইয়াছি রামমোহনের এই অস্ত্র উহা অপেক্ষা শতগুণে বেশী ধারাল। এই শিক্ষার উপরেই তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের ভিত্তি। তিনি ইংরাজী শিখিলেন ইহার পরে এবং শ্রীরামপুরের পাদ্রীদিগের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া গ্রীক হিব্রু আয়ত্ত করিলেন। কেন না, মূল না ধরিয়া ডাল পালায় বিচরণ ছিল তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ—ইহা সত্যান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রকৃতি বিরুদ্ধ। যাঁরা ভাবেন, রাজা ইংরাজী শিক্ষার ফল, তাঁদের অজ্ঞতার পরিমাণ এইখানেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই, যে শঙ্কর-রামানুজ দর্শনের সমন্বয়ে তিনি যে নিজস্ব বেদান্তের ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে হিন্দুদর্শনের অভিব্যক্তির ধারায় রাজর্ষি রামমোহনের স্থান শঙ্কর বা রামানুজের নিম্নে নহে। যাঁহারা যুগে যুগে হিন্দুর শিক্ষা ও সভ্যতাকে নবীভূত করিয়া ঋষি আখ্যা লাভ করিয়া গিয়াছেন রামমোহন তাঁহাদেরই একজন। তিনি মৃতের সঙ্গে মিশিয়া যান নাই, মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। মৃতদেহকে সাজাইয়া গুজাইয়া ঠেকা দিয়া লোক চক্ষুর কাছে যাঁরা দাঁড় করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ মৃতদেহের মধ্যে জীবন সঞ্চার করা যদি দোষের হয় তবে সে দোষ তিনি করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিনি যে প্রাচীনের নিজ বিশেষত্বটা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াই ইহাকে নূতনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন, হিন্দুর প্রাচীন জিনিসটা যে কি সে জ্ঞান যাঁদের নাই, উপকথার

গল্পের মত একটা প্রবাদ মাত্র জানা আছে, তাঁরা এই মহাকার্য্যের কোন ধারণা করিতে অসমর্থ। আসল কথা, রাজা রামমোহন রায় অতীতকে পুনর্গঠন করিয়াছেন। যে যোগ অজ্ঞানান্ধকারে কাটিয়া গিয়াছিল, তাহার পুনর্স্থাপনা করিয়াছেন। যাঁরা ভাবেন তিনি অতীতকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁদের মত ভ্রান্ত আর কেউ নাই। তাঁদের ভ্রান্তির কারণ ভারতের অতীত সম্বন্ধে তাঁদের পূর্ণ অনভিজ্ঞতা। তাঁরা সত্যভ্রষ্ট হইয়া কল্পনার রথে উড়িয়া বেড়ান। রাজা রামমোহন রায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তদানীন্তন টোল চতুষ্পাঠীর বিরোধী। কিন্তু যে শিক্ষার উপরে প্রাচীন ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত ছিল, সর্ব্বাংশে তাহারই অনুকূল। যারা টোল চতুষ্পাটীর শিক্ষাকে ভারতীয় জাতি গঠনের শিক্ষা মনে করিয়াছিলেন তারা নিতান্তই ভ্রান্ত। টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষা প্রাচীন পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিতান্ত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নবজীবন গঠন বিষয়ে ইহার অকর্ম্মণ্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তিনি ইহার বিরোধী হইয়াছিলেন। যে নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিতেছিল তাহা প্রাচীনের নব-কলেবর বলিয়া, অথবা সুপরিচালিত করিয়া ইহাকে প্রাচীন পদ্ধতির নূতন কলেবরে পরিণত করিবার জন্যই তিনি ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি এইটি গ্রহণ করিলেন এবং ইহার সঙ্গে আত্মবিদ্যা যোগ করিয়া দিয়া ইহার মধ্যে প্রাচীনের পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হইলেন বলিয়াই ইহার জন্য এত লড়িলেন। সাধারণ মানুষ নিজের রূপই বাহিরে খুঁজিয়া বেড়ায়। যার মধ্যে আছে কেবল কাঁচ সে বাহির হইতে কাঞ্চন আহরণ করিতে পারে না। তাই প্রতিক্রিয়াবাদীরা (Reactionists) রামমোহনের প্রকৃত স্বরূপটি কখনও ধরিতে পারেন নাই, এখনও তাঁহাকে চিনিতে পারেন না। যাঁরা আজ কালকার প্রতিক্রিয়া-বাদী তাঁরাই বাস্তবিক ইংরাজী শিক্ষার ফল, আপনাদের অজ্ঞাতসারে পাশ্চাত্য আদর্শের মোহে মুগ্ধ। তাঁরা যাকে বলেন প্রাচীনভারত, যার নামে অজ্ঞলোকের ভ্রান্তি উৎপন্ন করেন, তাহাও হয়তো কোন পাশ্চাত্য আদর্শের ঝাপসা দৃষ্টিজনিত বিকৃতরূপ। প্রাচীন ভারত বিষয়ে জ্ঞানের অভাবে উহাকেই প্রাচীন ভারত বলিয়া মনে করেন। এই Reactionistগণ কখনও রামমোহনকে পাইলেন না। যেহেতু ঋষিরা Reactionist হইতে পারেন না—তাঁহারা অতীতের উচ্চশেখরে সমাসীন ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা এবং বর্ত্তমানের দৃঢ় ভূমিতে দণ্ডায়মান ভবিষ্যচ্ছ্রষ্টা। ঋষিদের দৃষ্টি পশ্চাতে নয়, ভূতে নয়।

রাজা যে শিক্ষা প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন এবং আপনার জীবনে গড়িয়া দেখাইলেন তাহারই উপর কেবল আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তিনি বুদ্ধের ন্যায় আত্মাকে পূর্ণ স্বাধীনতার ভূমিতে বসাইতে চাহিলেন। তাহার সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য ঐ একমুখে। উহা মানবজীবনকে খণ্ডভাবে গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। রাজা মানুষকে অর্থনৈতিক ধর্ম্মনৈতিক সামাজিক সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ প্রয়াস কোন ব্যক্তি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ অথবা ক্ষেত্র বিশেষে আবদ্ধ ছিল না। নর-নারী-নির্ব্বিশেষে ছোট-বড়-নির্ব্বিশেষে সকলের মুক্তিই তিনি কামনা করিয়াছিলেন। দেশের রাষ্ট্রীয়স্বাধীনতার জন্যও সর্ব্ব প্রথম

তিনিই সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ক্ষেত্র বিশেষের স্বাধীনতার জন্য আপনাদের সমগ্রশক্তি নিয়োগ করিতেছেন তাঁহাদের সে চেষ্টার মধ্যে নিন্দনীয় কিছুই নাই স্বীকার করিয়াও দুঃখের সঙ্গে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে উহা পণ্ডশ্রম মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, যদি মানব আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা জন্য চেষ্টা করা না হয়। সিংহ বনের এক পার্শ্বে মেষ শিশুর ও অন্য পার্শ্বে শ্বাপদের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে না। সমাজে পরিবারে ধর্ম্ম নিয়মের মধ্যে slave mentality গড়িবার শত আয়োজনকে অটুট রাখিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিলেও আত্মা স্বরাট্ হইবে না, রাজর্ষি রামমোহনের জীবনের এই শিক্ষা—ইহাই যুগধর্ম্ম। ইহা অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ মানুষ হইবে না। আর কিছু হইয়া কি লাভ?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

নমস্কার

নমামি, হে নরদেব! নরহিতকামী,
বিদূরিতে দুঃখ দৈন্য এসেছ কি তুমি
স্বর্গ হ'তে, নররূপে হতভাগ্য দেশে।
অথবা কি অধর্ম্মের বিনাশ মানসে,
গোবিন্দ গোলকপতি পাঠালে হেথায়
করিয়া তোমারে দেব, ধর্ম্মের সহায়।
কিম্বা শাক্য, মহম্মদ, খৃষ্ট, চৈতন্যের
আত্মার আশীষ লয়ে, বিশ্বমানবের
মঙ্গল বিধান হেতু, জন্মিলে ভারতে—
অনাচার, অবিচার, অধর্ম্ম নাশিতে।
অদ্ভুত তোমার কর্ম্ম; অদম্য ক্ষমতা!
আশ্চর্য্য তোমার ত্যাগ; অপূর্ব্ব শীলতা!
কঠোর সংকল্প তব। সাহস দুর্ব্বার—
নিরত, নিপীড়িতের করিতে উদ্ধার।
নমি তাই নরদেব! নমামি তোমায়,
ভক্তি, প্রীতি, অর্ঘ্য আজি প্রদানিয়া পায়।
যুগান্তরকারী বন্দেমাতরম্ ধ্বনি,
উঠিয়াছে আজি পুনঃ, সত্যাগ্রহ সনে,
তব সাধনায়; যথা ধরমের গ্লানি,
নাশিবারে নারায়ণ কুরুক্ষেত্র রণে
"যতোধর্ম্মোস্ততোজয়" করিলা ঘোষণা,
সুবিশাল ভারতের মৃতকল্প দেহে
স্বরাজ সাধনারূপে এসেছে চেতনা।
শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রেম, স্নেহ, উচ্ছসিত হয়ে,
ছুটেছে বিদূরি আত্মধ্বংসী পাপ মোহে
বিনষ্ট স্বদেশী শিল্প করিতে উদ্ধার
প্রাচীন সভ্যতা সনে—যাহারি প্রভাবে
অচিরে খুলিবে দ্বার আত্ম-প্রতিষ্ঠার।
নমি তাই নরশ্রেষ্ঠ! নমামি তোমায়
হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানিয়া পায়।
ধরম, করমক্ষেত্রে ঘটায় মিলন
মানবের, পরস্পরে বাঁধি প্রেমডোরে;
একই তীর্থের যাত্রী হিন্দুমুসলমান
চলিয়াছে ভিন্ন পথে সোজা পথ ছেড়ে
বহুদিন, পরস্পরে ভাবিয়া বিভিন্ন;
তারি পুরস্কার ভাগ্যে দাসত্ব জীবন।
আচরি অহিংসা ধর্ম্ম এসেছে চৈতন্য
হিন্দু মুসলমে দিতে প্রীতি আলিঙ্গন।
জগতের হিংসা বহ্নি করিতে নির্ব্বাণ
স্বরাজ সাধনা পথে আজি অগ্রসর
এই দুই মহাজাতি, তব প্রেরণায়।
ভক্তি নতশিরে দেব, নমামি তোমায়॥

শ্রীশ্যামাচরণ চৌধুরী।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা লইয়াই শকুন্তলা। তপোবনবাসিনী শকুন্তলার স্বভাবসরল কোমল ভাবই অনসূয়া। দুষ্মন্তমহিষী শকুন্তলার "আহার্য্য-শোভাময়" উজ্জ্বলভাবই প্রিয়ম্বদা। অনসূয়াভাবে শকুন্তলা হাব ভাব বর্জ্জিতা, আশ্রমবাসিনী কিশোরী। প্রিয়ম্বদা ভাবে শকুন্তলা হাবভাবময়ী, বিলাস বিভ্রমবতী তরুণী। শকুন্তলা বর্ত্তমানে যেন অনসূয়া; ভবিষ্যতে যেন প্রিয়ম্বদা। চিৎ-শক্তি ও অচিৎ-শক্তি না বুঝিলে যেমন মহাশক্তিকে বুঝা যায় না; তদ্রূপ অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা ভাব না বিশ্লেষণ করিলে শকুন্তলা চরিত্রটিও বোঝা যায় না। শকুন্তলার প্রস্থানের পর অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার কথা কবি কিছু বলেন নাই বলিয়া যে ইহারা কবির উপেক্ষিতা, আমরা এমন কথা বলি না। কেন, তাহা পরেই পরিস্ফুট হইবে।

কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে শকুন্তলা মূল নায়িকা। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা উপনায়িকা মাত্র। অনসূয়ার মধ্যে মুগ্ধা নায়িকার ভাব। সে স্বভাবতঃ সরলা, কোমল প্রকৃতি অথচ মৃদুলজ্জাশীলা। প্রীতির বিকচ কুসুম। পূর্ণচন্দ্র প্রভা মূর্ত্তি ধরিয়া যেন ধরাতলে অবতীর্ণা। নবস্ফুট মল্লিকার মতই পরিমলময়ী। অসূয়াশূন্যা তাই, অনসূয়া। ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসা, গুণেও দোষারোপ, কাপট্য, ছলনা ও কৌটিল্য এখানে অসূয়ারই মধ্যে।

প্রিয়ম্বদার মধ্যে মধ্যা নায়িকার ভাব। 'প্ররূঢ় স্মরযৌবনা' 'ঈষৎ প্রগল্ভ বচনা' মধ্যম ব্রীড়িতা'। স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অতি চতুরা। রসের অধিদেবতা। নবোদিত সূর্য্যরশ্মি যেন শরীরিণী হইয়া সঞ্চরমানা। পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মিনীর মতই সৌরভময়ী। প্রিয়বাদিনী বলিয়াই প্রিয়ম্বদা। রসময়ী বাণী প্রণয়ী প্রণয়ীর কর্ণে মধু বর্ষণ করে। মানসিক অবস্থাভেদে কখন অনসূয়ার উপযোগিতা, কখন বা প্রিয়ম্বদার উপযোগিতা। কানন রাণীর স্নিগ্ধ শ্যাম দিকটিও যেমন মধুরদর্শন, তদ্রূপ পক্ষীকূজন মুখর দিকটিও শ্রুতিসুভগ। সংসারে দুই-ই আবশ্যক।

অনসূয়া।

অনসূয়া আশ্রমের শান্তিময়ী লক্ষ্মী। প্রিয়ম্বদা নগরের ভোগময়ী সম্রাজ্ঞী একটী তরুচ্ছায়া-স্নিগ্ধা বন নদী, ধীরে ধীরে নীরবে বহিয়া যায়। অন্যটী বর্ষার রঙ্গভঙ্গে নৃত্যশীলা গিরিনদী, সবেগে সগর্ব্বে ছুটিয়া চলে। "একটি জ্যোৎস্নামধুরা শারদীয়া রজনী। অপরটি আলোক দীপ্তা প্রভাতছবি একটী ভাবপ্রধানা কর্ম্মময়ী বালা। দ্বিতীয়টি কর্ম্মপ্রধানা ভাবময়ী রমণী।

অনসূয়ার সৌন্দর্য্য বড় কোমল "ব্রীড়াসঙ্কুচিত,"—তাহাতে মাধুর্য্য আছে কিন্তু দাহ নাই। সে সৌন্দর্য্যে মানব মুগ্ধ হয়, কিন্তু পুড়িয়া মরে না। দেহে যৌবনের শ্যাম সুষমা

* সাহিত্য সভায় পঠিত—কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত।

কিন্তু মুখখানি বালিকার মত। যেমন নির্ম্মল তেমনই সরল, চাতুর্য্যশূন্য। অনসূয়ার প্রীতি বালচন্দ্র জ্যোতির মত সুমধুর সুশীতল। সে প্রীতি হৃদয়ের বিশ্রাম। তাহাতে খেলার সাধ মেটে কিন্তু তাহা জীবনসংগ্রামে সহায়রূপা হয় না; অবসন্ন হৃদয়ে উদ্দীপনা আনে না। তাহা স্বপ্নের মত আবেশের মত। যেন এ কঠিন পৃথিবীর নহে। তাহার কৃষ্ণতার স্থির চক্ষুতে বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিত কটাক্ষ খেলে না। তাহা তপোবনশ্রীর মতই প্রশান্ত, মন্ত্রপূত বারির মতই পবিত্র। সঞ্চারিণী পল্লবিণী লতার মত তাহার গতি, কিন্তু তাহা হেলিয়া দুলিয়া চলে না। গজগতির সহিত তাহার তুলনা হয় না। তাহা কোমল মকমলের আস্তরণেরই যোগ্য। তাহার রক্তিম অধরে স্বচ্ছ হাসিটি স্বচ্ছজলে চন্দ্রকর রশ্মির মত সংমূর্চ্ছিত বড়ই মিষ্ট, বড়ই কোমল। সে হাসির মধ্যে যুবতীর লালসা নাই। চতুরার কুটিলতা নাই। বিলাসিনীর ছলাকলা নাই। তাহা অমৃতের মত পবিত্র, শিশুর মত নিষ্কলঙ্ক, মুক্তাফলের মত লাবণ্যময়। অনসূয়া কথা কহে, যেন বীণা ঝঙ্কার দেয়। তাহাতে সরলতা ও মাধুর্য্য যেন উচ্ছলিত হয়। সে যেন শ্রমাবসানে বিশ্রান্তির মত, যুদ্ধ শেষে শান্তির মত।

প্রিয়ম্বদা।

প্রিয়ম্বদার সৌন্দর্য্য পূর্ণপ্রস্ফুট, তরঙ্গান্দোলিত শতদলের মত। তাহাতে সুবাসও আছে। মত্ততাও আছে। সে সৌন্দর্য্যালোকে নর মুগ্ধও হয় আবার দগ্ধও হয়। প্রিয়ম্বদার হৃদয়ে গোলাপের মত সৌরভ, যূথিকার কোমলতা, পদ্মবৃন্তের কর্কশতাও বিদ্যমান। যেমন সে রস-ভাবজ্ঞা ব্যঙ্গপরায়ণা, তেমনই মধুর হাসিনী, প্রিয়বাদিনী। সে যেমন প্রেমগীতির মত মনোহারিণী, তেমনই ভেরীধ্বনির মত উদ্দীপনাকারিণী। তাহার প্রাণটি নদীর স্রোতের মত বাহ্যতঃ চঞ্চল, দৃশ্যতঃ কথঞ্চিত আবিলতাময়; কিন্তু অভ্যন্তরভাগ যেমন শীতল তেমনই স্বচ্ছ। তাহার দ্বারা ভালবাসার সাধও মেটে, খেলার সুখও চলে, আবার লালসাক্ষুধাও শান্তি হয়। শ্রান্ত হৃদয়েরও বিশ্রাম, জীবনযুদ্ধেও সহায়রূপা। একাধারে জাগরণ ও স্বপ্ন। তপোবনের পবিত্রতার সঙ্গে রাজান্তঃপুরের রসভাবচাতুর্য্যের মিলন প্রিয়ম্বদাকে এক অপূর্ব্ব শ্রীসম্পদ দান করিয়াছে। তাহার ভালবাসা মধুর অথচ উন্মাদক; কোমল অথচ তীব্র। তাহার দৃষ্টি সরল, অথচ অন্তর্ভেদিনী; প্রেমে ঢলঢল, ব্যঙ্গে জলজল্। সে দৃষ্টি "বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ চঞ্চৎ" তাহার ভঙ্গীটী "লীলাময়ী, সঙ্গীতমধুরা সম্রাজ্ঞীরই উপযুক্ত। তাহার হাসিটি জ্যোৎস্নাকরদীপ্ত, সুন্দর; দর্শন মাত্র মনপ্রাণ হরণ করে। সে হাসির ভিতরে বাহিরে রসতরঙ্গ দিবা রাত্রই বহে; মুক্তাফলের মত অনবরতই ফুটে। তাহার বাণী রসময়ী, আনন্দময়ী, ও প্রেমময়ী। যাহাতে পড়ে তাহাই সরস হইয়া উঠে। প্রিয়ম্বদা হৃদয়ের বিশ্রান্তি, অবসাদের উন্মাদনা, বীরত্বের উদ্দীপনা, স্বর্গের সুখ, চিত্তের ভোগ, ভালবাসার বিলাস।

অনসূয়া।

অনসূয়া প্রকৃতির দুহিতা, সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি। চাতুর্য্য জানে না, হাবভাব বিলাস বিভ্রম কিছুই শেখে নাই। কথার মধ্যে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণবাণ কিরূপে যোজনা করিতে

হয়, তাহাতে সে অভ্যস্ত নহে। তার প্রাণটি ছলাকলা শূন্য, সহানুভূতিময়, তাই শকুন্তলা যাহা কিছু মনের কথা নির্ভয়ে অসঙ্কোচে অনসূয়াকেই কহে। বৃক্ষের বল্কল মোচনের জন্য শকুন্তলা অনসূয়াকেই অনুরোধ জানায়।* প্রিয়ম্বদার উপর কৃত্রিম রাগের ভাণ করিয়া লজ্জা-কোপজড়িত নেত্রে অনসূয়াকেই কহে "অনসূয়ে আমি চলিলাম।"

আশ্রমের ছোট ছোট তরুগুলিতে জল দিবার জন্য শকুন্তলাসহ অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা উপস্থিত। তিনজনের কক্ষে ক্ষুদ্র সেচন কলশ, অধরে মৃদু হাসি, ললাটে স্বচ্ছ স্বেদবিন্দু। তিন জনের বয়স প্রায় সমানই। মধ্যে অনসূয়া কিছু ছোট, প্রিয়ম্বদা সামান্য বড় মাত্র। প্রিয়ম্বদা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত অভিন্নহৃদয়া সখীর মতই শকুন্তলাকে ভালবাসে। আর অনসূয়া মুগ্ধা কিশোরা নববধূর মতই (ঠিক উপমান না হইলেও) শকুন্তলায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে। অনসূয়ার ভালবাসা কত গাঢ়, সহানুভূতি কত গভীর, মনোভাবটি কত কোমল—তাহা তাহার প্রথম কথাটিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

সখি শকুন্তলে, পিতা কণ্ব তোমার চেয়ে আশ্রমের তরুগুলিকে অধিক ভালবাসেন; নতুবা নব মল্লিকার মত কোমলা তোমাকে আলবাল পরিপূরণে নিযুক্ত করিবেন কেন?

কি মধুর কোমল বাণী! বাণীর ভিতর দিয়া অনসূয়ার কোমল মূর্ত্তিখানি যেন সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শকুন্তলা যখন উত্তরে বলিল,—"সখি, শুধু পিতার নিয়োগ বলিয়া নহে, ইহাদের উপর আমার সহোদরের স্নেহ আছে।" অনসূয়া সে কথার আর প্রতি উত্তর করিল না। নিস্তব্ধে জল সেচন করিতে লাগিল।

প্রিয়ম্বদা যখন জিজ্ঞাসা করিল "অনসূয়ে, জান কি, শকুন্তলা কেন বনতোষিণীকে এত আগ্রহভরে দেখিতেছে?" অনসূয়া সরলপ্রাণা, অত সে বুঝে না; প্রিয়ম্বদার বাক্-চাতুরীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার সাধ্য কি? তদ্রূপ উত্তরও দিল—"আমি জানি না।"

রাজা দুষ্মন্তের গম্ভীর আকৃতি দেখিয়া, স্নিগ্ধ মধুর রসালাপ শুনিয়া, ঐশ্বর্য্য ও দাক্ষিণ্যের অপূর্ব্ব সন্নিবেশ লক্ষ্য করিয়া প্রিয়ম্বদার জানিতে ইচ্ছা হইল—"ইনি কে?" প্রিয়ম্বদা কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করিল। অনসূয়া কিন্তু সে কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া একেবারেই পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সে জিজ্ঞাসার মধ্যে ঋষিকন্যাগণের সুসভ্যতা, শিষ্টাচার, সদালাপ এবং সুশিক্ষার প্রভাবই পরিস্ফুট।

"আর্য্যের মধুরালাপজনিত বিশ্বস্ততাই আমাকে আলাপে মুখর করিয়া তুলিয়াছে। আর্য্য, কোন্ রাজর্ষিবংশ আপনা দ্বারা অলঙ্কৃত, কোন দেশ সম্প্রতি বিরহোৎকণ্ঠিত, কি নিমিত্তই বা এমন সুকুমার আত্মাকে আপনি তপোবনাগমন শ্রমে উপনীত করিয়াছেন?" পরিচয় লইবার ভঙ্গীটি বস্তুতঃই বড়ই সুন্দর। ইহার মধ্যে কৃত্রিম আদবকায়দা নাই, যুবতীজনোচিত ছলাকলা নাই। ইহা অকৃত্রিম হৃদয়ের স্বতোনিঃসৃত বাণী। কে বলিবে, প্রাচীনকালের রমণীরা শিক্ষাদীক্ষাহীনা এবং শিষ্টাচার শূন্যা ছিলেন।

রাজা শকুন্তলার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। বাক্‌নিপুণা রসিকা প্রিয়ম্বদা সে পরিচয়

---

* সখি অনসূয়ে, বড় শক্ত করিয়া প্রিয়ম্বদা আমার বক্ষে বল্কল আঁটিয়া দিয়াছে। তুমি শিথিল করিয়া দাও।

দিল না। সে পরিচয় দিবার কালে কি বাধা উপস্থিত হইবে, তাহা সে পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। এবারও অনসূয়া সে পরিচয় দিতে বসিল।

"রাজর্ষি বিশ্বামিত্রই সখীর জনক। তাত কণ্ব প্রতিপালক পিতা মাত্র। তপস্যারত বিশ্বামিত্র বসন্তোদয় কালে অপ্সরা মেনকার উন্মাদক রূপ দেখিয়া"—এইরূপে অসঙ্কোচে শকুন্তলার জন্ম ব্যাপার বলিতে গিয়া নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক লজ্জার জন্য অনসূয়া আর বলিতে পারিল না। মধ্যপথেই থামিয়া পড়িল। এ লজ্জা স্বভাবসরলার পক্ষেও স্বাভাবিক। বয়সের ধর্ম্মে, সুশিক্ষার গুণে, শকুন্তলার মত ভাবপ্রবণা এবং প্রিয়ম্বদার মত রসভাবজ্ঞার সাহচর্য্যে তাহার স্বাভাবিক লজ্জাটুকু আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। শকুন্তলার মত সঙ্গিনী পাইয়াছিল, প্রিয়ম্বদার মত সখী লাভ করিয়াছিল, আর তপোবনের রমণীধর্ম্ম শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়াছিল বলিয়াই অনসূয়া "মিরন্দা" হইয়া উঠে নাই। অনসূয়ার অবস্থায় কখন "মিরন্দা" ফুটে না। তপোবন ত আর নির্জ্জন দ্বীপ বা জনশূন্য অরণ্যানী নহে যে, তথায় স্বভাবের বন্য ভাব ফুটিবেই।

শকুন্তলা যখন অনসূয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"সখি অনসূয়ে, নূতন কুশসূচিতে আমার চরণ ক্ষতবিক্ষত, কুরুবকতরু শাখায় আমার বল্কল পরিলগ্ন হইয়াছে। অপেক্ষা কর, আমি ছাড়াইয়া লই।" অনসূয়া অমনই দাঁড়াইল। সে অতশত বুঝিল না। প্রিয়ম্বদা বোধ করি, তখন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; তাই তাহার মুখে এমন সময়ে কোন সরস রসিকতা ফুটিতে দেখিলাম না।

দুষ্মন্ত বিরহে শকুন্তলা কাতরা, বেতসলতাকুঞ্জের কুসুমাস্তরণে সে শয়ানা। শরীরের তাপ এত অসহ্য, মন এত তন্ময়—সখীরা যে বাতাস দিতেছে, তাহার উদ্বোধ পর্য্যন্ত নাই। শকুন্তলার অসুস্থতার মূল কি, প্রিয়ম্বদা সম্পূর্ণই বুঝিয়াছিল। অনসূয়া একটা ক্ষীণ আশঙ্কা করিয়াছিল মাত্র। আর সে আশঙ্কা জন্মিবারও হেতু—অনসূয়ার শিক্ষা আর পারিপার্শ্বিক ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ। দুষ্মন্ত বিরহেই সখী আমাদের এই দুঃখময়ী অবস্থায় নিপতিতা হইয়াছে—প্রিয়ম্বদার মুখে এই কথা শুনিয়া তবে সে বুঝিতে পারিল।

অনসূয়া যদিও প্রকৃতির দুহিতা স্বভাবসরলা, কিন্তু সে রীতিমত নারীধর্ম্ম শিক্ষায় শিক্ষিতা। ইতিহাসকথা প্রবন্ধে তাহার সম্যক্ অধিকার বর্ত্তমান। ইহা তাহার মুখের কথাতেই প্রকাশ।

"সখি শকুন্তলে, তোমার মনোগত ভাবটি কি, তাহা সবিশেষ অবগত নহি। তবে ইতিহাস কথা প্রবন্ধে কামিগণের অবস্থা যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে তোমার সেই অবস্থাই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বল সখি, কি নিমিত্ত তোমার এ আয়াস? রোগ না জানিলে চিকিৎসা কি করিব?"

শকুন্তলা নিজ মুখে রোগটি ব্যক্ত করিল এবং তাহার প্রশমনোপায়টি বলিয়া দিল এবং প্রার্থনা জানাইল "তোমরা যাহা ভাল বোঝ তাহাই ক'র। তবে আমি যাহাতে সেই রাজর্ষির অনুকম্পার পাত্রী হই, তাহা দেখিও। নহিলে আমি শুধু তোমাদের স্মৃতিপথেই রহিয়া যাইব।" প্রিয়ম্বদাও তখন জনান্তিকে অনসূয়াকে কহিল "অনসূয়ে, আকাঙ্ক্ষা চরমে উঠিয়াছে, আর

কাল হরণ করা চলে না।” তখন শকুন্তলার দুঃখে অনসূয়ার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; সেই কাতর প্রার্থনায় তার মনোতন্ত্রীতে একটি করুণ রাগিণী বাজিল। সে একেবারেই তাড়াতাড়ি ব্যগ্রস্বরে প্রিয়ম্বদাকে ধরিয়া বসিল—

“প্রিয়ম্বদে, কি উপায় হইবে? কি উপায়ে বিরলে সত্বর সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা যায়? সরলপ্রাণা অনসূয়াতে সংসারের কুটিলতা এবং পাপ এখনও স্পর্শ করে নাই। তাই তাহার সরল নিষ্পাপ মনে কোনরূপ কুণ্ঠা, সঙ্কোচ দেখা দিল না, কোন প্রকার তর্কবিতর্ক উত্থিত হইল না। অনসূয়া শকুন্তলায় মিশিয়াই আছে। “তদগতপ্রাণা হি সা।

প্রিয়ম্বদা বুঝাইল—বিরলে—ইহাই চিন্তার বিষয়। সত্বর—ইহা দুষ্কর নহে। ইহার অর্থও অনসূয়া বুঝিল না। প্রিয়ম্বদা বুঝাইয়া দিলে তবে সে বুঝিল। রাজাও যখন প্রেমমন্ত্রে মুগ্ধ; তখন সমাগম কিছু দুষ্কর নহে। কিন্তু নির্জ্জনে সমাগম—তাহাই ভাবনার বিষয়। কেবল যে স্থান নির্ব্বাচনেরই কৌশল করিতে হইবে, তাহা নহে। নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করান উচিত কি না, তাহার পরিণাম ফল কি—এই সকল ভাবনাই প্রিয়ম্বদার মনে জাগিল। অনসূয়া ও সকল বুঝিয়া অত ভাবিয়া কার্য্য করে না। যখন যেটি বলা আবশ্যক বা করা প্রয়োজন, তাহাই তৎক্ষণাৎ সে বলে এবং করে। কথা চাপিয়া রাখিতে সে জানে না, চাহেও না। দেবসেবা স্থানে পুষ্প রাশির মধ্যে করিয়া পত্র পাঠাইবার কৌশল অনসূয়ার মাথায় আইসে নাই। তবে সে অসঙ্কোচে সে পত্র দুষ্মন্তের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে প্রস্তুত।

রাজা দুষ্মন্ত সেই বেতসলতা মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছেন। সখী শকুন্তলার চক্ষুতে, অধরে শৃঙ্গার লজ্জায় লুকাচুরী ও আরম্ভ হইয়াছে। রাজাদিগের তখনকার কালে বহু পত্নী থাকা নিয়ম ছিল। শকুন্তলা যাহাতে রাজার প্রণয়পাত্রী হইয়া প্রধানা মহিষী হন—সেই আকাঙ্ক্ষা অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা করিবেই। কিন্তু এখানেও অনসূয়া মনের কথা খুলিয়া বলিল একেবারেই রাজার নিকট অনুরোধ বল, আবদার বল, প্রার্থনা বল, করিয়া বসিল—

“সখী আমাদের যাহাতে বন্ধুগণের অনুশোচনায় পাত্রী না হন, তাহা দেখিবেন।”

দুষ্মন্তশকুন্তলার প্রণয়ালাপের মধ্যে আর থাকা উচিৎ নহে—ইহা অনসূয়ার মাথায় আইসে নাই। সময়াভিজ্ঞা, রসভাবচতুরা প্রিয়ম্বদাই কৌশলে অনসূয়াকে লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। *

প্রিয়ম্বদা।

প্রিয়ম্বদা প্রকৃতির বধূ। বধূ-উচিত লজ্জা, গোপন ভালবাসা, প্রণয় লুকাচুরী, হাবভাব বিলাস বিভ্রম—সর্ব্ব বিষয়েই সে শিক্ষিতা। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তার স্ফুরণ চকিত কটাক্ষ খেলে। অঞ্চল চাপা হাসির মধ্যে তার মনোভাবটি ফুটিয়া উঠে। শকুন্তলার যাহা আছে হস্তিনাপুর রাণী শকুন্তলায় যাহা দেখা দিবে—প্রিয়ম্বদায় তাহাই পূর্ণভাবে দেদীপ্যমান।

* পাঠান্তরও আছে বটে—অনসূয়াই প্রথম বলে ‘চল মৃগশিশুকে উহার মায়ের নিকট রাখিয়া আসি।’ প্রিয়ম্বদা উত্তরে কহে ‘তুমি একাকী পারিবে না, আমিও যাই।’ এ পাঠান্তরটি অনসূয়া চরিত্রের উপযোগী নহে। অনসূয়া সরলভাবে বলিয়াছে এইরূপে চরিত্রটি বজায় রাখাও যেন কষ্ট কল্পনা হইয়া পড়ে। লেখক।

রাজান্তঃপুরের শাসনকর্ত্রীকে কতদূর চতুরা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হইতে হইবে—তাহারই আভাস প্রিয়ম্বদায় বিদ্যমান।

প্রিয়ম্বদা যেমন স্বভাব চতুরা, তেমনই সর্ব্ব বিষয়েই সুশিক্ষিতা। মর্ম্মপুটে রুদ্ধ ভালবাসার ক্ষীণ রশ্মিটুকু সে দেখিতে পায়। নবপ্রণয়বতী মুগ্ধা কিশোরীর আধপ্রেম আধ লজ্জার লুকাচুরী সে সহজেই ধরিয়া ফেলে। সাত্ত্বিক ভাব—ভ্রূকু ভ্রূকু কম্প, স্বেদজলস্রব ভূমিপানে আনত দৃষ্টি এবং লীলাপত্রচ্ছেদন তাহার চক্ষুতে অজ্ঞাত থাকে না।

শকুন্তলা যখন প্রিয়ম্বদার দোষ দিয়া বক্ষের দৃঢ়বদ্ধ বল্কলটি শিথিল করিয়া দিবার জন্ত অনসূয়াকে অনুরোধ করে; তখন প্রিয়ম্বদা হাসিতে হাসিতে বলে—

এস্থলে পয়োধরবিস্তারবর্দ্ধক নিজের যৌবনকে তিরস্কার কর; আমার দোষ কি?

এই সরস ব্যঙ্গটি সময়োচিত এবং বয়সোচিত ও বটে। এই কথাটিতে যে কেবল মিষ্ট রসিকতা এবং নিজ দোষের ক্ষালন মাত্র করা হইয়াছে, তাহা নহে! নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেমতৃষা যে বনবাসেও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না; যৌবনের রসালাপ যে তপোবনের চতুঃসীমার মধ্যেও ফুটিয়া উঠে; স্বভাবের কোলে পালিতা বনলতিকাও যে উদ্যানলতার গুণ সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়; আশ্রমের বেদসঙ্গীতের মধ্যেও যে প্রণয় দেবতার গুণগুণ ধ্বনিও শুনিতে পাওয়া যায়—কবি প্রকারান্তরে আমাদিগকে ইহাই বুঝাইলেন। রক্ত মাংসে গড়া মানবীর হৃদয় সর্ব্বত্রই সমান। যৌবনের প্রভাব সর্ব্বত্রই অবারিত। শকুন্তলা যে পূর্ণযৌবনা—এ ইঙ্গিতটিও কবি দুষ্মন্তকে জানাইয়া দিলেন।

শকুন্তলা, যখন "ঐ চূত তরুটি বায়ু চঞ্চল পল্লবাঙ্গুলী দ্বারা আমাকে কি যেন বলিতেছে; আমি যাই, উহাকে আদর করিগে", বলিয়া তরুটির নিকট গেল। তখন প্রিয়ম্বদা মৃদুহাস্যে শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

"শকুন্তলে এই তরুটির নিকট তুমি মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া থাক। তুমি সম্মুখে থাকিলে তরুটি লতা সনাথ হইয়া শোভা পাইবে।

ভিতরে ভিতরে স্বভাব সুলভ অদম্য প্রেমতৃষাটি যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহমানা তাহা প্রথমেই বুঝা গিয়াছে। এক্ষণে আবার সেই প্রেমতৃষার উপশমের পাত্রটি সম্বন্ধেও যে—তাহাদের দিব্যজ্ঞান বিদ্যমান তাহাই এক্ষণে পরিস্ফুট হইল। শকুন্তলার বিবাহ না হইলে আর মানাইতেছেনা, বিবাহের জন্ত ঋষিও বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন—তাহাও জানিতে পারা গেল। শকুন্তলার বিবাহের ফুল ফুটিয়াছে, এখন ভ্রমর আসিলেই হয়; তাহারও আর বড় বিলম্ব নাই। প্রিয়ম্বদারও ফুল ফুটিয়াছে; অনসূয়ারও ফুটিবার অবস্থায় আসিয়াছে।

বনতোষিণী নব মালিকার অঙ্গে নূতন কুসুম ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর সেই নব কুসুমযৌবনা নবমালিকা আপনার বাহু বেষ্টনে সহকার তরুটিকে জড়াইয়া আছে, শকুন্তলা তাহাই একদৃষ্টে দেখিতেছিল। প্রিয়ম্বদা তাহার মধ্যে এক নূতন সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিল। হাসিতে হাসিতে বলিল "অনসূয়ে জান কি, কেন শকুন্তলা বনতোষিনীকে এত করিয়া দেখিতেছে? দেখ বনতোষিনী যেমন এই সহকার তরুটিতে সঙ্গতা হইয়াছে, আমিও কি সেই প্রকার অনুরূপ বরের সঙ্গে মিলিতা হইতে পারিব!"

প্রিয়ম্বদা রসিকতার মধ্য দিয়া মধুবৃষ্টি করে, হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় রসমাধুর্য্য ঢালিয়া দেয়। শকুন্তলা যখন প্রিয়ম্বদে, তোমাকে একটি প্রিয় সংবাদ দিই বলিয়া আমুল মুকুলিতা মাধবী লতাটিকে দেখাইল। বিস্ফারিতচক্ষু প্রিয়ম্বদা সহর্ষে তাহা দেখিল। প্রত্যুৎপন্নমতি প্রিয়বাদিনী তৎক্ষণাৎ উত্তরও দিল—"সহি তেন হি পড়িপ্পিঅং দে নিবেদেমি" সখি, আমিও তোমাকে প্রতিপ্রিয় (উল্টাপ্রিয়) সংবাদ দিই। তুমিও 'আসন্ন পাণিগ্রহণা" হইয়াছ।" মাধবীলতা আমূল মুকুলিতা—ইহা শুভলক্ষণ। সাধে কি "প্রিয়ম্বদা" প্রিয়ম্বদা।

প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার কর্ণে রস সলিলধারা ঢালিয়া দিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিতেছিল কিন্তু সে সলিলধারা যে রাজা দুষ্মন্তের নূতন আশা বীজটিকে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে অঙ্কুরিত করিয়া দিতেছিল—তাহা অবশ্য প্রিয়ম্বদা জানিতেছিল না।

"উহা তোমার নিজেরই মনের কথা" বলিয়া শকুন্তলা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিল। বস্তুতঃ পতিসমাগমের জন্য শকুন্তলা যে লালায়িতা এবং উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে। তপোবনের পবিত্রতার মধ্যে যে বাস করে, সে ত আর বিলাসের কোলে পালিতা বিলাসিনী যুবতী নহে যে, রসসাক্তী হইয়া উঠিবে, তবে তাহার সুপরিপুষ্ট নিটোল অঙ্গ, কুসুমিত উন্মাদক যৌবন প্রেমরসোজ্জ্বল মধুর রসালাপ স্পষ্টই জানাইয়া দিতেছে যে, শকুন্তলার অন্তরের অন্তঃস্থল পতিসমাগমাশায় ব্যাকুল। শকুন্তলা তজ্জন্য অভাব অনুভব না করুক,—ব্যাকুলা নাই হউক—তবে তাহার আরক্তিম কপোল বিদ্যুদ্দাম চকিত কটাক্ষ মদনের রঙ্গভূমি সমুন্নত বক্ষ যে ব্যাকুল, উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার আর সংশয় নাই। সে অধর চুম্বনে ব্যগ্র, সে বাহুলতা আলিঙ্গনে লালায়িত, সে কটাক্ষ সন্ধানে উন্মুখ। আমরাও এক্ষেত্রে বলিতে পারি, "লাবণ্য চঞ্চল কিন্তু লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে"।

প্রিয়ম্বদা যখন শকুন্তলার সেই চুরি করিয়া চাহিয়া দেখাটি লক্ষ্য করিল, প্রিয়বাণী শ্রবণের প্রত্যাশায় কর্ণকে সাবধান এবং স্থির লক্ষ্য দেখিল; প্রণয় কোপ আর শৃঙ্গার লজ্জার লুকাচুরি ধরিতে পারিল তখন বুঝিল যে, শকুন্তলা রাজার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে। আবার যখন সে শকুন্তলার প্রতি রাজার করুণ সহানুভূতি, পরিচয় জানার অদম্য কৌতূহল এবং অহেতুক প্রীতির আকর্ষণ দেখিল—তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিল মৃগয়াবিহারী সম্রাট আজ হরিণ শিকার করিতে আসিয়া হরিণনয়নার কটাক্ষশরে বিদ্ধ হইয়াছেন। পৃথিবীর মালিক আজি এক বনবাসিনীর প্রভাতরল সৌন্দর্য্যের ভিখারী সাজিয়া আসিয়াছেন।

প্রিয়ম্বদাই লতাকুঞ্জের মধ্যে শিলাপট্টের উপর পুষ্প পল্লব বিছাইয়া শকুন্তলাকে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। নলিনীপত্র বাতাস দিয়া তপ্ত অঙ্গ শীতল করিবার যত্ন লইতেছে। সে বাতাসে ভিতরের তীব্র তাপ কিছুমাত্র শান্তিলাভ করিতেছে না। শকুন্তলা এমতই আত্মবিহ্বলা, সখীরা যে বাতাস দিতেছে—সে জানেই নাই। কি দুঃখময়ী অবস্থা। প্রিয়ম্বদা সবিষাদে অবস্থার প্রতি চাহিল। জনান্তিকে বুঝাইয়াও দিল—

এ বিকারের মূল রাজর্ষির প্রতি সখীর অনুরাগ। এ বিকারের একমাত্র ঔষধই রাজর্ষিসহ মিলন। এ সমাগম ব্যতীত অন্য কোন উপায়ই নাই।

রাজা আসিলেন। নিদাঘতপ্তা পৃথ্বী শীতল হইল। নির্ব্বাণপ্রায় দীপশিখা তৈলষিক্তে

জ্বলিয়া উঠিল। নির্জ্জীবপ্রায় শকুন্তলাবল্লরী রাজার অনুরাগ সলিল পাইয়া ধীরে ধীরে সজীব হইয়া দেখা দিল। রাজা, লতাকুঞ্জে, ছায়া স্নিগ্ধ—কুসুম শয্যায় শায়িতা শকুন্তলার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। অনসূয়াও প্রিয়ম্বদার মধ্য দিয়া দুইটি হৃদয়ে প্রেমমধুর রসালাপ চলিতে লাগিল। দুষ্মন্ত "উপভোগক্ষম" সহকার আর শকুন্তলা "নবকুসুম যৌবনা" মাধবীলতা। সহকার শাখা-বাহু আলিঙ্গনে লতাটিকে বক্ষের উপর টানিয়া লইবার উপক্রম করিতেছে, আর মাধবীলতাটিও তাহার বিস্তৃত বক্ষে আশ্রয় লইবার জন্য কম্পিতা ও উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছে। "দুইখানি মেঘই বিদ্যুতে ভরা" প্রিয়ম্বদা বুঝিল এ সময়ে আর থাকা উচিত নহে। মৃগশিশু ধরিবার ছলে প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে লইয়া পলাইয়া গেল।

শকুন্তলা ক্ষত্রিয় রাজর্ষির কন্যা এবং অপ্সরার গর্ভজাতা। দুষ্মন্তও শকুন্তলার স্পৃহনীয় যোগ্য বর। আর দুইজনে দুইজনকে দেখিবামাত্র ভালবাসায় বাঁধাও পড়িয়াছে। ইহাদের মিলনও বিধাতার দান। প্রিয়ম্বদা এই সকল ভাবিয়া, বেশ করিয়া বুঝিয়া তবে উভয়ের অন্তরের উপ্ত বীজটীকে সলিলদানে অঙ্কুরিত করিয়াছে। সে বুঝিয়াছিল, এই অঙ্কুরিত বীজ শীঘ্রই তরুর আকারে দেখা দিবে। তজ্জন্যই প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার অনিচ্ছাকৃত গমনে বাধা দিয়াছে, এমন কি দূতিগিরি করিতেও লজ্জা বোধ করে নাই।

শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার পূজার জন্য সখীদ্বয় মালিনীতীরে পুষ্পচয়নে ব্যগ্র এমন সময়ে "অয়মহংভোঃ" 'এক বিকট চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল। শকুন্তলা পর্ণশালার অভ্যন্তরে পতিচিন্তায় এমন বিভোরা; তাহারই দ্বারের সম্মুখের সে ধ্বনি তার কর্ণে একেবারেই প্রবেশ করিল না। শকুন্তলার মনটী তখন কল্পনার লীলান্বিত গতিতে হস্তিনাপুরে চলিয়া গিয়াছে। সে ভীষণ শব্দে সারা বনভূমি সন্ত্রস্তা। মালিনী নদী করুণ সঙ্গীত গাহিয়া বহমানা। হরিণেরা অর্দ্ধভক্ষিত মুখে কবল মুখে করিয়াই রাখিয়াছে। পক্ষীরা তরুশাখায় নিস্তব্ধে স্থিরভাবে বসিয়া আছে। সে ভৈরব গর্জ্জন পতিচিন্তায় তন্ময়চিত্তা শকুন্তলার কর্ণে একটু স্পন্দন উঠাইতে না পারিয়া দূর আকাশের গায়ে বিলীন হইয়া গেল।

"ভৈরব গর্জ্জন মিশে গেল তন্ময়তা সনে
সিন্ধু বেগ বালুকায় হল প্রবাহিত" *

সেই সহস্রবজ্র নির্ঘোষবৎধ্বনি শুনিয়া বহুদূরবর্ত্তিনী অনসূয়াও প্রিয়ম্বদা চমকিয়া উঠিল। উদ্বিগ্নচিত্ত স্খলিত চরণ, বিভ্রান্ত চক্ষু, লইয়া সখীদ্বয় ছুটিয়া আসিল। দেখে—অগ্নিসম তেজস্বী দুর্ব্বাসা ঋষি ক্রোধারুণ নেত্রে আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেছেন। পদভরে ধরিত্রী কম্পবানা। উঃ, কি বিষম বিপৎ। তখন শকুন্তলার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সহচরীদ্বয় ছিন্নপক্ষ পক্ষিণীর মত দুর্ব্বাসার চরণে লুটাইয়া পড়িল। ক্রোধাবতার ঋষির কঠোর মর্ম্মতারে সমবেদনার একটী ক্ষীণ রাগিণী মাত্র বাজিয়া উঠিল। তপস্বিনী ঋষিকন্যাদের করুণ পরিবেদনে ঋষি এই টুকু মাত্র সান্ত্বনা দিলেন যে, অভিজ্ঞানচিহ্ন দেখাইতে পারিলে তবে শকুন্তলার স্মৃতি দুষ্মন্তের অন্তরে জাগিয়া উঠিবে। পরিণামে এই অভিজ্ঞানচিহ্নই দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলনের কারণ হয়—তাই এই নাটক খানির নাম অভিজ্ঞান শকুন্তল।

---

* বঙ্কিম চন্দ্র—দেবী চৌধুরাণী—প্রফুল্ল।

চতুর্থ অঙ্কে প্রিয়ম্বদাই অনসূয়াকে সংবাদ দিল যে, তাতকণ্ব শকুন্তলার এই আত্মনিবেদনে বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। অদ্য প্রাতে লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে অভিনন্দিতা করিয়া বলিয়াছেন—

"বৎসে, ভাগ্যবশতঃ "ধূম নিরুদ্ধ দৃষ্টি" যজমানের আহুতি ঠিক যজ্ঞীয়াগ্নিতেই নিপতিতা হইয়াছে। "সৎশিষ্য পরিগৃহীতা" বিদ্যার মত তুমি সার্থক হইয়া উঠিয়াছ। অদ্যই তোমাকে আমি ঋষিগণের সাহায্যে পতিগৃহে প্রেরণ করিব। এই গান্ধর্ব্ব বিবাহে প্রিয়ম্বদার যে একটুও ভয় ছিল না, তাহা নহে। সে ভয় আজ দূর হইল। শকুন্তলা সুখিনী হইবে—সে সংবাদ প্রিয়ম্বদা তাড়াতাড়ি অনসূয়াকে দিয়া গেল।

সূর্য্যোদয়ে কৃতস্নাতা শকুন্তলাকে তপস্বিনীরা স্বস্তিবাদ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। প্রিয়ম্বদাও অনসূয়া আসিয়া প্রাণসখীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। একপ্রাণা নিজেরই প্রতিচ্ছবি স্থানীয়া সখীদের [illegible] যাইতে হইবে—শকুন্তলা কাঁদিতে লাগিল। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা ঋষিকন্যা, —মঙ্গলকার্য্যে রোদন অনুচিত, বলিয়া শকুন্তলাকে সান্ত্বনাও দিল; আবার নিজেরাও চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে বসিল। স্নেহের প্রকৃতিই এই।

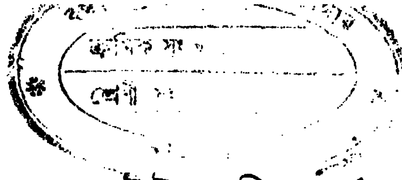
প্রিয়ম্বদা অত দুঃখের মধ্যে লক্ষ্য করিল শকুন্তলা আর্য্যপুত্র দর্শনে উৎসুকা হইয়াও তপোবন বিরহে বড় কাতরা হইয়াছে। প্রিয়ম্বদা চারিদিক চাহিয়া দেখিল—"উদ্গীর্ণ গর্ভকবলা" মৃগী, "পরিত্যক্তানৃত্যা" ময়ূরী "অপসৃত পাণ্ডুপত্রো" লতা প্রভৃতিও আজ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। প্রিয়ম্বদার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। গর্ভভার মন্থরা মৃগবধূ আসিয়া শকুন্তলার সম্মুখে দাঁড়াইল, মাতৃহারা মৃগশিশুটি ধীরে ধীরে শকুন্তলার অঞ্চলাগ্র টানিতে লাগিল। সখীদের শেষ আলিঙ্গন দিয়া শকুন্তলা আশ্রম ত্যাগ করিল।

আর অনসূয়া প্রিয়ম্বদার আবশ্যক নাই। শকুন্তলার তপোবন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ম্বদার কার্য্যও ফুরাইল। রঙ্গমঞ্চে সখীদ্বয়ের আবির্ভাব আর দেখা গেল না।

অনসূয়া প্রিয়ম্বদা যে যোগ্যপাত্রে সমর্পিতা হইবে—ইহা আমরা ঋষি কণ্বের মুখেই শুনিতে পাইয়াছি। ঋষিকন্যাদের যোগ্যবর যে ঋষিকুমার—এ বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। ঋষি যে তাঁহার বড় সাধের শকুন্তলার প্রিয়সখী দুটীকে প্রিয় শিষ্য শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের করেই সমর্পিতা করিবেন—ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। শারদ্বতের যোগ্যা অনসূয়া, শার্ঙ্গরবের অনুরূপা প্রিয়ম্বদা। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে আমরা কাদম্বরী কাব্যের পত্রলেখার মত কবির উপেক্ষিতা বলিতে পারি না।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার দুইটী দিক্ মাত্র। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে ছাড়িয়া দিয়া শকুন্তলার নিজের কিছু আছে কি না, আমরা জানি না। এই দুইটী সখী শকুন্তলারূপা জাহ্নবীকে নির্দ্দেশাভিমুখে স্থির রাখিবার জন্য অসিবরণার মত দুইপার্শ্বে বিরাজমানা আবার বলি তপোবনবাসিনী শকুন্তলার স্বভাব সরল কোমল দিকটিই অনসূয়া। দুষ্মন্ত মহিষী শকুন্তলার "প্রাচার্য্য-শোভাময়" উজ্জ্বল দিকটীই প্রিয়ম্বদা।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী



মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অ্যাবিলার্ড্ (Abelard)

পীরি অ্যাবিলার্ড্ বা আবৈলার্ড (Abailard) ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নগণ্টসের নিকট প্যালে নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্যারীতে তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়ম সাম্পোর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বাইশ বৎসর বয়সে শিক্ষা-গুরুর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি প্রথমতঃ মেলুনে (Melun) ও পরে, কার্ব্বীলে (corbeil) দুইটি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। ইহার কিছুকাল পরে সাম্পোর সহিত পুনরায় সদ্ভাব স্থাপিত হইলে, তিনি প্যারীতে প্রত্যাগমন করতঃ অসীম কৃতকার্য্যতার সহিত শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন গোপনীয় কারণে তিনি কানন্ ফুলবার্টের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হন এবং তজ্জন্য উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেণ্ট্ ডেনিসের মঠে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই স্থানেই অবস্থান কালেই তিনি "ডি ট্রিনিটাটি" (De Trinitate) গ্রন্থ রচনা করিয়া চার্চ্চেরও বিরাগভাজন হন। সইসনের ধর্ম্মসমিতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি উক্ত পুস্তকখানি অগ্নিতে সমর্পণ করেন। অতঃপর অ্যাবিলার্ড্ নোগেণ্ট্ সুর-সীন্ (Nogent-sur-seine) নগরে স্বয়ং একটি বক্তৃতা মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা প্যারাক্লীটী নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়কে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। সেণ্ট্ গিল্ডার অ্যাবেটের কার্য্য গ্রহণকালে তিনি এই মঞ্চটি তাঁহার প্রিয়পাত্রী হেলয়সীকে (Heloise) দান করিয়া যান। ১১৪০ খৃঃ অঃ অ্যাবিলার্ড্ সেণ্ট বার্নার্ড (St. Bernard of clairvaux) (১) কর্ত্তৃক বিধর্ম্মী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও কোন আকস্মিক উপায়ে তিনি ক্লুগ্নির মঠে (Abbey of Clugny) আশ্রয় প্রাপ্ত হন এবং পরিশেষে পূজনীয় পিটরের (Peter the Venerable) (২) অনুগ্রহে সেণ্ট্ বার্ণার্ডের নিকট মুক্তি লাভ করেন। গ্রহবৈগুণ্যে পুনঃপুনঃ দণ্ডিত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় অ্যাবিলার্ডের অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। ১১৪২ খৃঃ অঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

উপরোক্ত "ডি ট্রিনিটাটি" ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ ছিল, তন্মধ্যে "পত্রাবলী" বা Letters, "প্রাথমিক ধর্ম্মশাস্ত্র" (Introductio ad theologiam) "খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র" (Theologia Cristiana), "নীতিশাস্ত্র" (Ethics), "দার্শনিক, ইহুদী ও খৃষ্টানের

---

(১) পিটর্ ক্লুনীর অ্যাবট ছিলেন এবং ১২০০ খ্রীঃ অব্দে সরাসেন্‌দিগের কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ লাটিন্ ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

(২) সেণ্ট্ বার্ণার্ড্ (খ্রীঃ অঃ ১০৯১-১১৫৩) এবং আর্ণল্ড, হিউ, গড্রুক্রী প্রভৃতি সমসাময়িক আরও কয়েক ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রে তর্কের বিরোধী ছিলেন এবং অ্যাবিলার্ডের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন।

কথোপকথন" (Dialogue between a Philosopher, a Christian and a Jew) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

অ্যাবিলার্ড মহা ভাবুক ছিলেন, একারণ তিনি রস্কেলিনের গোঁড়া নামবাদ সংক্রান্ত মতগুলি সহজে মানিয়া লইতে পারেন নাই। আবার সাম্পোর উইলিয়মের ন্যায় কেবল কল্পনা রাজ্যেই বিলীন হইয়া তিনি গোঁড়া বাস্তববাদেরও প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার মতে সার্ব্বজনীন সত্তা (The universal) শুদ্ধ 'ব্যক্তি'তেই প্রকটিত হয়, "ব্যক্তির" বহির্ভাগে অর্থাৎ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া ইহার একটি মূর্ত্তিময়ী ধারণা (concept) অনুভব করা যায় মাত্র, তদ্ভিন্ন ইহার অন্য কোন অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, "ব্যক্তি"তে সত্তা (The universal) বিদ্যমান বটে; কিন্তু সেই সত্তা কেবল সার বা essence রূপে নয়, মূর্ত্ত বা পূর্ণরূপেই অবস্থিত। নানাজাতীয় জীবে যে নানারূপ প্রতিফলিত হইতেছে, সেই সেই রূপ সার্ব্বজনীন সত্তারই অঙ্গস্বরূপ। জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে ভিন্নতা, সেই ভিন্নতা মূল সত্তাতেই অবস্থিত। (Essence) বা সার রূপে অবস্থিতি করিলে বস্তুজাতের বিভিন্নতাই লোপ পাইত ও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থাকিত না, তাহা হইলে পিটর ও পলে, রাম ও যদুতে পার্থক্য থাকিত না। অ্যাবিলার্ডের মত যদিও খাঁটি নামবাদ নয়, তবুও নামবাদেরই সহিত ইহার সাদৃশ্য অধিক। প্লেটোর সত্তামূলক আদর্শবাদ ও অ্যারিষ্টটলের প্রত্যক্ষ মূলক আদর্শবাদে যে প্রভেদ, সাম্পোর অতীন্দ্রিয় বস্তুতত্ত্বেও (ultra idealistic doctrine) ও অ্যাবিলার্ডের স্বাতন্ত্র্যতত্ত্বেও সেই প্রভেদ। অ্যাবিলার্ড অ্যারিষ্টটলের অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সাক্ষাৎ পরিচয় পান নাই, তথাপি "অর্গাননু" গ্রন্থে উক্ত শাস্ত্রের যে সামান্য সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে মধ্যযুগের পণ্ডিত সমাজে অগ্রগণ্য করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগের মতের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও, অ্যাবিলার্ড তৎসাময়িক সুধীসমাজে স্বাধীনতাচেতা দৃঢ় মতাবলম্বী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি "চার্চ্চের" প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন, অথচ প্রয়োজন মত "চার্চ্চের" বিরাগভাজন হইতে ভয় পাইতেন না। তিনি cur'deus Homo? গ্রন্থের লেখক সেণ্ট্ অ্যানসেলেমের সহিত একযোগে প্রত্যাদেশ-মূলক সত্য (Revealed truth) এবং বিচার-সাপেক্ষ সত্য (Rational truth) উভয় সত্যকে এক বলিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সেণ্ট্ আগষ্টাইনের ন্যায়, জ্ঞান ও বিশ্বাসকে একাসনে স্থান দেন নাই। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা সম্ভব অথবা অসম্ভব, যে কোন মতকেই বিনা বিচারে সত্য বলিয়া মনে করে। অ্যাবিলার্ড্ এই শ্রেণীর লোককে তাঁহার Introductio গ্রন্থে, স্পষ্টাক্ষরে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি গ্রীসীয় দর্শন শাস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন, অথচ নিজে যে সেণ্ট আগষ্টাইনের গ্রন্থের ভিতরেই উক্ত দর্শনের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাও স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। তাঁহার বিবেচনায় খৃষ্টধর্ম্মের মূলসূত্রগুলির প্রায় সমস্তই অর্থাৎ ঈশ্বরবাদ, ত্রিগুণতত্ত্ব, অবতারবাদ প্রভৃতি যাহা কিছু, সকলেরই অস্তিত্ব সেই প্রাচীন ভাবুকদিগের গবেষণায় বিলুপ্ত রহিয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন

যে, 'নিউটেষ্টমেণ্ট' ও 'ওল্ডটেষ্টমেন্ট্' উভয় গ্রন্থই একই ধর্ম্মের প্রকাশক হইলেও উভয়ের প্রভেদ এত অধিক যে, তাহার তুলনায় খৃষ্টানেরা যাঁহাদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মতের সহিত খৃষ্টের স্বীয় মতের পার্থক্য অতি সামান্য। নীতির দিক দিয়া দেখিলে, ইহুদী দিগের ধর্ম্মগ্রন্থাপেক্ষা গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের অধিক উন্নত হইয়াছিল। একথা সত্য হইলে, কেবল খ্রীষ্টসমাজ বহির্ভূত বলিয়াই গ্রীক পণ্ডিতদিগকে ঘৃণা করা উচিত নয়। খ্রীষ্টান নহেন বলিয়াই কি তাঁহারা ঈশ্বর প্রদত্ত আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত? "গস্পেলের" প্রকৃত অর্থ, সুসংস্কৃত নৈতিক বিধি। সাধুবচন বলিয়াই কি ইহার এত আদর? অ্যাবিলার্ড বলেন, গ্রীক্‌দিগের নৈতিক বিধিতে ও "গস্পলে" মূলতঃ প্রভেদ নাই। যে সকল ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী, যাঁহাদের জীবনও কর্ম্ম, খৃষ্টপথানুবর্ত্তী এবং যাঁহাদের মতের সহিত খৃষ্টের মতের পুঙ্খানুপুঙ্খ মিল দেখা যায়, সেই সকল মহাত্মাকেই যদি নরকগামী বলিতে হয়, তবে আর সাধু কে?

সে যাহা হউক, আবিলর্ড্ গ্রীক দর্শনের ভিতর কিরূপে ত্রিমূর্ত্তি সংক্রান্ত মতের দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহাই বিচার্য্য। ত্রিমূর্ত্তির তিনটি মূর্ত্তিকে তিনি অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের তিন পৃথক্‌রূপ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই তিনরূপ যথাক্রমে, শক্তি, জ্ঞান ও সাধুতা। পৃথক পৃথক ধরিলে, শক্তি, জ্ঞান ও সাধুতা বা সদিচ্ছার কোন সত্তা নাই, কিন্তু এই তিনের সম্মিলনে বা সমন্বয়ে যে অবস্থার উদয় হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাবস্থা। সেই অবস্থারই ভগবানের অস্তিত্ব (tota perfectio boni)। মোট কথা, ত্রিমূর্ত্তি এমন এক পুরুষ যিনি যাহা কিছু মানস করেন, তাহাই করিতে পারেন, এবং যাহা মানস করেন, তাহা উত্তম জানিয়াই করেন। ধর্ম্মের দিক দিয়া ঈশ্বরের এই ভাবকে, সম্রাটের সম্রাটত্ব বলিতে পারা যায়, এবং তাহা রস্কেলিনের "ট্রাইথিজম্" (tri theism) মতের বিরুদ্ধ মত। আধ্যাত্মিকতার হিসাবে ইহাকে হুবহু শক্তিবাদ বলিতে হইবে, তবে এস্থলে শক্তি (force) এবং ভাবে (thought) প্রভেদ নাই, এই দুই বস্তু এক হইয়া ইচ্ছায় (will এ) পর্য্যবসিত হইয়াছে।

একটা মোটা কথা আছে যে, যখন লোকের মনে ধর্ম্মভাব প্রবল হয়, তখন নীতি ও ধর্ম্মে বড় বেশী ভেদ থাকে না, নীতিশাস্ত্রও ধর্ম্মশাস্ত্রে মিশিয়া যায়; আবার, যখন জ্ঞান পিপাসা বলবতী হয়, তখন লোকের মনে সন্দেহ আসিতে থাকে, নীতি ও ধর্ম্মের গণ্ডীও পৃথক হইয়া পড়ে। যে সময়ে নীতিশাস্ত্র গোঁড়ামির হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছিল, সে সময়টা উক্ত শাস্ত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় কাল। লাভার্দ্দিনের হিডেলবার্ট (Hidelbert of Lavardin) সিসিরো ও সেনেকার অনুকরণে নৈতিকদর্শন (Moralis Philosophia) নামে যে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই শ্রেণীর নীতিশাস্ত্র। অ্যাবিলার্ড্ কৃত "ন্যসেটী ইপ্‌সম্" (Nosee te 'ipsum) ও এই শ্রেণীর গ্রন্থ, কিন্তু হিডেলবার্টের গ্রন্থাপেক্ষা অধিক সারগর্ভ ও বিজ্ঞান সম্মত।

অ্যাবিলার্ডের নীতিশাস্ত্রে গোঁড়ামি খুব কম থাকিলেও তিনি যে কখনও তাহাকে তর্কশাস্ত্র হইতে একেবারে ছাঁটিয়া দিয়াছিলেন, তাহা নয়। যে মূলতত্ত্বের উপর উহা

স্থাপিত, অর্থাৎ যাহার অবলম্বনে উহা গঠিত হইয়াছিল, তাহা লাটীন্ ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের মতানুসারে কেবল স্বাধীন ঐশী ইচ্ছা নয়। ঈশ্বর পূর্ণ ও পরম পুরুষ, অতএব তাঁহার কার্য্যাবলী অবশ্যম্ভাবী (necessary)। এই necessary শব্দের অর্থ এই যে, কোন কায যে বিচারবিরুদ্ধ বলিয়া, কেবল না করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে, তাহা নহে; কোন কাজ যুক্তিযুক্ত বা বিচার সম্মত হইলে তাহা অবশ্যই করিতে হইবে, সেরূপ কায না করাও দোষের। প্রত্যক্ষজ্ঞানে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্য করণীয়। ঈশ্বরের ক্রিয়া-শক্তি বিচার বুদ্ধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া, তাঁহার সৃষ্ট জীব আমরাও তাঁহার মঙ্গলেচ্ছা-প্রণোদিত ও পরিচালিত হইতেছি। অতএব, আমাদের কৃত কার্য্যসমূহ ঈশ্বরেরই অনু-মোদিত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

পাপ পুণ্যের আলোচনায় অ্যাবিলার্ড বলিয়াছেন যে, কু-কায করিবার আগ্রহ বা tendency কেই পাপ বলা যায় না, বরং তাহা ধর্ম্ম পথেরই সোপান। বাস্তবিক, ধর্ম্মের মূলে প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয়। এই প্রতিযোগিতাই কুপথ প্রতিনিবৃত্তির একমাত্র উপায়। একদিকে যেমন পাপের প্রলোভন, অপর দিকে তেমনি পাপজয়ের নিমিত্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা,—এই দু'য়ের প্রতিযোগিতা বা struggle এর ফলে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। পাপের tendency না থাকিলে, tendency রোধ করিবার চেষ্টাও থাকিত না এবং ধর্ম্মেরও উৎপত্তি হইত না। কু-কার্য্যের প্রতি আগ্রহ যদি 'পাপ' না হয়, তবে "কু-কায"ই কি পাপের বিষয় (matter of sin)? তাহাও নয়। কেবল "কার্য্য" পাপ বা পুণ্য, কোন গণ্ডীর মধ্যেই আসে না। কার্য্য স্বয়ং নিরপেক্ষ (indifferent)। পাপের অনুসন্ধান করিতে হইলে, সেই-খানে করিতে হইবে, যেখান হইতে পাপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। ইচ্ছাই (will) পাপের মূলকারণ। ইচ্ছার ভিতরে ভাবী কার্য্যের ছাঁচ বা ছাপা (form) থাকে এবং ইচ্ছাতেই কার্য্যসমূহ অনুস্যূত হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কোন ব্যক্তি পাপানুষ্ঠানে প্রলুব্ধ হইয়াও যদি কোন দৈব কারণে তাহা সম্পন্ন করিতে অপারগ হয়, তবে সে ব্যক্তিও পাপানুষ্ঠানকারীর অপেক্ষা কম দণ্ডার্হ নহে; কেন না, পাপানুষ্ঠানে সম্মতি দেওয়া এবং পাপ কায করা উভয়ই তুল্য দণ্ডনীয়। দণ্ডাধিপতি ঈশ্বর বাহ্যাবরণ দেখিয়া বিচার করেন না; তিনি দেখেন, অন্তর বা আত্মা। বাসনা ও বাসনা পরিতৃপ্তির ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির দাসত্ব, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখাইয়া অ্যাবিলর্ড মানব জীবনকে নৈরাশ্য ও অত্যন্ত দুঃখের কারণ মনে করেন নাই। পক্ষান্তরে, বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ তিনি তৎসাময়িক ক্যাথলিক সমাজের নৈতিক কঠোরতারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে যে, এই সময় হইতে মধ্যযুগের নীতিশাস্ত্রে অ্যারিষ্টটলের প্রত্যক্ষবাদ প্রতিফলিত হইয়াছিল। মোটের উপর, অ্যাবিলর্ডের নীতিশাস্ত্র পাঠে অ্যারিষ্টটল্ ও তাহার মধ্যপন্থী নীতি-বিজ্ঞানের কথাই মনে পড়ে।

মধ্যযুগে অ্যাবিলার্ডের প্রভাব খুবই বেশী ছিল। তাহার ফলে, আমরা চার্চারের বার্ণাড্

কক্ষের উইলিয়াম্, জিল্‌বার্ট ডি লা পরী, সল্‌সবেরীর জন্ এবং এমন কি, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সেণ্ট্ ভিকটরের হিউগোর মতাবলীতেও তাঁহার প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করি। ইহাদের বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। * জিলবার্টকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া খাড়া করা হইয়াছিল; তাহার কারণ, তিনি ঈশ্বর (God) এবং দেবত্ব (Deity)র মধ্যে, পরমপুরুষের বিরাট্ রূপ ও সূক্ষ্ম রূপের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করিয়াছেন। সল্‌সবেরীর জন্ তদীয় "পলিক্রেটিকাস্" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সৃষ্টিকর্ত্তা ও জীবনদাতারূপ পরমাত্মা (Divine Spirit) যে কেবল মানবাত্মারই পরিপোষণ করেন, তাহা নয়; প্রত্যেক প্রাণীই তাঁহার মঙ্গলেচ্ছায় প্রতিপালিত হইতেছে, যেহেতু ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কোন প্রাণীরই অস্তিত্ব নাই, এবং ঐশ্বরিক সারসত্তার অধিকারী বলিয়াই বস্তুসমূহের স্বকীয় সত্তা বা অস্তিত্ব। ঈশ্বর তদীয় বিরাট্ মূর্ত্তিতে নিখিল সৃষ্টিকে বেষ্টন করিয়া আছেন, নিখিল বস্তুজাতে তিনি অনুপ্রবিষ্ট, এবং আত্মসত্তা দ্বারা তাহাদিগকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। যাবতীয় দ্রব্য, এমন কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্তও ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। যে যত বড় ও যে অবস্থায় বর্ত্তমান, সে সেই পরিমাণে ও সেই অবস্থায় যতটুকু সম্ভব, ততটুকুই ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অরুণরাগ পত্রপুষ্পে ও মণিকাঞ্চনাদিতে পতিত হইয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, ঈশ্বরও তেমনি সৃষ্টির নানা স্তর ও নানা জাতীয় জীবের ভিতর দিয়া ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন।"

জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে এই উদার ভাব প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবের সহিত মিলিত হইয়া একেশ্বরের প্রতিষ্ঠায় প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং এই ভাব লইয়াই সেণ্ট্ ভিক্টরের হিউগোর (Hugo of St. Victor) আবির্ভাব হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

সঙ্গণিকা।

স্থানাভাব হেতু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের 'সমনামরিক কথা' ও শ্রীমতী হেমলতা দেবীর 'সাধক' প্রকাশচন্দ্র প্রকাশিত হইতে পারিল না। আগামী আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

গত পৌষ মাসে যাঁহারা ১৩২৮ সনের মূল্য ভিপিতে দিয়াছেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য বৈশাখ সংখ্যা ভিপি করা হয় নাই। ভি পিতে অনর্থক খরচ ও বেশী হয়। নব্যভারতের সহৃদয় গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের দেয় মূল্য মঃ অঃ যোগে পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব। নতুবা আষাঢ় সংখ্যা ভিপিতে প্রেরিত হইবে। ইহাতে খরচ বেশী পড়িবে। সহৃদয় গ্রাহকগণ ইহা স্মরণ রাখিবেন।

* ১৩২৮ সাল, আষাঢ় মাসের নব্যভারত দ্রষ্টব্য।

স্বদেশীমেলা

গত চৈত্র ও বৈশাখ মাসে কলিকাতা সহরে তিনটী স্বদেশী মেলা হইয়া গিয়াছে; একটী ওয়েলিংটন স্কোয়ারে; দ্বিতীয়টী ভবানীপুর পদ্মপুকুরে; তৃতীয়টী মছুয়া বাজারে। এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনটী মেলা হওয়াতেও কলিকাতার ও মফঃস্বলের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে আসিয়া মেলা দেখিয়াছেন ও দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছেন। দেশের লোকেরা শুধু যে স্বদেশী দ্রব্যের আদর করিতে শিখিয়াছে তাহা নহে; অধিকন্তু দেশে কি কি জিনিস উৎপন্ন হইতেছে তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ দেখা যাইতেছে। ইহা যে দেশের পক্ষে সুলক্ষণ তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি যে কত সস্তা ও কত সুন্দর রকমে আমাদের দেশের কারিগরেরাই তৈয়ার করিতে পারে তাহা আমরা অনেকেই জানি না। সেই দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া আমরা কদর্য্য বিদেশী নকল কিনিয়া সন্তুষ্ট। ফলে উৎসাহের অভাবে দেশী গৃহজাত শিল্পগুলি প্রায়ই উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কারিগরেরা অন্য ব্যবসা ধরিতেছে; নিজেদের বংশগত ব্যবসায়ে আর অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয় না বলিয়া তাহাদের অনেকেই মসীজীবি কেরাণী কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে।

মেলা গুলি যে আমাদের দেশে প্রয়োজন তাহা আর একদিক হইতে দেখা যাইতে পারে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, একটী পণ্য অপর একটীর supplementary। এরূপ স্থলে যাঁহারা পণ্যদ্রব্যাদি উৎপন্ন করিতেছেন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করিবার সুবিধা মেলার মত স্থানেই খুব সম্ভব। যাঁহারা সূতা তৈয়ার করেন ও যাঁহারা বস্ত্র বয়ন করেন, তাঁহারা এই সব মেলাতে আসেন ও পরস্পরের অভাব অভিযোগ জানিতে ও জানাইতে পারেন এবং তাহাতে বস্ত্রব্যবসায়ের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ব্যবসায়ের পক্ষে সুতরাং মধ্যে মধ্যে এই রকম মিলন ক্ষেত্র দরকার। স্বদেশী মেলা গুলিই আমাদের সেই মিলন মন্দির।

দশে মিলিয়া কোনও কাজ করিতে গেলে মতভেদের সৃষ্টি হয়, হওয়া ও স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও একটী মত এই যে, বিদেশী বণিকেরা নাকি এই সব মেলা হইতে আমাদের প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়া যায়। আর তার পর সেইরূপ বিদেশী দ্রব্য আমদানী করিয়া বাজার ছাইয়া ফেলে। স্বদেশী দ্রব্যগুলি আর বিদেশ জাত সস্তা নকলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না; পরাস্ত হইয়া ক্রমে লোপ পায়। সত্য সত্য এরূপ কখনও হইয়াছে কিনা জানি না। সন্দেহটী সমূলক কি না তাহা হিসাব নিকাশ না করিয়া বলা যায় না।

ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ মেলা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় সেই উদ্দেশ্যে দর্শকদের তরফ হইতে দুএকটী কথা মেলার কর্ত্তৃপক্ষদের গোচর করিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ, যে চৈত্র মাস কিংবা বৈশাখ মাস মেলা বসাইবার প্রশস্ত সময় নহে। ইহাতে

দর্শকদিগের গ্রীষ্মের জন্য অসুবিধা হয়। ৩,৪ ঘণ্টা ধরিয়া দেখিয়া দর্শকের শ্রান্তি আসে; সব বিপণি গুলি ভাল করিয়া দেখা হয় না। তার উপর সময়টা কাল বৈশাখীর; মেলার ঘরগুলি সামান্য রকমে দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা। দুএকটী বেশী রকম ঝড়ঝাপটা আসিলে ঘর গুলি সামলান দায়। যাঁহারা জিনিষ পত্রাদি দেখাইয়া থাকেন তাঁহাদের ক্ষতি হইতে পারে।

মেলাতে একটী করিয়া Guide-book থাকা উচিত। সে গুলি প্রবেশ দ্বারে বিক্রয় করা হইবে। একখানি কিনিলেই দর্শকেরা কোথায় কোথায় বিশেষ মনোযোগ করিবেন তাহা ঠিক করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে অনেক সময় বাঁচে, আর দ্রব্যাদি দেখিবারও সুবিধা হয়।

সময় থাকিতে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য উপায়ে বাংলার প্রত্যেক গ্রাম হইতে সেখানকার বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্যাদি দেখাইতে কারিগরদের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। হঠাৎ দু দশ দিনের খবরে আমাদের গ্রামের লোকেদের মাল লইয়া আসা অনেক সময়েই অসম্ভব। সব জায়গা হইতে যাতায়াতের সুবিধা নাই; তার উপর অনেক কারিগরের অর্থের অসচ্ছলতা আছে। যোগাড় যন্ত্র করিয়া কলিকাতায় আসিতে সময় লাগে। হয় ত অনেক কারিগর খবর পাইবার আগেই মেলার নির্দ্দিষ্ট সময় আসিয়া পড়ে; তাঁহারা আসিতে পারেন না। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়।

আর একটি বিষয়ে, বিশেষ অভাব অনুভূত হয়। দুএকটী বিপণি ছাড়া অন্য কোনটীতেই পণ্যদ্রব্যের ও মূল্যের তালিকা না থাকাতে দর্শকদিগের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে; দোকানদারের পক্ষেও ইহা বিশেষ ক্ষতির কথা। একবার চোখ বুলাইয়া দোকানদারের নামের একখানি কার্ড পকেটে করিয়া আসিলেই দর্শকের কিছুই মনে থাকে না। যদি পরে কোনও দ্রব্য কিনিবার প্রয়োজন হয়, তখন অনেকেরই মনে থাকে না যে কোথায় কি দ্রব্য পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে, হয় তাঁহাদের বিদেশী দ্রব্য কিনিতে হয়, নয় বাজারে দৌড়াদৌড়ি করিয়া অনেক সময় বৃথা নষ্ট করিতে হয়। তাহার পর জিনিসগুলি বিক্রয় হইয়া গেলেই ক্রেতা তাহা লইয়া যান। ইহাতে প্রদর্শনীর ফল হয় না। ক্রেতার নামে টিকিট লাগাইয়া মেলার শেষ পর্য্যন্ত দোকানেই রাখিয়া দেওয়াই ঠিক। ভাল দ্রব্যগুলি নিশ্চয়ই মেলা খুলিবার দুএকদিনের মধ্যে বিক্রয় হইয়া যাইবেই। সেগুলি লইয়া গেলে প্রদর্শনীতে কেবল অকেজো খারাপ জিনিসগুলি পড়িয়া থাকিবে। যাঁহারা দুচারদিন পরে দেখিতে আসেন তাঁহারা ভাল দ্রব্যগুলি দেখিবার সুযোগ পান না।

শ্রীমন্মথনাথ বসু।

* * * * *

এবার ভারতের দুই প্রদেশের প্রদেশিক সমিতিতে দুইজন নারী সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গীয় নারীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ সৌভাগ্য ও গর্ব্বের বিষয়। দুইজনই বাঙ্গালী রমণী। মধ্যপ্রদেশের সভানেত্রী, স্বনামধন্যা সুকবি শ্রীমতী

সরোজিনী নাইডু ও চট্টগ্রাম প্রদেশের সভানেত্রী, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের সহধর্ম্মিণী। চট্টগ্রাম প্রাদেশিক সমিতিতে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার কথা আলোচনা করাতে অসহযোগীদের মধ্যে বেশ আন্দোলন হইয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন যে, চট্টগ্রামে বঙ্গদেশের সুনাম মসীলিপ্ত হইয়াছে। এরূপ ভাষা সমর্থন করা যায় না। রাজনীতি ক্ষেত্রে মতদ্বৈধ প্রায়ই হইয়া থাকে এবং হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সেজন্য বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের প্রতি এইরূপ আক্রমণ সমীচীন মনে হয় না। যতদূর মনে হয়, শ্রীযুক্তা বাসন্তীদেবীর বলার অর্থ এই যে, কাউন্সিলের ভিতর সেইরূপ খাঁটী লোক থাকিলে গবর্ণমেণ্টকে অচল করার সম্ভাবনা বেশী হইতে পারে এবং এই পন্থা গ্রহণ করা এখন অসহযোগীদের পক্ষে উচিত কি না ইহা যেন আগামী কংগ্রেস ভাবিয়া দেখেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যে এই মত পোষণ করেন, সেই বিষয়ে বোধ হয় কোন সন্দেহের কারণ নাই, কেন না শ্রীমতী বাসন্তী দেবী তাঁহার বক্তৃতার সুচনাতে তাহার আভাস দিয়াছেন। Reform scheme টী যে অত্যন্ত ফাঁকা ও অন্তঃসারশূন্য তাহা এতদিনে প্রায় সকলেই বুঝিয়াছেন; জনসাধারণের উপর যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি সামান্য, ছেলেভুলান মোয়া মাত্র, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু, তবুও যদি গবর্ণমেণ্টকে অচলকরা উদ্দেশ্য হয়, তবে একেবারে বাহির হইতে চেষ্টা করা অপেক্ষা Council হইতে চেষ্টা করিলে তুলনা হিসাবে হয়ত অধিকতর সহজসাধ্য। জনসাধারণের প্রতিনিধি কাউন্সিলের মেম্বারগণের ক্ষমতা অতি সামান্য হওয়া সত্বেও, একটি বিষয়ে তাহাদের ক্ষমতা রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি নূতন ট্যাক্স বসাইতে চাহেন, কাউন্সিলের মত ভিন্ন করিতে পারেন না। কোন টাক্স বসাইতে কাউন্সিল বাধা দিলে গবর্ণর বা অন্য কেহই সে মতের বিরুদ্ধে টেক্স বসাইতে পারেন না। যদিও কোন কোন বিষয়ে গবর্ণরের কাউন্সিলের মত উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে ও সেই ক্ষমতা তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, এখানে তিনি তাহা করিতে পারেন না। যেমন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি, এবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, নূতন তিনটী ট্যাক্সকে ভোটের জোরে বাধা দিতে পারিতেন, তবে ইহা (restore) বসাইবার ক্ষমতা গবর্ণরের ছিল না।

Hon'ble মিঃ কার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্টের তরফ হইয়া Amusement's Tax সমর্থন করিবার সময় বলিয়াছিলেন,—"We have taken legal opinion and have ascertained that it would not be open to His Excellency the Governor to certify these taxation Bills......The responsibility for dealing with these Bills, therefore, rests on the Council and on the Council alone, and the Council cannot evade its responsibility by shifting it on to the shoulders of H. E. Governor or of any body else."

"আমরা আইনজ্ঞের মত গ্রহণ করিয়া ইহাই জানিয়াছি যে গবর্ণর এই টাক্স ধার্য্যের প্রস্তাবগুলি (কাউন্সিলের মতের বিরুদ্ধে) প্রচলন করিতে পারেন না।...... এই ট্যাক্সের

প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা বা না করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কাউন্সিলের উপর ; কাউন্সিল এই দায়িত্ব গবর্ণর বা আর কাহারও উপর চাপাইয়া দিতে পারেন না।"

কার সাহেব আরও বলিয়াছেন :—

"So, I say, I did not exaggerate the case in the least, when I said that if the taxation Bills are thrown out by the Council, the result will be dead lock and chaos."

"আমি যে বলিয়াছি, যে যদি কাউন্সিল এই ট্যাক্সের প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য করেন, তবে গবর্ণমেণ্ট অচল হইবে, তাহা একেবারেই অতিরঞ্জন নহে।"

অসহযোগী নেতারা যদি কাউন্সিলে যাইতেন, এবং একসঙ্গে কাজ করিতেন, তবে গবর্ণমেণ্টকে অত্যন্ত বিপদে ফেলিতে পারিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী বোধ হয় এই সব ভাবিয়াই কাউন্সিলে প্রবেশ করার কথা উত্থাপন করিয়াছেন।

* * * * *

ইংলিশম্যান প্রমুখ এংগ্লোইণ্ডিয়ান কাগজে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আপেক্ষিক ভাল ব্যবহার করার বিপক্ষে বিশেষ ভাবে তীব্র আলোচনা হইতেছে। ইংলিশম্যান মনে করেন যে, সাধারণ অপরাধী হইতে রাজনৈতিক অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব বেশী, কেন না, যাঁহারা নিজের স্বার্থের জন্য আইন ভঙ্গ করে তাহাদের অপেক্ষা যাঁহারা কোন আদর্শ (Ideal) এর জন্য আইনভঙ্গ করে, তাহাদের নৈতিক অবনতি বেশী। যে জাতি বেলজিয়মে একটা কথা রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশে কুণ্ঠিত হয় নাই, যে জাতি আয়র্লণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করিতে ব্যস্ত, সে জাতির প্রতিনিধির পক্ষে এরূপ মত প্রকাশ করা আশ্চর্য্যজনক বটে ; তবে বিলাতের ইংরেজ যে ভাবে একটা জিনিষ বিচার করিয়া দেখে এই গরম দেশে ইংলিশম্যান বোধ হয় সে ভাবে সেই জিনিস বিচার করিবার মত মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারেন না। ভারতবাসীর পয়সায় ভারতের কয়েদখানায় দণ্ডিত ইউরোপীয়ান, জাপানী, চীনা, এমনকি নিগ্রো খুনী চোর প্রভৃতি সমাজদ্রোহী ব্যক্তিগণ যে ব্যবহার পায়—আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ, একটা উন্নত আদর্শের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় কারাদণ্ড বরণ করিয়া লইয়া, উক্তরূপ ব্যবহার দূরে থাক, জেলকানুনানুযায়ী সাধারণ সুবিধাগুলি লাভ করিতেছেন দেখিয়া ইংলিসম্যানের কি ভীষণ গাত্রদাহ ?

তবু ও যদি গবর্ণমেণ্ট সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিগণকে রাখিবার সুব্যবস্থা করিতেন। ফরিদপুর, বরিশাল, খিদিরপুর জেলের কথা এখন ও কেহ ভুলিতে পারে নাই।

সমস্ত সভ্য দেশে রাজনৈতিক বন্দীর সহিত যে ব্যবহার করা হয় আমাদের দেশেও সেই আচরণ করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার অনুরোধ সরকার বাহাদুর উপেক্ষা করিলেন। শিক্ষায়, জ্ঞানে, পদমর্য্যাদায় সমাজে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ লোক তাঁহাদের সহিত সাধারণ কয়েদী অপেক্ষা সামান্য একটু ভাল ব্যবহার করিলে ইংরাজশাসনের ভিত্তি কি শিথিল হইয়া যাইবে বলিয়া ইংলিশ-ম্যানের ভয় ?

* * * * *

বেগম সুলাতনা মুয়াজ্জিদজাদা নাম্নী একজন মুসলমান মহিলা বি, এল প্রাথমিক পরীক্ষায় পরীক্ষায় প্রথম ও হিন্দু আইনেও প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছেন। একজন অন্তঃপুরচারিনী মুসলমান মহিলার পক্ষে ইহা বিশেষ কৃতিত্ব ও প্রশংসার পরিচায়ক।

* * * * *

বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ মিশনের মহামনা সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মৃত্যুতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের তো কথাই নাই। ইহার অভাবে বেলুড়মঠ আজ কাণ্ডারীবিহীন। ইহার নির্দ্দেশে রামকৃষ্ণমিশন নরনারায়ণের সেবা করিয়া কত অগণিত রোগগ্রস্থ, ক্ষুধার্ত্ত, বিপন্ন, মুমূর্ষু লোকের কতভাবে সেবা করিয়া, সাহায্য করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন ও উপকৃত করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। বলিতে গেলে তিনি দুঃখী গরীব বিপন্নের মা বাপ ছিলেন। তাঁহার অভাবে দেশের ও মিশনের যে ক্ষতি হইল তাহা বলিবার নয়, বোধ হয় পূর্ণ হইবারও নয়।

* * * * *

মৌলানা হসরত মোহানীর দুইবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। জুরীগণ একবাক্যে তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া অভিমত দিয়াছিলেন। বিচারপতি প্রথম অপরাধে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২য় অপরাধে তাহাকে দোষী মনে করিয়াও হাইকোর্টের উপর বিচারের ভার অর্পণ করিয়াছেন।

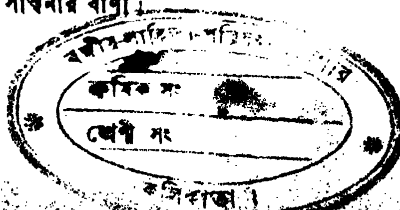
মহাত্মা গান্ধীর পুত্র শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধীরও দেড় বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। তিনিও পিতার ন্যায় নিজেকে প্রচলিত আইন অনুসারে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ও তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যে অপরাধে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিচারপতি মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অপরাধে কোথাও তিনমাস, কোথাও ছয় মাস, কোথাও এক বৎসর এবং এখানে দেড় বৎসর দণ্ডাদেশ হইয়াছে। একই অপরাধে শাস্তির বিভিন্নতার অর্থ কি? আর বরদোলী সিদ্ধান্তের পর দেশ শান্তভাবে চলিতেছে, এখনও ধর পাকড়ের শেষ হইল না—আশ্চর্য্যের বিষয়!

চিরসাথী।

যথাকালে না পৌঁছিলে মোর লিপিখানি
চিন্তাকুল হ'ত তব চিত্ত স্নেহময়,
দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ গত হয়,
লও কিনা সমাচার কিছুই না জানি।
কোনো বার্ত্তাবহ মোরে দেয় নাই আনি
কুশল সংবাদ তব, তবু এ হৃদয়
আপনি বলিয়া উঠে—"সর্ব্ব অনাময়"
আশা হয়ে আসে তার সান্ত্বনার বাণী।

অদেহ বা দিব্যদেহ তুমিই কি থাক
আশারূপে, শান্তিরূপে মোর কাছে কাছে?
প্রত্যুষে তুমিই মোরে নাম ধরে ডাক
আর বল,"দৃঢ় হও, বহু কাজ আছে"?
সন্ধ্যাকালে শ্রান্ত আর চিন্তা ববে ঘিরে
তুমি কি অভয় হস্ত রাখ ভপ্ত শিরে?

শ্রীকামিনী রায় বি-এ।



নব্যভারত

চত্বারিংশ খণ্ড] আষাঢ়, ১৩২৯ [৩য় সংখ্যা

কবিতা ও গানে হাফ্-টোন্।

এসেন্সের শিশির কর্ক যখন খোলা হয় তখন তীব্র গন্ধ নগ্ন ও অপ্রস্তুতভাবে মনকে আহত করে,—তাতে অবকাশ বা অবসরের কোন ক্রমই নেই; কিন্তু বেলফুল যখন ফোটে তখন অর্দ্ধস্ফুট কলিকার লীলায়িত ক্রম উত্তরোত্তর মনকে আবিষ্ট ও বিভ্রান্ত করে' দেয়—তা' ধীরে ধীরে নানা হিল্লোলে রসবৈচিত্র্য সঞ্চার করে' আত্মপ্রকাশ করে।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মাঝেও এই অবসর ও ক্রম, এই মৃদু ব্যাপ্তি ও বিলোল রসসম্পাতের অপূর্ব্ব কারুতা, এই ছায়ান্তর-মাধুর্য্যের নিবিড় আকর্ষণ এক অপূর্ব্ব মাদকতা ঘনীভূত করে। আড়ালে আহিত নিভৃত রূপশ্রী এক আশ্চর্য্য মহিমা লাভ করে—তা' ভাবেরই হোক্ কিম্বা বস্তুরই হোক্। এই মিশ্র ও ধূসর গোধূলি-রাজ্য সাহিত্যকে নানা দিক্ হ'তে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করে' ফেলেছে। এ যুগের নানা অভিনব ও বিভিন্নপন্থী কবিরা এই নিরুদ্দেশ রাজ্যের ক্ষুধিত ও গূঢ় আহ্বানে অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়েছেন। এ যুগের কাব্য ও কলার ঐশ্বর্য্য এই অভিনব মেঘরাজ্যে এক অপূর্ব্ব অলকা রচনা করেছে!

নগ্ন আলোক বস্তুকে প্রকাশ করে না,—ঢাকা দেয়। তা'তে আলোই দ্রষ্টব্য হয়ে পড়ে, জিনিষ নয়—এ জন্য চিত্রবিদ্যার কোন কোন শ্রেণীর শিল্পী শুধু আলোককে প্রকাশ করাই পরমার্থ করে' তুলেছেন। কিন্তু আলোক যেখানে উপলক্ষ্য মাত্র হয়, সেখানে ছায়া সঞ্চার কর্ত্তে হয়—সেখানে অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন—সেখানে পর্দ্দার অঞ্চল ভাল করে' টেনে দিতে হয়। ভাবরাজ্যে এ রকমের ব্যাপার আরও বেশী ঘটে' ওঠে। হৃদয়ের অসীম অন্তঃপুরে কত সুগুপ্ত ব্যথাবীথিকা, অশ্রুপর্য্যায় ও ক্ষুরধার পুলক রয়েছে তা'র ইয়ত্তা নেই। অতীত ও ভবিষ্যৎ সেখানে তো ডুবে রয়েছে—জলে ডোবা মণিমুক্তা-বোঝাই জাহাজের মত। শুধু বর্ত্তমানই জাগ্রত জ্ঞানরাজ্যে প্রতি মুহূর্ত্ত ভেসে উঠ্‌ছে—এ তো মনস্তত্ত্বেরই কথা। এ সমস্ত কারণে শুধু যা' প্রত্যক্ষ, যা' স্ফুট, যা' অস্ত্রোপচারীর মর্ম্মরটেবিলে ছুরিকাঘাতের জন্য শুভ্র কিরণতলে সজ্জীকৃত—তা' বড় জিনিষ বা একমাত্র দ্রষ্টব্য ব্যাপার নয়; এমন কি অতি যৎসামান্য। ভাবের বর্ণচ্ছত্রে—spectrum এ—যা' দেখা যাচ্ছে, তা', যা' দেখা যাচ্ছে না বা সামান্য দেখা যাচ্ছে, তা'র তুলনায় অতি যৎসামান্য।

কাব্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড, 'সংহার' 'স্বর্গচ্যুতি' বা 'নরকদর্শন' এসব স্পষ্ট সহজ উপায়ে আখ্যাত হয়েছে। একালের ট্র্যাজেডি এসব ভীষণ ও সরল রসসঞ্চারে রচিত হচ্ছে না। সেকালের মহাকাব্যের 'মোতিফ্' (motif) নিয়ে একালের খণ্ডকাব্যও রচিত হচ্ছে না,

কারণ একালে তা' অপ্রচুর ও অসম্ভব। মেয়্তেরলিঁ্যাক্(Maeterlinck)এক জায়গায় তা' আধুনিকদের পক্ষ হ'তে ভাল করে' বুঝিয়েছেন। একালের ট্র্যাজেডিতে রক্তপাত নেই,যুদ্ধোদ্যম নেই —তা গৃহকোণের অবজ্ঞাত অন্ধকারে জন্মলাভ কচ্ছে। মানবের চঞ্চল ভাবমুহূর্ত্তকে তন্ন তন্ন করে' তলিয়ে দেখে' তা'রই আড়ালে ও অন্তরালে অসংখ্য গভীর ট্র্যাজেডির বার্ত্তা পাওয়া যাচ্ছে, —যা'র কাছে কয়েকটা হত্যাকাণ্ড অতি তুচ্ছ ব্যাপার। প্রতিদিনের মানব-জীবনের অসংখ্য বেদনা ও আনন্দস্তরের উপকণ্ঠে একটা গভীরতর জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ছে, যা' একালের কাব্যে কলায় শুধু প্রতিফলিত হয়েছে। একালের এই অপূর্ব্ব রসজগৎকে শুধু রহস্যলোক বল্‌বার যো' নেই, প্রয়োজনও নেই। মধ্যযুগের প্রাচীন দুর্গ ও উৎসবঘটা বা পারস্য মোগল প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলের রাজন্যদের আরামের নানা উপকরণ—প্রাসাদ, ফোয়ারা, স্নানাগার বা মধুর অত্যাচারের নানা সংগ্রহের ভিতর যে অসূর্য্যম্পৃষ্ট রহস্য আছে—তা'তে এ যুগ আরাম পাচ্ছে না। নব্য আইরিশ সাহিত্য একটা নূতন পুরাণকথা (Mythology) তৈরি করে বসেছে, কবি সিঞ্জ (Synge) য়্যারান্ (Aaran) দ্বীপে ঘুরেছেন, শিল্পী গোগ্যাঁ তাহিতি (Tahiti) দ্বীপে দিন যাপন করেছেন, কিন্তুএ সবের ভিতর এ যুগের প্রবল রস-ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হয়নি। বাইরে ঘুরে' এ নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হয় নি, জীবনের অন্তরতর প্রকোষ্ঠেই তা'র সন্ধান পাওয়া গেছে।

বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্যভক্ত রাস্কিন্ (Ruskin) হঠাৎ এক জায়গায় ভাবের খেয়ালে একটা বড় রকমের কথা বলেছেন যা' তলিয়ে দেখ্‌লে হয়তো তাঁর নিজেরই মাথা ঘুরে যেত! রাস্কিন্ বলেছেন যে, যে আর্টে নিপুণ ও তরল সূক্ষ্ম ভাবাবেশ নেই, যা delicate নয়, তা নিকৃষ্ট— "All bold art is bad art"--সাহসিক ও ধৃষ্ট আর্ট মাত্রই খারাপ। রাস্কিনের মতে শুধু নগ্ন জ্ঞানজগৎটাই কবির পক্ষে বড় কথা নয়; এ জগতের ভিতরই প্রেম ও আশঙ্কা, স্বপ্ন ও ভীতি ওতপ্রোত হয়ে আছে, যা' অলৌকিক রসসঞ্চার করে' আর্টকে এক অদ্ভুত অপূর্ব্বতা দেয়।

কাজেই হাতের তাস সব খুলে' বা খোলা তাস নিয়ে যে শুধু এ খেলা হয় না, তা' নয়, —রঙের তাসের দরকারও এ খেলায় খুব বেশী হয়ে পড়ে। যা'রা চায় দুনিয়ার ভাবের রাস্তাগুলি খুব চওড়া ও বাঁধান হবে, তা'তে অলিগলির ঝ্যাসাদ থাক্‌বে না, তাদের পক্ষে এ রকমের ছায়াপথের শতবীথিকা দুঃসহ সন্দেহ নেই, অথচ উপায়ও নেই।

অক্‌টোপাসের মত নিষ্ঠুর বিজ্ঞানের আক্রমণে কবিতার অধিকারের জায়গা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে পড়া সম্ভব অনেকের মনে এ রকম বিশ্বাসও দাঁড়িয়ে গেছে। রূপকথাই হোক্, পরীরাজ্যই হোক্, কবিতার অনেক প্রাচীন অট্টালিকা, বিজ্ঞান আজ ধূলিসাৎ করেছে। প্রাচীন কলা ও কবিতা নানা রকমের দেবলোক, দানবলোক প্রভৃতি নিয়ে এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য পুরী রচনা করেছিল সকল দেশে। সভ্যতার প্রথম উষালোক যে নিষ্ঠার ভিতর এ পুরীকে জন্ম দেয়, সে নিষ্ঠা এখন আর থাক্‌তে পারে না। সেটাও কবির মানস-অন্তঃপুরই ছিল—বৈজ্ঞানিকের শাণিত তরবারি আজ তা'কে একটা দিকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' তৃপ্ত হয়েছে। পুরাণ (Myth) ও পুরাণকথার (Mythology) ভিতর কবির স্বচ্ছন্দবিহার সকল দেশেই হয়েছে; একালে যা' হচ্ছে তা' এসবের 'মমি' নিয়ে, প্রাণ

নিয়ে নয়। তার পরে আখ্যান ও উপাখ্যানের যে একটা ছায়ালোক রচিত হয়, যা' "রাজা" "রাণীর" নানা কল্পিত কীর্ত্তিকে মুখরিত করে, তাও একটা অন্তর্নিহিত গুম্ফিত অবসর-পিপাসা হ'তে জন্ম লাভ করে। তা'ও বা কোথাও আরব্য-দিবসের প্রখর সূর্য্যালোক হ'তে পালিয়ে একাদশ সহস্র রজনীর ধূসর অঞ্চলতলে আশ্রয় লাভ করে' অপূর্ব্ব নক্ষত্রলোক রচনা করেছে।

এ যুগটি এসে এসব তো চুরমার করে' দিয়েছে। এণ্ড্রু ল্যাঙের (Andrew Lang) পরীর কাহিনী এ জন্য বাজে বকুনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা' বলে' কি কবিতালক্ষ্মীকে একেবারে অন্তর্দ্ধান কর্ত্তে হয়েছে বিজ্ঞানের ভ্রূকুটি দেখে? একেবারেই নয়। বিজ্ঞানের যেখানে অভিষেক হয়েছে, কি হতে পারে, কাব্য ও কলালোক তো কোনকালেই সেখানে আনাগোনা করে নি। যেটা প্রমাণ প্রমেয়ের রাজ্য, যেখানে প্রতি সন্ধিস্থলের উপর "বুল্‌স্-আই ল্যাণ্টরণ্" প্রয়োগ কর্ত্তে হয়, কবিতা ও কলাকে সেখানে কোনকালে পাওয়া যায় নি। একালেও বিজ্ঞান বা ফটোগ্রাফের ধর্ম্মে কবিতাকে পেয়ে বসে নি। কবিতা একটা নূতন জানলা এ যুগের হৃদয়বেলার উপকণ্ঠে খুলেছে,—যা'র প্রাণাত্মক রসসম্পাত এক অসীম ও অব্যক্ত দেবযানের মত এ কূল হ'তে অকূলের দিকে ধূসরিত হয়ে বিস্তৃত হয়েছে। কলা ও কবিতাকে বিজ্ঞানের খাঁচায় বন্ধ কর্ত্তে অনেক চেষ্টা হয়েছে—না হলেই আশ্চর্য্যের বিষয় হ'ত—কিন্তু কলালক্ষ্মী ঈষৎ হাস্য করে' এসবের বজ্রমুষ্টি হ'তে আত্মরক্ষা করে' এসেছেন।

এ যুগে কবিতা ও কলা নিয়ে নানা আন্দোলন হয়েছে। সাহিত্যে বস্তুবাদিতা, প্রত্যক্ষ-বাদিতা প্রভৃতির উদ্দাম ডমরু যখন বেজে উঠে তখন কবিহৃদয় সচকিত ও ভীত হয়ে' পড়ে। যেখানে কাব্যকে শুধু আখ্যানরূপে কেউ দেখেছে সেখানে বস্তুবাদিতার অভিনয় চলেছে। কিন্তু গীতিকবিতা ও গান আখ্যান নয়, কাজেই এ রকমের কবিতা পরখ করে' দেখতে পাওয়া যায় যে প্রতিকূল আগ্নেয় তাণ্ডবের ভিতরও কি রকম আশ্চর্য্য ও নিপুণ উপায়ে কাব্য সুদূরে আপনার নিভৃত ও সুশীতল নীড় রচনা করে' অগ্রসর হয়েছে। কবিতা সহজেই প্রত্যক্ষবাদীর প্রখর আলোকসম্পাতকে ব্যঙ্গ করে সহস্র আড়ালে, ছায়ায় পল্লবিত শত ইঙ্গিতের মাঝে মধুর আশ্রয় লাভ করেছে। এ যুগের কবিতায় যে নানা দিকে নানা ভাবে একটি হাফ্-টোন্ বা সূক্ষ্মতর টোনের ছায়াসম্পাত এসে তা'কে সুকুমার ও পেলব, অথচ গভীর ও মর্ম্মন্তুদ করেছে তা'তেই এরূপ একটা নূতন কল্পলোক সৃষ্টির আভাস ভাল রকমেই পাওয়া যাচ্ছে। বোদ্‌লেয়ার্ (Baudelaire), ফ্লোবেয়ার্ (Flaubert), গঁকুর্ (Goncourt), ভেরলেন্ (Verlaine), মেলার্মে (Mallarme), প্রভৃতি ভাবুকগণ আধুনিক ইম্প্রেশনিষ্ট্ (Impressionist), সিম্বলিষ্ট্ (Symbolist), ডেক্যা-ডেণ্ট্ (Decadent) সাহিত্যের নানা পথে এই নূতন ইথরের মত হাল্কা কাব্যনীড় রচনা করেছেন।

মুক্ত, নগ্ন, স্ফুটতম জ্যামিতিক জগতের অন্তরালে এরূপে আভাসে, ইঙ্গিতে, শ্রমমন্থর মদিরতা ও তন্দ্রাজড় অর্দ্ধসুপ্তিতে এক অপরূপ ছায়ারাজ্য আধুনিক কবিতার সূক্ষ্মতম ভাবহিল্লোলে আশ্রয় লাভ করেছে—যা' সেকালে সম্ভব ছিল না। কবিতাও যে

নীতিশাস্ত্র, বা অধ্যাত্মতত্ত্ব নয়, ছন্দের ও ভাবের লালিত্যকে আশ্রয় করে'ই যে তা'র সুষমা বিকশিত হয়, শুধু একালেই তা' ভালরকমে অনুভূত হয়েছে। ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও উপদেশ এসব কবিতার ব্যাপারই নয়। ছন্দের অপূর্ব্ব লালিত্য মনের দ্বারে আঘাত করে' যে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য-পুলক উপস্থিত করে তা'কে জ্ঞানগম্য তত্ত্ব হতে আলাদা করে' দেখা এ প্রসঙ্গেই সম্ভব হয়েছে। সেকালেও কবিতার কাঁধে এসব গুরুভার সিন্ধবাদের মত চাপলেও কোন কোন কবি কাব্যের মুক্তির জন্য অজ্ঞাতসারে প্রচুর চেষ্টা করেছেন। কালিদাস আনন্দে মেঘদূতের প্রতি পদে এমন একটা সুললিত ও নিপুণ অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতা রক্ষা করেছেন যা' কাব্য হিসাবে মেঘদূতের মহিমা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতি পদেই মেঘদূতের রসার্থীর মনে হয় যে মেঘের এ রকমের দৌত্য সরকারী পেয়াদার লাল ফিতার বিষয়ই নয়—এ যক্ষের ক্লান্ত ও করুণ কোমলতা মানুষের মেজাজ ছাড়িয়ে গেছে—এবং যে পরিমাণে যক্ষপুরীটি গর্ব্বিত উজ্জয়িনীর কর্কশ বাস্তবতা পায় নি সে পরিমাণে তার লালিত্য অপরাজেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপে এ কাব্যের লালিত্য কবিকল্পনার আশ্রয় করে' যে সুশৃঙ্খলতা পেয়েছে তা' ভাবুকের কল্পনাবৃন্তেই বিকশিত হওয়ার যোগ্য—ভূতত্ত্ব ও আকাশতত্ত্ববিদের সমস্ত ব্যবস্থা তা' একান্তভাবে পরিহাস করেছে।

যে সমস্ত কারণে সেকালের কাব্য ও কবিতা বিশেষ কয়েকটি রূপ গ্রহণ করেছিল, সে সমস্ত অনিবার্য্য কারণে এ যুগের কবিতাও একটা নব্য কাব্যলোকের জন্ম দিয়েছে। একালের স্বপ্ন ও সৌন্দর্য্য ইন্দ্র-বরুণ বা এপলো-আইসিস্ কল্পনা কর্ত্তে সঙ্কুচিত হয়—এমন কি ম্যাক্‌বেথ্ (*Macbeth*), ম্যান্‌ফ্রেড্ (*Manfred*) হ্যামলেট্ (*Hamlet*), বা ফাউষ্টকে (*Faust*) রচনা করলে এ যুগের হাস্যোদ্রেক হবে—সে সব অসম্ভব ও আজগুবী মানুষ, বাসন্ত-জোৎস্না ও নদীকল্লোল প্রভৃতির মত, এ যুগের ধূসরিত মানবত্বের জীবনপথে মেকি বলে ধরা পড়ে' গেছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আর একটা অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হয়ে একটা অভিনব পুরীর সন্ধান পাওয়া গেছে যা' পূর্ব্ববর্ত্তী সকল যুগেরই দুর্লক্ষ্য ছিল। তা' আরব্যোপন্যাসের যাদুকরের অট্টালিকার মতই সকলের অপ্রত্যাশিত বিস্ময় সঞ্চার করেছে। এ পুরীর অফুরন্ত সৌন্দর্য্যসম্ভার প্রখর রৌদ্রে রজনীগন্ধার মত মুদিত হয়ে পড়ে, অথচ তরল ছায়াহিল্লোলের শত কুঞ্চিত অবকাশে তা' একেবারে নগ্ননৃত্যে উদ্বেলিত হয়ে' ওঠে। এ নব্য সাহিত্য উপলব্ধিরও সাধনা চাই। এই হাফ্-টোন্ পুরীর লঘু ও সূক্ষ্ম ভাবাবেগ ঊর্ণনাভের মত যে সত্যোপেত কাব্যজাল রচনা করেছে তা' হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে হলে জীবনকেও লীলায়িত ক্রমে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তারহীন ভাববার্ত্তার জন্য মৃদু ও পেলব করা প্রয়োজন।

এ সমস্ত "finer shades" প্রকাশ এ যুগের কলা ও কাব্যের একটা নূতন অধিকার। নব্য দার্শনিকেরাও তা' নানা দিকে বলেছেন। ব্যার্গসঁ (Bergson) এক জায়গায় এই "finer shades" ও "half-tones" প্রভৃতির জগৎকে উদ্ঘাটন করা আর্টেরই অধিকার বলে' উল্লেখ করেছেন: "Art reveals in things a great number of qualities

and finer shades than we ordinarily discover in them"। এরূপেই মানুষের বহির্জগৎও ক্রমশঃ সূক্ষ্মতম ও গভীরতম হয়ে' পড়ে, আর্টের সংস্পর্শে! বাল্জাক্‌কে (Balzac) উনবিংশ শতাব্দীর স্রষ্টা বলা হয়ে' থাকে যে হিসাবে, সে হিসাবে আধুনিক যুগও এই নূতন আর্টেরই একটা সৃষ্টি!

নানা ভাবে নানা দিকে এ যুগের উপর এই নূতন আর্টের ছায়া এসে পড়েছে। ব্যাখ্যা ও বিবৃতি, গতানুগতিক উপমা ও উল্লম্ফন ছেড়ে দিয়ে কল্পনাকে একটা অপূর্ব্ব বিষাদে এনে পুলকিত হওয়া, অতি তিক্ততার ভিতর একটা নিভৃত আরাম পাওয়া, দুনিয়ার উজ্জ্বল ছবিগুলিকে রবার দিয়ে ঘসে' মুছে' ওসবকে একটা বর্ণহীন ধূসরতা ও অনির্দ্দিষ্ট ব্যাপ্তির ভিতর এনে, একটা গূঢ় আনন্দ লাভ করা,– এসবের একটা ঢেউ এসেছিল উরোপীয় সাহিত্যে যখন বস্তুবাদিতা ও প্রত্যক্ষ্যবাদিতার রুক্ষ রক্ত চক্ষু সকলকে জর্জ্জরিত কর্ত্তে সুরু করেছিল। এ রকমের Pathological poems ক্রমশঃ সূক্ষ্ম রুচির ও অনুভূতির পরিচায়করূপে প্রসিদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সব কবিকেই এ রকমের কবিতা লিখ্‌বার রোগে পেয়েছিল। ভেয়ারহেয়রেন্ (Verhaeren), মেয়্‌তের্‌ল্যাঁক্ (Maeterlinck) প্রভৃতি সকলেই এ অবস্থার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পড়েন। ক্রমশঃ বাইরের জগৎ ছেড়ে উরোপীয় কবিতা অন্তর্জগতের মেঘরাজ্যে এসে পড়ে। তা'রই ভিতর মর্ম্মপীড়া, ব্যর্থতা, দুঃসহতা ও বেদনাই যেন কবিদের ভাবোদ্রেক করেছে বেশী। মেয়্‌তের্‌ল্যাঁকের (Maeterlinck) একটা প্রথম অবস্থার রচনা সেয়ার্ শাঁদ্ ("Serres Chandes") কাব্যে এ অবস্থাটি বেশ প্রতিফলিত হয়েছে। কোন সমালোচক বলেন : "These decadent sensations have reached the exasperation of their strength, the last burst blooms of their fancy and these poems of 'Serres Chandes' are supreme black flowers of our days' overheated and diseased spirit."

মনকে বেদনায় ও বিরহে আলোড়িত না করলে মনের গভীরতা বোঝা যায় না এ পুরাতন কথাটি এ রকমে যেন একটা নূতন প্রমাণ সংগ্রহ কর্ত্তে সক্ষম হ'ল। ক্রমশঃ কবিতা এ রকমের রুগ্ন ও বিষন্নভাবপুঞ্জ নিয়ে খেল্‌বার বাতিক ছেড়ে অতি সূক্ষ্মতম ভাবসম্পাতকে প্রাণমুকুরে প্রতিফলিত করার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। কবিরা যেমন দেখ্‌বার ও শোন্‌বার দুনিয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সহস্র বিলাসবিভ্রম প্রকাশ করেছেন—তেমনি আত্মার বহু নিভৃত ও অনুদ্ঘাটিত আলো ও ছায়ার লীলাবর্ত্ত কাব্যে স্থান দিতে সক্ষম হয়েছেন।

উরোপের কাব্যসাহিত্য ক্রমশঃ এ পথে ইম্প্রেসনিজ্‌মে (Impressionism) এসে পড়ে; তা'ও ছেড়ে সিম্বলিজ্‌মের (Symbolism) আশ্রয় নেয়। সব কিছুরই মূলে একই ভাব কাজ করেছে যাকে সংক্ষেপে মেলার্মে (Mallarme) বলেছেন : "To name is to destroy ; to suggest is to create."। এ সমস্ত কাব্যবিলাস প্রসঙ্গে সহজে 'mood' কে বিম্বিত করাও অনেক জায়গায় পরমার্থ হয়ে পড়ে। এ সব কর্ত্তে কোন কোন জায়গায় ভাষাকে অস্পষ্ট কর্ত্তে হয়—কোন কোন জায়গায় স্পষ্টতাও বাস্তবিক কত অস্পষ্ট তা'ও দেখাতে হয়;

মনকে অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় দাঁড় করাতে হয় কবিতার চরম সাফল্যের খাতিরে।* ভাষাকে অস্পষ্ট করা সহজ, কিন্তু ভাষাকে মুকুলিত বা অর্দ্ধস্ফুট অবস্থায় চয়ন করে' কবিতায় স্থান দেওয়া এ শুধু একালের প্রাণবান্ ও কল্পনাকুশল কবিরাই সম্ভব করেছেন।

এরূপ অবস্থায় কবিতাকে সঙ্গীতের মত ধ্বনির লীলায়িত তরঙ্গে আকৃষ্ট করে' এক অজানা আনন্দলোকের সংস্পর্শে আনা হয়েছে, কখনও রসসম্পর্কে ভাবের একটা হিল্লোলিত রামধনু বা রঞ্জিত arabesqueএর ভিতর মনকে বুলিয়ে নিয়ে এক সুগুপ্ত ও অন্তর্গূঢ় কল্পলোককে সার্থক করা হয়েছে।

পশ্চিমের সকল দেশ যে এ রকমের অবস্থা চেয়েছে বা পেয়েছে তা' নয়। জার্ম্মান অধ্যাপক হুগো মুনষ্টার্বার্গ্ (Hugo Munsterberg) আমেরিকার আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন :—"American Literature lack shading and twilight tones--all that is dreamy, pessimistic, sentimental, decadent. There are no half-tones, no sentimental and uncertain moods."

আমেরিকায় সব কিছুই অতিমাত্রায় নগ্ন বা অতিরিক্ত গুঞ্জিত। নব্য জাতি বলে' স্মৃতিসম্পর্কে রোমান্সের উপকরণও সেখানে কম। আমেরিকায় অনেক কিছু নূতন সৃষ্টি হচ্ছে। যদি এ যুগে কোথাও কোন নূতন স্থাপত্যকলার ভিত্তি নিহিত হয়ে থাকে তবে তা' আমেরিকায়। কিন্তু তা' স্পর্দ্ধা ও পর্য্যাকরনগ্ন ব্যাপ্তির উপর,—তাজমহলের গুপ্ত গুণ্ঠন ও নেপথ্য-নিঃশ্বাসের আরাম তা'তে নেই। রথচক্রঘর্ঘর বিশ্ববিজেতার দুন্দুভি তা'কে জোর করে' জন্ম দিচ্ছে,—জর্জ্জরিত ও লুণ্ঠিত করুণ চিত্তের অতৃপ্ত বেদনার অন্তরালে তা' মঞ্জরিত হয় নি। সে স্থাপত্যকলা নিঃশব্দ ও পরিমিত, অর্দ্ধ অন্ধকারে দুর্লক্ষ্য অজন্তা গুহার ন্যায় একটা ভাবান্তঃপুর ধ্যান কর্ত্তে পারে না।

ইংরেজী সাহিত্যই এই প্রসঙ্গে অতি নগণ্য ও বৎসামান্য হয়ে পড়েছে। কারণ ইংরেজের মনস্তত্ত্বে ভাবোচ্ছাস বা Idealism খুবই কম। পূর্ব্ববর্ত্তীদের ভিতর যা'কে খুবই ব্যাখ্যা করা হয়, সেই শেলী (Shelley) ইতালীয় ভাবাপন্ন। কবিবর য়ীট্সের (Yeats) মতে শেলীকে এই ইতালীয় আবহাওয়া হ'তে নির্ম্মুক্ত করা এক রকম দুঃসাধ্য। যে সাহিত্য আধুনিক যুগে উরোপের সহিত ইংরেজী সাহিত্যের ভাবসঙ্গম ঘটিয়েছে, সে সাহিত্য ইংরেজের নয়—তা' নব্য আইরিশ সাহিত্য। কবিবর য়ীট্স্ আইরিশ। ফ্রানসিস্ টম্সন্ (Francis Thompson) রোম্যান ক্যাথলিক ভাবাপন্ন, তাঁর ভাবজগৎই বিভিন্ন। বাংলা দেশে যাঁদের দোহাই বেশী—তাঁদের ভিতর উপনিষদের অধ্যাত্মতত্ত্ব আরোপ করা এ দেশের একটা দুশ্চিকিৎস্য রোগ হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে সব কবির স্থান উরোপীয় সাহিত্যে কতটুকু আছে—তা' কেউ ভাব্বার অবসর পান না। কাব্য, দর্শন বা তত্ত্ব নয়—কবিরাও দর্শন ব্যাখ্যার ব্যবসা করেন না—এ সহজ কথাটি বাংলা দেশে এখনও বিবেচিত হয় নি। সম্প্রতি চিত্রকলায় ভিতর দিয়ে

* লেখকের রচিত "আর্ট ও আহিতাগ্নি" নামক নূতন গ্রন্থে এ সমস্ত বিষয়ের বিশেষ ও বিশদ আলোচনা আছে— সম্পাদক

রোজার ফ্রাই (Roger Fry) এবং উইণ্ডহ্যাম্ লিউইস্ (Wyndham Lewis) প্রভৃতি উরোপের সহিত আবার আত্মিক সম্বন্ধ ঘটাতে চেষ্টা কচ্ছেন। Vorticism হচ্ছে তারই নমুনা। তা না হ'লে ইংলণ্ডকে 'একঘরে' ও একক হয়ে পড়তে হ'ত।

যাকে আমি হাফ্-টোন্ জগৎ বলেছি তা' এ যুগে উরোপের সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম জীবন-হিল্লোলকে বহন করে প্রদীপ্ত হয়েছে। এ সাহিত্যটিকেই আধুনিক বল্‌তে চাই কারণ তা' কোথাও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে পূর্ব্বতন কাব্য ও কলায় স্থান পায় নি।

ভাবের এই আধুনিক ও নব্যতর সমুদ্রমন্থনে বাংলা সাহিত্য কি কোন অবস্থার সঙ্গে কোথাও সৌহার্দ্দ্য ও সঙ্গতি রক্ষা কর্ত্তে পেরেছে? কোন রকম বাইরের কারণে বাংলাদেশের সহিত বিশ্বের ভাবতরঙ্গের অবশ্যম্ভাবী যোগ কল্পনা করাই সম্ভব নয়। অথচ তা হয়েছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় শুধু একজন কবি একা কার্ত্তবীর্য্যের মত সহস্র হস্তে যেন সুদূর বাংলার কল্পনাভীরু প্রাচ্য সাহিত্যকে এ রকমের একটা বিশ্বজনীন সম্পর্ক দিয়েছেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ও কাব্য বাংলার পূর্ব্বতন সমস্ত কবির ও কবিতার প্রতিবাদ সেখানেই এই বিশ্ব-সম্পর্কের সহস্রধারা তাঁর কাব্যের উপর অজস্র বারি সিঞ্চন করেছে! বাংলা দেশে যখন চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর প্রেমস্বপ্নকে বাংলা দেশের মাপকাঠি দিয়ে কল্পনা বা পরিমাপ কর্ত্তে যান নি! যখন আরও পূর্ব্ববর্ত্তী সুদূর প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব বাংলা দেশে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন তখন ভৌগোলিক সীমা তাঁর কল্পনালোক বা সহজ সংস্কারকে সঙ্কুচিত করে নি। বাংলাদেশের এরূপ অঘটন-ঘটন-পটিয়সী এক অনির্ব্বচনীয় ধ্যানবুদ্ধি বার বার এ দেশকে মহত্ত্বের পথে ডেকেছে। তেমনি এ যুগের রবীন্দ্রনাথও কাব্যক্ষেত্রে যখন এক নূতন সৌন্দর্য্যলোক রচনার শুভবুদ্ধি পেয়েছিলেন তখন বাংলাদেশের অধিকার বা বুদ্ধির সীমা তাঁকে সন্ত্রস্ত করে নি। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তীদের ইতিহাস ঘেঁটে চৈতন্যদেবের মনস্তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের মনোরাজ্য বিশ্লেষণ করে' রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্ব কিছুতেই পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, বাংলাদেশকে একেবারে একটা নূতন সৌন্দর্য্যলোকে আহ্বান করেছে—যা' শুধু পশ্চিমেই সম্ভব হয়েছিল। আর্‌নেষ্ট্ রিস্ (Ernest Rhys) কবিবর য়ীট্‌স্ প্রভৃতি অনেকে রবীন্দ্রনাথকে বাংলার চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের স্মৃতির ভিতর খুঁজতে চেষ্টা করেছেন—তাঁদের পক্ষে বোঝা কঠিন যে রবীন্দ্রনাথকে সেখানে পাওয়া অসম্ভব।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই ছায়ারাজ্যকে, এই হাফ্-টোন্ জগৎকে উপস্থাপিত করেছেন নানা বিচিত্রতার ভিতর দিয়ে। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের রচনায় দেখা যায় একটা উদ্দাম সৌন্দর্য্যব্যাকুলতা, জলপ্রপাতের মত, নির্ঝরের মত, তাঁর হৃদয়বেলাকে আপ্লুত ও উদ্বেলিত করে' কবিতাকে একটা রমণীয় রাজ্যে আকৃষ্ট করেছে,—যা'র একমাত্র প্রতিরূপ উরোপীয় সাহিত্যেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেকালে তাঁর Continental সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এমন মনে হয় না। সে জন্য বাংলাদেশের মাঝে তার অনুরূপ—parallel—কাব্যসাহিত্য দেখে একটু বিচলিত ও বিভ্রান্ত হ'তে হয়। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের রচনা হ'তেই বাংলা সাহিত্যে একটা বড় রকমের স্বপ্নরাজ্য রচিত

হ'তে থাকে, যা' শুধু বাংলা দেশের জিনিস মাত্র নয়। ভাবের রাজ্যের সহস্র জোয়ার ভাঁটা, হেরফের, অলিগলি, গবাক্ষ-ঝারোকা, নানা দিকে, নানা ইঙ্গিতে-আভাসে, গুঞ্জনে-শিঞ্জিতে, নানা ভাবে ও ধ্বনিলালিত্যে পরীশিশুর মত ক্রমশঃ তাঁর কাব্যে জন্মলাভ করেছে। তথাকথিত উরোপীয় ডেক্যাডেন্ট (Decadent) সাহিত্যের নানা রম্য লীলা ও সমস্যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অপূর্ব্ব স্থান পেয়েছে! রবীন্দ্রনাথের যৌবনের রচনায় এ সমস্তের এক অনির্ব্বচনীয় মদগন্ধ ও স্বাদ আছে যা "গীতাঞ্জলির" ঐশ্বর্য্যেও দুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথের তরুণ আলোচকেরা তাঁকে অধ্যাত্ম-কবি বলে' আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন; তাঁর জীবন অপেক্ষা জীবনদেবতাই তাঁদের বেশী স্তুতি গবেষণার ব্যাপার হয়ে' পড়েছে। কেউ বা তাঁকে কয়েকটি ইংরেজ কবির—সে সব নাম সকলেরই মুখস্থ আছে সঙ্গে তুলনা করে' এখনও আনন্দ পাচ্ছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথকে এত সহজে, বাঁধা গদে, কবিতা ব্যাখ্যার ইংরেজী শাস্ত্র অনুসারে তলিয়ে দেখা সম্ভব হবে না—এ সহজ কথাটি এখনও কেউ বুঝ্‌তে চেষ্টা করেন নি। রবীন্দ্রনাথের কালচার্ (culture) এত সহজ জিনিষ নয়, তা ইংরেজী মনস্তত্ত্বই নয়। রবীন্দ্রনাথকে পাওয়ার যদি কোন স্পষ্ট পুঁথি থাকে, তবে তা' তাঁর "জীবনস্মৃতি!" তা'রই ভিতর তাঁকে "King of the Dark Chamber" এর মতই পাওয়া যাবে, তার বেশী নয়। অথচ তাঁর কাব্যের অজস্র গতির ভিতর তিনি মুক্তহস্তে আত্ম প্রচার করেছেন। মোট কথা এ রকমের প্রাণবন্যা স্পষ্ট ঘটনাকে জুড়ে', গড়ে' তোলা যায় না—এ দেশে এবং উরোপেও। তাঁর "জীবনস্মৃতি"র ভিতর ফরাসীতে যাকে বলে "inedit" তা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এ জন্য এ শ্রেণীর কবিকে অনুধাবন করার পথ বিভিন্ন; সে পথে রবীন্দ্রনাথকে অধ্যয়ন কর্ত্তে হবে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অসংখ্য লীলাভঙ্গাকুল ঈথর-কোমল যে ছায়াজগৎ কল্পনার সোনার কাঠিতে প্রাণ লাভ করেছে, তা' এক দিকে বাংলাদেশকে অবশ্যম্ভাবী ভূমার সংস্পর্শ দান করেছে, অন্য দিকে বিশ্বসাহিত্যের সহিত সখ্যের অধিকার দিয়ে বাংলার কালচার্ ও ভাবাবেগকে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম মর্য্যাদা দান করেছে। "গীতাঞ্জলির" পুরস্কার লাভ শুধু এ ভাব-সম্পর্কের জন্য নয়। তা' বিশ্বসাহিত্যের এই ভাবস্রোতের মাঝে তিনি আপন সাধনার নূতন কিছু দান করেছেন বলে'—যা' উরোপীয় কাব্যকেও সমৃদ্ধ করেছে। শুধু বিশ্বসাহিত্যের সহিত ব্যাপক সম্পর্ক, তাঁর কাব্যে অনেক পুরাতন ব্যাপার। কি করে' এরূপ সম্ভব হ'ল, এ প্রশ্নটিই তাঁর কাব্যের ভিতরকার একটা গভীর রহস্য। সে আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

দুনিয়ার ঝড় বাংলাদেশের রবীন্দ্রনাথে সার্থক ভারবাহী পেয়েছিল তাই বাংলাদেশের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই ওতপ্রোত বিশ্বসম্পর্ক, এই অফুরন্ত রসনির্ঝর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের কোন একটা দিক্ দিয়েই এই কাল্‌চারের পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে না, সে সাহিত্য এতই সামান্য। এ জন্যই হয়তো কবির পক্ষে উরোপের মর্য্যাদাই একমাত্র সান্ত্বনার ব্যাপার হয়ে পড়েছে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

সমসাময়িক কথা।

২

শৈশব-স্মৃতি।

[বৈশাখের "নব্যভারতের" ২০ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

বাবা যখন কোটেরহাটে মুন্সেফ ছিলেন তখন আমার বয়স পাঁচ ছয় বছর হইলেও, ষাট বৎসর পরে, আজিও কোটেরহাটের ছবিটা উজ্জ্বল হইয়া আমার চক্ষের উপরে ভাসিতেছে। কাছারী, বাজার ও আমাদের বাসা একটা খালের ধারে ছিল। আমাদের বাসার বাহির বাড়ীতে একটা পুষ্করিণী ছিল। জোয়ারের সময় প্রায়ই সে পুষ্করিণীর জল তীর ছাপাইয়া পড়িত এবং চারিদিকের পথ ঘাট ভাসাইয়া দিত। কখনও কখনও জোয়ারের জলে আমাদের উঠান পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইত এবং ছোট ছোট মাছ চারিদিকে ছুটাছুটি করিত। তখন আমার যে কি আনন্দ হইত এবং গুরুজনের নিষেধ অমান্য করিয়াও সেই জল ভাঙ্গিয়া আমি যে দৌড়াদৌড়ি করিতে চেষ্টা করিতাম, সে কথা এখনও মনে আছে। মহকুমার নিকটের খালটা যে খুব বড় ছিল, তাহা নহে। তবে বারমাসই তাহাতে জল থাকিত। আর সে জলে মাঝে মাঝে কুমীরও ভাসিয়া উঠিত। এজন্য নদীতে নামিয়া স্নান করা নিরাপদ ছিল না। কোটেরহাটের চারিদিকে বোধ হয় অনেক জঙ্গল ছিল, কেন না সে অঞ্চলে জলে যেমন কুমীরের ভয় ছিল, ডাঙ্গায়ও তেমনি বাঘের ভয় খুবই ছিল। আমাদের এপারে বাঘ আসিত কি না মনে নাই, কিন্তু খালের ওপারে যে তাহাদের গতিবিধি ছিল, রাত্রিকালে আমরা অনেক সময় বিছানায় শুইয়া তাহার প্রমাণ পাইতাম। প্রায়ই রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া বাঘের ডাক আমাদের কাণে পৌঁছিত। আর চারিদিকের লোকেরাও প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দুএকটা বাঘ মারিয়া পুরস্কারের লোভে কাছারির ময়দানে আনিয়া হাজির করিত। কিন্তু বাঘ ও কুমীরের ভয় সত্ত্বেও কোটেরহাট আমার ভালই লাগিয়াছিল। বয়স বাড়িলে দেশে বিদেশে নানা স্থানে বেড়াইয়াছি, কিন্তু সেই শৈশবে কোটেরহাটে প্রকৃতির সঙ্গে যে একটা খেলাখেলি ও আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল, তেমনটি জীবনে আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া মনে নাই।

কিছুদিন পরে কোটেরহাটের কাছারী উঠিয়া যায়। বোধ হয় আমার বয়স তখন সাত বৎসর হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাবারও কার্য্য যায়। আমরা চলিয়া আসি। কিন্তু বাবাকে বেশি দিন বেকার থাকিতে হয় নাই। মাসখানেক যাইতে না যাইতেই নিজের জেলাতেই ফেঁচুগঞ্জ মহকুমায় তিনি মুন্সেফ নিযুক্ত হন। আমাকে লইয়া বাবা ফেঁচুগঞ্জে যান। মা বাড়ীতেই রহিলেন।

ফেঁচুগঞ্জের কথাও বেশ মনে আছে। ফেঁচুগঞ্জ এখন আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ের একটা ষ্টেশন হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ফেঁচুগঞ্জ কলিকাতা-কাছাড়-জাহাজ-লাইনের একটা

ষ্টেশন ছিল। জাহাজের ষ্টেশন এখনও আছে। বাবা যখন ফেঁচুগঞ্জে মুন্সেফ হইয়া যান তখন এদেশে জাহাজ চলিতে আরম্ভ করে নাই, রেল ত সেদিন মাত্র হইয়াছে। নৌকা ও পদব্রজেই লোকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিত। হেমন্তকালে হাঁটিয়া যাওয়াই প্রশস্ত ছিল। বর্ষাকালে পথ ঘাট জলে ডুবিয়া গেলে নৌকা চলাচলের সুবিধা হইত; তখন লোকে নৌকাতেই যাওয়া আসা করিত। আমার মনে পড়ে বাড়ী হইতে বাবার সঙ্গে নৌকাতেই ফেঁচুগঞ্জে যাই।

বরিশালের কোটেরহাটে প্রকৃতির এক রূপ দেখিয়াছিলাম, ফেঁচুগঞ্জে তাঁহার আর এক রূপ দেখিলাম। বরিশালে পাহাড় ছিল না, ফেঁচুগঞ্জ লাউড়ের পাহাড়ের নীচে বলিয়া অনেকটা পাহাড়ে জায়গা। ছোট ছোট টিলা নদীর তীরে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বর্ষার সময় নদীর জল যখন কানাচে কানাচে ভরিয়া ওঠে এবং মাঠের জলে ও নদীর জলে মেলামেলি হইয়া যখন চারিদিক জলাকীর্ণ করিয়া তোলে তখন এই পাহাড়-গুলির দৃশ্য বড় সুন্দর হয়।

আমাদের বাসা নদীর ধারে একটা পাহাড়ের উপরে ছিল; একেবারে নদীর গর্ভ হইতেই সে পাহাড়টি যেন স্নান করিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর একটা পাহাড়ে মুন্সেফের কাছারী ছিল। এ সকল চিত্র আজিও চক্ষের উপরে ভাসিতেছে। আর মনে পড়ে এই নদীতে পিতাপুত্র মিলিয়া ছিপ দিয়া মাছ ধরার কথা। আমি তখনও কেবল বাড়ীতেই যা কিছু পড়াশুনা করি। ফেঁচুগঞ্জে কোনও ইস্কুল ছিল কি না মনে নাই। থাকিলেও নিম্নশ্রেণীর বাংলা পাঠশালা থাকাই সম্ভব, ইংরাজী ইস্কুল যে ছিল না ইহা ঠিক। আর আমি কোনও বাংলা পাঠশালায় কখনও পড়িতে যাই নাই, ইহাও ঠিক। ফেঁচুগঞ্জে যা কিছু পড়াশুনা করিতাম, বাবাই তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। পড়া অপেক্ষা লেখার দিকেই তাঁহার দৃষ্টি বেশি ছিল। প্রতিদিন আমাকে অনেকগুলি কাগজ মক্স করিয়া সন্ধ্যার পরে তাঁহাকে দেখাইতে হইত। ছুটির দিনে কিন্তু বিকাল বেলা আমিও ছুটি পাইতাম। পাইতাম বলি এই জন্য যে বাবার জ্ঞাতসারে ও অনুমতিক্রমেই আমি তখন ছিপ লইয়া নদীতে মাছ ধরিতে যাইতাম। অন্য দিনে তাঁহার অজ্ঞাতসারে নিজেই ছুটি লইয়া এ কাজ করিতাম। মাছ ধরার সখটা তখন বাতিকের মত হইয়াছিল। প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত এ বাতিক ছিল। কলিকাতায় আসিয়া অনভ্যাস বশতঃ এ সখ সারিয়া যায়। বাবারও এ সখ ছিল। ফেঁচুগঞ্জে প্রতি রবিবারে ও অন্যান্য কাছারীর ছুটির দিনে বাপ বেটায় মিলিয়া বাসার পিছনে নদীর ঘাটে বসিয়া মাছ ধরিতাম।

বাবা বেশী দিন ফেঁচুগঞ্জে রহিলেন না। আমার বয়স বাড়িতেছে, ইংরাজী ইস্কুলে দিতে হইবে, এইজন্য অল্পদিনের মধ্যেই বাবা ফেঁচুগঞ্জের মুন্সেফীতে ইস্তাফা দিয়া শ্রীহট্টে আসিয়া ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন। যতদূর মনে পড়ে আমার বয়স তখন নয় বৎসর। ১৮৬৬ ইংরাজীতে—কোন মাসে মনে নাই—বাবা শ্রীহট্টে জজের আদালতে উকীল হইয়া বসিলেন।

৩

বাড়ার কথা ও ঘরের কথা

শৈশবাবধিই আমার বাড়ীর ও গ্রামের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় নাই। বাবা কর্ম্ম উপলক্ষ্যে বিদেশেই থাকিতেন। মাও তাঁর সঙ্গেই প্রায় থাকিতেন। কেবল পূজার সময় বৎসরে একবার করিয়া আমরা বাড়ী আসিতাম, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং গ্রাম্য জীবনের কোনও বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার অবসর ঘটে নাই। আমরা যদিও বিদেশেই থাকিতাম, পইলের বাড়ীতে সে জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের কোনও ব্যাঘাত ঘটিত না। আমরা না থাকিলেও বাঙ্গালী গৃহস্থের বার মাসের তের পার্ব্বণ যথারীতিই অনুষ্ঠিত হইত। বাড়ীর ভার যাহার উপর ছিল—তাহাকে কি বলিয়া ডাকিব ভাবিয়া পাই না। সে আমার সোদর ছিল না। তার সঙ্গে কোনও রক্তের সম্পর্ক ছিল না। সে জ্ঞাতিও ছিল না, কুটুম্বও ছিল না, অথচ সে আমার সোদরের চাইতে কমও ছিল বলিয়া মনে হয় না, জ্ঞাতি কুটুম্ব ত দূরের কথা। সে আমার পিতৃপরিবারের দাসীপুত্র মাত্র ছিল। আমি তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতাম। বাবাকে সে ঠাকুরমামা বলিয়া ডাকিত। আর তাহার উপরেও কেবল পইলের ভদ্রাসন রক্ষণাবেক্ষণের ভার নহে, কিন্তু বাবার বিষয়-আশয় তত্ত্বাবধানেরও ভার ছিল। এ সম্বন্ধ দাসপ্রভুর সম্বন্ধ নয়। মথুরার কোনও পদ সত্য ভাবে এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে না। এ সম্বন্ধ ছিল ঐশ্বর্য্যের নহে, মাধুর্য্যের, মথুরার নহে, বৃন্দাবনের। সে কথা আজ বলিই বা কাহাকে, বুঝিবেই বা কে?

সে কালে আমাদের দেশে এক প্রকারের দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল। সম্পন্ন ভদ্রলোকেরা দাস দাসী কিনিয়া নিজেদের পরিবারভুক্ত করিয়া লইতেন। ইংরাজের দণ্ডবিধি এই মানুষ কেনা বেচার প্রথাটা উঠাইয়া দিয়াছে, ভালই করিয়াছে। কিন্তু এই ক্রীতদাস-দাসীদিগের সন্তান সন্ততিগণের সঙ্গে অনেক সময় তাহাদের প্রভুপরিবারের যে একটা মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিত এবং এই সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ভদ্র ও ইতরের মধ্যে অন্যান্য সমাজে যে ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায় সে ব্যবধানটা যে স্বল্প বিস্তর নষ্ট হইয়া যাইত, ইহাও ভুলিতে পারি না। সংসার হইতে প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ একেবারে উঠিতে অনেক দিন লাগিবে। এক শ্রেণীর লোকে অন্য শ্রেণীর লোকের সংসারের নিত্যকার্য্যগুলি সর্ব্বদাই করিয়া দিবে, কিন্তু প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধটা এখন যেমন কেবল মাস-মাহিনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত এ কালে আমাদের সমাজে সেরূপ ছিল না। ভদ্রলোকেরা মাসহারা দিয়া প্রায়ই চাকর চাকরাণী রাখিতেন না। চাকর চাকরাণীরাও আজ এখানে কাল ওখানে এই ভাবে স্রোতের সেওলার মতন ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইত না; প্রভুদিগের পরিবারভুক্ত হইয়া চিরদিন থাকিত। আর প্রভুরাও ইহাদিগকে এবং ইহাদের সন্তান সন্ততিকে পর্য্যন্ত নিজের পরিজন ভাবিয়া স্নেহের সঙ্গে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ইহাই আমাদের প্রাচীন তথাকথিত দাসত্ব প্রথার ফল ছিল।

আমাদের অঞ্চলে প্রাচীন ক্রীতদাসদাসীর সন্তান সন্ততিকে নফর কহে। প্রায় গ্রামেই কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি প্রাচীন ভদ্রপরিবারের সংশ্লিষ্ট দু পাঁচ ঘর নফর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

তবে এখন আর তাহাদিগের সঙ্গে নফরের মত ব্যবহার করা চলে না। গত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইহাদেরও একটা নূতন মর্য্যাদাবোধ জন্মিয়াছে। পুরুষানুক্রমে সমাজের শিষ্ট দিগের সংশ্রবে থাকাতে এই শ্রেণীর লোকের আচার আচরণ সর্ব্বদাই ভদ্রতা ও শিষ্টাচারসম্মত হয়, এবং ইহাদের বুদ্ধিও প্রায়ই ভদ্রলোকদিগের সমান হইয়া থাকে। কথাবার্ত্তায় ইহাদিগকে ইতর বলিয়া মনে করা যায় না। ইংরাজের সরকারে যখন পেয়াদার প্রয়োজন হইল, তখন ইহারাই প্রথম সে কাজে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। আজিকালি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, প্রভৃতি সমাজের লোকেরাও ডাকের পিয়ন, আদালতের পেয়াদা এবং পুলিসের কনেষ্টবল পর্য্যন্ত হইয়া থাকেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এ সকল কর্ম্মকে নীচ ভাবিয়া ভদ্রলোকেরা তাহা গ্রহণ করিতেন না। তখন এই নফরেরাই এ সকল কাজে যাইয়া ভর্ত্তি হয়। এই ভাবে তাহাদের সাংসারিক অবস্থাও ক্রমে বদলাইয়া যায়। এই কারণে সেকালের নফর শ্রেণী একালে একেবারেই লোপ পাইয়াছে।

এই নফরেরা আবার দুই শ্রেণীর ছিলেন। কেহ কেহ নিজেদের মুনিব পরিবারভুক্ত ছিলেন; আর অধিকাংশই মুনিবের জমিতে বাস করিতেন; খাজনা দিতেন বলিয়া মনে হয় না, খাজনার পরিবর্ত্তে মুনিব বাড়ীর ক্রিয়া কর্ম্মে কাজ করিয়া দিতেন।

প্রাচীন ভাষা ব্যবহার করিতে হইলে দাদা আমাদের পরিবারের নফর ছিলেন, ইহাই কহিতে হয়। তাঁর পিতামাতা বোধ হয় আমার পিতামহের সময় হইতেই আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁর পিতাকে আমি দেখি নাই, কিন্তু তাঁর মাকে দেখিয়াছি। আমার সাত আট বৎসর বয়সের সময় তিনি দেহত্যাগ করেন। আমি তাঁহাকে পিসী বলিয়া ডাকিতাম। কলিকাতা অঞ্চলে যেরূপ পিসিমা মাসীমা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ হয় আমাদের অঞ্চলে অন্ততঃ সেকালে তাহা চলতি ছিল না। এখনও বৃদ্ধেরা 'পিসীমা' শুনিলে উপহাস করেন, কহেন পিসী আবার মা হয় কিরূপে? আমার নিজের পিতৃস্বসাদের যেমন কেবল পিসী বলিয়াই ডাকিতাম, ইঁহাকেও সেইরূপ কেবল পিসী বলিয়াই সম্বোধন করিতাম। দাদা তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলেন। ইনি যে আমার ভাই নহেন, শৈশবে আমার এ জ্ঞান একেবারেই হয় নাই। ক্রমে যখন তাহা বুঝিলাম, তখনও কিন্তু ইঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মর্য্যাদা দিতে বিন্দু মাত্রও কুণ্ঠিত হই নাই। আর আমি বেয়াদবী করিলেও বাবা তাহা মার্জ্জনা করিতেন না। মনে পড়ে, একদিন দাদা আমাকে শাসন করিতে যাইয়া কাণ মলিয়া দিয়াছিলেন। আমি তখন রাগিয়া তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলাম। বাবা একথা শুনিয়া আমাকে এমন মার দেন যে জীবনে আমি কখনও আর এরূপ অপরাধ করিতে সাহস পাই নাই।

বাবার প্রজারা "দাগু দাদাকে" যতটা ভয় ও খাতির করিত, বাবাকেও ততটা করিত কি না সন্দেহ। একবার বড় হইয়া আমি বান্নার জমীদারীর ভিতর দিয়া পইলের বাড়ী হইতে শ্রীহট্টে যাইতেছিলাম। তখন আমি কলেজে পড়ি। মা বাবা বাড়ী আছেন শুনিয়া গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী যাই। কিন্তু আমার বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা শ্রীহট্টে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি তখন নৌকা করিয়া শ্রীহট্ট যাত্রা করি। দাদা আমার সঙ্গে চলেন। একজন হিন্দু ভৃত্য

ও দুইজন মুসলমান পাইকও সঙ্গে চলে। তখন বর্ষা নামে নাই। জলভরা মাঠের উপর দিয়া নৌকার সোজা পথ পড়ে নাই। খালে খালে নৌকা চালাইতে হয়। আমাদের অঞ্চলটা বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায়। গ্রামগুলি, এমন কি গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীগুলি পর্য্যন্ত জলবেষ্টিত হইয়া দ্বীপের মতন হয়। আবার কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসেই এই জল শুকাইয়া যায়। কেবল খাল, নালা, বড় বড় বিল ও গভীর ডোবাতেই জল আটকাইয়া থাকে। বর্ষাকালে গোয়ালারা এবং গৃহস্থেরাও নিজেদের গোধন নিজেদের বাড়ীতেই বাঁধিয়া রাখেন ও বাঁধা ঘাস খাইতে দেন। হেমন্তকালে এ সকল গোধনকে খোলা মাঠে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গোয়ালারা এই সময়ে আপনার গরু বাছুর লইয়া নদী বা খালের ধারে বিস্তৃত ময়দানে গিয়া 'বাথান' বাঁধিয়া রহে। এখানেই তাহারা ক্ষীর, সর, দই, ঘোল, মাখন প্রস্তুত করে, এবং এই 'বাথান' হইতেই চারিদিকের গ্রামে যাইয়া এ সকল বিক্রী করে। আমাদের পথে বাবার জমীদারীতে এরূপ একটা খুব বড় বাথান পড়ে। খালে তখন জল কম। তীরের লোকে ও নৌকার লোকে পরস্পরকে দেখিতে পায় না। এই বাথানের কাছে নৌকা বাঁধিয়া দাদা এক জন পাইককে আমার জন্য কিছু সর ও ক্ষীর আনিতে পাঠাইলেন। অবশ্য জমীদার-পুত্রের ভেট, ইহাতে দামের কথা উঠিলই না। বাথানের গয়লা পাইককে দখল দিল না, সে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিয়া কহিল "কিছু পাওয়া গেল না, বিনা পয়সায় গয়লা দিতে চায় না"। তখন দাদা নৌকা হইতে তীরে উঠিয়া জমীদারী রেওয়াজে গয়লাকে গলা শাসাইয়া ডাকিলেন। অমনি গয়লা আসিয়া উপস্থিত। দাদা কহিলেন "কিছু ক্ষীর ও সর চাইয়া পাঠাইলাম, দিলে না যে! বিনা পয়সায় নাকি দিবে না"? গয়লা কহিল, "তুমি যে পাঠাইয়াছ, ইহা জানিব কেমন করিয়া? তোমার লোক যাইয়া কহিল, কে বিপিন বাবু যাইতেছেন, তাঁর জন্য ক্ষীর ও সর চাই"। দাদা তখন আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, এবং গয়লাও প্রচুর ক্ষীর সর আনিয়া হাজির করিল। তবে সেগুলি আমার জন্য না দাদার জন্য আজি পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারি নাই।

মোট কথা এই, বাবা নামে মাত্র জমীদার ছিলেন, দাদাই জমীদারের প্রতাপ রাখিয়াছিলেন এবং অনেক সময় নিম্ন শ্রেণীর প্রজাদিগের নিকটে জমীদারের প্রাপ্য সম্মানও আদায় করিতেন। আমার সোদর কেউ ছিল না। আমি দাদাকে সোদর বলিয়াই ভাবিতাম। দাদাও আমাকে কনিষ্ঠ ভাইয়ের মত স্নেহ মমতা করিতেন। আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে বাবা আমাকে ত্যাজ্য পুত্র করিয়া তাড়াইয়া দেন। এইরূপে বাড়ীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়া গেলেও দাদার স্নেহ-মমতা এক তিলও কমে নাই। আমার ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া দাদা একবার কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন। গ্রামে সহযাত্রীদের সঙ্গে তাঁরা কালীঘাটে বাসা করিয়া ছিলেন। বাবা তখন আমার চিঠিপত্র গ্রহণ দূরে থাক, কাহাকেও তাঁহার সমক্ষে আমার নাম লইতে দিতেন না। সুতরাং আমি কলিকাতায় আছি, বাড়ীর লোকে লোকমুখে এই মাত্র শুনিয়াছিলেন, আমার ঠিকানা কেহ জানিতেন না। দাদা এ যাত্রা কলিকাতায় আসিয়া সাতদিন ছিলেন। তার পর গয়া যান। সেখান হইতে আর দেশে ফেরেন নাই, বিসূচিকা রোগে গয়াধামেতেই দেহত্যাগ করেন। গয়া হইতে ফিরিবার সময় আমার ভগিনী আমার ঠিকানা

খোঁজ করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর মুখে শুনিয়াছি যে দাদা কলিকাতায় যে সাত আট দিন ছিলেন, তার সমস্ত সময়টা এই সহরের পথে পথে আমার অন্বেষণ করিয়াছিলেন। এই স্নেহের কথা স্মরণ করিলে এ ব্যক্তিকে নফর জ্ঞান করা মহাপাপ বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ আমার বাবাও দাদাকে কোনও দিন দাসীপুত্র বলিয়া অবজ্ঞা করেন নাই; কিন্তু নিজের সন্তান সন্ততির প্রতি লোকে যেরূপ ব্যবহার করে, দাদা এবং তাঁহার মেয়েদের প্রতি বাবা সেই রূপই ব্যবহার করিতেন। তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে আমায় কহিয়াছিলেন যে তাঁর জীবনের একটা কর্ত্তব্য বাকী ছিল—'সেটা "দাগার" কন্যাটিকে পাত্রস্থ করা'। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর জীবনের সকল কর্ত্তব্যও শেষ হইয়াছিল।

অনেক সময় ক্রীতদাস বলিলেই আমেরিকার কাফ্রী দাসদিগের কথা আমাদের মনে পড়ে। সেখানেও কোনও কোনও স্থলে এই কাফ্রী দাসদাসীরা নিজেদের প্রভুর পরিবার ভুক্ত হইয়া থাকিত, এবং এ সকল ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে যে প্রভু ও দাসের মধ্যে একটা সত্য স্নেহের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিত না এমন নহে। কিন্তু কাফ্রী দাস দাসীরা প্রভুদের অর্থোপার্জ্জনেরই সহায়তা করিত, তাহাদের কৃষিক্ষেত্রে জন খাটিত। সেটার ভিতর দিয়া প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবার বড় একটা সুযোগ মিলিত না। এই জন্যই পশ্চিমের দাসত্বপ্রথা এতটা পরিমাণে অমানুষিক হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দেশে দাসেরা প্রভুদের পরিচর্য্যাতেই নিযুক্ত হইত। এই জন্য আমি যে প্রথা কিছু কিছু দেখিয়াছি তাহাতে অন্তরের কোনও প্রবল ক্রোধের সঞ্চার হয় নাই। তবে এই প্রথাটিও যে ভাল ছিল এমন বলি না। ইহাতে মানুষকে পশু করিয়া তুলিত না বটে, কিন্তু খাটো করিয়া যে রাখিত সে বিষয় সন্দেহ নাই।

সেকালের প্রথা অনুসারে বালিকা বয়সেই আমার মা স্বামীর ঘর করিতে আসেন। তখন মাতুল পরিবারের একজন দাসী মা'র সঙ্গে আমাদের বাড়ী আসিয়া একরূপ আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়া যান। আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তিনি মা'র সঙ্গে ছিলেন। আমার তের চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। তার পরে আমার বড় মামা বিবাহ করিয়া নূতন বধূ ঘরে আনিলে ইনি আমাদের বাড়ী হইতে আমার মামার বাড়ী চলিয়া যান। ইনিও আমার মাতুল পরিবারভুক্ত ক্রীতদাসী ছিলেন। ইঁহার মা'র কথা কখনও শুনি নাই। কিন্তু ইঁহার এক কন্যা ছিল। আমার জন্মের পূর্ব্বেই সে মারা যায়। কিন্তু তাহার নামেই আমাদের বাড়ীতে এবং আমাদের আত্মীয় স্বজনদিগের মধ্যে ইনি পরিচিত ছিলেন। সকলে ইঁহাকে 'কাঞ্চনীর মা' বলিয়া ডাকিতেন। আমার মা ইঁহাকে দিদি বলিয়া ডাকিতেন এবং সর্ব্বদাই বড় ভগিনীর প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভক্তি দিতেন। আমি ইঁহাকে মাসী বলিয়া ডাকিতাম। শুনিয়াছি যখন আপোগণ্ড শিশু ছিলাম, বিশেষতঃ আমার বিমাতা ঠাকুরাণীর পরলোক গমনের পরে, ইনিই আমাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। মাকে সে দায় পোহাইতে হয় নাই, রাত্রিকালে কতকটা বড় হইয়াও আমি ইঁহারই কাছে শুইতাম এবং অনেক সময় ইঁহার সঙ্গে ইঁহার কাছে বসিয়া খাইতাম, সে যে কি স্নেহ ও অনুরাগ তাহার কথা মনে করিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাই। পরের সন্তানকে এমন করিয়া ভালবাসার এ সকল দৃষ্টান্ত ক্রমে সমাজে বিরল হইয়া যাইতেছে। মা'র মুখে শুনিয়াছি

যে অপোগণ্ড শৈশবে মাসী আমাকে কোলে লইয়া দিনান্তে খাইতে বসিয়াছেন, আর আমি সে সময় কেবল তাঁহার কোল নহে, কিন্তু ভোজনপাত্রের আশে পাশে পর্য্যন্ত ময়লা করিয়া দিয়াছি, কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই অবস্থাতেই আহার শেষ করিতেন। এই কথার উল্লেখ করিয়া কতবার মা কহিয়াছেন :—"দিদি তোমার জন্য যা করেছে আমি কোনও দিনই তা করিতে পারিতাম না।"

আমিও শৈশবে ইঁহার অত্যন্ত ন্যাওটা ছিলাম। মাঝে মাঝে মাকে ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতাম, কিন্তু এই মাসীকে ছাড়িয়া যাইতে হইলে কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইতাম। আমরা পূজার সময় যখন গ্রামের বাড়ীতে যাইতাম, মাসী তখন দু'চার দিনের জন্য আমার মামার বাড়ী যাইতেন। আর সে সময় কিছুতেই আমি তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হইতে চাহিতাম না। জোর করিয়া ছাড়াইতে গেলে মহা অনর্থ ঘটাইতাম। আমার চার পাঁচ বছর যখন বয়স তখনকার কথা এখনও মনে আছে ; সে সময়ে আত্মীয় স্বজনেরা "কাঞ্চণীর মা" মরিয়া গিয়াছে বলিয়া আমায় ক্ষেপাইতেন। প্রায় ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিন্দু-বিধবা-বিবাহ-আইন পাশ হয়। আমার পিতৃব্যেরা "কাঞ্চণীর মা'র" আবার বিবাহ দিবেন বলিয়াও অনেক সময় আমাকে ক্ষেপাইতেন। এসকল কথা শুনিয়া গুরুজনের প্রাপ্য সম্মান ভুলিয়া গিয়া আমি ইঁহাদিগকে যথেচ্ছা গালি গালাজ করিতাম। বড় হইয়া অবশ্য এ সকল তামাসাতে আর ক্ষেপিতাম না কিন্তু মা'র কাছ ছাড়া হইতে আমার যতটা ক্লেশ হইত এই মাসীর কাছ ছাড়া হইতে তার চাইতে কম ক্লেশ হইত না। আমার বাল্যকালে আমাদের অঞ্চলের হিন্দু ভদ্রসমাজে প্রভু ভৃত্যের মধ্যে এমন একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল যাহার স্মৃতির ছায়া পর্য্যন্ত এখন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অনেক সময় ভৃত্যেরা বেতনভুক্ ছিলেন না। যাঁহারা বেতনভুক্ ছিলেন তাঁহারাও নিজের গ্রামবাসী এবং প্রতিবেশী ছিলেন, নিতান্ত পরদেশী ছিলেন না। পুরুষানুক্রমে এই রূপে প্রভু-শ্রেণী এবং ভৃত্য-শ্রেণীর মধ্যে একটা ঘনিষ্ট আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিত। এখনকার শিক্ষিত সমাজের লোকে অনেকে হয়ত শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন যে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী ভদ্রলোক ভৃত্যের বিসূচিকা বা বসন্ত প্রভৃতি অতিশয় সংক্রামক রোগ হইলেও তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতেন না, কিন্তু বাড়ীতে রাখিয়াই নিজেদের আত্মীয় স্বজনদিগের মতন ইহাদের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেন।

একটা দৃশ্য এখনও আমার চোখের উপর ভাসিতেছে। আমার বয়স তখন বোধ হয় সাত বৎসর হইবে। বাবা তখন কোটেরহাটে। "দাদা" সে সময় কোটরহাটে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁর কলেরা হয়। ক্রমে অবস্থা খারাপ হইতে আরম্ভ করে। জীবনের আশা প্রায় নিভিয়া যাইতে লাগিল। তখন আমাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য তাঁর ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। আমি গিয়া দেখিলাম বাবা এবং আমার দুইজন জেঠ্‌তাত ভাই এবং একজন কাকা—ইঁহারা রোগীর শয্যাতে বসিয়া নিজের হাতে তাহার হিমাঙ্গে আবীর ঘসিতেছেন, আর মা এক কোণে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। পিতামাতার এক মাত্র পুত্র, বংশের একমাত্র প্রদীপ তখন আমি, অথচ আমাকে পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে আমার মা ও বাবা এই মুমূর্ষপ্রায় সংক্রামক রোগীর কাছে যাইতে দিলেন।

আমাদের বাড়ীতে চাকর চাকরাণীদিগের কোন অসুখ করিলে বাবা নিজে তাহাদের শুশ্রূষা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ গোঁড়া হিন্দু হইয়াও রোগীর সেবার সম্বন্ধে বাবা জাতিবর্ণের বিচার পর্য্যন্ত করিতে চাহিতেন না। শুনিয়াছি বাবা যখন ঢাকায় পেষকারী কি ওকালতী করিতেন তখন একদিন পথিপার্শ্বে একজন অজ্ঞাতকুলশীল অসহায় বসন্ত রোগীকে দেখিয়া তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে আনাইয়া সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যখনই কথাটা মনে পড়ে তখনই ভাবি, আমি পারি কি?

সেকালে ভদ্রলোক ও ইতর শ্রেণীর মধ্যে খুব যে একটা বড় ব্যবধান ছিল তাহা নহে। বাবা যখন পূজার সময় বাড়ী যাইতেন তখন গ্রামের সকল শ্রেণীর ও সকল জাতির লোক আসিয়া আমাদের নাটমন্দিরে দুবেলা ভিড় করিয়া বসিতেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা বাবার এক সঙ্গে একটা বড় ফরাস বিছানায় বসিতেন, ভৃত্য শ্রেণীর লোকেরা এবং নব শাখেরা স্বতন্ত্র পাটীর উপরে বসিতেন, আর যাঁদের 'জল চল' নাই অর্থাৎ যাঁহাদিগকে আধুনিকেরা অস্পৃশ্য জাতি বলেন তাঁহারা ও সেই নাটমন্দিরেই স্বতন্ত্র শরের দরমায় (আমাদের অঞ্চলে ইহাকে চাটাই বলে) বসিতেন। যাঁহারা বাবার সমবয়স্ক তাঁহারা ঐখানে বসিয়াই তামাকু পান করিতেন। যাঁহারা কনিষ্ঠ তাঁহারা, ব্রাহ্মণই হউন আর চণ্ডালই হউন, বাবার সমক্ষে ধূম পান করিতেন না, হুকা হাতে করিয়া আড়ালে যাইতেন। আর এই ভাবে সমাজের উচ্চতম হইতে নিম্নতম শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত একত্র বসিয়া নানা প্রকারের সদালাপ করিতেন। ইহার ফলে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা ও সদাচার অলক্ষিতে সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত যাইয়া ছড়াইয়া পড়িত।

আমাদের গ্রামে একটা টোল ছিল ইহাকে আমরা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের টোল বলিয়া জানিতাম। এই টোলে কেবল আমাদের গ্রামেরই নহে, কিন্তু ভিন্ন গ্রামের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যখন শিষ্যদিগকে পড়াইতেন অথবা অপরাহ্ণে তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেন তখন গ্রামের নিম্নশ্রেণীর প্রতিবেশীরা আসিয়া সেখানে অনেক সময় একত্রিত হইতেন এবং নিবিষ্টচিত্তে সে সকল শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিতেন। তাঁহারা যে সকল কথা বুঝিতেন এমন কল্পনা করা যায় না, কিন্তু টোলের হাওয়াতে এইরূপ ঘন ঘন আসিয়া বসিবার ফলেই অপরোক্ষ ভাবে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত ও আচার আচরণ ভদ্রসমাজোচিত হইয়া উঠিত। পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও নির্ধন, ভদ্র ও ইতর এ সকলের মধ্যে আধুনিক সভ্য সমাজে যে একটা বিশাল ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়, আমার শৈশবে আমাদের সমাজে কোনও দিন সে ব্যবধান দেখি নাই।

সে কালের লোকে জাতিভেদ মানিতেন বটে, সকলে সকলের জলগ্রহণ করিতেন না, পানাহার সম্বন্ধে আজি কালিকার মতন অবাধ মেশামেশি ছিল না। কিন্তু কেবল এই পানাহার ব্যাপার ব্যতীত আর প্রায় সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকেরা যথাযোগ্য ভাবে পরস্পরের সঙ্গে খুবই মেশামেশি করিতেন। বয়ঃকনিষ্ঠেরা শ্রেষ্ঠ বর্ণের অজুহাতে নিম্নতর বর্ণের বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে কোনও দিন নাম ধরিয়া ডাকিতেন না। অনেক বিষয়ে বয়স দিয়াই লোকের সামাজিক মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হইত। সামাজিক বিষয়ের বিচারে প্রায় সকল জাতির বয়োজ্যেষ্ঠরাই

মিলিত হইতেন। ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া কোন ভেদ এখানে ছিল না। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিতেন, অপর জাতির লোকেরা সে ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন। কিন্তু সমষ্টিগত সমাজশক্তি কেবল তাঁহাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া নবশাখ পর্য্যন্ত যাঁহাদেরই 'জলচল' ছিল তাঁহাদের সকলের হাতেই এ শক্তি ন্যস্ত ছিল। সকল জাতির বয়োজ্যেষ্ঠরা মিলিয়া সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করিতেন। এ সকল ব্যাপারে কাহাকেও বাদ দিলে চলিত না। এই জন্য সেকালে ভদ্র এবং ইতর, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, ধনী এবং নির্ধনের মধ্যে একটা দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

এমন কি যাঁহাদিগকে অন্ত্যজ জাতি বলা যায়, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরা যাঁহাদের জলগ্রহণ করেন না, তাঁহাদের সঙ্গেও যে খুব একটা ব্যবধান ছিল তাহা নহে। ব্রাহ্মণ পল্লীর অতি নিকটেই এ সকল অন্ত্যজ জাতিরা বাস করিতেন। মান্দ্রাজে যেমন প্রত্যেক গ্রামে দুইটা বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, এক 'অগ্রহারম্' ও অপর 'পার্ব্বারি', বাংলা দেশে কোনও দিন সেরূপ ছিল বলিয়া জানা নাই। ব্রাহ্মণ-পল্লীকে 'অগ্রহারম্' কহে 'পারিয়া' বা চণ্ডালদিগের পল্লীকে পার্ব্বারীয় কহে। এককালে- সে নিতান্ত বহুদিনের কথা ও নয়— কোনও পারিয়াকে ব্রাহ্মণ পল্লীর পথ দিয়া যাইতে হইলে ঢাক বাজাইয়া "ওগো আমি পারিয়া, তোমাদিগের পাড়ার ভিতর দিয়া যাইতেছি" ইহা জানাইয়া পথ চলিতে হইত। এই ঢাকের বাদ্য শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা নিজেদের দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া দিতেন, কি জানি পারিয়াকে দেখিয়া 'দৃষ্টিদোষ' ঘটে। আজকাল আর সেরূপ নাই, কিন্তু এখনও শোনা যায় কোনও পারিয়া ঘটনাক্রমে অগ্রহায়ণের ভিতর যাইয়া পড়িলে পাগলা কুকুরকে যেমন মানুষ ঢিল ছুঁড়িয়া দূর করিয়া দেয় সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীগণ পর্য্যন্ত হতভাগ্য পারিয়ার প্রতি কাষ্ঠ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তবে পারিয়ারাও এখন জাগিয়া উঠিয়াছেন। এ সকল ব্যবহার নীরবে আর সহ্য করেন না। ব্রাহ্মণকে নিজের হাতের ভিতরে পাইলে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়ে'র অবস্থা ঘটাইয়া তোলে। বাংলা দেশে এরূপ কখনও ছিল না।

আমাদের ভদ্রাসন বাড়ীর বাহিরের পুষ্করিণীর পাড়েই এক ঘর মালী প্রজা ছিলেন। আমাদের দেশে ইঁহাদের জল চলিত না। মাটি কাটা, পায়খানা তৈয়ার করা, খাল নালা কাটিয়া জলপ্রণালী পরিষ্কার করা এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রাঙ্গণ ঝাঁট দেওয়া ইঁহাদের জাতিগত ব্যবসায় ছিল। ইঁহারা মান্দ্রাজে জন্মিলে পারিয়া হইতেন এবং আমাদের পল্লীতে বাস করা ত দূরের কথা প্রবেশ করিবারও অধিকার পাইতেন না। মান্দ্রাজে পারিয়ারা দেবমন্দিরের পাশ দিয়াও চলাফেরা করিতে পারেন না। মন্দির পুরোবর্ত্তী প্রকাণ্ড রাস্তায় পর্য্যন্ত চলাফেরার অধিকার তাঁহাদের নাই। কিন্তু বাংলাদেশের চণ্ডালেরা পর্য্যন্ত আমাদের মালীদেরত কথাই নাই, পূজার সময় চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে দেবীমূর্ত্তির সমক্ষে দাঁড়াইয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া থাকেন। ইঁহাদের এই বাদ্য না হইলে দেবপূজাই অঙ্গহীন হইয়া থাকে। আমাদের বাড়ীর নিকটে যে মালী পরিবার ছিলেন তাঁহারা আমাদের রন্ধনশালাতেই প্রবেশ করিতে এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের জল ছুঁইতে পারিতেন না, এ ছাড়া সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে মেশামেশি করিতেন। এই পরিবারের কর্ত্তার নাম ছিল বদন। আমি তাঁহাকে

সর্ব্বদাই বদনদাদা বলিয়া ডাকিতাম। একদিন কি কারণে তাঁহার উপর চটিয়া গিয়া 'বদনমালী' বলিয়াছিলাম। এ কথাটা বাবার কাণে উঠে। আর এই জন্য আমাকে গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল।

বদনদাদার বিবাহের কথা মনে পড়ে। আমার বয়স তখন নয় দশ বৎসর হইবে; আমরা তখন পূজার ছুটিতে বাড়ী গিয়াছি। বিবাহের দিন বাবা নিজে যাইয়া বিবাহসভার আয়োজনের এবং ভিন্ন গ্রাম হইতে যে সকল নিমন্ত্রিত আসিবেন তাঁহাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করেন। আমাদের বাড়ী হইতে সভা সাজাইবার জন্য শতরঞ্চ ও সামাদান পাঠাইয়া দেন, আমাদের পুকুর হইতে বদনদাদাকে মাছ তুলিয়া লইতে বলেন এবং আমার মনে হয় যে বিবাহসভায় বাবা নিজে যাইয়া একপার্শ্বে একখানি চৌকীতে বসিয়া শুভকার্য্য সম্পাদনের সাহায্য করিয়াছিলেন।

আমার মনে হয় যে দিন বদনদাদার বধূ ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া যান, সেই রোগীর শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেও বাবাকে দেখিয়াছি। ঔষধ দেওয়া, পথ্য দেওয়া এবং অন্তিমে সান্ত্বনা দেওয়া, এ সকল সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে সেকালে জাতিবর্ণের বিচার ছিল না। বাবা মালীকে ছুঁইতেন না বটে, প্রয়োজন হইলে ছুঁইতেন না যে তাও নয়, ছুঁইলে স্নান করিতে হইত, এসকলই সত্য, কিন্তু ইহাতে তাঁহার লোকসেবার বা মানবতার কোনও বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইত বলিয়া মনে হয় না। জাতি বর্ণ বিচার সত্ত্বেও পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা ও ঘননিবিষ্টতা ছিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

ছায়া-সত্য

ভরি দুই বেলা,
যাহারে লইয়া চলে নিরন্তর লুকোচুরী খেলা,
সংশয়ে কভু বা যাই পশ্চাতে সরিয়া,
কভু পাশরিয়া
সব দ্বন্দ্ব, সব দুঃখ সকল সংশয় ভরা দ্বিধাক্ষুব্ধ আনত প্রয়াস,
অতীতের সব সর্ব্বনাশ—
আনন্দে ছুটিয়া যাই অসঙ্কোচ সুখে
তারি অভিমুখে।
আপনারি মনের আলোতে তারে হেরি,
কভু তারে ছায়া বলি মায়ামুগ্ধ মানব মনেরি,

কখন নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহারেই সত্য বলে করি আলিঙ্গন,
তাই প্রতিক্ষণ,—
প্রত্যেক অনুরে ঘেরি অবিরাম চলিয়াছে চঞ্চলের লীলা,
বাস্তবের ছায়া তাই বাস্তবের পাশে চলে সঙ্গিনী সে চিরনৃত্যশীলা।

২

মনে পড়ে শিশুকালে বাতায়নে একেলা বসিয়া
স্তব্ধ সুপ্ত দ্বিপ্রহর অবিশ্রাম ছুটে উচ্ছ্বসিয়া,
দীপ্ত সূর্য্য তপ্ত বায়ু, নৃত্যবেগে উড়াইয়া ধূলির পতাকা,
নমাইয়া দীর্ঘতরুশাখা,
মুঠি মুঠি শুষ্কপত্র ঘূর্ণাছন্দে ছড়াইয়া দিকে দিগন্তরে,
বিজয়ী বীরের মত প্রান্তরে প্রান্তরে,
উচ্চকিত করি দিশি দিশি—
আকাশে প্রান্তরে বনে যেখানে হয়েছে মেশামিশি—
তারি টানে,
প্রমত্ত দীপ্তির পথে ছায়ার স্বপন লোক পানে।
নীলিমার মাঝে
প্রখর রবির তেজ কোমল আঁখির পরে বাজে;
তবু তারি টানে
চেয়ে চেয়ে অনিমিখ দিগন্তের পানে,
কল্পনার মায়াময় রথে
খুঁজিয়া ফিরেছি কারে অজানা নদীর পারে অন্তহীন অজানিত পথে!

৩

উপকথা স্বর্ণসূত্র ধরি অনিবার
এই যে শিশুর চলা, এই যে শিশুর অভিসার,
ব্যাকুল বেদনা ভরা আশার আবেশে মুগ্ধ মন,
ধ্যানস্তব্ধ মগ্ন অনুক্ষণ;
এ যদি অসত্য হয়—
এই আশা ভালবাসা একাগ্রতা ব্যাকুলতাময়—
দিনে দিনে পলে পলে যে তাহারে যোগাইয়া জীবনের দীপ্ত সুধারস
প্রতি রক্ত বিন্দু তার ভরিয়াছে প্রাণে আর চিত্ত তার চিরদিন করিছে সরস—
এরে যদি বলি 'মায়া' বসি যদি অর্থহীন শিশুর স্বপন,
তাহলে এ গ্রহতারা চন্দ্রমা তপন,
শ্যামলা ধরণী প্রীতি ভালবাসা মাতৃস্তন্য জীবনের যা' কিছু সঞ্চয়
সকলি অলীক মিথ্যা, স্বপ্ন মায়াময়।

আমার কল্পনা যদি অবিরাম নিরবধি আমারে যোগায় প্রাণরস,
চির-যুগযুগান্তর বরষ বরষ --
তবে সে কল্পনা-ছায়া মানবের চিত্তে চিরদিন,
সত্য হয়ে প্রাণ হয়ে নয়নের দীপ্তি হয়ে আছিল রহিবে নিত্য সুন্দর নবীন।

শ্রীজীবনময় রায়।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আমার পিতামহ ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রাতঃস্মরণীয় স্বদেশবৎসল ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মী ও অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র "হিন্দু পেট্রিয়ট" নামক ইংরাজী সংবাদপত্র প্রবর্ত্তিত করিয়া উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিলে হরিশ্চন্দ্র উহাতে তাঁহার সহকারীরূপে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং কয়েক বৎসর পরে (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে) হরিশ্চন্দ্র উক্ত পত্রখানি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্রের নামে ক্রয় করিয়া উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। অতঃপর উভয় বন্ধু তাঁহাদের প্রতিভা ও শক্তির পূর্ণ প্রয়োগে উক্ত পত্রের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠ করেন। লর্ড ড্যালহৌসীর পররাজ্যগ্রাসিনী নীতির, সিপাহী বিপ্লবে বিকৃতমস্তিষ্ক ইংরাজ সাধারণের বৈরনির্য্যাতননীতির এবং দুর্বৃত্ত নীলকরগণের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া অক্লান্তভাবে মসীযুদ্ধ চালনা করিয়া সকলকে কিরূপ চমৎকৃত করিয়াছিলেন তাহা সংবাদপত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র অকস্মাৎ অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে গিরিশচন্দ্রই তাঁহার শোকাকুলা জননী ও অসহায়া সহধর্ম্মিণীর সাহায্যার্থে পুনরায় উক্ত পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। পরে "হিন্দু পেট্রিয়ট" ৺কৃষ্ণদাস পালের হস্তে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জমীদারগণের মুখপত্রে পরিণত হইলে গিরিশচন্দ্র প্রজাপক্ষ অবলম্বন করিয়া "বেঙ্গলী" পত্র প্রবর্ত্তিত করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহা অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদিত করেন। নীলকরগণের বিরুদ্ধে লিখিত কোনও নির্ভীক তেজোগর্ভ প্রবন্ধের জন্য জনৈক নীলকর হরিশ্চন্দ্রের নামে মানহানির মোকদ্দমা করেন। উক্ত মোকদ্দমার ব্যয়ের জন্য যখন সম্প্রতি-পরলোকগত হরিশ্চন্দ্রের বাসগৃহ বিক্রয় হইবার উপক্রম হয় তখন গিরিশচন্দ্রই কতিপয় মহানুভব বন্ধুর সাহায্যে গৃহখানি ক্রয় করেন। হরিশ্চন্দ্রের কীর্ত্তি ও স্মৃতি জীবিত রাখিবার জন্য গিরিশচন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র উভয়ের পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। গিরিশচন্দ্র যেমন হরিশ্চন্দ্রের অসাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান এবং অকাট্যযুক্তিসমন্বিত দার্শনিকোচিত রচনার জন্য তাঁহার অনুরাগী হইয়াছিলেন, হরিশ্চন্দ্রও তেমনই গিরিশচন্দ্রের ওজস্বিনী ভাষা এবং সাহিত্য-প্রতিভা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার একান্ত গুণপক্ষপাতী হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরে আহুত সাধারণ স্মৃতিসভায় গিরিশচন্দ্র স্বর্গগত বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া যে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাজা রামমোহন রায়ের পর এরূপ মহাপ্রাণ হিন্দু আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। হরিশ্চন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র উভয়ে সৈন্য-সংক্রান্ত হিসাব-বিভাগে একই অফিসে দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষকাল একত্রে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং উভয়েই অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী ও অকপট স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবনচরিত একমাত্র গিরিশচন্দ্রই লিখিতে পারিতেন। বন্ধুগণের অনুরোধে তিনি হরিশ্চন্দ্রের একটি বিস্তৃত জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু উহার পাণ্ডুলিপি তাঁহার কোনও আত্মীয় পড়িতে লইয়া গিয়া হারাইয়া ফেলেন, সেজন্য জীবনচরিতটী প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্যতম বন্ধু (পরে

"রেইস এণ্ড রায়ত" সম্পাদক) ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "মুখার্জীস ম্যাগাজিনে" গিরিশচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত পত্রিকা বিলুপ্ত হওয়ায় প্রবন্ধটি শেষ হয় নাই। আমরা উক্ত অসম্পূর্ণ প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত করিলাম। হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জীবনচরিত এখনও রচিত হয় নাই এবং প্রবন্ধটিতে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, সেইজন্য আশা করি উহা বাঙ্গালী পাঠকগণের অপ্রীতিকর হইবে না। এস্থলে বলা বাহুল্য যে মূল প্রবন্ধের লিপিচাতুর্য্য অক্ষম অনুবাদে প্রতিফলিত করা অসম্ভব। যাঁহারা মূল প্রবন্ধটি পাঠ করিতে চাহেন তাঁহারা মৎসম্পাদিত "Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, the founder and first Editor of the *Hindoo Patriot* and the *Bengalee*" নামক গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠা হইতে ১০৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখিবেন।]

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

বঙ্গসমাজের উপর সহসা বজ্রপাত হইয়াছে! সকলেরই কণ্ঠ রুদ্ধ, সকলেরই চক্ষুঃ স্থির। দরিদ্রের সহায়, ধনীর উপদেষ্টা, সমাজের মুখপাত্র, দেশের হিতৈষী, নির্ভীকহৃদয় বীর, যিনি সকল বিপদ অবহেলা করিয়া রাজনীতিক সংগ্রামে সকলের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন—অদ্য আমাদের বাষ্পাকুল নয়নের অন্তরালে স্বপ্নের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যৌবনের মধ্যাহ্নে, প্রতিভার পূর্ণবিকাশাবস্থায়,—যখন নীলকরপীড়িত কৃষকগণ সূর্য্যদেবসমক্ষে নমিতমস্তকে তাহাদের পরিত্রাণকারীর কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছে, এবং দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আনন্দ কোলাহলে মুখরিত—তখনই কৃতান্তের করালদণ্ড প্রচণ্ড বেগে নিপতিত হইল, এবং দেশের গৌরব ও অলঙ্কার সহসা জ্যোতির্ম্ময় মেঘরথে আরোহণ করিয়া শূন্যমার্গে অন্তর্হিত হইলেন। আমাদের যে ক্ষতি হইল তাহা অপরিমেয়। আমাদের সবে মাত্র সুস্থ জীবনের কুসুমকলি অঙ্কুরিত হইতেছিল। বহুযুগব্যাপী অন্ধকারের মধ্য হইতে আমরা সবে মাত্র আলোকরশ্মির সন্ধান পাইতেছিলাম। কুসংস্কারের নিবিড় ব্যূহ ভেদ করিয়া, বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা বহু আয়াসে ক্ষীণপদে (যদিও আগ্রহের সহিত) পথ অন্বেষণ করিতেছিলাম। আমরা সবে মাত্র রাজনীতিক স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমাদের দেশের নেতারা একত্র হইয়া দেশের অভাব অভিযোগাদি কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট ধীরভাবে অথচ অটল দৃঢ়তার সহিত যথাযথ জ্ঞাপন করিবার মহৎ কার্য্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত শাসনকর্ত্তাদিগের অনুচিত কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই মহদনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। যে তেজ, যে উদ্যমশীলতা, যে অভিমতের উদারতা ও যুক্তিকুশলতার বলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে একটা মহাশক্তির কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা একা হরিশ্চন্দ্রেরই প্রদত্ত। তাঁহার একাগ্র মন সততই অতীতের পর্য্যালোচনা ও ভবিষ্যতের পরীক্ষা বিষয়ে নিয়োজিত থাকিত। অদৃষ্টচক্রে, লোকনয়নের অন্তরালে, দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি সমাজের উচ্চতম পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং কেবল স্বীয় প্রতিভাবলে উহার উপর অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে তিনি যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার

সম্মুখে ধনী ও সজ্জন সকলেই মস্তক সসম্ভ্রমে অবনত করিয়াছিলেন। এরূপ ব্যক্তির জীবনের আলোচনা নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক হইবে। অতএব আমরা এই জীবনবৃত্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আশা করি, যাঁহারা এই পরলোকগত হিন্দু দেশহিতৈষীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

হরিশ্চন্দ্র ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক দরিদ্র বহুপত্নীক কুলীন ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পুত্র, এবং শৈশবে তাঁহার জননীর মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। য়ুরোপীয় পাঠক এরূপ দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের মধ্যে কিরূপ বন্ধন থাকিতে পারে তাহা বোধ হয় সহজে কল্পনা করিতে পারিবেন না, কিন্তু যাঁহারা কৌলিন্য প্রথার গূঢ় রহস্য অবগত আছেন, তাঁহারা ইহাতে কোনরূপ অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিবেন না। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রতিপালন অর্থে মোটা ভাত ও সুলভ শাকব্যঞ্জনাদি দ্বারা উদরপোষণ। অত্যল্প ব্যয়েই ভরণকার্য্য নির্ব্বাহ হইত, এবং শিক্ষার ব্যয় তদপেক্ষাও লঘুতর ছিল—কারণ তাহাতে কিছুই ব্যয় হইত না। যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে ইংরাজী ভাষায় এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে ইংরাজের মত অনর্গল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মত ওজস্বিনী ভাষায় ইংরাজী লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর বদান্যতায় পরিপুষ্ট একটি সামান্য গ্রাম্যবিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়েই অসাধারণ মেধাসম্পন্ন বালক ভবিষ্যতে মহিমান্বিত পুরুষে পরিণতির সূচনা ও আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। পাঠ্য বিষয়ের তালিকায় এরূপ কোন বিষয় ছিল না যাহাতে ছাত্র অন্ততঃ শিক্ষকের শিক্ষাদান-শক্তির শেষ সীমা পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই। কথিত আছে একজন দেশীয় শিক্ষক ছাত্রের কূট প্রশ্নের বিভীষিকায় এরূপ শঙ্কিত হইয়াছিলেন যে পড়াইবার অগ্রে পাঠ্য বিষয়গুলি আপনি উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া প্রস্তুত থাকা তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তথাপি সময়ে সময়ে পাঠের কোন কোন কঠিন অংশের বিশ্লেষণে শিক্ষক অপেক্ষা ছাত্রের প্রদর্শিত পথ অধিকতর সুগম ও অব্যর্থ বোধ হইত। তাঁহার সাহস ও কর্ম্মকুশলতা অসাধারণ ছিল। জনৈক সুরামত্ত ইংরাজ নাবিক একবার বিদ্যালয়ের কতিপয় যূথভ্রষ্ট বালককে অপমান করায় হরিশ্চন্দ্র তদ্দণ্ডেই একটি ক্ষুদ্র যোদ্ধৃদল সৃজন করিয়া, প্রত্যেকের হস্তে একগাছি 'রুল' দিয়া, নিজে দলের অগ্রণী হইয়া, আততায়ীকে এরূপ প্রহার দিয়াছিলেন, যে সে পলায়ন করিতে পথ পায় নাই। এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে সচরাচর এদেশের বালকেরা যে বয়সে পায়রা পুষিয়া ও ক্রীড়া কৌতুকে সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকে সেই বয়সে হরিশ্চন্দ্রের মানসিক বল কিরূপ ছিল তাহাই প্রদর্শন করা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হরিশ্চন্দ্রের পরিবারে অর্থাগমের আশা অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। যে কারণে তিনি ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলে অবৈতনিক ছাত্ররূপে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন সেই কারণেই তাঁহাকে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। গৃহে অন্নাভাবের করুণ আর্ত্তনাদ তাঁহার ন্যায় স্নেহমমতাশীল যুবককে কিছুতেই নিরুদ্বেগ থাকিতে দিল না। তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই। সে সময়ে কেরাণীগিরি সহজলভ্য ছিল না। তখন বিদ্যালয়ে সম্মানলাভ বা উচ্চশিক্ষাসঞ্জাত পাণ্ডিত্য, বিনা বিদ্যায় বহুবর্ষব্যাপী

ক্রমোন্নতির ফলে উচ্চপদপ্রাপ্ত গর্ব্বোদ্ধত রাজপুরুষদের নিকট উপহাসের বিষয় ছিল। যাহারা কখনও সেক্ষপীয়রের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, অথবা উক্ত নামে স্যর রবার্ট সেক্ষপীয়র নামক রেসিডেণ্টকেই বুঝিত, তাহারা সেক্ষপীয়রের বচন আবৃত্তিকারিগণকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিত। তখন সুপারিশপত্র ভিন্ন আফিসে প্রবেশলাভের অন্য উপায় ছিল না। হরিশ্চন্দ্রের অর্থাভাবও যেমন, সুপারিশের অভাবও তেমনই ছিল। তাঁহার উন্নতির পথে ইহা প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন করিতেই হইবে, নতুবা অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইল। লিপিকুশলতার গুণে কখনও কখনও আবেদনপত্রাদি লিখিয়া দুই একটি টাকা পাইতেন, কিন্তু তাহাতে অভাব ঘুচিত না, যদিও সময়ে সময়ে তিনি বিশেষ উপকৃত হইতেন। আমাদের মনে পড়ে তাঁহারই মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে বিদ্যালয় পরিত্যাগের কিছু দিন পরেই তাঁহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল তাহার আভাস পাওয়া যায়। দুরদৃষ্টক্রমে একদিন তাঁহার গৃহে আহারীয় সামগ্রী এরূপ নিঃশেষিত হইয়া যায় যে একটি তণ্ডুলকণা পর্য্যন্ত ছিল না। কি আহার করিবেন তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বাটীর বাহির হইয়া যে পিত্তলের বাসন বন্ধক রাখিয়া খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিবেন সে পথ পর্য্যন্ত নাই। বিষণ্ণচিত্তে বসিয়া নিজ দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে এ বিপদে পরিত্যাগ করিবেন এ কথা কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সহসা গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল এবং একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার বসিবার গৃহে প্রবিষ্ট হইল। একি ভগবান স্বয়ং ছদ্মবেশে তাঁহাকে অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন না কি? অসম্ভব নহে। শীঘ্রই জানা গেল, যে আগন্তুক একজন বিখ্যাত জমীদারের মোক্তার, কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র ইংরাজীতে অনুবাদ করাইতে আসিয়াছেন। পারিশ্রমিক দুইটাকা দিবার প্রস্তাব হইল। হরিশ্চন্দ্রের তখন টাকার এত অভাব এবং উহা এরূপ সুসময়ে উপস্থিত, যে দুই টাকার মূল্য তাঁহার নিকট দুই মোহরের সমান বিবেচিত হইল।

কিন্তু এরূপ অনিশ্চিত উপার্জ্জনে তাঁহার অভাব দূর হইতে পারে না। নিয়মিত উপার্জ্জন ব্যতীত তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চার অবসর হয় না। সুতরাং তিনি প্রসিদ্ধ নিলাম বিক্রেতা টুলো কোম্পানীর অধীনে মাসিক আট টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। পরে বেতন বাড়াইয়া দশ টাকা করা হয়। একজন দেশীয় যুবকের পক্ষে দশ টাকা বেতন তাঁহার প্রভুরা এরূপ প্রচুর বিবেচনা করিতেন যে তাহা আর কিছুতেই বর্দ্ধিত করিতে সম্মত হন নাই, যদিও হরিশ্চন্দ্র এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে আর দুই টাকা অধিক দিলে তিনি বহুদিন কোন রূপ বেতন বৃদ্ধির দাবী করিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই টলিলেন না। কারণ সে সময়ে সরকারের অভাব ছিল না। নিলাম সরকারদের চৌর্য্যবৃত্তির প্রলোভন ও সুবিধা যথেষ্ট ছিল। এবং হরিশ্চন্দ্র সেরূপ নীচ প্রবৃত্তির লোক হইলে অনায়াসেই উক্ত কর্ম্মে বাহাল থাকিয়া প্রভুর কার্পণ্যের প্রতিশোধ লইতে পারিতেন। কিন্তু অর্থাভাবে পীড়িত হইলেও অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন হরিশ্চন্দ্রের নিকট অতীব ঘৃণার্হ ছিল। তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং শীঘ্রই মিলিটারী

অডিটর জেনারেলের আপিসে একটি সামান্য পদ লাভ করিলেন। বেতন মাসিক পঁচিশ টাকা হইল কিন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্টই আশা ছিল। ঐ সময়ে ম্যাকেঞ্জি সাহেব (যিনি এক্ষণে কলিকাতার লোকপ্রিয় এবং উদ্যমশীল আবকারী ও ইনকাম ট্যাক্স কলেক্টর) তাঁহার দুর্লভ বন্ধুরূপে দর্শন দিলেন। উক্ত মহোদয় য়ুরোপীয় হইলেও জাতি ও বর্ণ বিচার নীচতার লক্ষণ বোধে অবহেলা করিয়া সদয়ভাবে তাঁহার হস্তধারণ করিলেন এবং সুবিধা দেখিলেই তাঁহার পদোন্নতি বিধান করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি পূর্ব্বাহ্নেই এই যুবক বন্ধুটির প্রতিভা (যাহার জ্যোতিঃ পরে বিদ্যুদ্বৎ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল) লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাৎকালীন ডেপুটী মিলিটারী অডিটর জেনারেল, কর্ণেল চ্যাম্পনিজ্ সাহেবের নিকট তাঁহাকে একজন অসাধারণ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত করিয়া দেন। এখন হইতে হরিশ্চন্দ্রের উন্নতির পথ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইতে আরম্ভ হইল। উক্ত কর্ণেল মহোদয় শীঘ্রই এই যুবক কর্ম্মচারীর গুণ বুঝিতে পারিলেন। যে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির জন্য তাঁহার শত্রুরাও তাঁহার প্রশংসা করিত এবং যে চিত্তের উদারতায় রাসেল্ সাহেব তাঁহার "Indian Diary" নামক পুস্তকে তাঁহাকে কলিকাতার Lucullus বলিয়া অভিহিত করেন, সেই বুদ্ধি ও উদারতার গুণে তিনি এই কেরাণী-জীবন-বরণকারীর উজ্জ্বল প্রতিভা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের সৌভাগ্যক্রমে সে সময় সৈন্যসংক্রান্ত হিসাব বিভাগ সেই উদারচিত্ত বীরপুরুষ কর্ণেল গোল্ডির অধীনে ছিল, যাহার তুল্য উন্নতমনা ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সে সময়ে বেঙ্গল আর্মি নামক যোদ্ধৃদলে অতি অল্পই ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে অদ্ভুত প্রতিভাবলে তিনি ভারতীয় সৈনিক বিভাগের কার্য্যাবলী সুনিপুণ কর্ণধারের ন্যায় অবলীলাক্রমে চালনা করিতেন তাহাতে নীচজনোচিত পক্ষপাতিত্ব কখনও স্থান পাইত না। তিনি দ্বিধা না করিয়া এই সামান্য কর্ম্মচারীকে অডিটরের পদে ও বেতনে উন্নীত করিলেন,—যে পদ পূর্ব্বে কেবল য়ুরোপীয় ও য়ুরেসীয় ভিন্ন কেহ অধিকার করিতে পায় নাই। আপত্তির স্বর উঠিয়াছিল কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের প্রতিবাদে তাহা নিস্তব্ধ হইয়া যায়। সে প্রতিবাদ হরিশের স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর ও অখণ্ডনীয় যুক্তি বিশদ ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তিনি যাহাই লিখিতেন বা যে লেখাই সংশোধিত করিয়া দিতেন তাহা উক্তবিধ গাম্ভীর্য্য ও বিশদতাগুণে মণ্ডিত হইত। কর্ম্মজীবনে এইরূপে ক্রমোন্নতি ঘটিতে লাগিল কিন্তু হরিশ্চন্দ্র কিছুদিন পরে যে ঝটিকাময় রাজনৈতিক সমুদ্রে তরণী চালনা করিয়াছিলেন তাহার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিবার যে সুযোগ উক্ত উন্নতি দ্বারা উদ্ঘাটিত হইল তাহা কখনও অবহেলা করেন নাই। সে সময়ে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ সরকারী উকিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত সদর কোর্টের একজন মুহুরী মাত্র ছিলেন। তিনি ভবানীপুরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কক্ষে তাঁহার সদ্গুণে মুগ্ধ ও অবাধে বিতরিত চাটনীলুব্ধ এক দল যুবক শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। হরিশ উক্ত দলের নেতা ছিলেন। শম্ভুনাথ বা হরিশ কেহই অনর্থক গল্পগুজবে কালক্ষেপ করিতে ভালবাসিতেন না। উভয়েই কর্ম্মপ্রিয় ছিলেন, এবং তাহার ফলে শীঘ্রই একটি আইন সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আইন সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইত তাহা অতি

উচ্চদরের। কোন অপরিচিত ব্যক্তি সহসা সে গৃহে প্রবেশ করিলে তাহা ব্যবহারাজীবীদিগের শিক্ষাস্থান বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন। আইনের বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থাদি পরস্পরের প্রতি নবশিক্ষার্থীর উৎসাহ এবং প্রবীন ব্যবাহারাজীবের নিপুণতার সহিত নিক্ষিপ্ত ও প্রতিনিক্ষিপ্ত হইতেছে। তর্ক বিতর্কের স্রোত এরূপ বেগে প্রবাহিত হইতেছে যে অবিশেষজ্ঞের পক্ষে তাহার গতি নিরীক্ষণ করা দুঃসাধ্য, মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়। প্রথম আদালত যে রায় দিয়াছেন আপীল আদালতে তাহা রহিত হইয়াছে, তাহার পর সদর আদালতে তাহার আলোচনা হইয়া পুর্ণবিচারের আদেশ হইয়াছে। শম্ভুনাথের বাড়ীতে যে কাল্পনিক আদালত বসিয়াছে তাহাতে সমস্ত মোকদ্দমা আদ্যন্ত আগ্রহের সহিত পুনরালোচিত হইল উভয় পক্ষেই কৌন্সিলী নিযুক্ত হইয়া যেরূপ উৎসাহের সহিত বাক্‌-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা প্রকৃত বিচারালয়ের যুদ্ধ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। যে সকল অভিমত প্রকাশিত হইল তাহা সারবত্তা ও মৌলিকতায় সদর্‌ আদালতের বিজ্ঞতম বিচারকের অভিমতের সমতুল্য। তাহার পর এক অত্যুগ্র বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। অমুক আইনের অমুক বিধান এই মতের অনুকূল, কিন্তু অমুক আইনের অমুক বিশেষ বিধান ইহার প্রতিকূল। উক্ত বিশেষ বিধানের মূল বিশ্লেষিত হইল। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হইল। হরিশ্চন্দ্রের তীক্ষ্ণ প্রতিভা এই সকল সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল, তাঁহার কণ্ঠস্বর অপর সকলের কণ্ঠস্বর অতিক্রম করিয়া উঠিল! তাঁহার অসাধারণ মানসিক শক্তি তর্কে এবং শেষ মীমাংসায় সকলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সদর আদালতের উকীল সম্প্রদায় কি অলঙ্কারই হারাইয়াছিলেন! তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ তাঁহাকে কেরানীগিরি পরিত্যাগ করিয়া আপনার উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিপদের সময় তিনি যে ব্যবসায় আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না। লোকে বলে তিনি এই বলিয়া আপনার কার্য্যের ঔচিত্য সমর্থন করিতেন যে অন্য কর্ম্ম অপেক্ষা কেরাণীগিরিতেই দুঃস্থজনকে পরামর্শদান এবং আবেদনাদি লিখিয়া দিবার অধিকতর অবসর হইত। তিনি যে সকল আবেদনপত্র লিখিয়া দিতেন তাহা পাঠ করিয়া দেশের প্রত্যেক অন্যায়কারীর মুখমণ্ডল ভয়ে ও লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি যে ওকালতীতে প্রতিষ্ঠালাভের উপযুক্ত হইয়াও কেরাণীগিরিতেই আবদ্ধ থাকিয়া আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ লোকে এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। নিজের সদ্‌গুণ ব্যক্ত করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু তিনি যে মিলিটারি অডিটর জেনারেলের আপিসে চিরকাল আবদ্ধ ছিলেন, সে কেবল তাঁহার কৃতজ্ঞতাগুণের বশে। বন্ধুত্বের বিশ্রম্ভালাপে তিনি একবার মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে যে পর্য্যন্ত কর্ণেল চ্যাম্পনিজ্‌ (যাঁহার নিকট তিনি এত দূর ঋণী ছিলেন) চলিয়া না যাইবেন সে পর্য্যন্ত তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতার খাতিরে তাঁহার পদ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তর্ক নিস্ফল হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলিল না। একবার মাত্র প্রতিজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত কর্ণেল মহাশয়ের একটিমাত্র স্নেহপূর্ণ বাক্যে উহাতে পুনরায় দৃঢ়তরভাবে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

যে অসাধারণ ব্যক্তির জীবনী আমরা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাঁহার কার্য্যক্ষমতা ও অধ্যবসায় সম্বন্ধে এই ঘটনা হইতেই কিঞ্চিৎ ধারণা করা যাইতে পারে যে ডাক্তার ডফ্‌ সাহেবের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য তিনি ভবানীপুর হইতে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার পর্য্যন্ত পাকা ১০ মাইল পথ পদব্রজে যাতায়াত করিয়াছিলেন। যে জ্ঞানস্পৃহার উত্তেজনায় তিনি সময় ও দূরত্ব তুচ্ছ করিয়া এতদূর ধাবিত হইয়াছিলেন তাহা সাধারণ নহে। আজকালিকার দিনে কয়জন যুবক ইহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তেজনার বশে এতদূর পথ চলিতে প্রস্তুত আছেন? কেহ কেহ গাড়ী খুঁজিবেন কেহ বা সঙ্গী খুঁজিবেন। সকলেই একটা না একটা ওজর করিয়া বসিবেন। কিন্তু হরিশের কার্য্যশক্তি ইংরাজের মত ছিল। কেরাণীজীবনে একবার বাধ্য হইয়া তাঁহাকে একখানি তিনপায়া টেবিল ও একখানি ভগ্ন চেয়ার লইয়া কাজ করিতে হইয়াছিল। তাহাতে একজন তাঁহাকে তাঁহার অসুবিধার কথা বড় সাহেবকে জানাইতে উপদেশ দিলেন। তিনি তাহাতে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা জাতিগর্ব্বে পরিপূর্ণ বলিয়া লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। তিনি তাঁহার ফিরিঙ্গী পরামর্শদাতাকে বলিলেন—বাঙ্গালী জানুর উপর কাগজ রাখিয়া লিখিতে অভ্যাস। তেপায়া টেবিল তাহা অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক।

শূন্য পাঠ গৃহে

সমাপ্ত তোমার পাঠ, না ফুরাতে বেলা,
হে সহপাঠিন্, তাই পাইয়াছ ছুটী।
আমার শুধিতে বাকী বহু ভুল, ত্রুটি,
খেলা ভাবি কাজে আমি করেছিনু হেলা,
কাজ ভাবি কতবার খেলিয়াছি খেলা,
জীবনের খাতাখানি ভরা কাটা কুটি,
যতই মুছিতে যাই তত উঠে ফুটি
কাল রেখা। সন্ধ্যা দীপ জালিয়া একেলা
শূন্য পাঠ গৃহে, চিত্ত উদাস ব্যাকুল
নিয়োজিতে হবে পাঠে। হয়তো আবার
প্রভাতের সঙ্গিদের গীত প্রতিধ্বনি
ফিরিয়া আসিবে কাণে, করাইবে ভুল,
হয়তো অজ্ঞাতসারে নয়নের ধার
মুছে দিবে নব লেখা, বাড়িবে রজনী।

মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন

এবারে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন হইয়া গেল। তিন বৎসর পরে সম্মিলন, অথচ গত দুই সম্মিলনে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই—তাই বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল মেদিনীপুরে যাইব। একটা নূতন স্থানও দেখা হইত। কিন্তু নানা কারণে যাওয়া ঘটিল না—কারণগুলির উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্বে সাহিত্য সম্মিলন ইত্যাদিতে যেরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত এখন আর সে-রূপটা দেখা যাইতেছে না। বৎসরে দুইটি সম্মিলন হইত,—সমগ্র বঙ্গের একটি এবং উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন; এ ছাড়া কোনও কোনও জেলায়ও এরূপ সম্মিলনের অধিবেশন হইত। একবার এরূপও প্রস্তাব হইয়াছিল যে 'পূর্ব্ববঙ্গ সম্মিলন' 'পশ্চিমবঙ্গ

সম্মিলন'—এমন কি 'দক্ষিণবঙ্গ সম্মিলন'ও—করিতে হইবে। যাহা হউক অতটা না হইলেও, বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, এই দুই সম্মিলনেরই ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভিতরে সাহিত্যানুশীলনের একটা উদ্দীপনা জাগিয়াছিল, তাহাতে নানাস্থলে সাহিত্য-সমিতি, অনুসন্ধান-সমিতি ইত্যাদির ও সৃষ্টি হইয়াছিল।

তাহার পর কুক্ষণে ইউরোপের মহাসমর আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ উহার ফলে অন্ন-বস্ত্রের মূল্য বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। লোকে এই নিমিত্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিয়া উদ্বেজিত হইয়া পড়িল। ইহা সাহিত্য-চর্চ্চার অনুকূল অবস্থা নহে—চিত্তে স্ফূর্ত্তি না থাকিলে কাব্য ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান কোনও বিষয়েই অভিনিবেশ হইতে পারে না। এদিকে রেলওয়ের রিটার্ণ্ টিকেট্ উঠিয়া গেল, সম্মিলনে যে কন্‌সেশন পাওয়া যাইত তাহাও গেল—এমন কি ভাড়াও বর্দ্ধিত হইল। ইহার উপর, এক প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমগ্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল—তাহাতেও সাহিত্যানুশীলনের দিকে শিক্ষিত সাধারণের অনুকূল দৃষ্টির সমূহ ব্যাঘাত ঘটিল। রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ দিবাপ্রদীপের ন্যায় নিষ্প্রভ, পত্রিকাখানি বিলয়প্রাপ্ত, এবং উত্তরবঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন বিস্মৃতির গর্ভে নিপতিত হইয়াছে। এই একটি উদাহরণ হইতেই সাহিত্য চর্চ্চার অবস্থা তথা সম্মিলনের সম্ভাবনা কিরূপ, তাহা অনুমিত হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন হাবড়ার অধিবেশন পর্য্যন্ত কথমপি বৎসরে একবার হইতে পারিয়াছে তারপর তিনবৎসরান্তে এইবার মেদিনীপুরে হইল। এত সব প্রতিকূল অবস্থায়ও যে ইহার অধিবেশন হইতে পারিল এই জন্য মেদিনীপুরের অধিবাসিগণ সাহিত্যসেবি মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের সানুগ্রহ আমন্ত্রণের সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই। কোনও সহৃদয় বন্ধুর পত্রে অবগত হইলাম যে অভ্যাগতগণের আদর আপ্যায়ন যথেষ্টই হইয়াছিল—প্রবন্ধ সম্ভারও নাকি ভূরিপরিমাণেই হইয়াছিল, তন্মধ্যে সারবান্ প্রবন্ধও প্রচুরই ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় এসকল কিছুই উপভোগ করিতে পারিলাম না।

সভাপতিনিয়োগে গুণগ্রাহিতাই লক্ষিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিশেষে সভাপতিত্ব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি পরিষদের একদা সভাপতি ছিলেন; উচ্চপদাভিষিক্ত রাজকর্ম্মচারী হইয়াও সাহিত্যের চর্চ্চায় অনুরাগী ছিলেন; প্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীত :-

মিলে সবে ভারত সন্তান
গাও ভারতের যশোগান।

ইত্যাদি তাঁরই রচিত। তিনি বোধ হয় বার্দ্ধক্যবশতঃ সভাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বেই সম্মিলন-সভাপতির পদে বৃত করা উচিত ছিল; ফলতঃ সভাপতি নিয়োগে বর্ষীয়ান্‌দিগকেই অগ্রে মনোনীত করা উচিত। তাহা না করাতে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ৺চন্দ্রনাথ বসু, ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রমেশচন্দ্র দত্ত—ইঁহাদের কাহাকেও অধিষ্ঠিত হইতে দেখা গেল না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এইপদে স্থবিরত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে আহূত হন নাই তাই তাঁহারা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে পারেন নাই।

পরে যিনি সভাপতির পদে বৃত হইয়াছেন, তিনি সাহিত্য পরিষদের একজন স্তম্ভস্বরূপ; বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতায় রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সুবিখ্যাত। তথাপি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, এইসকল বর্ষীয়ান্ ব্যক্তিদিগের কাহাকেও এই পদে অভিষিক্ত দেখিতে পাইলে অধিকতর আনন্দিত হইতাম।* সম্মিলনের শাখা বিভাগ বিষয়ে প্রতিকূল মত পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের প্রবন্ধেই প্রকাশিত করিয়াছি, এবার আর এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে চাই না। এই শাখাবিভাগ অধুনা সাহিত্য পরিষদেও সংক্রামিত হইয়াছে; ইহা যে একটা খুব ভাল কাজ হইয়াছে তাহা মনে করিতে পারি না। "আমার প্রবন্ধটির কথা সকলেই জানুক—ইহা সকলেই শুনুক" এইরূপ আকাঙ্ক্ষা কোন লেখকের বিশেষতঃ নব্য লেখকের এবং যশোলিপ্সু † ব্যক্তির হৃদয়ে উপজাত হওয়া স্বাভাবিক। শাখায় যাহা আলোচিত হয়—তাহা পরিষদের সমগ্র সভামণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হয় না ‡ শাখাধিবেশনে লোকও অধিক হয় না। এ অবস্থায় প্রবন্ধ লেখকের উৎসাহবর্দ্ধন হইতে পারে না। শাখার অধিবেশনের প্রবন্ধগুলির সম্যক্ আলোচনা হইলেও বরং শাখাবিভাগের সার্থকতা হইত; পরন্তু তাহাও যে (সব সময়) হয় না, ইহার পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। অখ্যাতনামা ব্যক্তির লিখিত অসার প্রবন্ধও শাখায় আলোচিত হইয়া পরিষৎ পত্রিকায় স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধ বাহুল্য হেতু যে শাখাবিভাগ আবশ্যক এমনও নহে—কেননা শাখায় যথোচিত প্রবন্ধের অভাবও বুঝা গিয়াছে। এ অবস্থায় পরিষদে ও শাখাবিভাগ কেন যে প্রবর্ত্তিত হইল বুঝিতে পারি না।

সম্মিলনের বিভিন্নশাখায় সভাপতি নিয়োগ সম্বন্ধেও বলিতে পারি যে সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞান শাখায় যাঁহারা সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন সকলেই সুযোগ্য ব্যক্তি। সাহিত্যশাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বিদ্যারত্ন মহোদয় রস-রচনায় ইদানীং একপ্রকার অদ্বিতীয় বলিলেও চলে; বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর নায়ক নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব কৌশল প্রদর্শন করিতেছেন। দর্শন শাখার সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর বয়সে বিদ্যায় ও চরিত্র মাহাত্ম্যে সর্ব্বথা বরণীয় ব্যক্তি; 'ব্রহ্মবিদ্যা' সম্পাদনে এবং তাহাতে স্বরচিত আধ্যাত্মিক প্রকাশ দ্বারা তিনি দর্শন বিষয়ে যে সম্যক্ প্রবিষ্ট তাহাই সূচিত হইয়াছে। বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ রায় চুণীলাল রায় বহাদুর সি,আই,ই কেবল বৈজ্ঞানিক নহেন অপিচ সাহিত্যসেবী; সাহিত্য সভার তিনি সম্পাদক এবং পরিষদের সহকারী সভাপতি। বিজ্ঞানশাখার সভ্যগণ কর্ত্তৃক বিগত (হাবড়া) সম্মিলনেই তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।* ইতিহাসশাখার সভাপতি ও যোগ্যব্যক্তি; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও

* ইঁহাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ, কেহ বা সুদূরাবস্থিত এতাদৃশ কারণেও হয়তো ইঁহাদের কথা সম্মিলনের উদ্যোক্তৃবর্গ ভাবিতে পারেন নাই

† "যশসি চাভিরুচিঃ প্রকৃতি সিদ্ধমিদং হি মহাত্মানাম্"।

‡ বিজ্ঞাপন হাতে লিখিয়া প্রচারিত হওয়ায় সংক্ষেপার্থ প্রবন্ধকারের নামটা পর্য্যন্ত লেখা হয় না, দেখিয়াছি।

'ছাপ' যুক্ত না হইলেও নানাভাষায় তিনি লব্ধপ্রবেশ বলিয়া খ্যাতিমান্। অনেক পত্রিকায় তিনি সম্পাদকতা করিয়াছেন এবং ইদানীং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। নানাভাষায় জ্ঞান থাকাতে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা করিবার তাঁহার ক্ষমতা রহিয়াছে।

কোনও সুহৃদ্বরের অনুগ্রহে সমুদয় সভাপতির মায় অভ্যর্থনা সমিতির—অভিভাষণ এক এক খণ্ড পাইয়াছি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি মহোদয় একজন প্রবীন পণ্ডিত—বিদ্যার জাহাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই পরিণতপ্রাজ্ঞ বিদ্বৎপ্রবরের অভিভাষণখানি বড়ই আদরের সহিত পাঠ করিলাম। আক্ষেপের বিষয় যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, তাহা পাই নাই। মেদিনীপুর অতি প্রকাণ্ড জেলা—বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সম্মিলন ক্ষেত্র—প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সংস্থানভূমি—অশেষ মনীষাসম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তাই মেদিনীপুরের গৌরবকাহিনী শুনিতে পাইব, ইহাই প্রত্যাশিত ছিল। অপিচ তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধটি রচনা পারিপাট্যে অতীব মনোহারী হইবে ইহাও আশা করিয়াছিলাম। যাহা হউক আমাদের এই আশাভঙ্গের জন্য অগস্তি মহাশয়কে দোষ দিতে পারি না—দোষ আমাদের অদৃষ্টের। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর নানাদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছি—শিখি নাই আপনার জন্মভূমির ইতিবৃত্ত; ইংরেজীতে হুড় হুড় করিয়া বলিতে লিখিতে শিখিয়াছি, শিখি নাই নিজের মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে। * তবে মেদিনীপুরে সাহিত্য-চর্চ্চা তো খুবই হয়, শ্রীযুত অগস্তি মহাশয়কে কোনও সাহিত্যিক এবিষয়ে সহায়তা করিলেই ভাল হইত। বৃদ্ধ বয়সেও যে অগস্তি মহোদয় সম্মিলনের আহ্বানকারিগণের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক স্বাগতসম্ভাষণ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন এজন্য তিনি সাহিত্যসেবিমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন। এক জন বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী অবসরগ্রহণপূর্ব্বক যে দেশহিতকর ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—এ আদর্শ আমাদের সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

সম্মিলন-সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয় স্বীয় অভিভাষণে তাঁহার চিরাভ্যস্ত ও সর্ব্বান্তঃকরণে আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে তিনিই (১৮৯৭ অব্দে) প্রস্তাব করিয়া এফ, এ, ও বি, এ তে বাঙ্গালা রচনার প্রবর্ত্তন করেন। ফলতঃ রায় চৌধুরী মহাশয়ের মাতৃভাষার উন্নতি বিধান কল্পে আন্তরিক চেষ্টা বড়ই শ্লাঘার বিষয়। সম্প্রতি তিনি সিনেট্ সভায় আছেন কিনা ঠিক্ জানিনা। অল্পকয়েকদিন হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলীর খসড়া সিনেটের সভ্যগণের নিকটে বিচারার্থে প্রেরিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা গেল ইংরেজী ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদান ও পরীক্ষা গ্রহণ হইবে।

মাতৃভাষা—১ খানি প্রশ্নপত্র

* সুখের বিষয়, সম্প্রতি বাতাস অনেকটা ফিরিয়াছে, এবং তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ধন্যবাদার্হ, সন্দেহ নাই।

মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মাতৃভাষার প্রাধান্য প্রবর্ত্তিত হইল; আশা করা যায় উপরিতন পরীক্ষাগুলিতেও (অর্থাৎ আই, এ, বি-এ ইত্যাদিতে) মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে।

এই খস্‌ড়া যাহাতে পরিগৃহীত হয়, তজ্জন্য সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়কে সহায়তা করিতে পারেন। দুইটি আশঙ্কার কারণ ইহাতে আছে—প্রথম সরকারী শিক্ষাবিভাগ ইহার পরিপন্থী হইতে পারেন; দ্বিতীয়, মেট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমেডিয়েট্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে না থাকিবারই সম্ভাবনা। তাই এ বিষয়ে লোকমত ও সরকারকে জানান আবশ্যক।

অতঃপর সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে সম্মিলন ক্ষেত্রে এবার রসের ফোয়ারা ছুটিবে—অথবা ব্যাকরণের বিভীষিকা প্রদর্শিত হইবে; আমরা এ বিষয়ে হতাশ হইয়াছি, একথা বলিবই। পরন্তু ললিত বাবু এমন এক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন, যাহা আজকালকার সবিশেষ উপযোগীই হইয়াছে। ইদানীং আমরা জাতীয় শিক্ষা ও 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু ললিত বাবুর ন্যায় এরূপ পরিস্ফুটভাবে অথচ নিরপেক্ষতার সহিত এতৎসম্বন্ধে আর কেহ বলিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তিনি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রবীন অধ্যাপক; অথচ তাঁহার মতিগতি আবাল্য সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের অনুকূল এবং আর্য্যসভ্যতার পক্ষপাতী। প্রবন্ধটি সারবান্ অথচ ফেনিল নহে—কথাগুলি বেশ গোছাইয়া বলা হইয়াছে। ললিত বাবুর পাঠের ভঙ্গিও চমৎকার; অতএব বোধ হয় শ্রোতৃমণ্ডলী নিবিষ্টচিত্তে অভিভাষণ আগন্ত শুনিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছেন। সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণে কেবল 'সাহিত্য' বিষয়ে অতি কম কথাই আছে—তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব ও উপাদেয়ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা ইহার কোনও রূপ ত্রুটি গ্রহণে নিতান্তই অনিচ্ছুক।

বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণটির বিষয়ও অতি সময়োপযোগী হইয়াছে; বিজ্ঞান সম্পর্কীয় বড় বড় কথা না শুনাইয়া রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় যে কাগজের কথা ইহাতে বলিয়াছেন তদ্দারা সাধারণের উপকার হইবার কথা। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"—বাণিজ্যের লক্ষ্মী এখন প্রায় পরহস্তগতা; তাই এখন 'অৰ্দ্ধেন ক্রিয়তে কার্য্যম্' কৃষিই আমাদের প্রধান অবলম্বন। যিনি ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পথ দেখাইয়া দিবেন, তিনিই সুতরাং আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। বসুমহাশয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েরও কথা পাড়িয়াছেন—এমন কি দেশে কোথায় কি কাজ হইতেছে তাহারও তালিকা একটি দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন। তবে প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ হইয়াছে; এতটা সময় শ্রোতৃগণ ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ করিতে পারিয়া থাকিলে উপকৃত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বিচক্ষণ বসু মহাশয়ের অভিভাষণের কয়েকটি স্থল বাদ দিয়া পড়িতে হইয়াছিল—ইহা আক্ষেপের বিষয়; 'প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দুরাদস্পর্শনং বরম্'—ঐ সকল কথা প্রবন্ধে স্থান না পাইলেই ভাল ছিল। ফলতঃ সাহিত্য সম্মিলনের ক্ষেত্রে রাজনীতির এদিক্ ওদিক্ উভয়টাই পরিহর্ত্তব্য।

দর্শন শাখার সভাপতি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় প্রবন্ধটিকে যথেষ্টই সরল ও সুখবোধ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—অথচ দর্শনের যত প্রকার বিভিন্ন পন্থা আছে সমস্তই উল্লেখ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট জিনিস—শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক বিতরিত 'প্রেম' যে সার বস্তু তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে বিষয়ের জটিলতা হেতু, আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও, প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। 'ইউরোপের মহাশ্মশান জগতের হাহাকার' ইত্যাদিতে ব্যথিত হইয়া সহৃদয় সিংহ মহোদয় আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন "ভারতের আলোকে জগৎ আলোকিত হউক।" ভগবান্ তাই করুন।

ইতিহাস শাখায় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদীয় অভিভাষণের প্রথম অংশে মেদিনীপুরের কথা অনেকটা বলিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে। অভিভাষণটি লিখিতে অমূল্যবাবু যথেষ্ট খাটিয়াছেন এবং তাহা পাঠ করিলে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। প্রবন্ধ হিসাবে ইহা বেশ হইয়াছে। তবে সম্মিলন সভায় যাহা পঠিত হইবে তাহা যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও অনায়াসবোধ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উপসংহার ভাগে তিনি উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন "স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থলাভ বা যশোমাল্যে বিভূষিত হইবার জন্য যেন আমরা সত্যকে বিকৃত করিয়া বা মিথ্যাকে সত্যের আবরণে আবৃত করিয়া দশের নিকট উপস্থাপিত না করি।" খুব ভাল কথা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সম্মিলনে প্রাপ্ত প্রবন্ধ সংখ্যা যথেষ্টই হইয়াছিল এবং অনেক প্রবন্ধই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এ যাবৎ এই সকল প্রবন্ধের কোনওটিই দেখিতে পাই নাই। পত্রিকাস্থ হইলে অবশ্যই পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিব।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবার ও শেষ দিবসে কতকগুলি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে; এরূপ সর্ব্বদাই হইয়া আসিতেছে—পরন্তু কাজ অতি কমই হয়। যাহা হউক, তন্মধ্যে একটি প্রস্তাব এইরূপ দেখিলাম "V. Desirability of introducing Bengali as the medium of instruction in all subjects in Primary and High schools ইত্যাদি ইত্যাদি and approaching the Calcutta Dacca and Assam Universities and Dacca Board of Examination." * বক্তব্য এই যে প্রাইমারি স্কুলগুলিতে তো সর্ব্বত্রই বাঙ্গালা প্রভৃতি মাতৃভাষার (ভার্ণাকুলারের) সম্পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান; তবে এস্থলে প্রাইমারির উল্লেখ বোধ হয় ভ্রমতঃই হইয়াছে। অপিচ আসামে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ দুইটি ইউনিভারসিটিই হইবার কথা উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু একটিও হইবে বলিয়া কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সরকার বাহাদুর তো শাসন পদ্ধতির নিত্যকর্ম্ম চালাইবারই অর্থাগমের চিন্তায় ব্যাকুল—ঐ সকল নৈমিত্তিক ব্যাপার এখন স্বপ্নেরই অগোচর।

মেদিনীপুরের সম্মিলনের উপসংহারে কোনও স্থল হইতে ভবিষ্য সম্মিলনের আহ্বান আসিয়াছে কিনা সংবাদ পাই নাই; "সর্গান্তে ভাবি সর্গস্য কথায়াঃ সূচনা ভবেৎ—মহা-

* Amrita Bazar Patrika Dak Edition 20th Aprial 1922

কাব্যের লক্ষণোক্ত এই নিয়মানুসারে "বিজ্ঞানশাখা" তাঁহাদের ভাবী সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি তাঁহাদের (তথা আমাদের) আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ হয়—সত্বরই (সংবৎসর মধ্যেই—আগামী বড়দিনের বন্ধে হইলে বিশেষ ভাল হয়) যেন কোনও স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন দেখিতে পাই।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

চিরায়মানা

যৌবনে এলে না তুমি শিবানী আমার,
বুঝি বুড়া ক্ষেপা বর, রিক্ত সন্ন্যাসীর
ভস্মরাগ, জটাভার, শতচ্ছিন্ন চীর
একমাত্র আকিঞ্চন কুমারী হিয়ার!
তাই বহু বর্ষ ধরি আছ প্রতীক্ষায়
হে চিরকিশোরী মোর অনূঢ়া প্রেয়সী
প্রৌঢ় প্রণয়ীর লাগি? শান্ত গরিমায়
অশান্ত যৌবন মোর উচ্ছল সরসী
স্বচ্ছ আরসীর মত যবে স্তব্ধ হবে
সে দিন আসিবে তুমি; নিস্তরঙ্গ বুকে
অচঞ্চল ছায়াখানি ফেলিবে নীরবে;
স্পন্দহীন মিলনের পরিপূর্ণ সুখে
ভরি' দিবে বক্ষ মোর;—তারা উদারায়
সাহানা উঠিবে বাজি তোমায় আমায়।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

অভিভাষণ *

চার্ল্স্ এনান্ডেল্ (C. Annandale) চিত্রবিদ্যার সহিত ইতিহাসের তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিক চিত্রকর ও ঐতিহাসিকের কার্য্য কতকটা একই প্রকারের। প্রকৃতি চিত্রকরকে উপাদান-সম্ভার দিতে কখনই কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু সৌন্দর্য্যশালিনী স্বভাবরাণী কোথাও সমগ্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখেন নাই। শ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে চিত্রকরকে উপাদানগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হয়; তার পর তুলিকার সাহায্যে যথাযথ বর্ণ সংযোজন করিয়া, চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়; সেইরূপ সমাজ, ইতিহাস গঠনের উপাদান দিয়াই ক্ষান্ত থাকে, ঐতিহাসিককে ঐ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনা হইতে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিতে হয়। ঐতিহাসিকের মনে রাখা উচিত, ঘটনার ফিরিস্তি করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য নয়; পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি আবার করি—ঘটনার কারণানুসন্ধান তাঁহার অন্যতম কার্য্য। কোন্ অবস্থায় কি করিয়া ঘটনাটী ঘটিল, তাহাও দেখা ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। পটুয়া ও চিত্রকরে যেরূপ প্রভেদ, ঘটনার ফিরিস্তি-বিবৃতিকারী ঐতিহাসিক ও ঘটনার কার্য্যকারণ-আবিষ্কারক ঐতিহাসিকের মধ্যে প্রভেদও সেইরূপ। প্রথম শ্রেণীর

* মেদিনীপুর বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের পরিশিষ্টাংশ।

চিত্রকর ও ঐতিহাসিক "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" শ্রেণীর নকলনবিশমাত্র। চিত্রকর ও প্রকৃত ঐতিহাসিকের সাধারণ ও বিশেষ দুই প্রকার গুণ থাকা উচিত। সাধারণ গুণ অর্থে যে কেবল সাধারণ জ্ঞান বুঝিতে হইবে, তাহা নহে, অধিকন্তু বুঝিতে হইবে—প্রকৃষ্ট মানসিক শক্তি। যে শক্তিবলে ঐতিহাসিক মানবকে জ্ঞানের পথে সত্যনির্দ্ধারণে সহায়তা করে—যে শক্তিবলে মানব তাঁহার নিকট হইতে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করিয়া ধন্য হয়, তাহাই এই প্রকৃষ্ট মানসিক শক্তি। দার্শনিক বেকনের মতে ইতিহাস স্মৃতির উপর, দর্শন জ্ঞানের উপর ও কবিতা কল্পনার উপর নির্ভর করে। বস্তুতঃ ইতিহাস যে স্মৃতির উপর কতকটা নির্ভরশীল, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না; কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, ঐতিহাসিককে মানবের ঘটনা লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। মানবের প্রত্যেক ঘটনার সহিত স্বার্থ বা বিরাগ ও অনুভূতি কতকপরিমাণে জড়িত থাকেই থাকে। প্রকৃত ঐতিহাসিককে এগুলির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। বুদ্ধিবৃত্তির চালনায় সত্য নির্দ্ধারণই তাঁহার কর্ত্তব্য। ভাবাবেশে ঘটনাকে বিকৃত করিয়া দেখিলে চলিবে না। প্রমাণগুলিকে ব্যবহারাজীবীর মত দেখিলেও চলিবে না; তাহা হইলে ঐতিহাসিক একদেশদর্শী হইয়া পড়িবেন। তাঁহাকে সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিয়া, স্থিরচিত্তে সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে দেখিতে হইবে, প্রমাণগুলি বিচারসহ কি না। আর দেখিতে হইবে, কোন্ অবস্থাবশে মানব কোন্ কার্য্য করিতে পারে। মানবের সুখদুঃখের অংশভাগী তাঁহাকে হইতে হইবে—সহমর্ম্মী হইয়া তাঁহাকে ঘটনাগুলি দেখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি ঐতিহাসিকের চাই 'সু-মতলব'। কু-মতলবে আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘটনাকে বিকৃত না করিয়া অথবা ঘটনা হইতে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া সত্যসন্ধ ঐতিহাসিক কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। বক্তব্য বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলাও ঐতিহাসিকের আর একটী সাধারণ গুণ। বর্ণনভঙ্গী অর্থে রচনা প্রণালী বুঝিলে চলিবে না—ভাব ও চিন্তার ধারাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করাই ঐতিহাসিকের বর্ণন-ভঙ্গী।

এই পর্য্যন্ত ইতিহাসের ধারা কলাভিমুখী। ঐতিহাসিকের বিশেষ গুণ আলোচনা করিতে হইলে বিজ্ঞানের সহিত ইতিহাসের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। আজকাল বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী দ্বারা ইতিহাসের আলোচনা হউক এ কথা আমাদের দেশে অনেকেই বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত ইতিহাস আলোচনা সম্ভবপরই নয়। ঐতিহাসিক যে যুগের ইতিহাস লিখিবেন, সেই যুগের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার সম্যক্ পরিচয় থাকা আবশ্যক। সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-গুলির আলোচনা ও দেশের অবস্থার বিবরণ বা statistics সংগ্রহ করা ঐতিহাসিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্কশাস্ত্রের মতে ঘটনাপরিদর্শনজন্য যে সকল নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে, ঐতিহাসিককে সেগুলির প্রতি অবহিত হইতে হইবে। প্রমাণগুলির যথার্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে, প্রমাণ-উত্থাপনকারীর ঘটনাবলী দেখিবার কত দূর সুযোগ-সুবিধা হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন, ঘটনাপরিদর্শনকারী সমসাময়িক সাক্ষ্যের মূল্য পরবর্ত্তী কালের সাক্ষ্যের মূল্য অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী। স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিফলক,

দানপত্র ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ লিপির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলেও দেখিতে হইবে, কবে কাহা কর্ত্তৃক ঘটনার কত বৎসর পরে সেই স্তম্ভ উত্তোলিত হইয়াছে কিংবা লিপি বা ফলক উৎকীর্ণ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে চাই না। দেশবিখ্যাত শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বর্দ্ধমান-সম্মেলনের সভাপতিরূপে এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। আমি এ স্থানে (Troeltsch) ট্রএলট্‌শের সুচিন্তিত গ্রন্থের দু'একটী কথার পুনরুল্লেখ করিব। তিনি বলিয়াছেন, অন্যান্য বিষয়েরও যেমন, ইতিহাসেও সেইরূপ। পুথিগত বিদ্যা সাধারণ ভাবের উপর নির্ভর করে। সাধারণ ভাব আবার কার্য্য কারণের নিয়মবশে চালিত হইয়া থাকে। ইতিহাসের ব্যবহারিক কার্য্যকরী বিকৃতি ছাড়িয়া দিলে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য—প্রত্যেক ঘটনা, কার্য্য, প্রণালী ও ঘটনার সূত্র কার্য্যকারণপরম্পরার নিয়মানুসারে নির্দ্ধারণ করা। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের নামান্তর মাত্র।

জার্ম্মানদেশে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বেরন্‌হাইম (Bernheim) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিমতে ইতিহাস আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেন। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মানেরা এ বিষয়ে যত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তত দূর অন্য কোন জাতির ঐতিহাসিকগণ হইতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সেনোবো (Seignobois) ও লাঙলোয়া (Langlois) সমাজবিজ্ঞানে এই পদ্ধতি কতদূর প্রযোজ্য, তাহা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের আলোচনার বিষয় একই—মানব। তবে সমাজতত্ত্বে মানবসংহিতার (Communalism) দিক্ হইতে ব্যক্তিত্বকে দেখিতে হইবে। এখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য কোনরূপ নাই। ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি এখানে কার্য্যকরী হয় না। সংহতির পূর্ত্তির জন্যই ব্যক্তির আবশ্যকতা। সমাজই ব্যক্তির ইতিহাস, ব্যক্তিও তাহার কার্য্যাবলী লইয়াই ব্যস্ত। ব্যক্তির কার্য্য সমাজের পরিপন্থী কি না, তাহার বিচার ইতিহাস করিয়া থাকে। জার্ম্মান দেশের এই পদ্ধতি অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অনুসৃত হয়। এখন সকল দেশের পণ্ডিতেরা একরূপ একবাক্যে এই পদ্ধতি ইতিহাস আলোচনার সুষ্ঠু পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এইবার দার্শনিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই। কার্য্যকারণপরম্পরার সূত্র ও ঘটনা একত্র সমাবেশ করিয়াই ইতিহাস নিশ্চেষ্ট থাকে না। জগতের যে কার্য্যকারী শক্তি সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ কি এবং প্রত্যেক যুগধর্ম্ম ও তাহার কার্য্যকরী শক্তি ইতিহাসের দ্বারা কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে সে সমস্যা পূরণে সহায়তা করিবার জন্য ইতিহাস চেষ্টা করিয়া থাকে। দার্শনিক পরাবিদ্যায় "মানবাত্মার স্বরূপ," "জগতের আদিকারণ যিনি এই জগৎকে সৃষ্ট করিয়াছেন ও ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতি" ও "আত্মার স্বাভাবিক জীবন ও নৈতিক জীবনের পার্থক্য" প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় ইতিহাস কতটুকু সহায়তা করিতে পারে বা করিয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। এই সমস্যাগুলির সমাধান সম্বন্ধে জীবনের উদ্দেশ্য কি, ইতিহাস তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে; যুগশক্তি কিরূপে মানবহৃদয়ে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারও একটা বিচার করিয়া থাকে। এই বিষয়গুলি প্রকৃত ইতিহাসের বিষয়ীভূত নয় সত্য, কিন্তু ইতিহাস

আলোচনা করিতে আমরা কেবল ঘটনা বা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমাদের পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক তত্ত্বগুলির মীমাংসা করিবার ইচ্ছা মনে স্বতই উদিত হইয়া থাকে। এই প্রশ্ন সমাধান চেষ্টাই ইতিহাসের দার্শনিক ধারা নামে কথিত হইয়া থাকে। পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, এখনও আমাদের দেশে এ শ্রেণীর ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হয় নাই, তবে আশা করিতে পারা যায়, শীঘ্রই কোন শক্তিশালী ঐতিহাসিক এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন। এই বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে রাজনীতি, আইন, সৌন্দর্য্যানুভূতি-নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নগুলির সমীচীন সিদ্ধান্ত দ্বারা ঐতিহাসিক প্রশ্নের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এইখানে দর্শনাভিমুখী ইতিহাস, ইতিহাসের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করে। ইহা নূতন একটা কিছুই নয়। চরিত্র-নীতির নিয়মবলে এ কার্য্য সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য পূর্ব্বসূরিগণ এই পথ অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন; শ্লাইমাখের ও হেগেল প্রভৃতি জার্ম্মান মনীষীরা এই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুসৃত হইলে ইতিহাসের মূল্য আদর্শানুযায়ী নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একটু গোলমাল উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই আদর্শের স্বরূপ কিরূপ হইবে—ভাবগত বা রূপরসগত বাস্তব আদর্শ? বাস্তব আদর্শকে ত একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আবার কেবল চরিত্রের দিক হইতে মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলে সফল হইবার সম্ভাবনা কমই দেখা যায়; কারণ, চরিত্রের মাপকাঠি কোথা হইতে পাওয়া যায়? —ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা করিয়াই ত চরিত্রের মাপকাঠি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তাহা হইলেই সেই তর্কশাস্ত্রের চক্রাবর্ত্তে (Reasoning in a circle—*Petitio Principii*) পড়িতে হইল। তাই বলিয়া যে এ বিষয়ের আলোচনায় কোন ফললাভ হইবে না, তাহা বলা যায় না। ঐতিহাসিক, ঘটনার জনয়িত্রী-শক্তির যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলেও ভগবদ্দত্ত সামর্থ্যবলে যে কতকটা পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এখানে চরিত্রের বিকাশ সম্বন্ধেও একটা কথা উঠিব। এই জীবনেই কি আমরা আত্মানুভূতি করিতে পারি? যদি আমাদের চরিত্রের বিকাশ আদর্শানুযায়ী এই জন্মেই না হয়, তা হইলে কি হইবে?—পরজন্মে আমরা সেই সূত্র ধরিয়া আত্মদর্শন করিতে কি পারিব না? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও আমাদের দেশের দার্শনিক মত আলোচনা করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাই না। তবে একটা কথা এখানে বলিতে চাই, ইতিহাস মানবের উন্নতি ও অবনতি লইয়া ব্যস্ত। দার্শনিক ইতিহাসে জাতির শুধু উন্নতির দিকই আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু আর একটা কথাও এখানে বিচার করিতে হইবে। আত্মদর্শন করিতে হইলে আদর্শ ভাবের পশ্চাতে ছুটিতে হয় সত্য, কিন্তু এই ভাবকে আপনার করিবার চেষ্টাও চাই। এই ভাবকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই আদর্শকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা ও উন্নতি-প্রবণতাবলে জগৎ যাহার অভিমুখে ছুটিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য ব্যগ্র—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সেই সার্ব্বজনীন আদর্শের অনুসরণ—এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে সত্য, আর এই দু'য়ের সমন্বয় করাও বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়;—তথাপি বলিতে হইবে, প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনা, সার্ব্বজনীন

ভাবের দিকে কতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহা দেখিয়াই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সীমাবদ্ধ ও অসীমের ভাবটা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে—সীমাবদ্ধের সংহতি অসীম নহে; অসীম সীমাবদ্ধের ভিতর রহিয়াছে, কিন্তু ব্যষ্টি বা সমগ্রভাবে নাই, অংশতঃ আছে; আর অসীম সর্ব্বদাই সীমাবদ্ধ জিনিসের উৎপাদন করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় দিতেছে। ইতিহাস সীমাবদ্ধ ঘটনার বিবৃতি করিয়া অসীমের দিক্ হইতেও তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিবে। দার্শনিক ইতিহাস ও ইতিহাসে আর একটু পার্থক্য এই, দার্শনিক ঐতিহাসিকেরা সাধারণ ঐতিহাসিকের ন্যায় স্থান, কাল, পাত্রের দিকে মনোযোগী হন না। তাঁহারা স্থান, কাল, পাত্রের অতীত অসীমের সন্ধানেই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের দিকে অবহিত হওয়া দার্শনিক ঐতিহাসিকেরও কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, এ শ্রেণীর ঐতিহাসিকদিগের অগ্রণী জোসেফ্ ফেরারি (Joseph Ferrari) এ দিকে মনোযোগী হইয়াছেন।

আজকাল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের সঙ্গে দু'এক জন পণ্ডিত আখ্যানকল্প বা romantic ইতিহাসেরও ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মেকলে ও ফ্রুড্ এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক। তবে ইঁহাদের লেখা ঐতিহাসিক আখ্যান নয়। আখ্যানকল্প ইতিহাস ও ঐতিহাসিক আখ্যান এক জিনিস নয়। ঐতিহাসিক আখ্যানে ঐতিহাসিক উপাদান চিত্রের backgroundরূপে ব্যবহৃত হয়। মূল চিত্রটী কিন্তু একেবারে অমূলক কাল্পনিক থাকিয়া যায়। কিন্তু আখ্যানকল্প ইতিহাসে ঐতিহাসিক প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান-রীতি ও প্রকৃত দৃশ্যের অবতারণপদ্ধতিতে গল্পকথকের ভঙ্গীবিলাসের চরম নৈপুণ্য অবলম্বন করিয়া, আখ্যান-বস্তুটী জলন্ত ও জীবন্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য—ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ, জীবন্ত ব্যাপার করিয়া তোলা, এবং অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে বর্ণনার সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবধানের দূরত্ব মন হইতে অপসারিত করিয়া দেওয়া। অতীতের ঘনান্ধকারের মধ্যে ক্ষীণালোকে ভীতি-চকিত-আড়ষ্ট পাঠকের সানন্দ আগ্রহকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিবৃতি-বর্ত্তিকার মাধুরীতে তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। এইটুকুই তাঁহার প্রধান গুণপণা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক বলেন, "History is not a Shilling shocker"; ইতিহাসে প্রকৃত ঘটনার সত্যসন্ধ বিবৃতি থাকা চাই—ঘটনা যেমনটী পাইবে, ঠিক তেমন করিয়াই তাহা চক্ষুর সম্মুখে ধরিবে—তুমি যে সত্যানুসন্ধিৎসু, এ কথা ভুলিয়া, শুধু পাঠকের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া, অনুমানের সাহায্যে নাটকীয় পদ্ধতির সার্থকতা সম্পাদন করিলে চলিবে না। দার্শনিক ঐতিহাসিক কিন্তু অনুমানের একেবারে অপক্ষপাতী নন। তিনি বলেন, অনুমানের দরকার—ঘটনাকে নাটকীয় পদ্ধতিতে বর্ণনা করিবার জন্য নয়, সেই সমুদয় হইতে আমাদের উপকারে আসিতে পারে, এইরূপ ভাব নিষ্কর্ষ করিবার জন্য। আখ্যানকল্প ইতিহাসে ঘটনা নাটকীয় আকার ধারণ করে, বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে সেই ঘটনা শ্রেণীবিভক্ত হয় এবং দার্শনিক ইতিহাসে তৎসমুদয় হইতে সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হয়।

বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রণয়ন-কার্য্য এই তিন প্রণালীদ্বারাই সম্ভবপর হইবে। আপাততঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া আমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তারপর যখন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে পারিব, তখন ইতিহাসের দর্শনের দিক্ আলোচিত হইবার আশা করিতে পারি। বাঙ্গালীর সর্ব্বাঙ্গীন ইতিহাস এখনও হয় নাই। জ্ঞানের বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া, তমসাবৃত যুগে আলোক-সম্পাত করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন—যাঁহাদের সাধনার ফলে বাঙ্গালার ইতিহাস-চর্চ্চা প্রসারলাভ করিয়াছে, সেই সকল অক্লান্ত-কর্ম্মীদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামপালের ভূমিকায় ও ধর্ম্মঠাকুরের ব্যাখ্যানে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড়লেখমালায় ও পালরাজগণের আলোচনায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ গৌড়রাজমালায় ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "Palas of Bengal" ও "বাঙ্গালার ইতিহাসে" প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কথাই আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি বলিতে হইবে—প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কথাই আজিও সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। আমার বোধ হয়, এ কার্য্য সময়-সাপেক্ষ। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলার প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলিত না হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস আশা করা যাইতে পারে না।

কয়েকখানি প্রাদেশিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে বাঙ্গালার সকল জেলার ইতিহাস লিখিত হউক, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। এখানে একটা কথা বলিতে চাই। কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে হইলে যে সকল জাতি সেই দেশে বাস করিয়া থাকে, তাহাদের বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদের চরিত্রগত বিশেষত্ব কোথায়, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে—তাহাদের সভ্যতার ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে; আর বুঝিতে হইবে, কোন্ অবস্থাবশে সমাজ-বদ্ধ হইয়া তাহারা উন্নতি বা অবনতির পথে চলিয়াছে। গ্রীসের ইতিহাসে তাহাদের শিল্পানুরাগের চিত্র না থাকিলে তাহা গ্রীসের ইতিহাস বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না, রোমের ইতিহাস বুঝিতে হইলে তাহাদের প্রচারিত আইন-কানুন না বুঝিলে রোমের ইতিহাসের কথা অজ্ঞাতই থাকিবে। বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইলে বাঙ্গালীর প্রাণ, ধর্ম্ম ও সমাজকে না বুঝিলে, বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা হইবে। কারণ, বাঙ্গালী ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল ও আছে—আর বাঙ্গালী সমাজের সুশীতল ছায়ায় একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতে যতটা ভালবাসে ততটা অন্য কোন জাতি বাসে না।

অনুসন্ধানের উপর যখন ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, তখন বাঙ্গালার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে একজনের চেষ্টায় যে হইবে, তাহা বলিয়া আমাদের মনে হয় না; সমবেত চেষ্টা চাই। আপনাদের ন্যায় সুধী সজ্জনকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না যে, "সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা"। জেলায় জেলায় বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির ন্যায় সমিতির সৃষ্টি হউক। সমবেত চেষ্টায় ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে সত্যসন্ধ সাহিত্যিকবৃন্দ বদ্ধপরিকর হউন। সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে হইলে হিংসা-দ্বেষ দূর করিতে হইবে, যশের মুকুট আপনার মাথায় ধারণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে হইবে, আপনার কৃতিত্ব

প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না। শুধু সত্যের দিকে চাহিয়া, আত্মাভিমান ভুলিয়া, কর্ত্তব্যের প্রেরণায় কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

মনের ভিতর কোনও সংস্কার লইয়া কার্য্য করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। অনুসন্ধিৎসুর মন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় থাকা উচিত। যে চিত্র তাঁহার সম্মুখে পতিত হইবে, তাহারই নিখুঁৎ ছবি যেন উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। দর্পণের উপমা ছাড়িয়া ফটোগ্রাফের উপমা দেওয়াই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। কারণ, দর্পণের চিত্র বিপরীতমুখী হয়—তাহার পর বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আমরা তাহাকে ঠিক করিয়া লই। ফটোগ্রাফ যন্ত্রে চিত্রের অবিকল প্রতিলিপিই পাওয়া যায়। সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা থাকা উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া কোন কর্ম্মীর ভুলভ্রান্তি দেখিলেই তাহার উপর খড়্গহস্ত হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ত্রুটি-বিচ্যুতি মানুষেরই হইয়া থাকে। দশজনের আলোচনার ফলে মিথ্যা-মেঘ কাটিয়া গিয়া, ইতিহাসের আকাশে সত্য-সূর্য্য প্রকাশিত হইবে। বিরুদ্ধ মত গুলিকে যুক্তির নিকষে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীকে ঘৃণার চক্ষে দেখা কখনই কর্ত্তব্য নয়। কারণ, এ কথাটা মনে রাখা উচিত, মানুষ আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। মনে রাখা উচিত, সুযোগ ও সুবিধার অভাবে পরীক্ষিত ঘটনাগুলির সম্যক্ পরিদর্শন না করিয়াই বা বিচার-বুদ্ধির প্রকৃত চালনা না করিয়াই তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এ কথা মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। আর আজ যিনি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, অপরের অনুসন্ধানফলে প্রকাশিত ঘটনাগুলি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি যে মত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নয়।

অনুসন্ধান-সমিতির পরিচালনভার সুদক্ষ ঐতিহাসিকদিগের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের নেতৃত্বে ও পরামর্শমতে কার্য্য করিলে সুফল যে হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। শরৎকুমার, অক্ষয়কুমারের নেতৃত্বে পরিচালিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্যাবলীর দ্বারা বাঙ্গালা দেশে ইতিহাস-রচনার যে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা ইতিহাস অনুশীলনকারীকে আর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। এই সঙ্গে গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের রাঢ় দেশে একটি এইরূপ অনুসন্ধানসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেশ কার্য্য করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদের কার্য্যের গতি কিঞ্চিৎ শ্লথ হইয়া গিয়াছে। আশা করি তাঁহারা পূর্ব্বেকার উদ্যমের সহিত পুনরায় আপনাদের উদ্দিষ্ট পথে চলিবেন। নবপ্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান-সমিতিগুলির জন্য কলাভবন নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে সংগৃহীত ঐতিহাসিক দ্রব্য-সম্ভার কোথায় থাকিবে? কলিকাতায় সাহিত্য-পরিষদে, রঙ্গপুর ও কুমিল্লা শাখাভবনে ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায় এইরূপ অনেক প্রাচীন নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। জেলায় জেলায় এইরূপ চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হইতে থাকুক, সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের আলোচনার প্রসারও বর্দ্ধিত হউক।

আমার বক্তব্য যাহা, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। ইতিহাস-প্রণালী কিরূপভাবে চালিত

হওয়া উচিত, তাহারই একটা দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি—নূতন কিছু বলি নাই; বলিবার স্পর্দ্ধাও রাখি না। তবে সুধীসজ্জন-প্রদর্শিত বিভিন্ন পথ-সকলের আলোচনা করিয়া, যে পথ ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে সুফল ফলিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, সেই পথপরিচয় আপনাদিগকে দিলাম মাত্র। আপনারা সুধী জন, এ পথ ধরিয়া চলা উচিত কি না, তাহার বিচার করিয়া দেখুন।

পরিশেষে ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন আমরা কার্য্য করিবার শক্তি—সংবেতভাবে কার্য্য করিবার শক্তি ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই। স্বার্থসিদ্ধির জন্য, অর্থলাভ বা যশোমাল্যে বিভূষিত হইবার জন্য যেন আমরা সত্যকে বিকৃত করিয়া বা মিথ্যাকে সত্যের আবরণে আবৃত করিয়া দশের নিকট উপস্থাপিত না করি। প্রাচীন কালে জগতের অন্যান্য দেশবাসীরা আমাদের সত্যানুরাগের যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—সে চিত্র যেন আমরা কোনরূপে মসী-মলিন হইতে না দিই। বংশানুক্রমপ্রভাবে, উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট যে সত্যনিষ্ঠা আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা যেন চিরউজ্জ্বল থাকে। আর সত্যের প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া যেন আমরা সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। সবল মনের অধিকারী হইয়া, বাহিরের প্রভাবে চালিত না হইয়া বা ঐতিহাসিক দলবিশেষের আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইয়া, কেবলমাত্র বিবেক-বুদ্ধির প্রেরণায় ধ্রুব সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠা রাখিয়া, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা হিংসাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া—কর্ম্ম করিতে পারি। সত্যভাষণে যেন আমাদের কখনও কুণ্ঠা না আসে। আমরা যেন বৈদিক ঋষির ন্যায় ঐতরেয় আরণ্যকের বাণী প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতে পারি,—

"ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু।
তদ্বক্তারমবত্ববতু বক্তারমবতু বক্তারম্‌॥"

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ



সঙ্গণিকা

৺বৈকুণ্ঠনাথ সেন

রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন সম্প্রতি ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা দীর্ঘ জীবন বলিতে হইবে। ইনি বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদের) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল ও নেতা ছিলেন। কংগ্রেসের সহিত তাঁহার আমরণ ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর তিনি সর্ব্বপ্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাতে বাংলাদেশের অন্তরায়িত যুবকদিগের প্রতি অবিচারের কথা যে ভাবে প্রকাশ

করেন তাহাতে তাঁহার নির্ভীক স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ভারত-সভার সভাপতিরূপে তিনি অনেক কাজ করেন এবং দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা যুক্তি-বহুল হইত ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ থাকিত। তিনি যৌবন কাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দেশহিতকর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার মত স্বদেশহিতৈষী লোকের বিয়োগে বাংলাদেশ, বিশেষভাবে বহরমপুর, একজন অকৃত্রিম সুহৃৎ ও নেতা হারাইল।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় গত ২৫শে বৈশাখ কাশীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পিতার সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও সাধনা তাঁহার পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাহা শান্ত, সংযত, নিষ্ঠাবান হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ। আজ কাল সে নিষ্ঠা, সে শান্ত ভাব দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত কাজেই ধর্ম্ম ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তিনি "এডুকেশন গেজেট্" সম্পাদন ও "ভূদেবজীবনী", "সদালাপ", "অনাথবন্ধু" প্রভৃতি গ্রন্থ ও উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী অনুরূপা ও ইন্দিরা দেবীকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাংলা সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত আছেন।

৺কাশীচন্দ্র ঘোষাল

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। বাল্যকালে তাঁহার ইংরাজি পাঠের সুবিধাও হয় নাই। কিন্তু অধিক বয়সে তিনি উৎসাহ, অধ্যবসায় ও অক্লান্ত নিষ্ঠার সহিত ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি সুন্দর গান ও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। কাশীবাবু বাংলাদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি তাঁহার বড়ই অনুরাগ ছিল। রবিবাবুর কবিতা ও গানের প্রচারও তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন।

জহরলালের কারাদণ্ড

বিগত ৬ই জুন শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু কারামুক্ত হইয়াছেন। তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র জহরলাল নেহেরু পুনরায় কারারুদ্ধ হইয়াছেন। পিতা কারামুক্ত হইলেন, পুত্র কারারুদ্ধ হইলেন। কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হওয়াতে

জহরলালের প্রথমবার কারাদণ্ড হয়। বর্ত্তমান কারাদণ্ড এলাহাবাদে বিলাতী কাপড় বিক্রয়ের বিরুদ্ধে 'পিকেটীং' করার অপরাধে। নেহেরু পরিবারের বিলাসিতা উত্তর-ভারতে সুবিদিত। জহরলাল বাল্যাবধি রাজসুখে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। নিজেও পরম বিলাসী পুরুষ ছিলেন। তিনি দশবৎসরেরও বেশী বিলাতে—হ্যারো ও কেম্‌ব্রিজে—কাটাইয়াছেন। তাঁহার চাল-চলন, হাব-ভাব সমস্তই ইংরাজের মত ছিল। পাঞ্জাবের হাঙ্গামার তদন্ত উপলক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়। জীবনের মুখ একেবারে ফিরিয়া যায়। পরশ-পাথর স্পর্শমাত্রে যেমন লোহাকে সোনা করিয়া তুলে তেমনি গান্ধীর পবিত্র সংস্পর্শ কতগুলি জীবনে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। জহরলালের সত্যাগ্রহ-মন্ত্রে দীক্ষা ও সরল জীবনযাত্রাপদ্ধতি তাঁহার পিতা মতিলাল নেহেরুকে অসহযোগ আন্দোলনে টানিয়া আনে। পুত্রের আদর্শে পিতার পরিবর্ত্তন ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে জহরলালের বীরমাতা স্বরূপরাণীর হৃদয়স্পর্শী বাণী। জননী বলিতেছেন—"আজ আমার 'আনন্দ ভবন' নিরানন্দময় হইয়াছে। কুসুমশয্যায় লালিত পালিত আমার পুত্র আজ কারারুদ্ধ, এ কথা মনে করিতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যে জন্য আমার কুসুমকোমল বালক এই কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, দেশবাসী সকলে তাহা গ্রহণ করিলে আমার এ মর্ম্মান্তিক বেদনা ও পুত্রের কষ্ট সার্থক হইবে।" মাতৃহৃদয়ের এ গভীর বেদনা, এ কাতর প্রার্থনা বৃথায় যাইবে না, যাইতে পারে না।

গোপবন্ধু দাস

নবীন যুগে যাঁহারা উড়িষ্যার উন্নতিচেষ্টায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস তাঁহাদের ভিতর প্রধান একজন। ওকালতীতে তাঁহার বেশ পশার ও প্রতিপত্তি হইতেছিল। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে তিনি নানা ভাল কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি জাতীয়-জীবনের উন্মেষক না হওয়ায় তিনি শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র ও শ্রীযুক্ত গোদাবরী মিশ্রের সাহচর্য্যে "সত্যবাদী আশ্রম" স্থাপন করেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি নিজের ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তাহাতে ঐ ভীষণ দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইবার অনেক সাহায্য হয়। এই সময়ে কতিপয় রাজকর্ম্মচারীর ব্যবহারে তিনি এতদূর ব্যথিত ও বিচলিত হন যে আমলাতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া মহাত্মা গান্ধীপ্রবর্ত্তিত অসহযোগমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার চেষ্টায় উড়িষ্যাদেশে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার হয়। অসহযোগবার্ত্তা প্রচার করিয়া তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন এবং গত বৎসর রাজদ্বারে আইন অমান্য করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। কিন্তু বিচারে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভ করিয়া গোপবন্ধু আরো উৎসাহের সহিত অসহযোগ প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নীলকান্ত ও গোদাবরী মিশ্রের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং গোপবন্ধু পুনরায় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের তিনটী

বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। গ্রেপ্তার হইবার সময়ে গোপবন্ধু উড়িষ্যাবাসীর নিকট একটী নিবেদন প্রকাশ করিয়া সমস্ত উড়িষ্যাবাসীকে স্বরাজ সাধনায় আহ্বান করিয়াছেন।

"ইজিপ্ট্" জাহাজ ও ভারতীয় লস্কর

পি এণ্ড ও কোম্পানীর "ইজিপ্ট্" একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ। ঐ জাহাজ বিলাতী ডাক, অনেক যাত্রী, বিস্তর খালাসী ও দেড়কোটী টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য লইয়া গত ২০শে মে ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূলস্থ ব্রেষ্ট্ বন্দরের কাছাকাছি একখানি ফরাসী জাহাজের ধাক্কা লাগিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। ইহাতে বিস্তর লোক প্রাণ হারাইয়াছে। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় লস্করদের অনেকরূপ প্রতিকূল সমালোচনা হইতেছে ও নানাবিধ অভিযোগেরও সৃষ্টি হইয়াছে। পিস্তল যে তাহাদের হাতে ছিল না, ও গুলি যে তাহারা করে নাই বা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় সে বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণ পরে পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে সমুদ্রগর্ভ যখন বিপদে পরিপূর্ণ ছিল, যে কোনও মুহূর্ত্তে টর্পেডো যখন জাহাজ ডুবাইয়া দিতে পারিত, সে সময়ে প্রাণের মায়া না রাখিয়া তাহারা অবিচলিতভাবে জাহাজের কাজ করিয়াছে। সকলেই জানেন চট্টগ্রামের মুসলমানগণ কিরূপ সাহসী ও কর্ম্মঠ। তবে একটা কথা আছে। বিলাতে কাজের অভাবে অনেক ইংরেজ নাবিক বেকার বসিয়া আছে। ভারতীয় লস্করের দ্বারায় কম বেতনে বেশী কাজ পাওয়া যায় এবং তাহারা প্রায়ই মাতাল হয় না। সেই জন্য ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংরেজ নাবিক আঁটিয়া উঠিতে পারে না। অনেকে অনুমান করেন যে লস্করদের তাড়াইয়া তাহাদের স্থানে ইংরেজ নাবিক আনিবার অভিপ্রায়ে লস্করদের উপর "ইজিপ্ট্"-ডুবির ব্যাপারে ভীরুতা ও পৈশাচিকতার কলঙ্ক আরোপ করা হইতেছে। এ কথা সত্য কি না তাহা জানিবার উপায় আমাদের নাই। তবে লস্করদের নিন্দা নূতন নয়। বিলাতের একদল লোক সুবিধা পাইলেই লস্করদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, "ইজিপ্ট্"-ডুবির ব্যাপার তদন্ত করিবার জন্য বিলাতের বোর্ড্ অফ্ ট্রেড্ যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন সেই কমিটি কি বলেন জানিবার জন্য এ দেশের লোক উৎসুক থাকিবে।

মুলসীপেটার সত্যাগ্রহ

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত মুলসীপেটা তালুকে মাউলি নামে তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর বাস। এই মাউলি জাতির শৌর্য্যে ও বীরত্বে শিবাজীর মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই জন্য মাউলিরা মহারাষ্ট্রদের অত্যন্ত প্রিয়। ইহাদের বাসভূমি মুলসীপেটার অদূরে একটী বাঁধ বাঁধিয়া তাতা কোম্পানী বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। বাঁধটি বাঁধিলে মুলসীপেটা জলমগ্ন হইয়া যায়। তাই ইহা কিনিয়া লইবার জন্য তাতা কোম্পানী গভর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সরকারের ভূমিক্রয় আইন (Land Acquisition Act) অনুসারে মুলসীপেটা কিনিয়া লইবার অনুমতি পান। কিন্তু মাউলিরা তাহাদের পৈতৃক

বাসভূমি বিক্রয় করিতে কিছুতেই সম্মত হয় না। তাহারা তাঁহাদের বাসভূমি রক্ষার্থে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করে এবং সমস্ত মারহাট্টিদের উৎসাহে ও আনুকুল্যে উৎসাহিত হইয়া যে বিরাট সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় তাহার ফলে তাতা কোম্পানীর সঙ্গে প্রথমে একটা রফা নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু তাহার কিছুদিন পরেই কোম্পানী তাঁহাদের পূর্ব্বসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টিত হন। মাউলিরা আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলে মিলিয়া বাঁধ দেওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। অভিযোগ এই যে তাতা-কোম্পানীর লোকেরা মাউলিদের জোর করিয়া হটাইয়া দিতে গিয়া ছোট বড় নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে আঘাত করিয়াছে। অভিযোগের সত্যতা এত দূর হইতে জানিবার সম্পূর্ণ সুযোগ নাই। পরাঞ্জপে, কেলকার, ফাড়কে প্রভৃতি মহারাষ্ট্র জননায়কগণ মাউলিদের সাহায্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। সুদূর নাগপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থান হইতে দলে দলে মারহাট্টা যুবক আসিয়া এই সত্যাগ্রহে উৎসাহের সহিত যোগ দিতেছেন। কাহারও কাহারও ১৪৪ ধারা অমান্য করার অপরাধে কারাদণ্ড হইয়া গিয়াছে। নাগপুর নেতা ডাক্তার মুঞ্জীর অধিনায়কত্বে মহারাষ্ট্র দেশবাসীগণ এক বিরাট আলোচনা সভা আহ্বান করিয়া এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয়ে ব্যাপৃত হইয়াছেন। মাউলিরা তাহাদের সঙ্কল্পে অটল রহিয়াছে। দেশীয় বণিকের সুবিধার কথা স্মরণ করিয়া অনেকে মাউলিদের এই সংগ্রাম অবিবেচনার কার্য্য মনে করিতেছেন। ভাবোচ্ছ্বাসের বশে মুগ্ধ হইয়া দেশীয় শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন বলিয়া অনেকে মহারাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ভাবিবার বিষয় এই যে, আজ দেশীয় বণিকের সুবিধার জন্য, যে আইনের সমর্থন করিয়া পৈত্রিক ভিটার প্রতি আমাদের দেশের লোকের যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ আছে, তাহাকে তুচ্ছ করা উচিত বলিয়া মনে করা হইতেছে, বিদেশী বণিকের স্বার্থের জন্য যদি কোনও দিন ঐরূপ কাহাদের পৈতৃক ভিটা হইতে অপসৃত করিবার প্রস্তাব হয় এবং সরকার তাহার সমর্থন করেন তখন তাহার প্রতিবাদ করিবার উপায় থাকিবে কি? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। নদীমাতৃক বাংলা দেশে পাট ও অন্যান্য কারবারের জন্য বিদেশী বণিকের নদীর উপকণ্ঠে স্থানের প্রয়োজন হয়। সেই জন্য যদি গঙ্গার দুই পারের অধিবাসীদিগের পৈত্রিক গৃহ ত্যাগ করিবার কোনও সম্ভাবনা হয় তবে তাহাদের মনের ভাব কিরূপ হইতে পারে ইহা ভাবিলেই আমরা ইহার তীব্রতা অনুভব করিতে পারি। এই সব কারণে মুলশিপেটার ব্যাপারটিকে একটা প্রাদেশিক ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া মনে করা যায় না। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র ভারতের সংগ্রাম। এই জন্য বাংলা মুলসীপেটার দিকে চাহিয়া আছে।

ইঞ্চ্‌কেপ-কমিটি ও ব্যয়সঙ্কোচ

অনেক ঢাক-ঢোল বাজাইয়া ভারতগভর্ণমেণ্টের ব্যয়বাহুল্য কমাইবার জন্য একটা কমিটি বসিয়াছে। লর্ড ইঞ্চকেপ্ এই কমিটির চেয়ারম্যানস্বরূপে এদেশে আসিতেছেন। কিন্তু কমিটির সদস্যদের নাম পড়িয়া আমাদের বিশেষ আশা হইতেছে না। বঙ্গদেশ হইতে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, স্যার টমাস্ কেটো, এবং স্যর আলেক্‌জান্দার্ মারে নিযুক্ত হইয়াছেন।

তাঁহারা তিন জনেই ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজনীতিতে তাঁহাদের কতদূর অভিজ্ঞতা আছে তাহা তাহা বলা কঠিন। শুধু ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ হইলেই গভর্ণমেণ্টের ব্যয়বাহুল্য কমাইবার পক্ষে সুপরামর্শ দিবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকে বলিয়া মনে হয় না। এই কমিটিতে সার দাদিবা দালাল ও পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের নিয়োগ সমীচীন হইয়াছে। ইহাঁরা যোগ্য ব্যক্তি। ব্যয়সঙ্কোচ সম্বন্ধে ইহাঁদের অভিমতের মূল্য আছে। এই কমিটিতে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় একজন রাজনীতিজ্ঞ পুরুষের নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত ছিল। ভারত-গবর্ণমেণ্টের ব্যয়বাহুল্যের সঙ্গে ইহার রাজনৈতিক পলিসির একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই পলিসির আমূল পরিবর্ত্তন না করিতে পারিলে এখানে কিছু, ওখানে কিছু এরূপ করিয়া ব্যয় কমাইলেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। এই কমিটির, ভারত গভর্ণমেণ্টের সামরিক সাজসজ্জার জন্য অথবা অর্থব্যয় অথবা অন্য পলিসির বিষয়ে কোনও কথা বলার ক্ষমতা আছে কি না প্রকাশ নাই। এই ক্ষমতা না থাকিলে কমিটির কার্য্য কতদূর ফলদায়ক হইবে তাহা সন্দেহের বিষয়।

রুষ মনস্বীদের অন্নকষ্ট

যুদ্ধ বিগ্রহ, অন্তর্দ্রোহ ও দীর্ঘকালব্যাপী অজন্মার ফলে রাশিয়ায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি অনেক রুষ মনস্বী খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অনেকে দুরবস্থার চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক বিখ্যাত রুষ পণ্ডিত পল্ ভিনোগ্রাডফ্ রাশিয়ার বিদ্বজ্জনদের অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাবের কথা জানাইয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একটী পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি অতি মর্ম্মস্পর্শী, দৈনিক কাগজগুলিতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে নিত্য দুর্ভিক্ষ, সে আবার অন্যদেশের দুর্ভিক্ষে অর্থ সাহায্য করিবে কি করিয়া ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু আমাদের নিজের গৃহের অভাব বা কষ্ট উপস্থিত হইলেও আমরা প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজনের দুঃখে ব্যথিত না হইয়া পারি না। বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে যোগ রহিয়াছে তাহা ক্রমে বাড়িয়া চলিতেছে ও চলিবে। এই সাহায্য-ভাণ্ডার আবার বিশেষভাবে রাশিয়ার দুর্দ্দশাগ্রস্ত মনস্বীদিগের জন্য। রাশিয়ার বুধমণ্ডলী অভাব অভিযোগের মধ্যেও যেরূপ ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে আত্ম-নিয়োগ করিয়া জগতের সেবায় রত আছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে মৃত্যুকবল হইতে বাঁচাইতে না পারিলে জগতেরই সমূহ ক্ষতি। আজ রাশিয়া ভারতের দ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রার্থীকে ফিরাইতে নাই, ইহাই ভারতের চিরন্তন ধর্ম্ম। যিনি যাহা কিছু দয়া করিয়া পাঠাইতে চাহেন তাহা "শান্তিনিকেতন" ডাকঘরের ঠিকানায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইলে তিনি তাহা যথাস্থানে ভারতের নামে প্রেরণ করিবেন।

বিদ্বজ্জনসভায় ভারতের প্রতিনিধি

জগতের বিদ্বজ্জনগণের মধ্যে পরস্পরের চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদান জ্ঞান-প্রচারের পক্ষে যে একান্ত প্রয়োজন তাহা সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের ফলে যুযুৎসু জাতিগণের মধ্যে এই আদান-প্রদান একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। শুধু তাহাই নয়, জার্ম্মাণ বা অষ্ট্রিয়ান্ মনীষীগণের সহিত ইংরেজ বা ফরাসী মনীষীগণের সদ্ভাবের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। যিনি যে দেশের লোক তিনি সেই দেশের পক্ষ লইয়া নিজেদের ত্রুটি অপরাধকেও সমর্থন করিয়া অপর পক্ষের বিরাগভাজন হন। ইহাতে ভাব বিনিময়ের কার্য্য যে চলা অসম্ভব তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এখন যুদ্ধাবসানে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর চোখ ফুটিয়াছে। তাঁহারা আবার পূর্ব্বেকার মত নিজেদের সাধন-লব্ধ বিষয়গুলি পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিয়া সত্যকে যাচাই করিয়া লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তাই জ্ঞানরাজ্যে পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহচর্য্য কি ভাবে হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য লীগ্ অফ নেশনস্ য়ুরোপের মনীষীশ্রেষ্ঠদের আহ্বান করিয়াছেন। এই কাজটি করিবার জন্য যে কমিটি গঠন করা হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ত্তা-শাস্ত্রের অধ্যাপক, Minto Professor of Economics ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লওয়া হইয়াছে। জগতের জ্ঞান-রাজ্যে ভারতবর্ষের স্থান যে য়ুরোপে স্বীকৃত হইল তাহা যে সুখের বিষয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-উপাধিধারী, এবং বার্ত্তাশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। তিনি ধীর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার নিয়োগে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু যে কমিটিতে "থিওরী অফ রিলেটিভিটি"র স্রষ্টা প্রফেসর আইনস্টাইন, রেডিয়মের আবিষ্কর্ত্রী ম্যাডাম কুরী, দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ বার্গস, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক ডক্টর গিলবার্ট মারে প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিতগণ আহুত হইয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে ঐরূপ বিশ্ব-বিখ্যাত, জগন্মান্য কাহাকেও যাইতে দেখিলে আমরা অধিকতর আনন্দ লাভ করিতাম। এই প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমেই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয়। ভারতের প্রতিনিধিরূপে তিনিই এই সভায় যাইলে যে সকল দিক হইতেই ভাল হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই—বিশেষতঃ তিনি এখন জ্ঞানের রাজ্যে একতা-প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অভাবে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কিম্বা ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এই দুইজনের একজন হইলে ভাল হইত। ইঁহাদের দুইজনই পাণ্ডিত্য-কীর্ত্তিতে পাশ্চাত্যজগতে বিশেষ পরিচিত।

কলিকাতার প্রথম বেসরকারী মিউনিসিপ্যাল্ চেয়ারম্যান্

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি মিষ্টার জে এন্ গুপ্ত কয়েক সপ্তাহের জন্য ছুটি গ্রহণ করায় তাঁহার স্থানে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সুযোগ্য সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন বেসরকারী ভারতবাসী এই পদে নিযুক্ত হন নাই।

শ্রীমতী জগরাণী দেবী

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের উপর যখন খুব অত্যাচার চলিতেছিল তখন যাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীদয়ালের স্ত্রী শ্রীমতী জগরাণী দেবী তাঁহার মধ্যে একজন প্রধান। তিনি দেড় বৎসরের শিশু কোলে লইয়া হাসিমুখে জেলে যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি তাঁহার স্বামীর শুধু গৃহকর্ম্মে ও গৃহধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী ছিলেন তাহা নহে, জনহিতকর কাজে তাঁহার স্বামীর প্রকৃত সহকর্ম্মিণী ও সহমর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি দরিদ্র ও অশিক্ষিতের মাতৃস্বরূপিণী ছিলেন। দরিদ্র বালকবালিকাদিগকে তিনি লেখাপড়া শিখাইতেন। তাঁহারই উৎসাহে ও যত্নে পণ্ডিত ভবানীচরণ "হিন্দি" নামক পত্রিকা পরিচালনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। সম্প্রতি এই এই মহামনা নারীর মৃত্যু হইয়াছে।

মান্দ্রাজে প্রথম মহিলা মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনার্

মাদ্রাজে সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টান জননায়ক ও হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত এম ডি দেবদাস মহাশয়ের পত্নী দেশের দরিদ্র রমণী এবং শিশুদের কল্যাণের জন্য বিস্তর পরিশ্রম ও যথেষ্ট স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন। সম্প্রতি এই মনস্বিনী নারী মান্দ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজে কোন মহিলা এই পদ প্রাপ্ত হন নাই।

বাংলার জল কষ্ট

আজকাল প্রতিবৎসরই গ্রীষ্মারম্ভে সূর্য্যের প্রখর তাপে সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি শুষ্ক হইয়া তৃষিত হইয়া উঠে। এবৎসর তাহা অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমস্ত বাংলা পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক পুষ্করিণী ব্যতীত ছোট খাট প্রায় সব গ্রামেরই পুষ্করিণী শুকাইয়া গিয়াছে। কূপ জলহীন। কখনও যাহা শোনা যায় নাই, রেলগাড়ী করিয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল পাঠান হইয়াছে। তাহাও আবার প্রতি সের তিন আনা চারি আনা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে! পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে লোকে পুণ্যসঞ্চয়ার্থে জলছত্র করিয়া জল দান করিত। পিপাসা নিবারণের জন্য রাজদ্বারে কখনও দেশকে ভিক্ষার্থী হইতে হয় নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আমাদের পুরাতন সমাজের ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থলে নূতন কোনও ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই। ব্রত পার্ব্বণের মধ্য দিয়া সমাজ-সেবার আদর্শ আমরা হারাইয়াছি। তাহার পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্যদেশে যে সমবেত উপায়ে গণের সেবার পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতিও আমরা অবলম্বন করিতে পারি নাই। আমরা একূল ওকূল দুকূল হারাইয়া সব নিঃস্ব হইয়া বসিয়া আছি। যখনই অভাবগ্রস্ত হই তখনই সরকারের নিকট ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হই না। সরকারের তহবিলে অর্থের অভাব—আমরা চেঁচাইলে বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই—অথবা থাকিলেও আমাদের নিজেদের তাহাতে কল্যাণ নাই। নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতে চেষ্টা না করিয়া হাত পা গুটাইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে নিজের দুর্গতিকে ডাকিয়া আনা হয়। নিজের

পারে দাঁড়াইয়া জীর্ণ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কূপ খনন tube wells প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে নিজেদের সমবেত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে জলের ব্যবস্থার জন্য সমবায় সমিতি করিয়া নিজেদের কৃষি ও পানীয় জলের অভাব মোচনের চেষ্টা করিতে হইবে। নিজেদের অভাব নিজেই মোচন করিতে বদ্ধপরিকর হইলে ভাগ্যবিধাতা সদয় হইবেন। এই দারুণ জলকষ্টের তাড়নায় যদি আমরা একটুও স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা পাই তাহা হইলে এই ভীষণ কষ্টও কতকটা সার্থক হয়।

কংগ্রেস্ কার্য্যকরী সভার লক্ষ্ণৌ বৈঠক

লক্ষ্ণৌ সহরে কংগ্রেস কার্য্যকরী সভার একটি বৈঠক বসিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। জনকয়েক জননায়ক বর্দ্দোলি সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য আরম্ভ করিবার প্রস্তাব করেন। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এবং খদ্দর প্রচার প্রস্তাব পুনর্গৃহীত হইয়াছে। তবে ব্যাপকভাবে আইন অমান্য করিবার জন্য দেশ কি পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সঠিক জানিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু, লালা ছনিচাঁদ প্রভৃতিকে লইয়া কমিটী গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। ইঁহাদের তদন্তের ফলের উপর কংগ্রেসের শেষ মীমাংসা নির্ভর করিবে।

বাঙ্গলাসরকারের ব্যয়সঙ্কোচ-কমিটি

বাঙ্গলা সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয় প্রায় দেড় কোটি টাকা অধিক। শাসনের ব্যয় না কমাইতে পারিলে সরকার দেউলিয়া হইয়া যাইবেন। তাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ব্যয় সঙ্কোচ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করেন, সে প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় পরিগৃহীত হইলেও এতদিন কোনও কাজ হয় নাই। সম্প্রতি বাঙ্গলাসরকার ব্যয় সঙ্কোচ করিবার উপায় নির্দ্ধারনের জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটিতে সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি সি, ডব্লু রোডস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর ও বাঙ্গলা সরকারের প্রাই সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কমিটির উপর প্রজাসাধারণের বিশ্বাস অতি অল্পই হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। সার রাজেন্দ্র ও রোডস সাহেব ইঞ্চকেপ কমিটির সদস্য। সেই কাজের গুরুভারের উপর এই কাজ যোগ্যতার সহিত তাঁহাদের পক্ষে পরিচালন করা এক প্রকার অসম্ভব। আর সার রাজেন্দ্র এবং মিঃ রোডস্ বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হইলেও শাসন ব্যাপারে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কতদূর তাহা জানা নাই। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় মিউনিসিপালিটির সভাপতি রূপে বেশ যোগ্যতার সহিত কাজ করিতেছেন। তাঁহাকে সেই কাজেই রাখিলে ভাল হইত। রায় অবিনাশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইলেও শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় সাধারণের বিদিত নহে। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ফাইনান্স বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় কৃষ্ণলাল দত্ত বাহাদুর, ব্যবস্থাপক সভার কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় অথবা শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্তের মত লোককে এই কমিটির সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত দেখিলে আমরা সুখী হইতাম।

রেলগাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি

রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীরও ভাড় বাড়িয়াছে; কিন্তু যাত্রীর সুখ সুবিধার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি নাই। গাড়ীতে অত্যন্ত ঠাসাঠাসি করিয়া যাইতে হয়। টিকিট কিনিবার সময়ও ধাকা ধাক্কি খাইতে হয় যথেষ্ট। অথচ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইতে রেলকোম্পানীর আয় সবচেয়ে বেশী কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় সকলের চেয়ে অধিক। মাদ্রাজের রেলযাত্রীদিগের একটি সভা আছে। রেলযাত্রীর সুখসুবিধা লইয়া অবিরত আন্দোলন করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। এরূপ সমিতি প্রত্যেক প্রদেশে হওয়া উচিত। এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত পার্থসারথি আয়েঙ্গার অ্যাকওয়ার্থ কমিটীর কাছে রেলগাড়ীতে ভিড়ের যে বিবরণ প্রদান করেন তাহা হইতে একটি উদাহরণ দিলেই যাত্রীদের কষ্টের কথা স্পষ্ট বোঝা যাইবে। প্রত্যেক দিনে যাত্রীদিগের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে এবং যত টিকিট বিক্রয় হয় তাহার হিসাব লইয়া তিনি গড় পড়তা প্রত্যেক ট্রেনের যা হিসাব করিয়াছেন তাহা এই—

প্রত্যেক ট্রেনে গড়পড়তা স্থান—

প্রথম শ্রেণী—৫৫৩—দ্বিতীয় শ্রেণী—২৯৭—তৃতীয় শ্রেণী—৫৬৪

টিকেট বিক্রয়—

প্রথমশ্রেণী—৮৬৫—দ্বিতীয় শ্রেণী—৮২৪—তৃতীয় শ্রেণী—৮৩৫

অবশ্য মাদ্রাজে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী নাই এবং প্রথম শ্রেণীর আরোহী দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে বেশী থাকে।

বধূ-নির্য্যাতন

আহিরিটোলার বধূনির্য্যাতন মামলা শেষ না হইতে হইতেই আরও তিন চারিটি মামলার কথা শুনা যাইতেছে। সুদূর দিনাজপুর হইতেও একটি ভীষণ নির্য্যাতনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও এরূপ নৃশংস ও বিসদৃশ ব্যবহার সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে না তবুও এতগুলি বীভৎস ব্যাপার যে কেন ঘটিয়া উঠা সম্ভবপর হইল তাহা দেশ ও সমাজের চিন্তা ও আলোচনার বিষয়। সামাজিক দৃষ্টির কোনও শৈথিল্য বশতঃ এরূপ অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইতে অবকাশ পাইতেছে কি না তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আহিরিটোলার ঘটনা লইয়া দেশে যেরূপ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে দেশের ধর্ম্মবুদ্ধি এখনও জাগ্রত আছে বলিয়া বুঝা যায়। আশা হয় যে এই আন্দোলনের ফলে দেশের ও দশের মঙ্গল হইবে।



নব্যভারত

চত্বারিংশ খণ্ড] শ্রাবণ, ১৩২৯ [৪র্থ সংখ্যা

বুদ্ধিবাদের প্রতিবাদ

য়ুরোপে একটি নূতন দার্শনিক মতের সৃষ্টি হয়েছে, পণ্ডিতেরা তার নাম দিয়েছেন anti-Intellectualism। আমি সেই সম্বন্ধে "কলিকাতা-রিভিউ" পত্রিকার জুন-সংখ্যায় কিছু লিখেছিলাম। এই মতটি সমাজ-চিন্তা এবং সংবেত-কর্ম্মের মধ্যে কতখানি প্রবেশ এবং প্রতিপত্তি লাভ করেছে তা দেখাতে গিয়ে আমাকে ব'লতে হয়েছিল যে, যেমন এক ধারে রাষ্ট্র সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতার প্রতিবন্ধক হচ্চে, যেমন সঙ্ঘ ব্যক্তিকে পরিস্ফুট করার এবং রাষ্ট্রের কবল হতে আত্মরক্ষার জন্য তার স্বাধীনতা, সত্ত্বা এবং স্বারাজ্য প্রমাণ ক'রতে বদ্ধ পরিকর, তেমনি অন্য ধারে সভ্যতা, জাতির এবং ধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে, ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি সমাজ এবং রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধেই লিখেছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতের প্রভাব অন্যত্রও দেখা যায়, বিশেষভাবে শিক্ষা-বিজ্ঞানে, মনোবিজ্ঞানে এবং দর্শনে।

এখন ঐ মতটির পরিচয় আবশ্যক। পরিচয় দেবার পূর্ব্বেই একটি সন্দেহ দূর করা উচিত। কেউ কেউ ব'লতে পারেন "ওটা য়ুরোপের জিনিষ, যে বিশেষ দর্শনের প্রতিঘাতে ওর উৎপত্তি হয়েছে, অর্থাৎ Utilitarianism, সেটিকে আমরা কখনও মানি না। হিন্দু ধর্ম্ম এবং সমাজ নীতির সঙ্গে সেটি খাপ খায় না অতএব বাজে মাল আমদানী ক'রে লাভ নেই।" তর্কের খাতিরে ব'লতে গেলে উত্তর এই রকম দিতে হয়:—Utilitarianism কে দর্শন না বল্লেও আমাদের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে এবং কর্ম্মে ওর ছাপ যে বেশ জোরেই পড়েছে তার প্রমাণ প্রভূত পরিমাণেই পাওয়া যায়; বঙ্কিম বাবুর প্রবন্ধগুলির উল্লেখই যথেষ্ট হ'বে। আর যদি তার ছাপ নাও প'ড়ে থাকে তা হ'লেও আজকালকার দিনে বিদেশী ব'লেই কোন মত অগ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়;—টীকা দেবার বিপক্ষে জনসাধারণের আপত্তির ফল মৃত্যু। সোজা ভাষায় ব'লতে গেলে যদিও ঐ মতটির তর্কবুদ্ধির বিপক্ষে বিদ্রোহ হতেই উৎপত্তি, তবুও বর্ত্তমানে সে মতটি এমন সর্ব্বব্যাপক হয়েছে যে সেটি পৃথিবীর অনেক ঘটনা এবং চিন্তার ব্যাখ্যা এবং বর্ত্তমান সভ্যতার গতি নির্দ্দেশ করতে পারে। Utilitarianরা সুখকেই মানুষের চরম উদ্দেশ্য ব'লে ঠিক করেছিলেন এবং এক বুদ্ধিই সে উদ্দেশ্য সফল ক'রতে পারে এই তাঁদের ধারণা ছিল। এ বুদ্ধি Reason নয়, এ কেবল অঙ্কের বুদ্ধি, এ বুদ্ধি

প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক উপায়কে বিচার করে সাধারণ হিতের গ, সা, গু, দিয়ে। কিন্তু এ রকম অঙ্ক ক'সে যে পৃথিবীতে চলা যায় না সে খবর একজন চাষাও জানতো। সে চাষাটি বলেছিল "Lads get on in this world not by Algebra, but by hard work"। এ খবরটি যখন পণ্ডিতদের কাণে এল—তাঁরা ব'ল্লেন "তর্কবুদ্ধি শেষ কথা নয়। এমন কি প্রথম কথাও নয়। সহজ বৃত্তিগুলি এই বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা প্রবীণ এবং তাদের দ্বারা কাজও বেশী হয়, সহজ এবং সুন্দরভাবে।" সেই সহজ বৃত্তির সাহায্যে, সমাজে বুদ্ধির অলক্ষিতে কতখানি কাজ হচ্ছে ও কতখানি কাজ হতে পারে তা' Russell এবং Graham Wallas তাঁদের বইগুলিতে দেখিয়েছেন।

বাঙ্গালীর আবার বিশেষ ক'রে পূর্ব্বোক্ত মতটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথকে বোঝ্‌বার দুটি দিক আছে—একটি বাংলা সাহিত্যের এবং অন্যটি বিশ্ব সাহিত্যের। এ দু'দিক দিয়ে দেখ্‌লেই আমরা বুঝ্‌তে পারবো—যে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে যা ব'লে আস্‌চেন, anti-intellectualistsরাও আজ তাই বল্‌তে চাইচেন। রবিবাবুর "Creative Unity" বইখানি তাঁদের ধর্ম্ম-পুস্তকের কাজ করবে। আমার একথা বল্‌বার উদ্দে রবিবাবুকে কোন একটী বিশেষ মতের মধ্যে আবদ্ধ করা নয়। আমার পূজ্যপাদ আ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সেদিন আমাকে বল্‌ছিলেন—"সমগ্র পৃথিবী দু'দিন পরে যা ব'ল্‌বে কবি আজ তাই বল্‌চেন; তাঁর কাছে সকলকেই আস্‌তে হবে।" আমি বলি, ইতিমধ্যেই কবির একটী কথা লোকেরা অস্ফুটভাবে বল্‌চে, সেই আধ আধ বুলির শক্ত নাম "anti-Intellectualism."

এখন পরিচয়ের কথা। মানুষের বৃত্তিগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়—বুদ্ধিমূলক, ভাবমূলক, আর ইচ্ছামূলক। ভাব আমাদের প্রেরণা দেয়, বুদ্ধি উদ্দেশ্য ঠিক করে এবং ইচ্ছাশক্তি সেই উদ্দেশ্যটাকে কার্য্যে পরিণত করে। ভাব আমাকে বল্‌চে বাড়ী থেকে ছুটে বের হও, বুদ্ধি বল্‌চে গোলদীঘিতে বেড়াতে যাও মন প্রফুল্ল হবে, স্বাস্থ্যও ভাল হবে; ইচ্ছাশক্তি আমাকে অন্যত্র না নিয়ে গিয়ে গোলদীঘিতে নিয়ে গেল। এই হচ্ছে সাধারণ ধারণা যে, এ বিভাগ ব্যবহারিক জগতে বিশেষ কোন কাজের ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু এর দ্বারা আরও অনেক অনেক কাজের কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। আমার প্রবৃত্তি হ'ল যে আমি অকারণে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। ঘরের বাইরে যাবার প্রবৃত্তি আমার ঘরের বার ক'রে দিলে, আমি রাস্তায় এলাম। বুদ্ধি কোনও পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিলে না, আমি ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলুম, পথই আমার পথ দেখিয়ে দিলে, যেতে যেতে আমি রাস্তার ধারে অশোক ফুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটা গুচ্ছ কাণে গুঁজলাম, খানিক পরে দেখি গঙ্গার ধারে এসে পড়ছি। ইচ্ছা-শক্তির ক্রীড়া আমি বুঝ্‌তে পারি নি, বুদ্ধি আমাকে পচা গলিতে নিয়ে যায় নি, কোন্ অদৃশ্য অভিজ্ঞতা আমাকে চৌরঙ্গীর মোড়ে হাওয়াগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ীর মুখ থেকে রক্ষা ক'রেছে, আর আমার চরণ-যুগলও এই বপুখানিকে ব'য়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে নি। কেবল অভ্যাস দিয়েই আমার কার্য্যের ব্যাখ্যা হয় না। যে লোক কাণে অশোকফুল গুঁজতে পারে এমন লোককে নদীর ধারে

চালিত ক'রে আমার প্রবৃত্তি তার ধর্ম্মসঙ্গত কাজই ক'রেচে। এই রকম অনেক কাজ দৈনন্দিন জীবনে ঘটুচে দেখা যায়। কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমাজ ও জাতীয় জীবনেও ঐ রকম প্রায়ই ঘটে। বোধ হয় এ বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না যে, যে সকল ঘটনা ও চিন্তা ব্যবহারিক স্বার্থজ্ঞান হ'তে উদ্ভূত হয় নি, ঠিক সেইগুলিই ব্যক্তিকে ও সমষ্টিকে মহৎ করে। সব মহৎ কাজই নিষ্কাম।

অতএব দেখা যাচ্চে যে বুদ্ধি, ভাব এবং ইচ্ছায় আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে ভাগ ক'রলে জীবনের সব সুন্দর এবং মহৎ কাজ বাদ পড়ে যায়—সুতরাং নতুনভাবে তাদের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রথমেই নব্যপন্থীরা ব'লচেন যে জীবনী-শক্তিটী একটী অখণ্ড এবং অখণ্ডনীয় পদার্থ, অতএব তাকে ভাগ করা সম্ভব নয়—তবে তাকে বুঝ্‌তে গেলে সেই শক্তিরই একটী কার্য্যকরী যন্ত্রের, অর্থাৎ বুদ্ধির, সাহায্য নিতে হবে। বুদ্ধি সমগ্র জীবনী-শক্তি হ'তে বোঝবার জন্য একটী System পৃথক ক'রে নেয়—যেমন ইঞ্জিনিয়ার বাড়ী তৈরী কর্‌বার পূর্ব্বে সেক্‌সান্ কিংবা প্ল্যান করেন, যেমন বৈজ্ঞানিক, নদীর জল দূষিত কিনা পরীক্ষা ক'রবার জন্য এক বাটী জল তাঁর পরীক্ষাগারে নিয়ে আসেন। সেক্‌সান্ করা নিতান্ত দরকার, নদীটীকে ঘরের ভেতর আনা যায় না ব'লে বাটী ক'রে জল নিয়ে আস্‌তেই হবে, কিন্তু তাই ব'লে ইমারৎ-খানি সেক্‌সান্ নয় এবং এক বাটী জল নদীও নয়। বিচারবুদ্ধিকে যাঁরা সর্ব্বে-সর্ব্বা মনে করেন তাঁরা বাড়ীর সম্পূর্ণতাকে, ঐক্যকে, নদীর সহজ গতিকে ভুলে যান, সাজঘরে সাজাকেই রঙ্গমঞ্চের অভিনয় বিবেচনা করেন। খণ্ড আমাদের হাতের যন্ত্রমাত্র, সে খণ্ডকে যদি পূর্ণ ব'লে আলিঙ্গন করি তা হ'লে যান্ত্রিকতার চূড়ান্ত হবে। Intellectualism এবং Materialism একই জিনিষের এ পিঠ আর ও পিঠ।

মানুষ যখন যন্ত্র নয় তখন নব্যপন্থীরা আর একটা কথা এই বল্‌তে চান যে, বুদ্ধি ব্যতীত আমাদের অন্যান্য প্রবৃত্তির উপর ঝোঁক্ দেওয়া উচিত। মনের একটী সচেতন ও অচেতন দিক্ আছে। চেতন অংশের কীর্ত্তিকলাপ আমরা জানি কিন্তু অচেতন অংশ সচেতনের অপেক্ষা কম জানি বলেই সেটী "কম্-জোরী" নয়। অচেতন অংশের মধ্যে মানবজাতির জন্ম জন্মান্তরের নিহিত যে সব অভিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে, তাদের নাম instinct অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তি। তাদের সম্বন্ধে আমরা জানি যে তারা গতিশীল অতএব তাদের প্রেরণাশক্তি আছে এবং সে প্রেরণাশক্তির উপর নির্ভর কর্‌লে আমাদের সকল কর্ম্ম সহজ এবং সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে। অবশ্য অনেকে ভয় পাচ্ছেন যে সাধারণে এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হ'য়ে অনেক কুকার্য্য ক'রে বস্‌বে কিংবা বর্ত্তমান কালে যাঁদের হাতে ক্ষমতা আছে তাঁরা এই সরল-ভাবটী এবং সাধারণের ভাবপ্রবণতাকে নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবেন। কিন্তু এ ভয় অমূলক। এই সহজ প্রবৃত্তিগুলির আর একটী গুণ এই যে তারা পুরাতন হ'লেও অপরিবর্ত্তনীয় নয়; প্রত্যেক প্রবৃত্তি একটু চাপাচাপি কর্‌লেই নিজের রূপ বদলায়। মনস্তত্ত্ববিদেরা এই বদ্‌লানকে Sublimation এবং Canalisation বলেন। রূপ বদ্‌লান অর্থ এক প্রবৃত্তির

চাপেও হয় এবং বুদ্ধির জোরেও হয়; যেমন কাম হ'তে প্রেম এবং প্রেম হ'তে সাহিত্য এবং বিশ্বজনীনতা; যেমন স্বার্থপর ছেলেদের স্বার্থজ্ঞান লোপ পায় ফুটবল খেলতে গিয়ে। বুদ্ধির চেয়ে অন্য একটী প্রবৃত্তির উন্মেষ দ্বারা যেরূপ বদলান যায় সেরূপ কষ্ট কল্পিত হয় না সুতরাং সুন্দর হয়। মা ঘরে অসুস্থ হয়ে রয়েছেন, প্রবৃত্তি হ'ল মাঠে খেলা দেখতে যাই। বুদ্ধি উপদেশ দিলে "যেয়ো না," গেলুন না। যাওয়া হ'ল না বটে কিন্তু মন খারাপ হ'য়ে গেল, মার সেবা হ'ল না। কিন্তু মাঠে যাবার প্রবৃত্তিকে যদি মার প্রতি স্নেহ, সহানুভূতি দিয়ে বশ করা যেত তা হ'লে সেবায় প্রাণ থাকত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অজানা অরূপের যে বাহুল্য আছে তার মানে এই, যে তিনি জানেন যে চেতন অংশ অচেতনের তুলনায় একটী বুদ্বুদ মাত্র এবং সেই অচেতন সাগরে যে প্রবৃত্তিগুলি নির্মজ্জিত র'য়েছে তাদেরই প্রেরণাশক্তির দ্বারা সচেতন জগতের কাজগুলি সহজ, সরল ও সুন্দর হবে।

মনোবিজ্ঞানের এই তথ্যগুলির মূল্য অনেক। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজির মালিক (Capitalist) এবং শ্রমিকের (Labourer) ঝগড়ার মীমাংসা পাওয়া যায়, যদি আমরা মেনে নিই যে জীবনী-শক্তি একটি অখণ্ড পদার্থ। এতদিন শ্রমজীবিকে কেবলমাত্র শ্রমের দিক দিয়েই দেখে আসা হচ্ছে। তার পারিশ্রমিক কেবল শ্রমের মূল্য মাত্র ব'লে ধরা হয়। কিন্তু শ্রমিক ও মানুষ যদি এই নতুন মতটী শ্রমিকের পূর্ণ বিকাশ লাভ করবার সাহায্য করে তা হ'লে কলঘরেতে, জমিদারীতেও আমরা সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা দেখতে পাব ব'লে আশা করতে পারি।

রাজনীতিতেও আমরা এতদিন ধরে রাষ্ট্র বা Stateএর পূজা ক'রে আসচি। সে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আমরা বুঝি সাধারণতঃ দমনশক্তির দ্বারা। সৃজনের পথে আমরা তার সাহায্য কখনও পাই না। তার কারণ এই যে রাষ্ট্র একটী কাজ চালাবার যন্ত্র মাত্র, সেখানে আত্মার যোগ নেই, মানবিকতার পরশ নেই, লাল ফিতার ফাঁদে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। নবপন্থীরা বলছেন মানুষ চাই, Personality চাই, কেন না মানুষই মানুষকে জাগাতে পারে। এই Personality শুধু বুদ্ধিমত্তা নয়, এটী সম্পূর্ণ জিনিষ; এটী চেনা-অচেনা, রূপ-অরূপ, আবেগ-সংযম, খেয়াল-বুদ্ধি সব নিয়েই গড়ে উঠেছে। তর্কবুদ্ধি আমাদের উপদেশ দিতে পারে, শ্রুতি স্মৃতির ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু কোন জীবন্ত আদর্শ আমাদের সম্মুখে দাঁড় করাতে পারে না। অথচ আমরা ছেলেবেলা হ'তে পড়ে আসচি এবং এখনও দেখছি যে "Example is better than precept." যদি রাষ্ট্রের কাজ প্রত্যেক মানুষকে ব্যক্তিগত হিসাবে ফুটিয়ে তোলা হয়—গ্রীকরা যেমন বলতেন যা হওয়া উচিত—তা হ'লে জীবনীশক্তিকে অখণ্ড ব'লে মানতেই হবে এবং বুদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য বৃত্তি ও ভাবগুলির মস্ত বড় অস্তিত্ব স্বীকার ক'রতে হবে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ঐ কথাগুলি খাটে। নাড়ীর যোগই হচ্ছে সজীব যোগ কিন্তু সে যোগ রাষ্ট্রের সঙ্গে হ'তে পারে না—বিশেষতঃ যে রাষ্ট্র বিদেশীর দ্বারা পরিচালিত। বিদেশীর পক্ষে Loyalty স্বার্থের, বিচারবুদ্ধির কথা, অথচ দলের প্রতি

Loyalty না থাক্‌লে আত্মরক্ষাও হয় না এবং স্বার্থত্যাগের দ্বারা হৃদয়বৃত্তির বিকাশও হয় না। সেইজন্য সংঘ চাই। অথচ সে সংঘ গোষ্ঠী হ'লে চল্‌বে না, কোন স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লে চল্‌বে না—কেবল মাত্র Personalityকে বেষ্টন ক'রে আপনা আপনি তাকে গড়ে উঠ্‌তে হবে। মহাপুরুষের স্পর্শ লেগেই সংঘ গড়ে উঠ্‌বে—"নাস্তি গতিরন্যথা।" মনুষ্যত্বই সত্য, অতএব মানুষ ম'রে গেলেও তার সত্য জীবন্ত থাক্‌বে, সৃষ্ট সংঘের ভিতর, সংঘের আত্মায়। "বিজলী," "প্রবর্ত্তক," "নবসংঘ," আজ ঐ কথা ব'ল্‌ছেন। "শান্তিনিকেতনের" মূল ভিত্তি তাই, রামকৃষ্ণের মঠও ঐ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্র ঐ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। বর্ত্তমানকালে কংগ্রেস যদি কিছু কাজ ক'রে থাকে সেও ঐ সত্যের জোরে। সংঘ যখন formal নয় তখন একটু ঘরোয়া হ'তেই হবে। ঘরোয়া কথাটী প্রাণের কথা;—কেন না ঘরেই মানুষ সহজ হয়, ঘরকেই মানুষ সুন্দর ক'রে সাজায়, ঘরেই মানুষ মঙ্গলমঠ স্থাপন ক'রে এবং ঘরেই মানুষ বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তিকে বেশী মেনে চলে। বাহির যদি ঘরের মতন হয় তা হ'লে মানুষকে খর্ব্বতার দৈন্যে পশু হ'তে হয় না।

শিক্ষাক্ষেত্রে যদি আমরা বুঝি যে একটী প্রবৃত্তিকে অন্য একটী সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা দমন ক'র্‌তে ও লোপ পাওয়াতে পারি তা হ'লে শিক্ষার আদর্শ উল্‌টে যায়। সেই চারশ বছর পূর্ব্বে যবে থেকে Machiavelli, "Strong Man" চেয়ে বস্‌লেন তবে থেকে শিক্ষকেরা কেবলমাত্র "Strong Man"ই তৈরী কোরে আস্‌ছেন। বর্ত্তমানকালেও অভিব্যক্তিবাদের ভুল অংশটুকু নিয়ে শিক্ষকেরা ছাত্রকে কেবলমাত্র জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত করছেন। ব্যক্তির সম্পূর্ণতার দিকে তাঁদের দৃষ্টি নেই। Character মানে শিক্ষকেরা বোঝেন বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা। এরূপ এক-পেশে শিক্ষার কুফল আমরা গত যুদ্ধে টের পেয়েছি। এই নতুন মতটী গ্রাহ্য হলে শিক্ষার আদর্শ হয়ে উঠ্‌বে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রবাহের পথ সহজ করে দেওয়া—অতএব শিক্ষকের কর্ত্তব্য হচ্চে ভক্তিভরে ছাত্রদের মনোভাব লক্ষ্য ক'র্‌তে শেখা। তাঁদের সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে যে তাঁদের শেখাবার কিছু নেই, তাঁদের কাজ হচ্চে facts যোগাড় ক'রে দেওয়া, জীবনস্রোতের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে দেওয়া এবং "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে একটী প্রবৃত্তির সাহায্যে অন্য প্রবৃত্তিটীকে দমন করা কিংবা ফুটিয়ে তোলা। এ কর্ত্তব্যগুলি সমাধা কর্‌তে গেলে শিক্ষকের নিজের Personality গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। শিক্ষার এই নূতন আদর্শের কথা বর্ত্তমানে আমাদের বিশেষ ক'রে মনে রাখা উচিত। আমাদের দেশে অনেকে Vocational education চাইচেন, তাঁদের উদ্দেশ্য দেশের দারিদ্র্য দূর করা। কিন্তু দারিদ্র্য দূর ক'র্‌তে গিয়ে তাঁরা চেয়ে বসেন টাকা আন্‌বার ফিকির শিক্ষা। সে ফিকির যে কোন যন্ত্র চালাতে জান্‌লেই হবে, তার জন্য শিক্ষার দরকার নেই। প্রকৃত শিক্ষা ফিকিরের ধার ধারে না এবং ফিকির জান্‌তে শিক্ষার দরকার নেই। পৃথিবীতে যন্ত্রের দরকার চিরকালই থাক্‌বে। আমাদের হিন্দুধর্ম্মেও বলে না কি যে অন্নময়কোষ ছাড়া আরও চারিটী কোষ আছে? নব্য-পন্থীরা সেই পঞ্চকোষেই ক্ষুধা মেটাতে চান।

Anti-Intellectualism এর বাংলা কি? আমার এক বন্ধু বলেন "নির্ব্বুদ্ধিতাবাদ।

যেকালে আমার মত লোকে সেই মতের ব্যাখ্যা করেচে তখন তার বাংলা নাম হোক "নির্ব্বুদ্ধিতা-বাদ"; যখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ঐ নামের ব্যাখ্যা কর্‌বেন তখন অন্য নাম দিলেই হবে। বাস্তবিক কিন্তু বুদ্ধিকে বাদ দিতে কেউ চায় না, কেননা বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে কোন কাজই হয় না। লোকেরা শুধু বুদ্ধির বড়াইকে আর তার autocracyকে আর সহ্য ক'রতে পারচে না। বুদ্ধির নিজের ধর্ম্ম আছে, সেই ধর্ম্ম মেনে চল্‌লেই কোন গোলই ওঠে না। ব্যবহার-উপযোগিতাই হচ্ছে বিচার বুদ্ধির মাপকাটী, সেই মাপকাটীর অনুসারেই চল্‌তে হবে অথচ প্রত্যেক কর্ম্মের, প্রত্যেক চিন্তার নিজস্ব মূল্য আছে। চাঁদের আলো ক'টী মোমবাতির তেজে জ্বল্‌ছে এবং অবনী বাবুর স্ত্রীমূর্ত্তি গুলিকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় কি যায় না, উচিত কি উচিত নয় এসব প্রশ্নের মূল্য হয়তো আছে, কিন্তু চন্দ্র কিরণের কিংবা অবনীবাবুর ছবিগুলির মূল্য রসগ্রহণ ক'রতে সে মূল্য জানবার আবশ্যক নেই। মিল সাহেব "Utility includes truth" লিখে গেছেন ব'লেই রবীন্দ্র নাথকে "Truth is higher than utility" লিখতে হ'য়েছে। মিলের জগতই বর্ত্তমান জগত; সে জগতে আনন্দের উৎস শুকিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের জগতে জীবন একটী রসস্রোত আনন্দে ভরপুর। সে আনন্দ অঙ্ক কস্‌বার আনন্দ নয়, মোকর্দ্দমা জিত্‌বার আনন্দ নয়, সে শুধু সৃষ্টির অনাবিল আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ আনন্দের "মুক্তধারা" এ জগতে আনতে চান মনুষ্যত্ব দিয়ে, যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ স্বার্থত্যাগে। তাই কুমার অভিজিৎ নিজের নিজত্ব ভাসিয়ে দিয়ে মুক্তধারার বাঁধ খুলে দিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বরূপ বিকাশ কর্‌লেন আনন্দের স্রোতে ভেসে গিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলচেন,—আমি যে আমি এ বুঝতে কষ্ট হয় না—"It is some untold mystery of unity in me that has a simplicity of the infinite" এই একতাই সৃজন ক'রে চল্‌ছে সৃষ্টিই তার লীলা, প্রেমেই নিজেকে সে পূর্ণ করে, অদ্বৈতই আনন্দ এবং অনন্তই আনন্দ। এটী শুধু কবির ধর্ম্ম নয় এটী জগতের ধর্ম্ম হ'তেই হবে।

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

দু'খানি চিঠি

["কলিকাতা রিভিউ" কাগজে আমার লেখাটি পড়ে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমাকে দু'খানি চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি সে দু'টি ছাপাতে দিচ্ছি। এ গুলি প্রবন্ধ নয়, চিঠি—এই কথাটি পাঠকেরা স্মরণ রাখবেন। আমার দুঃখ এই যে চিঠি থেকে গোটা কয়েক অবান্তর কথা বাদ দিতে গিয়ে সেগুলি প্রবন্ধের মতন দেখাচ্ছে—সম্পূর্ণতার রস, যা আমি উপভোগ করেছি, ইচ্ছা করে, সে রস সকলকে বণ্টন ক'রে দিই। এ ইচ্ছা কত স্বাভাবিক তা যিনি প্রমথ বাবুর চিঠি পেয়েছেন তিনিই জানেন।—লেখক]

(১)

ধূর্জটী,

তোমার 'আর্টিকেল' পেলুম ও পড়লুম। লেখাটি একটু শক্ত হয়েছে, বিশেষতঃ সাধারণ পাঠকের পক্ষে ত নিশ্চয়ই। শক্ত হবার কারণ তুমি এক আর্টিকেলের ভিতর এমন অনেক জিনিষ ঢুকিয়েছ যার বিষয়ে অধিকাংশ লোক সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমাদের দেশের কজন লোক বলো ত "Regionalism", "Syndicalism" প্রভৃতির নাম শুনেছে? তবে তুমি বলতে পারো যে এ প্রবন্ধ সকলের পড়বার জন্য নয়, সুশিক্ষিত পাঠকের জন্য। তার উত্তরে কিছু বলবার নেই। Anti-Intellectualism বুঝবে অবশ্য শুধু intellectualsরা।

এখন তোমার প্রবন্ধের আসল বিষয় সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলবার আছে। ইউরোপে যত সব নতুন মত বেরিয়েছে তার ভিত্তি অবশ্য এই সত্য যে মানুষ শুধু মস্তিষ্ক নয়; আর তার সকল কাজের গোড়ায় থাকে তার প্রকৃতি তার বুদ্ধি নয়। আর মানুষের প্রধান motive force হচ্ছে তার emotion, যা বুদ্ধির দ্বারা সম্পূর্ণ শাসিত হয় না আর শাসিত হওয়াও উচিত নয়। এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর Reasonএর পাণ্ডারা যে reason অর্থে intellect বুঝতেন এ কথা সম্ভবতঃ সত্য নয়। Anti Intellectualism যে reason এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সে বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ নেই। এখন আমার প্রশ্ন এই যে এই সব anti-Intellectualismএর পাণ্ডারা sincere কি না? আমার বিশ্বাস আর্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে anti-Intellectualism অকপট কেননা ও দুই জিনিষ reasonএর সৃষ্টি নয়, কিন্তু পলিটিক্স ও ইকনমিক্সের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ও একটা চাল মাত্র। পলিটিকাল হিসেবে mass কে exploit করবার ও হচ্ছে একটা জবর উপায়। Pan-Slavism, Pan-Germanism প্রভৃতি সব যে পলিটিকাল ব্যাপার সে বিষয়ে ত কোনই সন্দেহ নেই; আর দুই ব্যাপারের সঙ্গে আমার যতটুকু পরিচয় আছে তার থেকে দেখতে পাই, যে Slav আত্মা German আত্মা প্রভৃতির বিষয় যা বলা হয় সে সব মিছে কথা, আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের মনের ভিতর বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা। এ ব্যাপারের মূল হচ্ছে intellect। আজকাল লোক জানে যে intellect যার জন্ম দেয়—অর্থাৎ idea—তার সাহায্যে অপরের emotion জাগানো যায়, ওঠানো যায়, নাচানো যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি লিখেছ যে religion হচ্ছে মানব-সমাজের একটা প্রধান বন্ধন। কথাটা খুব সত্য। তাই ইউরোপে আজ অনেক স্বদেশী নেতা religion নিজে না মেনে অপরকে মানাতে চান, তাদের মনের উপর প্রভুত্ব করবার জন্যে। যে কাজ Church আগে করত এরা আজ তাই করতে চাচ্ছে। এই কারণে ইউরোপে আজকাল একদল anti-intellectualist জন্মেছে যাদের নাম হচ্ছে—Atheist Roman Catholic। আর্ট ও সাহিত্যে মানুষের উচ্চাঙ্গের emotionএর প্রকাশ আর পলিটিকাল তার নিম্নাঙ্গের emotion এর খেলা, সুতরাং এ দুই ক্ষেত্রে anti-Intellectualism এক জিনিষ নয় বরং ঠিক উল্টো জিনিষ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

Anti-Intellectualismএর গলদ এই যে তার উপর কোনরূপ সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলা যায় না। তোমার প্রকৃতি ও আমার প্রকৃতি এক নয়, কিন্তু তোমাকে আমাকে যদি এক সঙ্গে ঘর করতে হয় তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমার প্রকৃতির যেখানে অনৈক্য তার উপর ঝোঁক না দিয়ে সেখানে ঐক্য সেইখানেই ঝোঁক দিতে হয়। আর মানুষের সঙ্গে মানুষের যাতে ঐক্য ঘটায় মনের সেই শক্তির নাম reason; ও জিনিষ মুখ্যতঃ moral এবং emotional এবং গৌণতঃ intellectual, সুতরাং anti-Intellectualismএর একটা স্পষ্ট immoral ও un-emotional দিক আছে। যদি অনুমতি করত' একটা paradox বানাই। Anti-intellectualismএর দোষ এই যে তা কেবলমাত্র intellectual

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

(২)

তোমার প্রথম চিঠি শনিবারে পাই, আর দ্বিতীয়খানি এইমাত্র পেলুম। তুমি দেখছি আমার কথাগুলো একটু বেশী seriously নিয়েছ। আমার চিঠির নীচে "বীরবল" সই করলে, আমার মতের কতটা রাখতে হবে আর কতটা ফেলতে হবে তা তুমি অনায়াসে ধরতে পারতে। ও চিঠিখানি আধ-মজা করে লেখা, তবে সে মজার ভিতর থেকেও এক আধটা সত্যও হয়ত বেরিয়ে পড়তে পারে। দেখ, সব দেশেই চলতি মতগুলো লোকমুখে ক্রমে বুলি হয়ে ওঠে। মানুষ একটা নাম পেলেই খুসি থাকে, তখন সে নামের পিছনে রূপ দেখবার প্রবৃত্তি তার আর থাকে না। তারপর সেই নাম জপতে জপতে সে auto-hypnotised হয়ে যায়। যারা Folk-Psychology দেখে, এ সত্য আমার বিশ্বাস, তারা নিশ্চয়ই ধরেছে।

ইউরোপের দশাই যখন এই, তখন আমরা যে বুলির দাস হয়ে পড়ব তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের মনের ভিতর সজ্ঞানে গড়া এমন কোনও মত নেই, যা কোনও নূতন মতের আক্রমণের বিরুদ্ধে ঢাল তলওয়ার নিয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের দেশের অবস্থা যা, আমাদের মনের অবস্থাও তাই, অর্থাৎ ও দুয়ের কোনটিই আত্মবলে রক্ষিত নয়। বিদেশীর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার ভার আজ যেমন ইংরাজের হাতে রয়েছে, নূতন মতের আক্রমণ থেকে মনকে রক্ষা করার ভারও আজ তেমনি ইংরাজের হাতে রয়েছে। এস্থলে ইংরাজ মানে, বিলিতি মত। আর বলা বাহুল্য যে সে মত আমাদের হাতগড়া নয় বলে, আমাদের মনের উপর তা আলগা হয়ে বসে আছে;—যেমন দেশের উপর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আলগা হয়ে বসে রয়েছে। সুতরাং ইউরোপ থেকে আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত মতের প্রতি আমাদের "মম-তা" নেই, তা ছাড়তে আমরা সবাই সদাই প্রস্তুত। এই জন্যেই আমাদের critical বুদ্ধি আদপেই নেই। Conservatismই হচ্ছে criticismএর জন্মদাতা। পুরাতনকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য নূতনকে যাচাই করার নামই criticism। অবশ্য নূতনকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যও পুরাতনকেও মানুষে যাচাই করে—কিন্তু এ দুই হচ্ছে একই অস্ত্রের উল্টো প্রয়োগ। শেষটা কারও কারও হাতে ও অস্ত্র—"শঙ্খ বণিক করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে"—তাই হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ আমার হাতে criticism কতকটা ঐ রকম একটা যন্ত্র হয়ে উঠেছে।

এ criticismএর কাজ কোনও বিশেষ মতকে রক্ষা করা কিম্বা নষ্ট করা নয়;—মতের ভিড়ের মধ্যে মনকে রক্ষা করা। এখন ইউরোপের উপর একটু নজর দেওয়া যাক্। ফরাসীরা যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল তার মূলমন্ত্র যে reason, এ কে অস্বীকার করবে যখন উক্ত বিপ্লবের গুরু-পুরোহিতের দল নিজমুখে স্বীকার করেন যে তাঁরা age of reason আনতে চেয়েছিলেন? আমার বক্তব্য শুধু এই, যে ও reason মানে intellect নয়। ও যুগের তিনটি মহাবাক্য—Liberty, Equality ও Fraternity—intellect থেকে বেরয়নি, কেননা বেরতে পারে না। অসংখ্য জর্ম্মাণ পণ্ডিত দেখিয়েছেন যে উক্ত তিনটি কথা অতিশয় নির্ব্বোধের কথা। এক-মাত্র বুদ্ধির হিসেব থেকেও তিনটির একটির পক্ষে দুটি ভাল কথা বলা যায় না। ও তিনটিরই মূল হচ্ছে মানুষের হৃদয় ও তার ন্যায়বুদ্ধি। Voltaire এর অস্ত্র logic নয় irony, তর্ক নয় বিদ্রূপ। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর বুদ্ধিকে তাঁর moral senseএর অস্ত্র করে তুলেছিলেন। Voltaireএর বিদ্রূপের মারাত্মক শক্তির মূল হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর জ্বলন্ত রোষ। খৃষ্টান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে "Crush the infamy" বলা কি বুদ্ধিমানের কথা? এ হচ্ছে Churchএর অত্যাচারের বিরুদ্ধ ন্যায়বুদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ। জর্ম্মান পণ্ডিতদের হাজার পাণ্ডিত্যপূর্ণ হাজার হাজার বইয়ের চাইতে Voltaireএর "Candide" এর মূল্য যে আজও শতগুণে বেশী তার কারণ শুধু তার wit নয়, সেই witএর পিছনে যে ন্যায়বুদ্ধি আছে তাই। Voltaire ভুল ideaর উপর তাঁর বুদ্ধির ছুরি কখনো চালাতেন না, যদি না তাঁর বিশ্বাস থাকৃত যে ঐ সব ভুল idea হচ্ছে সকল অত্যাচারের মূল।

Rousseau যে কতবড় fool তা Maine পর্য্যন্ত অনায়াসে প্রমাণ করে দিতে পারেন। "Social Contract" যে উপন্যাস এ কথা কোন ঐতিহাসিক না জানে? "Social Contract" লজিকের ঠাস বুনানি। কিন্তু ও বইয়ের সব axiom যে রুসোর postulate—আর রুসো যে পাগল ছিলেন এ ত আমরা সবাই জানি। তবে কি গুণে এ পাগল দুনিয়া পাগল করলে? এক তাঁর অসাধারণ sensibilityর গুণে। রুসোর সকল মতের মূল হচ্ছে তাঁর হৃদয়।

সুতরাং একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে ফরাসী বিপ্লবের প্রাণ শক্তি এসেছে ফরাসী জাতির হৃদয় ও ন্যায়বুদ্ধি থেকে। Heine মজা করে বলেছেন যে ফরাসী বিপ্লব হচ্ছে একখানা মহাকাব্য। কিন্তু এ মজার ভিতর একটা মহা সত্য আছে। ইউরোপের যত কবির দল, Goethe থেকে আরম্ভ করে Shelley পর্য্যন্ত ঐ ব্যাপারে মেতে উঠেছিলেন। আর যত intellectualএর দল ফরাসী বিপ্লবের reason যে un-reason তাই প্রমাণ করতে কাগজের উপর কালির আঁচড় কাটতে বসে গেলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর Enlightenmentএর গলদ যে কোথায় তা বুদ্ধিমানের দল দুদিনেই লজিকের সাহায্যে ধরে ফেললেন। ফল কথা ফরাসি বিপ্লবের ভিতরকার কথা, intellectualও নয় anti-intellectualও নয়, non-intellectual। ও যুগের ফরাসী মনীষীরা humanity বিশ্বাস করতেন অর্থাৎ তাঁদের ধারণা ছিল মানুষমাত্রেই এক ছাঁচে ঢালা। তারপর, ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যখন re-action এলো, তখন বুদ্ধির দিক থেকে, ফরাসী মনের ঐ universalityর উপরই প্রধান আক্রমণ হল। তখন বলা হল যে মানুষ বলে কোনও পদার্থ নেই, আছে জর্ম্মাণ, ইংরেজ, দিনেমার, ওলন্দাজ ইত্যাদি।

সুতরাং বস্তুগত্যা যা আছে তা হচ্ছে concrete, Universal একটা abstraction মাত্র। আর হৃদয়ের দিক থেকে এই বলা হল, যে idea চরিত্র গড়ে না। Voltaireএর ও বিশ্বাস বিলকুল ভুল, আসলে চরিত্র idea গড়ে। সুতরাং ideaরও কোন শক্তি নেই কোনও Universality নেই। এই দুই মত থেকে জন্মলাভ করলে Romantic Movement; অতএব এ movement একদম concreteকে আঁকড়ে ধরলে। রোমান্টিক কবিতা পড়ো, দেখতে পাবে Feudalism ও খৃষ্টধর্ম্মের গুণকীর্ত্তনে তা পূর্ণ, অর্থাৎ ঐ জাতীয় কাব্যের প্রাণ হয়ে উঠেছিল history. তারপর তা ইতিহাস থেকে পিছু হটে পুরাণ, ও পুরাণ থেকে পিছু হটে রূপকথায় গিয়ে পৌঁছল। ইতিহাস nationalistic হল, ইকনমিকস ঐতিহাসিক হল, আর্ট জাতীয় হল, দর্শন প্রথম হৃদয়ের ভিতর ঢুকে গেল, সেখানে বেশী দিন না থাকতে পেরে তারপর willএর উপর ভর করলে, তারপর unconscious অর্থাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তারপর রোমান্টিসিজমের মৃত্যু হল। রোমান্টিসিজমের গুণ এই যে concreteএর জ্ঞানের মাহাত্ম্য ও emotionএর শক্তি সম্বন্ধে তা মানুষকে সজ্ঞান করেছে। তা মারা গেল এই দোষে যে concreteএর পূজা করতে করতে সে Universalকে ভুলে মেরে দিলে। আর emotionকে মুখের কথায় বাড়াতে বাড়াতে তা sentimentalismএর সৃষ্টি করলে।

তারপর এই রোমান্টিসিজমের প্রতিবাদ স্বরূপে Realism এর জন্ম হল। এ জিনিষ হল একদম বৈজ্ঞানিক। এর মূলসূত্র হল এই যে, বুদ্ধি, ন্যায়বুদ্ধি, হৃদয় এর কোনটাই মানুষের চরিত্রের ও কর্ম্মের নিয়ন্তা নয়, natureই তাকে চালায়, সে nature কতকটা বাহ্য-প্রকৃতি, কতকটা তদনুরূপ মানুষের অন্তর্প্রকৃতি। মানুষের মূল প্রকৃতি খুঁজতে খুঁজতে এরা instinct বার করে ফেলেছে—অর্থাৎ এমন একটা ভিতরকার ঠেলা, যা হৃদয় মনের অধীন নয়। Conscious মন হচ্ছে উপরকার মন—তার ভিতর যা আছে সে হচ্ছে ego-instinct, sex-instinct ও group-instinct; আর মানব-জীবন হচ্ছে এই তিনের খেলা। এ সত্য অবশ্য মানুষের analytic-intellect এর কাছে ধরা পড়েছে। এই জন্যই আমি বলেছি যে anti-Intellectualism হচ্ছে Intelleclualismএর শেষ কথা। এখন দেখা যাক এর ফল দাঁড়াল কি?

বলা বাহুল্য মানুষ কর্ম্ম-মার্গেরও পথিক আর জ্ঞান-মার্গেরও পথিক; মানুষ সুধু কাজ করে খুসি হয় না, সে সকল বিষয়ের তত্ত্বও জানতে চায়। New Psychology, Folk-Psychology যদি সত্য হয় তো তাতে মানুষের জ্ঞান বাড়িয়ে দিয়েছে। Einsteinএর আবিষ্কারকে কালই আমরা ফলিত-জ্যোতিষে পরিণত করতে পারব না, কিন্তু তাই বলে তার যে কোনও মূল্য নেই তা নয়। সুতরাং New Psychologyর সাহায্যে Psycho-Analysis না করতে পারলেও, আর Folk-Psychologyর সাহায্যে Folk-lore বানাতে না পারলেও ও-দুয়ের Science অর্থাৎ জ্ঞান হিসেবে যথেষ্ট মূল্য আছে। যে হেতু মানসিক দূরবীনের সাহায্যে Folk-Psychology আর অনুবীক্ষনের সাহায্যে New Psychology আবিষ্কৃত হয়েছে। ওর একটা চেষ্টা হচ্ছে মানুষের মনের ভিতর যা অতি ক্ষুদ্র যা অতি সূক্ষ্ম তাকেই মানব-মনের ভিত্তি করা, আর তৎপরটির বহুমানবের মধ্যে যা অতি স্থূল তাকেই উক্ত

মনের ভিত্তি করা। বলা বাহুল্য এ দুই বিজ্ঞানই মানুষের personality উড়িয়ে দেয়।

তারপর ঐ জ্ঞানের হিসেব থেকে দেখলে দেখা যায় যে জর্ম্মান Romanticism আর ফরাসি Humanitarianism হচ্ছে পরস্পর পরস্পরের thesis ও anti-thesis; কাজেই এ যুগে দুইয়ে মিলে synthesis হয়েছে। আজকের দর্শনের শেষ কথা হচ্ছে যে Concrete-এর মধ্যেই Universal থাকে। Concrete থেকে ছাড়িয়ে নিলে, Universal যেমন একটা abstraction হয়ে পড়ে আবার Universal থেকে ছাড়িয়ে নিলে Concreteও তেমনি একটা abstraction মাত্র হয়ে ওঠে, কেননা Concreteও থাকে Universalএর মধ্যে। সুতরাং Intellectualismও যেমন ভুল anti-Intellectualism'ও তদ্রূপ; তবে ও দুয়ের মধ্যেই আধখানা করে সত্য আছে। ফরাসীরা দিয়েছিল Humanityর উপর ঝোঁক, আর জর্ম্মানরা দিয়েছিল Nationalityর উপর ঝোঁক। একের ফলে ঘটেছিল French Revolution আর অপরের ফলে হয়েছে German War। ফরাসী বিপ্লবের ফলে শুধু ফরাসী জাত নয়, বিশ্বমানব নবজীবন লাভ করেছিল, আর জার্ম্মান যুদ্ধের ফলে শুধু জর্ম্মান জাত নয় বিশ্বমানব মৃত্যুমুখে পড়েছে। অতএব আমার বিশ্বাস মানুষ আবার Humanitarianismএর উপর ঝোঁক দেবে, শুধু বাঁচবার জন্য। Anti-Intellectualism জর্ম্মান রোমান্টিসিজ্‌মের গোঁয়ার ছেলে, সুতরাং এ যুগে তার প্রতিপত্তি আর বেশী দিন থাকবে না। কারণ মানুষ এখন সমগ্র মানব-সমাজের একটা Spiritual synthesis চায়। এবং তার জন্য চাই Reason, যে হেতু ও জিনিষ হচ্ছে হৃদয় মন ও ন্যায় বুদ্ধির synthesis। ইতি—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

স্পর্শমণি

আমার জীবন যবে অন্ধকারে রুদ্ধ অন্ধপ্রায়
আপন শক্তির পরে সংশয়ের বিমূঢ় লজ্জায়
পলে পলে মৃত্যুমুখে চলেছিল দুর্নিবার স্রোতে
তুমি আসি আপনার পরিপূর্ণ প্রেমের আলোতে,
দিলে উজলিয়া, ম্লান অবনত এ ললাট খানি
বিশ্বের আনন্দ-যজ্ঞে। তাই আজি অসংশয়ে জানি
তুমি মোর জীবনের দীপ্তিমান পরশরতন
তোমারি মঙ্গল স্পর্শে আজি মোর শুভ জাগরণ।

শ্রীজীবনময় রায়।

আহার ও চরিত্র

(২)

পূর্ব্ববারে এই অত্যন্ত গুরুতর বিষয় কেবল এক দিক হইতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে, আহার বর্ণের নিয়ামক, বর্ণ চরিত্রের নিয়ামক। এই ভাবে আহারের সহিত চরিত্রের যোগ থাকা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই বিষয়টি নানা দিক হইতে আলোচনা করা যায়। এক্ষণে ইহাকে জৈব রসায়নের * দিক হইতে সংক্ষেপে বিবেচনা করিব।

আহার্য্য পদার্থ দেহ মধ্যে পরিপাক হয়; তাহার ফলে উহা নানা দ্রব্যে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। ঐ সকল বিশ্লিষ্ট পদার্থ দেহের সকল অঙ্গই গঠন করে। অস্থি, মাংস, স্নায়ু, স্নায়ুগণ্ড, শিরা, পেশী ইত্যাদি দেহের সমস্তই আহার্য্য বস্তু হইতে গঠিত হয়। কিন্তু যাহা আহার করি তাহার সমস্তই এই কার্য্যে ব্যয় হয় না। যে অংশ দেহ পোষণ করে তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ পরিত্যক্ত হয়। কঠিন, তরল এবং বায়ব্য পদার্থরূপে পরিত্যক্ত হয়। এই ত্রিবিধ পদার্থের বর্ণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদি দ্বারা অনেক স্থলে ইহাদিগের গঠন স্থূলতঃ নির্ণয় করা যায়, কিন্তু সম্যক্ বিশ্লেষণ না করিলে জানা যায় না।

অস্থি, মাংস, স্নায়ু, মস্তিষ্ক, শিরা, পেশি, স্নায়ুগণ্ড, এবং যন্ত্র সকল নানাবিধ কোষ দ্বারা গঠিত। ঐ সকল কোষ হইতে বহু প্রকার রস নির্গত হয়। লিভার হইতে যে রস নির্গত হয় তাহা দ্বারা আহার্য্য পদার্থ পরিপাক হইয়া থাকে। অন্ত্রস্থ গণ্ড হইতে যে রস ক্ষরণ হয় তদ্দারাও আহার্য্য বস্তু পরিপাক হয়। মুখের লালা মুখের রস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অণ্ড হইতে কিম্বা গর্ভকোষ হইতে যে রস ক্ষরণ হয় তাহার মধ্যে স্ত্রীকীট ও পুংকীট থাকে; ইহাদিগের মিশ্রণে দেহ গঠিত হয় এবং স্ত্রীদেহ অথবা পুংদেহ গঠিত হইলে তদুপযোগী দৈহিক ক্রিয়াও বিভিন্ন হইয়া উঠে। ঐ দুই যন্ত্রের মধ্যস্থ কোষগুচ্ছ * হইতে যে রস নির্গত হয় তাহাও স্ত্রীপুংভেদের কারণ সমূহ মধ্যে অন্যতম। এই সকল বিভিন্ন যন্ত্রের রস অবশ্যই আহার্য্য পদার্থ হইতে সংগৃহীত হয়। সেই রসস্রাবী যন্ত্রের ও গণ্ডের আয়তন, এবং রসের পরিমান, গঠন তারতম্য, গুণভেদ অনুসারে চরিত্রের তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং আহার্য্য ভেদে যন্ত্রাদির আয়তন প্রভেদ এবং রসের মাত্রা ও গুণভেদ এবং তাহা হইতে চরিত্র-বৈষম্য জাত হওয়া প্রতীয়মান হয়।

আমরা এই পথ অনুসরণ করিয়াই আলোচ্য বিষয় বিশদ করিবার চেষ্টা করিব।

লিভারের কথা বলিয়াছি; উহার রস দ্বারা পরিপাক ক্রিয়া যতদূর হওয়া উচিত তাহা যদি না হয় তবে অজীর্ণ অথবা কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে। যে দিন এই সকল হয় সে দিন

* Bio-Chemistry

সুতরাং মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক স্নায়ু পদার্থের উন্নত পরিণাম।

† Testes Ovary's Tissue

আমাদিগের স্বভাবও রাগান্বিত অথবা খিট্‌খিটে হইয়া থাকে। লিভারের রস যদি অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহা হইলেও ঐরূপ ফল হয়। লিভার আয়তনে বড় হইলে যে সকল পীড়া হয় তাহা অচিকিৎস্য না হইলেও তাহাতে দুর্ব্বলতা, নিরুৎসাহ, অনুদ্যম প্রভৃতি আনয়ন করে। লিভার ছোট হইয়া গেলে যদি স্কেরোপিন্ পীড়া হয় তবে জীবনের আশা প্রায় থাকে না। তখন স্বভাব যেরূপ হইতে পারে তাহা অনায়াসেই বোধগম্য।

তৎপর, যে সকল গ্ল্যাণ্ড দেহমধ্যে নানা স্থানে রহিয়াছে তাহাদিগের আয়তন ও রস ক্ষরণ এতদুভয়ের উপরেই স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে চরিত্র নির্ভর করে। মুখের লালা যদি অধিক বাহির হয় অথবা উহার স্বাদ যদি তিক্ত কিম্বা অম্ল হইয়া উঠে তাহা হইলে আমরা গভীর চিন্তা কিম্বা কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারি না; স্বভাবও একটু কোপন হইয়া উঠে।

থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ড নামে আমাদিগের একটি গ্ল্যাণ্ড আছে। উহা বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র হইলে, উহার রসক্ষরণ অধিক অথবা অল্প হইলে, আমরা দীর্ঘ অথবা ক্ষুদ্র হই; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অথবা লঘুচেতা হই। এই গ্ল্যাণ্ড আমাদের দেহ ও মন নানাপ্রকারে নিয়মিত করে। ইহাতেও স্বভাবের স্থায়ী অস্থায়ী উভয়বিধ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

অণ্ডের রস অল্প হইলে জরায়ু এবং তন্নিম্নস্থ অঙ্গের রস ক্ষারবহুল হইলে অথবা অম্ল হইলেও সংযমের অভাব হইতে পারে।*

মূত্ররসে চিনির ভাগ অধিক হইলে অথবা ইউরিয়া কিম্বা অক্স্যালেট্ অধিক নির্গত হইলে যে সকল দুঃসাধ্য অথবা সুসাধ্য পীড়া উৎপন্ন হয় তাহাতেও স্বভাবের তারতম্য হইয়া থাকে।

ব্যক্তির দেহগন্ধ তীব্র হইলে স্বভাবও নিষ্ঠুর হয়। অন্ততঃ দেহ গন্ধ বিভিন্ন হইলে স্বভাবও বিভিন্নপ্রকার হওয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এ সকল প্রায় সর্ব্বজনবিদিত কথা। যদিও জীবদেহ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপরে এই সকল বিষয় সম্যক্ অবগত নহেন, তথাপি স্থূল ভাবে এ সকল কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু এক্ষণে অত্যন্ত গুরুতর একটী রসের কথা বলিব যাহা দ্বারা দেহ ও স্বভাব বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হয় এবং যাহা অনেকেরই অজ্ঞাত। এই রসের ইংরাজি নাম হরমোন্ *। এই রস অণ্ডের এবং গর্ভকোষের কোষগুচ্ছ হইতে নির্গত হয়, স্ত্রীদেহে ও পুংদেহে যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও পার্থক্য আছে; স্ত্রী ও পুরুষগণের মনের সুতরাং স্বভাবের যে সকল গুরুতর প্রভেদ আছে, তাহা সম্ভবতঃ এই হরমোন্ রসের কার্য্য। এই রস ঐ সকল প্রভেদের একমাত্র কারণ না হইলেও একটী গুরুতর কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। †

* আমি একটি অবস্থাপন্ন প্রাচীন স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি। তাঁহার দেহের বর্ণ পরিষ্কার সাদা ছিল; তিনি খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। চক্ষু বড় এবং উজ্জ্বল ছিল। অনেক সময় উপর্য্যুপরি তাঁহার দেহে রক্ত পিত্ত হইত। ডাক্তারেরা Rash বলিতেন। এই সকল সময়ে তাঁহার অঙ্গ-বিশেষ নিজের অঙ্গুলী দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিতেন। পরিণামে তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া গেল।

* Hormonio.

† Determination of sex. By Dr. Doncaster. 1914. page 95.

পণ্ডিতগণ ইহাও অসম্ভব বোধ করিতেছেন না যে স্ত্রীপুংভেদ ভ্রূণের ধাতুর উপর নির্ভর করে; এবং জরায়ু মধ্যে স্ত্রী কোষ ও পুং কোষ মিলিত হইয়া যে মুহূর্ত্তে গর্ভাধান হয় তৎপরেও ঐ ভ্রূণের * ধাতু † পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এই ধাতু পরিবর্ত্তনের গুরুতর কারণ হরমোন্ নামক রস। এই রসের প্রকৃতি স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং চেষ্টা দ্বারাও পরিবর্ত্তিত করা অসম্ভব নহে।

সাধারণতঃ সে চেষ্টা আর কিছুই নহে, আহার্য্য পদার্থের পরিবর্ত্তন।

উপরে অতি সংক্ষেপে যাহা বলা হইল তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে আহার্য্য পদার্থের দ্বারা রস, রক্ত, স্নায়ু, গ্ল্যাণ্ড ইত্যাদি গঠিত হয়; উহার পরিবর্ত্তনে রসাদিরও পরিবর্ত্তন হয়; এবং সেই হেতু ব্যক্তির স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়। পণ্ডিত লোয়েব প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন যে মস্তিষ্কের বিবিধ কেন্দ্র নষ্ট করিয়া দিলে নানারূপ মনোভাবও বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে জীবের স্বভাব অথবা ধাতু স্থায়ীরূপে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, যখন আহার দ্বারাই মস্তিষ্ক কেন্দ্র সকল পুষ্টিলাভ করে তখন চেষ্টা দ্বারাই হউক অথবা আহার পরিবর্ত্তনের ফলেই হউক, ঐ কেন্দ্র সকলের বিকৃতি অথবা ধ্বংস সাধন করিলে কিম্বা মস্তিষ্ক নিহিত কোন গ্ল্যাণ্ডের বিনাশ সাধন অথবা ক্রিয়া পরিবর্ত্তন করিলে ব্যক্তির স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হইবে। যাহারা মাদক দ্রব্য সেবন করে তাহাদিগের স্বভাব অস্থায়ী অথবা স্থায়ী * রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; ইহা সকলেই জানেন।

ব্যক্তি, কেহ এক ধাতুর, কেহ অন্য ধাতুর হইয়া থাকেন। বায়ু পিত্ত কফ এই তিন বিভাগ করিলে বুঝা যায় যে স্বভাবতঃ কেহ বায়ু প্রধান, কেহ শ্লেষ্মা প্রধান, কেহ পিত্ত প্রধান লোক। কেহবা বাতপৈত্তিক, কেহ পিত্তশ্লৈষ্মিক, কেহ বাতশ্লৈষ্মিক ধাতুবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। আহার্য্য বস্তুও এই সকল ধাতুর হইয়া থাকে। কোন খাদ্যে বায়ু বৃদ্ধি করে, কোন খাদ্যে শ্লেষ্মা অথবা পিত্ত বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, কোন কোন খাদ্যে ঐ সকল ধাতু দমন করে। বায়ুপ্রধান, শ্লেষ্মাপ্রধান অথবা পিত্তপ্রধান ব্যক্তির স্বভাবও যখন বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে তখন আহার্য্য বস্তুর সহিত স্বভাবের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকা অঙ্গীকার করিতে হয়। ডাক্তার পালেট্ প্রায় স্পষ্টাক্ষরে এবং ডাক্তার সেলিবি ভাবতঃ ইহা স্বীকারও করিয়াছেন।

এস্থলে একটা কথা হইতে পারে যে আমাদিগের দেহ পোষণের আবশ্যকীয় পদার্থ সকল সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য বস্তু হইতেই পাওয়া যায়; এবং যে বস্তু হইতেই পাওয়া যাউক, ঐ পদার্থ সকলের গুণ একই প্রকার। সুতরাং আহার্য্য বস্তু যাহাই হউক না কেন তাহাতে কিছুই আসে যায় না। আহার্য্যবস্তুভেদে ব্যক্তির স্বভাব বিভিন্ন হইবার কোন কারণ নাই। ঈদৃশ প্রতিবাদ সঙ্গত নহে। জন্তুগণ, সুতরাং মানবও, জৈব পদার্থ ব্যতীত তথাকথিত জড় পদার্থ খাইতে পারে না। উদ্ভিদ্‌গণ অঙ্গার, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস্ প্রভৃতি

† এই সময় ঐ ভ্রূণকে কলল বলে।

* Physiological Condition. Determination of sex, page 105. "It is not impossible that the sex of individual may be modified after fertilization if the physiological condition on which sex depends can be changed" Loeb.

* দীর্ঘকাল সেবন করিলে।

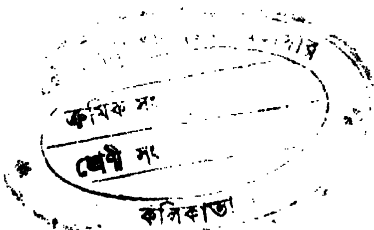
জড় পদার্থ পরিপাক করিয়া স্বদেহ মধ্যে জৈব পদার্থে পরিণত করিয়া থাকে এবং তাহাতেই তাহাদিগের দেহ পুষ্টি হয়। কিন্তু জন্তুগণ ঐ সকল জড় পদার্থ দেহ মধ্যে পরিপাক করতঃ দেহ পোষণ করিতে পারে না। তাহারা উদ্ভিদ আহার করতঃ ঐ সকল জড় পদার্থ দেহ মধ্যে গ্রহণ করে; তদ্দ্বারাই তাহাদিগের দেহ পোষণ হয়। জৈব পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থে জন্তুগণের দেহ পোষণ হয় না। কিন্তু সমান জড় পদার্থে গঠিত বিভিন্ন বস্তুর যেমন বিভিন্ন গুণ হইতে পারে, তেমনই সমশ্রেণীর অথবা সমজাতীয় কিম্বা সমপ্রকারের জৈব পদার্থের গুণও সর্ব্বদাই বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। সুতরাং জৈব পদার্থের গঠন এক হইলেই গুণও এক হইবে, এরূপ কথা সঙ্গত হইতে পারে না। এস্থলে দুইটী দৃষ্টান্ত দিব। জড় পদার্থ মধ্যে অঙ্গার ও হীরক এক পদার্থই; কিন্তু গুণের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। মানুষ ও বানর সম শ্রেণীর জীব, অশ্ব এবং জেব্রা সমজাতীয় জীব। ইহাদিগের দেহের গুণও অত্যন্ত বিভিন্ন; মস্তিষ্ক ত সম্পূর্ণ পৃথক-ধর্ম্মী। দুইজন মানুষের মস্তিষ্ক সমান জৈব পদার্থে গঠিত হইলেও গুণে সম্পূর্ণ পৃথক হইতে পারে এবং হয়ও। সমস্ত জীবকোষের, সুতরাং, সমস্ত জীবদেহের মূল প্রটোপ্লাসম্। ইহার গঠন একই প্রকার। তথাপি বিভিন্ন উদ্ভিদ্ দেহের এবং বিভিন্ন জন্তু দেহের প্রটোপ্লাসমের গুণ কত বিভিন্ন! উদ্ভিদের প্রটোপ্ল্যাসম্ হইতে উদ্ভিদই হয়, জন্তু হয় না; জন্তুর প্রটোপ্ল্যাসম্ হইতে জন্তুই হয়, উদ্ভিদ্ হয় না। এক প্রকার উদ্ভিদের প্রটোপ্ল্যাসম্ হইতে অন্য উদ্ভিদ্ হয় না; এক জন্তুর প্রটোপ্ল্যাসম্ হইতেও অন্য জন্তু হয় না। এ সকল কথা বংশানুক্রম * শাস্ত্রের অন্তর্গত; এস্থলে বিস্তারে বলা যাইতে পারে না। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে বিভিন্ন জৈব পদার্থের একতা অথবা সমতায় তাহাদিগের গুণ সাম্য হইতে দেখা যায় না। জৈব পদার্থের গঠনের সাম্যের উপর তাহার গুণ নির্ভর করে না। জীবন্ত অবস্থায় ত নির্ভর করেই না; মৃত অবস্থাতেও নহে। এক স্থানেই দুইটী সহোদর ভ্রাতার জীবন্ত দেহ যেমন পৃথক গুণযুক্ত হয়, তাহাদিগের-মৃত দেহও তেমনই। ঐ দুইটী মৃত দেহ সমান সময়ে পচিয়া যায় না; অথবা সমান সময়ে গোরের মাটীতে মিশিয়া যায় না। সমশ্রেণীর অথবা সমপ্রকারের জৈব অন্ন, চর্ব্বি ইত্যাদি পদার্থ বিভিন্ন ধর্ম্মী হইতে দেখা যায়। ঈদৃশ অবস্থা সকল প্রণিধান করিলে বুঝা যায় যে উপরের লিখিত প্রতিবাদ বাক্য সমূলক নহে। জন্তুগণের, বিশেষতঃ উন্নত জন্তুগণের, আহার্য্য বস্তুর সহিত চরিত্রের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ইহা যে কেবল বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় তাহা নহে, প্রত্যক্ষও দেখা যায়। কোন্ আহার্য্য বস্তু কোন্ দেশে কোন্ জাতীয় মানবের উপর কিরূপ ক্রিয়া করে তাহা ভূগোলদর্শন দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। আজি নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি না। মানব আদিকাল হইতে কোন্ দেশে কিরূপ আহার উপকারজনক হইবে তাহা বিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়াই স্থির করিয়াছে। তাহাতে তাহার জাতিগত চরিত্রও নানা প্রকার হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক কারণে চরিত্র গঠিত হয় না। যে সকল কারণে হয় তাহার মধ্যে আহার্য্য ভেদ অন্যতম। মাংসাশী এবং উদ্ভিজ্জভোজী জন্তুগণ

* Heridity.

মধ্যে চরিত্রেরও গুরুতর প্রভেদ দেখা যায়। ভাত এবং রুটি ভোজনেও ঐরূপ প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। ঘৃত এবং মাখন এই দুইটী স্নেহপদার্থ এক জন্তুর দুগ্ধ হইতে গ্রহণ করিলেও তাহাদিগের গুণ পৃথক হয়। গো হইতে এবং মহিষ হইতে ঘৃত সংগ্রহ করিলেও গুণ ভেদ হইতে দেখা যায়। সুতরাং দৈহিক ক্রিয়ার তারতম্য উৎপাদন করিবার সহিত মানসিক অবস্থারও পার্থক্য উৎপাদন করিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। স্নায়ু মণ্ডলের, সুতরাং মস্তিষ্ক পদার্থের উপর চরিত্র নিশ্চয় নির্ভর করে। সুতরাং আহার্য্য ভেদে মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়াবৈষম্য হইলেই চরিত্র বৈষম্যও হইবে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ডারুইন্ দেখাইয়াছেন * যে, যে মানব যেরূপ আহার করিতে পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত তাহার পরিবর্ত্তনে আয়ু হ্রাস বংশ হানি হয়। কেন হয় তাহা ভাল বুঝা যায় না। এই এক কারণেই চরিত্র কত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। যে বহুপত্য এবং যাহার বংশহানি হইতে চলিল এতদুভয় ব্যক্তির চরিত্র ঐ একমাত্র কারণেই অত্যন্ত পৃথক হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আহার্য্যের দিক হইতে এই দুরূহ বিষয় আলোচনা করিলে তাহার সহিত চরিত্রের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকা অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে বস্তুভেদে মুখ্য অথবা গৌণ হইবে, তাহা পশ্চাৎ আলোচনা করিব।

শ্রীশশধর রায়।



জাপানের শিক্ষা-পদ্ধতি

(জাপান হইতে লিখিত পত্র)

আমি এখন জাপানের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল দেখিবার জন্য টোকিওতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে কিওটো রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্বের অধ্যাপক তোশিও নোজ্ঞামীর সহিত পরিচয় হয়। তাঁহার পরামর্শমত কিওটো সহরে একটী প্রাথমিক শিক্ষালয় দেখিতে যাই। কিওটো সহরে প্রায় সাত লক্ষ লোকের বাস। সহরটীকে ৮০টী বিভাগে ভাগ করিয়া নেওয়া হইয়াছে। প্রতি বিভাগে অন্ততঃ একটি প্রাথমিক শিক্ষালয়। কোনও কোনও বিভাগে দুইটী। মোট প্রায় ৭৫,০০০ বালক বালিকা এই সব প্রাথমিক শিক্ষালয়ে পড়িতে আসে। ছয় বৎসর বয়স হইলেই জাপানের সকল বালক ও বালিকা প্রাথমিক শিক্ষালয়ে পড়িতে আসিতে বাধ্য। কিওটো সহরে এই ৭৫০০০ বালকবালিকাদিগকে পড়াইবার জন্য ১৪০০ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আছেন। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নাও থাকিতে পারে;

---

* Descent of Man. Ch. VII.

† এবং পরিজন।

কিন্তু নর্ম্যাল স্কুলে পড়িয়া প্রত্যেকের শিক্ষাদান কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করা চাই। শিক্ষকদের বেতন মাসে অন্ততঃ ৮০ য়েন্ শিক্ষয়িত্রীর বেতন মাসে অন্ততঃ ৬০ য়েন্। আজকালকার হিসাবে ১০ য়েন্ ১৭৲ টাকার সমান। প্রধান শিক্ষকের বেতন বেশী। আমি যে প্রাথমিক শিক্ষালয়টী দেখিতে গিয়াছিলাম তাহার প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৭০ য়েন্। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সহিত তুলনা করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে জাপানে রাঁধুনীর বেতন মাসে ৩০ য়েন্। বলা বাহুল্য যে এই সব প্রাথমিক শিক্ষালয়ে ছাত্র ছাত্রীরা বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করে। বেতন দিবার ব্যবস্থা থাকিলে তাহাদিগকে শিক্ষালয়ে পড়িতে আসিতে বাধ্য করা চলে না। প্রত্যেক বালকবালিকাকে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতেই হইবে (compulsory elementary education) এরূপ ব্যবস্থা করিলে, শিক্ষালাভ বিনা বেতনে (free) হইবে এব্যবস্থাও করিতে হয়। এই ১৪০০ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর বেতন কিওটো সহর দেয়।

অধ্যাপক নোগামী পূর্ব্বেই টেলিফোনে সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলেন যে আমি নিস্শো শো গাক্কো (Nissho Sho Gakko) বা নিস্শো প্রাথমিক শিক্ষালয় দেখিতে যাইব। প্রধান শিক্ষক যদি ইংরাজী বলিতে না পারেন, তবে সে শিক্ষালয়ে আমার যাওয়া বা না যাওয়া সমান দাঁড়ায়। আমি জাপানী ভাষা জানি না। আর জাপানী শিক্ষকেরা অনেকেই ইংরাজী পড়েন বটে, কিন্তু এত কম ইংরাজী জানেন যে তাঁহাদের সহিত মনের ভাব বিনিময় করা আমার পক্ষে সহজ সাধ্য নয়। সেই জন্য অধ্যাপক নোগামী আমাকে নিস্শো শো গাক্কোতে যাইতে পরামর্শ দেন। তথাকার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সাকুতারো তামুরা ইংরাজীতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিবেন। আমি যাইতেই শ্রীযুক্ত সাকুতারো তামুরাকে সংবাদ দেওয়া হইল।

সামনে উঠানে ছোট একটী বাগান। ঝরঝরে পরিষ্কার বাড়ী। বুট জুতা পায়ে দিয়া ঘরে ঢুকিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইল। এমন পরিষ্কার কাঠের মেজে। ছাত্র ছাত্রীরা হয় "তাবি" মোজা পায়ে, নয় খড়ের জুতা, পায়ে দিয়া ঘুরিতেছে। বাহিরে মাটিতে হাঁটিবার সময় তাহারা কাঠের খড়ম পায়ে দেয়। ঘরে ঢুকিবার সময় কাঠের খড়ম পা হইতে খুলিয়া ফেলে ও খড়ম রাখিবার যে নির্দ্দিষ্ট যায়গা আছে সেখানে খড়ম রাখে। তামুরা মহাশয় বলিলেন "আপনি জুতা পায়ে দিয়াই আসুন।" আমি প্রাণপণে জুতার তলা পাপোষে [illegible]। একটী ঘরে আমরা দুইজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা সুরু করিতেই শিক্ষালয়ের একটী চাকরাণী আসিয়া চা খাইতে দিল। জাপানীদের সৌজন্যের কথা পূর্ব্বপত্রেও বলিয়াছি।

তামুরা মহাশয়ের শিক্ষালয়ে ৬০০ বালক বালিকা পড়িতে আসে। তাহার মধ্যে ১০০ শিশু কিণ্ডারগার্টেন্ শ্রেণীতে পড়ে। কিণ্ডারগার্টেন যাহারা পড়ে তাহারা বেতন দেয়। কিণ্ডারগার্টেন পড়ানো বা না পড়ানো অভিভাবকের খুসী। যে শিশু কিণ্ডারগার্টেনে পড়িবে সে মাসে ৩ য়েন্ বেতন দিবে। কোনও কোনও শ্রেণীতে বেতন মাসে ৪ য়েন্। এই ১০০টী শিশুর জন্য এই শিক্ষালয়ে ৬টী শিক্ষয়িত্রী। বাকী ৫০০ ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য ৩টী শিক্ষয়িত্রী ও ১০টী শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক তামুরা মহাশয়কে ধরিলে মোট ২০ জন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী।

সকাল বেলা ৮॥০ টায় শিক্ষালয়ের কাজ সুরু হয় ও বেলা ১॥ টায় শেষ হয়। ১১ টায় সময় শিক্ষালয়েই বসিয়া সকলে একবার খায়। তামুরা মহাশয় আমাকে নিয়া গিয়া দেখাইলেন, কিণ্ডারগার্টেনের শিশুরা সব সারি দিয়া বসিয়া শিক্ষয়িত্রীর সহিত খাইতেছিল। শিক্ষালয়ে যেমন পড়িবার যায়গা আছে, তেমনি খাইবার যায়গা আছে, খেলিবার যায়গা ত আছেই, স্নান করিবার ও মুখ হাত ধুইবার যায়গাও আছে। জাপানে ছেলে ও মেয়ে একই শিক্ষালয়ে পড়িতে যায়। সাধারণতঃ ছেলেদের জন্য পৃথক্ শ্রেণী। মেয়েদের জন্য পৃথক শ্রেণী। কিণ্ডারগার্টেনে শাসনের চিহ্নও দেখা যাইবেই না। সমস্ত শিক্ষালয়ে শাসনের চিহ্ন আমার চোখে পড়িল না। তখন ছুটী হইয়াছে, খাইবার সময়। দেখিলাম অনেক ছেলে রং ও তুলি নিয়া তখন শিক্ষালয়ের উঠানের একটা গাছ আঁকিতেছে। প্রধান শিক্ষক আমাকে সঙ্গে নিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাহাদের তাহাতে ভয় বা সঙ্কোচ বা চাঞ্চল্য কিছু দেখা গেল না। একটী ছোট ঘরের পাশ দিয়া আমরা দুইজনে যাইতেছিলাম। আমার মনে হইল সেই ছোট ঘরটীতে একটী ছেলে বন্ধ রহিয়াছে। আমি ভাবিলাম ঐ ছেলেটীকে বোধ হয় শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। আমি দুই পা পিছু হাটিয়া সেই ছোট ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তামুরা মহাশয় দরজা খুলিয়া দিলেন, দেখিলাম ছেলেটী নিবিষ্ট চিত্তে জানালার ভিতর দিয়া যে গাছটী দেখা যাইতেছে তাহাই তুলি ও রং দিয়া চিত্রিত করিতেছে। খাবার সময় যে ছুটী হইয়াছিল তখন এই ছেলেরা ছবি আঁকিতেছে, আর বেশীর ভাগ ছেলে মেয়েরা বাহিরে রোদে খেলিতেছে ও ছুটোছুটী করিতেছে। যেদিন বৃষ্টি হয় সেদিন খেলিবার জন্য ও ব্যায়াম করিবার জন্য প্রকাণ্ড ব্যায়ামশালা আছে। খেলা, পড়া, বেড়ানো— কোনও সময়েই শিক্ষককে দেখিয়া সঙ্কোচ নাই। বাড়ীতে যেমন মা বাপের নিকট ভয় বা সঙ্কোচ নাই, শিক্ষালয়েও শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর নিকট তেমনই সরল স্বাভাবিক ব্যবহার।

একজন শিক্ষক এক শ্রেণীতে মেয়েদের নীতিশিক্ষা দিতেছিলেন। তামুরা মহাশয় আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। মেয়েরা কালচেহারা বিদেশী দেখে একটু থমকিয়া গেল। শিক্ষক মহাশয় যেমন পড়াইতেছিলেন ও বক্তৃতা করিতেছিলেন তেমনই করিতে লাগিলেন। আমরা দুইজনে বাহিরে চলিয়া আসিলে শুনিতে পাইলাম সেই শ্রেণীর সমস্ত মেয়েরা কলরব করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে কি বলিতেছে। এবার আমরা দুইজনে ছেলেদের এক শ্রেণীতে গেলাম। একজন শিক্ষক উদ্ভিদ্বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছিলেন। তামুরা মহাশয়ের হঠাৎ একটা দরকারী কাজ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তিনি আমাকে বলিয়া গেলেন যে তিনি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আমি যেন ঐ শ্রেণীতেই থাকি। ছেলেদের আমার দিকে যেন নজরই পড়িল না। শিক্ষক মহাশয়ের হাতে এক সরু বাঁশের কঞ্চি, প্রায় ৫ হাত লম্বা। কালো বোর্ডে খড়ি দিয়া ছবি আঁকিতেছেন ও ঐ বাঁশ দিয়া ছবির ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছেলেদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহার টেবিলে যেমন একটী চারাগাছের একটা অংশ রহিয়াছে, ঠিক সেই রকম অংশ প্রত্যেক ছেলের টেবিলের উপর রহিয়াছে। শিক্ষক মহাশয় সেই অংশটুকু হাতে করিয়া, কাটিয়া, কখনও বা বোর্ডে ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন. আর কখনও বা সেই ৪০।৪৫টী ছেলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে ৫।৬ জন এক হাত তুলিয়া শিক্ষক মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া আছে।

ঐ ৫০৬ জনের মনে শিক্ষক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া কি যেন প্রশ্ন উঠিয়াছে। তাহার উত্তর শিক্ষক মহাশয়ের কাছে চাই। এক সঙ্গে ৫০৬ জন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, তাহা হইলে গোলমাল হইবে। সুতরাং ৫০৬ জন হাত তুলিয়া মাষ্টার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া আছে। মাষ্টার মহাশয় একজনকে ইঙ্গিত করিলেন। সে দাঁড়াইয়া জোর গলায় তাহার প্রশ্ন করিল। মাষ্টার মহাশয় তাহার উত্তর দিয়া, বোর্ডে ছবি আবার আঁকিয়া, বুঝাইয়া দিলেন। ঐ ৫০৬ জনের মধ্যে অনেকেই আর প্রশ্ন করিল না। তাহাদের প্রশ্নের উত্তর তাহারা পাইয়াছে। আবার মাষ্টার মহাশয় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। এবার সব শেষ পংক্তি হইতে একজন হাত তুলিল। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে ইঙ্গিত করিতেই সে দাঁড়াইয়া তাহার প্রশ্ন করিল। আমি হয়ত ১০।১২ মিনিট সেই শ্রেণীতে ছিলাম। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ৫ বার এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তর চলিতে লাগিল। একটী প্রশ্নে প্রথম দুই পংক্তির দুই তিনটী ছেলে একটু মৃদু হাসি হাসিল। মাষ্টার মহাশয় কিন্তু কোনও প্রশ্নই তুচ্ছ করিলেন না। প্রশ্ন জিজ্ঞাসু ছাত্রের মুখে বা স্বরে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা দ্বিধার লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। তামুরা মহাশয় ফিরিয়া আসিলে আমি বলিলাম "তোমার এই শ্রেণী দেখিয়া আমি যেমন আনন্দ পাইয়াছি, এমন আর কিছুতে পাই নাই। তোমার শিক্ষালয়ের অনেক ব্যাপারেই আনন্দ পাইয়াছি। কিন্তু একি সুন্দর স্বাভাবিক শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ। ছেলেগুলির মন চারাগাছের ঐ অংশে যেন ডুবিয়া আছে। আর যার মনে যে প্রশ্ন উদয় হইতেছে, নিঃসঙ্কোচে শিক্ষকের নিকট তাহার উত্তর চাহিতেছে।" আমরা যতক্ষণ ঐ শ্রেণীতে ছিলাম ও তথা হইতে চলিয়া আসিবার ঠিক পরেই ঐ শ্রেণীর ছেলেদের মনে আমার বা তামুরা মহাশয়ের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন জাগিয়াছিল বলিয়া মনে হইল না। তাহারা যেন ঐ গাছ লইয়া মাতিয়াছিল। আমার মনে আছে আমরা যখন কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম, আমাদের গণিতাধ্যাপক মিঃ লিটল্‌কে কেহ কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই লিটল্ সাহেব তাহাকে বলিতেন—"তোমার মত আর সকলে যদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করে, তাহা হইলে কি ভীষণ গোলমাল হয়। তাহা হইলে আমার বক্তৃতা দেওয়াই বন্ধ হইয়া যায়।" সে প্রশ্নের উত্তর ত লিটল্ সাহেব দিতেনই না। যাহাতে আর কেহ প্রশ্ন না করে তাহার জন্য ঐরূপ বলিতেন। আমরা তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতাম। সে আজ ২৭ বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই জাপানী শিক্ষালয়ে ছাত্রদের মনে কৌতূহল জাগাইবার চেষ্টা করা হয়। সমস্ত শিক্ষালয় পরিদর্শন করিয়া আমরা দুইজনে যখন আবার বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম, চাকরাণী আসিয়া আমাদিগকে এক পেয়ালা কফি দিল।

তামুরা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে কোনও ছাত্র পড়াশুনা অবহেলা করিলে বাড়ীতে জানান হয় কি না। তিনি বলিলেন যে প্রতি মাসে একবার প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর মায়ের সহিত শিক্ষকের দেখা হয় ও ছাত্র বা ছাত্রীর বিষয় আলোচনা হয়। বাপের সহিত পরামর্শ হয় বৎসরে ৩।৪ বার। স্বদেশী এক ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন যে তিনি জাপানীদের কাছে শুনিয়াছেন যে জাপানী ছেলে মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষালয়ে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকে। কবে ছয় বৎসর পূর্ণ হইবে আর শিক্ষালয়ে যাইতে পারিবে তাহার জন্য ব্যস্ত হয়। যে রকম বেড়াইবার বন্দোবস্ত, তাহাতে উৎসুক হইবারই কথা। দলে দলে ছাত্র ও ছাত্রী শিক্ষক

ও শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে বসন্তে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। সারাদিন বেড়াইয়া, খেলিয়া, খাইয়া, দলে দলে তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে নিজেদের গ্রামে বা সহরে ফিরিয়া যাইতেছে। বসন্তে এ দৃশ্য জাপানের যেখানে যাও সেখানেই দেখিবে। শুনিয়াছি অক্টোবর মাসেও ছেলে মেয়েদের নিয়া শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী এইরূপ বেড়াইয়া বেড়ান। এখন টোকিওতে বড় মেলা হইতেছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে Peace Exhibition। পরশুদিন সেখানে গিয়া দেখি, ছেলে মেয়ের দল শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে সেখানেও ভিড় করিতেছে। শিক্ষক ও ছাত্রে এই রকম সম্বন্ধ হইলে ছেলেমেয়েদের পক্ষে শিক্ষালয়ে যাইবার জন্য ব্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

এই প্রাথমিক শিক্ষালয়ে জাপানী ভাষা শেখান হয়। আর পাটীগণিত, ভূগোল, ইতিহাস, ভূতত্ব, প্রাণীতত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ব, রসায়ণ ও খণিজতত্ব শেখান হয়। অঙ্কন, চিত্র, সঙ্গীত ও ড্রিল শেখান হয়। ছাত্রেরা বেতন দেয় না বটে। কিন্তু খাতা, বই, রঙ্গীন পেন্সিল, তুলি, রং, কালী, কলম, কাগজ ইত্যাদি নিজের খরচে কেনে। প্রত্যেক ছাত্র একটি টুপি কেনে। বইয়ের দাম ছাড়া, খাতা, তুলি, রং প্রভৃতিতে বৎসরে ২॥ য়েন্ হইতে ৪ য়েন্ প্রত্যেক ছাত্রকে খরচ করিতে হয়। বইয়ের দাম বৎসরে ১॥০ য়েন্ হইতে ৩ য়েন্ পড়ে। টুপি বৎসরে একটা কিনিতে হয়। টুপির দাম ৩ য়েন্। দুপুর বেলা খাবার খরচ ছাত্রেরা নিজেরা দেয়। যার যার বাড়ী থেকে খাবার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে যখন কাছাকাছি তীর্থস্থান, বাগান বা পাহাড় দেখিতে বাহির হয়, তাহার জন্য ছাত্রদের খরচ ছাত্রেরা নিজেরা দেয়। সুতরাং বেতন দেয় না বটে, তবু প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর খরচ খুব কম দাঁড়ায় না। অবশ্য শিক্ষকদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া বেড়াইবার সময় উহারা সকলেই তৃতীয় শ্রেণীতে যায় ও একসঙ্গে দল বাঁধিয়া যায় বলিয়া ভাড়াও কম দিতে হয়। কিন্তু তবুও প্রত্যেক ছেলে মেয়ের জন্য বাপ মায়ের খরচ নিতান্ত কম দাঁড়ায় না। আর এই শিক্ষালয়ের ২০ জন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর বেতন মোট মাসিক ১৫৭০ য়েন্, বৎসরে ১৮৮৪০ য়েন্। তাঁহাদের বেতন ছাড়া বাড়ী ঘর মেরামত, চাকর, জল, বিজলীবাতি, লেবরেটারী, সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য প্রতি বৎসর ২৫০০০ য়েন্ খরচ হয়। মোট ৪৩,৮৪০ য়েন্ বাৎসরিক ব্যয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আজকাল ১০০ য়েন্ ১৭০৲ টাকার সমান। সুতরাং এই একটী প্রাথমিক শিক্ষালয়ের জন্য প্রতি বৎসর কিওটো সহর ৭৪,৫২৮ টাকা খরচ করে। তা ছাড়া ছাত্রদের অভিভাবকদের যা খরচ তাহার কিছু পরিচয় দিয়াছি। এই সব শিক্ষালয়ে পড়িতে আসে কাহারা?—মুচি, মিস্ত্রী, মেছুনী, মুদি প্রভৃতির ছেলেমেয়েরা।

ছয় বৎসর প্রত্যেক বালকবালিকা এই সব প্রাথমিক শিক্ষালয়ে পড়িতে বাধ্য। প্রথমে বাপ মায়েরা আপত্তি করিত। আমাদের দেশে যেমন আপত্তি শুনা যায়, জাপানেও সে সব আপত্তি উঠিয়াছিল। আমাদের দেশে একজন "নাইট" উপাধি ভূষিত ধনাঢ্য স্বদেশহিতৈষী বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন যে প্রত্যেক বালক বালিকা যদি শিক্ষালয়ে পড়িতে বাধ্য হয় তবে কয়েক বৎসর পরে দেশে আর চাকর বা মজুর পাওয়া যাইবে না। একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার, তিনি মাঝে মাঝে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন—আমাকে

বলিয়াছিলেন যে তিনি প্রত্যেককে বাধ্য করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার বিরোধী, দেশে তা হলে ছোট লোকেরা প্রায় চাকর মজুর হইতে চাহিবে না। জাপানেও এ সব আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু যে বৎসর জাপান নিয়ম করিয়া দিল যে প্রত্যেক বয়োপ্রাপ্ত যুবককে সৈন্য হইয়া দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে শিখিতে হইবে, সেই বৎসরই জাপান এই সব প্রাথমিক শিক্ষালয়ে বালকবালিকাদিগের শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়া দেয়। সম্রাটের অনুজ্ঞা প্রচারিত হইল :—"কোনও সমাজে নিরক্ষর পরিবার থাকিতে পারিবে না, কোনও পরিবারে নিরক্ষর পুরুষ বা স্ত্রী থাকিবে না।" সে আজ বেশী দিনের কথা নয়, ৫০ বৎসরও হয় নাই। আজ জাপানে রেলওয়ে ষ্টেশনে মুটের হাতে আমি ২০ য়েনের নোট দিতেছি সে আমার জন্য টিকিট কিনিয়া আনিতেছে, বাকী টাকার হিসাব মুখে মুখে দিতেছে, আমার তোরঙ্গ বাক্সের জন্য লেবেল কিনিয়া আনিয়া জাপানী ভাষায় লিখিয়া দিতেছে, "য়ামাদা হইতে য়োকাহামা যাইবে," মালআপিসে মাল রেজেষ্ট্রী করিয়া রসিদ আমাকে দিতেছে ও ছোট পুটুলি বা ব্যাগ বহিয়া কোন্ গাড়ীতে কোন্ কামরায় আমাকে উঠিতে হইবে সব আমাকে বলিয়া দিতেছে। এখানে সব জাপানী ভাষায় কাজ হয়। আমি জাপানী জানি না। ষ্টেশনের অধিকাংশ লোক ইংরাজী জানে না। সুতরাং এ সব কাজের জন্য মুটেই আমার বন্ধু ও সহায়। কোবেতে রিক্শা কুলিরাও আমার টিকিট কিনিয়া লেবেল লিখিয়া দিয়াছে।

জাপানীরা বলে যে জাপানী যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তার জন্য বাহাদুরী শিণ্টো-বাদের। আমি তাহাদিগকে বলি যে শিণ্টোবাদ অনেক বিষয়ে জাপানীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে শিখাইয়াছে সত্য। কিন্তু আজকাল জাপানীকে যতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখা যায় তার জন্য বাহাদুরী ঐ রাজকীয় অনুজ্ঞার—"আমার রাজ্যে কোনও সমাজে নিরক্ষর পরিবার থাকিতে পারিবে না, কোনও পরিবারে নিরক্ষর পুরুষ বা স্ত্রী থাকিবে না।" আমি কোনও নূতন দেশে গেলে বড় বড় সহরের গরিব লোকদের পাড়া দেখিতে কখনও ভুলি না। জাপানেও দেখিয়াছি গরিবের পাড়ায় যে সব ছোট ছেলে মেয়েরা শিক্ষালয়ে যায় না, ছয় বৎসর বয়স যাহাদের হয় নাই, তাহাদের চেয়ে অনেক বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেই সব ছেলে মেয়ে যাহাদের বয়স ছয় বৎসরের বেশী হইয়াছে ও শিক্ষালয়ে যাওয়া যাইতে বাধ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিসশো শো গাক্কোতে স্নান ও হাত মুখ ধুইবার ব্যবস্থা আছে। শিণ্টোবাদী বাপ মা ছোট শিশুকে যতটা পরিষ্কার রাখিতে যত্ন করে, তার চেয়ে বেশী পরিষ্কার থাকিবার জন্য শিক্ষালয়ে বালক বালিকারা শিক্ষা পাইয়া থাকে। আমাদের দেশের হিন্দুদের ন্যায়, জাপানীরা শরীর পরিষ্কার রাখিবার জন্য প্রত্যহ স্নান করে। এক পাড়াগাঁয়ে মুচীর স্ত্রীকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা জাপানীতে জিজ্ঞাসা করিলাম "হাঁ গা, তোমার ছেলে মেয়েরা রোজ স্নান করে?" মুচিবৌ বলিল "মাই নিচি" অর্থাৎ প্রতিদিন। শীতের দেশে গরম জল না হলে স্নান করা যায় না। খোলা যায়গায় স্নান করা চলে না। সুতরাং স্নান ব্যয়সাধ্য। সে দেশে যে এরা প্রত্যহ স্নান করে এটা এদের খুব প্রশংসার কথা। তার উপর শিক্ষালয়ের শিক্ষা। ফলে জাপানী জন সাধারণ, ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের চেয়ে শরীর সম্বন্ধে বেশী পরিষ্কার।

এই গেল প্রাথমিক শিক্ষার কথা। তার উপর মধ্য শিক্ষালয় (৪ হইতে ৫ বৎসর) । তার উপর নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তৈয়ার করা হয় (৩ বৎসর) যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে চায় তাহারা পূর্ব্বে যায় উচ্চশিক্ষালয়ে (৩ বৎসর)। তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর (চিকিৎসা শাস্ত্রের বেলা চার বৎসর) পর ছাত্র গাকুশি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। "গাকুশি" ডিগ্রী বা উপাধি নহে। উপাধিকে বলে "হাকুশি"। আরও দুই বৎসর পর "হাকুশি" উপাধি পাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের লোকের জানিবার বিশেষ কথা এইটী যে জাপানের ছয় কোটী লোকের উচ্চশিক্ষার জন্য ৫টী রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবে না তাহারা মধ্যশিক্ষালয় হইতে হয় নর্ম্ম্যাল স্কুলে গিয়া শিক্ষক হইবার চেষ্টা করে, নয় জীবিকা উপার্জ্জনের অপর কোনও পথে কৃতিত্বলাভ করিতে চেষ্টা করে। প্রাথমিক শিক্ষালয়ে যেমন প্রত্যেক বালকবালিকাকে যাইতেই হইবে, মধ্য শিক্ষালয় তা নয়। অনেকেই মধ্যশিক্ষালয়ে যায় না। তাহারা সোজা জীবিকা উপার্জ্জনের পথে চলিয়া গিয়া সংগ্রামে লাগিয়া যায়। যাহারা প্রাথমিক শিক্ষালয়ের পরও আরও শিক্ষালাভ করিতে চায় তাহারা মধ্য শিক্ষালয়ে গিয়া আবার ৫ বৎসর পড়ে। তার পরে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবার তাহারা উচ্চশিক্ষালয়ে যায় (৩ বৎসর)। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবে না, শিক্ষকও হইবে না, তাহাদের জীবন সংগ্রামের আয়োজনের জন্য অপর অনেক শিক্ষালয় আছে, যথা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, চিকিৎসা, নৌচালনা, মৎস্যসম্পর্কীয়, বনসম্পর্কীয়, কলকারখানা সম্পর্কীয়, রেশমসম্পর্কীয়, তড়িৎশক্তিসম্পর্কীয় ইত্যাদি। এই সব শিক্ষালয়ের সংখ্যা ৭ হাজারের বেশী।

সর্ব্বোচ্চ শিক্ষালয় রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৫টীর কথা বলিয়াছি। তাহাদের সম্বন্ধে শুধু এই কথা জানাইতে চাই ; টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতি বৎসর সরকার হইতে ২৯,৫৩,৩০৫ য়েন্ ও কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৭,১৫,৪২৮ য়েন্ বরাদ্দ করাই আছে। এর চেয়ে বেশীই প্রতি বৎসর পায়। কোনও বৎসর এত অর্থ খরচ না হইলে তাহা পর বৎসর সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই হিসাবে জমা থাকে। ১৯২১ সালে কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৪৩০ এবং মোট খরচ হইয়াছিল ৩৩,১২,৪৪২ য়েন্, আমাদের দেশের টাকায় ৫০ লক্ষ টাকা। আমাদের ব্যবস্থাপকগণ আশু বাবুর সহিত আড়ি করিয়া উচ্চশিক্ষার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইতেও লজ্জা বোধ করেন নাই। আর এখানে প্রতি বৎসর টোকিও ৫০ লক্ষ টাকার বেশী পাইতেছে, কিওটো ২৯ লক্ষ টাকার বেশী পাইতেছে।

কর্ম্মকুশল বলিয়া জাপানীর তেমন সুখ্যাতি করিবার আমি কিছু পাই নাই। ইহাদের ডাকঘরের বেবন্দোবস্তের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্যান্য ব্যাপারেও ইহারা যে তেমন একটা কিছু বেশী চটপটে, কর্ম্মকুশল, তাহার প্রমাণ পাই নাই। শুনিতে পাই একটি ব্যাপারে ইহাদের কাণ্ডকারখানা খুব বড়, কর্ম্মকুশলতাও প্রশংসার্হ। সেটি যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে। সেখানে ইহারা নাকি ভড়িঘড়ি চটপটে ওস্তাদ, ঘড়ির কাঁটা দেখে কাজ করে। সেখানে শাসনও খুব কড়া। তার ছোট খাটো প্রমাণ এদের পুলিস। পুলিসকে ইহারা খুব মানে। কিন্তু আমার

কাছে বড় ভাল লাগিয়াছে জাপানী শিশু ও জাপানী বালক বালিকা, আর জাপানী স্ত্রী ও মাতা। এত মাকে রাস্তায়, গাড়ীতে, বাড়ীতে ছেলের যত্ন করিতে দেখিলাম। একদিন একটিবারও দেখি নাই যে কোনও মায়ের একটী বার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। সময়ে সময়ে জাপানী পুরুষকে রাগ করিতে দেখিয়াছি—তাও খুব কম। একদিন মাত্র দেখিয়াছি একজন আর একজনের গায়ে এক ঘুঁসি মারিয়াছে। কিন্তু ছেলে মেয়ের উপর মুহূর্ত্তকালের জন্ত বিরক্ত হইয়াছে এ আজ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপানী শিশুকে পিঠে নিয়া মা বাহিরে সর্ব্বদাই চলা ফেরা করিতেছে। সুতরাং মা ছেলে মানুষ করিতেছে ইহা প্রায় প্রতিদিনই দেখিতেছি। এক দিনও কি দেখিলাম না যে একটী মায়ের একবারও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। এদের ছোট ছেলে মেয়েগুলি যেন সজীবতার প্রতিমূর্ত্তি। কিছু না পায় ত খড়ের দড়ি হাতে করে খড়ম পায়ে নাচ্‌ছে, আর দড়ি মাথার উপর দিয়া পায়ের নীচে দিয়া ঘুরাইতেছে। কাল দেখিয়াছিলাম এক শ্রীমতী, বয়স হদ্দ তিন বৎসর, সঙ্গী নাই, হাতে দড়িও নাই, ফুটপাথের উপর থেকে ছোট্ট নর্দ্দামা ডিঙ্গাইয়া খড়ম পায়ে লাফাইতেছে, একবার লাফাইয়া রাস্তায় নামিতেছে আবার লাফাইয়া ফুটপাথে উঠিতেছে। এই ১০ মিনিট ধরিয়া করিতেছে। ইহাই হইল তার খেলা।

আমার "স্বরাজে" লিখিয়াছিলাম—"রাষ্ট্রের লোকবল চাও, তবে সুগঠিত সবল সুস্থ শিশুর প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। তাহার জন্ত চাই সুস্থ সবল সদাচারী পিতা; পূর্ণাঙ্গী দৃঢ়ব্রতা সন্তান-পালন-কুশলা স্বদেশপরায়ণা জননী" * * * এই বিষয়ে জাপান আমাদের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়েছে। এদিকে তোমরা অনেক কাজ করতে পার। একটা দেশ ও জাতি গড়ে তোলা ত এক বৎসরের কাজ নয়। বৎসরের পর বৎসর হাজার হাজার লোককে তাহার জন্ত সাধনা করিতে হইবে।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

য়ামাগাটা হোটেল, টোকিও, জাপান, ২৬শে জুন, ১৯২২।

* গত বৎসর "নব্য ভারতে" "স্বরাজ" প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।—নঃ ভাঃ

বাঙ্গালী নারীজীবনের দুঃখবরণ।

বাঙ্গালী নারীজীবন ভাল করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায়, দুঃখকেই তাঁহারা চরম ও পরমরূপে মানিয়া লইয়াছেন। এবং দুঃখের স্রোতেই সারাজীবন ভাসিয়া চলিয়াছেন। এ পৃথিবীতে তাঁহারা যে অনধিকার প্রবেশকারী জন্মের সময় হইতেই নীরবশঙ্খ ও মায়ের লজ্জা তাঁহাদের শিরায় শিরায় সে জ্ঞান সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। জন্ম তাঁহাদের যেমন অন্যায় ও লজ্জাজনক—মৃত্যু তেমনি সকল সময়েই বাঞ্ছনীয় ও গৌরবকর। বাল্যকালে অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে পিতামাতা বিবাহের ভাবনা ও অর্থব্যয় হইতে মুক্ত হইবেন—সুতরাং তাহা বাঞ্ছনীয়। বিবাহের পর সধবা থাকিতে মাথায় সিঁদুর, হাতে লোহা লইয়া যে কোন সময় মৃত্যুই সৌভাগ্য ও গৌরবের পরাকাষ্ঠা। তাহার পর বিধবা হইলে ত জীবনই মৃত্যু, তখন বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা ত অপরাধ ও পাপ কিছু হইতেই পারে না। মৃত্যুই কেবলমাত্র তখন স্বাভাবিক ও একমাত্র গতি। সতীদাহে ইহা একেবারেই সম্পাদিত হইয়া তাঁহারা জীবিত শবদেহ বহন করার অদ্ভুত বিসদৃশতা হইতে অব্যাহতি পাইতেন। বাস্তবিক আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সহিত উহা ঠিক খাপ খাইয়াছিল। বিবাহই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ঘটনা—জন্ম, মৃত্যু তাহার কাছে কিছুই নহে। তাহা দ্বারাই তাঁহাদের সমস্ত জীবন ভাগ করা হইয়াছে।

এইভাবে আজন্ম অভ্যস্ত হওয়ায় কোন দুঃখ, কোন অপমান, স্ত্রী পুরুষের যতই অন্যায় অদ্ভুত বৈষম্য হউক, কিছুতেই, তাঁহাদের মনে বিস্ময়, ক্রোধ বা বিদ্রোহের ভাব আনিতে পারে না। তাঁহারা শুধু দুঃখ, শুধু ব্যথা পাইতে পারেন মাত্র। সুখেই আশ্চর্য্য হইয়া আপনাকে অত সৌভাগ্যের অযোগ্য জ্ঞানে যাহা হইতে সে সুখলাভ ঘটে, তাহা যতই স্বাভাবিক হউক, তাহার প্রতি তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার সীমা, পরিসীমা থাকে না।

কান্না ও দুঃখ আমাদের "অন্তঃপুরে" এমনই বাসা লইয়াছে, এমনই মানাইয়া গিয়াছে যে, তাহার কারণ ঘটাইতেও আমাদের লজ্জা নাই, তাহা নিবারণ বা কমাইবার জন্যও কোন চিন্তা আমাদের স্বভাবতঃই মনে উদয় হয় না।

অবশ্য সুখ, আনন্দ, হাসি যে আমাদের মেয়েদের একেবারেই স্পর্শ করে না এমন নহে। কারণ তাহা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। অবস্থা যতই হীন ও দুঃখপূর্ণ হউক, আনন্দের রেখা তাহার মধ্যে উঁকি মারিবেই। অনেক সময় হীনজীবনের ইহাই ত সর্ব্বাপেক্ষা পরিহাস। আর আমাদের মেয়েরা অনেকেই যে জীবনের কোন না কোন সময়ে সুখ, সৌভাগ্যের মুখ দেখিতে পান না ইহাও নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের সমস্ত সুখই "সৌভাগ্য" মাত্র। তাহার ক্ষণস্থায়িত্ব ও চাঞ্চল্য এতই বেশী যে তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই তাহা স্বাভাবিক ভাবে লইতেই পারেন না। হয় ইহা তাঁহাদের অহঙ্কারী করিয়া তোলে, নতুবা হারাইবার ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া তাহা ভালমত গ্রহণ করিতেই পারেন না। শাস্ত্রে পরভাগ্যোপজীবিকে "নিত্যদুঃখিত" বলা হইয়াছে। তাহা হইলে আমাদের দেশের মেয়েদের

অবস্থার কথা কি আর বলিতে হইবে। পরভাগ্যোপজীবি পৃথিবীতে যদি কেহ, থাকে তাঁহারা তাহাতে প্রথমাধিকার পাইবেন সন্দেহ নাই।

দুঃখ তাঁহাদের এতই স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, যে অনেক সময়ে অকারণে ও তাহা সহ্য করিয়া থাকেন, এবং আপনাদের মধ্যে একজন অপরকে দুঃখ দিতেও ইতস্ততঃ করেন না। নিজজাতির উপর তাঁহাদের কি গভীর ঘৃণা! পুরুষেরা মনে মনে তাঁহাদের বঞ্চিত অবস্থা কতকটা জানেন বলিয়া বাহিরে আড়ম্বরে তাঁহাদের সম্বন্ধে বড় বড় কথা এবং অনেক সময় নানা "অনুগ্রহ" করিয়া তাহা ঢাকা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মেয়েরা আপনাদের সত্য অবস্থা জানেন ও সেই অনুসারেই পরস্পরের বিচার ও পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আপনাদের কোনরূপে বাড়াইয়া তোলার এতটুকুও প্রবৃত্তি নাই। আমাদের মেয়েদের উন্নত অবস্থার কথা যাঁহারা বক্তৃতায় ঘোষণা করেন তাঁহাদের, মেয়েরা নিজেরা আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধে কি মনে করেন, তাহার খোঁজ লইতে অনুরোধ করি। এই সর্ব্বদা আপনাদের প্রতি একান্ত হীনভাব ও দুঃখস্রোতে ভাসমানতা আমাদের মেয়েদের বিনয়, সংযম ও অদ্ভুত ত্যাগশক্তি ইত্যাদি আখ্যায় ঘোষিত হয়। ঐ সকল সদ্গুণ যে তাঁহাদের নাই এমন নহে কিন্তু তাহা অপরপক্ষে এতটা অন্যায়, অধর্ম্ম, আত্মপরিতৃপ্তির (self-indulgence) পরিবর্ত্তে ব্যয়িত হয় যে তাহার কোন মাহাত্ম্যই থাকে না, এমন কি তাহা কলুষিতই হইয়া পড়ে।

দুঃখের প্রতি আমাদের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহা দয়া ইত্যাদি কতকগুলি ভালবৃত্তিকেও উত্তেজিত করিয়া থাকে। বিশেষতঃ দুঃখ যখন অপরে আমাদের জন্য বহন করে, তখন তাহার চিত্র বড়ই মনোহারী। সেইজন্য আমাদের দেশের বিধবার সম্বন্ধে কবিদের উচ্ছ্বাসের এত ঘটা। যদিও ব্যবহারিক জগতে আমাদের সকল শুভকর্ম্ম ও অনুষ্ঠান হইতে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে রাখিয়াই থাকি! কিন্তু অপরের খরচে আমাদের ঐ সদ্বৃত্তির চর্চ্চা বিশেষ উচ্চভাব কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ থাকিতে পারে, অনেক স্থলে হয়ত তাহা করুণা না হইয়া আত্মতৃপ্তিও হইতে পারে। করুণা যখন জ্ঞানের সহায়তায় দুঃখের মূল দূর করিতে অগ্রসর হয়, তখনই তাহার সার্থকতা। নতুবা বিধবার দুঃখে "হায় হায়" করিব অথচ ঐ নামচিহ্নিত একটি বালিকা বা বৃদ্ধার মুখেও যদি একাদশীতে একবিন্দু জল কেহ দেয় তাহার ধোপা, নাপিত বন্ধ করিব এমন দয়াকে আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় তাহা আর বলিতে হইবে কি?

তাহার পর সকল রকম মানবধর্ম্ম বিশিষ্ট মনুষ্য জাতির অর্দ্ধাংশকে যদি অপরার্দ্ধের দয়াপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার ক্ষেত্রমাত্র হইয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে অবস্থাটা যে তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর বা গৌরবজনক কিছুই হওয়া সম্ভব নহে, একথা যুক্তি, তর্ক করিয়া বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

বাস্তবিক কল্পনার চোখে দুঃখকে যতই রঙীন করিয়া দেখান হউক, দুঃখ জগতে উদ্দেশ্যের চরম ও পরম সত্য নহে। আমাদের আমোদগুলি সাধারণতঃ এমনই পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছে যে অনেক সময় দুঃখ আমাদের তাহার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকৃত আনন্দের সন্ধান দিতে

পারে। ইহাতেই অর্থাৎ দুঃখভজনেই কেবল তাহার সার্থকতা। কিন্তু ইহার ভিতরে যে একটি প্রচ্ছন্ন মাদকতা আছে, তাহাতে অনেক সময়েই আমাদের কেবল তাহার নেশাতেই অভিভূত করে। ইহা একপ্রকার আত্মপ্রশ্রয় বা দুঃখবিলাসিতা মাত্র। আমাদের মেয়েরা অধিকাংশক্ষেত্রে এই স্তরেই থাকিয়া যান। তাহার পর দুঃখের আর একটী নিকৃষ্টতর মূর্ত্তি তাহা যেন আমাদের সকলের চোখে একপ্রকার প্রাধান্য ও বিজ্ঞাপনের ভাব জাহির করে ও আমাদের সকল কর্ত্তব্য ও সদ্গুণের চর্চ্চা হইতে অব্যাহতি লাভের অধিকার দিয়া থাকে। ইহাত কেবল মনের দুঃখের কথা—শারীরিক দুঃখের ফল ইহা হইতে ও শোচনীয়। তাহা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাগৃহীত ও কোন সত্য উচ্চলক্ষ্য সাধনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়রূপে অবলম্বিত না হইলে যে কত হীন ও থেলো হইয়া পড়ে বলা যায় না। আমাদের মেয়েদের বিশেষ করিয়া বিধবাদের উপর যে নানা প্রকার শারীরিক যন্ত্রণার ভার চাপান হইয়াছে তাহাতে প্রকৃত উচ্চলক্ষ্য কতদূর সাধিত হইতেছে তাহাতে বিষম সন্দেহ আছে। তাহা একদিকে যেমন অত্যাচারিতকে সমস্ত স্বাভাবিক ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া জীবনেই প্রবঞ্চিত করে, অন্যদিকে অত্যাচারকারীর আত্মপ্রশ্রয় ও স্পর্দ্ধা সেই পরিমাণে বাড়াইতে থাকে।

বাস্তবিক কেবল কষ্টের জন্য কষ্ট সহ্য করায় ফল নাই। মনুষ্যসভ্যতার নিম্নতর অবস্থায় যখন শারীরিক অনুভূতি ভিন্ন কেবল মানসিক ভাব মনকে তেমন সাড়া দিতে পারিত না, মানুষের দৈহিক জীবনের মূল্য সম্বন্ধেই যখন মানুষের ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল ব্যক্তিত্ব বা মনের স্ফূর্ত্তি ও স্বাধীনতার মূল্য ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল বলিলেই হয়—বিশেষতঃ নারীকে সমশ্রেণীর মানুষ বলিয়া কল্পনাও পরিস্ফুট হয় নাই তখন যে এরূপ ব্যবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু যখন সকল দিকের সকল বিভাগেই পরিবর্ত্তন হইতেছে তখন শাস্ত্রে অনেকগুলি ভাল কথা আছে বলিয়াই সেগুলি আমাদের বিবেক ও প্রত্যক্ষ ন্যায়বিচার ও উচ্চতর কারুণ্যে আঘাত করিয়াও তাহা চালাইতেই হইবে? সেগুলি যদি আবার আমাদের স্পর্শ না করিয়া কেবল আমাদের একান্ত করতলগত দুর্ব্বলজনের উপর দিয়াই চালিত হয়, তখন তাহা কি আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বকে অধিকতর ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে না?

আমাদের দেশের নারীজীবনের অপার দুঃখে তাঁহাদের যে সবিশেষ উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হয় নাই, তাহা আগেই দেখান হইয়াছে। তর্কস্থলে যদি তাহা হইয়াছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদের মঙ্গলোদ্দেশ্যেই বা এবং তাঁহাদের উপর এই অসহ যন্ত্রণা ও দুঃখের ভার আপনারা একাংশও গ্রহণ না করিয়া চাপাইবার অধিকার আমাদের কোথা হইতে আসিল এই প্রত্যক্ষ সত্যটি আমাদের চিন্তারাজ্যে কখনও প্রবেশ করে কি? যে শাস্ত্রের উপর আমাদের এমন অটল ভক্তি—যদিও আপনাদের ক্ষেত্রে সহস্র গুণ লঘু হইলেও তাহার নিয়ম আমরা শতাংশের একাংশও পালন করি না এবং সুবিধা ও আবশ্যকমত ক্রমেই পরিবর্ত্তন করিয়া চলিতেছি—তাহাও যখন কেবল পুরুষদেরই রচিত, তখন যাহাদের উপর ইহার বোল আনা প্রয়োগের এতটুকু এদিক, ওদিক করিতেও আমাদের এত কুণ্ঠা—তাঁহাদের তাহা পালন করিতে প্রকৃত নৈতিক বাধ্যতা কি থাকিতে পারে তাহা কখনও আমাদের মনে উদয় হয় কি?

বঙ্গনারী।

সমসাময়িক কথা

গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজের কথা

আমাদের গ্রামটা খুব বড়। অনেকগুলি "ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের" বাস। "ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক" কথাটা আমাদের জেলার ভাষায় এককালে প্রচলিত ছিল। কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতিকেই ভদ্রলোক বলা হইত। ব্রাহ্মণেরা ত সকলের উপরে ছিলেনই। সুতরাং তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক হইতে পৃথক করাতে তাঁরা যে ভদ্রলোক নন, ইহা বুঝাইত না। এখন বোধ হয় আমাদের গ্রামের কোনও কোনও ভদ্র পরিবার নিজেদের বৈদ্য বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বাল্যকালে কেন, যৌবনেও শ্রীহট্টের ভদ্রসমাজে এই বৈদ্যত্বের অভিমান মাথা তুলিয়া উঠে নাই। শ্রীহট্টের হিন্দুসমাজে বৈদ্য এবং কায়স্থদের মধ্যে আদান-প্রদান চলিত, এখনও চলে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ এবং ঢাকার মহেশ্বরদি পরগণার বৈদ্যেরা কায়স্থদিগের সঙ্গে আদান-প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের জাত নষ্ট হয় না। আমাদের গ্রামেও দু, এক ঘর বৈদ্য আছেন। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা বৈদ্য বলিয়া শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতেন না। শ্রীহট্টের কায়স্থদের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র নাই বলিলেও চলে। কচিৎ কোনও খানে থাকিলেও তাঁহাদের কোনও প্রকারের কৌলীন্য মর্য্যাদা নাই। শ্রীহট্টের কায়স্থ-বৈদ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা যত বেশী দিন সে দেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, মোটামুটী তাঁহাদেরই কৌলিন্য মর্য্যাদা বেশী। কায়স্থ ও বৈদ্য, ইঁহারাই সাধারণভাবে ভদ্র বলিয়া অভিহিত হইতেন। আমাদের গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ এবং ভদ্র পরিবারের বাস। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই যজন যাজন এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। কাহারও কাহারও কিছু জমি-জেরাতও ছিল। দু'চারি জন মহাজনীও করিতেন। মোটের উপরে সকলেরই সাংসারিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। ভদ্রলোকদের অনেকেই চাকুরিয়া ছিলেন। শ্রীহট্টে ও নিকটবর্ত্তী কাছার জেলার সদর মহকুমা শিলচরে ইঁহারা ইংরাজের সরকারে কর্ম্ম করিতেন। শারদীয় পূজার সময় প্রায় সকলেই বাড়ী আসিতেন। কাহারও কাহারও বাড়ীতে রীতিমত দুর্গোৎসব হইত। নবশাখদিগের মধ্যেও কাহারও কাহারও অবস্থা বেশ ভাল ছিল। তাঁহারাও দেবী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া উৎসব করিতেন। এইজন্য পূজার সময় গ্রামটা বহুলোক-সমাগমে এবং উৎসবের আমোদ-প্রমোদে সরগরম হইয়া উঠিত; বাকী ক'মাস অনেকটা যেন নিঝুম মারিয়া থাকিত।

ব্রাহ্মণ ভদ্র-লোকদিগের আশেপাশে অনেকগুলি ভৃত্য শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। স্থানীয় ভাষায় ইহাদিগকে "সিং" কহিত। এ ছাড়া অনেকগুলি নবশাখ পরিবারও আমাদের গ্রামবাসী ছিলেন। বাংলার প্রত্যেক গ্রামে যেমন ছুতার, কামার, সোনার বা স্বর্ণকার প্রভৃতি বার্ত্তিকেরা বাস করেন, আমাদের গ্রামেও সেইরূপ ছিল। এ সকলে মিলিয়া একটা বৃহৎ গ্রাম্য সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সমাজে ব্রাহ্মণেরাই যে আধিপত্য করিতেন, তাহা

নহে। সকল জাতির বয়োজ্যেষ্ঠেরা মিলিয়া সমাজ শাসন করিতেন। বাল্যকালে এই গ্রাম্য সমাজে সকল শ্রেণীর মধ্যেই একটা আশ্চর্য্য মর্য্যাদা-বোধ দেখিয়াছি। তখনও কাঞ্চন-কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। অতি দরিদ্র লোকেও যথারীতি নিমন্ত্রণ না পাইলে পূজা-পার্ব্বন উপলক্ষে কিম্বা বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি পারিবারিক ব্যাপারে ধনীলোকের বাড়ীতে যাইয়া পাত পাড়িত না। সারা বছর যারা ধনীর দ্বারে মাগিয়া খাইত, তারাও দুর্গোৎসবের সময়ে যথারীতি নিমন্ত্রণ না পাইলে পূজা-বাড়ীর মাটি মাড়াইত না। "যখন কাহাকেও বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া না খাওয়াও, তখন তোমার বাড়ীতে যাইয়া ভিক্ষা মাগিয়া খাইতে পারি। কিন্তু যখন ক্রিয়া-কর্ম্ম-উপলক্ষে গ্রামের আর দশ জনকে আদর করিয়া ডাক, তখন আমাকে না ডাকিলে যাইব কেন?"—এই ভাবটা অতিশয় গরীব লোকের মধ্যেও প্রবল ছিল। ধনী লোকেরাও গরীব লোকেদের এই আত্মমর্য্যাদা-বোধের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। গরীব বলিয়া কিম্বা জাত হিসাবে নীচু বলিয়া কেহ কাহাকেও অবজ্ঞা করিতেন না, বিশেষতঃ ক্রিয়াকর্ম্ম-উপলক্ষে নিমন্ত্রিত-দিগের মধ্যে সৌজন্য প্রকাশে কোনও তারতম্য হইত না। গৃহ-স্বামী সকলের নিকটেই গললগ্নীকৃতবাসে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যার তত্ত্বাবধান করিতেন। বরঞ্চ নিজের সমশ্রেণীর অভ্যাগতদিগের নিকটে এ সৌজন্য প্রকাশ না করিলেও বিশেষ অপরাধের কথা হইত না; কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীর লোকের নিকটে এই সৌজন্যের অভাব অত্যন্ত দোষের কথা হইয়া উঠিত।

বাংলার অনেক গ্রামে যেমন হিন্দু ও মুসলমানেরা পরস্পরের পাশাপাশি বাস করেন, আমাদের গ্রামেও তাহাই ছিল, এখনও আছে। আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে অনুমান আধ মাইল দূরে এক মুসলমান জমিদার বাস করিতেন। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, মৈমনসিংহ ও ঢাকার মুসলমান সমাজে ইঁহারা কুলীন বলিয়া পরিগণিত। পরলোকগত প্রেমাস্পদ শ্রদ্ধেয় বন্ধু আবদুল রসুল আমাদের এই মুসলমান জমিদারের কুটুম্ব ছিলেন। যেমন সমৃদ্ধ হিন্দু পরিবারের আসে পাশে সেকালে কতকগুলি নফর পরিবার বাস করিতেন, এই মুসলমান জমীদারের আশে পাশেও সেইরূপ অনেকগুলি মুসলমান ভৃত্য-পরিবার বাস করিতেন। এ একটা মুসলমান পল্লী ছিল। এ ছাড়া অনেকগুলি মুসলমান জেলিয়াও আমাদের গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহাদের একটা স্বতন্ত্র পল্লী ছিল। এই পল্লীকে লোকে "মেছুয়া হাটি" কহিত। অনেক কৃষিজীবি মুসলমানও আমাদের গ্রামে ছিলেন। গ্রামের হিন্দু সমাজ যতবড় ছিল, মুসলমান সমাজ যে তার চাইতে খুব ছোট ছিল, তাহা মনে হয় না। কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া কখনও কোনও দিন যে কোনও ঝগড়া বিবাদ বাধিত এমন কথা শুনি নাই। বরং ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে এই মুসলমান জমিদার পরিবারের লোকেরা আমাদের বাড়ীতে বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ব্যাপারে নিমন্ত্রিত হইতেন ও যথারীতি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। এ সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে যৌতুক দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। স্থানীয় ভাষায় ইহাকে 'শিউলী' কহিত। এই 'শিউলী' প্রথাতে কাহারও ঐশ্বর্য্য বিস্তারের কোনও অবসর ছিল না। যিনি যাহা পাইতেন তাহাই ফিরাইয়া দিতেন। কার সঙ্গে কত 'শিউলী' আদান প্রদানের কথা, প্রত্যেক পরিবারের ইহার একটা হিসাব থাকিত। যতদূর মনে হয় চারি আনা হইতে আরম্ভ করিয়া দুই টাকা পর্য্যন্তই 'শিউলী' দিবার রীতি ছিল। যিনি যত 'শিউলী' পাইতেন, ততটাই

ফিরাইয়া দিতেন, বেশি দিলে তাহা অগ্রাহ্য হইত। এই ব্যবস্থাতে গৃহস্থেরও আত্মসম্মানে আঘাত লাগিত না, অথচ সমাজের দশজনে মিলিয়া তাঁহার পারিবারিক ব্যাপারগুলির খরচপত্র অনেকটা কুলাইয়া দিতেন।

আমাদের প্রতিবেশী মুসলমান জমীদার পরিবারের সঙ্গেও আমাদের পরিবারের এই 'সিউলী'র আদান প্রদানের ব্যবহার ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধেই তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য ছিল, কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে ছিল না, ইহাতে এই কথাটাই বুঝাইত। আর যদিও আমরা আমাদের বাড়ীতে পূজা-উপলক্ষে তাঁহাদের কখনও নিমন্ত্রণ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না, ঈদ্ উপলক্ষে তাঁহারা যে আমাদের নিমন্ত্রণ করিতেন, ইহা বেশ মনে আছে। এবং আমাদের বাড়ী হইতে ঈদের সময় তাঁহাদের বাড়ীতে খুব বড় একটা সিধা যাইত, ইহাও বেশ মনে পড়ে।

এত গেল সম্ভ্রান্ত মুসলমান প্রতিবেশীদের কথা। সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের ইহা অপেক্ষাও বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল। হিন্দুরা যেমন মুসলমানের দরগায় সিন্নি দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, সেইরূপ মুসলমান জনসাধারণেও হিন্দু দেব-দেবীর পূজার সময়ে তাঁহাদের নিকটে বলি লইয়া আসিতেও দ্বিধা করিতেন না। হিন্দুরা যে অসত্যের উপাসনা করে, এ কল্পনাও তাহাদের মনে কোনও দিন জাগে নাই। হিন্দু দেবদেবীর পূজার সঙ্গে মুসলমানদিগের সঙ্গে যে একটা নিত্য যোগ ছিল, এমন নহে। হিন্দুরাও মুসলমান পীরের দরগায় সিন্নি দিতেন, "মানত" করিয়া। আপদে-বিপদে পড়িলে ইঁহারা পীরসাহেবের শরণাপন্ন হইতেন। আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য তাঁহার নিকট দোয়া করিতেন এবং পীর সাহেব দয়া করিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করিলে তাঁহার দরগায় সিন্নি দিবেন, এ সংকল্প করিতেন। মুসলমানেরাও আপদে বিপদে উদ্ধারের জন্য দুর্গা, কালী প্রভৃতি জাগ্রত হিন্দু দেবতার নিকটে মানত করিতেন। যাঁহারা যেরূপ মানত করিতেন, হিন্দু প্রতিবেশীর বাড়ীতে দেবীর পূজার সময় সেইরূপ বলি লইয়া আসিতেন। এইভাবে কেহ বা পাঁঠা, কেহ বা পায়রা, আর কেহ বা চাল-কুমড়া, শশা, কলা বা আক, বলি দিবার জন্য আনিতেন। আমাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসবের সময় প্রতি বৎসরই বাবার মুসলমান প্রজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ বলি আনিতেন। ব্রাহ্মণেরা এসকল বলি দেবতার নিকটে উৎসর্গ করিয়া দিতেন। সাধারণ মুসলমান প্রজাগণ পূজার সময় আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইতেন। শত শত মুসলমান এই উপলক্ষে পূজার তিন দিন আমাদের বাড়ী আসিয়া দই, চিড়া, মুড়কি, ও বাতাসা দিয়া ফলার করিতেন। হিন্দু নিমন্ত্রিতদিগকে দেবতার প্রসাদ দেওয়া যাইত, মুসলমানদিগকে প্রসাদ দেওয়া যাইত না;—প্রভেদ এই ছিল।

আমার বাল্যকালে আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনও প্রকারের সাম্প্রদায়িক দলাদলি দেখি নাই। বিষয়-আশয় লইয়া হিন্দুতে হিন্দুতে এবং মুসলমানে মুসলমানে যেমন ঝগড়া বিবাদ হইত, হিন্দু মুসলমানেও সেইরূপই হইত। আর এই সকল বিরোধে কোনও দিন হিন্দুরা মুসলমানের বিরুদ্ধে বা মুসলমানেরা হিন্দুর বিরুদ্ধে জোট বাঁধিয়াছে এমন দেখি নাই। যার সঙ্গে যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, সেইরূপই সে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিত; স্বধর্ম্মীর প্রতি বিশেষভাবে কেউ পক্ষপাতিত্ব করিত না;—হিন্দুতেও নহে, মুসলমানেতেও নহে। একবার আমাদের

প্রতিবেশী মুসলমান জমীদারের সঙ্গে বাবার একটা মহলের সত্বাধিকারীত্ব লইয়া বিরোধ বাধে। বাবা এই মহলটা খাজনা বাকীর নিলামে খরিদ করেন। গ্রামের বহুতর হিন্দু মুসলমান ভদ্র লোকের এই মহলের উপরে আগে সত্বাধিকার ছিল। নিলামের জোরে এই সত্ব লোপ পায়। ইঁহারা একজোট হইয়া যাহাতে বাবা নিলামি মহলের দখল পান, তাহার চেষ্টা করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই মহলের প্রায় আটশত বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমান প্রজা বাবার নিকটে আসিয়া কবুলিয়ত দিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান জমীদারের বিপক্ষতা করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন নাই। হিন্দু জমীদার ভাল হইলে তাঁহার মুসলমান প্রজারা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া মুসলমান জমীদারের বিপক্ষে লাঠি ধরিতে কুণ্ঠিত হইত না। ধর্ম্ম-কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাপারে কে হিন্দু কে মুসলমান, এই প্রশ্নটাই তখন উঠিত না।

দোল-দুর্গোৎসব, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি এবং শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে বিষহরি বা মনসার পূজা, গ্রামের হিন্দুদিগের প্রধান উৎসব ছিল। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে ঘরে ঘরে পিঠে-পুলি প্রস্তুত হইত। শেষ রাত্রে আমরা বালকের দল পুকুর ধারে যাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জুটিতাম। পূর্ব্বদিন পুকুরের ধারে একটা ফাঁকা যায়গায় একটা খড়ের ঘর তৈয়ার করিয়া রাখা হইত। যতদুর মনে পড়ে বোধ হয় এগুলিকে ভেড়ার ঘর বলা হইল। প্রত্যুষে পুকুরে ডুব দিয়া উঠিয়া এ ভেড়ার ঘরে আগুন দিয়া তাহার চারি পাশে দাঁড়াইয়া সকলে আগুন পোহাইতাম। পাড়ায় পাড়ায় এ সম্বন্ধে একটা প্রতিযোগিতাও ছিল। কাহাদের পাড়ায় এই ভেড়ার ঘর সকলের চাইতে বড় এবং কোন ঘরের অগ্নিশিখা সকলের চাইতে উপরে ওঠে, অতিশয় আগ্রহসহকারে গ্রামের লোক বিশেষতঃ বালকের দল ইহা লক্ষ্য করিত। যাদের ভেড়ার ঘরের আগুনের শিখা সকলের চাইতে উপরে উঠিত, তাদের আত্মশ্লাঘার সীমা থাকিত না। স্নান ও আগুন পোহান শেষ হইলে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া পীঠে-পুলি খাওয়ার পালা সুরু হইত। অপরাহ্নে গ্রামের নিকটে মাঠে খেলা হইত। ডাণ্ডা-গুলি, কপাটি, লাফান এবং মানুষ দৌড় এ সকলি প্রধান ক্রীড়া ছিল। গ্রামের বালক এবং যুবকেরা এ সকল খেলায় নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতেন; বয়োজ্যেষ্ঠরা তাঁহাদের খেলা দেখিবার জন্য খেলার মাঠে যাইয়া জনতা করিতেন। উত্তরায়ণ উপলক্ষে গৃহস্থের বাড়ীতে কোনও বিশেষ পূজা হইত কি না মনে নাই, সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ আসিয়া কোনও কোনও বাড়ীতে একটা কিছু অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেন। কিন্তু এই পূজা উত্তরায়ণ-উৎসবের একটা গণনীয় অঙ্গ ছিল না। আর এই উৎসবটা ছোট বড় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই হইত। সকলে এ দিনটা আমোদ-প্রমোদ করিয়াই কাটাইতেন।

বিষহরি বা মনসা-পূজা আমাদের অঞ্চলে একটা প্রধান পর্ব্ব ছিল। গরীব গৃহস্থেরাও বিষহরির মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহার পূজা করিত। বিষহরি নামেই তাঁর পরিচয়—নাগকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিষধর সর্প তাঁহার বাহন। সাপের ফণার উপরেই বোধ হয় তাঁহার উর্দ্ধ অঙ্গ সকল গড়িয়া তোলা হইত। কখনও কখনও একটা ঘটের উপরে সাপের ফণা নির্ম্মাণ করিয়া বিষহরির নামে এই ঘটেরই পূজা হইত। মনসা-পূজার উৎপত্তি পদ্মপুরাণ হইতে। মনসার পূজা-কাহিনীর সঙ্গে লখিন্দর সওদাগরের কথা জড়াইয়া ছিল। বড় হইয়া একবার ভাগলপুরে কিছুদিনের জন্য গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম যে লখিন্দরের রাজধানী চম্পানগর

এখনও ভাগলপুরের নিকটে রহিয়াছে। আর মনসা-পূজা উপলক্ষে এখানে খুব একটা বড় মেলাও হইয়া থাকে। চম্পানগরের মনসাদেবী কি করিয়া যে মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া পড়িয়াছিলেন, জানি না। তবে বর্ষার সময় যখন মাঠ ঘাট সব জলে ডুবিয়া যায়, তখন এ সকল জলা যায়গাতে বেশ সাপের ভয় হয়, ইহা বোঝা যায়। এ সকল স্থানে প্রথম যখন বসতি আরম্ভ হয় তখন এই সাপের ভয়টা খুবই বেশী ছিল, ইহাও সহজে অনুমান করিতে পারা যায়। এই কারণেই বোধ হয় আমাদের অঞ্চলে বিষহরির পূজাটা এতটা প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার আর একটা কারণও হয়ত ছিল। শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে এই সকল জলাকীর্ণ অঞ্চলের গৃহস্থেরা নিজেদের গোধন বাড়ীর গোয়ালেই বাঁধিয়া রাখেন। গোপাট বা গোপথ দিয়া তখন নৌকা চলাচল করে; গোচারণের মাঠ জলে ডুবিয়া যায়। এই জলের উপর খুব লম্বা লম্বা ঘাস জন্মে। গৃহস্থকে এ সময়ে নিজেদের গরুর জন্য এই ঘাস কাটিয়া আনিতে হয়। কখনও জলে নামিয়া আর কখনও বা ঘাসের নৌকা হইতেই ঘাস কাটিতে হয়। এইরূপ ঘাস কাটিতে যাইয়া লোকের সর্পাঘাত হইয়াছে, এরূপও মাঝে মাঝে শোনা যাইত। এইরূপে গো-গ্রাস সংগ্রহ করা যে একেবারে নিরাপদ ছিল না, ইহাও বোঝা যায়। এই কারণেও বুঝি বা বিষহরি বা মনসা এ অঞ্চলের লোকের নিকট হইতে এতটা পূজা পাইতেন। মনসা পূজা প্রায়ই কৃষকদিগের বাড়ীতে হইত। সম্পন্ন কৃষকেরা বিষহরির নিকট ছাগ বলিদান করিতেন। এই উপলক্ষে পরদিবস তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই ভোজ হইত। বিষহরি পূজা উপলক্ষে ভাসানের দিন বাইচ খেলা হইত। শ্রাবণ মাস ধরিয়া গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় এই খেলা অভ্যাস করা হইত। এক গো-গ্রাস সংগ্রহ ভিন্ন তখন অন্য সমুদয় কৃষিকার্য্য বন্ধ থাকিত। ধান তখন মাঠে আপনি গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ষার জল যত বাড়ে, ধানের গাছও ততই বাড়িয়া উঠিতেছে। হঠাৎ বন্যা আসিয়া ধানের মাথাগুলি দু'তিন দিন ডুবাইয়া না রাখিলে সে ফসলের আপাততঃ আর কোনও আশঙ্কা নাই। সুতরাং এ সময়ে কৃষিকার্য্য বন্ধ থাকিত বলিয়া গ্রামের লোকের অবসরের অভাব হইত না। তরী-তরকারীর ফসলের জন্যও তখন আর বিশেষভাবে খাটিতে হইত না। কৃষকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া নিজের নিজের নৌকা লইয়া ঘাস কাটিতে বাহির হইয়া যাইত। দু'প্রহরের সময় প্রায় সকলেই বাড়ী ফিরিয়া আসিত। তারপর আর সেদিনকার মত কোনও কাজ থাকিত না। বিকাল বেলা ছিপ দিয়া মাছ ধরিয়া কিম্বা বিশ্রাম করিয়া অথবা বাইচ খেলিয়া কাটাইত। শ্রাবণ মাসটা ভরিয়া এই বাইচ খেলা চলিত। প্রতি পাড়ায় দু'তিনটা খেলার নৌকা ছিল। প্রতিদিন অপরাহ্নে পাড়ার বেকার লোকেরা পল্লী-বালকদিগকে জড় করিয়া বাইচ খেলিতে বাহির হইয়া যাইত। সারিগান এই বাইচ খেলার একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল। পল্লী-জলপথ এই গানে প্রতিদিন অপরাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে মুখরিত হইয়া উঠিত। গানগুলির পদ ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু তাহার সুর ও লয় এখনও কানের ভিতরে বাজিতেছে। একটা গানের একটা মাত্র পদ আজও মনে আছে;—

ঘাটে লাগাও রে নাও ওরে ভাইয়া মাঝি
যে ঘাটে লাগাইবার নাও দেখবার ফুলের পানি

বাইচের নৌকা ঘাটে আসিবার মুখে সর্ব্বদাই এই দুইটী পদ গাহিতে গাহিতে আসিত। এইরূপে শ্রাবণমাস ভরা বাইচ খেলা অভ্যাস হইত। শ্রাবণের সংক্রান্তিতে মনসা পূজা শেষ হইলে তার পরদিন দেবীর ভাসান উপলক্ষে এ খেলার পরীক্ষা হইত। অনেকগুলি নৌকা ভিন্ন ভিন্ন পল্লী হইতে বাহির হইয়া গ্রামের নিকটে খোলা বিলে যাইয়া এই নৌকা-দৌড়ে যোগদান করিত। অন্যান্য খেলার মত এ খেলারও কতকগুলি বাঁধা নিয়ম ছিল। একটা বিশেষ নিয়ম এই ছিল যে, কেহ প্রতিযোগী নৌকার সম্মুখের পথ রোধ করিবার জন্য নিজের নৌকা আড়াআড়ি চালাইতে পারিবে না। রেষারেষির মুখে অনেক সময় এই নিয়মটা ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইত। আর তখনই নৌকায় নৌকায় ঠোকাঠুকি হইয়া খেলোয়াড়দিগের মধ্যে লাঠালাঠি আরম্ভ হইত। ইহার ফলে মাথা ফাটাফাটিও যে হইত না, তাহা নহে। এ জন্য ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর মধ্যে এ সময়ে একটা বিদ্বেষও জাগিয়া উঠিত। এই বিদ্বেষের প্রেরণায় প্রত্যেক পল্লী সকল বিষয়েই অন্যান্য পল্লীর অপেক্ষা বড় হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিত। এই ভাবে একটা গ্রাম্য দেশপ্রীতি বা parochial patriotism জাগিয়া উঠিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অতৃপ্তি

যেওনা যেওনা সখা দুটি পায়ে ধরি,
রাখ এ মিনতি মোর অতিথি আমার,
ধরেছিলে যে রাগিনী অন্তরাটি তার
এখনো যে আছে বাকী, দাও শেষ করি
আরব্ধ সঙ্গীত তব। যে অরুণ রাগে
আঁধারের এক প্রান্তে উষার আভাস
এঁকেছিলে চিত্রকর কুঙ্কুমে ও ফাগে,
মসীময়ী তুলিকায় করিও না নাশ
সে অপূর্ণ চিত্রলেখা। বসন্ত আমার,
বুকভরা যে বাতাসে মুকুলে মুকুলে
আচ্ছন্ন করেছ মোর শাখা উপশাখা,
পুষ্পহীন শুষ্কপ্রাণ ভরে যাক্ ফুলে
রুধিও না সে বাতাস সুধাস্পর্শমাখা।
একটি বাসর নিশি দিও হে প্রাণেশ
তারপর লব চির বৈধব্যের বেশ।

শ্রী সুরেশ্বর শর্ম্মা।



সত্যেন্দ্র-স্মৃতি

কবি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়া। আমি তখন স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। ১৩১৪ সালের পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁর একটি ছাত্রকে তার বাবার কাছে বর্ম্মায় পৌঁছিয়ে দেবার পথে কলকাতায় এসে আমাদের বাড়ীতে অতিথি হন। তাঁর পথ-যাত্রার সঙ্গী ছিল একটা বই-ঠাসা বাক্স। কি সব বই সঙ্গে নিয়ে অজিতবাবু বর্ম্মা যাচ্ছেন তা দেখ্‌বার জন্য কৌতূহলী হয়ে একদিন দুপুর বেলা বাক্সটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে সাহিত্য দর্শন রাজনীতির নানান্ ইংরেজী কেতাবের ভিতর থেকে একখানি পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে ছাপা বাংলা কবিতার বই বের হ'ল—"হোমশিখা"। খুলে দেখ্‌লাম, বইখানি সবে বেরিয়েছে ও রচয়িতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর করকমলে" উপহার দিয়েছেন। পাতা উল্টিয়ে দেখি একটি কবিতার পাশে নীল পেন্সিলের দাগ দেওয়া রয়েছে। সেই কবিতাটি প্রথম পড়্‌লাম। তখন খুব বেশী বোঝ্‌বার বয়স আমার ছিল না, কিন্তু "হোমশিখার" তেজ-দৃপ্ত ছন্দ আমার তরুণ মনকে কি যে একটা নাড়া দিয়েছিল তা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তারপর একে একে "হোমশিখার" সবগুলো কবিতাই প'ড়ে ফেল্‌লাম। অজিতবাবু কি জিনিষপত্র কেন্‌বার জন্য বেরিয়েছিলেন, ফিরে আস্‌তেই তাঁর কাছ থেকে কবির পরিচয় নিয়ে জান্‌লাম, তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র, তাঁর ও পরলোকগত কবি সতীশচন্দ্র রায়ের অনেক দিনের বন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় শিষ্য। তার দুদিন পরেই অজিতবাবু বর্ম্মা চলে' গেলেন। এ দু'দিনে বারবার প'ড়ে "হোমশিখার" বড় বড় দু তিনটা কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল দেখে, যাবার সময় অজিতবাবু বইটি আমাকে দিয়ে গেলেন। সেখানি আজও আমার কাছে আছে।

কিন্তু শুধু "হোমশিখা" পেয়ে তৃপ্ত হ'তে পার্‌লাম না, মার কাছ থেকে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর একটা টাকা আদায় করে' একখানা "বেণু ও বীণা" কিনে নিয়ে এলাম। কবিতাগুলো ক্রমাগত পড়্‌তাম; আর সারাদিনই আবৃত্তি চল্‌তো গুনগুন করে'। মাসিক পত্রিকায় তখন সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা খুব ক্বচিৎ বের হ'ত বোধ হয়, কাজেই, খুব ইচ্ছা কর্‌লেও, তাঁর নতুন কবিতা পড়্‌তে পেতাম না। বছর খানেক কেটে গেল, একদিন আমার এক সহপাঠীবন্ধুর দাদার কাছে শুন্‌লাম সত্যেনবাবুর নতুন একখানি কবিতাসংগ্রহ বেরিয়েছে, জগতের যত শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার অনুবাদ। তখন আমি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ি, কয়েক মাস পরেই পরীক্ষা। কবিতার বই কেন্‌বার জন্য টাকা চাইলে যে মা দেবেন এমন কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং অন্যত্র শরণাপন্ন হ'তে হ'ল। যা হোক, "তীর্থ-সলিল" কেনা হ'ল। কি ভাল যে লাগ্‌লো তার বিচিত্র ছন্দের ঝঙ্কার, অদ্ভুত শব্দবিভব, বাংলার বনচ্ছায়ে নিখিলের

কবির সঙ্গীত! "তীর্থ-সলিলের" কবিতার মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল লেগেছিল নানান্ দেশের জাতীয় সঙ্গীতের তর্জ্জমা।

"লা মার্শেয়ের" বজ্র-নির্ঘোষ :—

"একি অভাগ্য! একি অপমাম! বিদেশীর দল এসে,
বিধি ও বিধান করে ব্যবস্থা ফরাসীর এই দেশে!

* * *

ওগো ভগবান্! এমনি করিয়া রহিব কি চিরকাল?
নতমস্তকে বহিব লাঙ্গল, হাতে শৃঙ্খল-জাল?
যাহারা ঘৃণ্য যাহারা অধম—তাদেরি বাড়িবে বল?
ভাগ্যবিধাতা হবে কি মোদের অত্যাচারীর দল?
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাঁধ দল, বাঁধ দল!
চল্ রে চল্ রে চল্!
ঘৃণ্য শোণিতে হবে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল?"

রাসিয়ার উদাত্ত-গম্ভীর গাথা :—

"সকল ভয়ের ভয় তুমি প্রভু! তোমারে নমস্কার;
বজ্র তোমার রণ-দুন্দুভি, বিদ্যুৎ তরবার!
তোমার রাজ্যে করুণা তোমার হউক মূর্ত্তিমান,
শান্তির ধারা বর্ষণ কর কালে কালে ভগবান।"

নরওয়ের ভাবোচ্ছ্বাস :—

"ঝঞ্ঝা-মথিত সাগরোত্থিত
ভালবাসি এই দেশ,
হ'ক্ বন্ধুর,— আকর্ষণের
তবু তা'র নাহি শেষ।
ওগো ভালবেসো, তারে ভালবেসো,
না ভুলি' পূর্ব্বকথা,
ভুলো না মোদের 'সাগা'-সঙ্গীত,—
স্বপ্নময়ী সে গাথা।"

হাঙ্গেরীর উদ্দীপনা :—

"দেশের দশের ডাক শোনো ওই,
ওঠ, ওঠ, ম্যাগিয়ার!
এই বেলা যদি পার ত পারিলে,
নহিলে হ'ল না আর।"

ইজিপ্টের বিষাদ-গীতি :—

"হে মিশর ভূমি! গরীয়সী তুমি, তুমি মহিমার ধাম,
অযুত যুগের জননী! এ দেহ তোমারেই সঁপিলাম।
কত কীর্ত্তির শ্মশান তুমি গো পুণ্য মিশর ভূমি,
তব সন্তানে যে করে পীড়ন তা'রেও গ্রাসিবে তুমি।"

সব শেষে বাংলা রূপান্তরে "বন্দে মাতরমের" মধুর মূর্ত্তি :—

"বন্দনা করি মায়!
সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, চন্দন-শীতলায়!
যাঁহার জ্যোৎস্না-পুলকিত রাতি,
যাঁহার ভূষণ বনফুল পাঁতি,
সুহাসিনী সেই মধুরভাষিনী—সুখদায়—বরদায়!
বন্দনা করি মায়!"

সেই তের বছর আগে প্রথম যখন কবিতাগুলি পড়েছিলাম তখন যেমন সেগুলি সমস্ত মনকে মাতিয়েছিল, আজও তেমনি মাতায় তার উদ্দীপনায়, তার ব্যঞ্জনায়, তার ঝঙ্কারে।

"তীর্থ-সলিল" পড়্‌বার পর থেকেই সত্যেন্দ্রনাথকে দেখ্‌বার জন্য আমার মনে ভারী একটি ঔৎসুক্য জন্মায়। কিন্তু দেখ্‌বো কি করে'? আমি ত তখন স্কুলের ছাত্রমাত্র। কিন্তু দেখা হ'ল কয়েক মাস পরেই। কলেজে ঢুকে যখন বাড়ীর লোকের কাছ থেকে ইচ্ছামত বই কেন্‌বার স্বাধীনতা ও সুবিধা পাওয়া গেল, তখন হ্যারিসন রোডের চৌমাথায়, এলবার্ট-হলের নীচে পুরাণো বইয়ের দোকানে ঘোরাঘুরি সুরু কর্‌লাম। এইখানে প্রায়ই দেখ্‌তাম একটি ভদ্রলোক,—বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, সাদাসিদা পোষাক, চোখে চশ্‌মা,—বই দেখ্‌ছেন কিম্বা কিন্‌ছেন। একদিন দেখ্‌লাম তিনি মূল ফরাসী ভাষায় মোলেয়ারের এক সেট্ নাটক কিনে মুটের মাথায় চাপাচ্ছেন। আর একদিন দেখ্‌লাম Thiersএর History of the French Revolutionএর ক' ভালুম কিন্‌লেন। আরো একদিন দেখ্‌লাম খালিলের দোকান থেকে পুরাণো কয়েকখানা বাঁধানো "Monist" কাগজ ও একটা কি ফার্শী বই কিনে নিয়ে বের হচ্ছেন। এত বিচিত্র বিষয়ে অনুরাগী কে এই লোকটি জান্‌বার জন্য বড় কৌতূহল হ'ল। বইয়ের দোকানে খোঁজ করে' নাম জান্‌তে পার্‌লাম না, শুধু খবর পেলাম দর্জ্জিপাড়ায় থাকেন। মধ্যে মধ্যে বিকালে দেখ্‌তাম ভদ্রলোকটি গোলদীঘিতে বেড়াচ্ছেন। একদিন দেখ্‌লাম তাঁকে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। চারুবাবুর সঙ্গে আমার তখন আলাপ ছিল না, কিন্তু তাঁকে চিন্‌তাম। তাঁর সঙ্গে দেখে অনুমান কর্‌লাম যে ইনি নিশ্চয়ই কোন সাহিত্যিক। তারপর হঠাৎ যেন কেন মনে হল ইনিই বোধ হয় সত্যেন দত্ত। জান্‌বার উপায় ছিল না, সুতরাং জান্‌তে পার্‌লাম না; কিন্তু মনে মনে সেদিন থেকে কেমন ধারণা হয়ে গেল যে ইনিই সত্যেন্দ্রনাথ।

এর কিছুদিন পরে একদিন সকালে বসে' পড়্ছি এমন সময় পরলোকগত গিরিশ শর্ম্মা মহাশয় আমাদের বাড়ী এলেন, তাঁর পিছনে পিছনে দেখি পুরাণো বইয়ের সন্ধানী, চারুবাবুর সঙ্গী সেই ভদ্রলোকটি। গিরিশবাবু ঘরে ঢুকেই বল্লেন—"অমল, এঁকে চেন? ইনিই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যাঁর কবিতা তোমার মুখে অনেক শুনেছি। আমার সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হয়েছে, আজ তোমাদের বাড়ীর সাম্‌নে দেখা হ'ল, তোমার কাছে তাই ধরে' নিয়ে এলাম।" কি আশ্চর্য্য, আমার অনুমান তা হলে একেবারে ঠিক! অভ্যর্থনা করে' বসালাম কবিকে। এত শান্ত-স্বভাব, এমন অমায়িক এত স্বল্প-ভাষী লোক ত বেশী দেখিনি আগে। আমিই বকে' যেতে লাগ্‌লাম, তিনি বসে' বসে' শুন্‌তে লাগ্‌লেন। আমার সেদিন উৎসাহ ও আনন্দের আর অন্ত ছিল না। তাড়াতাড়ি তাঁর বই তিনখানি বের করে', তাঁকে "হোমশিখার" সাম্য-সাম কবিতাটি পড়্‌তে অনুরোধ কর্‌লাম। তিনি কিছুতেই পড়্‌তে রাজী হলেন না, অল্প হেসে বল্লেন—"আমার লেখার উপর দিয়েই চুকে গেছে, পড়া আমার আসে না। আপনি পড়ুন, আমি শুনি।" আমার পড়্‌বার দরকার হ'ল না, মুখস্থ ছিল, আবৃত্তি কর্‌লাম। সে এক নূতন অভিজ্ঞতা, কবির সাম্‌নে তাঁর কবিতা আবৃত্তি। তার আগে বন্ধুবান্ধবের কাছে, বাড়ীতে কতদিন কতবার ঐ কবিতা পড়েছি, কিন্তু সেদিন কণ্ঠে যেমন সুর পেলাম তেমন আর কোন দিন পাইনি।

"জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন-ভয়-হারী,
সাম্যের মহাসঙ্গীত নব গাহ মিলি' নরনারী!

আমরা মানি না মানুষের গড়া কল্পিত যত বাধা,
আমরা মানি না বিলাস-লালিত ঘোড়ার আরোহী গাধা;

মানি না গির্জ্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর;

রাজা আমাদের বিশ্বমানব, তাঁহারি সেবার তরে
জীবন মোদের গড়িয়া তুলেছি শত অতন্দ্র করে;

*   *   *   *

আমরা মানিনা শিখা, ত্রিপুণ্ড্র, উপবীত, তরবারি,
জাব্দা খাতার ধারিনাক ধার, মোরা শুধু মমতারি।

মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানি না শুষ্ক নীতি,
নূতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি।

নয়ন মোদের উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে সহসা তাই!
তৃণে, পল্লবে, নীল নভতলে আর মলিনতা নাই!

চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে বিশ্ব বিপুল পুলক ভরে,
বাহু প্রসারিয়া ছুটেছে মানব মানব-হিয়ার তরে !

ছিঁড়িয়া পড়িছে শৃঙ্খল যত ভাঙ্গিয়া পড়িছে বাধা,
বিঘ্ন যত সে মনে জেগেছিল নাহি নাহি তা'র আধা !

জীর্ণ বিকল লোহার শিকল ছিঁড়িছে—পড়িছে টুটি',
আজীবন যারা আছিল বন্দী তা'রাও লভিছে ছুটি !

অন্ধের দেশে দৃষ্টি আসিছে, মূকের ফুটিছে বাণী,
কবে থেমে যায় কলহের সাথে অস্ত্রের হানাহানি।

অন্যায় সাথে বিস্মৃতি-নদে ডুবুক্ অত্যাচার,
সাম্যের মহাসঙ্গীতে স্বর যাক মিলি' সবাকার।"

আবৃত্তি শেষ হলে পর "তীর্থ-সলিল" নিয়ে কোন্ বই থেকে কোন্ কবিতা পেয়েছেন, কোন্‌টা একেবারে মূলের অনুবাদ, কোন্‌টা ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ সে খবর জেনে নিলাম। ঘণ্টা দুয়েক পরে সত্যেন্দ্রনাথ যখন বিদায় নেবার সময় বল্লেন—"আমার ওখানে আপনি যাবেন একদিন, আমার বই দেখাব।" "'আপনি' বলে' সম্বোধন করলে যাওয়া কিন্তু শক্ত হবে" এই কথা বলাতে উত্তর পেলাম "আচ্ছা আগে আলাপ পুরাণো হোক্।" গিরিশবাবু হেসে বল্লেন—"হ্যাঁ, 'Familiarity breeds contempt' বটে।"

এর পরে যাওয়া-আসায় তাঁর সঙ্গে অল্পে অল্পে আলাপ জম্‌তে সুরু হ'ল। তাঁর বই কিন্‌বার ও পড়্‌বার নেশা দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। তাঁর ঠাকুরদাদার লাইব্রেরীতে ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন, ভারতবর্ষের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কেতাবের সংগ্রহ অনেক ছিল। দর্শনে তাঁর অভিরুচি খুব ছিল না বটে কিন্তু তাও যে তাঁর পড়া ছিল না এমন নয়। ইতিহাস—দেশের ও বিদেশের—তাঁর মত পড়া খুব অল্প লোকেরই দেখেছি। তারপরে কাব্য ও সাহিত্যের ত কথাই নাই। পুরাণই কি তাঁর কম পড়া ছিল? যখনই কোথাও পৌরাণিক কিছুর উল্লেখ নির্ণয় কর্‌তে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তা কোথায় আছে বলে' দিয়েছেন। আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যে কেমন ছিল তা তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা খুব ভাল ক'রেই জানেন। ফরাসী ভাষা জানা থাকাতে য়ুরোপীয় সাহিত্যের সকল মহলের চাবি যেন তাঁর মুঠোর ভিতর ছিল। য়ুরোপের নানা দেশের সাহিত্যের যে বিচিত্র সংগ্রহ তাঁর লাইব্রেরীতে স্থান পেয়েছিল তা দেখ্‌লেই বোঝা যেত তাঁর পাণ্ডিত্য একাধারে কত ব্যাপক ও গভীর। অথচ একদিনের জন্যও জ্ঞানী বলে' তাঁর কোন অভিমান দেখিনি। Pedantry তাঁর চক্ষুশূল ছিল,

ও জিনিষটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না; যেখানে ওর গন্ধ পেতেন সেখান থেকে দূরে থাকতেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আলাপের অল্পদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে বোলপুরে যে উৎসব হয় সেই উৎসবে তাঁর অনেক সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তিনিও যোগদান করেন। মনে আছে ২৫শে বৈশাখের সকাল বেলা শান্তিনিকেতনের আমবাগানে আশ্রমবাসীদের সম্বর্দ্ধনার পর একে একে যখন বাংলার উদীয়মান সাহিত্যিকেরা সত্যেন্দ্রনাথের সলজ্জ আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে আগে রেখে কবিগুরুকে প্রণাম করবার জন্য অগ্রসর হলেন। সত্যেন্দ্রনাথের হাতে কয়েকটি পদ্ম, আস্তে আস্তে তিনি সেগুলি কবির পায়ের কাছে রেখে পায়ের ধূলা নেবার জন্য হাত বাড়াতেই রবীন্দ্রনাথ কি স্নেহের সঙ্গে তাঁর হাত দুখানি দিয়ে সর্ব্বাঙ্গে যেন আশীর্ব্বাদ বুলিয়ে দিলেন। সেবার কয়দিন বোলপুরে থেকে বুঝলাম সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কত প্রিয়। কবির ক্রমাগত কেবল সত্যেন্দ্রের খোঁজ। কিছু পড়ে শোনাবেন, আগে জিজ্ঞাসা করছেন "সত্যেন কৈ?" সত্যেন্দ্র ত এগিয়ে এসে সাম্‌নে বস্‌বার লোক নন, একটি কোণে বন্ধু চারুবাবুর পিছনে চুপটি করে বসে' আছেন। সেখান থেকে তাঁকে আবিষ্কার করা হ'ল। "সত্যেন, তুমি কি লিখ্‌চো বল," "সত্যেন তুমি আমার কাছে এখানে এসে কিছুদিন থাক"— কবির মুখে কেবল শুনতাম এইসব স্নেহসম্ভাষণ। আর দেখ্‌লাম সত্যেন্দ্র তাঁর বন্ধুদের হৃদয়ে কতখানি স্থান অধিকার করে' আছেন। সেবার উৎসব উপলক্ষ্যে বোলপুরে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁর অনেক বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন অফুরন্ত রসের ফোয়ারা পরলোকগত গিরিশ শর্ম্মা। শান্তিনিকেতন গৃহের দোতলায় এঁরা সব একসঙ্গে ছিলেন। গিরিশবাবুর সঙ্গে আসাতে আমিও এঁদের মধ্যে স্থান পেয়েছিলাম। এঁরা সকলে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি যে কি অনুরাগী ছিলেন তা দেখে আমি অবাক্ হয়ে যেতাম। তারপরে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বহুবার বোলপুরে কবি-সঙ্গমে গিয়েছি। ঐ শান্তিনিকেতন গৃহের দোতলার বারান্দায় কত বিনিদ্র রাত্রি রবীন্দ্রনাথের গানে ও আলাপে ভরপুর হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে বারের সেই ২৫শে বৈশাখে বন্ধুজনের মাঝখানে সত্যেন্দ্রনাথের শান্ত হাস্যোজ্জল মুখ-শ্রী এখনো চোখের উপরে ভাসছে।

বোলপুর থেকে ফিরে এসে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তরফ হতে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে যাতে তাঁর যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা হয় সেজন্য সত্যেনবাবু, চারুবাবু, মণিলালবাবু বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করলেন। এই তিন বন্ধুরই অক্লান্ত চেষ্টায় এবং নাটোরের মহারাজা ও পরলোকগত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের উৎসাহে রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনার আয়োজন সুরু হ'ল। সেই আয়োজনে আমি তাঁদের কাজে লেগেছিলাম ছাত্রমহলে চাঁদা তোল্‌বার জন্য। এই উপলক্ষ্যেই

চারুবাবু ও মণিবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় ও আমি বয়সে তাঁদের অনেক ছোট হলেও আস্তে আস্তে তাঁদের ভিতরে এসে পড়ি। ভিতরে এসে দেখ্‌লাম এই বন্ধুদলটির মধ্যে কি নিবিড় প্রীতির বন্ধন। সত্যেন্দ্রনাথ, আগেই বলেছি, স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী ছিলেন, সকলের সঙ্গেই যে তিনি খুব একটা মিশ্‌তে পার্‌তেন এমন নয়। কিন্তু বন্ধু-সভায় তিনি নিজেকে গল্পে, গানে, হাস্য-পরিহাসে অজস্র ভাবে বিলিয়ে দিতেন। তাঁর প্রাণটা যে কত বড় আর কত তাজা ছিল তা তাঁকে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী মহাশয়ের বৈঠক্‌খানায় বা "ভারতী"-অফিসে মণিবাবুর সান্ধ্য-সভায় দেখ্‌লে বোঝা যেত। আর বোঝা যেত তাঁর সূক্ষ্ম সাহিত্য-রসোপলব্ধির শক্তি, প্রগাঢ় সৌন্দর্য্যানুভূতি ও নিপুণ সমালোচনার ক্ষমতা। সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁর চুলচেরা বিচার-পদ্ধতি ছিল না। অথচ ভাল-মন্দ লাগা সম্বন্ধে তাঁর কোন দিন কোন দ্বিধা দেখিনি। যেটা ভাল সেটা তিনি এমন সহজে ভাল ব'লে ধর্‌তে পার্‌তেন যে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হ'ত। তর্কবুদ্ধি দিয়ে তিনি সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচার কর্‌তেন না; কর্‌তেন তাঁর স্বাভাবিক সহজ শক্তি দিয়ে। কিন্তু তাই বলে' কোন রচনা কেন ভাল বা মন্দ তা নিয়ে তর্ক কর্‌তে তাঁকে কোন দিন কুণ্ঠিত দেখিনি। তর্ক তাঁর সঙ্গে অনেক করেছি ও অনেককে কর্‌তে শুনেছি, কিন্তু এক দ্বিজেন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয় ছাড়া আর কাউকে তাঁকে তর্কে এঁটে উঠ্‌তে দেখেছি বলে' মনে পড়ে না। কিন্তু মতামত সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধাহীন অসংশয় ছিল বলে' গোঁড়ামি বা dogmatism মোটেই ছিল না।

দীর্ঘ বারো বছর সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তাঁর মনীষা, চরিত্র ও হৃদয়ের যে পরিচয় পেয়েছি তা একটি মাত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর কয়েকটি গুণের কথা না বল্‌লে এ বন্ধুকৃত্য অসমাপ্ত থেকে যাবে। সকলের [illegible] মনে পড়ে তাঁর নিজের রচনা সম্বন্ধে নিন্দা বা প্রশংসায় সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব। সে রকম আর কোন সাহিত্যিকের দেখেছি বলে' মনে হয় না। মনে পড়ে তাঁর এক একটা কবিতা বেরিয়েছে আর লোকে তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে, কত লোক তাঁর সাম্‌নে এসে কতদিন কত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে, কিন্তু একটি দিনের জন্যও তাঁকে কোন রকম বিচলিত হতে দেখি নি। একদিন আমরা কয়েকটি বন্ধু বোলপুর থেকে ফিরে আস্‌ছিলাম, সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বর্দ্ধমানে কোন প্রসিদ্ধ স্বদেশী বক্তা আমাদের গাড়ীতে উঠ্‌লেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় পেয়ে তাঁর সঙ্গে নিজে আলাপ করে' তাঁর কবিতার খুব প্রশংসা আরম্ভ কর্‌লেন। তাঁর প্রশংসার মধ্যে অত্যুক্তি কিছুমাত্র ছিল না, কিন্তু সে সময় সত্যেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখ্‌লে অতি বড় হৃদয়হীনেরও কষ্ট হ'ত, যেন তাঁকে হত্যাপরাধে বিচারকের সাম্‌নে হাজির করা হয়েছে। ভদ্রলোক বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে তাঁর প্রশংসা সত্যেন্দ্রকে আনন্দের পরিবর্ত্তে পীড়াই দিচ্ছে, তিনি থাম্‌লেন, কবি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লেন। হাওড়ায় নেমে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "অমন কর্‌ছিলেন কেন?" উত্তর পেলাম "বড় বক্তৃতার মত

শোনাচ্ছিল।" আর একবার লক্ষ্ণৌর ব্যারিষ্টার, কবি অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য জানিয়ে আমাকে চিঠি লেখেন। আমি সে চিঠিখানি সত্যেন্দ্রনাথকে পড়ে' শোনালাম। তার কিছুদিন পরেই অতুলবাবু কলকাতায় এলে একদিন সন্ধ্যায় "ভারতী"-অফিসের তেতালার বৈঠকে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য তাঁকে নিয়ে এলাম। অতুলবাবু অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ সেরে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে তাঁর কবিতা পড়ে' কি আনন্দ পেয়েছেন সেই কথা যত বল্‌তে লাগ্‌লেন সত্যেন্দ্রনাথ ততই সংকোচে স্নারা হতে লাগ্‌লেন, ভাল করে অতুলবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বল্‌তে পার্‌লেন না। এত গেল অপরিচিতের প্রশংসা। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে প্রশংসা শুন্‌লে আনন্দ নিশ্চয়ই পেতেন, কিন্তু কোন দিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌তে দেখিনি। বাস্তবিক, প্রশংসা সম্বন্ধে তাঁর আশ্চর্য্য ঔদাসীন্য ছিল। য়ুরোপীয় সমালোচকের একটু সার্টিফিকেট চিঠির পর চিঠি লিখে আনাতে পার্‌লে যে দেশের বিশ্বপণ্ডিতরা একেবারে দামামা কাঁধে করে' বের হন, সেই দেশে জন্মে' সত্যেন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে যে কতটা উদাসীন ছিলেন তার একটু পরিচয় দিই। রবিবাবু তাঁর "Fruit-Gathering" বইখানিতে সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার তর্জ্জমা করেছেন। "Fruit-Gathering" যখন বের হয় আমি তখন লাহোরের ইংরেজী দৈনিক "পাঞ্জাবী" কাগজে। সেই সময় বিলাতের কাগজে "Fruit-Gathering"এর যেসব সমালোচনা হয় তার অনেকগুলো আমার কাছে আসে। তার মধ্যে একটা খুব নামজাদা কাগজের সমালোচনাতে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষভাবে উল্লেখ করে' বলা হয় যে অন্য যত বাংলা কবির কবিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর Fruit-Gatheringএ তর্জ্জমা করেছেন তার মধ্যে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাতেই একটি বিশেষ সুর আছে। সমালোচনাটি পড়ে' আমার বড় আনন্দ হ'ল, আমি সেটি সত্যেন্দ্রবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। প্রাপ্তি-স্বীকারের সময় পেরিয়ে গেলেও যখন কোন জবাব পেলাম না তখন আমার চিঠিটা পেলেন কি না জান্‌বার জন্য আর-একখানা চিঠি লিখ্‌লাম। এবার সময়-মত জবাব এল :—

"* * * স্বয়ং কবি আমার রচনা তর্জ্জমা করেছেন এইটেই আমার পক্ষে এত বড় কথা যে তারপর কোন্ বিলাতী কাগজ, তা যত বড়ই হোক্ না, কি বল্‌লো বা না বল্‌লো তাতে আমার দুঃখ বা আনন্দ কিছুই নেই। তাই তোমার চিঠির জবাব কি দেব ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছিলাম না। Acknowledge অবশ্য অনেক আগেই করা উচিত ছিল, সেজন্য রাগ কোরো না। * * *"

নিন্দা সম্বন্ধেও একই রকম ঔদাসীন্য। বাংলাদেশে সাহিত্যক্ষেত্রে, সকলেই জানেন, ঈর্ষা অসূয়ার অভাব নেই। বিশেষতঃ সত্যেন্দ্রনাথের লোকযশ নবীন কবিদের কারুর কারুর কষ্টের কারণ হয়েছিল। এঁদেরি মধ্যে একজন একবার অকারণে সত্যেন্দ্রের কবিতার খুব কটু সমালোচনা করে' আমাকে একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানি আমি চারুবাবুকে পড়ে' শোনাই। চারুবাবু সে চিঠির কথা সত্যেনবাবুকে বলেন। তারপর যেদিন সত্যেনবাবুর সঙ্গে দেখা

হ'ল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—"অমুক আপনার কবিতা সম্বন্ধে কি লিখেছেন শুনেছেন ?" তিনি উত্তরে বল্লেন— "হ্যাঁ, চারু কি বলেছিল বটে।" বাস্, ঐটুকু, তারপর চিঠিখানার আর কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত করলেন না। যিনি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর সঙ্গে তারপর আমার বাড়ীতে ও অন্যান্য জায়গায় অনেকবার সত্যেনবাবুর দেখা হয়েছে, কিন্তু তাঁর প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের কখনো কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিনি। নিজেদের মধ্যেও কোন দিন তাঁর সম্বন্ধে কোনরকম নিন্দা তাঁর মুখে শুনি নি। লোকের সম্বন্ধে ঠাট্টা তামাসা বন্ধুবান্ধব-মহলে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট শোনা যেত বটে, কিন্তু তাঁর কাছে কারুর নিন্দা বিশেষ শুনেছি বলে' মনে পড়ে না। তাঁর সমসাময়িক কবিদের সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের মনের কোণে কোথাও ঈর্ষার লেশমাত্র ছিল না। যখন যাঁর যে কবিতা ভাল লেগেছে মুক্তকণ্ঠে তখন তাঁর সে কবিতার প্রশংসা করেছেন। "ঝরাফুলের" কবি করুণানিধানের অনেক কবিতার সুখ্যাতি তাঁর মুখে শুনেছি। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর "অপরাজিতা" কাব্য বের হলে পর তিনিই সেখানি আমাকে পড়্‌তে দেন। বইখানি ফেরত দিলে পর সত্যেন্দ্রনাথ কেমন লাগ্‌লো জিজ্ঞাসা করাতে আমি বল্লাম "বৈচিত্র্যের অভাব।" তিনি বল্লেন "তা হতে পারে, কিন্তু খাঁটি কাব্যরস আছে।"

স্বদেশের প্রতি গভীর প্রীতি সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রের আর-এক বিশেষত্ব ছিল। "কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল" কবিতা থেকে আরম্ভ করে' 'গান্ধিজী' পর্য্যন্ত সমস্ত কবিতার প্রত্যেকটি ছত্রে সে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় রয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তা কাজকর্ম্মের মধ্যে এই প্রেম যে নানা ভাবে নানা মূর্ত্তিতে ফুটে উঠ্‌ত তা শুধু তাঁর বন্ধুরাই জানেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল একেবারে সাঁচ্চা,—ঝুঁটা স্বাদেশিকতার মোহ তাঁকে কোন দিন আচ্ছন্ন করতে পারেনি। স্বদেশের বা স্বজাতির ভাল-মন্দ সব কিছু নির্ব্বিশেষে আঁকড়িয়ে ধরে' তাকে জাতির প্রতি মমত্ববুদ্ধি বলে' ঘোষণা করার মত দুর্ব্বুদ্ধি তাঁর কখনো হয় নি। দেশের নামে কোন অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে বা মনুষ্যত্বকে কোথাও খর্ব্ব করা হচ্ছে দেখ্‌লে তিনি একেবারে অসহিষ্ণু হয়ে উঠ্‌তেন। যেখানে দেশের লোকের অন্যায় বা অত্যাচার দেখেছেন, কাপট্য বা ভণ্ডামির পরিচয় পেয়েছেন সেখানে নির্ম্মম হয়ে আঘাত করেছেন। আবার বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের হাতে স্বদেশবাসীর লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনকে ঠিক তেমনি জোরের ও সাহসের সঙ্গে আক্রমণ করে' তিনি তাঁর পৌরুষের পরিচয় দিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের মত শান্ত লোক খুব কমই দেখেছি। কিন্তু পাঞ্জাবের ডায়ারী-কাণ্ড তাঁকে কি রকম উত্তেজিত করেছিল তা আমি জানি। লাহোরে হাণ্টার-কমিটির সাম্‌নে ডায়ার যখন সাক্ষ্য দেয় তখন আমি "ট্রিবিউন" কাগজে তার একটা বর্ণনা দিয়েছিলাম। সেই বর্ণনাটুকু সঙ্গে দিয়ে তাঁকে আমি একটা চিঠি লিখি। তাতে ২৫,০০০ নিরপরাধী ও নিরস্ত্র লোকের উপর গুলি চালিয়ে তার জন্য ডায়ারের বাহাদুরী ও কমিটির দেশী সদস্যদের সঙ্গে তার উদ্ধত ব্যবহারের কথা সব ছিল। বর্ণনাটি পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে লিখ্‌লেন :—

"* * * আমি শুধু ভাব্‌ছি তুমি চুপ করে' বসে' ঐ evidence শুন্‌লে কি করে'? আমার তো পড়ে' রক্ত গরম হয়ে উঠেচে। আমি যদি উপস্থিত থাক্‌তুম, তা হলে নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড করে' বস্‌তুম। আর পাঁচহাজার পাঞ্জাবীর সাম্‌নে বসে' ভায়ার ঐ রকম তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে চলে গেল? * * * *"

শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু যে "Modern Review"এ লিখেছেন "He was a fiery Nationalist, almost a revolutionary"—সে কথাটা যে কতখানি সত্য তা একটি ঘটনার উল্লেখ কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যাবে। যুদ্ধের সময় যখন বাঙ্গালী পল্টন তৈরী হচ্ছিল তখন একবার আমি পরলোকগত সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের আগ্রহে কোন এক জায়গায় তাঁর সঙ্গে রংরুট সংগ্রহে যাই। যাওয়ার কিছুই ঠিক ছিল না। হঠাৎ একদিন শনিবার সুরেশবাবু এসে বাড়ী থেকে আমাকে ধরে' নিয়ে গেলেন। পরদিন রবিবার দুপুরে সত্যেনবাবুর বাড়ীতে আমার যাবার কথা আগে থেকে ঠিক ছিল। সুতরাং যাওয়ার আগে তাঁকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে গেলাম। সোমবার সকালে কল্‌কাতা ফিরে এসে দেখ্‌লাম আমার টেবিলের উপর একখানি পোষ্টকার্ড রয়েছে। তাতে শুধু দুটি লাইন লেখা :—

"কেন যে এ রণ জান না কারণ—তবুও যুঝিছ, হায়,
জয় পরাজয় সমান তোমার, চিরশৃঙ্খল পায়।"

—সত্যেন্দ্র

বন্ধুদের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা বল্‌তে গেলেই সকলের আগে মনে পড়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা। কি মধুর বন্ধন যে ছিল এই দুজনের মধ্যে তা লিখে বোঝানো অসম্ভব। যতদিন এঁদের দু'জনকে দেখেছি ততদিন মনে হয়েছে সার্থক এ বন্ধুত্ব। প্রতিদিন সকাল বেলা বেড়িয়ে ফের্‌বার সময় সত্যেন্দ্র একবার "চারুর" সঙ্গে দেখা করে' যাননি এমন বোধ হয় কখনো ঘটেনি। সকালে হয় তো চারুবাবুর ঘরে বসে' আছি, তিনি গল্প কর্‌চেন আর ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন, কি না "সত্যেনের আস্‌বার সময় হ'ল বোধ হয়।" অল্পক্ষণ পরেই নীচ থেকে ডাক শোনা গেল "চারু"। সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে ভাবোচ্ছ্বাসের বাহুল্য ছিল না, কিন্তু সে ডাকে একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য মাখান থাক্‌তো। বন্ধুবান্ধবরা সব মিলে কোথাও বেড়াতে যাবার আয়োজন হচ্ছে, সকলে উৎসুক সত্যেনবাবু যাবেন কি না জান্‌বার জন্য। সত্যেনবাবু আগে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "চারু যাবে ত?" যদি শুন্‌লেন যে চারুবাবুর যাওয়া হয় ত সম্ভব হবে না, তবে আর তাঁকে কিছুতেই সঙ্গী করা গেল না। বল্‌তেন "চারু সঙ্গে না থাক্‌লে আমি কোথাও যেতে ভরসা পাই না। আর চারুর সঙ্গে যাচ্ছি শুন্‌লে মা নিশ্চিন্ত মনে যেতে দেন।" সত্যিই দেখেছি চারুবাবুর উপর তাঁর শিশুর মত নির্ভরের ভাব। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে বাহ্যসংজ্ঞাহীন অবস্থায় চারুবাবুর "সত্যেন" "সত্যেন" ডাকের উত্তরে মুখে তাঁর শেষ হাসির রেখা ফুটেছিল আর হাত দু'খানি বাড়িয়ে বন্ধুর হাত দুটি খুঁজেছিলেন।

ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। দ্বিজেন-বাবু একবার সস্ত্রীক পশ্চিমে বেড়াতে যাবার সময় সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁদের সঙ্গী করেন। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের কতকগুলি বাঁধাবাঁধি অভ্যাস থাকাতে তাঁর বড় ভাবনা ছিল যে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিজেনবাবুদের না জানি কত অসুবিধা হবে। বেড়িয়ে কল্‌কাতায় ফিরে এসে বন্ধুবান্ধবদের কাছে কতবার যে দ্বিজেনবাবু ও তাঁর স্ত্রীর যত্নের ও তাঁর সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখার কথা বলেছেন তা বল্‌তে পারি না। আর একবার রবীন্দ্রনাথ কাশ্মীর বেড়াতে যাবার সময় সত্যেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। বাড়ীর লোক কিম্বা চারুবাবুকে ছাড়া এই বোধ হয় তাঁর দ্বিতীয় ভ্রমণযাত্রা। অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে দ্বিজেন বাগ্‌চী মহাশয়ের রসগ্রাহিতা ও সাহিত্য-সমজ্‌দারিতার উপর তাঁর খুব আস্থা ছিল। সত্যেনবাবু তাঁকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করতেন। বাগ্‌চীমহাশয়ের সঙ্গে যখন একটি ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথের কোন বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদের মতের অমিল হয় তখন সত্যেন্দ্রনাথকে যেমন বিচলিত হতে দেখেছিলাম এমন আর কখনো দেখিনি।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ছোট গল্পের যেমন অনুরাগী তেমন আর কেউ ছিলেন না। বল্‌তেন "সত্যিকার ছোট গল্প, যা ঠিক ফরাসী ছোট গল্পের কায়দায় লেখা, তা শুধু মণিলালই লিখেছে।" ইদানীং আমার কাছে একদিন দুঃখ করে' বলেছিলেন, "মণিলাল গল্প লেখা ছেড়ে দিলে দেখ্‌ছি। ওর বড় চমৎকার হাত ছিল।" আর একদিন বলেছিলেন, "তুমি মণিলাল ও চারুর গোটা কয়েক বাছা বাছা গল্প ইংরেজীতে তর্জ্জমা কর না কেন?" আমি আমার অক্ষমতা জানালে শুধু হাস্‌লেন।

আমি বয়সে ও সকল রকমেই সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক ছোট ছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁর বয়স্যদের সঙ্গে যে ভাবে মিশেছেন, আমার সঙ্গে বরাবর ঠিক সেই ভাবেই মিশেছেন, কোন বিষয়ে কোন রকম পার্থক্য করেন নি। বয়সের বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমি তাঁর অন্তরঙ্গ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। যখনই কোন নতুন কবিতা লিখেছেন তখনই খবর দিয়েছেন, পড়িয়ে শুনিয়েছেন এবং ভাল লাগ্‌লো কি না জিজ্ঞাসা করেছেন। তাঁর কাছে আমি অনেক জিনিষ শিখেছি, কিন্তু তিনি কোনদিন শিক্ষকভাবে আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেননি, বন্ধুভাবে করেছেন। একবার মনে আছে গ্রীষ্মের ছুটির সময় প্রায় দু'মাস ধরে' দুপুরবেলার অসহ্য গরমে আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আধুনিক ইংরেজ ও নব্য আইরিশ কবিদের কাব্য পড়েছিলেন। তখন তাঁর চোখ খারাপ হয়েছে, আমি পড়্‌তাম, তিনি শুন্‌তেন ও ব্যাখ্যা কর্‌তেন। সে সময় একদিকে তাঁর বোঝাবার শক্তি ও অন্যদিকে তাঁর ধৈর্য্য দেখে অবাক্ হয়ে যেতাম। আমি কত কবিতার কত রকম অদ্ভুত অর্থ করেছি, তিনি কিন্তু একদিনের জন্যও একটু অসহিষ্ণু হননি।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস তাঁর খুব বেশী ছিল না। বিশেষতঃ

চোখ খারাপ হবার পর চিঠি লেখার অভ্যাস আরো ক'মে এসেছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের হাঙ্গামার সময় যখন চারিদিকে বিপদের মধ্যে আছি তখন তাঁর কাছ থেকে একদিন একখানি পোষ্টকার্ড পেলাম, তাতে শুধু বড় বড় করে লেখা "মাভৈঃ।" সেই ঘোর দুর্দ্দিনে যখন "নিত্য চকিত চঞ্চল চিত," তখন তাঁর এই অভয়বাণী প্রাণে যে বল দিয়েছিল তা এখন বোঝান কঠিন। যে ক'বছর আমি পাঞ্জাবে ছিলাম, সে ক'বছর নববর্ষে নিয়মিত তাঁর কাছ থেকে একটি করে' কবিতা উপহার পেতাম। তার মধ্যে দুটি একেবারে বিভিন্ন রকমের কবিতা এখানে দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করে' এই অসম্পূর্ণ স্মৃতি-কথা সমাপন কর্‌লাম।

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১৩২৫।

প্রিয়বরেষু,

নূরজাহানের চোখের চমক
আনারকলির ছায়া
তোমার চিঠি আমার মনে
ঘনিয়ে তুলে মায়া।

লাহোর থেকে হাজির ডাকে
কুহকী কার্‌পেট,
হারিয়ে পেলাম হালখাতাতে
বকেয়া স্মৃতির ভেট।

মনের আগে স্বপন রাগে
আজ জাগে আবার—
সেই আরামের সপ্ত অতল
শোভন শালেমার।

Motor-ধূলোয় Goggle এঁটে
দেখ্‌ছি যে Day-dream
রজত পারা রাবীর ধারা
চোখের Ice-cream!

শ্বেত-পাথরের মৌচাকের ফের
ঝর্‌ছে তরল ধার,
পদ্মরাগের পদ্ম কুঁড়ি
পাঁপ্‌ড়ি খুলে তার।

বীণাপাণির অলক আঁকে
ফার্সী হরফে
বাদ্‌শাজাদী জেবুন্নিসা
মখ্‌ফি ওরফে।
রণজিতের ভস্মে মেশে
ভস্ম কপোতীর,
বুকের উপর ল'চলে' যায়
ঘুমায় জাহাঙ্গীর।
নেই শুধু ঘুম কালের চোখে
পলক না পড়ে !—
Philosophy !—কি সর্ব্বনাশ !—
সাতায় চড়ে
খুল্‌ছিনে আর মুখ কলমের,
এইখানে বিশ্রাম
বেদব্যাসের ; বিদায় বন্ধু,
আলেকম্ সেলাম্।
নূতন বর্ষে নিখুঁত্ হয়ে
কাটাও অহর্নিশ,
বাঙ্গালী ! গুল্‌জার করে' দাও
"পাঞ্জাবী" অফিস॥ ইতি—

সত্যেন্দ্র

(২)

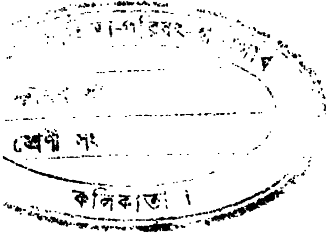
কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১৩২৭।

বন্ধু,

পাৎলা পাতার শাঁওলা ছায়ে
কে এলো আজ আদুল গায়ে,
উষার আলোয় জাগ্‌লো সাড়া
কোন্ পরাণের স্পন্দনের ?
স্মৃতির সাথে স্বপ্ন মিলে
সঙ্গমে তার নাইয়ে দিলে
হ'ল বিয়ে হাসির সঙ্গে
অতনু কোন ক্রন্দনের ?

ধ্যানে ছিল যে চাঁপাফুল
ঘুমিয়ে ছিল যে-সব বকুল
যে গন্ধটুক্ লুকিয়েছিল
তরুণ শাখায় চন্দনের
আজকে তারা নতুন স্পর্শে
উঠ্‌লো জেগে নতুন হর্ষে
তাদের স্বপন তোমায় সঁপে
ছুটলো হাওয়া নন্দনের।

তোমার—সত্যেন্দ্র
শ্রীঅমলচন্দ্র হোম



সঙ্গণিকা।

৺ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাঙ্গলার বাণী-মন্দিরের একনিষ্ঠ সাধক, বঙ্গভারতীর বরপুত্র, বাঙ্গালীর প্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গত ১০ই আষাঢ় রাত্রি তৃতীয় প্রহরে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রাবণের বারিধারার মত জগৎ কবি রবীন্দ্রনাথ যে ভাবধারায় দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, তাহাতে অবগাহন করিয়া যে কয়জন একনিষ্ঠ পূজারী আপন আপন কল্পনাকুঞ্জ হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া বঙ্গবাণীর মন্দির প্রাঙ্গনে অর্ঘ্যসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজটীকা পাইয়াছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। বাঙ্গলার আধুনিক-গীতিকাব্য-সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের আসন রবীন্দ্রনাথের পরই।

ভাবে ভাষায় ও ছন্দে বাংলা ভাষাকে তিনি অতুল সম্পদে বিভূষিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি জ্ঞানী সুশিক্ষিত ও স্থিরচিত্ত ছিলেন। হৃদয়ে ছিল তাঁহার অদম্য নির্ভিকতা, বিশাল উদারতা ও সত্যের জন্য আকুল আগ্রহ। চরিত্র তাঁহার ছিল নির্ম্মল নির্দ্দোষ ও অহঙ্কার বিহীন। তাঁহার কবিতায় এই সব কয়টি গুণ উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তেজস্বিতায়, পবিত্রতায় ও ভাবের প্রাঞ্জলতায় তাঁহার বহু কবিতা বঙ্গভাষার রত্নভাণ্ডারে হীরক খণ্ডের মতন চিরদীপ্তিমান থাকিবে। স্বদেশপ্রেমে তাঁহার হৃদয় ভরপুর ছিল, কিন্তু তাঁহার বিশাল উদার হৃদয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কখনও আবদ্ধ ছিল না। জগতের যত আশা আকাঙ্ক্ষা, যত কিছু দুঃখ বেদনা সবই সত্যেন্দ্রনাথের বীণায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।

পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম দেশে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল তখন কবি রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতায় প্রাণের প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। এবার যখন ভারতের অর্দ্ধজড়তা-মগ্ন বিরাট জনসংঘকে আত্মার মর্য্যাদা বুঝাইবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর আহ্বান বাজিয়া উঠিল তখন সত্যেন্দ্রনাথ এই জগতযজ্ঞের বিরাট সূচনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন

এবং "জগন্নাথের রথের সারথী"কে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে সসম্মানে বরণ করিয়া লইলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং নানা ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্য সম্পদ আহরণ করিয়া বাংলাভাষাকে উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার অনুবাদ কখনও অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। ভাব ও ভাষার আশ্চর্য্য সমাবেশে সেগুলিকে মৌলিক করিয়া তুলিয়াছে। বাংলা ভাষায়ও শব্দ সম্পদে তাঁহার ক্ষমতা খুব বেশী ছিল। রবীন্দ্রনাথের তিনি শিষ্য ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মৌলিকতা অসাধারণ।

এ সংসারের হিসাবে আমরা সত্যেন্দ্র নাথকে হারাইয়াছি বটে কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অন্তরে তিনি চিরকাল অমর হইয়া রহিবেন। তাঁহার পুত্রহারা বৃদ্ধাজননী ও নিঃসন্তানা পত্নীই কি শুধু আজ তাঁহার জন্য বেদনাক্লিষ্টা? আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতি সত্যেন্দ্রনাথের জন্য বেদনাপীড়িত। সত্যেন্দ্র নাথের অভাব পূর্ণ হইবার নহে—এই নব-জাগরণের দিনে বাঙ্গালীর প্রাণে উদ্দীপনা দিতে সত্যেন্দ্রনাথের মত আর কেহ নাই!

আমরা আশাকরি বাঙ্গালী সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা যথার্থরূপে করিবে। অবগত হইলাম নব্যভারতের এই সংখ্যার "সত্যেন্দ্র-স্মৃতি প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অমল চন্দ্র হোম কবির কাব্য সমূহ হইতে যাহাতে একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চয়ানিকা প্রকাশিত হয়, সত্যেন্দ্র নাথের বন্ধুদের নিকট সেইরূপ একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। কবির স্মৃতিরক্ষার্থ এ প্রস্তাব সমীচীন ও শোভন বলিয়া মনে হয়। আশা করি ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে।

বঙ্কিম-স্মৃতি।

সম্প্রতি সাহিত্যপরিষদে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং এজন্য প্রায় ২৫০০৲ টাকা খরচ হইবে এইরূপ অনুমান করা হয়। সেদিন বঙ্কিম স্মৃতি সভায় প্রকাশ করা হয় যে, এই সামান্য অর্থও সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে যে কি লজ্জার কথা তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি দেশের সম্মান-হীনতার সূচনা করিতেছে কি? অথবা বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের সর্ব্ববিষয়ে উদাসীনতা, উৎসাহ-হীনতা ও নির্ব্বিকার ভাব প্রকাশ করিতেছে? এই সামান্য বিষয়টিতে কি আমাদের জাতীয় মনের একটা প্রকাণ্ড গ্লানির ক্ষত চোখের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে নাই।

তবে সুখের বিষয় যে সভাস্থলেই মোট ব্যয়ের বাকী টাকা সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে সাহিত্য পরিষদই এই ক্রটীর জন্য সম্ভবতঃ দায়ী। তাঁহারা বঙ্কিম স্মৃতির প্রস্তাবটি যথেষ্ট বিজ্ঞাপিত করেন নাই। সাহিত্য পরিষদেই এমন অনেক সভ্য আছেন যাঁহারা ইচ্ছা করিলে একাই এই সামান্য ব্যয় বহন করিতে পারিতেন। অথবা সর্ব্বসাধারণ জানিতে পারিলে বহুপূর্ব্বেই আশাতিরিক্ত চাঁদা সংগৃহীত হইত ও সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে এই কলঙ্কভাগী হইতে হইত না।

* * * * *

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার জুলাই মাসের অধিবেশন শেষ হইয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র প্রজার উপর নূতন টেক্স বসাইয়া যে টাকা আদায় করিলেন, তাহার কতক টাকা খরচের জন্য কাউন্সিল নূতন বজেট পাশ করিয়া দিলেন। ৩৩ লক্ষ টাকার বাজেট পাশ হইয়া গেল, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মোট ২০ হাজার টাকাও কমাইতে পারিলেন না। ব্যবস্থাপক সভার হাতে ব্যয় সংক্ষেপের ভার দিলে ফল কিরূপ হইবে তাহার সূচনা পাওয়া গেল।

কনেষ্টবলদের জন্য "স্প্রিং ওয়ালা" লোহার খাট, কয়েকজন পুলিস সাহেবের জন্য মোটর গাড়ীর ভাতা ও মঞ্জুর হইয়া গেল, ব্যবস্থাপক সভা কিছুই করিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। প্রথম বৎসরের বাজেট বিচারের সময় সভ্যগণের মধ্যে যে একতা ছিল, তাহা একেবারে লোপ পাইয়াছে মনে হয়। ইহার দুইটি কারণ আপাততঃ সকলের চোখেই পড়িতেছে। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের দলপুষ্টির চেষ্টা। উপাধি বর্ষণ, আত্মীয়দের চাকুরীসংস্থান, রাজপ্রাসাদ তুল্য বাড়ীতে রাজভোগে থাকার বন্দোবস্ত, উচ্চপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ ইত্যাদি নানা কারণে সভ্যদের মধ্যে কেহ কেহ গভর্ণমেণ্টের যে সকল প্রস্তাবে পূর্ব্বে তাঁহাদের আপত্তি জানাইয়াছিলেন সেই সকল প্রস্তাবই সমর্থন করিতেছেন বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন। আবার অন্য দিকে opposition পার্টির কোন দল নাই। সেখানে সকলেই দলপতি হইতে ইচ্ছুক কেহই কাহারো সঙ্গে কাজ করিতে চাহেন না। ইহাতে ২।১ জন সভ্যের ব্যক্তিগত ভাবে নাম জাহির হইতেছে বটে, কিন্তু দেশের কাজ কিছুই হইতেছে না। লেজিসলেটীভ্ এসেমব্লীতে যেরূপ ডেমোক্রেটিক্ পার্টি হইয়াছে, সেরূপ কি এখানে ও হইতে পারে না? সভ্যগণ কি নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, নিজেদের ব্যক্তিগত নাম জাহির করিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারেন না? পার্লামেণ্টের প্রণালীতে দেশের কাজ করিতে হইলে, দল গঠন না করিলে চলিবে না। যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের opposition পক্ষে, তাঁহারা নিশ্চয়ই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া দেশের মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান যে একত্র হইয়া একজোটে কাজ করিলে তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলে দেশে তাঁহাদের যে যশ ও সুনাম ছড়াইয়া পড়িবে, শুধু নিস্ফল বক্তৃতার সৃষ্টি করিলে দেশের লোক ভুলিবে না। কারণ বক্তৃতার মোহ লোকে কাটাইয়া উঠিয়াছে।

* * * *

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ একবার একরূপ ভোট দিয়া, পরবর্ত্তী সভায় তাহার প্রত্যাহার করিতেছেন, এরূপ ঘটনা পৃথিবীর কোন ব্যবস্থাপক সভায় ঘটে কি না জানি না; কিন্তু সামান্য একটা মিউনিসিপালিটিতেও ছয়মাসের মধ্যে সহজে মত পরিবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা নাই। প্রতি অধিবেশনে মত বদলাইয়া, এরূপ ছেলেমানুষী করিলে, জনসাধারণ দূরে থাকুক, গবর্ণমেণ্ট নিজেই এ সভাকে কতদূর হেয় ও তুচ্ছ মনে করেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। গত মার্চ্চ মাসে ব্যবস্থাপক সভা কলিকাতার নবনিযুক্ত পুলিস

সোয়ারের টাকা নামঞ্জুর করিলেন; লর্ড লিটন্ বিচক্ষণ লোক, তিনি শুধু তিনমাসের জন্ত নিজের দায়িত্বে টাকাটা খরচ করিয়া, বাকী নয় মাসের জন্ত ব্যবস্থাপক সভার পুনর্বিবেচনার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন। লিটন সাহেব বলিলেন, "তোমরা মাত্র এক ভোটে নামঞ্জুর করিয়া দিলে, বোধ হয় নিজেদের মনের ভাব নিজেরাই বুঝিতে পার নাই।" ব্যবস্থাপক সভার স্থিরমতিত্ব সম্বন্ধে চমৎকার সার্টিফিকেট। এবার লিটন্ সাহেব আরো বলিলেন, "যদিও তোমাদের কথা অগ্রাহ্য করিবার আমার ক্ষমতা আছে, এবার আমি তাহা করিব না। আশা করি তোমরা বুঝিয়া সুঝিয়া ভোট দিবে।" সদস্যগণ অমনি স্কুলের অনুতপ্ত "ভাল" ছাত্রের মত, চট্‌পট টাকাটা মঞ্জুর করিয়া দিলেন। তিন মাস আগে যে নিজেরাই টাকাটা নামঞ্জুর করিয়াছিলেন, সে কথা কি একেবারেই মনে হইল না? এরূপ ব্যবস্থাপক সভার মূল্য কি? এখন কি সভাটা ভাঙ্গিয়া আবার নূতন Election করা উচিত নয়? হাই-কোর্টের ছাপান বহির (Paper Book) বিষয়ে ও, সভা নিজের ভোট নিজেই উল্‌টাইয়া দিলেন, বাহাদুরী বটে!

*　　　*　　　*　　　*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত ২॥০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। অনেক সদস্যই এই টাকা কাটিবার জন্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের হিসাবপত্র গবর্ণমেণ্টকে দেখাইবেন স্বীকার করাতে, সকলেই টাকা কাটিবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। শুধু একজন সভ্য নাছোড়বান্দা হইয়া দশ হাজার টাকা কাটিবার প্রস্তাব করিলেন। অবশ্য এই দশহাজার টাকা কাটিয়া লইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না, গবর্ণমেণ্টের ও বিশেষ লাভ হইত না; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কার্য্য শৃঙ্খলার প্রতি লোকের আস্থা নাই, এই কথাটিই প্রমাণিত হইত। কিন্তু এই প্রস্তাবও গৃহীত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্ত ব্যবস্থাপক সভা কি অনুতপ্ত হইয়াছেন?

*　　　*　　　*　　　*

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে মৌলবী ফজলল্ হক্ সাহেব হিন্দুমুসলমানের কথা তুলিয়া শিক্ষার পুণ্যমন্দিরের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। বাণীর মন্দিরে জাতিভেদ নাই। সেখানে উপযুক্ত লোকেরই আদর হয়। মৌলবী ফজলল্ হক্ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, শিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে কয়জন শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিয়াছে?

যখন উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে, তখন স্বভাবতঃই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে আরো অধিক সংখ্যক মুসলমানের স্থান হইবে সন্দেহ নাই। যদি জাতিগত বৈষম্য লইয়া কাজ চলে, তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণাম জানিয়া আমরা হতাশ হই।

*　　　*　　　*　　　*

বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদ যোগে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে শুনিয়া মৌলবী ফজলল্ হক্ সাহেব ঘোরতর আপত্তি করিয়াছেন। ইহাতে নাকি বঙ্গদেশের মুসলমান

সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে, কারণ ফজলুল্ হক্ সাহেব বলেন, মুসলমানদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা নয় উর্দ্দু। আমরা বঙ্গদেশের মুসলমানদের নিকট সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি এই মতের পক্ষপাতী? মুসলমান সমাজের মুখপত্র "সেবক" কিন্তু হক সাহেবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গলা।

*　　*　　*　　*

গবর্ণমেণ্ট বাংলাদেশের জন্য যে ব্যয় সংক্ষেপ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা লইয়া সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় বেশ একটু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কোন কোন মেম্বর স্পষ্টই বলিয়াছেন, এই কমিটির সদস্যদের উপর তাহাদের বিশেষ আস্থা নাই। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রমুখ কয়েকজন Businessmen গবর্ণমেণ্টের ছোট খাট ব্যয়ের এখানে কিছু, ওখানে কিছু কাটিতে পারেন, কিন্তু মোটা মোটা অনাবশ্যক ব্যয় বন্ধ করিতে কিংবা গবর্ণমেণ্টের পলিসির বিরুদ্ধে কি তাঁহারা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন, এবং করিলেও কি তাহার খুব বেশী মূল্য হইবে? রাজনীতি ক্ষেত্রে এই কমিটির মেম্বরদের কোন দক্ষতার পরিচয় এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আমাদের ন্যায় দরিদ্রদেশে মোটা বেতনের ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিসের লোক রাখা যাইতে পারে কি না ইহা কি এই কমিটি বিবেচনা করিতে পারিবেন? জাপানের তুলনায় আমাদের কর্ম্মচারীদের কত অধিক বেতন দেওয়া হয় তাহা ভাবিবার বিষয় বটে! জাপানের সরকারী আয় অনুসারে কর্ম্মচারীর বেতন নির্দ্দিষ্ট হয়, আর আমাদের দেশে বিদেশী কর্ম্মচারীর সুবিধার দিকে নজর রাখিয়া তাহাদের বেতন নির্দ্ধারণ করা হয়। এই দুই প্রণালীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের দেশের আয় অনুসারে এ দেশের উচ্চতম কর্ম্মচারীরা বেতন নির্দ্ধারণ করার কি এই কমিটির ক্ষমতা থাকিবে? নতুবা শুধুই পণ্ডশ্রম করিয়া লাভ কি?

শাসন সংস্কারে যে শুধু বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাই নহে—প্রায় প্রত্যেক বিভাগে কর্ম্মচারী সংখ্যা অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়াতে খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ কার্য্যকুশলতা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না বরং অনেক স্থলেই শিথিলতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। কৃষি বিভাগ আবগারী বিভাগ, ও পুলিশ বিভাগে অর্থের অপব্যয়ের কথা শোনা যাইতেছে। মিউনিশন বোর্ড ও কোল কনট্রোলার আফিসের গলদের কথা—সকলেই বিদিত আছেন। উচ্চতম কর্ম্মচারীদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকিলে এরূপ ঘটনা কখনও ঘটিতে পারিত না। আমাদের বিশ্বাস কর্ম্মচারী সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে কর্ম্মক্ষেত্রে সুসম্বদ্ধ কর্ম্মের অভাব হইয়াছে এবং কর্ম্মচারীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবও নাই। কথায় বলে "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।" ব্যয় সংক্ষেপ কমিটি কর্ম্মচারী সংখ্যা হ্রাসের একটা উপায় করিতে পারিলে কাজের সুশৃঙ্খলা হয়, অর্থেরও অনাটন কমিয়া আসে। কমিটির সভ্যগণ এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন কি?

বেতাল।

ম্যাট্রিকুলেশন ও বাংলাভাষা

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই নিয়ম পাশ হইয়াছে যে অতঃপর মেট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দান ও পরীক্ষা গ্রহণ জাতীয় ভাষাতে হইবে। ইহা একটী শুভ সংবাদ। বাল্যকালে সমস্ত বিষয় বিদেশী ভাষায় শিখিতে হইলে সময় অনেক বেশী লাগে পরিশ্রমও অনেক বেশী করিতে হয়। বালকেরা অনেক সময় না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া যায় তাহাতে অনর্থক তাহাদের মন ভারাক্রান্ত হয়। জাতীয় ভাষায় হইলে এইরূপ নানা অসুবিধা ও কষ্ট হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং অনেক কঠিন বিষয় সহজে শিখিতে পারে।

এ বিষয় নিয়াও মতদ্বৈধ হয় তর্ক-বিতর্ক হয় আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক বিশ্ব-বিদ্যালয় এ কাজটী করিয়া দেশের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন ইহাতে ইংরাজী শিক্ষার অসুবিধা হইবে। কিন্তু তাহা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। আর একটী অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষা (Compulsary second language) রূপে যে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইবে তাহা বর্ত্তমান আদর্শ (standard) হইতে আরো একটু উচ্চ হইলেই ভাল হয়, কেন না বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী ভাষার সাহায্য ভিন্ন জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে এত সহজে জ্ঞান আহরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সেই হিসাবে ইংরাজী ভাষায় আমাদের বিশেষ দক্ষতার আবশ্যক।

অসহযোগ আন্দোলনের ফল

মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশীবস্ত্র প্রচলন ও মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা বৃথা যায় নাই।

সম্প্রতি শুল্কবিভাগের কলেক্টর মিঃ লয়েড কলিকাতা বন্দরের সামুদ্রিক আমদানী রপ্তানীর যে বার্ষিক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি বলেন,—

"Several causes,—the increasel duty, the *picketing of liquor shops* by non-co-operaters and restrictions of credits granted to the Indian merchants by French export houses—have conspired to reduce the trade in brandy by more than half" * * * "contraction of demand is the treatment prescribed by economic law for high prices; and to this natural treatment was added in case of India the more drastic effect of the deliberate boycott of British peice goods which was placed in the forefront of the Gandhi Programme......Imports of hosiery has made a surprising decline from Rs. 109 lakhs to Rs. 20 lakhs......the woollen goods trade has suffered a disastrous collapse. The boycott preached by the non-co-operators, re-inforced as it is by the powerful argument of the purse has undoubtedly been effective.

অর্থাৎ তিনি বলেন যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ব্রাণ্ডি, সুতার কাপড় ও গরম কাপড়ের আমদানী যে অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বোম্বাই সহরের বার্ষিক বিবরণীতে ও অসহযোগ আন্দোলনের ফল স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের কৃষিবিভাগের বার্ষিক পাট চাষের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে পাট চাষ অনেক পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে ও তৎপরিবর্ত্তে ধানের চাষ বহুল পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশীয় কৃষি ও বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য অসহযোগীদের এই চেষ্টা সকলেরই সমর্থন করা উচিত।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কণ্ঠরোধ

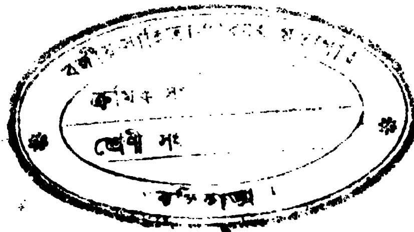
রাজনৈতিক প্রয়োজনে ১৪৪ ধারার যথেচ্ছ প্রয়োগ আইন সঙ্গত কি না তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবিগণ অনেক দিন হইতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। মাদ্রাজ ও পঞ্জাবের উকীলসভা ইতিপূর্ব্বে এরূপ যথেচ্ছ প্রয়োগের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মহীশূরের উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সার লেস্‌লি মিলার (Sir Leslie Miller, মাদ্রাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ) বাঙ্গালোর সহরে ১৪৪ ধারার প্রয়োগ সম্বন্ধে আপীলের বিচারে রায় দিবার সময় ইহা বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে গোলযোগ হইবার আশঙ্কাই ১৪৪ ধারা প্রয়োগের পক্ষে যথেষ্ট নহে। গোলযোগের আশু সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হইলে আইনের ঐরূপ প্রয়োগ অসিদ্ধ।" অথচ ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ১৪৪ ধারার প্রয়োগ সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। এমন কি শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্যের ন্যায় ধীর স্থির ও সংযতমনা ব্যক্তির প্রতিও এই ধারা প্রয়োগ করা হইয়াছে। মালব্যজী এতদিন পর্য্যন্ত সাহচর্য্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন ও অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত ব্যবস্থাপক সভার কাজ করিয়াছেন। তাঁহার উপরও এরূপ ব্যবহার হইলে গবর্ণমেন্টের প্রতি সাধারণের মনের ভাব কিরূপ হইতে পারে তাহা চিন্তার বিষয়।

মর্ম্মোক্তি

কোথা সে সাধনা, সেই সত্য অনুভূতি
যার বলে যার ফলে সত্য হবে বাণী,
যে কথা ফুটিবে মুখে আনিবে সে টানি
অন্তরের উপলব্ধি। অনল বৈদ্যুতি
বিদরি অম্বর তল মর্ম্মবাণী তার
উচ্ছ্বাসিত করে যথা, প্রাণের আগুন
আমারে শতধা করি করিবে প্রচার

কবে মোর মর্ম্মকথা? চাতুরী নিপুন
বচনের ঊর্ণজাল করিয়া বয়ন
কীটপতঙ্গের পাল চাহিনা বাঁধিতে,
জীবনের সুখদুঃখ করিয়া মন্থন
চাহি চিত্ত-অগ্নিগিরি উৎসারিয়া দিতে।
সত্য-অভিজ্ঞতা ভরা প্রাণের নির্য্যাসে
লিখে যাব জীবনের সত্য-ইতিহাসে।

শ্রী সুরেশ্বর শর্ম্মা।



নব্যভারত

চত্বারিংশ খণ্ড] ভাদ্র, ১৩২৯ [৫ম সংখ্যা

বেদান্তে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও পুরুষকার

ভারতবর্ষের বেদান্ত-গ্রন্থে দুইটী বাক্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। "সোঽহং ব্রহ্ম" এবং "তৎত্বমসি"—এই দুইটী বাক্য বলিয়া দিতেছে যে, প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মা,—ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নহে। জীবে ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। কিন্তু কথা এই যে, জীব যদি ব্রহ্মই হয়, তাহা হইলে জীবের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা কথার কথা মাত্র হইয়া উঠে। মানবাত্মাকে ব্রহ্ম যে ভাবে চালাইতেছেন, যে পথে ও যে কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছেন, মানব, যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকাবৎ, সেই কার্য্যে ও সেই পথে চালিত হইতেছে। যদি তাহাই হইল, তবে আর মনুষ্যকে পাপ-পুণ্যের জন্য দায়ী করা চলিল না। কেন না, কোন কর্ম্মেই ত তবে তাহার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব থাকিতেছে না। ঈশ্বর যাহা করিতেছেন, জীব তাহাই করিতেছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বেদান্ত এইরূপে মানবাত্মার স্বাধীন কর্ত্তৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। বেদান্তের এই প্রকার উপদেশের ফলেই ভারতবর্ষে—"ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন, যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—প্রভৃতি আলস্য পরিপোষক ও কর্ম্মোদ্যমবিলোপকারী শ্লোক প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে;—অনেকের মুখে এই প্রকার অভিযোগও শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা এই প্রবন্ধে, মানবাত্মার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে বেদান্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত কিরূপ সেই বিষয়টী আলোচনা করিব। সঙ্গে সঙ্গে, ধর্ম্মজীবন গঠনে ও আত্মার উৎকর্ষতা সাধনে, মানুষের 'পুরুষকারের' আবশ্যকতা আছে কি না, তাহাও আলোচনা করিব। প্রকৃত আলোচনার অভাবে, বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক অপসিদ্ধান্ত দেশ ও বিদেশে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের মানুষ কর্ম্মোদ্যমশূন্য, অদৃষ্টবাদী 'জড় ভরত' হইয়া পড়িবার হেতু বেদান্ত দর্শনের ঐ সকল উপদেশ,—একথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু বেদান্তের উপরে এই যে অভিযোগ আনীত হইয়া থাকে, ইহার মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক। এই প্রবন্ধে, আমরা সেই বিচার করিতেই চেষ্টা করিব। প্রকৃতই কি বেদান্ত, মানবাত্মার কর্ত্তৃত্ব ও পুরুষকারের কোন প্রতিকূল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন?

বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি তাবৎ প্রাণীই, যে যেমন স্বভাব বা প্রকৃতি

(Innate Nature or Character) লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে তদনুরূপ কর্ম্মে, সর্ব্বদাই নিযুক্ত রহিয়াছে। কর্ম্ম করাই জবের 'স্বভাব'।

গীতা বলিয়াছেন—"কোন জীবই ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। আপন আপন স্বভাব বা প্রকৃতির গুণানুসারে জীবগণ, অবশ হইয়া, কর্ম্ম করিয়া থাকে" *। "আপন প্রকৃতি বা স্বভাবের বশে, জীব, অন্ধভাবে, পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে" †।

বেদান্তে এই স্বভাব-সিদ্ধ জীব-প্রকৃতির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা, জীবমাত্রেই যে সতত ক্রিয়াশীল, ইহা প্রমাণিত হয়।

সমুদয় স্থাবর জঙ্গম—এক প্রাণশক্তিরই অভিব্যক্তি। অতি নিম্নস্তরের স্থাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল বস্তুতে, পরমাত্মা ক্রমোর্দ্ধভাবে, আপন স্বরূপের বিকাশ করিতেছেন—

"স্থাবরত্বাদারভ্য উপর্য্যুপরি আবিস্তরত্বমাত্মনঃ"

(ঐতঃভাঃ)।

যেখানে রসের সঞ্চালন আছে, সেইখানেই চেতনের অবস্থান বা সদ্ভাব অনুমান করিতে হইবে। স্থাবর পদার্থে সর্ব্বদা রসের সঞ্চালন পরিদৃষ্ট হয়, সুতরাং বৃক্ষাদির মধ্যেও গূঢ়-ভাবে চৈতন্য রহিয়াছে। কিন্তু জঙ্গম পদার্থেই প্রাণের ক্রিয়া সমধিক প্রকটিত। চক্ষুরাদি প্রাণক্রিয়া জঙ্গমেই অধিকতর বিকাশিত রহিয়াছে। "প্রাণ ও অন্ন—এই দুইয়ের বিভাগ সম্পাদনের নিমিত্ত, আত্ম-চৈতন্য—যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থে, ক্রমোর্দ্ধভাবে, জীব-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন" ‡।

মনুষ্য দেহেও প্রাণশক্তি, আপনাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া বিবিধ ক্রিয়া সম্পাদনের হেতু হইয়া রহিয়াছে §। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার মূলে, এবং দৈহিক সমুদায় ক্রিয়ার মূলে, প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তিই জীবের দেহ নির্ম্মাণ করিয়া তোলে। তন্মধ্যে, মনুষ্যদেহ, প্রাণশক্তির সহিত মন,বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের সংযোগ দৃষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানলাভের সাধন বা কারণ। ইহারাই বিষয়বর্গকে আত্মার নিকটে লইয়া যায়; তাই আমরা তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সমর্থ হই। যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের চেষ্টার মূলে—এই প্রাণশক্তি। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যে আপন আপন বিষয়ে ধাবিত হয়, প্রাণই তাহার হেতু। মনের যে বিষয়াকার স্পন্দন বা সুখ-দুঃখাদির আকারে স্পন্দন,—ইহারও মূলে প্রাণশক্তি। গাঢ় নিদ্রার সময়ে আমাদের মন, প্রাণশক্তির মধ্যেই বিলীন হইয়া অবস্থান করে। তখনও, কেবল প্রাণই দেহে ক্রিয়াশীল থাকে। জাগিয়া উঠা মাত্রই আবার, বিষয়েন্দ্রিয়-যোগে প্রবুদ্ধ হইয়া, মনের বিবিধ জ্ঞান ও ক্রিয়া, সেই প্রাণশক্তি হইতেই বহির্গত হয়। এই জন্যই

* গীতা, ৩।৫॥

† গীতা, ১৮।৫৮—৬০।

‡ "জগতঃ স্রষ্টা, নামরূপে ব্যাকুর্ব্বন্, স্থাবরজঙ্গমানি অন্নাত্তৃত্ববিভাগার্থং, তদেব প্রবিশ্য আবিরভবৎ আত্ম-প্রকাশনায়" (ঐতঃভাষ্য)॥

§ × × এবং প্রাণঃ পঞ্চবিধঃ সর্ব্বক্রিয়াহেতুঃ (ঐ ভাষ্য)।

"প্রাণবন্ধনং সোম্য ! মনঃ"—বলা হইয়াছে। মন ও বুদ্ধি—প্রাণেতেই বাঁধা আছে। তাবৎ ইন্দ্রিয়-চেষ্টার মূলে, মনের তাবৎ স্পন্দনের মূলে, এই প্রাণশক্তিই ক্রিয়াশীল †। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে "পঞ্চপ্রকার ক্রিয়া সমন্বিত 'প্রাণশক্তি' যখন মন ও বুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে "প্রজ্ঞাত্মা" শব্দে (জীব শব্দে) নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।" শঙ্করাচার্য্যও, 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে,—

"যোয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি স্ফুরত্যয়ং জ্যোতিঃ"।

—অর্থাৎ, আমাদের বুদ্ধিই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সাধন; এবং এই বুদ্ধি প্রাণশক্তিতে নিবদ্ধ রহিয়াই, স্বক্রিয়া সম্পাদন করে।

ইহাই আমাদের জৈব 'প্রকৃতি' বা 'স্বভাব'। বেদান্তে একথা অন্যপ্রকারেও পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দেহ বা স্থূল "অন্নময় কোষের" অভ্যন্তরে, 'বিজ্ঞানময়' কোষ ও 'প্রাণময়' কোষ অবস্থিত আছে *। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাণ ও বুদ্ধি লইয়াই প্রধানতঃ জীব-প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে। প্রাণে নিবদ্ধ রহিয়াই বুদ্ধি,—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যোগে বহির্ম্মুখ হইয়া, শব্দ-স্পর্শাদি বিবিধ বাহ্য বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে এবং বিবিধ কর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে বহির্ম্মুখ হইয়া, সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে †।

জীবের 'প্রকৃতি' কাহাকে বলে, তাহা দেখা হইল। এই প্রকৃতি বা স্বভাব দ্বারা চালিত হইয়াই আমরা সমুদায় ক্রিয়া করিয়া থাকি। এখন আমরা এই ক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব।

জন্ম হইতেই আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গ, বিষয়-তৃষ্ণা বিশিষ্ট। অনুকূল বা সুখকর বিষয়ের উপরে 'রাগ' বা তৃষ্ণা এবং প্রতিকূল বা দুঃখকর বিষয়ের উপরে 'বিরাগ' বা দ্বেষ—এই প্রকার রাগ দ্বেষ লইয়াই ইন্দ্রিয়বর্গ জন্মিয়াছে।

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ" (গীঃ) অতএব বাহ্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত হওয়াই ইন্দ্রিয়বর্গের "স্বাভাবিক" নিয়ম।

প্রকৃতপক্ষে আত্মা স্বতন্ত্র, আমরা এই কথাটা একেবারে ভুলিয়া যাই। আত্মা যে স্বতন্ত্র থাকিয়াই, সকল প্রবৃত্তির চালক ও প্রেরক, এই তত্ত্ব আমরা একেবারে বিস্মৃত হই এবং প্রাণ ও বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার সঙ্গে আত্মার এই স্বাতন্ত্র্যকে আমরা মিশাইয়া ফেলি। এবং এই ক্রিয়াগুলির সঙ্গে আমরা আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া ফেলি। এই প্রকারে, ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়বর্গে 'অহঙ্কার'-স্থাপনই সকল প্রবৃত্তির মূল হইয়া উঠে। শঙ্করাচার্য্য, ইহাকে "অধ্যাস" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহাকে "চিত্তগ্রন্থি" শব্দ দ্বারা ও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"অহং মমেত্যেব সদাভিমানং, দেহেন্দ্রিয়াদৌ কুরুতে গৃহাদৌ"।
শ্রোত্রাদৌ হি আত্মভাবং কৃত্বা...জায়তে, ম্রিয়তে।
যে শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবং পরিত্যজন্তি ত এব ধীরাঃ" (কঠ ভাষ্য)।

† "প্রাণঃ পঞ্চকরণবৃত্তিঃ. মনোবুদ্ধিযুক্তঃ প্রজ্ঞাত্মা ; বিজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিদ্বয়-সংমূর্চ্ছিতাত্মা"। "প্রাণতন্ত্রত্বাৎ চিত্তব্যাপাররূপত্বাৎ, প্রাণহেতুস্তদুচ্যতে" (ঐ০ ভাষ্য)।

* 'এবমস্মিন্ মুখ্যে প্রাণে চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাগিন্দ্রিয়াণি শরীরমিতি—সর্ব্বং প্রাণেনৈব ক্রিয়তে'।

† [illegible]বিকং প্রাগের অনাত্মবর্শনং ...ভোগেষু তৃষ্ণা,...বিষয়া ন [illegible] (কঠ ১)

মনুষ্যের স্বভাবই এই প্রকার। আমরা যে প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছি, সেই প্রকৃতি এইরূপেই ক্রিয়া করিয়া থাকে। এপ্রকার ক্রিয়ায় জীবের কোনই "স্বাধীনতা" দৃষ্ট হয় না। যাহা ইন্দ্রিয়বর্গের অনুকূল, যাহা মনের প্রীতিকর, তাহার উপরেই মনের তৃষ্ণা জাগিয়া উঠে। এই তৃষ্ণাই সকল প্রবৃত্তির প্রেরক। বিষয়বর্গের গুণাদি চিন্তায়, মন ব্যাপৃত হইলে, তৎপ্রাপ্তির সংকল্প জাগিয়া উঠে। এই সংকল্প হইতে কামনার উদয় হয়। এই কামনাই পুরুষকে বিষয়-লাভে প্রবৃত্ত করে। তৎপর, পুরুষ, কর্ম্ম করিয়া থাকে। ক্রিয়ার ইহাই নিয়ম। ইহাতে পুরুষের স্বাধীনতা নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই। যেমন যেমন তৃষ্ণা, প্রবৃত্তি প্রভৃতির শৃঙ্খল উপস্থিত হইবে, তেমন তেমন উহারা চিত্তকে বিষয়ের দিকে, অবশ-ভাবে, টানিয়া লইয়া যাইবে।

"বিষয়েষ্বাবিশৎ চেতঃ, সংকল্পয়তি তদ্‌গুণান্।
সম্যক্ সংকল্পনাৎ কামঃ, কামাৎ পুংসঃ প্রবর্ত্তনম্"।

এই প্রকারে, একটীর পর একটী, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলায় নিয়মিত হইয়া মনুষ্য চালিত হয় এবং বিবিধ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। সর্ব্বপ্রথমে, আত্মার স্বতন্ত্রতা ভুলিয়া, দেহাদিতে আত্মবোধ; তৎপরে ঐ দেহাদির গুণচিন্তা; এই চিন্তা বা সংকল্প হইতে কামনার উদয়; এই কামনা হইতে প্রবৃত্তি; এই প্রবৃত্তি চালিত হইয়া বিষয়-ভোগার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান। এই ভাবেই আমরা ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। এখানে 'স্বাধীনতা' কোথায়?

আমাদের বুদ্ধি, এইরূপে বিষয়-তৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া, বিষয়েচ্ছা করিয়া থাকে। এই ইচ্ছাই কর্ম্মের মূল। এই ইচ্ছাই, কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলিকে বিষয়ের দিকে চালিত করে। এই প্রকারে বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া, 'প্রাণময়' কোষ চেষ্টিত হয়। এ স্থলে, রাগ, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুখদুঃখাদি—একটী অন্যটীর দ্বারা, পর পর নিয়মিত, শাসিত হইয়া থাকে। এই শৃঙ্খলায়, জীবের 'স্বাধীনতা' কোথায়?

আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত মলিন; উহা রজঃ ও তমঃ দ্বারা সর্ব্বদা সমাচ্ছন্ন। বেদান্তে বুদ্ধির একটী সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; তাহার নাম "সত্ত্ব"। আমাদের এই সত্ত্বটী রজঃ ও তমের মলিনতা দ্বারা গাঢ় আচ্ছাদিত। এই জন্যই আমাদের সত্ত্ব বস্তুটী, বিষয়েচ্ছা দ্বারা কলুষিত, ক্ষুদ্র স্বার্থসুখের লালসায় সর্ব্বদা পরিচালিত। মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রকৃতির অবস্থাই এই প্রকার। এই কলুষিত জীব-প্রকৃতির একটী সুন্দর বর্ণনা গীতাকার নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাকে "আসুরী" প্রকৃতি বলা হইয়াছে। আমরা এস্থলে ঐ বর্ণনাটীর সারাংশ দিতেছি—

'সংসারে আবদ্ধ জীবের নিকটে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, আত্মার স্বাধীনতা, আত্মার কর্ত্তৃত্ব অলীক বস্তু। এ জগতের কোন মূল কারণ নাই। (কেন না, Empirical stand point হইতে জড় প্রকৃতিতে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না)। আত্মা যে অবিনশ্বর, ইহা মোহান্ধ জীব বুঝিতে পারে না। ইহাদের প্রত্যেক কার্য্য রাগ দ্বেষ চালিত। ইন্দ্রিয়-সুখের লালসা, ইহাদিগকে ক্ষুদ্র বিষয়-ভোগে লিপ্ত করে। ইহারা কামনার দাস। এ কামনার পূরণ করা অসম্ভব। দম্ভ, মান, মত্ততা সমন্বিত হইয়াই ইহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। শত শত আশা-পাশে আবদ্ধ হইয়া, কাম-ক্রোধের বশে, এই

সকল লোক, কামনার তৃপ্তি সাধনার্থে, পর-পীড়ন উৎপাদন করিয়া, অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। 'আমি ব্যতীত আর কে আছে, আমার ন্যায়, ধনী, মানী, বিদ্বান্ অপর কেহ নাই'—এই প্রকারে, অহঙ্কার, বল, দর্প, কামক্রোধাদির আশ্রিত থাকিয়া, ইহারা পরের হিংসা ও অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে'—ইত্যাদি।

জীবের স্বাভাবিক প্রকৃতি সম্বন্ধে বেদান্তের সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল। এখন আমরা বিচার করিয়া দেখিব যে, বেদান্ত এস্থলে মানবাত্মার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব ও পুরুষকারের স্থান রাখিয়াছেন কি না। বিষয়টী বড় গুরুতর। অনেকের ধারণা এই যে, জীবাত্মার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে বেদান্ত নীরব, শঙ্করাচার্য্য নীরব। এই ধারণা কতদূর সত্য, তাহারই আলোচনা আগামী বারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।*

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

শিক্ষা

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান পণ্ডিত রুডলফ অয়কেন (Rudolf Eucken *Main Currents of Modern Thought*) বলেন, যে শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত সীমায় আবদ্ধ রাখিয়া বর্দ্ধিত করিতে চায়, তাহা সন্তোষকর নহে। বংশানুক্রমে সামাজিক ও নৈসর্গিক অবস্থা নিচয় যে কেবল তাকে নানাপ্রকারে নিয়মিত করিতেছে তাহা নহে, কিন্তু ধরিতে গেলে সে এই সকল আবেষ্টনেরই ফল। ইহারা ব্যক্তিকে এমনভাবেই ঘিরিয়া রহিয়াছে, ধারে বা ভারে (cunning or force) কিছুতেই সে ইহাদের বন্ধন কাটিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং সন্ন্যাসী মনে করিতে পারেন, তিনি সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাহার ভ্রান্তি। এ সকলের শক্তি আত্মার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার কার্য্য চলিতেছে জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক। সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পূর্ব্বে ইহাদের প্রভাব হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার আশা নাই। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাটার মধ্যে ও ইহাদের কৃতকার্য্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে। শিক্ষা এ সকল নিয়মিত করিয়া আত্মাকে এমন গতি প্রদান করিবে যে সংসার হইতে বিরতির দুরাশায় মুসড়িয়া না গিয়া পূর্ণ সমাজজীবনের উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে। মানুষ যে সমস্ত শক্তির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে সেগুলিকে পূর্ণবিকাশের দিকে লইয়া যাওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য, নিগ্রহের দ্বারা মানুষকে পঙ্গু করা উদ্দেশ্য নহে। এতকাল যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহা যেন বাহির হইতে চাপ দেওয়ার একটা নিষ্পেষণ যন্ত্র, ভিতর হইতে ফুটাইয়া তুলিবার প্রেরণা নহে। সব এক ছাঁচে গড়ার চেষ্টা শিক্ষা নয়, অধিকাংশের পক্ষেই সেটা নিগ্রহ মাত্র। এই নিগ্রহ হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে হইবে। মানুষ যাহাতে সংসারের কাজে লাগে তার শক্তিকে সমাজের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারে, সেই শিক্ষা দিয়া তার আত্মাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। যখন শিক্ষা অল্প-সংখ্যক-

* The Calcutta Philosophical Society তে পঠিত ও আলোচিত প্রবন্ধের সারাংশ।

লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তখন শিক্ষা দ্বারা মানুষের পণ্ডিত বা ভদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকা চলে। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা ডিমক্র্যাটিক। আজ আর শিক্ষিতকে সমাজের শোভা বর্দ্ধন করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সমাজ সেবার উপযোগী শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে টিঁকিয়া থাকিয়া যাহাতে পরিণামে সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারা যায়, সেই দিকে নজর রাখিয়া শিক্ষার্থীকে অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষাপদ্ধতি এমন হইবে যাহাতে শিক্ষার্থী বিদ্যার্থী হন, পাকচক্রে পুলীশ বাঁচাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করতঃ দুমুঠা খাইতে পাইয়া কোন রকমে দিন গুজ্রানোটাই জীবনের সিদ্ধির মাপকাঠি হইয়া না উঠে। সেই উদ্দেশ্যে দেহ মন আত্মা যাহাতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে সর্ব্বাদৌ সেই দিকে নজর দিতে হইবে। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্ মনে রাখিয়া শরীর পোষণে মনোযোগ দেওয়া চাই। শরীর সুস্থ না থাকিলে সকল বিদ্যাই বৃথা। শিক্ষার দ্বারা আমাকে সমাজের সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে—এইটী মনে রাখিলে শারীরিক সুস্থতা যে কত প্রয়োজন তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমার যাহা কিছু শক্তি সামর্থ্য তাহা যতই কেন অকিঞ্চিৎকর হউক না, সমাজের হিতার্থে খাটাইতে আমি বাধ্য, ইহাই আমার ঋণ, ইহা মনে রাখিয়াই আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমি যতই ক্ষুদ্র হই না কেন, এই বিরাট্ বিশ্বমানব দেহের আমি অঙ্গ, আমার পুষ্টিতে এই বিরাটের পুষ্টি, আমার নাশে এই বিরাটের অঙ্গহানি। নিজের দিকে এই ভাবে দৃষ্টি করিলে ক্ষুদ্র বুদ্ধি তিরোহিত হইবে, শক্তি জাগিবে; সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বোধও জাগ্রত হইবে। কেবল ব্যক্তিত্ব লইয়া পড়িয়া থাকিবার বা ব্যক্তিগত মুক্তির লোভে সকল ছাড়িয়া জঙ্গলে পালাইবার বাসনা প্রবল হইবে না। আমার একার জন্য আমি নই। একটী জীবও অমুক্ত থাকিলে আমার নিজের মুক্তির প্রয়াস একটা দুর্নীতি মাত্র বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ যে এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, উহাকে একটা প্রত্যক্ষ সামাজিক সত্যে পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদিগের স্বার্থপর হইবার অবসর নাই। আমি আমার গৃহখানিই কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহাতে নিরাময়ে বাস করিতে সমর্থ নই, যদি আমার পার্শ্ববর্ত্তীদিগের গৃহও তদ্রূপ না হয়। তাহাদিগের অপরিচ্ছন্নতা হইতে উৎপন্ন রোগ আমার গৃহে সংক্রামিত হইবেই। সুতরাং প্রতিবেশীর গৃহ পরিষ্কার করিবার জন্যও আমাকেই উদ্যোগী হইতে হইবে। ব্রাহ্মণ একদিন আর সকলকে শূদ্র বানাইয়া নিজের উচ্চতা বজায় রাখিতে গিয়াছিলেন। শূদ্র বেষ্টিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা পাইল না। আজ ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে সীমা রেখাটা যে কোন্ খানে তাহা অতি তীক্ষ্ণ অনুবীক্ষণও বাহির করিতে অসমর্থ। ব্রাহ্মণ যদি সকলকেই ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেন তবে তিনিও ব্রাহ্মণত্বে আরও উন্নীত হইতেন; অধঃপতন হইত না। সকলের সঙ্গে আমার জীবন মরণ বাঁধা—শিক্ষার ব্যবস্থায় এইটিকেই মূল সূত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষা কখন আরম্ভ হইবে তাহা লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদ্ স্বীকার করেন, মানুষের স্মৃতি তাহার নিজের

জন্মবিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে সমর্থ। সুতরাং জন্মকালেই মানুষ অন্ততঃ কিছু সংগ্রহ করিয়া লইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হয়, সে নিতান্ত শূন্যস্থালী রূপে আসে না। কাজেই তাহাকে কিছু দিতে গেলে, তাহার যাহা আছে তার সঙ্গে ঠোকাঠুকি না লাগে সেজন্য বেশ হুঁসিয়ার হইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহা একেবারে আদি হইতেই। সুতরাং মানব মনের গতিবিধি বিষয়ে যিনি অনভিজ্ঞ তাঁর হাতে শিক্ষার ভার দিলে যে অনর্থ ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার, অনর্থ যে আঁশে পাশে চারিদিকেই ঘটিতেছে তাহা ত প্রত্যক্ষ। মানুষ যাহা লইয়া আসে তাহা তাহাকে অজ্ঞাতসারে পরিচালিত করে। এমন কি, সে যাহা শিক্ষা করে তাহারও অধিকাংশ ঐ অজ্ঞাত রাজ্যেই অবস্থিতি করে এবং অভ্যাসাদিরূপে অনেক সময়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাহাকে চালায়। এক অর্থে ইহাই তাহার ব্যক্তিত্ব। মানুষ অন্যদিকে আবার সামাজিক জীব। সুতরাং সামাজিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে তার মানসিক ক্ষেত্রে একটা সংগ্রামের সম্ভাবনা রহিয়াছে। তার ব্যক্তিত্ব তাকে একদিক দিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়, সমাজ যদি অন্যদিকে টানে তাহা হইলে ধস্তাধস্তি অনিবার্য্য। এইখানেই শিক্ষার সমস্যা। নিগ্রহের দ্বারা ব্যক্তিত্বকে কোণঠাসা করিয়া সমাজ আপনার সুবিধামত মানুষ গড়িবে না ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত শক্তির মুখ পরিবর্তন করিয়া দিয়া সামাজিক হিতের জন্যই তাহাকে বাহিরেই টানিয়া আনিবে! ব্যক্তিত্বের শক্তি যে দিকে যাইতে চাহিয়াছিল সেদিকে গেল না বটে, কিন্তু অন্যদিকে রাস্তা পাইয়া সে আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিল। কু-শিক্ষা প্রণালীর দোষে কুশিক্ষকের হাতে পড়িয়া যে শক্তি সুমহৎ সামাজিক মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ তাহাই নিগৃহীত হইয়া উৎকট ব্যাধিরূপে মানব অন্তরে বিরাজ করে; যাহা হইতে মানব সমাজের মহা অনর্থ সকল উৎপাদিত হয়। ধর্ম্ম জগতে যাহা এক সময়ে ভ্রান্ত মানুষের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল এবং এই প্রশংসার ফলে যাহা স্থায়ী আকার ধারণ করিয়াছে সেই ধর্ম্মান্ধতাজনিত পরপীড়ন ও আত্মনিগ্রহ মধ্য যুগীয় বিকৃত ধর্ম্মভাবের যে জের সামলাইতে আমাদিগকে এখনও হিমসিম খাইতে হইতেছে তাহা কুশিক্ষায় আত্মার নির্য্যাতিত শক্তিরই বিপথে বহিপ্রকাশ মাত্র।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, অভিজ্ঞতার হাতে মানুষকে শিক্ষিত হইবার জন্য ছাড়িয়া দাও, কার্য্যক্ষেত্রের উঠা নামার মধ্য দিয়া সে গড়িয়া উঠিবে। সে কথা সত্য, কিন্তু সবটা তো সে তার ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে পাইতে পারে না। দশজনের সঙ্গে বিদ্যালয়ে তাকে কতকগুলি জিনিষ আগে পাইতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জন শিক্ষা প্রণালী, বিশেষতঃ অতীতের অর্জ্জিত জ্ঞান ভাণ্ডারের সঙ্গে তাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকটেই পরিচিত হইতে হইবে। নতুবা সভ্য সমাজে জন্মগ্রহণ জনিত যে তার একটা বিশেষ অধিকার তাহার ফল হইতে সে বঞ্চিত হইবে। বিশেষতঃ, জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার জাতির আত্মার বহিঃপ্রকাশ, জাতীয় জীবনস্রোতের উৎস। যে শিক্ষা ব্যক্তিকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া না দেয়, জাতীয় জীবনকে ব্যক্তির মধ্যে পুনর্জ্জন্ম না দেয় সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। অন্যদিকে আবার সাহায্য নিরপেক্ষ কার্য্যক্ষেত্রকে সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষা মনে করিবারও হেতু নাই। কার্য্য-

ক্ষেত্রের নানা অবস্থার সংঘর্ষ ও সমাবেশ হইতে সর্ব্বদা ভ্রান্তিকে পরিহার করিয়া সত্য সংগ্রহের সম্ভাবনা যে খুব বেশী তাহা মনে হয় না। ক্রমাগত ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিবার জন্ম মানুষকে সংসারক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেওয়াও শিক্ষার সুব্যবস্থা নহে। ইহাতে বহুসময় বৃথা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শিশুমনের ক্রমবিকাশের অনুসরণ করিয়াই শিক্ষাপদ্ধতি গড়িতে হইবে। শিক্ষা বিষয়ক বুদ্ধিবিবেচনার অভাবে যে প্রণালীটা আমরা সংগ্রহ করিব শিশুর নিকট হইতে তাহা না করিয়া তাহার ঘাড়ে একটা বাহিরের বোঝা চাপাইয়া দেই। তার মনের গতি ও প্রবণতা নির্দ্ধারণ না করিয়া কতকগুলি ধরাবাঁধা গৎ পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া তাহাকে দিয়া মুখস্থ করাইয়া লইলে যে শিক্ষা হয় তাহার ফলভোগ আরও বহুদিন চলিবে। বিবর্ত্তনের ক্রমকে অনুসরণ না করিয়া যে শিক্ষা, তাহা দেহের মাপে জামা না কাটিয়া জাঁতা দিয়া দেহকে জামার মধ্যে ভরিয়া দেওয়া। কেবল শিশু-শিক্ষার মধ্যে কিণ্ডারগার্টেন-প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা কোন কোন স্থানে হইয়াছে। কিন্তু শিশু তো চির দিন শিশুই থাকিবে না এবং শিশুত্বেই জীবনলীলা শেষ হইবে না। সুতরাং তার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী শিক্ষার এক মাত্র বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী এই "কিণ্ডারগার্টেন" সর্ব্বাবস্থাতেই প্রয়োগ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের অনুবর্ত্তন করিয়া ক্রম বিকাশের বিশেষ বিশেষ স্তরে ক্ষেত্র বিশেষের নিজেরই মধ্য হইতে বিকাশ ও বিবর্দ্ধনের যে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে তাহারই নির্দ্দেশে আত্মচেষ্টার পথে আত্মবিকাশ ("Seek through self-activity to lead him to self-knowledge" Froebel) অপর পক্ষে অন্তর্নিহিত যে পাথরে আত্মবিকাশের স্রোত আট্‌কাইয়া গিয়াছে সেই মানসিক ব্যাধিরূপ পাথর (Neurosis) যাহা মনের অন্তরাল হইতে বাধা প্রদান করে তাহা না সরাইয়া শিক্ষক যতই সদুপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করুন না কেন, সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী

জাপানের পত্র

আজ পাঁচ সপ্তাহ ধরে জাপানের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কোবে, ও সাকা ও কিওটো সহর গুলিতে আড্ডা গেড়ে বসে, ভিন্ন ভিন্ন যায়গায় যা দেখিবার আছে তা' দেখে, আবার ঐ সহর গুলির একটীতে বা অপরটীতে ফিরে যাচ্ছি। পরশু দিন কিওটো ফিরে যাব। তার পরে তিন সপ্তাহ জাপানের উত্তর পূর্ব্বাংশের কিছুটা দেখে সানফ্রান্সিস্কো রওনা হব। আজ আমি মিয়াজু বন্দরে। এটী জাপানের উত্তর উপকূলের ছোট একটী বন্দর। এখানে জাপানীরা প্রকৃতির শোভা সম্ভোগ করিতে আসে। মিয়াজু বন্দর হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে "আমানো হাশিদাতে" জাপানের একটী

একটী প্রসিদ্ধ সুদৃশ্য উপবন। 'হাশিদাতে' দেখিবার জন্য আমি মিয়াজুতে আসিয়াছি। আমি যে ঘরে বসিয়া আছি তাহার সম্মুখে তিন চারি মাইল বিস্তৃত জাপান সাগরের একটী ছোট কোণ। যে দিকে তাকাই পাহাড়ের সারি। জাপান সাগরের এই কোণটী একটী হ্রদের মত মনে হয়। মনে হয় যেন চারি দিকের আঁকা বাঁকা পাহাড়ের মধ্যে একটী হ্রদ। অথচ দিন রাত সমুদ্রের লোণা জল অতি মৃদু মন্দ গতিতে পাহাড়ের পায়ের উপর বালুকাময় অতি সঙ্কীর্ণ উপকূলে ঢেউ তুলিতেছে ও ফেলিতেছে। চব্বিশ ঘণ্টা শ্‌ শপ্‌! শ্‌ শপ্‌!! ঢেউয়ের ও বালির শব্দ শুনিতে পাইতেছি। 'হাশিদাতে' উপবনটী বালির চর, দৈর্ঘ্যে দুই মাইল। প্রস্থে কোথায়ও একশত গজ, কোথায়ও বা পাঁচশত গজ, কোথায়ও বা আধ মাইল। পাইন গাছের সারি এলো মেলো চলিয়াছে। তার নীচে দুই মাইল লম্বা রাস্তা ও যায়গায় যায়গায় বসিবার বন্দোবস্ত। উপবনটীর দুই ধারেই সমুদ্রের জল ও সঙ্কীর্ণ উপকূলের বালুকা। কোথায়ও বা জলের পাশে বড় বড় ঘাস। দুই পাশেই জাপান সাগরের ছোট আঁচলটী পাতা। তাতে বড় ঢেউ আসিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ পাহাড় গুলি প্রহরীর মত ছোট উপবনটীকে যত্নে রক্ষা করিতেছে। আর উপবনটী এক পাহাড়ের গা হইতে রওনা হইয়া আর এক পাহাড়ের গা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। পাহাড়ের উপর চড়িয়া সকলে 'হাশিদাতে' উপবনের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করে।

মার্চ্চ মাসের ১৫ই আন্দাজ জাপানে বসন্ত ঋতু সুরু হইয়াছে, জুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত চলিবে। আমি ১১ই এপ্রিল কোবে বন্দরে পৌঁছিয়াই জাপানের প্রসিদ্ধ সাকুরা ফুল দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। অথচ সেদিন বৃষ্টি, রাস্তায় কাদা, তাতে তাপমান যন্ত্রে পারদ ৪৫° পর্য্যন্ত নামিয়াছে। আমি কলিকাতার ভেতো বাঙ্গালী। শীতে ঘরে বসিয়া থাকিতেও আমার কষ্ট হইতেছিল। হোটেলের দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে হোটেলের পাশে এক গরিব জাপানীর বাড়ীতে একটী ছোট গাছ, তার ডালে একটীও পাতা নাই। বিলাতে শীতকালে গাছগুলি যেমন একেবারে নেড়া হয়, ঐ গাছটীও তেমনি নেড়া একটীও পাতা তার ডালে ছিল না। কিন্তু ঈষৎ গোলাপী আভায় আলোকিত একরকম ফুলের গুচ্ছ ঐ গাছের নেড়া ডালে দেখিতে পাইলাম। সে কি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য! হোটেলের চাকরটীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে ঐ জাপানী সাকুরা। এত শীতে এমন ফুল। পরদিন হোটেল হইতে আধ মাইল দূরে পাহাড়ের গায় সুয়েয়ামা উপবনে গেলাম দুপুর বেলা সেখান থেকে নীচের কোবে সহর ও বন্দর দেখিতেছিলাম। জাপানী জন কয়েকও সে সময়ে পাহাড়ের উপরে সেই উপবনে বেড়াইতে আসিয়াছিল। একজন জাপানীর সহিত ইংরাজীতে কথা বলিতে চেষ্টা করিলাম। সে বলিল যে সে অতি সামান্য ইংরাজী জানে। তাহার ছোট ছেলেটীকে কোলে তুলিয়া আমার নিকট ধরিয়া তাহাকে বলিল "এই তোমার ভারতবাসী খুড়ো মশায়।" কিছুক্ষণ পরে সে বলিল যে "Higher commerical School এর একটী ছাত্র এই উপবনে বেড়াইতে আসিয়াছে। সে নিশ্চয়ই ইংরাজী জানে। চল তাহার সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিই।" সে ছাত্রটীর সহিত ঐ জাপানীর ও পরিচয় ছিল না। জাপানের সব ছাত্রেরা তাহাদের শিক্ষালয়ের বিশেষ চিহ্ন যুক্ত টুপি মাথায় দেয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক রকম টুপি, প্রাথমিক শিক্ষালয়ের আর এক রকম টুপি, চিকিৎসা শিক্ষালয়ের আর এক রকম টুপি। টুপিতে শিক্ষালয়ের বিশেষ চিহ্ন লাগান থাকে। সেই চিহ্ন দেখে। ঐ জাপানটী বুঝিতে পারিয়াছে যে ঐ যুবক কোবেষ Higher commeical School এর ছাত্র। তিন জনের কেহ কাহাকেও চিনিতেন না। ইংরাজী ভদ্রতার রীতি অনুসারে যে যার পরিচয় দিয়া আলাপ করিয়া নিলাম। কন্যার বিবাহের প্রস্তাবে সে সম্ভার উঠিবার সম্ভাবনাই ছিল না। আর কে কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখে ও কি ধরণে চেক্ সহি করে তাহাও কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। সুতরাং অপরিচিত লোকের সহিত হঠাৎ রাস্তায় বেড়াইবার সময় পরিচয় হওয়াতে তিন জনের কাহারও আকস্মিক ঘোর বিপদের সম্ভাবনা রহিল না। ছাত্রটী আমাকে বলিল যে এই সাকুরার সময়, সাকুরা দেখিতে চাও ত আজই সুমা-দেরা বেড়াইতে যাইও। কোবে হইতে পাঁচ মাইল দূর সুমা-দেরা, রেলগাড়ীতে যাওয়া যায়, ট্রামগাড়ীতেও যাওয়া যায়। কিছুক্ষণ গল্প করিয়া সুয়েরামা উপবন হইতে নামিয়া আসিলাম। সেই ছাত্রটী আমাকে কোবের সানোমিয়া ষ্টেশন দেখাইয়া দিল, কখন্ কখন্ সুমা-দেরা যাইবার ও তথা হইতে ফিরিবার গাড়ী আছে বলিয়া দিল। আমি যখন বলিলাম যে আমি এখনই সুমা-দেরা যাইতে চাই, তখন সে টিকিট কিনিয়া দিয়া বাকী পয়সা আমাকে ফেরৎ দিয়া টুপি তুলিয়া "সায়োনারা" বলিয়া বিদায় হইল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এই জাপানী জাতি কেমন করিয়া আমাদিগের নিকট অসৎ প্রবঞ্চক বলিয়া দুর্নামগ্রস্ত হইয়াছে।

সুমা রেলওয়ে ষ্টেশন একেবারে সমুদ্রের ধারে। ষ্টেশন হইতে আধ মাইল পথ হাঁটিয়া নিকটের পাহাড়ের দিকে চলিলাম। দেখিলাম মেলা বসিয়াছে। দলে দলে পুরুষ মেয়ে সুমা-দেরা বেড়াইতে যাইতেছে। দুই পাশে ছোট দোকানের সারি; তাহাতে কাগজের ফুল, খেলনা, ছবি, খাবার, সাকের বোতল। মায়ের পিঠে ছোট শিশু কাপড়ে জড়ান ও সাবধানে বাঁধা; কাহারও বা ঘুমে মাথা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কোনও শিশু বা মোটা টুকটুকে গালের উপর দিয়া অনিমেষে দুই চক্ষু দিয়া বিস্ময়ে বসন্তের যেটুকু শোভা তাহার পক্ষে পড়িতেছে তাহাই একদৃষ্টে দেখিতেছে। বালক বালিকারা খড়ম পায়ে ছুটোছুটি তাহাদের বাপ মায়ের সঙ্গে চলিয়াছে। সকলের পোষাকে এত ভিন্ন ভিন্ন উজ্জ্বল রং যে আমার ওভারকোটটী যেন বড়ই বেমানান মনে হইতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া দেখি একদল জাপানী তক্তপোষের উপর বসিয়া সাকে নামক জাপানী মদ খাইতেছে ও দুইটী গেইশা কমিসেন বাজাইয়া গান করিতেছে। সে দলের জাপানী পুরুষেরা হাতে তালি দিয়া তাল দিতেছে কখনও বা নাচিতেছে। একটী ছোট সরোবরের চারি পাশে শতাধিক সাকুরার গাছ ও তাহাতে রাশি রাশি সাকুরা ফুটিয়া রহিয়াছে। পাতা খুব কম, নাই বলিলেও চলে। ডাল পালা আর ফুলের মেলা। যুবকগণ সরোবরের চারি ধারে Marathton Raceএ ছুটিয়াছে; পাঁচ বার কি সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া যে আগে আসিয়া পৌছিবে সেই দৌড়ে প্রথম হইবে। সরোবরে কয়েকটী নৌকায় কয়েকদল যুবক বাচ খেলিতেছে। আমি এক দোকানে গিয়া কফির ফরমাইস্ দিলাম। চায়ের দোকানের সুন্দরীগণ সকলকেই জাপানী ভাষায় ডাকিয়া,

বলিতেছে আসুন আজ্ঞা হউক্।" আমি যাই কফি খাইবার জন্য এক দোকানে ঢুকিলাম অমনি একে একে দুই তিনটী মেয়ে আসিয়া সুভদ্রভাবে শরীর নোওয়াইয়া জাপানী ভাষায় বলিল—"স্বাগত!" আমি ইংরেজীতে কফি চাওয়াতে ইংরাজীজানা পুরুষ একজন আমার নিকট আসিল ও সে মেয়েদের বলিয়া দিল আমি কি কি চাই। আমি পুরুষটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এটা কি কোনও পর্ব্বের সময়। এ যায়গাটা ত একটা বাগান, বৌদ্ধ মন্দিরের এক অংশে সাকুরা গাছ লাগাইয়া একটা বড় বাগান করা হইয়াছে। এত দোকান, এত লোক, এ মেলা কি কোনও পর্ব্ব উপলক্ষে? সে বলিল না, এখন সাকুরা ফুটিয়াছে বসন্তে এক মাস আন্দাজ লোক সকাল হইতে সুরু করিয়া রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত এখানে আসে। ফুল দেখে, সাকে খায় গান করে, নাচে। সাকুরাও ঝরিয়া পড়িয়া যাইবে, এখানকার আমোদও শেষ হইবে। দোকান পাট উঠিয়া যাইবে।" রাত্রিতে বিজলি বাতিতে সাকুরার আর এক রকম শোভা হয়। সেই ছাত্রটী আমাকে বলিয়াছিল, সে সেদিন রাত্রিতে সুমাদেরাতে যাইবে। সুমাদেরা দেখিয়া আমার দেশের কথা মনে হইতে লাগিল। আর মনে পড়িল, রবি বাবুর কবিতা—"হারে! নিরানন্দ দেশ!"

বসন্তে জাপানের যেখানে যাও, দেখিবে দলে দলে বালক বালিকা শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। জাপানের প্রাথমিক শিক্ষালয়ে বালক ও বালিকা উভয়েই ছাত্র। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন ক্লাস ছাড়া অপর সব ক্লাসে সাধারণতঃ বালকেরা এক ক্লাসে ও বালিকারা ভিন্ন ক্লাসে পড়ে। এই শিক্ষালয়ে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক। যেখানে যাই দেখিতেছি যে, প্রায় একশত কি কিছু কম বালক ও বালিকা দল বাঁধিয়া শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সারাদিন বেড়াইতেছে। হাশিদাতে দুই দিন দুই দল বালক ও বালিকা শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আসিয়াছে দেখিলাম। বালকেরা অনেক সময় বিউগল্ বাজাইয়া বাজনার তালে তালে পা ফেলিয়া সৈন্যদের মত চলে। বালিকারা কখনও কখনও সকলে সমস্বরে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে দেখিয়াছি। দুপুরবেলা যার যার দুপুর খাবার খাইতেছে। হয়ত বা চায়ের দোকানে ডিম বা দুধ কিনিয়া খাইতেছে। তার পরে, এক দল হয়ত কাণামাছি খেলিতে লাগিল, একদল হয়ত Leap Frog খেলিতে লাগিল। আবার বাড়ী ফিরিবার সময় হইলে শিক্ষকের পেছনে পেছনে সার বাঁধিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নোজামি আমাকে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখিবার সুযোগ দেন। তাহার কথা বলিয়াছি। কিন্তু মায়ের সহিত ছেলে মেয়ের সাহচর্য্য জাপানে যেমন দেখিতেছি আমাদের দেশে তেমন দেখি নাই। ত্রিশ বৎসরের মা প্রকাশ্য পার্কে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কাণামাছি খেলিতেছেন সন্ধ্যাবেলা, ওসকায় নাকানোসীমা বাগানে দেখিয়াছি। মা বেড়াইতে যাইতেছেন, পিঠে কচি শিশুটী বাঁধাই আছে। রেলগাড়ীতে, ট্রামগাড়ীতে প্রায়ই দেখিবে, মা শিশুকে স্তন্যদান করিতেছেন। ইহাতে মা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। তন্ময় হইয়া শিশুকে আদরের সহিত দুধ খাওয়াইতেছেন। গাড়ীতে বসিবার যায়গা নাই। শিশু ক্ষুধায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল। একজন পুরুষ অমনি উঠিয়া মাকে বসিবার যায়গা দিল। মা শিশুকে স্তন্যদান করিতে লাগিল। অবশ্য আজ কালকার পাশ্চাত্য

প্রথমে শিক্ষিতা জাপানী মায়েরা এরূপ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন তাহাও দুই একবার দেখিয়াছি। কিন্তু চৌদ্দআনা জাপানী মা ইহাতে সঙ্কোচের কিছু আছে বলিয়া মনে করেন না। সুতরাং সন্তান পালন ইহাদিগের নিকট বিরক্তির ব্যাপার নহে। মা যেখানে খুসী বেড়াইতে যান, শিশুত পিঠে বাঁধাই রহিল। হয় মায়ের, নয় দিদির, নয় দাদার পিঠে সে বাঁধা আছে। শিশুর যত্নের ত্রুটী হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তার পর শিশু বড় হইল হাঁটিতে শিখিল। সর্ব্বদাই মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে রহিয়াছে। মাও ঘরে আবদ্ধ নয় ছেলে মেয়েও নয়। একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন, সত্য সত্যই জাপানীর মত সুখের শৈশব পৃথিবীতে কমই দেখা যায়। আর জাপানী শিশুও বাস্তবিক সুশীল শিশু। মা বা বাপ শিশুকে শাসনের জন্য প্রহার করিতেছে, এরূপ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। হাশিদাতে উপবন উপরের পাহাড় হইতে দেখিবার জন্য সেদিন আমি কাসামাটসু গিয়াছিলাম। চায়ের দোকানে বসিয়া আপেল ও বিস্কুট খাইতেছি, এক দল চায়ের দোকান হইতে চলিয়া গেল। বিস্কুটের ছোট একটী টুকরা পড়িয়াছিল। চ-ওয়ালীর শিশুপুত্র সেই টুকরাটী হাতে করিয়া মুখে দিবার আয়োজন করিতেছে দেখিয়া মা আসিয়া শিশুর হাত হইতে তাহা কাড়িয়া ফেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড একটী বিস্কুট শিশুর হাতে তখনই দিল। বিস্কুটের দাম এক আনা। পাহাড়ে কাঠ কুড়াইতে মা ও মেয়ে বাহির হইয়াছে। ছোট নাতিটী সঙ্গে সঙ্গে আছে। কাঠ কুড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জন্য ১০।১৫টী ফুল জড় করিয়া গোছা বাঁধিয়া শিশুর হাতে দিল। শিশুও খড়ম পায়ে মা ও দিদিমার পেছনে পেছনে ফুল হাতে করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিল।

জাপানীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রতিদিন স্নান করে। আমাদের গরম দেশে স্নান করা সহজ। শীতের দেশে স্নান ব্যয়সাধ্য। সুতরাং এটা এদের গুণের মধ্যে ধরিতে হইবে। আর ইহাদের বড় একটী গুণ, সৌজন্য। এতটা সৌজন্য অপর দেশে আমি দেখি নাই। জাপান সম্বন্ধে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল। জাপানে আসিয়া জাপানীদিগকে দেখিয়া আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। জাপানীদের দোষ নাই মনে করিও না। কিন্তু ইহাদের কয়েকটী গুণের কথা বলিলাম। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

ওসাকা হোটেল, ১৬ই মে, ১৯২২।

সাধু প্রকাশচন্দ্র রায়ের স্মৃতি।

২।

সাধু প্রকাশচন্দ্রের পরার্থময় জীবনের কথা কত আর বলিব? আত্মহারা হইয়া অপরকে ভালবাসিতে এখন বুঝি আর কাহাকেও দেখি নাই—আর কিছু না হোক এমন পত্নীপ্রেম আর দ্বিতীয় কাহারো দেখি নাই। আমি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি—তিনি তখন বিপত্নীক আমি বিপত্নীক কথাটী তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারি না—তিনি বি-পত্নীক ছিলেন না। তিনি যে যথার্থই পত্নীপ্রাণ ছিলেন। দিবানিশি ঐ প্রসঙ্গ—ঐ এক চিন্তা। দেবী জী তাঁহার কি

বলিতেন, কি করিতেন, সদা সর্ব্বদাই শুনিতাম। একদিন বলিলেন "তোমরা অতিথিকে ভাল সামগ্রী দিতে না পারিলে এত ক্ষোভ কর কেন, এত লজ্জিত হও কেন? এমন কি ধার করেও ভাল সামগ্রী দিতে যাও কেন? যদি কোন দিন হাতে পয়সা না থাকে, ঘরে যা থাকবে তাই দিয়েই আতিথ্য করবে। জান দেবীজী কি করতেন, একবার মাসের শেষে আমাদের হাতে পয়সা নাই ঘরে অতিথি উপস্থিত,—অতিথিকে তিনি শুধু আলু ভাতে ভাত দিয়া, অতিথির সম্মুখে হাত জোড় করিয়া বলিলেন, মাপ করবেন আজ আমার ঘরে এই বই আর সংস্থান নাই, আপনার অভ্যর্থনার যথাযোগ্য আয়োজন করতে পারলাম না। দেখ দেবী জী আলুভাতে ভাত দিয়া আতিথ্য করতেন তবু ব্রতভঙ্গ করিতেন না, আর তোমরা ঋণগ্রস্ত হয়ে অতিথিকে ভাল খাওয়াতে চেষ্টা কর এ ত উচিত নয়। আমরা সংসার আরম্ভ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, অনাহারে মরি তাও ভাল, এক পয়সা ঋণ করব না—তা জীবনের প্রাণান্ত সংগ্রামের ভিতরও রক্ষা করেছি। জীবনে যদি ব্রতই না রইল তবে রইল কি?" দেবী জী ধর্ম্ম এবং কর্ম্মকে জীবনে মিলিত করেছিলেন তাঁর কর্ম্মময় জীবন ছিল, যার ভিত্তিতে ছিল অচলা নিষ্ঠা। এমনি করিয়া কথায় কথায় উঠিতে বসিতে দেবী অঘোর কামিনীর মধুময় জীবনের কথা কতই শুনিতাম। সমুদায় মন প্রাণ দিয়া এমন করিয়া স্ত্রীকে ভালবাসিতে শ্রদ্ধা করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই. সাধে কি অঘোর কামিনী স্বামীকে "পত্নীপ্রাণ" "স্বর্গের সাথী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন? এ ত আর কবিত্ব নয়, পল্লবিত মধুর বচন নয়! এ প্রাণের মর্ম্মস্থল হইতে উচ্ছ্বসিত গভীর কথা! প্রকাশচন্দ্র যথার্থই "অঘোর-প্রকাশ" ছিলেন। পত্নীপ্রেমে নিষিক্ত তাঁর পবিত্র মধুর জীবনচিত্র দেখিয়াছি—অঘোর কামিনীর কি ছিল—তা ত দেখি নাই—যা প্রকাশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, সে অপূর্ব্ব কথা! এই দম্পতীর জীবনের প্রথম কথা প্রেম, দ্বিতীয় কথা প্রেম, প্রতিদিনের সাধনা প্রেম,—মৃত্যুর ক্ষণে প্রেম! প্রকাশচন্দ্র কথায় কথায় একদিন আমায় বলিলেন "আমার জীবনের সকলের চেয়ে বড় সাধ কি জান? আমার যখন মৃত্যুর ক্ষণ উপস্থিত হবে, সেই সময় অদূরে বিয়ের নহবৎ বাজতে থাকবে, দেহ হতে যখন আবার প্রাণ বাহির হইবে, সে বিয়াহের মঙ্গল বাদ্য শুনতে শুনতে যাবে, আহা সেদিন আমার কি সুখের দিন, সেদিন মহা মিলনের দিন—মৃত্যুর চিন্তায় আমার প্রাণ সুখে মগ্ন হয়—এত আরাম আর কিছুতেই নাই—তাই ব'লে ভেবো না, আমি মরিবার জন্য ব্যস্ত—দেখছ না, আমি কত শরীরের যত্ন করি, মরতে আমি চাই না—কিন্তু আসবে যেদিন যাবার পালা, সেই আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময়। তোমরা কি জান মৃত্যুও সাধন করতে হয়,—আমি সেই মৃত্যু সাধন করেছি।"

আমি হাঁ করিয়া এই সকল অমৃত কথা শুনিলাম—তাঁর মৃত্যুর পর সুবোধচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার বাবার মৃত্যুর সময় বিবাহের বাজনা বাজাইয়া ছিলে কি?" সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "না প্রাণ ধরিয়া তা পারি নাই।" কি বলিব, প্রতি খুঁটিনাটি কথায় তাঁর দেবীজীকে স্মরণ হইত। ভগবানের সান্নিধ্য আর পত্নীর সান্নিধ্য এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি ভুলিতে পারিতেন না। সাধন ভজনে এই দম্পতীর অসাধারণ নিষ্ঠা ছিল। ভোর ৪ টায় চক্ষু খুলিয়াই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া নাম গান। আমাকে একদিন প্রকাশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে

বলিলেন যে "লোকে যেমন নেশাখোর হয়, আমরা দুজনে উপাসনাখোর হইয়াছিলাম, যেদিন ঘরে বিপদ, কঠোর পরীক্ষা—দেবী জী ঘন ঘন উপাসনার ঘরে গিয়া দুই দশ মিনিট বসিতেন—তবে প্রাণে শক্তি আসিত। উপাসনা ভাল না হইলে তিনি আমার মুখ দেখিয়াই বুঝিতেন—অমনি আমাকে ডাকিয়া ভগবানের চরণে কাতর প্রার্থনা করিতেন—মাছ যেমন জল না হলে বাঁচে না, আমরা তেমনি ভগবানের নাম না হলে বাঁচতাম না।"—ধন্য অঘোর প্রকাশের দেবতা!! ধন্য তাঁদের সংসার ধর্ম্ম!! একেই বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন—ব্রাহ্মসমাজে সাধক দম্পতী যদি কেহ থাকিয়াছিলেন, তবে সে অঘোরপ্রকাশ!

এইবার বলিব পিতারূপে প্রকাশচন্দ্রকে কিরূপ দেখিয়াছি। আমাদের বাড়ী যখন ছিলেন, তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বিলাত হইতে আসিলেন। আমার বাড়ীতেই বিলাত প্রত্যাগত পুত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হইল—সে কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। বিধানচন্দ্র যখন সমুদ্র পথে, তখন তাঁর জন্মদিন উপস্থিত। জন্মদিনের দুইদিন আগে প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "পরশু বিধানের জন্মদিন! আমার ইচ্ছা হইতেছে সেদিন তোমাদের মিষ্ট মুখ করাই, তুমি কি এখানকার দুইচার জন বন্ধুকে ডাকিয়া জলযোগ করাইতে পারিবে।" আমি বলিলাম "কেন পারিব না" তখন কি কি আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিলেন। দেখিলাম, উৎকৃষ্ট বস্তু না হইলে তাঁর মন উঠিল না। বিধানচন্দ্রের জন্মদিনে সকালে সকলকে লইয়া পুত্রের মঙ্গলকামনায় উপাসনা করিলেন। বিকালে ৪ টার সময় বন্ধুদিগকে সুন্দর করিয়া জলযোগ করাইলেন। তারপর রাত্রে আবার আমাদের লইয়া ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং পুত্রের জন্য আবার প্রার্থনা করিলেন। যেদিন বিধান আসিবেন তার পূর্ব্বদিন বলিলেন "দেখ কৃতী পুত্র ঘরে আসছে, আজ দেবীজী থাকলে কত আয়োজন করতেন, আমি বাবা, আমার ত কৃতী পুত্রের প্রতি সমাদর দেখাতে হয়, তুমি যদি পার তার যথা-যোগ্য অভ্যর্থনার জোগাড় কর।" আমি বলিলাম "কি করতে হবে"। বলিলেন "ফুল পাতা দিয়ে বাড়ী সাজাও, রাত্রে বাড়ীতে রোসনাই কর, ঐক্যতান বাদ্যের যদি জোগাড় হয় কর, আর প্রীতিভোজন।" আমি তথাস্তু বলিয়া বাড়ী পত্রে পুষ্পে সাজাইলাম; ফটকে "শুভাগমন" লেখা হইল, রাত্রে আলোক মালায় গৃহ প্রাঙ্গন সুসজ্জিত হইল এবং সখের কনসার্টের দল মধুর বাদ্য শুনাইল। সে এক মহোৎসবের ব্যাপার। বিধানচন্দ্র সমারোহ দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন! "বাবা একি ব্যাপার করেছেন, লজ্জায় মরি!" প্রকাশচন্দ্র কৃতী পুত্রের যথা-যোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া তৃপ্ত হইলেন। আমরাও তাঁর আনন্দের ভাগী হইয়া কৃতার্থ হইলাম। সকল কাজেই তার নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, এবং সৌন্দর্য্যবোধ ছিল। আমাদের বাড়ী যখন প্রকাশচন্দ্র ছিলেন, তখন এখন যিনি তাঁর "মেজবৌমা" তিনি সঙ্গে ছিলেন। তখন মেজছেলে "সাধনচন্দ্র" বিলাতে। প্রকাশচন্দ্রের এই পুত্রবধূর নাম ব্রহ্মকুমারী, তাঁকে আমরা "বুড়ী" বলিয়া ডাকি। ব্রহ্মকুমারী ছায়ার ন্যায় প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন দিবানিশি তন্ময় হইয়া তাঁর সেবা করিতেন। ব্রহ্মকুমারীর সামান্য কোন ত্রুটি দেখিলে প্রকাশচন্দ্র হেসে হেসে তার উল্লেখ করিতেন, বলিতেন "বুড়ী এটা তোমার ঠিক হয় নাই"

একদিন ব্রহ্মকুমারী বলিলেন "আপনি আমার ক্রটিগুলো খুব দেখতে পান আর আমার দোষের কথাই কেবল বলেন।" তিনি এমন মিষ্টি হাসি হেসে, এমন মিষ্টি করে বললেন "জান না কি আমি তোমায় নিখুঁৎ দেখতে চাই, আমি যে তোমায় খুব ভালবাসি।" ঠিক প্রকাশ চন্দ্রের এই স্বভাব ছিল। আমাদের দোষ ক্রটির কথা মিষ্টি করে হেসে হেসে বলতেন। একদিন আমার স্বামীর সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হয়। প্রকাশচন্দ্র মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন; হাসিয়া বলিলেন "আমিত্বটা ছাড় দেখি, তোমার কথাই কি বড়, তোমার মতই কি মত, একবার স্বামীর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ কর ত। অভিমান কোরো না, অভিমান অহংকার, ও বড় সর্ব্বনাশের কথা। অভিমান ছাড়, নিজেকে ছেড়ে দাও দেখি মিলন সম্পূর্ণ হয় কিনা। মা লক্ষ্মি স্বামীকে যদি না পেলে ভগবানকে পাবে কি? দাম্পত্য প্রেম যেখানে নাই, আমার বিশ্বাস, ধর্ম্ম সেখানে দাঁড়াতে পারে না"—ছাড় ছাড় অভিমান আর আর আমিত্ব।" এমন করে মুখের উপর মিষ্টি ক'রে তিরস্কার আর কেউ কখন করে নাই। আঃ! কি মিষ্টি সে তিরস্কার! কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য, প্রকাশচন্দ্র কখন অন্য কাহারো নিন্দা বা দোষের কথা কাহারো নিকট পাড়েন নাই। দোষের কথা মুখের উপর—সুখ্যাতি পশ্চাতে!

একদিন ব্রহ্মকুমারী সকালবেলা তাঁহাকে এক পেয়ালা দুধ খাইতে দিয়াছিলেন—পেয়ালাটী হাতে করিয়াই প্রকাশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "বুড়ি, এই নূতন পেয়ালাটী কি নিবেদন করা হয়েছে? (অর্থাৎ ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে)ব্রহ্মকুমারী একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "দিন দিন আপনার সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি হচ্চে"। আমি নিকটে দাঁড়াইয়াছিলাম, বলিলাম, "দেখ্‌ছেন কি বুড়ীর শাসনে আপনাকে বুড়ো বয়সে থাকতে হবে, কড়া হাতে পড়েছেন।" প্রকাশচন্দ্র হেসে বলিলেন "তা যেন বুড়ী ভাবেন না, আমি তাঁদের এক চেটিয়া নই; আমি যেমন তোমাদের, তেমনি আমার সন্তানদের আমায় কেউ দখল করে রাখতে পারবেন না, আমি মুক্ত ও স্বাধীন। বাস্তবিক তিনি কেবল তাঁর সন্তানদের ছিলেন না, তিনি আমাদের পক্ষে একান্ত আপনার জন ও ছিলেন। তাঁর কাছে বসিলে প্রাণ আশ্বস্ত হইত, মনে মনে অনুভব করিতাম, পরমাত্মীয়ের কাছে বসেছি। যখন তিনি স্বর্গে গেলেন, তখনও ভুলে ভুলে কত সময় মনে করেছি "এ কথাটা তাঁকে বলব।" প্রকাশচন্দ্রের প্রসঙ্গ অফুরন্ত আজ আর দুই একটী কথা বলিয়া শেষ করিব। প্রকাশচন্দ্র কোন ভাল লোকের কথা আমাদের মুখে শুনিলেই বলিতেন "আমার তাঁকে দেখতে হবে ত? আমার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিও।" একদিন আমার স্বর্গীয় পতি মহাশয় একজন জড়বাদী ফরাসী ভদ্রলোকের সাধুতার কথা তাঁর নিকট গল্প করিলেন। এই ভদ্রলোকটী বেহালা বাজাইতে অতিশয় দক্ষ ছিলেন—তিনি Positivist ছিলেন, অথচ উপাসনার জন্য প্রাণ তাঁর ব্যাকুল ছিল। একদিন নাকি আমার স্বামীকে বলেছিলেন যে, "দেখ এমন পূজার পদ্ধতি হয় না, তোমরা এবং আমরা এক সঙ্গে পূজা করতে পারি?" তিনি বলিলেন "এমন পূজা কি করে সম্ভব? আমরা ভগবানের পূজা করব, আপনি Humanityর পূজা করবেন।" তিনি উত্তর করলেন "human being হয়ে Humanity ছাড়া বড় কি ধারণা করতে পার?" যাহোক এমন মিলিত পূজা সম্ভব হইল না।" উনি প্রকাশচন্দ্রের নিকট একথা বলিতে, তিনি সেই ফরাসী ভদ্রলোকটীকে দেখবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। "ওহে আমার

তাকে দেখাতে হবে।" উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। ফরাসী ভদ্রলোকটি প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রকাশচন্দ্র বলিতেন "সাধু সঙ্গ করাই আমাদের তীর্থ যাত্রা। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যথার্থ সাধু দর্শন করা আমার জীবনের ব্রত।" প্রকাশচন্দ্র অপরের প্রাণে ভগবদ্ভক্তি সংক্রামিত করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁর সংসর্গে মানুষ ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বাসী না হইয়া পারিত না। দারজিলিংএ যখন আমাদের বাড়ী ছিলেন, একদিন এক ভদ্রলোকের একটী ছেলে হঠাৎ মারা যায়। রাত্রি ১০ টার সময় আমার স্বামী মহাশয় সেই বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "আহা! বিদেশে বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ ১৫।১৬ বছরের ছেলেটি মারা গেল—কি ভীষণ শোকের আঘাতে বাপ মা একেবারে ধরাশায়ী হইয়াছেন। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, ওঁদের এই সময় যদি কেহ ভগবানের মিষ্ট নাম শুনাইতেন!" প্রকাশচন্দ্র অমনি বলিয়া উঠিলেন "চল আমায় নিয়া চল, আমি সেই দুঃখিনী মাকে ভগবানের নাম শুনাইব।" তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল—তখনও সেই বালকের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। প্রকাশচন্দ্র গিয়া তাঁহার পাশে বসিলেন—ভগবানের নিকট সেই বালকের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল জানি না সেই বালকের মা—হিন্দুগৃহের বধূ প্রকাশচন্দ্রের নিকট মুক্ত কণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন—যিনি জীবনে কখনও উপাসনা প্রার্থনা করিতে শেখেন নাই, ভগবানের নাম শুনিয়া তাঁর দগ্ধ হৃদয় শীতল হইল। তারপর হইতে যে কয় দিন তাঁহারা ছিলেন প্রকাশচন্দ্র নিত্য তাঁহাদের নিকট গিয়া দুদণ্ড বসিতেন। আর এক ঘটনা শিলং সহরে হইয়াছিল। সেখানে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে গৃহস্বামীর কঠিন পীড়া হয়। তখন প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণের সময় প্রকাশচন্দ্র সেই ভদ্র লোকটীকে দেখিতে আসিতেন। মৃত্যু সঙ্কট হইতে যখন তিনি মুক্ত হইলেন, তখন প্রকাশ চন্দ্র হাসিয়া তাঁর পত্নীকে বলিলেন "মা লক্ষ্মি! ভগবানের কৃপায় তোমার স্বামী এত বড় সঙ্কট হ'তে উদ্ধার হলেন, একদিন ঘরে আনন্দোৎসব কর, বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াও।" তিনি বলিলেন "তা বেশ কথা—তাহাই করিব।" একদিন মহাসমারোহ করিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইল, বন্ধুরা আসিলেন; তখন প্রকাশচন্দ্র আস্তে আস্তে গৃহস্বামিনীকে বলিলেন "মা লক্ষ্মি, যাঁর কৃপায় তোমার স্বামী বেঁচে উঠলেন, তাঁকে ধন্যবাদ করে সকলকে খাওয়ালে ভাল হয় না?" তিনি বলিলেন "বেশত! তাহলে আপনি বলুন কি করতে হবে?" প্রকাশচন্দ্র বলিলেন "আর কিছু নয়, একটু বসিবার স্থান কর, আমি ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাব।" তাহাই হইল। একথা প্রকাশচন্দ্রের মুখে শুনি নাই—সেই গৃহস্বামিনীর সঙ্গে দারজিলিং এ সাক্ষাৎ হইলে, তিনি প্রকাশচন্দ্রের প্রসঙ্গে এই গল্প করিয়া বলিয়াছিলেন "কে প্রকাশ বাবু আপনাদের মত ব্রাহ্ম ছিলেন না, তিনি আমাদের দিয়াও ভগবানের নাম করাইয়া ছাড়িতেন, তবু ব্রাহ্ম বলিয়া কখন তাঁহাকে পর ভাবি নাই—যদিও আমরা হিন্দু। বাস্তবিক তিনি ত আমাদের মত ছিলেন না। তাঁর ভগবানের গৌরব, তিনি সকল কার্য্যে ঘোষণা করিতেন, নিজের বুলি কখনও ভুলিতেন না, কিন্তু এমন করে পরকে আপন কে করিতে পারিয়াছে? তাঁর স্মৃতি আমার নিকট স্বর্গের আভাষ আনিয়া দেয়—কিন্তু এ প্রসঙ্গ কত আর বলিব, এখানেই শেষ করিলাম।

শ্রীহেমলতা সরকার।

কাকের কলঙ্ক।

আজকাল বাঙ্গালী পাঠকের পাঠরুচি ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কোনও না কোনও মাসিক পত্রে পক্ষীতত্ত্ব সম্বন্ধে অধুনা দু একটি প্রবন্ধ থাকেই। আমিও সেই জন্য কাকের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। কাকের উপদ্রবে জ্বালাতন হন নাই—কয়জন এমন পাঠক আছেন? কি দেশী, কি বিদেশী সকলেই এই পাখীর সম্বন্ধে একটা ঘোরতর বিদ্বেষ পোষণ করেন। কাকও আমাদের এই বিদ্বেষ কড়ায় গণ্ডায় ফিরাইয়া দেয়। ইহার লুণ্ঠনপরায়ণতা, চৌর্য্য, লোভ ও কপটতায় সকলেই ব্যতিব্যস্ত। এহেন কাকের পক্ষ সমর্থন করিয়া আমি দুই চারিটি কথা লিখিতে বসিয়াছি।

কিন্তু আমি বিশাল পক্ষিবিজ্ঞান সমুদ্রে ভগীরথরূপে একটি সলিলকণাও বহন করিয়া আনিবার দুরাকাঙ্ক্ষা রাখি না। যাঁহারা গ্রামপ্রান্তে, জলাশয়সান্নিধ্যে কাশবনে আত্মগোপন করিয়া বকধার্ম্মিকত্বের গবেষণা করেন; অথবা, যাঁহারা জনহীন নিবিড় অরণ্যে শ্যামার স্বরলহরী শ্রবণে চৈতন্য হারাইয়া বসেন; কিংবা, খাল বিলে হোগলাবনে পানকৌড়ি ও ডুবুরির দাম্পত্যলীলা পর্য্যবেক্ষণে ব্যগ্র—তাঁহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। আমি অভদ্র, কলঙ্কিত কাকপাখিটির প্রতি দয়াপরবশ হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছি। "বকের বদনামে" কেহ কেহ ব্যথিত হইয়াছেন—কাকের অপবাদে আমার সহৃদয়তা কিছু অপরাধের নহে।

নিদাঘের অবসর দিনে গৃহমধ্যে বৈদ্যুতিক পাখার অভাবে তালবৃন্ত দ্বারা উত্তাপ তাড়াইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত গলদ্‌ঘর্ম্ম পাঠক নিদ্রাদেবীর সুখক্রোড়ে আশ্রয় সম্বন্ধে যখন হতাশ হইয়া পড়েন, তখন বারান্দার রেলিং হইতে যে সুঠাম, সুগঠিতদেহ, ভ্রমরকৃষ্ণ পাখীটি মাথা নাড়িয়া প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তির বিরুদ্ধে নিজের অভিযোগ জ্ঞাপন করে, তাহার কণ্ঠধ্বনি সম্বন্ধে নিদ্রাপ্রয়াসী পাঠকের অভিমত লিপিবদ্ধ করা বোধহয় সুরুচিসঙ্গত হইবে না। যে সকল সুগৃহিণী পাঠিকা কচি আম প্রভৃতি অম্লরসাত্মক ফলের বিবিধ রসাল আচার প্রস্তুত করিতে নিপুণা তাঁহারাও এই রসনাপ্রিয় বিহঙ্গমটিকে সুনজরে দেখেন না। যাঁহাদের কটাক্ষ বর্ষণে ত্রিভুবন চঞ্চল, তাঁহাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতেও এই পাখী বিচলিত হয় না। বরং দুষ্ট পাখী পালটিয়া গালি দেয়—"কা—কা—কাণা হও—কাণা হও।" এরূপ অভিসম্পাত যে করে তার বিরুদ্ধে সুনয়নীগণ যদি উৎকট বৈরীভাব পোষণ করেন, তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া কখনই চলে না, কারণ রমণীর প্রতি ওরূপ অভিশাপ নিতান্ত ভদ্রতাবিরুদ্ধ ও রুচিবিগর্হিত।

অতি শৈশবেই আমরা কাকের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হই। ছোট্ট বাঙ্গালীর বাচ্ছা যখন ভাত খাইতে বিদ্রোহ করে, তখন তাহার জননী ভগিনী তাহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিয়া, কাককে আহ্বান পূর্ব্বক, অন্নের গ্রাস কাকে লইয়া যাইতেছে, এই ভয় দেখাইয়া তাহা গলাধঃকরণ করান। তার পর যতই বয়স বাড়ে ঐ চতুর, কপট পাখীটির চৌর্য্য-কুশ-

লতার ততই তাহার প্রতি বিরক্ত হইতে থাকি। কলিকাতার বালক যখন অনেক কান্নাকাটি-লব্ধ পয়সাটির বিনিময়ে ঠোঙাভরা রসমুণ্ডি লইয়া উৎসাহে গৃহপানে ধাবিত হয়, তখন এই খেচর সহসা ছোঁ মারিয়া বালকের সব আনন্দ, সব উৎসাহ ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া যায়। আমার একটি বালক আত্মীয়কে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"বল দেখি, তুমি বেশী চালাক না কাক বেশী চালাক।" আলিসায় উপবিষ্ট একটি কাকের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সেই অপরিস্ফুটবুদ্ধি মানবক ক্ষুণ্ণমনে স্বীকার করিল—"কাকই বেশী চালাক।" কিন্তু তাহার বুদ্ধিবিকাশ সম্বন্ধে পাছে আমি হতাশ হই, সেই ভয়ে সে আমায় আশ্বস্ত করিল যে, তাহার দাদার মত বয়সে সে কাক অপেক্ষাও চালাক হইবে। অর্থাৎ কাক সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বোধ হয় এই যে, পরিণত বয়স্ক পুরুষ কাক অপেক্ষা চালাক হইলেও তাহার মত শিশু কাকের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, ছোট বড় স্ত্রীপুরুষ সকলেই আমাদের এই অতি পরিচিত নিত্যসহচর পক্ষীকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। শুধু যে ঘৃণা করেন তাহা নহে, জগতের সৃষ্টি-রহস্যে ইহাকে একটা অত্যুক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন। এবং "যাকে দেখতে পারি না তার চলন বাঁকা।" এই হিসাবে কাকের কর্কশ কণ্ঠধ্বনিতে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় অনেকে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন।

তাচ্ছিল্য, ঘৃণা ও অনবরত তাড়নায় পাখী দূরে থাক, সহজ মানুষই ধূর্ত্ত ও চোর হইয়া উঠে। বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সহিত যুঝিয়া তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হয় বলিয়াই কাক চোর, লোভী, ধূর্ত্ত, ও দুর্ম্মুখ। শুধু এই সকল দোষের জন্য কাককে পক্ষী সমাজে চণ্ডাল রূপে নির্দ্দেশ করা উচিত হইবে না। বিহঙ্গ পিনালকোডে চৌর্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। বিশেষতঃ, মানুষের সম্পত্তি অপহরণ করা পক্ষীসমাজে একটা প্রশংসার কার্য্য। যেমন অনেক পাশ্চাত্য জাতির বিশ্বাস যে তাঁহাদের সুবিধার জন্যই প্রাচ্যজাতির সৃষ্টি, নহিলে ইহাদের অস্তিত্বের কোনও ন্যায্য কারণ থাকে না—তেমনি, পশুপক্ষীগণের মধ্যে অনেক দার্শনিকের বিশ্বাস যে মানুষ শুধু তাহাদেরই সুবিধার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। এবং সেই সুবিধা-গুলি মানুষের নিকট হইতে আদায় করিতে গেলে চতুরতা এবং চৌর্য্য অবলম্বন করিতেই হইবে।

লোভ চৌর্য্য অপেক্ষাও কম দূষণীয়। লোভ কি মানুষেরও প্রকৃতিগত নহে? লোভের জন্য মানুষে মানুষে কি অনবরত সঙ্ঘাত হইতেছে না। কাকের সম্মুখে তুমি নানারূপ সুখাদ্য সাজাইয়া তাহার চিত্তে প্রলোভনের সঞ্চার করিবে, অথচ যখন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ঔদরিক প্রয়োজন সাধন করিবে তখন তুমি তাহাকে দোষ দিবে! তোমাদের মধ্যে টাকার লোভে, রূপের লোভে, রাজসম্মানের লোভে, যশের লোভে কত লোক সত্যের পথ ছাড়িয়া দিতেছে তাহার হিসাব রাখ কি?

কাক দুর্ম্মুখ এটা আমি স্বীকার করি। স্থানকালপাত্র নির্ব্বিশেষে সে বড়ই কটূক্তি প্রয়োগ করে। তার কণ্ঠধ্বনি যে মোটেই সুললিত নহে একথা জানিয়াই বোধ হয় মানুষকে বিরক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই সে এরূপ করে।

কাকের দোষক্ষালনের চেষ্টা করিয়া, তাহার দু'একটি গুণের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কাক যে দেখিতে সুশ্রী—ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। তাহার অবয়বের সুঠাম গঠন সম্বন্ধে আমার কথা মানিতে না চাহ, চারু রায় বা ভবানী লাহা বা তোমার পরিচিত কোনও চিত্রকরের মত লইও। কাকের দেহে বর্ণবিন্যাস তোমার ভাল না লাগিলেও তাহাতে সুন্দর একটা সামঞ্জস্য আছে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিও।

কাকের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে কাকের চরিত্র কত সুন্দর।

প্রথমতঃ, কাক একপত্নীক। সামাজিক বাঁধাবাঁধির অভাব সত্ত্বেও কাকদম্পতির একজনের মৃত্যু না হইলে কেহ কাহাকেও ত্যাগ করে না। তাহার দীর্ঘ জীবন সর্ব্বজনবিদিত।

দ্বিতীয়তঃ, কাক তাহার সঙ্গিনীর বিশেষ যত্ন লইয়া থাকে। কাকগৃহিণীর প্রসূতি অবস্থায়, পুরুষ কাক তাহার জন্য খাদ্য আহরণ করিয়া খাওয়াইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, স্ত্রী কাক পুরুষ কাকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াও কোনও শাস্তি পায় নাই। আহার্য্য সম্বন্ধে এরূপ ঔদার্য্য পশুপক্ষীর মধ্যে বিরল।

তৃতীয়তঃ, কাক অত্যন্ত সন্তানবৎসল। সন্তানের বিপদ আশঙ্কা করিলে সে মানুষকেও আক্রমণ করে। কাক এত চতুর, কিন্তু ধূর্ত্ততর কোকিল কেমন করিয়া তাহার দ্বারা নিজ সন্তান পালন করাইয়া লয় তাহা সকলেই জানেন। এই পালিত শিশুগুলির ক্ষুধা অপরিসীম এবং ইহারা দিন ভরিয়া আহার্য্যের জন্য চীৎকার করে। মানুষ পিতামাতা সন্তানের এত আব্দার কখনই সহ্য করেন না।

এই পরভৃত কোকিলশিশুকে অপরিসীম ধৈর্য্য সহকারে কাক দম্পতী খাওয়াইয়া বড় করে। আহার্য্য আনয়নের জন্য এই শিশুগুলির "তর সয় না"। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি একবার খাওয়াইয়া আহার্য্য অন্বেষণে কাকগুলি চলিয়া যাওয়া মাত্র কোকিল শাবক ভীষণ আর্ত্তনাদ জুড়িয়া দেয়। কাক নীরবে সকল বিরক্তি উপেক্ষা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া চলে।

সামাজিক জীবনে কাকের একতা খুব বেশী। দলাদলি একরূপ নাই বলিলেই চলে। সাধারণতঃ পাখীদের মধ্যে পংক্তি-ভোজন দেখা যায় না। কিন্তু কলিকাতার পথে আবর্জ্জনা রাশি ঘিরিয়া কাকের দল নির্ব্বিবাদে আহার করে, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ব্যক্তিগত বিবাদ যে হয় না তাহা নহে। তবে, মানুষের মধ্যে যেরূপ ব্যক্তিগত কলহ অনেক সময়েই সামাজিক দলাদলিতে পরিণত হয়—ইহাদের মধ্যে তেমন হয় না।

মাঝে মাঝে ইহারা একত্র হইয়া নানা আলোচনা করে। আমাদের পাশের বাড়ির একটি নিমগাছে মাঝে মাঝে কাকের পঞ্চায়েৎ বসিত। কেহ যে সভাপতি হইত তাহা মনে হয় না। কেহ গাছে কেহ বা ভিন্নিয় ছাদের উপর বসিত। এবং যাহাদের কিছু বক্তব্য থাকিত তাহারা শাখাগ্র হইতে বক্তৃতা করিয়া পুনরায় নামিয়া আসিত। এইরূপ ১০।২০ মিনিট বাকবিতণ্ডার পর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিত।

পরস্পরের আপদে বিপদে কাকের মধ্যে সহানুভূতি খুব বেশী। অবশ্য এই সহানুভূতি

শুধু চাঞ্চল্য, উৎকণ্ঠা ও গলাবাজীতেই প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে কাক পাকা "মডারেট"। কোনও কাকের অনিষ্ট চেষ্টা করিলে অন্যান্য কাক জড় হইয়া এমন অ্যাজিটেশন আরম্ভ করিবে যে, হয় তোমায় অনিষ্ট চেষ্টা হইতে বিরত হইতে হইবে, নয় ডায়ারী উপায়ে তাহাদের একেবারে ঠাণ্ডা করিতে হইবে।

ছোটনাগপুরের একটি প্রান্তিক সহরে বাসকালে, ঔদরিকভাবে পক্ষীতত্ত্বের আলোচনার্থ একদিন বন্দুকস্কন্ধে পক্ষী-সংগ্রহে বাহির হইয়াছিলাম। বাসার সন্নিকটে এক পলাশবন হইতে কয়েকটা কাক আমায় দেখিতে পাইয়া এমনই কলরব আরম্ভ করিল এবং ফেউয়ের মত আমার সঙ্গ লইল যে, সে দেশের খেচর মাত্রই সাবধান হইয়া গেল ও আমার উদ্দেশ্য বিফল হইল। কাক বন্দুক জিনিসটির ব্যবহার কি তাহা বেশ জানে। ঐ যন্ত্রটির হনন ক্ষমতা যে সসীম দূরত্বের উপর নির্ভর করে তাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়ায়—যথোচিত তফাতে থাকিয়া তোমায় বেশ একটু বিদ্রূপ করিয়া লয়। তুমি ছড়ি লইয়া বেড়াও—কাক তোমায় গ্রাহ্য করিবে না। কিন্তু তুমি একটি ঢিল কুড়াইয়া লও, কাছাকাছি কাক থাকিলে তৎক্ষণাৎ চম্পট দিবে। কাক বড় উপদ্রব করিতেছে—তুমি গুলতি বাঁশ লইয়া ঘর হইতে বাহির হও, তোমাকে দেখিয়াই কাকের হঠাৎ মনে পড়িয়া যাইবে গ্রামের অপর প্রান্তে তাহার একটা নিমন্ত্রণ আছে। এ গেল কাকের বুদ্ধির কথা। তবে বলা চলে যে প্রাণ লইয়া যেখানে টানা টানি সেখানে আপনি বুদ্ধি গজায়।

কাক যে আমাদের ধাঙড়ের কাজ করে এ কথা সবাই জানেন। কলিকাতার পথে মৃত মূষিক বিড়ালাদি নিক্ষিপ্ত হইয়া পচিয়া পাড়া আমোদিত করিয়া ফেলিলেও, কর্পোরেশনের মাহিনা করা মানব জাতীয় মেথরগণ তাহা স্পর্শ করে না। কাক না থাকিলে গলিবাসী নিরীহ বাঙালীর অবস্থা শোচনীয় হইত।

গবাদি পশুর সঙ্গে কাকের বড়ই সম্প্রীতি। ইহারা চরিবার সময় অনেক কীটাদিকে স্থানচ্যুত করে। সেই সকল কীটাদির লোভে কাক প্রায়ই উহাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়। আবার গরু যখন বসিয়া বসিয়া নিঃশব্দে জাবর কাটে কাক তখন তাহার নাসিকা মধ্য হইতে, পৃষ্ঠ বা পুচ্ছ হইতে অথবা কর্ণ ও চক্ষুর কোণ হইতে এঁটুলি পোকা ঠোকরাইয়া তুলিয়া লয়। মুখাগ্রে উপবিষ্ট কাককে দেখিয়া, গরু বা বলদ তাহার দিকে মুখ বাড়াইয়া নিমীলিত নয়নে অপেক্ষা করে; কাক ইঙ্গিত বুঝিয়া ঐ চতুষ্পদের সুদীর্ঘ নাসারন্ধ্রে আপনার চঞ্চু প্রবেশ করাইয়া দেয়—অনেকেই বহুবার লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহারা সুধু যে গোসেবা-পরায়ণ তাহা নহে—কৃষকেরও ইহারা বন্ধু। পঙ্গপালের ঝাঁক যখন কৃষকের আতঙ্ক উপস্থিত করে তখন ময়না প্রভৃতির সঙ্গে কাকও সেই পঙ্গপাল সমূহ আক্রমণপূর্ব্বক বিধ্বস্ত করিতে তৎপর হয় একথা বিশেষজ্ঞ লক্ষ্য করিয়াছেন। এখানেও কাক আমাদের উপকারই করে। কাকের এতগুলি গুণের উল্লেখ করিলাম। ইহার পর কাকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত কি না পাঠক বিবেচনা করিবেন।

খেচরকুলে এই পক্ষীর যথেষ্ট অপযশ আছে, এবং সে জন্য ইহাদিগকে বেশ উপক্রান্ত হইতে হয়। কোনও কোনও পক্ষিশাবকের সুকোমল দেহ-মাংসের লোভ কাক সম্বরণ করিতে

পারে না। তাই সকলেই ইহাকে সন্দেহ করে। পক্ষী সমাজের চৌকীদার ফিঙে কাক দেখিলেই আক্রমণ করে। কাক আয়তনে ফিঙে অপেক্ষা বড় হইলেও কাপুরুষ। ফিঙের সামনে পড়িলে সে পলাইবার পথ পায় না।

এতদ্ব্যতীত, এই সুচতুর পক্ষীটি কোকিলের কাছে বড় জব্দ থাকে। কাককে দিয়া ইহারা নিজ সন্তান পালন করাইয়া লয়। কোকিলের প্রতি কাকের সেইজন্য প্রকৃতিগত বিদ্বেষ আছে কোকিল দেখিলেই তাহাকে কাক তাড়া করিয়া যায়। কোকিলও কাকের এই স্বভাবের সুযোগ গ্রহণ করে। পুংকোকিল কাকের বাসার সম্মুখে আসা মাত্র কাকদম্পতি তাহাকে তাড়া করে। মারীচের মত তাহাদিগকে কোকিল বহুদূর লইয়া যায়। ইত্যবসরে স্ত্রীকোকিল কাকের বাসায় ডিম রাখিয়া আসে। শুধু রাখিয়াই সে ক্ষান্ত হয় না। নীড়মধ্যে কাকের ডিম থাকিলে দুষ্টা তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আসে। শাবকজনন কালে কাক তাহার বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে, নতুবা সে ডিমের পার্থক্য বুঝিতে পারে না কেন? ডিম ফুটিয়া শাবক বাহির হইলেও সে তাহার আকৃতিগত পার্থক্য টের পায় না। অপরের সন্তানকে সে অতি যত্ন সহকারে লালন পালন করিয়া বর্দ্ধিত করে। আমি দেখিয়াছি কোকিল শাবক বড় হইয়া তাহার স্বাভাবিক ডাক ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে—তখনও কাকদম্পতি তাহাকে পরিশ্রম করিয়া আহার্য্য যোগাইতেছে। আমার মনে হয় শাবকোৎপাদন ব্যাপারটাই ইহাদের একটা প্রবল স্বাভাবিক প্রেরণা বা অন্ধ instinct এবং তাহাতেই মত্ত হইয়া থাকে বলিয়া উক্ত প্রবঞ্চনা ইহারা ধরিতে পারে না।

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

ভিক্ষুণী

'ভিক্ষুণী' শব্দটী পালি ভাষা হইতে গৃহীত। যে সমুদয় স্ত্রীলোক সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতেন, তাঁহাদিগকেই ভিক্ষুণী বলা হইত। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে জগতে কোন সময়ে নারীগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই বা তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই। মহাত্মা বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগকে এই অধিকার দিয়াছিলেন। আর তিনিও স্বেচ্ছাক্রমে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে নারীগণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। মহাপ্রজাপতীর বিশেষ আগ্রহে এবং আনন্দের অনুরোধে ও যুক্তিতে তাঁহাকে এই বিষয়ে মত দিতে হইয়াছিল। ঘটনাটী বিনয়-পিটকে বর্ণিত আছে। আমরা এই গ্রন্থ হইতেই নিম্নলিখিত অংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম:—

ভগবান বুদ্ধ এক সময়ে শাক্যগণের মধ্যে কপিলাবস্তুতে নিগ্রোধারামে বাস করিতেছিলেন। ভগবান্ যে স্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, মহা প্রজাপতী গোতমী সেই স্থলে উপস্থিত

হইলেন এবং ভগবান্‌কে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে স্থিতি করিলেন। একপ্রান্তে অবস্থিতি করিয়া মহাপ্রজাপতী গোতমী ভগবান্‌কে এই প্রকার বলিলেন :—

"ভদন্ত! নারীগণ তথাগত (=বুদ্ধ) প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিনয়ে গৃহত্যাগ করিয়া অগৃহস্থরূপে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন, এ বিষয়ে ভগবানের অনুমতি পাইলে ভাল হয়।"

বুদ্ধ বলিলেন :—

"গোতমি! তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিনয়ে গৃহত্যাগ করিয়া অগৃহস্থরূপে নারীগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন, তোমার এ প্রকার অভিরুচি না হউক।"

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার মহাপ্রজাপতী গোতমী ঐ প্রকার প্রার্থনা করিলেন। ভগবান বুদ্ধও ঐ একই উত্তর দিলেন।

নারীগণের প্রব্রজ্যা অবলম্বন বিষয়ে ভগবান্ অনুমতি দিলেন না, এইজন্য মহা প্রজাপতী দুঃখিতা, দুর্ম্মনা এবং অশ্রুমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্‌কে অভিবাদন-পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ কপিলাবস্তুতে যথেচ্ছকাল বাস করিয়া বৈশালী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বৈশালীতে উপনীত হইয়া ভগবান্ মহাবনের কূটাগারশালাতে অবস্থান করিলেন। এদিকে মহাপ্রজাপতী গোতমী কেশ ছিন্ন করাইয়া, কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া বহু শাক্য নারীসহ বৈশালী অভিমুখে গমন করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত কূটাগারশালাতে উপস্থিত হইলেন। মহা-প্রজাপতী স্ফীতপদে, ধূলিপূর্ণ গাত্রে দুঃখী দুর্ম্মনা এবং অশ্রুমুখী হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বহির্ভাগে দ্বারকোষ্ঠ প্রান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন।

আয়ুষ্মান্ আনন্দ তাঁহাকে এই অবস্থায় অবস্থিত দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"হে গোতমি! তুমি কেন এই অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছ?"

গোতমী বলিলেন—"নারীগণ ......প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন, ইহাতে ভগবান্ অনুমতি দিলেন না।"

আনন্দ বলিলেন—"গোতমি! তুমি মুহূর্ত্তকাল এই স্থলে অপেক্ষা কর, আমি ভগবান্‌কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবান্ সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে অবস্থিতি করিলেন। তদনন্তর ভগবান্‌কে বলিলেন :—

"মহাপ্রজাপতী গোতমী স্ফীতপদে ধূলিপূর্ণ গাত্রে দুঃখী দুর্ম্মনা এবং অশ্রুমুখী হইয়া বহির্ভাগে দ্বারকোষ্ঠপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, কারণ ভগবান্ নারীগণকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে অনুমতি দেন নাই। এ বিষয়ে ভগবান্ যদি অনুমতি দেন তাহা হইলে ভাল হয়।"

ভগবান্ বলিলেন :—

"আনন্দ! এ বিষয়ে তোমার অভিরুচি না হউক।"

আনন্দ দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার ঐ প্রকার বলিলেন এবং ভগবানও ঐ একই প্রকার উত্তর দিলেন।

তখন আনন্দ মনে মনে চিন্তা করিলেন—"ভগবান্ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইহাদিগকে

অনুমতি দিলেন না। আমি এখন অন্য কারণে অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারি।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভগবান্‌কে বলিলেন :—

'নারীগণ যদি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তবে তাঁহারা কি স্রোতাপত্তিফল, সকৃতাগামিফল, অনাগামিফল এবং অর্হত্বফল লাভ করিতে সমর্থ হন্ না?"

আনন্দ যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার একটুকু ব্যাখ্যা আবশ্যক। বুদ্ধ সাধনমার্গকে স্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যিনি এই স্রোতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার নাম "স্রোতাপন্ন"। তাঁহার অবস্থার নাম "স্রোতাপত্তি"। সাধনের ইহাই প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থার সাধকের নাম "সকৃতাগামী"। সকৃতাগামী সাধককে পৃথিবীতে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তৃতীয় অবস্থার সাধকের নাম "অনাগামী"। ইহাকে আর পৃথিবীতে আগমন করিতে হয় না। যিনি চতুর্থ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার নাম "অর্হৎ"। ইনিই নির্ব্বাণ লাভ করেন।

আনন্দ বুদ্ধদেবকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই—

নারীগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে তাঁহারা এই চারি অবস্থা লাভ করিতে পারিবেন কিনা এবং এই চারি অবস্থার ফলপ্রাপ্ত হইবেন কি না। ভগবান্ বলিলেন—"হাঁ, আনন্দ! ইহারা...ইহার ফললাভ করিতে সমর্থ।"

তখন আনন্দ বলিলেন—

"স্ত্রীলোক যখন এই প্রকার ফললাভে সমর্থ, এবং মহাপ্রজাপতী গোতমী যখন ভগবানের মাতৃস্বসা এবং জননীর মৃত্যুর পরে যখন ভগবান্‌কে তিনি পালন করিয়াছিলেন এবং স্তন্যদুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন, তখন স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার অনুমতি দিলে ভাল হয়।"

ভগবান্ বলিলেন—

"আনন্দ! মহাপ্রজাপতী গোতমী যদি আটটী 'গুরুধর্ম্ম' প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হয়েন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে উপসম্পদা (অর্থাৎ দীক্ষা) দিতে পারি।"

ইহার পর মহাপ্রজাপতীকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মের আটটী প্রধান নিয়ম প্রতিপালন করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাহার পর তাঁহাকে ভিক্ষুণীরূপে গ্রহণ করা হইল। মহাপ্রজাপতীই প্রথম "ভিক্ষুণী"।

বুদ্ধদেব অনিচ্ছার সহিত এ বিষয় মত দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন স্ত্রীলোকগণ যদি তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাধনমার্গ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সেই সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন এবং তাঁহারাও নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ।

আনন্দ মহাপ্রজাপতীর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি সাহায্য না করিলে, নারীগণ এই অধিকার পাইতেন কিনা সন্দেহ।

মহাপ্রজাপতীর আগ্রহ এবং দৃষ্টান্ত অতুলনীয়। বুদ্ধদেব যখন তাঁহাকে প্রথমে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে অনুমতি দিলেন না, তখন তিনি মস্তক মুণ্ডন করিলেন, কাষায় বস্ত্র গ্রহণ

করিয়া ভিক্ষুবেশ ধারণ করিলেন এবং বহুনারী সহ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এ সমুদয়ের অর্থ কি? বুদ্ধদেব যদি নারীজাতিকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার অধিকার না দিতেন, মহাপ্রজাপতী কি স্বয়ং একটী ভিক্ষুণী সম্প্রদায় গঠন করিতেন? ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

রুদ্রের আহ্বান

আজি রুদ্রের রথ থেমেছে তোদেরি অঙ্গনে
ওরে পুরবাসি, তোরা সবে তার সঙ্গ নে,'
'ওই দুর্দম, এসেছে নিঠুর,
মোহ-নিদ্রায় করি দিতে দূর,
শোন্ তোরা আজি তাহারি ধনুর টঙ্কনে,
রথ থেমেছে রে অঙ্গনে।

এতকাল তোরা শুয়েছিলি সুখ-শয়নে,
কেটে গেছে কাল স্বপনের জাল বয়নে,
সে দিনের আজ হল অবসান,
ওই শোন কাণে ভৈরব তান,
তা'হলে তোদের নিদ্ টুটে যাবে নয়নে,—
এত কাল ছিলি শয়নে।

ভেবেছিলি বুঝি কেটে যাবে কাল আলসে,
চাঁদিমা বুঝিরে চিরদিন দেবে আলো সে,
ফুল, মধু, আর মলয় বাতাস,
প্রেম, বিরহের বৃথা হা হুতাশ,—
ভেবে কিবা হবে,—যাবে দিন হেন লালসে,
কেটে যাবে কাল আলসে।

সে সুখ স্বপন সবি বুঝি আজি টুটল,
নভ-অঙ্গনে রক্তিম আভা ফুটিল,
রুদ্রের সেই আলোক-ছটায়
সুখ-নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটায়,
মনে হয় বুঝি—এ কি দুর্গ্রহ জুটল!
সুখের স্বপন টুটিল!

নিদ্ পরিহরি দেখরে সকলে চাহিয়া,
নহিলে এখনি সময় যাইবে বহিয়া,
রুদ্রের ওই শঙ্খের রবে
সবারি যে আজ সাড়া দিতে হবে,
উচ্চকণ্ঠে তাহারি বিজয় গাহিয়া,
দেখ্ রে সকলে চাহিয়া।

রুদ্র আজিকে এসেছে দীপ্ত বরণে,
ভয় নাই কিছু, লওরে উহার শরণে,
কর্ম্মের পথে, আলস ঘুচায়ে
রুদ্রের ডাকে শিরটী উঁচায়ে,
বাহিরিবি যবে, তখনি জিনিবি মরণে;
এসেছে দীপ্ত বরণে।
আয় এই শুভ লগনে।

শ্রীবিজয় সেন গুপ্ত

সমসাময়িক কথা

৫

সেকালের শিশুশিক্ষা।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় আমার যথারীতি "বিদ্যারম্ভ" বা হাতেখড়ি হয়। বাবা তখন বরিশালে কোটেরহাটে মুন্সেফী করেন। আমাদের গ্রামের পুরোহিত সে সময়ে কোটেরহাটে ছিলেন। তাঁর হাতেই আমার বিদ্যারম্ভ হয়। ষাট বৎসর পরে আজিও সে সময়ের ঘটনাগুলি পরিষ্কার মনে আছে। একদিন প্রাতঃকালে আমি নূতন কাপড় পরিয়া তাঁহার কাছে একখানা আসনে যাইয়া বসিলাম। তিনি সরস্বতীর স্তব পড়িয়া আমার হাত ধরিয়া "আঞ্জী," ক, খ, লিখাইয়া দিলেন। আজিকার লোকেরা বোধহয় এই "আঞ্জীর" কথা কিছুই জানেন না। ঐ বস্তুটা যে কি আমিও এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। এই আঞ্জী ইংরাজী বর্ণমালা S'এর মতন। সংস্কৃত বা বাংলা বর্ণমালায় কোথাও এই আঞ্জীর কোনও পরিচয় পাই নাই। লেখাপড়ার কোথাও আঞ্জীর ব্যবহার হয় না, কিন্তু আমার বিদ্যারম্ভের পরে কিছুদিন ধরিয়া বর্ণমালা লিখিবার বা আবৃত্তি করিবার সময় এই আঞ্জী দিয়া আরম্ভ করিতে হইত। আমার মনে হয় যে এই আঞ্জী একটা মাঙ্গলিক চিহ্ন বা শব্দমাত্র ছিল। বড় হইয়া মনুতে পড়িয়াছি যে ব্রাহ্মণ কোনও বিষয় লিখন-পঠনের আদিতে ওঁ লিখিবেন বা উচ্চারণ করিবেন। এই ওঁ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শব্দ। উপনিষদে এই ওঁকে অক্ষর বা অবিনাশী এবং পরম আশ্রয় বলিয়াছেন। ইহাই জীবের শ্রেষ্ঠ অলম্বন। এই 'ওঁ'কে জানিয়া জীব ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হয়। কিন্তু সেকালের রীতি অনুসারে ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই বাংলাদেশে অন্য কোনও জাতির বেদ পড়িবার অধিকার ছিল না। সুতরাং ওঁ লিখিবার বা উচ্চারণ করিবারও অধিকার ছিল না। এই আঞ্জীটা কি ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্যবহারের জন্য বৈদিকে ওঁ এর একটা চিহ্নমাত্র ছিল? এই প্রশ্নটা অনেক বার মনে উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার সদুত্তর আজি পর্য্যন্ত পাই নাই।

এই বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠানের পরে আমার লেখাপড়ার সঙ্গে পুরোহিত মহাশয়ের আর কোনও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। বাবাই আমার শিক্ষার ভার নিজে গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকটে আমার বর্ণপরিচয় হয়। তিনি হাতে ধরিয়া আমাকে ক, খ লিখাইতে শেখান। সন্ধ্যার পরে কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিদিন আমাকে কোলে বসাইয়া সংস্কৃত শ্লোক শিখাইতেন। সে সকল শ্লোকের কিছু কিছু এখনও মনে আছে। একটী শ্লোক ছিল—রামঃ রামঃ হরে রামঃ শ্রীরামঃ কমলাপতি। এ ছাড়া চাণক্য নীতির অনেকগুলি শ্লোক তাঁহার নিকটে শিখিয়াছিলাম। সে কালের বয়স্কদিগের সভাতে পরিবারের বালকদিগকে এ সকল শ্লোক আবৃত্তি করিয়া নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে হইত। আমাকেও বাবার বৈঠকে তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের নিকটে এ অভিনয় করিতে হইত। বর্ণ-পরিচয় লাভ হইলে পরে শিশুবোধ পড়িতে আরম্ভ করি। তখনও মদন মোহন

তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় বাংলার সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। শিশুবোধই শিশুপাঠ্য ছিল। এই শিশুবোধে কি কি ছিল সব মনে নাই; কিন্তু অনেকগুলি চাণক্যশ্লোক এবং তাহার বাংলা অনুবাদ ছিল, এ কথা মনে আছে। "হংস মধ্যে বকো যথা," "স্বদেশে পূজ্যতে রাজন, বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে"—এ সকল কথা শিশুবোধেই পড়িয়াছিলাম। আর পড়িয়াছিলাম দাতা কর্ণের কথা—

পক্ষীমাংস মৃগমাংস যেবা রুচি হয়
কোন্ মাংস আনি দিব কহ মহাশয়।

দাতা কর্ণের কাহিনী জীবনে ভুলিবার নহে। মনে হয় যেন শিশুবোধে নামতা এবং শুভঙ্করীও ছিল। এইরূপে বর্ণ-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশুবোধেই প্রথমে কিছু কিছু গণিতও শিখিয়াছিলাম। গণিতের একটা ফাঁকির কথা এখনও মনে আছে। আর আমি বহুদিন পর্য্যন্ত যে এই ফাঁকিটি ধরিতে পারি নাই, এ কথাও ভুলিয়া যাই নাই। দেড়কুড়ি শিয়ালের ত্রিশটা ল্যাজ, প্রত্যেক শিয়ালের কটা হইল? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে বহুদিন লাগিয়াছিল। আর এই জন্য অনেকবার মূর্খ, নির্ব্বোধ প্রভৃতি উপাধিও বাবার নিকটে পাইয়াছিলাম। সে কালে হাতের লেখার উপরে জ্যেষ্ঠদিগের অত্যন্ত বেশী দৃষ্টি ছিল। বর্ণপরিচয় লাভ করিলে বাবা প্রতিদিন কতকগুলি লেখা মক্স করিবার জন্য দিতেন। কিছুদিন পরে শিশুবোধের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গভর্ণমেণ্ট-গেজেটও পড়িতে আরম্ভ করি। প্রায়ই বাবা কাছারি যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, এবং তাঁর এজলাসেই একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিতেন। তিনি যখন মামলার বিচার করিতেন, আমি সে সময়ে তাঁহার পাশে বসিয়া নীরবে গভর্ণমেণ্ট-গেজেটের পাতা উল্টাইতাম।

৬

বাল্য-শিক্ষা

আমার বয়স যখন আট কি নয় বৎসর, তখন বাবা মুন্সেফী ইস্তাফা দিয়া আমার লেখা-পড়ার সুবন্দোবস্ত করিবার আশায় শ্রীহট্টে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। আমি কোনও বাংলা স্কুলে পড়িতে যাই নাই। শ্রীহট্টে আসিলে বাবা প্রথমে ফার্শী শিখিবার জন্য আমাকে এক মৌলবীর নিকটে পাঠাইয়া দেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহার কাছে যাইয়া ফার্শী শিখিতে আরম্ভ করি। কিন্তু আলেফ্, বে, তে, ছে'র পরে সাহনামার দুই এক পৃষ্ঠার বেশী আমার ফার্শী পড়া হইল না। তিন চার মাসের মধ্যে মৌলবী সাহেবের পাঠশালা ছাড়িয়া একেবারে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। ফার্শী পড়িতে পারি নাই বলিয়া তখন কোনও দুঃখ হয় নাই, কিন্তু এখন সেজন্য বড় আপশোষ হইতেছে। ফার্শী সাহিত্যের মহিমা যে কি, তখন ইহা জানিতাম না, তাহার মর্য্যাদাবোধের বয়সও তখন হয় নাই। এ সকল কথা জানিয়া অবধি, অত তাড়াতাড়ি ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম বলিয়া মাঝে মাঝে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

১৮৬৬ ইংরাজীতে আমার ইংরাজীশিক্ষা আরম্ভ হয়। সে সময়ে শ্রীহট্টে কোনও সরকারী স্কুল ছিল না। খৃষ্টান পাদ্রীদের একটা স্কুল ছিল। এই পাদ্রীরা ওয়েল্‌স্ মিশন (Wales Mission) ভুক্ত ছিলেন। রেঃ ডবলিউ প্রাইস্ নামে একজন অতি সদাশয় ও সহৃদয় পাদ্রী ইস্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেকালের লোকের মুখে ইহাঁর প্রশংসা ধরিত না। শ্রীহট্টের প্রথম ইংরাজি নবীশের দল সকলে ইহাঁর ছাত্র ছিলেন। কলিকাতার প্রথম ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরা ডেভিড্ হেয়ারকে যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন শ্রীহট্টের প্রথম ইংরাজী নবীশের দল প্রাইস্ সাহেবকে সেইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি ছাত্রদের কেবল শিক্ষক ছিলেন না, তাহাদের অকৃত্রিম বন্ধুও ছিলেন, আপদে-বিপদে তাহাদের সাহায্য করিতেন। আমি যখন এই পাদ্রী স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হইলাম, প্রাইস্ সাহেব তখন বুড়া হইয়া গিয়াছেন; তবে মনে হয় যেন সাধারণভাবে স্কুলের কাজের তত্ত্বাবধান মাত্র করিতেন। ৺ জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ১৮৬৫ ইংরাজীতে জয়-গোবিন্দ বাবু একই সঙ্গে বি, এ, ও এম, এ, পাশ করেন। জয়গোবিন্দ বাবু খৃষ্টিয়ান ছিলেন। শ্রীহট্টেই তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসনও ছিল। প্রাইস্ সাহেবের নিকটেই তিনি ইংরাজী শিখিয়া-ছিলেন, এবং শ্রীহট্টের মিশন-স্কুল হইতেই এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায় ডফ্ সাহেবের কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন। আমার বোধ হয় প্রাইস্ সাহেবের নিকটেই তিনি খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষালাভ করেন। জয়গোবিন্দ বাবু বেশীদিন শ্রীহট্টে ছিলেন না। বি, এল পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি কলিকাতার বাঙ্গালী খৃষ্টান সমাজের শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন। ৺ কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল। ডফ্ কলেজে কালীবাবু জয়গোবিন্দ বাবু সতীর্থ ছিলেন। দুই বন্ধুতে মিলিয়া আমরণ বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ান সমাজের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। "ইণ্ডিয়ান খৃষ্টিয়ান্ হেরাল্ড" নামে ইহাঁদের একখানা সাপ্তাহিক পত্র ছিল। জয়গোবিন্দ বাবুই ইহার সম্পাদক ও সত্বাধিকারী ছিলেন। দুই বৎসরকাল আমি শ্রীহট্টের পাদ্রী-স্কুলে পড়ি। তার পর শ্রীহট্টের হিন্দু সমাজের সঙ্গে এই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। বিরোধের কারণটা কি ছিল ঠিক মনে নাই। হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠীরা একজোটে পাদ্রীদের স্কুল হইতে নিজেদের অধীনস্থ বালকদিগকে ছাড়াইয়া আনিয়া আর একটা স্কুল স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। আমিও পাদ্রী-স্কুল ছাড়িয়া আসি। সেকালে একটা উচ্চ-শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল চালান সোজা কথা ছিল না। ছাত্রবেতন দিয়া সকল খরচ কুলান অসম্ভব ছিল। হিন্দুসমাজের কর্ত্তারা দেখিলেন যে তাঁহাদের পক্ষে স্থায়ীভাবে পাদ্রী স্কুলের পাশাপাশি আর একটা উচ্চ-শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল রাখা অসম্ভব হইবে। সুতরাং তাঁহারা শ্রীহট্টে যাহাতে একটা সরকারী স্কুল স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাদ্রীদের স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শ্রীহট্টে একটা সরকারী স্কুল ছিল। ঐ স্কুল বোধ হয় শ্রীহট্টে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করে। পাদ্রীদের স্কুল স্থাপিত হইবার পরে গভর্ণমেণ্ট অনাবশ্যক বোধে সেই স্কুলটী তুলিয়া দেন। এখনে ছাত্র-সংখ্যাও বাড়িয়াছে। পাশাপাশি দুইটা স্কুলও বা চলিতে পারে; বিশেষতঃ পাদ্রীদের স্কুলে লোকের

ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং ধর্ম্মাচরণের উপরে হাত দেওয়া হয় বলিয়া অনেকে সেই স্কুলে নিজেদের বালকদিগকে পাঠাইতে রাজী নহেন; এই সকল কারণ দেখাইয়া সহরের লোকে গভর্ণমেন্ট-স্কুলের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। বাবা এই আন্দোলনের একজন প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে ১৮৬৯ ইংরাজীতে শ্রীহট্টে বর্ত্তমান গভর্ণমেন্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। সে দিন হইতে আমিও এই স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করি।

পাদ্রীদের স্কুলে তখন জয়গোবিন্দ বাবু প্রধান শিক্ষক ছিলেন না। এই গোলমালের পুর্ব্বেই বোধ হয় তিনি শ্রীহট্ট ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। ১৮৭১ ইংরাজীতে বি, এল, পাশ করিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য শ্রীহট্টে যাইয়া ওকালতী করেন। কিন্তু শ্রীহট্টের সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় তিনি পাদ্রী-স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন না। জয়গোবিন্দ বাবু ঐ স্কুল ছাড়িয়া আসিবার পরে শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার বসু তাঁহার পদে নিযুক্ত হয়েন। গভর্ণমেন্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় দুর্গাকুমার বাবুই নূতন স্কুলে আমাদের হেড-মাষ্টার হইলেন। সারা জীবনটা অতি দক্ষতার সঙ্গে হেডমাষ্টারী করিয়া দুর্গাকুমার বাবু "রায় সাহেব" উপাধি লাভ করেন। ত্রিশ বত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া দুর্গাকুমার বাবুই শ্রীহট্টে ইংরাজী শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম গুরু হইয়াছিলেন। পেন্‌সন্ লইয়া তিনি এখন ঢাকায় বাস করিতেছেন।

আমার বাল্য শিক্ষকদিগের মধ্যে দুর্গাকুমার বাবুর নিকটেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঋণী। তাঁর পদতলে বসিয়া যে ইংরাজী শিখিয়াছিলাম, তাহারই জোরে ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারিতেছি। এখনকার ইংরাজী-শিক্ষার প্রণালী জানি না। এযুগের ছেলেদের মুখে যাহা শুনিতে পাই, তাহাতে মনে হয় আজকাল স্কুলে আগেকার মতন ইংরাজী শেখান হয় না। দুর্গাকুমার বাবু কেবল শব্দার্থ শিখাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের ধাত্বর্থও শিখাইতেন। কোন্ মূল ধাতু হইতে কোন্ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে সেই ধাত্বর্থ অবলম্বন করিয়া কোন শব্দ কিরূপে ব্যাপক অর্থ লাভ করিয়াছে, এসকল শিখাইবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বিশপ ট্রেঞ্চের ইংরাজী শব্দের ইতিহাস বা History of Words দুর্গাকুমার বাবু তাঁহার ছাত্রদিগকে অত্যন্ত যত্ন করিয়া পড়াইতেন। এখানি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের তালিকাভুক্ত ছিল না। কিন্তু ইংরাজী শব্দের ধাতুগত অর্থ এবং তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ না জানিলে ইংরাজী ভাষার কলকাটি কেহ মুঠার ভিতরে পাইতে পারে না। এই কলকাটিটা যার হাতে নাই, সে কখনও সে ভাষার মূল-প্রকৃতি এবং গঠনকে বজায় রাখিয়াও যথেচ্ছা তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। আর এই কলকাঠিটা হাতে না পাইয়া যারা এই বিদেশী ভাষা লইয়া খেলা করিতে যাইবে, তাদের ইংরাজী তখন ইংরাজের ইংরাজীর নকল হইবে, ইংরাজ নিজে যে ভাবে তার ভাষা ব্যবহার করে, সেই ভাবেই এই ভাষা ব্যবহার করিবে। আর এই জন্য তাহাকে ইংরাজের এসারত বিস্তৃতরূপে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হইবে, স্বাধীনভাবে কখনই সে এই ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবে না। দুর্গাকুমার বাবু ভাল করিয়া এ কথাটা বুঝিয়াছিলেন। এইজন্যতিনি আমাদিগকে অত্যন্ত যত্ন করিয়া ইংরাজি শব্দের ধাত্বর্থ এবং বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থের ঐতিহাসিক

পরিবর্ত্তন ও অভিব্যক্তি শিখাইয়াছিলেন। যদি আমার ইংরাজী লেখায় কোনও কিছু গুণ থাকে, তাহা আমার নিজের কৃতিত্বে নহে, কিন্তু দুর্গাকুমার বাবুর কৃপায়, এ কথাটা সর্ব্বদাই মনে করিয়া থাকি। এই চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর কাল আমি এবং আমার শ্রীহট্ট-স্কুলের সতীর্থেরা যেমন দুর্গাকুমার বাবুকে অকৃত্রিম ভক্তি করিয়া আসিয়াছি, সেইরূপ তিনিও আমাদিগকে অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের কাহারো কোনও কৃতিত্বের বা যশের কথা শুনিলে, দুর্গাকুমার বাবুর প্রাণটা এখনও গৌরবে ফুলিয়া উঠে। তিনিও আমাদিগকে ভুলেন নাই, আমরাও কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না।

ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলে বাবা আমার পড়াশুনার আর তত্ত্বাবধান করিতেন না। তিনি ইংরাজী জানিতেন না বলিয়া বোধহয় স্কুলের উপরেই আমার শিক্ষার সমুদয় ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। লেখাপড়ার জন্য বাবা কোনও দিন বেশী শাসন করেন নাই। তাঁর হাতে যা মারধর খাইয়াছি তাহা সদাচার শিক্ষা করিবার জন্য, বিদ্যা-উপার্জ্জনের জন্য নহে। বাবা দেশের প্রাচীন নীতি-অনুসারেই আমাকে লালনপালন করেন।

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ

প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ।

এই নীতি-শ্লোক আমার সম্বন্ধে তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আমি আদরের গোপাল হইয়াছিলাম। তার পর পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাবার নিকট এক দিনও বোধহয় শারীরিক সুস্থ অবস্থায় প্রকাশ্যভাবে কোনও আদর পাই নাই। ব্যেরামের সময় অন্য কথা। বাবার কঠোর শাসনে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতাম। তিনি কখন বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবেন, আর আমরা বালকের দল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিব সর্ব্বদা এই চিন্তাই করিতাম। ইহার ফলে পিতা-পুত্রের মধ্যে যে সহজ এবং স্বাভাবিক সৌহার্দ্দ্য গড়িয়া উঠা বাঞ্ছনীয়, আমার জীবনে তাহা গড়িয়া উঠে নাই। পিতা-পুত্রে সেরূপ ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্য থাকিলে পরে যত সহজে তাঁহার স্নেহের ডোর নির্ম্মমভাবে কাটিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম, তাহা সম্ভব হইত না। বাবার হাতে মার অনেক খাইয়াছি। দু'এক দিনের কথা এই দীর্ঘ-জীবনেও ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু লেখাপড়ার জন্য নহে, কেবল দুরাচার বা কদাচারের জন্যই এ সকল কঠোর শাস্তি ভোগ করিতাম। এক দিনের কথা উজ্জ্বলরূপে মনে আছে। তখন আমি ইংরাজী-স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। সেই সময়েই সর্ব্বপ্রথমে সোডা-ওয়াটার ও লেমনেডের কল শ্রীহট্টে যায়। দেশীয় লোকদিগের মধ্যে এই বিজাতীয় পানীয় বোধ হয় কেহই ব্যবহার করিতেন না। সৌখীন মুসলমানেরা সোডা, লেমনেড্ পান করিলেও হিন্দুদিগের নিকটে তাহা একেবারেই অপেয় ছিল। কলওয়ালা ভাবিল যে স্কুলের বালকদিগের মধ্যে বোধহয় এ বস্তু চালাইতে পারা যাইবে। স্কুলের ছুটীর সময় ধামা বোঝাই করিয়া সে সোডা, লেমনেড্ স্কুলে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আমরা বালকের দল উৎসাহসহকারে এই অপেয় পান করিতে লাগিলাম। এক দিনের লেমনেডের পয়সা আমার বাকী ছিল। দুই চারি দিন পরে ঠিক বাবার কাছারি যাইবার মুখে সেই ব্যক্তি আসিয়া আমাদের বৈঠকখানা-ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। কি কাজ, জিজ্ঞাসা করিলে, আমার সঙ্গে দেখা

করিতে চাহিল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? সে কহিল, স্কুলে লেমনেড্ খাইয়াছিলাম তাহার পয়সা বাকী আছে। তখন আমার ডাক পড়িল। আমি আসিয়া কবুল জবাব দিলাম। তখন এই ব্যক্তিকে তাহার পাওনা পয়সা দিয়া বিদায় দিয়া, বাবা আমাকে বেদম মারিলেন। পরদিন হইতে আমার স্কুল যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। লেখা-পড়া শিখিবার জন্যই আমাকে স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন, জাতি-ধর্ম্মনাশের জন্য নহে। এই স্কুলে যাওয়ার ফলে যখন আমি জাতিধর্ম্ম নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন এই সর্ব্বনেশে লেখাপড়া ত্যাগ করিতেই হইবে। এ সময়ে মা শ্রীহট্টে ছিলেন না। দেশের বাড়ীতে ছিলেন। প্রায় ছয় মাস পরে মা শ্রীহট্টের বাসায় ফিরিয়া আসিলে বোধহয় তাঁহার কথায় বাবা আবার আমাকে স্কুলে পাঠাইলেন।

আর একদিনের কথাও মনে আছে। সে সময়ে শ্রীহট্ট সহরে ভদ্রসমাজে মদ খাওয়া অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। সহরতলীর ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-কায়স্থেরা প্রায় সকলেই শক্তি-উপাসক ছিলেন। বাড়ীতে বাড়ীতে মদ চুয়ান হইত, এবং অনেকেই কালীনামে আকণ্ঠ পুরিয়া সেই মদপান করিতেন। প্রবাসী ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও একদল মদ্যপ ছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ আমাদের নিকট আত্মীয় কুটুম্বও ছিলেন। ইঁহাদের কীর্ত্তি কলাপ জ্যেষ্ঠদিগের মুখে আমরা বালকের দলও শুনিতে পাইতাম। একদিন মদ খাওয়া ও মাতলামি খেলা করিবার সখ হইল। আমি এবং আমার সঙ্গীগণ এক ঘটী জলে নুন গুলিয়া মদ প্রস্তুত করিলাম। এবং সুরা মনে করিয়া এই নোনা জল গ্লাস গ্লাস করিয়া পান করিলাম। তার পর মাতলামির অভিনয়। বাবা তখন কাছারিতে ছিলেন। সে সময় মাও শ্রীহট্টের বাসায় ছিলেন না। সুতরাং আমরা সব বাড়ীটা খোলা পাইয়াছিলাম। বাবা কাছারি হইতে আসিয়া চাকরদিগের মুখে আমাদের এই অভিনয়ের কথা শুনিলেন; এবং এজন্য আমাকে এমন ভাবে মারিলেন যে বোধহয় সেই মারের স্মৃতিই আমাকে জীবনভরা নানা অবস্থার মধ্যেও সুরার দিকে টানিয়া লইতে পারে নাই।

আর একদিনের কথাও মনে পড়িতেছে। আমাদের শ্রীহট্টের বাসায় প্রতি শনিবারে শনির সেবা হইত। চাল, কলা, দুধ ও চিনি দিয়াই শনির ভোগ দেওয়া হইত। শ্রীহট্টে শুক্রবার হাটবার ছিল। প্রতি শুক্রবারে হাট হইতে শনির সেবার জন্য খুব ভাল ভাল শকরী কলা আসিত। একদিন পুরোহিত সন্ধ্যার পরে শনির সেবা দিতে আসিলে পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত কলা আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বাবা কথাটা শুনিয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। চাকর কহিল যে সে ঠিকই বাজার হইতে কলা আনিয়াছিল; বোধহয় তাহা আমারই উদরস্থ হইয়াছে। অমনি আমার ডাক পড়িল। আমি কাছে যাইবামাত্রই বাবা উদ্যতদণ্ড হইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি ভয়ে দৌড় দিলাম। তিনিও আমাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। আমাদের এক হাতাতেই আমার এক পিস্তুত ভাইয়ের বাসা ছিল। আমি দৌড়িয়া তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। ভাগিনেয়-বধূর মুখ দর্শন সে কালের নীতি-বিগর্হিত ছিল, ঘটনাক্রমে দেখিলে মামাশ্বশুরকে স্নান করিতে হইত। বাবা ভাগিনেয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। আমিও সে যাত্রা তাঁহার উদ্যতদণ্ড হইতে রক্ষা পাইলাম।

আর একদিনের দণ্ডের কথাও বিশেষভাবে মনে আছে। সে ঘটনাটা বলিবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। তখন বোধ হয় আমার বয়স বার কি তের হইবে। এ সময়ে আমাদের বাসায় একটা নূতন পাকা পাইখানা তৈয়ারী হয়। কিন্তু রাজমিস্ত্রীর কাজ সবটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কে পাইখানাটা ব্যবহার করিয়া ময়লা করিয়া যান। পরদিন রাজমিস্ত্রীরা আসিয়া বাবার নিকটে এই ঘটনাটার এজাহার দেয়। এ অপকর্ম্ম আমি ছাড়া আর কে করিবে? বাবা সরাসরিভাবে ইহাই স্থির করিয়া লইলেন এবং এই জন্য আমাকে যথোপযুক্ত শাস্তিও দিলেন। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধী ছিলাম। মার খাইয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমে জানিলাম যে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাবার মক্কেল, এই কাজটা করিয়াছিলেন। বাবাকে আর সে কথা কহিলাম না; কিন্তু সেই মক্কেলটী আবার কবে আসেন তাহারই তাগেবাগে রহিলাম। একদিন রবিবার অপরাহ্নে তাহাকে পাইয়া তিনি যখন আমাদের বাসা হইতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সে সময়ে চারিটি পয়সা হাতে লইয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিয়া কহিলাম—আপনি সেদিন আমাদের নূতন পায়খানাটা সংস্কার করিয়া গিয়াছেন, তার দক্ষিণাটা দেওয়া হয় নাই—এই বলিয়া তাঁহার পায়ে পয়সা চারিটা ফেলিয়া ছুটিয়া পালাইলাম। এই প্রসঙ্গ তুলিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত আমরা অনেকবার আমোদ আহ্লাদ করিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল।

শিক্ষা-সমস্যা

রোজগারের নিকষে আমাদের বিদ্যাকে যাচাই করিয়া আসিয়াছি, তাই যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের অর্জ্জিত বিদ্যা কোনও প্রকারে আমাদের অন্ন যোগাইয়া আসিয়াছে, ততদিন আমরা বেশ নিশ্চিন্ত মনেই কাটাইয়াছিলাম। এই বিদ্যালাভ করিয়া আমাদের সৃজনী প্রতিভা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা জাগ্রত হইতেছে কিনা, আমাদের আচার ব্যবহার ও জীবনযাত্রা প্রণালীতে আমরা প্রকৃত শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছি কিনা তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি নাই। তাই আমাদের দৃষ্টি ছিল শুধু নৈপুণ্য লাভের efficiencyর দিকে, পূর্ণতার adequacyর দিকে আমরা মোটেই দৃষ্টি রাখি নাই। নিপুণ কারিগর, পটু কেরাণী, সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার ও কর্ম্মক্ষম স্কুল মাষ্টার তৈয়ারী করিবার যন্ত্রবিশেষ রূপেই আমরা শিক্ষাশালার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি।

শিক্ষাশেষে ছাত্রেরা যন্ত্রের মত কাজ করিয়া চলিতে পারে কিনা তাহাই দেখিয়া আসিয়াছি, তাহারা মানুষ হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার প্রয়াস পাই নাই। তাই পুঁথিগত আক্ষরিক বিদ্যা কতকটা মুখস্থ করিয়া ডিগ্রী অর্জ্জন করিয়া নিজেদের খুব শিক্ষিত মনে

করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু জোর করিয়া চোখ বুঁজিয়া থাকা আর কত দিন চলে? অন্নাভাবের তাড়নায় অস্থির হইয়া আমরা বুঝিয়াছি যে সুধা বলিয়া আমরা যাহাকে এত দিন পান করিয়া আসিয়াছি তাহা আমাদের জীবনে প্রাণশক্তিকে বাড়াইয়া তোলা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ আমাদিগকে নির্জ্জীব করিয়া ফেলিয়াছে।

তাই অভাবের তাড়নায় উন্মত্ত আমরা, দেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিকে গোলামী শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিলাম এবং তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিলাম কিন্তু নবশিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করিবার জন্য যতটা বুদ্ধি খরচ করিতে হয়, যে সৃজনী প্রতিভার প্রয়োজন হয়, তাহা দেশের মধ্যে সুপ্ত থাকিলেও, তাহাকে জাগাইতে যে শ্রম করিতে হয়, তাহাতে পরাঙ্মুখ আমরা, স্বভাবগত দাসমনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অনুরূপ আর একটি পদ্ধতি খাড়া করিয়া তাহাকে ন্যাশান্যাল এডুকেশন (জাতীয় শিক্ষা) নামে অভিহিত করিলাম। ১৯০৬ সালের এই জাতীয় শিক্ষা তাই আমাদের জাতীয় জীবনের সোণার কাঠি হইল না।

আবার মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে দেশে শিক্ষার আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে বটে, কিন্তু মনে হয়, আমরা আবার সেই পুরাতনেরই প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেছি। ভয় হয়, আমাদের এই আন্দোলনটা বুঝি একটা ফাঁকা আওয়াজ। অভাবের তাড়নায় বিব্রত হইয়া আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা পূরণের একটা নূতন প্রয়াস মাত্র। এই আন্দোলনের কর্ণধার যাঁহারা তাঁহাদের মনে শিক্ষা সম্বন্ধে আরও উচ্চতর আদর্শ থাকা খুবই সম্ভবপর স্বীকার করি; কিন্তু দেশব্যাপী শিক্ষাসম্বন্ধে এই গভীর অসন্তোষের অধিকাংশটাই যে অর্থ নৈতিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে অর্থকরী বিদ্যা (Vocational education) শিখাইবার জন্য এত প্রয়াস কেন? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে সেলাই ও কাঠের কাজ শিখাইবার বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন, অমনি চারি দিকে মহা সন্তোষের চিহ্ন দেখা গেল। কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত থাকা ভাল, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেটুকু ব্যবস্থাই কি চরম ব্যবস্থা? তাহা যদি না হয় তবে এত অল্পেই এ মহাসন্তোষ কেন? শিক্ষার আদর্শ যেখানে এতটা সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র সেখানে প্রকৃত শিক্ষামন্দির গড়িয়া তোলা দুরূহ ব্যাপার। আমাদের আন্দোলনটা যে অনেকটা ফাঁকা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, এখনও পর্য্যন্ত শিক্ষার একটা নূতন প্রণালী গড়িয়া উঠিল না। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, সে অনুভূত অভাব পূরণের প্রয়াস পায়। দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে যে গলদ আছে, তাহা আন্দোলনের উত্তেজনায় ফুটিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই, ধীরে ধীরে সাধারণের অজ্ঞাতে দেশের ভাবুক মনে প্রকাশ পাইতেছিল। তাই ভারতের নানা স্থানে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া নবশিক্ষাপদ্ধতি মূর্ত্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিল। গুরুকুল, বোলপুর, সত্যবাদী, মায়াপুরাম, কাল্লিকুলাম, জলন্ধর প্রভৃতি স্থানে নব নব শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, পুরাতন পদ্ধতিতে একান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া। অজানা নূতন পথের বিপদ আপদকে বরণ করিয়া লইবার সাহস যাঁহাদের মধ্যে ছিল, দেশের সেই সব নির্ভীক আগ্রহ প্রাণ প্রায় নিঃসহায় অবস্থায় রিক্তহস্তে নূতন প্রচেষ্টায়

আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় সাহায্য না লইয়া, রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা স্বীকৃত না হইয়াও যে, এই সকল শিক্ষাশালা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, দেশের কোনও না কোনও অভাব, এক একটি শিক্ষাশালা দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে। প্রয়োজন না থাকিলে, ইহাদের প্রসার সম্ভবপর হইত না। হইতে পারে যে, ইহাদের কোনও একটির দ্বারা আমাদের শিক্ষাসমস্যার মীমাংসা হইবে না, কিন্তু ইহা ধ্রুব যে, ইহাদের মধ্যে আমাদের এক একটি অভিনব আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তি পাইবার প্রয়াস পাইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাআন্দোলন যদি ফাঁকা আওয়াজ না হইয়া প্রকৃত আন্দোলন হইত, তাহা হইলে এই নূতন শিক্ষাশালাগুলির উৎপত্তি ও বিকাশের ধারাকে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচিত হইতে দেখিতাম। কোন্ প্রয়োজনে ইহাদের সৃষ্টি, সৃজিত হইয়া আমাদের সেই অভাব ইহারা কতটা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, কি পরিমাণেই বা ইহারা ব্যর্থ হইয়াছে, কেনই বা ব্যর্থতা ইহাদিগকে ক্ষুণ্ণ করিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। রবীন্দ্রনাথ, শ্রদ্ধানন্দ, অরবিন্দ, গোপবন্ধু, লজ্জাবতী ও অনিমানন্দ প্রভৃতি চিন্তাবীরেরা কোন কোন নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিলেন এবং তাহার সার্থকতা কোথায়, কোথায় বা তাহাদের অভাব ও অপূর্ণতা, তাহার বিশিষ্ট আলোচনা চলিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের কোনও মনীষিকে এরূপ আলোচনা করিতে দেখিলাম না। কিন্তু স্যাডলার সাহেবের অধিনায়কত্বে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার কমিশন বসিয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গলার নবশিক্ষাপ্রণালীগুলির আলোচনা দেখিতে পাইতেছি। রবীন্দ্রনাথ ও অনিমানন্দের প্রচেষ্টার অভিনবত্ব ইঁহাদের প্রখর দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই।

বোলপুর আশ্রমে বহু শিক্ষক আছেন। সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া, সম্যক আলোচনা কোনও ভারতীয় শিক্ষক করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু ইংরেজ শিক্ষক পিয়ারসন সাহেব বোলপুর আশ্রম সম্বন্ধে একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় জাড্য ও অলসতার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে? আমরা যে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীন, তাহার আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়, আমাদের তথাকথিত নিম্নজাতির শিক্ষাপ্রদান প্রচেষ্টার মধ্যে। আমরা তাহাদিগকে আক্ষরিক বিদ্যাদানের জন্য, কতকগুলি প্রাথমিক শিক্ষাশালা খুলিয়া আমাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়াছি। আক্ষরিক বিদ্যার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি; কিন্তু এই কাজেই কি আমাদের সমস্ত শক্তিকে ক্ষয় করিয়া ফেলা উচিত? আমাদের সাধ্য ও শক্তি অল্প; কাজে কাজেই তাহা খরচ করিবার সময় সবচেয়ে বেশী ফল কিসে পাওয়া যায়, সেই দিকেই সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শ্রেয়তমের পরিবর্ত্তে শ্রেয়ের জন্ম শক্তি ব্যয়, শক্তির অপচয়। গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জীবনের প্রসার যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা আমরা কতটুকু করিয়াছি? আমাদের গ্রামের কাথোয়ারী, গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপ, যাত্রা, কবি আখড়াই, হাফ আখড়াই, কথকতা প্রভৃতিকে শিক্ষার বাহন রূপে ব্যবহারের কোনও প্রকৃত চেষ্টা হইয়াছে কি? গ্রামের আউল, বাউল, ফকীর সন্ন্যাসী যাহাতে শিক্ষাদাতা হইয়া শিক্ষার প্রচারে লাগিতে পারেন তাহার কোনও বন্দোবস্তের চেষ্টা হইয়াছে কি? বিলাতী

Mass education এর আদর্শে প্রদর্শনী খুলিয়াছি, অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তির বশে ছায়াচিত্র ও সচলচিত্র লইয়া একটু আধটু শক্তির অপচয় ঘটাইয়াছি বটে, কিন্তু মেলা, হাট প্রভৃতি দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিকে শিক্ষার যন্ত্র রূপে ব্যবহার করিবার প্রয়াস কোথায়?

আমাদের স্ত্রীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার বন্দোবস্তও যেরূপ এলোমেলো তাহাতে মনে হয় যে আমরা আমাদের অভাব সম্বন্ধে এখনও সজাগ হই নাই। শিক্ষার মূলতত্ত্বে জাতি-ভেদ নাই, স্বীকার করি; নরনারীর সমান অধিকার ইহাও সত্য। কিন্তু সমান মানে কি একই রূপ না অনুরূপ? শিক্ষার ব্যবহারিক দিকেও কি পার্থক্য নাই? যে বিদ্যা নিজের আয়ত্তে থাকিলে ব্যবহারিক জীবনে সুবিধা হয়, তাহাকে অর্জ্জন না করিলে জীবনযুদ্ধে সাফল্য লাভ সম্ভবপর নহে। নারীর জীবনযাত্রা প্রণালী যখন কতকটা স্বতন্ত্র, তখন তাহার জীবনযাত্রা প্রণালী সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে, তাহার বিদ্যাশিক্ষা প্রণালীও কতকটা স্বতন্ত্র হওয়া স্বাভাবিক। এই পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কি আমাদের শিক্ষা প্রণালী গড়িয়া উঠিতেছে? তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে বলিব যে আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন।

আমার মনে হয় আমাদের সবচেয়ে অপরাধ শিশুদের শিক্ষার সম্বন্ধে। আমি শিক্ষক নই; কিন্তু আমার ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা বড় সুখের নহে। তাহা হইতে বুঝিয়াছি যে আমার মত বহু লোকের জানার-আনন্দ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি চিরকালের জন্য হরণ করে। শিক্ষাশালায় যাইবার নামে অনেক শিশু ভীত হইয়া উঠে। শিক্ষা প্রণালীর দোষে আমরা তাহা এতই ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছি!

শিশুই যাহার জীবনের আনন্দ, শিশুমনের সহিত যাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, যিনি শিশুর খেলার সাথী, এমন লোকের উপরে কোথায় শিশুদিগের শিক্ষার ভার থাকিবে, না তাহার পরিবর্ত্তে সস্তায় কাজ সারিবার লোভে, জীবনে যাহার কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই, আত্মার প্রসারে যাহার আনন্দ নাই, দিনগত পাপক্ষয় যাহার জীবনের জপমন্ত্র, এমন লোককে পয়সার চাকর করিয়া শিশুদিগের ভার অর্পণ করিয়া কাজ আদায়ের চেষ্টা করি। যাহার নিজের জীবনের কোনও ভিত্তি নাই, সুন্দরের প্রতি যাহার স্বাভাবিক টান নাই, গতানুগতিক জীবন যাপন যাহার স্বভাব, তাহার হাতে শিশুজীবন কিরূপে গড়িয়া উঠিবে? আমাদের এই নিদারুণ অত্যাচার—এই চিন্তাহীন অপকর্ম্মের ফলে যে শিশু জীবনের সমস্ত আনন্দ নষ্ট হইয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বাঙ্গলাদেশের বালক বালিকার মুখে হাসির রেখা দেখা যায় না। এই নিদারুণ শিক্ষা-পদ্ধতির পর তাহাদের মুখে আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া না উঠিবারই কথা।

শিক্ষাজীবনের প্রতি আমাদের এই বিরাট ঔদাসীন্যের মধ্যেই আমাদের মৃত্যুবাণ রহিয়াছে। আমরা যদি নির্ভয়ে আমাদের এই শিক্ষা সমস্যার সম্মুখীন হইয়া আমাদের মৃত্যু-বাণকে অপসারিত করিয়া প্রকৃত শিক্ষার বীজ রোপণ করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রসার হইবে, আমাদের নির্ভীক আত্মা স্বরাট হইবে, আমাদের স্বরাজ্যসাধন সফল হইবে।

শ্রীবনবিহারী গুপ্ত।

ভুলের ফসল

কিছু দিন আগে ফিজিদ্বীপ প্রত্যাগত এক বাঙ্গালী যুবক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ইনি সেখানে চাকুরী লইয়া গিয়াছিলেন। কাজ ছাড়িয়া দেশে ফিরিবার সময়, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ড হইয়া ফিরিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আর বিদেশীদের স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা করিবেন না, যাহাতে দেশে ধন ধান্য বৃদ্ধি হয় সেই চেষ্টা করিবেন। নানা প্রকার আন্তর্জাতিক আলোচনা চলিতেছিল। বহির্জগতের সহিত তুলনামূলক সমালোচনায় আমাদের জাতীয় দুর্গতির মূল খুঁজিতেছিলাম। সাত বৎসর বয়সের নাতি আমাদের তর্ক বিতর্ক শুনিতে শুনিতে বাল-সুলভ বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিল— "এ সকল কথা ভাল লাগে না, একটা ভাল গল্প বলুন।" অতিথি ভাল গল্প জানেন না বলায়, বালক বিরক্ত হইয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিল; কিন্তু আমাদের চিন্তাস্রোত ভিন্ন প্রণালীতে চালিত করিয়া দিয়া গেল। আমি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের (Wordsworth) এক লাইন আওড়াইয়া বলিলাম—"Child is the father of man", অর্থাৎ পরিণত বয়সের গুণাদির অঙ্কুর শৈশবেই প্রকাশ পায়। বালকের স্থানান্তরে যাওয়ার এই কথাই প্রমাণ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত হইল যে, বহু সু-লেখকগণের চিন্তাধারা গল্পচ্ছলে প্রচার হইতে আরম্ভ হওয়ার, ঔপন্যাসিক সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইলে ও নভেল বা গল্পগুচ্ছ ভিন্ন অন্য অন্য বিষয়ের বহি বা মাসিক পত্রিকা যে আমাদের অন্তঃপুরে স্থান পাইতেছে না ইহা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী।

এই প্রকার কথোপকথনের কয়েক দিন পরে "ভুলের ফসল" উপহার পাইলাম। পড়িয়া দেখিলাম যে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া গল্পচ্ছলে কৃষি ও সমবায়ের সাহায্যে নষ্ট পল্লীশ্রী কি প্রকারে পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে তাহার পন্থা দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। কৃষিবিভাগের প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর পক্ষে এই প্রকার মতবিস্তারের পরিকল্পনা মামুলি ধরণের চেষ্টা বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে; কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যিনি স্বচক্ষে পল্লীবাসীর গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট দেখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে (Back to the land) 'ভুঁয়ের ফিরে যাওয়া' এই মন্ত্রের যথাবিধি প্রয়োগ সমীচীন বলিয়াই মনে হইবে। দেবেন্দ্রবাবু চাহেন (১) মহাজনের কবল হইতে দরিদ্র কৃষককুলকে উদ্ধার করিতে এবং (২) শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে কায়িক পরিশ্রমের মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া ক্ষেত্রস্বামী (Farmer) প্রস্তুত করিতে। বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। আমাদের বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং কৃষিলব্ধ আয়ের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়ঃ। এই দুই বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবুর সহিত আমাদের মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থা সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে তাহা বলিতেছি।

(১) যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মরাজকে বলিয়াছিলেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

* ভুলের ফসল। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, জি, প্রণীত মূল্য দশ আনা।

এই বাক্য স্মরণ করিয়া যে পথে গেলে "মহাজন" উপাধি লাভ হইতে পারে, মনুর মতে "কুসীদ পথ" বলিয়া নিন্দনীয় হইলেও কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কি বিশ্ববিদ্যালয় ফেরতা কিছু টাকা সঞ্চয় হইলেই, সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে "মহাজনে" দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। তেজারতি কারবার বাঙ্গালী গৃহস্থের একমাত্র লাভজনক ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাষীদের মধ্যে মহাজনের চিত্র অঙ্কিত করিতে দেবেন্দ্র বাবু বেশ রং ফলাইয়াছেন। সে চিত্র পাঠকগণের সম্মুখে ধরিতেছি :—

"এহেন নিমাই ছিলেন চাষী; হাল গরু জমি জমা নিয়ে চাষ নয়। নিমাই চষ্‌তেন লোকের বাস্তু-ভিটে, আর সেঁচ দিবেন তাদের বুকের রক্ত, রুইতেন রূপোর গুঁড়ো—তাইতে ফলতো থলো থলো টাকার তোড়া। এই রকমে অনেককে উদ্বাস্ত করে, তাঁদের ভিটেয় সরসে বুনে, ঘুঘু চরিয়ে, এই মহাপুরুষ আর একটি নাম কিনে ছিলেন মহাজন"।

এ চিত্র যে খুব অতিরঞ্জিত ইহা বলিতে পারি না, কেন না প্রতি গ্রামেই নিমাই পালের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বিচরণ করিতে দেখা যাইতেছে। এখন কথা হচ্চে—এ হেন নিমাই পালদের কপর হইতে নিরক্ষর দরিদ্র প্রজাবৃন্দকে বাঁচান যায় কি প্রকারে? এ রোগের ঔষধই বা কি? দেবেন্দ্র বাবু কোঃ অপারিটিভ কৃষি ব্যাঙ্ক সর্ব্বরোগহর মহৌষধ মনে করেন, কিন্তু আমি এই ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইতেছি না বলিয়া রোগের নিদান খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। কৃষিবিজ্ঞান ও কোঃঅপারেটিভ সোসাইটি খোলায় শিক্ষিত যুবকদের চাকুরীর একটা নূতন দ্বার খুলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু জমাখরচ মিলাইয়া দেখিলে জমার ঘরে অঙ্কপাত বড় একটা দেখা যাইতেছে না। তবে প্রচার কার্য্য চলিতেছে, এই যা সামান্য লাভ। ডেনমার্কে সমবায় সমিতির সাহায্যে কি প্রকারে অন্ন সমস্যার সমাধান হইয়াছে, মিঃ চণ্ডিকা প্রসাদের পুস্তকে তাহা পড়িয়াছি, আয়ারলণ্ডে স্যার হরেস প্লানকেট (Sir Horace Plun Kett) এক ভাবে কৃষিসমবায় আন্দোলন (Agricultural, co-operative movement) চালাইয়াছিলেন তাহার ইতিহাস ও অনেকে জানেন এবং হোলিওক (Holyoke) সাহেবের নায়কত্বে বিলাতে কি প্রকারে সমবায় সমিতির প্রচলন হইয়াছিল এবং "রকডেল পাইওনিয়ার" (Rochdale Pioneers) রা কি প্রকারে তাহাদের সমবায় কারবার গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার বিবরণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রের জানা আছে; কিন্তু আমাদের দেশের লোকে কৃষিব্যাঙ্কগুলি টাকা কর্জ্জের একটা নূতন প্রণালী মনে করিতেছে। যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে মনে হয় জাতি-ভেদ-প্রথার মধ্যে বদ্ধিত, অর্থহীন,ও কায়িক পরিশ্রমবিমুখ বাঙ্গালীর দ্বারা সমবায় সমিতির যোগে অন্নসমস্যার মীমাংসা সম্ভবপর নহে। যে সমস্ত গ্রামে কৃষিব্যাঙ্ক আছে সেখানকার কৃষকেরা ও বাধ্য হইয়া শতকরা ৭৫৲ টাকা বার্ষিক সুদে টাকা কর্জ্জ করিতেছে। কোন কোন গ্রামের জন্য কৃষিব্যাঙ্ক মঞ্জুর করাইয়া আনাইয়াও উহা খোলা হইতেছে না, কারণ ঐ ব্যাঙ্ক আবশ্যক মত টাকা যোগাইতে পারিবে না, লাভের মধ্যে বিপদে ত্রাণকর্ত্তা মহাজন চটিয়া যাইবে। বাংলার এক মাত্র সম্পদ কৃষি, কিন্তু উহার উন্নতি কেবল সার ও বীজের উৎকর্ষ সাধনে সংঘটিত হইতে পারে না। যাহাতে বৃষ্টিপাত না হইলেও জলসেচনের দ্বারা চৈত্র মাসের মধ্যে কর্ষণ কার্য্য শেষ হইতে

পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা চাই। আবার হঠাৎ বর্ষার জল আসিয়া ধানের কচি চারা ডুবাইয়া দিতে না পারে তাহারও বন্দোবস্ত দরকার। পূর্ব্ববঙ্গে জমীতে সার না দিলেও পলিপড়া জমিতে প্রচুর শস্য জন্মিতে পারে। কিন্তু বর্ষার জল নিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিলে কৃষিকার্য্যে লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না। এ বিষয়ে বিশেষ অনুশীলন এবং চেষ্টার দরকার। আশা করি দেবেন্দ্রবাবু সেই দিকে মনোযোগ দিবেন। কৃষকদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনও বই পড়িতে পারে না। ছাত্রবৃন্দ ছুটীর সময় কৃষক সমিতি করিয়া 'ভুলের ফসলের' ন্যায় বহি পড়িয়া শুনান, তবেই লেখকের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, নতুবা গল্পের হিসাবে পড়িয়া গেলে বিশেষ ফলের আশা করা যায় না।

(২) "যে পরিবারে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা পরস্পর পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট, সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে" মনুর এই উক্তির সার্থকতা দেখা যাইতেছে নববধূর কর-কমলে নভেল বা গল্পগুচ্ছ উপহার দেওয়ায়, পল্লীর বাস্তুভিটা ত্যাগে এবং "বাসায়" আনিয়া নায়ক নায়িকার আদর্শে জীবন গঠনের চেষ্টায়। নিজের সংসার চাকর চাকরাণীর উপর ছাড়িয়া দেওয়ায়, তাহা যে ছারখারে যাইতেছে সে দিকে দৃকপাত নাই; এ দিকে নবদম্পতি "গৃহদাহ"র আখ্যান বিষয়ের সমালোচনায় ব্যস্ত, এ দৃশ্য সম্ভবতঃ অনেকের চোখেই পড়িয়াছে। উপহার গ্রন্থের সঙ্গে একখানা "ভুলের-ফসল" যোগ করিলে অনেক নববধূ "শোভনার" ন্যায় "সোনার মেডেল" গলায় ঝুলাইয়া বিলাত-ফেরত স্বামীকে "মোড়ল" বানাইয়া লইবার চেষ্টা করিবেন এবং অনেক শ্বশুর "সুলেখা"-পুত্রবধূকে বলিবেন—"লজ্জা কিরে বেটী! তবে অরুণকে লিখে দাও, আদালতে ষাঁড়ের মত গাঁ গাঁ করে চেঁচিয়ে কি হচ্ছে শুনি? তার চেয়ে এখানে এসে লাঙ্গলে জুড়ে দাও।" সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাতার জাতি আদিম অবস্থা হইতে মানব সভ্যতা বিস্তারের সহায়তা করিয়াছেন। সুলেখার দুধ দুহিতে দুহিতে "অপূর্ব্বছন্দে" গান ধরায় দুহিতা শব্দের পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। পল্লীর ঘরে ঘরে কবে "শোভনা ও "সুলেখা" বিরাজ করিবে সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

দেবেন্দ্র বাবু নূতন ধরণের গল্পের বহি লিখিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আশাকরি, কৃষিক্ষেত্রের ন্যায়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও সার ও বীজ যোগাইয়া নব্যতন্ত্রীদের জীবন নূতন ধারায় চালাইবার সহায়তা করিতে থাকিবেন।

শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী।

বাসনা।

নিশিদিন ওই অনন্তের পথে,
প্রাণ মোর শুধু ছুটে যেতে চায়!
ধরণীর কিছু লাগেনা যে ভালো,
ঠেলে ফেলে দিয়ে সবি উপেক্ষায়!

অনন্ত গগনে স্বরগের জ্যোতি,
বিমল চন্দ্রমা তারার আলো!
অসীমের আভা দেয় প্রাণে আনি
তাই তাহা মোর লাগে যে ভালো!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

বিশ্বভারতী-পরিচয়

কেমনটি করলে ভাল হত বা কোন্‌টা করা উচিত ছিল, বিশ্বের মজলিসে ভারতীর বীণাকে ঠিক কোন্ সুরটীতে বাজবার ফরমাস করলে, সকল অতিথিকেই সমান খুসি রাখা চলে, সেই আলোচনা করবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়নি। বিশ্ব-ভারতীর কবির মধ্যে, কোন্ মানস শিশু জন্মগ্রহণ করে তার নৃত্যের তালে তালে এমন সঙ্গীত সৃষ্টি করলে, যার নূপুরনিক্বণে সুদূর দিগন্ত হতে মুগ্ধ শ্রোতারা আজ ঐ শান্তিনিকেতনের বন-ছায়ায় এসে মিলিত হচ্ছেন, এই প্রবন্ধ তারি পরিচয় নেবার ও দেবার প্রয়াস মাত্র।

মুক্তির ইচ্ছা মানুষের চিরন্তন স্বপ্ন। বিস্মৃত যুগ হতে আরম্ভ করে আজো সে তার দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। শুধু দেশ, কাল ও রুচিভেদে এই মুক্তির ধারণা বিচিত্র ও সাধনের পথ বিভিন্ন হয়েছে। তারপরে সেই পথে চলতে চলতে সেটা যে পথমাত্র সে কথা ভুলে গিয়ে তাকে নিজের বলে ভালবেসেছে। তাই বারে বারে পথের সীমানা নিয়ে গোল বাধল।

তাই দেখতে পাই, মানুষ যখন ধর্ম্মকেই মুক্তির পথ ব'লে ধ'রে নিল, তখন এই ধর্ম্মের নামে মানুষে মানুষে বিরোধ, দেশ জুড়ে মহাবিনষ্টি ও ধ্বংসকে একেবারে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, যখনি যখনি ধর্ম্মের গ্লানির নামে অপ্রীতি ও মৃত্যুর তরঙ্গ উত্তাল হয়েছে, তখনি সেই মথিত সমুদ্র ভিন্ন করে এক একটী মহাপুরুষ উঠেছেন, হাতে মিলনের অমৃতভাণ্ড নিয়ে। এমনি করেই এদেশে নানক, কবীরের উদ্ভব হয়েছে।

তারপর, পরদেশী পশ্চিমের বন্যা ভারতের উপকূলে নূতন তরঙ্গ তুলে দেখা দিল। তার মধ্যে তখন জীবনের মুক্তিপথ ধর্ম্মকে অতিক্রম করে এসে মিলেছে জীবিকার মধ্যে। পশ্চিমের মন তখন ভাবতে শিখেছে যে, এই রক্ত-মাংসের শরীরটাকে আশ্রয় করে, যে শক্তি সৃষ্টির আদিকাল হতে চলে এসেছে, তাকে বাঁচিয়ে, তাকে বাড়িয়ে চলাতেই মুক্তি। এই প্রসারের পথে যদি কোন বিঘ্ন আসে, তাকে সরানোই ধর্ম্ম। তাই এই ইংরাজ বণিক্ যখন তার ঐশ্বর্য্য বিস্তারের প্রবল শক্তি নিয়ে এই দেশে দেখা দিল, আর নিজের ক্ষমতা দিয়ে তার ভূরি সঞ্চয়ের বিজয় নিশান দিকে দিকে উড়িয়ে দিতে লাগল, তখন, বহুদিনের বিদেশী প্লাবনে দিশাহারা, এই জাতির মনের তটপার্শ্বে, ধীরে ধীরে ঐশ্বর্য্য মোহের একটী গভীর বালির চর পড়তে আরম্ভ করল।

অধিগত ঐশ্বর্য্যের ভারে বিদেশী ইংরেজ এদেশেই থেকে গেল, আর তারই রক্ষণের জন্য, ক্রমশঃ যে বিরাট রাষ্ট্রযন্ত্রের রচনা করলে, তারি আড়ালে তাদের সমস্ত গৃধ্নুতা ঢাকা পড়ে গেল।

সেই মহিমান্বিত যন্ত্রবিভূতির দিকে চেয়ে ভারতবাসী ভাবলে -- এই-ই পথ।

কিন্তু সে পথের সামনেটা যে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছিলেন, রাষ্ট্ররচনাকুশল জাগ্রত স্বার্থ-বুদ্ধি বিজয়ী ইংরাজ। তাই আবেদনের বরণডালা সাজিয়ে, পশ্চাতে গিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া ছাড়া আর কোনো গতি রইল না।

এম্নি করে যখন একদল ভারতবাসী "চাটুকারবৃত্তি বা চরবৃত্তির দ্বারা যেমন করে হোক্ অপমানের অন্ন খুঁটে খাবার জন্যে রাষ্ট্রীয় আবর্জ্জনাকুণ্ডের আশে পাশে" ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলেন, যখন যথালভ্যের নিমন্ত্রণে সমাগত এই উচ্ছিষ্টভোজী দলের অভুক্তি ও ও অর্দ্ধভোজনের অতৃপ্তি, আক্রোশ ও ক্রন্দনজনিত ধ্বনি সমস্ত গগনকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, সেই সময়ে, এই বাঙলার শ্যামল তমালের অন্তরালে, একটী মহাপ্রাণ পীড়িত হয়ে উঠলেন। ব্যথিত কণ্ঠে উচ্চারিত হল, "আজকাল আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তপস্যাকেই মুক্তির তপস্যা বলে ধরে নিয়েছি। দল বেঁধে কান্নাকেই সেই তপস্যার সাধনা বলে ধরে নিয়েছিলুম। সেই বিরাট কান্নার আয়োজনে অন্য সকল কাজকর্ম্ম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।" সমস্ত জগত যখন তন্দ্রালীন থাকে তখন যেমন গিরিশৃঙ্গের উন্নত ললাট প্রভাতরবির প্রথম কিরণস্পর্শে দীপ্ত হয়ে উঠে, তেমনি করে এই ক্রন্দনমূর্চ্ছিত দেশে সেই দিন ভবিষ্য-ভারতের মুক্তি-সূর্য্যের তূর্য্যধ্বনি এই মহাপুরুষের কাছে ঘোষিত হয়েছিল।

ইংরাজের যন্ত্র শুধু একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। তিনি দেখেছিলেন যে "পাশ্চাত্যদেশে মানুষের জীবনে একটা লক্ষ্য আছে, সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানারকমে বল দিচ্চে ও পথ নির্দ্দেশ করচে। তারি সঙ্গে সঙ্গে অবান্তরভাবে অন্য দশরকম প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে যাচ্চে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড় লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠেনি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড় হয়ে উঠল।"

সেই জন্য রাষ্ট্রীয় ক্রন্দনের রঙ্গমঞ্চে এটাও তাঁর দৃষ্টি এড়াল না যে, "অন্য সকল কাজকর্ম্ম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।" তাই জীবনের-হারানো-লক্ষ্য এই দেশে জীবিকার লক্ষ্যই বড় হয়ে উঠ্ছিল। সেইখানে বল্‌তে হল,

"জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে, সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, এ কথা যদি না মানি তা হলে নিতান্ত ছোট হয়ে যাই।"

তাই,

"এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব এই মনে করেই এখানে প্রথম বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম।" তার প্রথম সোপান হচ্চে বাইরের নানা প্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্য এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।" এমনি করে সেই "নিভৃত আশ্রয়ে," "ভারতবর্ষের মধ্যে সেই বেড়াদেওয়া স্থানে একটী বীজ বপন করা হল। সেই বেড়াদেওয়া অঙ্কুরিত চারাগাছ যখন "ছাগলের

নাগালের" উপরে উঠল, তখন একদিন তারি তলায় তেরশ' ছাব্বিশের আষাঢ় মাসে যে আসন রচিত হল তারি নাম বিশ্বভারতী।

জীবিকার লক্ষ্যকেই বড় করে ধরেছিলাম বলে "গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমরা নিঃস্ব। যা কিছু সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে।" তাই বিশ্বভারতী প্রাণ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন কালিদাস ও ভাস থেকে, রামানুজ, নিম্বার্ক ও বল্লভ থেকে, পালি ও সিংহলী ভাষা থেকে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় কণ্ঠসঙ্গীত থেকে। পাশ্চাত্য ভাষার মধ্যে ছিল শুধু রাজভাষা।

এমনি করে যখন বিশ্বভারতী এই ভারতে "মহামিলনের সাগরতীর" রচনায় মগ্ন ছিলেন, সেই অবসরে একদল ভারতবাসীর মনে রাষ্ট্র-ব্রত ধীরে ধীরে সমস্ত আলোড়নের বিক্ষোভকে অতিক্রম করে স্থির লক্ষ্যের স্থান অধিকার করতে চলেছিল। সেই লক্ষ্য সাধনের পথে বাক্যের চেয়ে অর্জ্জন, লোভের চেয়ে ত্যাগ বড় হয়ে উঠ্ছিল। এমন সময়ে যখন বিশ্বভারতীর কবি সমগ্র পশ্চিমগ্রাসী প্রলয়নিশার শেষযামে য়ুরোপের প্রান্তে উপনীত হলেন তখন শুন্তে পেলেন, সমস্ত মৃত্যুকোলাহলের বিজয়দুন্দুভি মথিত করে দিকে দিকে নিষ্পিষ্ট মানবের বেদনাধ্বনি উঠেছে। দেখ্লেন, যন্ত্ররাজের জয়বিভীষিকায় পশ্চিমাকাশ ত্রস্ত হয়েছে। এইখানে কবি পেলেন বিশ্বের নবরূপ। উপেক্ষিত মানবের আগ্রহ-আমন্ত্রণের মধ্যে, দৃপ্তশক্তির রথচক্রতলে লাঞ্ছিত সুন্দরের মৃত্যুনিশ্বাসের মধ্যে তিনি বিশ্বভারতীর জন্য জগতজোড়া নূতন বাণী শুন্‌লেন।

"When I left you to start for Europe, I was labouring under the delusion that my mission was to build an Indian University in which Indian cultures would be represented in all their variety. But when I came to the continental Europe and fully realised that I had been accepted as one of themselves, *I realised that my mission was the mission of the present age.* It was to make the meeting of the East and West fruitful in truth. I felt that the call of the Shantiniketan was the invitation of India to the rest of the world.

আজ শুধু "বিশ্বের সভাতলে" ভারতের ডাক নয়। ভারতের প্রাঙ্গণে আজ বিশ্বের নিমন্ত্রণ। ভারতের দীনতার মধ্যে যে ক্রন্দন অহরহ অন্ধের মত ফির্ছে, সে শুধু রাষ্ট্র-শৃঙ্খলিতের বিলাপ নয়, তার বেদনা আজ ধ্বনিত হয়েছে সমস্ত বিশ্বে; যেখানে যেখানে মানুষ পীড়িত হয়েছে, তার নানা সঙ্কটের ভারে। আজ প্রতি মানবের জন্য একই মুক্তির বাণী ঘোষিত হয়েছে, সে হল "আত্মার মুক্তি।"

অকৃপণ মুক্তির এই নবমন্ত্রঘোষিত বিশ্বভারতীর তপোবনে ভারতবর্ষ আজ চীন ও সিংহলকে, জর্ম্মান্ ও মার্কিণকে, জিজ্ঞাসু ও শিল্পীকে, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানকে, কবি ও কৃষককে একই সুরসাধনায় মিলিত করছেন এই জেনে যে, একদিন সমস্ত বিশ্ববাসীকে তার বিচিত্র বিরোধের অপরিচয়ের মধ্যে থেকে ডেকে বল্‌তে পারবেন,

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

শ্রীপ্রকাশ রায়।

উক্তি (" ") চিহ্নিত সমস্ত কথাই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকে সংগৃহীত।
ইংরাজি উক্তির Italics লেখকের।

বিদ্যাসাগর

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ-সভা বছর বছর হয় কিন্তু তাতে বক্তারা মন খুলে সব কথা বলেন না, এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে' থাকৃতে পারেননি বটে কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ কর্‌তে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখ্‌তে চান। অর্থাৎ বিদ্যা-সাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌চেন।

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে, তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে' গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেচে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন।—এমন দেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, যেখানে জীবন ও মনের যে প্রবাহ মানুষের সংসারকে নিয়ত অতীত থেকে বর্ত্তমান, বর্ত্তমান থেকে ভবিষ্যতের অভিমুখে নিয়ে যেতে চায় সেই প্রবাহকে লোকেরা বিশ্বাস করেনি, এবং তাকে বিপজ্জনক মনে করে' তার পথে সহস্র বাঁধ বেঁধে সমাজকে নিরাপদ কর্‌বার চেষ্টা করেচে। কিন্তু তৎসত্ত্বে তিনি পুরাতনের বেড়ার মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাকৃতে পারেননি। এতেই তাঁর চারিত্রের অসামান্যতা ব্যক্ত হয়েছে। দয়া প্রভৃতি গুণ অনেকের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় কিন্তু চরিত্র-বল আমাদের দেশে সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। যারা সবলচরিত্র, যাদের চারিত্র-বল কেবলমাত্র ধর্ম্মবুদ্ধিগত নয় কিন্তু মানসিক-বুদ্ধি-গত সেই প্রবলেরা অতীতের বিধিনিষেধে অবরুদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন না। তাঁদের বুদ্ধির চারিত্র-বল প্রথার বিচারহীন অনুশাসনকে শান্তশিষ্ট হয়ে মান্‌তে পারে না। মানসিক চারিত্র-বলের এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান। যাঁরা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে' দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে' নিয়ে যাবার সারথী স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সব-চেয়ে বড় হয়ে লেগেছে।

বর্ত্তমান কাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে, এই নিত্যচলনশীল সীমারেখার উপর দাঁড়িয়ে কে কোন্ দিকে মুখ ফেরায় আসলে সেইটাই লক্ষ্য কর্‌বার

জিনিষ। যাঁরা বর্ত্তমান কালের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পিছন দিকেই ফিরে থাকে, তারা কখনো অগ্রগামী হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানবজীবনের পুরোবর্ত্তী হবার পথ মিথ্যা হয়ে গেছে। তারা অতীতকেই নিয়ত দেখে বলে' তার মধ্যেই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়ে থাকাতেই তাদের একান্ত আস্থা। তারা পথে চলাকে মানে না। তারা বলে যে সত্য সুদূর অতীতের মধ্যেই তার সমস্ত ফসল ফলিয়ে শেষ করে' ফেলেছে; তারা বলে যে তাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিষয়-ব্যাপারের যা-কিছু তত্ত্ব তা ঋষিচিত্ত থেকে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভূত হয়ে চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে, তারা প্রাণের নিয়ম অনুসারে ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করেনি, সুতরাং তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল বলে' জিনিষটাই তাদের নয়।

এইরূপে সুসম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধ্যে চিত্তকে অবরুদ্ধ করে' তার মধ্যে বিরাজ করা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্ব্বত্র লক্ষ্য-গোচর হয়, এমন কি আমাদের দেশের যুবকদের মুখেও এর সমর্থন শোনা যায়। প্রত্যেক দেশের যুবকদের উপর ভার রয়েছে সংসারের সত্যকে নূতন করে' যাচাই করে' নেওয়া, সংসারকে নূতন পথে বহন করে' নিয়ে যাওয়া, অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। প্রবীণ ও বিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অনুকূলতা করতে ভয় পান, কিন্তু যুবকদের প্রতি ভার আছে তারা সত্যকে পরখ করে' নেবে।

সত্য যুগে যুগে নূতন করে' আত্মপরীক্ষা দেবার জন্যে যুবকদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই-সকল নবযুগের বীরদের কাছে সত্যের ছদ্মবেশধারী পুরাতন মিথ্যা পরাস্ত হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে। সকল প্রকার প্রথাকেই চিরন্তন বলে' কল্পনা করে' কোনো রকমে শান্তিতে ও আরামে মনকে অলস করে' রাখ্‌তে তাদের মনের মধ্যে পীড়া বোধ হয় না, দেশের পক্ষে এইটেই সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। সেইজন্যেই আশ্চর্য্যের কথা এই যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও, এই দেশেরই একজন সেই নবীনের বিদ্রোহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আপনার মধ্যে সত্যের তেজ, কর্ত্তব্যের সাহস অনুভব করে' ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে জয়ী করবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানেই তাঁর যথার্থ মহত্ত্ব। সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাহ্মণ-তনয়কে কিরূপে আঘাত ও অপমান করেছিল, তার ইতিহাস আজকার দিনে ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু যাঁরা সেই সময়ের কথা জানেন তাঁরা জানেন যে তিনি কত বড় সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের জোরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জয়ী হয়েছিলেন বলে গৌরব করতে পারিনে। কারণ সত্যের জয়ে দুই প্রতিকূল পক্ষেরই যোগ্যতা থাকা দরকার। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধে যাঁরা বাহিরে পরাভব পান তাঁরাও অন্তরে জয়ী হন, এই কথাটি জেনে আজ আমরা তাঁর জয়কীর্ত্তন করব।

বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতু-স্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যা-কিছু পাশ্চাত্য তাকে

অশুচি বলে' অপমান করেননি। তিনি জান্‌তেন, বিদ্যার মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর কর্‌বার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন।

এই বিদ্যাসম্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর বাইরের ব্যবহার বেশভূষা প্রাচীন কিন্তু যাঁর অন্তর চির-নবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে' তিনি বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ কর্‌তে পেরেছিলেন এইটেই বড় রমণীয় হয়েছিল। তিনি অনেক বেশী বয়সে বিদেশী বিদ্যায় প্রবেশলাভ করেন এবং তাঁর গৃহে বাল্যকালে ও পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত-বিদ্যারই চর্চ্চা হয়েছে। অথচ তিনি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব না নিয়ে অতি প্রসন্নচিত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার কর্‌তে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং চির-যৌবনের অভিষেক লাভ করে' বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সব-চেয়ে পূজনীয় কারণ তিনি আমাদের দেশে চল্‌বার পথ প্রস্তুত করে' গেছেন। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষদের কাজই হচ্চে এইভাবে বাধা অপসারিত করে' ভাবী যুগে যাত্রা কর্‌বার পথকে মুক্ত করে' দেওয়া। তাঁরা মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সম্বন্ধের বাধা মোচন করে' দেন। কিন্তু বাধাই যে-দেশের দেবতা সে দেশ এই মহাপুরুষদের সম্মান কর্‌তে জানে না। বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তাঁর চরিত্রের সব-চেয়ে বড় পরিচয় হয়ে থাক্‌বে। এই ব্রাহ্মণতনয় যদি তাঁর মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন কর্‌তেন, তাহলে অনায়াসে আজ তিনি অবতারের পদ পেয়ে বস্‌তেন এবং যে নৈরাশ্যের আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁকে সহ্য কর্‌তে হ'ত না। কিন্তু যাঁরা বড়, জনসাধারণের চাটুবৃত্তি কর্‌বার জন্যে সংসারে তাঁদের জন্ম নয়। এইজন্যে জনসাধারণও সকল সময়ে স্তুতিবাক্যের মজুরি দিয়ে তাঁদের বিদায় করে না।

একথা মান্‌তেই হবে যে বিদ্যাসাগর দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত এই বেদনা বহন করে ছিলেন। তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত pessimist ছিলেন বলে' অখ্যাতি লাভ করেছেন, তার কারণ হচ্চে যে যেখানে তাঁর বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শান্তি পাননি। তিনি যদিও তাতে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হননি, তবুও তাঁর জীবন যে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা অনেকের কাছে অবিদিত নেই। তিনি তাঁর বড় তপস্যার দিকে স্বদেশীয়ের কাছে অভ্যর্থনা পাননি, কিন্তু সকল মহাপুরুষেরাই এই না-পাওয়ার গৌরবের দ্বারাই ভূষিত হন। বিধাতা তাঁদের যে দুঃসাধ্য সাধন কর্‌তে সংসারে পাঠান, তাঁরা সেই দেবদত্ত দৌত্যের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সম্মান গ্রহণ করেই আসেন। বাহিরের অগৌরব তাঁদের অন্তরের সেই সম্মানের টীকাকেই উজ্জ্বল করে' তোলে,—অসম্মানই তাঁদের পুরস্কার।

এই উপলক্ষ্যে আরেক জনের নাম আজ আমার মনে পড়্‌ছে—যিনি প্রাচীনকালের

সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগরের মত জীবনের আরম্ভকালে শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখেননি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকৃতে পারলেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্ম্মে অনুসন্ধান করেছিলেন, নির্ভীক এই সাহসের জন্য তিনি ধন্য। যেমন ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জানবার জন্য মানুষ নূতন নূতন দেশে নিক্রমণ করে' অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনই মানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে' নব নব পথে ধাবিত করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা আপন চরিত্র-মহিমায় দুঃসহ কষ্টকে শিরোধার্য্য করে' নিয়ে থাকেন। আমরা অনুভব করতে পারি না যে এঁরা এঁদের বিরাট স্বরূপ নিয়ে ক্ষুদ্র জনসংঘকে ছাড়িয়ে কত উর্দ্ধে বিরাজ করেন। যারা ছোট, বড়র বড়ত্বকেই তারা সকলের চেয়ে বড় অপরাধ বলে' গণ্য করে। এই কারণেই ছোটর আঘাতই বড়র পক্ষে পূজার অর্ঘ্য।

যে জাতি মনে করে' বসে' আছে যে অতীতের ভাণ্ডারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য্য, সেই ঐশ্বর্য্যকে অর্জ্জন করবার জন্যে তার স্বকীয় উদ্ভাবনার কোনো অপেক্ষা নেই, তা পূর্ব্বযুগের ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মত সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির শ্লোকে সঞ্চিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে। নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে' কখনই সে আরাম পেত না। কারণ বুদ্ধি ও শক্তির ধর্ম্মই এই যে, সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে' যা অজ্ঞাত যা অলব্ধ তার অভিমুখে নিয়ত চলতে চায়; বহুমূল্য পাথর দিয়ে তৈরি কবরস্থানের প্রতি তার অনুরাগ নেই। যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয়যাত্রা শুব্ধ হয়ে গেছে, সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্ম্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব তার হাতের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুরুষদের মহৎ সাধনার যথার্থ প্রমাণ হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে য়ুরোপে যে-সকল দেশ অতীতের আঁচল ধরা, তারা মানসিক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রিক সকল ব্যাপারেই অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্পেন দেশের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ এক সময়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন সে অন্য য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্ব্ব-গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে স্পেনের চিত্ত ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতিতে অবরুদ্ধ, তাই তার চিত্তসম্পদেরউন্মেষ হয়নি। যারা এমনি ভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্ত্তমানকে প্রহসনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্ত্তনকে হাস্যকর দুঃখকর লজ্জাকর বলে' মনে করে, তারা জীবন্মৃত জাতি। তাই বলে' অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো জাতিরপক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মানুষকে জানতে হবে যে অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবীকালের পথেই তাকে অগ্রসর করবার জন্যে। আমাদের

চলার সময় যে পা পিছিয়ে থাকে সেও সাম্‌নের পা কে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি সাম্‌নের পা-কে পিছনে টেনে রাখ্‌ত তাহলে তার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হ'ত। তাই সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু নির্ম্মাণ করে' দিয়ে মানুষের চলার পথকে সহজ করে' দিয়েছেন। আমি মনে করি যে ভারতবর্ষে জাতির সঙ্গে জাতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নয় যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ। আমরা এইরূপে উভয় কালের মধ্যে একটি অতলস্পর্শ ব্যবধান সৃষ্টি করে' মনকে তার গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি। একদিকে আমরা ভাবীকালে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হতে পারৃছি না, অন্যদিকে আমরা কেবল অতীতকে আঁক্‌ড়ে থাকৃতেও পারৃছি না। তাই আমরা একদিকে মোটর-রেল-টেলিগ্রাফকে জীবন-যাত্রার নিত্যসহচর করেছি, আবার অন্যদিকে বলৃছি বিজ্ঞান যে আমাদের সর্ব্বনাশ করৃল, পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের সইবে না। তাই আমরা না আগে না পিছে কোনো দিকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করৃতে পারৃছি না। আমাদের এই দোটানার কারণ হচ্চে যে আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেত্রকে আয়ত্তের অতীত করে' রাখ্‌তে চাচ্ছি, তাই আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই।

আজ আমরা বলৃব যে, যে-সকল বীরপুরুষ অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, অতীত সম্পদকে কৃপণের ধনের মত মাটিতে গচ্ছিত না রেখে বহমান কালের মধ্যে তার ব্যবহারের মুক্তিসাধন করৃতে উদ্যমশীল হয়েছেন তাঁরাই চিরস্মরণীয়, কারণ তাঁরাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পথপ্রদর্শক। তাঁদের সকলেই যে বাইরের সফলতা পেয়েছেন তা নয়, কারণ আমি বলেছি যে তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র অনুসারে সার্থকতার তারতম্য হয়েছে কিন্তু আমাদের পক্ষে খুব আশার কথা যে আমাদের দেশেও এঁদের মত লোকের জন্ম হয়।

আজকাল আমরা দেশে প্রাচ্য বিদ্যার যে সম্মান করৃছি তা কতকটা দেশাভিমান বশতঃ। কিন্তু সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বশতঃ প্রাচীন বিদ্যাকে সর্ব্বমানবের সম্পদ করৃবার জন্য ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন আমাদের বাংলার রামমোহন রায় এবং তার জন্য অনেকবার তাঁর প্রাণশঙ্কা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। আজ আমরা তাঁর সাধনার ফল ভোগ করৃচি কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা করৃতে কুণ্ঠিত হইনি। তবু আজ আমরা তাঁকে নমস্কার করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ, আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা বলে' মানেন নি, তাকে আঘাত করেছেন। অনেকে বলৃবেন যে তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ্য মাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে ত শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয়। তিনি তাঁর করুণার ঔদার্য্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করৃতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহকরূপে

দেখেন নি। তিনি কতকালের পুঞ্জীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন হয়ে নিষ্ঠুর আচারকে দয়ার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেননি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে' গেছেন।

আজ আমাদের মুখের কথায় তাঁদের কোনো পুরস্কার নেই। কিন্তু আশা আছে যে এমন একদিন আস্‌বে যেদিন আমরাও সম্মুখের পথে চল্‌তে গৌরব বোধ করব, ভূতগ্রস্ত হয়ে শাস্ত্রানুশাসনের বোঝায় পঙ্গু হয়ে পিছনে পড়ে' থাকব না, যেদিন "যুদ্ধং দেহি" বলে' প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে' নিতে কুণ্ঠিত হব না। সেই জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যৎকে অভ্যর্থনা করে' আন্‌বার জন্তে যাঁরা প্রত্যূষেই জাগ্রত হয়েছিলেন, তাঁদের বল্‌ব, "ধন্ত তোমরা, তোমাদের তপস্যা ব্যর্থ হয়নি, তোমরা একদিন সত্যের সংগ্রামে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলে বলেই আমাদের অগোচরে পাষাণের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। তোমরা একদিন স্বদেশবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি তোমাদের জীবন নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে তোমাদের কীর্ত্তি অক্ষয়রূপ ধারণ কর্‌ছিল।"

সত্যপথের পথিকরূপে সন্ধানীরূপে নবজীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, ভাবীকালের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে একতালে পা ফেলে যেদিন আমরা এই কথা বল্‌তে পারব সেইদিনই এই-সকল মহাপুরুষদের স্মৃতি দেশের হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে উঠ্‌বে। আশা করি সেই শুভদিন অনতিদূরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্যাসাগর-স্মরণসভায় বক্তৃতার মর্ম্ম (১৭ই শ্রাবণ, ১৩২৯। ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা।) শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত কুমার সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক অনু-লিখিত।

একলব্য।

হে গুরু পূজ্য দেবতা আমার মূর্ত্ত সিদ্ধি মোর!
আর্য্য নহিক বন্য শূদ্র অনাচারী অতি ঘোর।
তা ব'লে বলিনি অমৃত-বাণী, শুদ্ধ চিত্ত মন,
জগতে আমার ইষ্ট পূজ্য গুরু মম শুধু দ্রোণ!
গড়িনি বটে ও জড়ের মূর্ত্তি শরীরি দ্রোণের কায়া;
আমার গুরু যে বিশ্বে বিরাট রয়েছেন প্রসারিয়া।
অনলে অনিলে আকাশ আলোকে প্রতি পরমাণু অণু,
নিখিল ভুবন সত্তার মাঝে বিকশিত বর তনু!
আমার মাংস, অস্থি, মজ্জা সকল জীবন মাঝে
চিত্ত, চিন্তা, ভাবনা, সাধনা সারা প্রাণে ব্যাপিয়াছে;

গুরুর মূর্ত্তি, গুরুর সত্তা সকলি যে দ্রোণময়,
দেবতা আমার, দেহের বিহনে ভক্তির হানি হয় ?
নিমেষে নিমেষে, প্রতি শ্বাসে শ্বাসে পেয়েছি গুরুর বাণী,
তাঁহারি শিক্ষা, অস্ত্র দীক্ষা শ্রদ্ধার ভরে মানি।
পূর্ণ কামনা, অস্ত্র সিদ্ধি, জীবন, সাধনা মম !
সেই চির মনোরম !
সুদূর দেবতা বিদেহ ইষ্ট মূর্ত্ত দাসের কাছে ;
অঙ্গুলি কেন, অঞ্জলি দিব যা কিছু আমার আছে !
যাহার আশায় অনশনে বসে রৌদ্র-জ্বালায় দহি,
কত দিবানিশি সুকঠোর তপে সফলতা মাগি রহি,
সেই চির মম ঈপ্সিত সাধ চরণে সঁপিতে চাই
সিদ্ধিও মোর, এ হ'তে সিদ্ধি ! আর কিছু দেব নাই !
এই লহ অঙ্গুলি,
অস্ত্র শিক্ষা যা ছিল আমার তাও গুরু যাব ভুলি !

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

সঙ্গণিকা।

সাহিত্য পরিষদে দান।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের মাতৃদেবী ও স্ত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে সত্যেন্দ্রনাথের মূল্যবান লাইব্রেরীটী দান করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় এই ইচ্ছাটী প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং ইঁহারা তাহার গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। স্বর্গীয় কবির পিতামহ স্বর্গগত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের আমল হইতে এই লাইব্রেরীতে বহু মূল্যবান গ্রন্থ সঞ্চিত ছিল এবং সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও বহু মূল্যের গ্রন্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সমস্তই দান করিয়া ইঁহারা শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন।

বিগত ১৩ই শ্রাবণ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের স্বর্গারোহণ দিবসে "বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনে"র কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর বাণীভবন দুঃস্থ বিধবাদের সাধারণ শিক্ষা ও অর্থকরী শিল্প শিক্ষা দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে বালীগঞ্জে শ্রীমতী হিরণ্ময়ীদেবীর প্রতিষ্ঠিত মহিলা-শিল্প-সমিতি নামে আর একটী বিধবাদের আশ্রম

আছে। সহরের এই প্রান্তে আর একটী ভবনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এখানে চরকা, তাঁত, শিল্প এবং জ্যাম, জেলী, মোরব্বা ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যবসায়-মূলক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এত বৎসর হইয়া গিয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষা কল্পে কোন চেষ্টা হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না বোধ হয়। এ চেষ্টাটী অতীব প্রশংসনীয় এবং বাড়ীটী তাঁহার স্মৃতি রক্ষার উপযোগী। শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহোদয়ার বিশেষ উদ্যোগে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার এই উদ্যোগ বিশেষ উৎসাহ দানের যোগ্য। এ কার্য্যের জন্য তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বসতবাটীটী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। শোনা যায়, ইহা কোন মাড়োয়ারীর নিকট বন্ধক রহিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ ইহা নিলামে বিক্রী হইয়া যাইবে। বাটীটীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে দুঃখ সম্বরণ করা কঠিন ব্যাপার হয়। এই পুণ্যস্মৃতি-মণ্ডিত গৃহটী যাহাতে পরহস্তগত না হইয়া বিদ্যাসাগরের পবিত্র স্মৃতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে, শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহাশয়া সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন ও ইহাতে দেশবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ সাহায্য প্রার্থনা কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে, সাগ্রহে গ্রহণীয়। এ পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে যিনি যতটুকু পারেন, সাহায্য করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

* * * *

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের সভায় উপস্থিত হইবার জন্য যাতায়াতের ও তৎকালীন কলিকাতায় অবস্থানের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ১৯২১ সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯২২ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত দেড় বৎসরে দেড় লক্ষ (১,৫২,৯২৩৵১০) টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার ভিতরের যে সব কথা শোনা গিয়াছে, তাহা, যে কোন শ্রেণীর মধ্যেই বিশেষ ভাবে, তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, বড়ই লজ্জাজনক ও দেশের অতি বড় দুর্দ্দশারই পরিচায়ক। এই অসহযোগ আন্দোলনের দিনে, দেশের সেবা করিবার ইচ্ছা ও আকাজ্ঞা নিয়াই, ইঁহারা কংগ্রেসের ও দেশের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুই নৌকায় পা দিয়া কোন কাজই ভাল ভাবে হয় না। দেশের সেবা করিব, অথচ দেশের করভার-প্রপীড়িত দরিদ্র প্রজাসাধারণের অর্থে নিজের অর্থ-পেটিকা পূর্ণ করিব, এ ভাব নিয়া দেশের সেবা করিতে যাওয়া কাহারও উচিত নয় এবং এ ভাবে সেবা হয় ও না। না মন্ত্রী মহাশয়দের, না সভ্যমহাশয়দের। প্রকৃত নিঃস্বার্থ ও অকৃত্রিমভাবে দেশের সেবা করিতে চাহিলে, তাহার পথ আছে। এখানে নিজের অর্থোপার্জ্জন স্পৃহাটা কতক সংযত করিতে পারিলে, দেশের অনেক মঙ্গল হয়। সকল দিকে সকলে মিলিয়া দরিদ্র দেশের অর্থের শোষণ আরম্ভ করিলে আর আশা কোথায়?

যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদত্যাগ।

যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস মহাশয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করিবার জন্য তথাকার লাট সাহেবকে যে চিঠি লিখিয়াছেন "অমৃতবাজার" ও "সার্ভেণ্ট" পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সারাংশ এই :—

"এতদ্বারা আমি সম্মানপূর্ব্বক জানাইতেছি যে আমি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ ত্যাগ করিলাম।

এইরূপ করিবার কারণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এখনকার ব্যবস্থা যেরূপ তাহাতে আইনসভার সভ্যগণকে নির্দ্দয় অত্যাচার, দুর্নীতি, সাধারণের অর্থের অপব্যয় ও করবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে হয় সহযোগিতা করিতে হইতেছে, নয় নীরবে দর্শকরূপে অবস্থান করিতে হইতেছে। আইন ব্যবস্থার সুরক্ষিত আয়োজনের মধ্যে দরিদ্র প্রজা ও শ্রমজীবীর স্বার্থ স্থান পায় নাই। অত্যন্ত বর্দ্ধিতহারে জলকরের উপর আবার শত করা ২৫ টাকার দণ্ড, জমী বন্দোবস্তে খাজনার ক্রমবৃদ্ধির ব্যবস্থা, বনবিভাগের পরিচালনা, অন্যান্য বহুবিধ বিষয়ে করবৃদ্ধি—এইসব ব্যবস্থা সাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের মুখাপেক্ষী হইয়া চলুক বা না চলুক, দেশের লোকের এই সকল ও অন্যান্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শুভাশুভ ব্যাপারে সরকার বাহাদুর কিন্তু তাঁহাদের নিজের আইনকানুন জারী করিতে রিফর্ম-পূর্ব্বকালেও যেমন এখনও তেমনি বদ্ধপরিকর। এই আইনসভার দ্বারা বিশেষ কোনও শ্রেণী বা সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। সেটা সম্ভব, যদি আইনসভা সাধারণের স্বার্থহানি করিয়া তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা করেন ও জবরদস্তী দমননীতিতে আমলাতন্ত্রের সহিত যোগ দেন।

সংস্কৃত শাসনপদ্ধতির মধ্যে হিতকর অনুষ্ঠানের সুযোগ থাকিলেও—বাধা সেখানে কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব, কারণ তাঁহারা তাঁহাদের মতে আমাদের দায়িত্ব জ্ঞান শিখাইতে চাহেন। দেশের লোকের ইচ্ছা ও অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া নীতি-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা ও ও নির্ভুলতা প্রমাণ করাই শাসনব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইতেছে।

যুগ্মতন্ত্র (Dyarchy) সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না। কাজে যেটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই ব্যবস্থা অত্যাচার ও দমননীতি এবং নূতন নূতন করবৃদ্ধি ব্যাপারে বেশ সাহায্যই করিয়াছে।

এই সভার নির্ব্বাচকগণের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধা নাই ইহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার সভ্যপদ ত্যাগ করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখিতেছি না।

একান্ত অনুগত ভৃত্য
নারায়ণ দাস।"

* * * * *

হিন্দুজাতির জনসংখ্যা হ্রাস।

১৯২১সালের লোক গণনায় দেখা গিয়াছে যে সমগ্র ভারতে হিন্দুর সংখ্যা পূর্ব্ব

দশ বৎসর হইতে প্রায় ৭ লক্ষ কমিয়া গিয়াছে ও বাংলায় এক লক্ষের (১,৩৬,২৩১) উপর কমিয়া গিয়াছে। মুসলমান সংখ্যা সমগ্র ভারতে প্রায় ২০লক্ষ ও বাংলায় প্রায় সাড়ে বার লক্ষ (১২,৪৮, ৮৯৬) বাড়িয়াছে। খৃষ্টান সংখ্যা সমগ্র ভারতে প্রায় দশ লক্ষ ও বাংলায় প্রায় কুড়ি হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ব্যাপারটি বিশেষ চিন্তার বিষয়। হিন্দুজাতির এরূপ ভাবে কমিয়া যাওয়া বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টিদান, কারণ নির্ণয় ও উপায় নির্দ্ধারণ বিশেষ আবশ্যক। সামাজিক কোন কারণ ইহার মূলে আছে কি ?

নারীর লাঞ্ছনা।

সম্প্রতি ইংরাজের আদালত হইতে কয়টি বালিকা বধূর প্রতি তাহার আপন পরিবারের লোকের অত্যাচার বা নির্য্যাতন, আইনের আশ্রয় লইয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে। আইনের আশ্রয় লওয়াতে, ব্যাপারগুলি লোকের চক্ষু কর্ণের গোচরীভূত হইয়াছে। লোক চক্ষু কর্ণের অগোচরে এইরূপ কত পরিবার যে আছে, যেখানে কেহই জানে না, কত নারী কত বালিকা কত অত্যাচার নীরবে সহিতেছে!

আমাদের চিরাগত প্রথা ও সংস্কার যে, পারিবারিক বিষয় পরিবারের ভিতরেই আবদ্ধ থাকিবে। তাহার কোন খুঁত বা দোষ ত্রুটি বাহিরে প্রকাশ হওয়া অপেক্ষা, অসহনীয় যন্ত্রণা এমন কি কোথাও কোথাও মৃত্যুও বরণীয় বলিয়া মনে করা হয়। করা স্বাভাবিক। কেন না হিন্দু সমাজ, খৃষ্টান বা মুসলমান সমাজের ন্যায় বিবাহ সম্পর্ককে শুধু এ পৃথিবীর সম্পর্ক মনে করেন না। গাঁট ছড়া একবার গ্রন্থিবদ্ধ হইলে আর খুলিবার নয়, ইহাই আমাদের জন্মগত সংস্কার। সামাজিক প্রথানুসারে নারীর শ্বশুর অথবা স্বামীর গৃহই আপন গৃহ। স্বামীর অধিকারেই তাঁহার অধিকার। মুসলমান নারীর পিতার নিকট ও স্বামীর নিকট আর্থিক দাবীর অধিকার আছে, হিন্দুনারীর তাহা নাই। ইহা ভিন্ন সামাজিক ও ব্যক্তিগতভাবে নারীর সম্মান ও সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে তাহার স্বামীর উপর নির্ভর করে। ইহা, বঙ্গের প্রতিগৃহে নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয়ে স্বাভাবিক বলিয়া বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাই, নিতান্তই অসহনীয় না হইলে বধূর শ্বশুর গৃহের অত্যাচারে, তাঁহার পিতা বা ভ্রাতা বা কল্যাণাকাঙ্ক্ষী কোন আত্মীয় পারতপক্ষে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না, অনেক স্থলে হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক দুঃখ বহন করিয়াও নীরব থাকেন। ইহা শুধু বালিকা বধূর ভবিষ্যৎ জীবন অশান্তিময় না হওয়ার ভয়েই করিয়া থাকেন। এবং বধূও নিজের একান্ত অসহায় দুর্ব্বল অবস্থা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নীরবে সহিষ্ণুতার সহিত সকল সহিয়া থাকেন। প্রতি কাজের প্রতিক্রিয়া (reaction) আছে। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে যাহারা যত বেশী অত্যাচারিত হয় তাহারা তত বেশী অত্যাচারী হয়। অত্যাচারিতা বধূই হয়ত ভবিষ্যৎ জীবনে অত্যাচারিণী শাশুড়ীতে পরিণত হন। সে কথা যাউক, এই যে কোন গৃহে বধূর

নিঃসহায় অবস্থা, কোথাও বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া ভাবিয়া লইলে, কোন গৃহে বিধবা ভগিনী বা ভ্রাতৃবধূর নিঃসহায় অবস্থা,—তাঁহাদের এই একান্ত অসহায় অবস্থাই, তাঁহাদের প্রতি অত্যাচারের সুযোগ দিয়া থাকে। তারপর শুধু শারীরিক লাঞ্ছনা নয়, মানসিক যন্ত্রণা যাহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কাহারও জানিবার উপায় নাই, তাহাতে অহোরাত্র ভুগিয়া ভুগিয়া তাহাদের মনের বিকাশের ও প্রসারের সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

আমি যদি আমার শক্তি ও সামর্থ্য জানিয়া, পারিবারিক শান্তি রক্ষার জন্য হৃদয়ে তীব্রতা না আনিয়া, অত্যাচার সহিতে পারি, তবে তাহাতে আমার সহিষ্ণুতা বাড়িবে, শক্তিও বাড়িবে। কিন্তু তাহা না হইয়া নিঃসহায় অবস্থায় পড়িয়া, নিজেকে উপায়হীন ভাবিয়া, অত্যাচার সহিলে মানসিক তেজের ও সাহসের লোপ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী এবং তাহা হইতে ভীরুতা ও কাপুরুষতার সৃষ্টি হয়। ভীরুতা ও কাপুরুষতা সকল রকম দোষের জন্মদাতা। বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে যে প্রকৃত ত্যাগী তেজস্বী কর্ম্মনিষ্ঠ বীরের অভাব, তাহার মূল কারণ ঐখানে। রাজনৈতিক অধিকার লাভ অপেক্ষা ইহা একটী কম সমস্যার বিষয় নহে। উন্নত চরিত্র গঠিত না হইলে, মানসিক তেজ বীর্য্য সম্পন্ন মানুষ না হইলে, অধিকার পাইবার বা পাইলেও তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকেনা। এ বিষয় সকলেরই বিশেষভাবে চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজন।

* * * * *

আইন ব্যবসা পুনরারম্ভ।

কয়েকজন অসহযোগী কয়েক মাসের জন্য আদালতে আইনের ব্যবসা করা বন্ধ রাখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজন আর্থিক অভাবের জন্য আবার আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। অন্য উপায়ে যদি তাঁহাদের অর্থ উপার্জ্জন করা সম্ভব হইত তবে বোধ হয় ভাল হইত। একবার যাহা মন্দ বলিয়া মনে করিয়াছেন, আবার তাহাতে যোগ না দিলে, আদর্শ অক্ষুন্ন থাকিত ও দেশবাসীর নিকট সম্মান বাড়িত।

* * * *

চরকা প্রচলন

বঙ্গীয় কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কলিকাতা সহরে একটি সরকারী আলোচনা সভার বৈঠক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে এই প্রস্তাবটি পাশ হইয়াছে যে, "চরকা বাঙ্গালার একটি প্রধান গৃহ শিল্পরূপে প্রচলন করার জন্য এই কমিটি একটি ইস্তাহার বাহির করিতে সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।"

ভূপ্রদক্ষিণকারী মিঃ ম্যার্টিনেট।

এইচ ম্যার্টিনেট নামে একজন আমেরিকাবাসী পায়ে হাঁটিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন ও অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা আসিয়া বাঙ্গালীর সঙ্গে থাকিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অর্থের অথবা জিনিষ পত্রের বাহুল্য

নাই। অতি সামান্য, নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস নিজ কাঁধে নিয়া, খালি পায়ে বেড়াইতেছেন। কোনরূপ অর্থ সম্বল বা পরিচয়ের সম্বল না লইয়া, শুধু নিজের সাহস ও মানুষের আতিথেয়তা ও সহৃদয়তার উপর বিশ্বাসের নির্ভর রাখিয়াছেন বলিয়াই এভাবে চলিতে পারিয়াছেন। এবং সেই জন্যই কোথাও তাঁহাকে অভাব গ্রস্ত বা অনশন ক্লিষ্ট হইতে হয় নাই। জগতে সহৃদয়তা বিদ্যমান রহিয়াছে, গ্রহণ করিতে জানিলেই পাওয়া যায়। এইভাবে পৃথিবী ঘুরিলে তাঁহার বিভিন্ন প্রকারের বহু অভিজ্ঞতা হওয়ার সম্ভাবনা ; তাহা ট্রেনে ষ্টিমারে করিয়া বেড়াইলে হওয়া সম্ভব হইত না।

* * * *

নারীর ভোট দিবার অধিকার।

কালকাতা কর্পোরেশনে কলিকাতাস্থ নারীদের ভোট দিবার প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হইয়াছে। বহু তর্ক বিতর্কের পর ইহা ভোটে পাশ হইয়াছে।

* * * *

পার্লামেণ্টের প্রথম মহিলা সভ্যের বাণী।

The Woman Citizen নামক বিলাতের এক পত্রিকা পার্লিমেণ্টের প্রথম মহিলা সভ্য লেডী অ্যাষ্টরের বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল

"জগতে আমাদের কাজের দরকার পড়িয়াছে। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত জগৎ সার্থকতা হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে।

আমরা দেশে দেশে এই আদর্শ প্রচার করিব যে, এ পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি স্থাপন করিতে, পুরুষ ও নারীর এক যোগে কাজ করা দরকার।

অতি বড় সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমাদের নারীদের সম্মুখে রাজনীতি কোনও অতীত ইতিহাসের জের লইয়া আসে নাই। ইহা যে সৌভাগ্যের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ রাজনীতির কূটচক্র তার যুগযুগব্যাপী আবর্ত্তের মধ্যে সঞ্চিত আবর্জ্জনার স্তূপ লইয়া, যদি আজ নারীর নব সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহার সম্মুখে আসিত, তাহা হইলে, সেই জঞ্জাল অপসারণেই তার দুই কল্যাণ হস্ত ব্যাপৃত থাকিত, নূতন সৃষ্টি ঘটিয়া উঠিত কি না সন্দেহ। আজ তাহা নাই বলিয়া, যাহা কল্যাণ, যাহা সুন্দর বলিয়া নারী বুঝিবেন, কৃত কর্ম্মের বিনা অনুশোচনায় তাহাই মুক্ত কণ্ঠ ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

পুরুষ-পরিচালিত জগতের পাশাপাশি যদি নারীর অধিষ্ঠিত জগত না থাকে, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য আর কিছু ভাবিতে পারি না।

নারীর জীবনে পত্নীত্বের সম্পর্ক অল্পদিনের হইতে পারে, কিন্তু মাতৃত্ব তাহার চিরন্তন।

বাহিরের জীবন যত বাড়িবে ঘরের মধুরতা তত কমিবে।

আমরা পুরুষদের প্রতি সুবিচার করি নাই। সর্ব্বদা আমরা মনে মনে জানিয়াছি যে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল, কিন্তু সে কথা বলিবার সাহস দেখাই নাই।

আমরা পুরুষের নিকট হইতে যাহা পাইতে চাই তাহাই পাই।

খাঁটি নারী প্রকৃত খাঁটি জিনিসের আদর করেন।

নারীরা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যাহা আকাঙ্ক্ষা করেন রাজনীতিক্ষেত্রে তাহাই পাইবেন। আজ পর্য্যন্ত পুরুষ যাহা করিয়াছেন, তাহা অনুকরণ করাই যদি নারীর চরম কীর্ত্তি হয় তবে পৃথিবী যে নিকৃষ্টতর হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

*　　*　　*　　*

বাঙ্গলা দেশে শিক্ষা বিষয়ক সাহায্য।

শিক্ষাসচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয় বাঙ্গলা দেশের শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি।

তথা কথিত নিম্নশ্রেণীর ভিতর শিক্ষা বিস্তার।

স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি।

মফঃস্বলের কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থার প্রসার।

স্বাভাবিক মন্দ প্রকৃতিবিশিষ্ট শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রচেষ্টা। (Provision for education among children with criminal tendencies)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাধারণতঃ যাহা দেওয়া হয় তাহার অতিরিক্ত সাহায্য প্রদান।

ইহার সমস্তগুলিই অতি উত্তম প্রস্তাব। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহা যাহাতে বাস্তবিকই বিশেষভাবে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিলে খুব ভাল হয়। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক ব্যবস্থা শুধু ব্যবস্থাই থাকে, কার্য্যে পরিণত হয় না। এস্থলে ইহা না হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান সময়ে এ দেশের বালক ও যুবকগণের স্বাস্থ্য যেরূপ হইয়া যাইতেছে, তাহাতে পরবর্ত্তী জীবনে কঠোর জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। কাজেই এই দিকে এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া তিনি দেশের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। শিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গে তিনি একটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে যে প্রাইমারী স্কুলে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে তাহার অর্দ্ধেক ছাত্র বা ছাত্রী যেন বিনা বেতনে তথায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। শিক্ষা বিস্তারের সদিচ্ছাই যে ইহার প্রণোদক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এ বিষয়ের বিচার্য্য অন্যান্য দিক আছে।

প্রথমতঃ, বিদ্যালয়ে ধরাবাঁধা নিয়ম রহিল যে, অর্দ্ধেক ছাত্র ছাত্রী বিনা বেতনে পড়িতে পাইবে। তাহাতে তাহাদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। তাহাতে মনের ভাবের বৈষম্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকাতে, মানসিক অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সকল লোক সংসারে সমান হয় না, অবৈতনিক ও বেতনদাতা দুই শ্রেণীর ছাত্র হওয়াতে পড়াইবার ব্যবহারের তফাৎ বা বৈষম্য হইতে পারে; অবশ্য হইবেই বলিতেছি না, না ও হইতে পারে; তবে সকল দিক দেখিয়া ও ভাবিয়া নেওয়াই দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহারের বৈষম্য হইলেই মানুষ আপনাআপনি নিজেকে দীন হীন মনে করে, যাহা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। বালক বালিকারা আবার এসব অতি সহজে বুঝিতে ও ধরিতে পারে। সকলেই অবৈতনিক, অথবা নাম মাত্র বেতন হইলেও সকলকেই বেতন দিতে হয়, এরূপ হইলে মনে অন্য কোন ভাব আসিতে পারে না। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে সব বালক বালিকা জানিতে পারে যে, তাহারা দারিদ্র্যহেতু অন্যের নিকট সাহায্য পায় (charity boys) তাহাদের অভিমান বেশী হয়, কিন্তু আত্মসম্মান জাগে না। আত্মসম্মান বিহীন শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা হইতে পারে না। সকলে অবৈতনিক হইলে বা সকলেই বেতন দিলে, নিজেকে দীন হীন বলিয়া মনে কোন ভাব আসিতে পারে না, বরং নিজের ও যে অন্য সকলের সঙ্গে সমান অধিকার আছে সে জ্ঞান জন্মে। হয়, বেতন হারে খুব কমাইয়া দিলে নতুবা অন্য আর একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় (free school) করিবার ব্যবস্থা করিলে সুবিধা ও শিক্ষার বিস্তার দুই হইতে পারে।

মাননীয় শিক্ষাসচিব মহাশয় এই সঙ্গে আর একটী বিষয়ের প্রবর্ত্তনা করিলে খুব ভাল ব্যবস্থা করিতেন। সাধারণতঃ বালকদের স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে অতি অল্পবেতনে দারিদ্র্য-সংগ্রাম প্রপীড়িত, জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বিহীন শিক্ষক দলই দেখিতে পাওয়া যায়। অভাব-গ্রস্ত হওয়াতে, তাঁহাদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সকাল সন্ধ্যায় অন্য কাজ জুটাইয়া নিতে হয়। কর্ম্মক্লান্ত, দারিদ্র্য-সংগ্রাম-প্রপীড়িত এই শিক্ষকগণের হাতে ভবিষ্যদ্বংশীয় বালকগণের শিক্ষা ন্যস্ত হওয়াতে অধিকাংশ জায়গায়ই অনুপযুক্ততা প্রমাণিত হয়। অল্প বেতনে যোগ্য লোক পাওয়া যায় না। অনুপযুক্ততা হেতু দায়িত্ব জ্ঞান ইঁহাদের অধিকাংশ জায়গায়ই কম হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক বালকের জীবনে বিষম ক্ষতি হইয়া থাকে। বেশী বেতন দিয়া শিক্ষক যাহাতে উপযুক্ত হইতে পারেন তাহা করিলে ভাল হয়।

পরিণত বয়সে অনেক যুবককে নিম্নশ্রেণীতে দায়িত্ববিহীন অনুপযুক্ত শিক্ষকদের নিকট তাহাদের জীবনের বিশেষ ক্ষতির কথা বলিয়া দুঃখ করিতে শোনা যায়।

শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় শিক্ষার উন্নতি ও সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছেন, তাই এই অতি গুরুতর বিষয়ের বিবেচনা ও উপায় নির্ণয়ের ব্যবস্থার কথা বলা হইল। এই সব বিষয়ের ব্যবস্থা হইলে দেশের সমূহ উপকার সাধিত হইবে।

সম্পাদকীয় সঙ্ঘ।

সম্প্রতি কলিকাতার ইণ্ডিয়ান জারনেলিষ্ট এসোসিয়েসন নামে কাগজ সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের জন্য একটী সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। সঙ্ঘটীর উদ্দেশ্য কাগজ সম্পর্কিত সকলের ভিতরে একটা ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ও তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ স্বার্থরক্ষার জন্য সম্মিলিত চেষ্টা করা। কাগজসংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিই এই সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারিবেন।

গত ১৬ই জুলাই সঙ্ঘের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। তাহাতে স্থির হইয়াছে সঙ্ঘের, একজন সভাপতি, একজন কর্ম্মসচিব, তিন জন সহকারী কর্ম্মসচিব ও কলিকাতা হইতে ১৫ জন ও মফঃস্বল হইতে ৬ জন লইয়া একটী কর্ম্ম সমিতি (executive committee) থাকিবে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় সভাপতি ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় কর্ম্মসচিব মনোনীত হইয়াছেন।

বর্ত্তমানে ও অতীতে এরূপ বৃত্তি-অনুযায়ী সঙ্ঘ গঠিত হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বহু বৎসর পূর্ব্বে 'প্রেস এসোসিয়েসন' নামে একটী সঙ্ঘ-সৃষ্টির আয়োজন হইয়াছিল কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে 'প্রেস এসোসিয়েসন অব ইণ্ডিয়া" নামে একটী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য ও প্রায় এইরূপই ; কাগজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও মুদ্রাযন্ত্র সত্বাধিকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।

বর্ত্তমানে, দৃশ্যতঃ মুদ্রাযন্ত্র আইনের কড়াকড় বহুপরিমাণে কমিয়া গেলেও, লেখক সম্প্রদায়ের বিপদ যে কাটে নাই, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। চারিদিকে যেরূপ মানহানির মোকদ্দমা, সিডিসনের মোকদ্দমা ও নানারূপ উপদ্রব, মনে হয়, এই সব দেখিয়াই উদ্যোগকর্ত্তারা এরূপ একটী সঙ্ঘ গঠনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। অবশ্য শুধু বর্ত্তমান সরকারী বিপদ হইতে লেখক সম্প্রদায়কে রক্ষা করাই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নয়, ইহার উদ্দেশ্য আরও বিস্তৃত। বর্ত্তমানে আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন যেরূপ ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে কাগজ ও লেখক সম্প্রদায়ের উপর গুরুভার ন্যস্ত। তাঁহারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পবিত্রতা রক্ষার আদর্শ দাতা। যাহাতে তাঁহারা এই গুরুভার সহজে ও আপন বিবেকানুযায়ী বহন করিতে পারেন—সঙ্ঘের এ বিষয়ে অনেক করিবার আছে। ইহা ব্যতীত সঙ্ঘের একটী প্রীতিকর কাজ আছে। লেখকগণের মধ্যে সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা।

সঙ্ঘের কর্ম্মসমিতির গত বৈঠকে দুইটী প্রস্তাব পাশ হইয়াছে :—

প্রথম—রাজকর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে লিখিয়া যে সমস্ত সম্পাদক মানহানির জন্য অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছেন তাঁহাদের মোকদ্দমা সংক্রান্ত ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া, মতামত জানাইবার জন্য একটী উপসমিতি (Sub-committee) গঠন করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়—অভিযুক্ত কর্ম্মচারীর অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সম্যক অনুসন্ধান করিবেন এবং অনুসন্ধানে যদি কর্ম্মচারী নির্দ্দোষ প্রমাণিত হন, তবে গবর্ণমেণ্ট একটী ইস্তাহার জারী করিবেন। সম্পাদক বিনাপ্রতিবাদে তাহা মুদ্রিত করিলে, গবর্ণমেণ্ট কোন কর্ম্মচারীকেই মানহানির মোকদ্দমা আনয়ন করিতে অনুমতি দিবেন না। সমিতি গবর্ণমেণ্টের ইহাই কর্ত্তব্য মনে করেন।"

দ্বিতীয় প্রস্তাবটীতে মনে হয়, সঙ্ঘ, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও পত্রিকা সম্পাদক এই উভয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টের সমদৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিতেছেন ; কার্য্যতঃ তাহা কি দেখা যায় ? তাহা হইলে অভিযুক্ত কর্ম্মচারীর দোষ ক্ষালনার্থ গবর্ণমেণ্ট অর্থব্যয় কেন করিয়া থাকেন ? আর তাহা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের ইহার মধ্যে আসিবার দরকার কি ? অভিযোগ যাহার নামে প্রতিবাদ তো তিনিই করিতে পারেন।

লাহোর প্রকাশ প্রিণ্টিং প্রেসে এইরূপ একটী মোকদ্দমা হয়। পুলিসের বিরুদ্ধে লেখায় গবর্ণমেণ্ট জামীনের দুই হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেন। ঐ প্রেস পঞ্জাব হাইকোর্টে আপীল করেন। আপীলের রায় দিবার সময় রায়ে বিচারপতি তিনজন বলিয়াছেন যে, "কয়েকজন

পুলিশের নামে দোষারোপ করায় এই প্রেসের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। কিন্তু কয়েকজন পুলিশের নামে কিছু লিখিলেই যে তাহাতে গবর্মেণ্টকে হীন বা হেয় করা হইল তাহা মনে করা ভুল।"

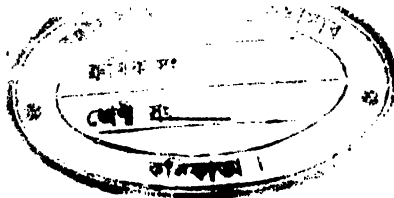
* * * *

কয়েকজন নেতার কারামুক্তি।

দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে গত ৯ই আগষ্ট রাত্রিতে ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে গত ৪ঠা আগষ্ট মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের অসাধারণ ত্যাগ ও দুঃখ বরণে দেশমাতার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। আমরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

লয়েড জর্জ্জের বক্তৃতা।

বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ বিলাতের পার্লামেণ্টের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"এই শাসন সংস্কার ভারতের পক্ষে পরীক্ষা (experiment) মাত্র। এই পরীক্ষায় ভারত পাশ হইতে না পারিলে ঐ শাসন সংস্কার প্রয়োজনানুসারে কাট ছাঁট করা যাইবে। ইংরেজ কখনও কোন কালে ভারত ত্যাগ করিবেন না, সিবিলিয়ান প্রমুখ ভারতের আমলাদের কখনও উচ্ছেদ করা হইবে না।" প্রধান মন্ত্রীর এই কথায় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। কর্ণেল ওয়েজউড প্রভৃতি ভারতবন্ধু ইংরাজগণ "ইহা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ" বলিয়া লয়েড জর্জ্জকে দোষ দিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সে সময়কার ষ্টেট সেক্রেটারী-রূপে লর্ড ক্রু হাউস অব লর্ডসে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী কখন স্বায়ত্তশাসন পাইবে না। তাহার কয় বৎসর পরে স্বয়ং সম্রাট ঘোষণা করিলেন ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যান্তর্গত স্বরাজ পাইবে। সুতরাং এ সকল বক্তৃতাতে আশ্বস্ত বা নিরাশ কোন পক্ষেরই কিছুই হইবার কারণ নাই। তা ছাড়া শাসনসংস্কার পদ্ধতি (Reform Bill) তে আমরা কতটা অধিকার পাইয়াছি তাহাও ত দেখিতেছি। এ সব বক্তৃতার কুহকে মুগ্ধ বা ভাষার বিশ্লেষণে শক্তির অপব্যয় না করিয়া নিজেদের আত্মোন্নতির চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ। সাধনায় সিদ্ধিলাভ নিশ্চয়।



[redacted]

নব্যভারত

চত্বারিংশ খণ্ড]   আশ্বিন, ১৩২৯   [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমার মনে এর ভাবটী, সঙ্কল্পটি কোন একটি বিশেষ সময়ে যে ভেবে চিন্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই সঙ্কল্পের বীজ আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শটী জাগ্রত হয়ে উঠেচে।

আপনারা জানেন যে আমি যথোচিত ভাবে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলিনি। আমার পরিবারে আমি যে ভাবে মানুষ হয়েছি তাতে ক'রে আমাকে সংসার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল,—আমি একান্ত বাসী ছিলাম। মানব সমাজের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ট যোগ ছিলনা আমি তার প্রান্তে মানুষ হয়েছি। "জীবন-স্মৃতি"তে এর বিবরণ পড়ে থাকবেন। আমি সমাজের থেকে দূরে বাস করতুম বলে, তার দিকে বাতায়নের পথ দিয়ে দৃষ্টিপাত করেছি। তাই আমার কাছে দূরের দুর্লভ জিনিষের প্রতি আকর্ষণ খুব গভীর ছিল। কলকাতা সহরে আমার বাস ছিল, কাজেই ইঁট কাঠ পাথরের মধ্যে আমার গতিবিধি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। আমাদের চারিদিকেই বাড়ী গুলি মাথা তুলে থাকৃত, আর তাদের মাঝখানে অল্প পরিধির মধ্যে সামান্য কয়েকটি গাছ পালা আর একটী পুষ্করিণী ছিল। কিন্তু দূরে আমাদের পাড়ার বাইরে বেশী বড় বাড়ি ছিলনা একটু পাড়াগাঁ গোছের ভাব ছিল।

সে সময় আমাকে বাইরের প্রকৃতি ডাক দিয়াছিল। মনে আছে মধ্যাহ্নে লুকিয়ে একলা ছাদের কোনটি গ্রহণ করতুম। উন্মুক্ত নীলাকাশ, চিলের ডাক আর পাড়ার গলির জনতার বিচিত্র ছোট ছোট কলধ্বনির মধ্য দিয়ে বাড়ীর ছাদের উপর থেকে যে জীবন যাত্রার খণ্ড খণ্ড ছবি পেতুম, তা আমার হৃদয়কে আন্দোলিত করেছিল। এর মধ্যে মানব প্রকৃতির ও একটা ডাক ছিল। দূর থেকে কখনো বা লোকালয়ের উপর রাত্রের ঘুম পাড়ানো সুর কখনো বা প্রভাতের ঘুম জাগানো গান আর উৎসব কোলা-হলের নানা রকম ধ্বনি আমার হৃদয়কে উতলা করে দিয়েছিল। বর্ষার নব মেঘাগমে

আকাশের লীলা বৈচিত্র্য আর শরতের শিশিরে ছোট বাগানটীতে ঘাস ও নারিকেল রাজির ঝলমলানি আমার কাছে অপূর্ব্ব হয়ে দেখা দিত। মনে আছে অতি প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তার অপেক্ষা করছি। সকালের সেই শিশিরের উপর সোনার আলো আমার হৃদয়ে নিবিড় গভীর আনন্দ-বেদনার সঞ্চার করেছে। বিশ্বজগৎ যেন আমাকে বার বার করে আহ্বান করে বলেছে,—"তুমি আমার আপনার, আমার মধ্যে যে সত্য আছে তা সকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা রাখে, কিন্তু তবুও তোমায় আমায় এই বিরহের মধ্যেও মাধুর্য্য রয়েছে।" তখনও এই বহির্বিশ্বের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্ট ভাবে ঘনিয়ে উঠেছে, ছোট ঘরের ভিতরকার মানুষটিকে বাইরের ডাক গভীর ভাবে মুগ্ধ করেছিল।

তারপর আমার মনে আছে যে প্রথম যখন আমাদের সহরে ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মত এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকট ভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারিনা। আপনারা অনেকে পল্লীগ্রাম থেকে আসছেন, অনেকেরই পল্লীর সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ। আপনারা তার শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনরাজি দেখে থাকবেন কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। ইঁট কাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা যে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুঝেছিলুম অল্প লোকের ভাগ্যেই তা ঘটে। সকালে কুঠীর পানসি দক্ষিণ দিকে যেত সন্ধ্যায় তা উত্তরগামী হত। নদীর দুধারে, এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মানুষের এই জীবন যাত্রার যোগ, গ্রাম বাসীদের এই স্নান পান তর্পণ এই সকল দৃশ্য আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রাম গুলি যেন গঙ্গার দুই পারকে আঁকড়ে রয়েছে—পিপাসার জলকে স্তন্যরসের মত গ্রহণ করে নিয়েছে। আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম যাওয়া, আর সে সময়ে সেখানকার সূর্য্যের উদয়াস্ত যে আমার কাছে কি অপরূপ লেগেছিল তা কি বলব। এই যে বিশ্বজগতে প্রতিমুহূর্ত্তে অনির্ব্বচনীয় মহিমা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতি পরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় আপনারা তার উল্লেখ দেখেছেন। কোনো মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্ব্বতা একবার "না" হয়ে গেছে, নেই বল্লেই হয়। তার রহস্য, মাধুর্য্য, তার মনে যেমন সাড়া দেয় না। আকাশে দিনের পর দিন যেন আশ্চর্য্য একটি কাব্য গ্রন্থে পাতার পর পাতা উদ্‌ঘাটন করে' বিশ্বকবির মর্ম্মকথাটি বার বার প্রকাশ করতে থাকে, আমরা মাঝখান থেকে অতি পরিচয়ের অন্তরালে তার রস থেকে বঞ্চিত হই। তাই প্রকৃতির রসধারার স্পর্শে আমার মন সে সময়ে যে রকম উৎসুক হয়ে উঠেছিল আজও তার প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে যায়নি এ কথাটা বলার দরকার আছে। এতটা আমি ভূমিকা স্বরূপ বল্লুম। যে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ দিকে চালনা করছিল এই সময়কার জীবন যাত্রা তার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ব্যাপার।

এমনি আর একটি অনুকূল ঘটনা ঘটল যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করতে লাগলুম। পদ্মাতটের সেই আম-জাম-ঝাউ বেত আর শর্ষের ক্ষেত, ফাল্গুনের মৃদু সৌগন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জ্জন চরে কলধ্বনি মুখরিত বুনো হাঁসের বসতি, সন্ধ্যা তারায় জ্বল জ্বল করা নদীর স্বচ্ছ গভীরতা এ সব আমার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। তখন পল্লীগ্রামে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সম্মিলিত জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল।

অল্পবয়সে আমি আর একটি জিনিস পেয়েছি। মানুষের থেকে দূরে বাস করলেও এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাটিয়ে থাকলেও আমি বাড়ীতে আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গীত সাহিত্য শিল্প কলার চর্চ্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি, এটি আমার জীবনের খুব বড় কথা। আমি শিশু কাল থেকে পলাতক ছাত্র, মাষ্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্ব সংসারের যে সকল অদৃশ্য মাষ্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাদের কাছে কোনো রকমে আমি পড়া শিখে নিয়েছি। আমাদের বাড়ীতে নিয়ত ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যের ও সঙ্গীতের আলোচনা হ'ত আমি এসবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এই সকল বিদ্যা যথার্থভাবে শিক্ষা লাভ না করলেও এথেকে ভিতরে ভিতরে আশ পাশ হ'তে নানা উপায়ে মনে মনে আনন্দরস সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার বড়দাদা তখন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে নিরত ছিলেন। বনস্পতি যেমন স্বচ্ছন্দে প্রচুর ফুল ফুটিয়ে, ফল ধরিয়ে ও ইতস্তত: বিস্তর খসিয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয়, তাতে তার কোনো অনুশোচনা নেই; তেমনি তিনি খাতায় যতটা লেখা রক্ষা করতেন তার চেয়ে ছেঁড়া কাগজে বাতাসে ছড়াছড়ি যেত অনেক বেশি। আমাদের চলা ফেরার রাস্তা সেই সব বিক্ষিপ্ত ছিন্ন পত্রে আকীর্ণ হয়ে গেছে। সেই সকল অবারিত সাহিত্য রচনার ছিন্নপত্রের স্তূপ আমার চিত্ত ধারায় পালিমাটির সঞ্চয় রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

তারপর আপনারা জানেন আমি খুব অল্প বয়স থেকেই সাহিত্য চর্চ্চায় মন দিয়েছি আর তাতে করে নিন্দা খ্যাতি যা পেয়েছি তারই মধ্য দিয়ে লেখনী চালিয়ে গিয়েছি। তখন একটা বড় সুবিধা ছিল যে সাহিত্য ক্ষেত্রে এত প্রকাশ্যতা ছিল না, সাহিত্যের এত বড় বাজার বসেনি,—ছোট হাটেই পসরা দেওয়া নেওয়া চলত। তাই আমার বাল্য রচনা আপন কোণ টুকুতে কোনো লজ্জা পায় নি। আত্মীয় বন্ধুদের যা একটু আধটু প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছি তাই যথেষ্ট মনে করেছি। তারপর ক্রমে বঙ্গ সাহিত্যের প্রসার হল, তার চর্চ্চা ব্যাপকতা লাভ করল! সাহিত্য ক্ষেত্রে জনতায় আক্রান্ত হল। দেখতে দেখতে রাত্রির আকাশে তারার আবির্ভাবের মত, সাহিত্যাকাশ অসংখ্য লেখকের দ্বারা খচিত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তৎসত্বেও আমার সাহিত্য চর্চ্চার মধ্যে বরাবর সেই নির্জ্জনতাই ছিল। এই বিরল বাসই আমার একান্ত আপনার জিনিস ছিল। অতিরিক্ত প্রকাশ্যতার আঘাতে আমি কখনো সুস্থ বোধ করিনি। আমি ৪০।৪৫ বছর পর্য্যন্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাসটীতে আপন খেয়ালে সাহিত্য রচনা করেছি। আমার কাব্য সৃষ্টির যা কিছু ভালমন্দ তা সে সময়েই লেখা হয়েছে।

যখন এমি সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটাচ্ছি তখন আমার অন্তরের একটা

আহ্বান একটা প্রেরণা এল যার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে আমার মন ব্যাকুল হ'ল। যে কর্ম্ম করবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা হ'ল তা হচ্ছে শিক্ষাদান কার্য্য। এটা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যে আমার যোগ ছিলনা তা তো আগেই বলেছি। কিন্তু এই ভারই যে আমাকে গ্রহণ করতে হ'ল তার কারণ হচ্ছে আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, তা দূর না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। আমি একথা বলছিনা যে এই গুরুতর অভাব শুধু আমাদের দেশেই আছে—সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীণ হতে পারছে না—সর্ব্বত্রই বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে abstract ব্যাপার করে ফেলা হয়।

তখন আমার মনে একটি দূর কালের ছবি জেগে উঠ্‌ল। যে তপোবনের কথা পুরাণ কথায় পড়া যায়, ইতিহাস তাকে কতখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না, কিন্তু সে বিচার ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে তপোবনের শিক্ষা প্রণালীতে খুব একটি বড় সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য্য আছে তেমনই অপর দিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষা তখন মানব জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্ত ব্যাপার হয় না। বনের ভিতর থেকে তপোবনের হোম ধেনু দোহন করে, অগ্নি প্রজ্জলিত করে নানা ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে যে জীবন যাপনের ব্যবস্থা প্রাচীন-কালে ছিল তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাদের গুরুরূপে বরণ করা হয় তাদের সঙ্গে এইরূপ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে, একত্র মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে খুব একটা বড় শিক্ষা আছে। এতে করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গুরুশিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠে উঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে কিন্তু তার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি, তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য্য আছে তা সকল কালের। বর্ত্তমান কালে ও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়।

এই চিন্তা যখন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার ভার নিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তখন শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে তপোবনের ভাবে পূর্ণ ছিল। আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষ ভাবে জানি যে তিনি কি পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগ সাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্ত ভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে এই অনুভূতি তাঁর কাছে বাহিরের জিনিস ছিলনা। তিনি রাত্রি দুটোর সময় উন্মুক্ত ছাদে বসে তারাখচিত রাত্রিতে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীতলে

বসে' প্রাণের পাত্রটী পূর্ণ করে সুধা ধারা পান করেছেন। যিনি সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হ'ল যে যদি ছাত্রদের মহর্ষির সাধনস্থল এই শান্তিনিকেতনে এনে বসিয়ে দিতে পারি তবে তাদের সঙ্গে থেকে নিজের যেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারলে বাকিটুকুর জন্য আমাকে ভাব্‌তে হবেনা, প্রকৃতিই তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগের জন্য সকলের চিত্তেই যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে, তার নিবৃত্তি করবার চেষ্টা কর্‌তে হবে, যে স্পর্শ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তাকে যোগাতে হবে।

তখন আমার সঙ্গীসহায় খুবই অল্প। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভাল বাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বল্লেন, "আপনি মাষ্টারী করতে না জানেন আমি সে ভার নিচ্ছি।" আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য করুণ রসের উদ্রেক করে' তাদের হাসিয়েছি, কাঁদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটী ছোট গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করে ৫।৭দিন ধরে একটী ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম। তখন মুখে মুখে গল্প তৈরী করবার আমার শক্তি ছিল। এই সব বানান গল্পের অনেকগুলি আমার "গল্পগুচ্ছে" স্থান পেয়েছে। এমনি ভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে-গল্পে-গানে রামায়ণ মহাভারত পাঠে সরস হয়ে উঠে তার চেষ্টা করেছি।

আমি জানি ছেলেদের এম্নি ভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া একটা attitude তৈরী করে তোলা খুব বড় কথা। মানুষের যে এতবড় বিশ্বের মধ্যে এতবড় মানব সমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এত বড় উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই দুর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়েছে চাকরী এবং বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু মানুষকে আপন অধিকারটী চিনে নিতে হবে। সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সামঞ্জস্য সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানব বিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে।

আমাদের দেশবাসীরা "ভূমৈব সুখম" এই ঋষি বাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করচে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধন পথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিক্রান্ত হয়েছে, তাঁরা জেনেছেন যে ভূমৈব সুখম"— দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্যও অকিঞ্চিৎকর জীবন যাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রাচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটচে।

তাই শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার এ কথা মনে হল যে আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে। যে গঙ্গার ধারা গিরিশিখর থেকে উত্থিত হয়ে দেশ দেশান্তরে বহমান হয়ে চলেছে মানুষ তার জলকে সংসারের ছোট বড় সকল কাজেই লাগাতে পারে। তেমনি যে পাবনী বিদ্যাধারা কোন উত্তুঙ্গ মানব চিত্তের উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলছে; যা পূর্ব্বপশ্চিমবাহিনী হয়ে দিকে দিকে নিরন্তর স্বতঃ উৎসারিত হচ্ছে, তাকে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পরিধির মধ্যে বাঁধ বেঁধে ধরে রেখে দেখ্‌ব না, কিন্তু যেখানে তা পূর্ণ মানবজীবনকে সার্থক করে তুলেছে, তার সেই বিরাট বিশ্বরূটী যেখানে পরিস্ফুট হয়েছে, সেখানে আমরা অবগাহন করে শুদ্ধ নির্ম্মল হব।

"স তপোঽ তপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বম্ সৃজত যদিদং কিঞ্চ।" সৃষ্টিকর্ত্তা তপস্যা করেচেন, তপস্যা করে সমস্ত সৃজন করচেন। প্রতিঅণু পরমাণুতে তাঁর সেই তপস্যা নিহিত। সেজন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্ত্তন। সৃষ্টিকর্ত্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলেছে, সেও চুপ করে বসে নেই। কেন না মানুষও সৃষ্টিকর্ত্তা, তার আসল হচ্ছে সৃষ্টির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে, সঞ্চয় করে, এই তার বড় পরিচয় নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃক্ষেত্রে তার ও তপঃসাধনা। মানুষ হচ্চে তপস্বী, এই কথাটা উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবেরা সত্য ধর্ম্ম বলে বড় করে জানতে হবে।

আজকার দিনে যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ব্ব জাতির ও সর্ব্বদেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদেরও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে। আমি যখন বিশ্বভারতী স্থাপিত করলুম তখন এই সংকল্পই আমার মনে কাজ করছিল। আমি বাঙ্গালী বলে' আমাদের সাহিত্য রসের চর্চ্চা কেবল বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্ব সংসারে জন্মাই নি? আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক যত কবি যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করছেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কি কম গৌরব আছে?

আমার মুখে এই কথা অহমিকার মত শোনাতে পারে আজকের কথা প্রসঙ্গে তবু আমার বলা দরকার যে য়ুরোপে আমি যে সম্মান পেয়েছি তা রাজা মহারাজারা কোন কালে পায় নি। এর দ্বারা একটা কথার প্রমাণ হচ্ছে যে মানুষের অন্তর প্রদেশের বেদনা-নিকেতনে জাতিবিচার নাই। আমি এমন সব লোকের কাছে গিয়েছি যাঁহারা মানুষের গুরু, কিন্তু তাঁরা স্বচ্ছন্দে নিঃসঙ্কোচে এই পূর্ব্বদেশ বাসীর সঙ্গে শ্রদ্ধার আদান প্রদান করেছেন। আমি কোথায় যে মানুষের মনে সোনার কাঠি ছোঁয়াতে পেরেছি, কেন যে য়ুরোপের মহাদেশ বিভাগে এরা আমাকে আত্মীয়রূপে সমাদর করেছে সে কথা ভেবে আমি নিজেই বিস্মিত হই। এমনি ভাবেই স্যর জগদীশ বসুও যেখানে

নিজের মধ্যে সত্যের উৎস ধারার সন্ধান পেয়েছেন এবং তা মানুষকে দিতে পেরেছেন সেখানে সকল দেশের জ্ঞানীরা তাঁকে আপনার বলেই অভ্যর্থনা করে নিয়েছে।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নিরন্তর বিদ্যার সমাদর হচ্ছে। ফরাসী ও জার্ম্মানদের মধ্যে বাইরের ঘোর রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও উভয়ের মধ্যে বিদ্যার সহযোগিতার বাধা কখনো ঘটে নি। আমরাই কেন শুধু চিরকেলে 'স্কুলেবয়' হয়ে একটু একটু করে মুখস্থ করে পাঠ শিখে নিয়ে পরীক্ষার আসরে নামব, তার পর পরীক্ষা পাশ করেই সব বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়ে বসে থাকব। কেন সকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপস্যার বিনিময় হবে না? এই কথা মনে রেখেই আমি বিশ্ব-ভারতীতে আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে য়ুরোপের অনেক মনস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছিলুম। তাঁরা একজনও সেই আমন্ত্রণের অবজ্ঞা করেন নি। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্ততঃ আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে। তিনি হচ্ছেন প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি। তার সঙ্গে যদি আপনাদের নিকট সম্বন্ধ ঘটত তা হলে দেখতেন যে তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ, তাঁর হৃদয় তেমনি বিশাল। আমি প্রথমে সঙ্কোচের সঙ্গে অধ্যাপক লেভির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব জানালুম, তাঁকে বল্লুম যে আমার ইচ্ছা যে ভারতবর্ষে আমি এমন বিদ্যাক্ষেত্র স্থাপন করি যেখানে সকল পণ্ডিতের সমাগম হবে, যেখানে ভারতীয় সম্পদের একত্র সমাবেশের চেষ্টা হবে। সে সময় তাঁর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল। হার্ভার্ড পৃথিবীর বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আমাদের বিশ্বভারতীর নাম ধাম কেউ জানে না, অথচ এই অখ্যাতনামা আশ্রমের আতিথ্য লেভি সাহেব অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আপনারা মনে করবেন না যে তিনি এখানে এসে শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন "এ যেন আমার পক্ষে স্বর্গবাস।" তিনি যেমন বড় পণ্ডিত ছিলেন তাঁর তদনুরূপ যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়া গিয়াছিল তাও বলা যায় না কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করেন নি, তিনি ভাবের গৌরবেই কর্ম্মগৌরব অনুভব করেছেন, তাই এখানে এসে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে ফ্রান্স জর্ম্মনি সুইজারল্যাণ্ড আষ্ট্রীয়া বোহিমিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ থেকে অজস্র পরিমাণ বই দানরূপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।

বিশ্বকে সহযোগী রূপে পাবার জন্য শান্তিনিকেতনে আমরা সাধ্যমত আসন পেতেছি কিন্তু একহাতে যেমন তালি বাজেনা, তেমনই একপক্ষের দ্বারা এই চিত্তসমবায় সম্ভবপর হয় না। যেখানে ভারতবর্ষ এক জায়গায় নিজেকে কোণ-ঠেসা করে রেখেছে সেখানে কি সে তার রুদ্ধ দ্বার খুলবে না? ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বকে একঘরে করে' রাখার স্পর্দ্ধাকে নিজের গৌরব বলে জ্ঞান করবে?

আমার ইচ্ছা, বিশ্বভারতীতে সেই ক্ষেত্রটী তৈরী হয় যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কল্যাণজনক ও আত্মীয় জনোচিত হয়। ভারতবর্ষকে অনুভব করতে হবে যে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে মানুষকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করাতে অগৌরব বা

দুঃখের কারণ নেই, যেখানে মানুষের পরস্পরের সম্পর্কটি পীড়াজনক নয়। আমার পাশ্চাত্য বন্ধুরা আমাকে কখনো কখনো জিজ্ঞাসা করেছেন—তোমাদের দেশের লোকে কি আমাদের গ্রহণ কর্ব্বে? আমি তার উত্তর জোরের সঙ্গে বলেছি হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ভারতীয়েরা আপনাদের কখনো প্রত্যাখ্যান করবেনা।' আমি জানি যে বাঙালীর মনে বিদ্যার গৌরব বোধ আছে, বাঙালী পাশ্চাত্য বিদ্যাকে অস্বীকার করবেনা। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা ভেদ ও মতবাদ সত্বে ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই সর্ব্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা, বাঙালীর রক্তের জিনিষ হয়ে গেছে। যারা অতি দরিদ্র,—যাদের কষ্টের সীমা নেই—তারা ও বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা ভদ্র পদবী লাভ করবে বলে' আকাঙ্ক্ষা বাংলা দেশেই করে। বাঙ্গালী যদি শিক্ষিত না হতে পারে তবে সে ভদ্র সমাজেই উঠ্‌তে পারলনা। তাই তো বাঙ্গালীর বিধবা মা ধান ভেনে' সুতো কেটে প্রাণপাত করে' ছেলেকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র হয়। তাই আমি মনে করেছিলুম যে বাঙালী, বিদ্যা ও বিদ্বানকে অবজ্ঞা করবে না, তাই আমি পাশ্চাত্য জ্ঞানীদের বলে এসেছিলাম যে 'তোমরা নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে আমাদের দেশে আস্‌তে পার তোমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হবেনা।'

আমার এই আশ্বাস-বাক্যের সত্য পরীক্ষা বিশ্বভারতীতেই হবে। আশা করি এই খানে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, বৃহৎ মানব সমাজে যেখানে জ্ঞানের যজ্ঞ চলচে সেখানে সত্য-হোমানলে আহুতি দেবার অধিকার আমাদের ও আছে; সমস্ত দেশ ও কালের জ্ঞান সম্পদ আমরা আপনার বলে দাবী করতে পারি এই গৌরব আমাদের; মানুষের হাত থেকে বর ও অর্ঘ্য গ্রহণের যে স্বাভাবিক অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে, কোনো মোহ বশতঃ আমরা তার থেকে লেশমাত্র বঞ্চিত নই; আমাদের মধ্যে সেই বর্ব্বরতা নেই যা দেশকাল পাত্র নিরপেক্ষ জ্ঞানের আলোককে আত্মীয় রূপে স্বীকার করেনা, তাকে অবজ্ঞা করে লজ্জা পায় না, প্রত্যাখ্যান করে' নিজের দৈন্য অনুভব করতে পারেনা।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রুদ্ধ কক্ষ

আমার বুকের মাঝে ঘর একখানি
ছিল শুধু চাবী দেওয়া। পারিনি খুলিতে
কোন মতে সে কবাট, পারিনি জানিতে
কি যে ছিল সেই ঘরে। শত চাবী
আনি বৃথা চেষ্টা শতবার করেছিনু কত
খুলিতে সে রুদ্ধদ্বার। কি ছিল আমার
অজানিত সে প্রকোষ্ঠে, তাই অবিরত
ভাবিতাম কুতূহলী—শুধু অন্ধকার,
শুধু শূন্য? অথবা সে ঘরখানি ভরা
ছিল মোর পরিপূর্ণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
রিক্ত জীবনের সর্ব্বদুঃখ-দৈন্যহরা?
তুমি এলে জীবনে, অঞ্চলে তোমার
সোণার চাবিটি বাঁধা। দুয়ার নিমেষে
খুলি গুপ্ত ধনরাশি দেখাইলে হেসে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

* প্রেসিডেন্সী কলেজ য়ুনিয়নে প্রদত্ত বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত অনুলিখিত।

সৌন্দর্য্য

সৌন্দর্য্য বোধ জিনিষটা খুব পুরাতন। মানুষ বসনের বহুপূর্ব্ব হইতেই ভূষণের পক্ষপাতী। এ পক্ষপাতের জের আজিও চলিতেছে, তাই প্রয়োজন অপেক্ষা অপ্রয়োজনেরই সমারোহ অধিক। এমন কি, মানুষের সমগ্র জীবনই যেন সৌন্দর্য্যকামীর এক বিরাট অভিযান,—তাহাতেই জীবনাদর্শকে কখনও ত্যাগের, কখনও ভোগের দিকে বাড়াইয়া তুলিয়া নানা বিচিত্র সভ্যতার সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষই সৌন্দর্য্যের একমাত্র দ্রষ্টা ও ভোক্তা নহেন। পশু পক্ষীর সখ্য ও সঙ্গীপ্রীতির মূলেও এই সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা। বসন্তাগমে দিক্‌সকল যখন প্রসন্ন হয়, ধরিত্রী ভূষণপ্রিয়া ছোট মেয়েটীর মত নব পরিচ্ছদে হাস্যময়ী হইয়া উঠেন, পরিমলবাহী মন্দবায়ুর সুখস্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে পুলকসঞ্চার করিয়া দেয়, অনুগ্র রবিকর শীতের জড়িমা দূর করিয়া জগতে নবজাগরণ আনিয়া দেয়, নিশারাণী কখনও বা কৃষ্ণবাসে আত্মগোপন করিয়া কোটী চক্ষে সুপ্তধরণীর শান্তি সুখ উপভোগ করেন এবং কখনও বা শশাঙ্ককিরীট ও অংশুবাসে শোভিত হইয়া প্রেমবৃন্দাবনে রাসলীলার সৃষ্টি করিতে থাকেন,—তখন মানবশিশুর অর্থহীন ধাবন কুর্দ্দনে মৃগশিশুও যোগদান করে, মানবের হাস্যকলরব ভ্রমরগুঞ্জনে ও বিহগ কূজনে মধুময় হইয়া উঠে, এবং তরুলতাকুল পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়া পারিপার্শ্বিক আনন্দ লহরীর সহিত ছন্দোরক্ষা করিতে উদ্‌যুক্ত হয়; জড় চেতনের চির বিরোধ যেন মিটিয়া গিয়া এক প্রীতিসম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এই খানেই কি শেষ? অণুর প্রতি অণুর আকর্ষণে, সূর্য্যের প্রতি বসুন্ধরার আকর্ষণেও কি সেই একই প্রীতিবন্ধ বিদ্যমান নাই? "যাহা ছিলনা তাহা আইসে না, যাহা আছে তাহা প্রথম হইতেই ছিল" এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সৌন্দর্য্যবোধকে মানুষের মধ্যে আকস্মিক আবির্ভাব বলিয়া মনে করিবার কারণ কি? মানুষ সৃষ্টির এক স্তর মাত্র, তাহার উপরে ও নীচে অসংখ্য স্তর বর্ত্তমান, এবং যে স্তর যত দূরবর্ত্তী তৎ সম্বন্ধে জ্ঞানও তত অল্প। মনুষ্য যেমন ইতর প্রাণীকে সৌন্দর্য্যবোধশূন্য মনে করিয়া কৃপার চক্ষে দেখেন, দেবতাগণ হয়ত মানুষকে আবার ঠিক্ সেই কারণেই কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। প্রকৃত কথা এই যে সৌন্দর্য্যবোধ বীজরূপে গোড়া হইতেই আছে, স্তরভেদে তাহা বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত। মানুষ নিজস্তরে মাত্র ইহার অস্তিত্ব অনুভব করেন,—নিম্নে বা উচ্চে পশুস্তরে বা দেবস্তরে ইহার উপলব্ধি করিবার শক্তি তাঁহার নাই।

কিন্তু সৌন্দর্য্যের মত রহস্যময় বস্তু জগতে বিরল। বহুরূপীর একটী আকার আছে, পুরুভুজেরও একটী স্বরূপ ঠিক্ থাকে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের আদর্শ চিরচঞ্চল, যেন সর্ব্ববন্ধনমুক্ত। প্রাচীন কালে যাহা সুন্দর ছিল আজ তাহা অসুন্দর, প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য্য বিভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত, আবার একই দেশে ও একই কালে ব্যক্তিভেদে সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি বিভিন্ন। এমন কি একই ব্যক্তি বয়স ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন সৌন্দর্য্যের

উপাসনা করিয়া থাকে, উষা সন্ধ্যাদি চিরসুন্দর সামগ্রীরও আদর সকল সময় তাহার নিকট সমান থাকে না। গলগণ্ডের দেশে নাকি তাহার অভাবই কুশ্রীতা বলিয়া গণ্য হয়। উপ-কথার পেচক পরীক্ষাভার স্বহস্তে পাইয়া সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণের পর তাহার শাবকটীকেই নাকি সৌন্দর্য্যের পুরস্কার দিয়াছিল। তবে কি সৌন্দর্য্যের কোন মূর্ত্তি নাই? ইহা কি কেবল মরুক্ষেত্রের মরীচিকা—তৃষ্ণাকে কেবল জাগাইয়া দেয়, মিটায় না? এই জন্যই কি দেবাদিদেব শঙ্কর সৌন্দর্য্যের দেবতাটীকে দেহমুক্ত করিয়াছিলেন? এ দিকে এই সৌন্দর্য্যের মোহে জগৎ পাগল। যে জাতি যত বীর, যত কর্ম্মী তাহার সৌন্দর্য্য সন্ধানের সমারোহও তত অধিক। মাতালের মত দিনের পর দিন তাহারা 'ফ্যাশান' বদল করিতে থাকে,—কিন্তু কোথায় যে তাহাদের এই ছুটাছুটীর নিবৃত্তি তাহা তাহারা জানে না। ইহা কি কেবল শূন্যতার অনুসরণ, না অনন্ত সুন্দর কোন চিরন্তন বস্তুর অন্বেষণ? দেখা যাক্।

বিশ্বজগতের সকলই সুন্দর। শিশুর হাস্যরোদনের ন্যায়, প্রকৃতির স্নেহরৌদ্রের ন্যায়, বিশ্বপতির কারুণ্য ও সংহার মূর্ত্তির ন্যায়—মানবের সুখ দুঃখ, বিরহ মিলন, জয় পরাজয় সকলই সুন্দর, কেবল দেখিবার চক্ষু চাই। বিশ্বসৌন্দর্য্যের মধ্যে দুঃখের স্থান চিত্রের মধ্যে ছায়ার স্থানের মত,- যাহাতে আলোকাংশকে উজ্জ্বলতা ও চিত্রকে পূর্ণতা দান করে। মৈত্রী বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিলে দুঃখের দুঃখত্ব চলিয়া যায়,—বরণ করিয়া লইলে দুঃখ পরম সম্পদে পরিণত হয়। স্বাধীনতাকামীর দোর্দ্দণ্ড রণ তাণ্ডবের সহিত ভোগকামীর বিলাস ভবনের ক্ষুদ্র সুখ কি তুলনীয় হইতে পারে? মানুষ কিন্তু একথা বুঝিয়াও বুঝেনা। ক্ষুদ্রতমের মধ্যেও আমিত্ব-বোধ জাগাইয়া দিয়া যে লীলাময় তাহাকে চোখ বাঁধা বলদের মত ঘুরাইতেছেন তিনিই এজন্য দায়ী। মানুষ বেচারী ধাঁধায় পড়িয়া গোড়া হইতেই আপনাকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে ও সমস্ত জগৎকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলে। অপরের সুখ তাহার নিকট দুঃখের আকারে দেখা দেয়, এবং নিজের সুখকেও অস্থায়ী শঙ্কায় সে ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পারে না। এ অবস্থায় যে সুন্দর অসুন্দর হইয়া পড়িবে তাহা আর বিচিত্র কি? সৌভাগ্যক্রমে দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ও অহংবুদ্ধি প্রেমের কোমল আঘাতে খসিয়া পড়ে,—তখন সৌন্দর্য্যের রাজত্ব ফিরিয়া আসে। মায়ের চক্ষে ছেলের মত ও ছেলের চক্ষে মায়ের মত সুন্দর বুঝি আর কিছুই নাই। যদি কোন প্রেমময় পুরুষ সমস্ত মানব জাতিকে মাতার মত স্নেহচক্ষে দেখিতে শিখিয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রেম যদি বুদ্ধচৈতন্যের ন্যায় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গেও প্রসার লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি তিনি সর্ব্ববস্তুর মধ্যে প্রিয়-সন্দর্শনের সুখ অনুভব করিবেন না? সমস্ত জগৎ কি তাঁহার চক্ষে সৌন্দর্য্য নিকেতন হইয়া উঠিবে না?

তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা ও শ্রোতা, তাঁহার নিকট প্রীতিই বিশ্বসঙ্গীতের একমাত্র সুর, জীবন দ্বন্দ্ব নহে প্রেম। সৌন্দর্য্যভোগের একটী যোগ্যতা চাই। যেখানে অভাব বোধ যত কম অথবা শক্তি ও প্রীতিবোধ যত অধিক সেখানে এই যোগ্যতা তত অধিক। সৌন্দর্য্য কাপুরুষকে কখনও ধরা দেয় না।

তাই মনে হয় সৌন্দর্য্য বাহিরে নয়, ভিতরে; বস্তুনিষ্ঠ নয়, মনোনিষ্ঠ; objective

নয়, subjective। হৃদয়ের রঙে রঙাইয়া তুলিলে সকল বস্তুকেই সুন্দর দেখায়। তবে evolution ও আত্মানুভূতির স্তরভেদে এই রঙাইবার বস্তু বিভিন্ন হইয়া থাকে। দুই ব্যক্তির অভাব ও পূর্ণতাবোধ ঠিক্ এক হইতে পারে না, তাই যে সৌন্দর্য্যে একের তৃপ্তি, অন্যের তৃপ্তি তাহাতে না হইতেও পারে। যাহা পূর্ণসুন্দর তাহাতেই সকলের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়। যদি কখনও ভাগ্যবশে সেই পূর্ণসুন্দরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহাতে সকলকেই যে বিমুগ্ধ করিয়া দিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে বংশী-ধ্বনিতে কুলনারী কুলমান বিস্মৃত হইবে, যমুনা উজান বহিবে, বনমধ্যে বসন্তের আবির্ভাব হইবে,—সমস্ত ক্ষুধা শান্ত হইবে, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইবে। এরূপ পূর্ণের কেহ শত্রু থাকিতে পারে না। এই জন্য "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়ের" হস্তে জগাই মাধাইয়ের পুনর্জ্জন্মলাভ ও ক্ষমাবতার বুদ্ধদেবের সম্মুখ হইতে রণোদ্যত হস্তীর পলায়ন। অনুরূপ কারণে তপোবনে সিংহমৃগের একত্র বিচরণ যেমন বিশ্বাস্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়, প্রেমাবতার যীশুর ক্রুশোপাখ্যানকেও তেমনি অবিশ্বাস্য বলিয়া সন্দেহ জন্মে। অভাব, ক্ষুদ্রতা ও হিংসা যাঁহার নাই তাঁহার শত্রুতাচরণ কে করিবে? যাহা কিছু সুন্দর তাহার মধ্যেই এই পূর্ণতার আংশিক অভিব্যক্তি আছে।

সুন্দর কোন কিছু দেখিলেই "বাঃ" বলিয়া একটা আরামের নিশ্বাস স্বতঃই বাহির হইয়া আসে। যেন রোগ-শোক-অভাব সন্তপ্ত ক্ষুব্ধ চিত্ত একটা আশ্রয়লাভ ও স্বস্তি অনুভব করিল। কিন্তু সৌন্দর্য্য ভোগ কেবল আশ্রয়লাভ মাত্র নহে। তাহা হইলে ধনী মনিবের সখের চাকর হওয়া অপেক্ষা সুন্দর অবস্থা আর থাকিত না। কিন্তু সৌন্দর্য্যে আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিষ আনিয়া দেয়, তাহা আত্মীয়বুদ্ধি, নিজের বলিয়া জ্ঞান। যেখানে আমরা আশ্রয়ের গুরুভারে মুহ্যমান হইয়া পড়ি সেখানে এই আত্মীয়ভাব আইসে না, সেখানে আমরা সম্ভ্রম করিতে পারি কিন্তু আপনবোধ করিতে অর্থাৎ ভালবাসিতে পারি না। সুন্দর কিছু দেখিলে মনে হয় অপূর্ণ 'আমির' একটা অঙ্গ এতদিন বাহিরে লুকাইয়া ছিল, অবশেষে আসিয়া মিলিত হইল ও 'আমির' ঐ অপূর্ণতা কিছু পূর্ণ করিয়া দিল। ফলতঃ সৌন্দর্য্যভোগের মূলে আছে আত্মপ্রসারণজ্ঞান,—স্বস্তিপূর্ণ নিজত্ববোধই ইহার লক্ষণ। ইহাতে ভোগ্য ও ভোক্তা এক হইয়া যায়। এইখানেই কাম্যভোগের সহিত ইহার পার্থক্য। কামী স্বামিত্বপিপাসু,—কাম্যবস্তুকে সে আপন অধিকারে না পাইলে তৃপ্ত হয় না এবং সেই অধিকার লাভ করিবার জন্য সে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার পর্য্যন্ত রাখে না। তাই অতৃপ্তি ও দুরাকাঙ্ক্ষা কাম্যভোগের চিরসহচর,—পূর্ণপরিতৃপ্তি সৌন্দর্য্যভোগের অমৃতফল।

কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রাণ কোথায়, ইহার স্বরূপ কি? সৌন্দর্য্যভোগের যাহা সার অর্থাৎ নিজত্ববোধ ও আশ্রয়বুদ্ধি তাহা সত্য ছাড়া আর কিছুতে অসম্ভব। সত্যের ন্যায় পরম ও চরম আশ্রয় আর কি হইতে পারে? ব্যক্তিভেদে এ আশ্রয় বিভিন্ন, কাহারও ধন, কাহারও জন, কাহারও বিদ্যা, কাহারও ধর্ম্ম। কিন্তু যাহার যাহা আশ্রয় তাহা তাঁহার নিকট সত্য। বিদ্যাকে যদি কেহ আশ্রয় বলিয়া জানেন, বিদ্যাসম্বন্ধে এই সত্যতাবুদ্ধিই তাঁহার নির্ভরের এক মাত্র কারণ। তিনি চিন্তায় দেখিয়াছেন, তিনি হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি পরীক্ষায়

পাইয়াছেন যে বিদ্যাভিন্ন সমস্ত অবলম্বন মিথ্যা ও অসার,—সার বিদ্যার অবলম্বনই সত্য ও সার, ইহা টিকিয়া থাকে ও প্রতারিত করেনা, অন্ততঃ তাঁহার নিকট টিঁকিয়া আছে ও কখনও প্রতারণা করে নাই। অর্থাৎ বিদ্যা সত্য অন্ততঃ তাঁহার চক্ষে। নিরম্বুবোধের ও একমাত্র কারণ এই সত্যতাবুদ্ধি। এই খানেই বহিরাশ্রয়ের সহিত সত্যাশ্রয়ের পার্থক্য। ধনীমনিব দয়া করিয়া আপন হন, সত্য আপন বলিয়া দয়া করেন। ধনীমনিব হঠাৎ এক নূতন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া আশ্রিতকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারেন এবং সে সময় খাপ খাওয়াইতে না পারার ফল হইবে চিরবিচ্ছেদ,—সত্যেরও মূর্ত্তিভেদ অনন্ত বটে, কিন্তু সে যে অতি নিকট, অহর্নিশি হৃদয়ে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত গূঢ়তাও গভীরতার সহিত পরিচয় করাইয়া দেয় তাই তাহার নবমূর্ত্তি অভিভব বা বিচ্ছেদের সৃষ্টি করেনা, বরং পুরাতন আত্মীয়তাকে আরও দৃঢ়তরই করিয়া দেয়। মানুষ সান্ত হইয়াও বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ মাত্র বলিয়া অসহনীয়, আর সত্য অনন্ত হইয়াও বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য বলিয়া বরণীয়, বিচ্ছেদের সেখানে অবসর নাই। হৃদয় সাগর মন্থনে যাহার জন্ম, অবিরত সংযোগে যাহার বৃদ্ধি, অত্যন্ত পরিচয়ে ও যাহা চিরনবীন, অতি নিকট বলিয়া যাহ বিশ্লেষণের অতীত—সেই সত্যের অপেক্ষা আপন আর কি আছে? সুন্দর যখন নূতন করিয়া আমাদের নিরম্বুবোধকে জাগ্রত করিয়া দেয় তখন ইহাই বুঝিতে হয় যে আমাদের অন্তরে যে সত্যদেবতাটী অনবরত নিজের সিংহাসন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে যত্নশীল তিনি ঐ সঙ্গে নিজের অধিকার একটু বিস্তৃত ও গভীরতর করিয়া লইলেন। অতএব সুন্দর যদি অধীন ও আশ্রয়মাত্র হয় তাহা হইলে সত্যও সুন্দর অভিন্ন।

এইবার বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে, চিত্র সুন্দর হইতে হইলে কেন সত্য হওয়া আবশ্যক হয়। আনাড়ীর হাতের শিবমূর্ত্তি অপেক্ষা ওস্তাদের হাতের বানর মূর্ত্তির আদর কেন অধিক। সত্য এক বই দুই নহে, ওস্তাদের বানর সেই সত্যকে স্মরণ করাইয়া দেয় আর আনাড়ী কতকগুলা তুলি ও রঙের কথা মাত্র স্মরণ করায়। শোনা যায় চক্ষুই আত্মার বিশেষ অধিষ্ঠান, ওস্তাদ জানেন বানরের কোনখানে অনন্ত রূপের বিশেষ করিয়া পরিচয় আছে। এই খানেই অবিকল প্রতিরূপ বা ফটোগ্রাফের সহিত ওস্তাদজীর চিত্রের প্রভেদ। যাহা প্রতিরূপ মাত্র তাহা আমাদিগকে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রাখিয়া যায়, যাহা চিত্র তাহা যেটুকু ফুটাইবার সেইটুকু মাত্র ফুটাইয়া দিয়া আমাদের চক্ষুরুন্মীলনে সহায়তা করে। যিনি নিজভাব্য বিষয়কে যতটা গভীরভাবে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহার চিত্র ততই সত্য ও সুন্দর হয়। কিন্তু ধ্যানলভ্য চরমসত্যের অনুভূতি মানুষের প্রকাশ-শক্তির অতীত,—সে অগাধ সমুদ্রে ডুবিলে আর উঠা যায় না, উঠিলে সকল কথা ভুলিয়া যাইতে হয়, স্মৃতির মধ্যে ছায়ার মত যাহা পড়িয়া থাকে সেই টুকুই মাত্র প্রকাশ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। যিনি শিক্ষা ও সংস্কারগুণে কবি তিনি ছন্দে, যিনি চিত্রকর তিনি বর্ণে, যিনি ভাস্কর তিনি ভাবে, ও যিনি সঙ্গীতজ্ঞ তিনি সুরে, এই প্রকাশের কাজ শেষ করিয়া থাকেন। এই প্রকাশবিদ্যাই কলাবিদ্যা,—ছন্দে, সুরে, ভাবে, বর্ণে যিনি যে পরিমাণে হৃদয়ের সত্যানুভূতিকে ফুটাইতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে কলাবিৎ।

সত্য ধ্যানলভ্য, তাহার প্রকাশও ধ্যানানুবর্ত্তী। উপলব্ধি যাঁহার সংশয়াচ্ছন্ন তাঁহার প্রকাশচেষ্টা বিড়ম্বনা। উপলব্ধি যাঁহার নিঃসংশয় তিনিই কলাবিৎ হইবার অধিকারী। সত্যদর্শন মহাপুরুষের বরের মত অব্যর্থ, তাহাতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবেই,—তা সে সত্যদর্শককেই করুক আর তাঁহার চিত্রকেই করুক। যিনি ধ্যানদৃষ্ট সত্য প্রকাশ করিতে না চাহেন তিনি নিজেই চিত্র হইয়া পড়েন,—he becomes himself a poem. তাঁহার মধ্যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টিভার ভগবান্ স্বহস্তে গ্রহণ করেন, ভাবে, ভাষায় ভঙ্গীতে তাঁহাকে মধুময় করিয়া তুলেন, সে সৌন্দর্য্যে বুদ্ধ চৈতন্যর আবির্ভাব হয়। কিন্তু উপলব্ধি নিঃসংশয় হইলে কোথাও কোথাও ভিতর হইতেই প্রকাশের জন্য একটী প্রেরণা আইসে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কলাবিতের সৃষ্টি হয়, সত্যের প্রকাশই তাঁহাদের উপর ভগবানের আদেশ। সে আদেশ পালন না করিলে নিস্তার নাই। হইতে পারে তাঁহারা নিঃসম্বল, কিন্তু সম্বল আসিয়া জুটে। বাল্মীকি ও কালীদাস নাকি এক মুহূর্ত্তেই কবিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের প্রাচীন কবি কীড্মনও তাহার প্রমাণ। ইহাই ভগবৎ 'কৃপা'—কল্পনা যাহা কলাবিৎ দিগের পরম ধন ইহা জন্মলব্ধ সম্পদ—সাধনা দ্বারা ও নাকি আয়ত্ত হয় না। ইহারই প্রসাদে কলাবিৎ দিব্যচক্ষু লাভ করেন, অসংখ্য দর্শনীয়ের মধ্যে যে টুকু দেখিবার সেইটুকুই দেখিতে পান, যাহা বর্জ্জন করিবার তাহা বর্জ্জন করিতে শিখেন, এবং প্রকাশের জন্য যতটুকু আয়োজন আবশ্যক ঠিক্ ততটুকুই করিয়া ক্ষান্ত হন। এই খানেই কলাবিতের চয়ন, সংযম ও সমাবেশ শক্তি। ইহারই উপর সৌন্দর্য্যের সমস্ত প্রকাশ নির্ভর করে। কল্পনাই যে কলাবিতের চক্ষু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু হস্ত কুশলতাও চাই, সেজন্য শিক্ষার প্রয়োজন। একথা সত্য যে ভিতরে যাহার বস্তু নাই অলঙ্কারে তাহার কুশ্রীতা বৃদ্ধিই করে, এবং যাহা ভিতরে সুন্দর তাহা অলঙ্কারহীন হইলেও সুন্দরই দেখায়। কিন্তু যাহা স্বভাবসুন্দর তাহার সম্বন্ধে কি মানুষের কোন কর্ত্তব্য নাই? সত্য কথা উচ্চারণ করিলেই কি সত্য সম্বন্ধে সমস্ত কর্ত্তব্যের অবসান হয়? সত্যকে কি প্রিয় করিয়া বলিবার উপদেশ নাই? সুন্দর সম্বন্ধেও সে উপদেশ পালনীয়, সুন্দরও সত্যের ন্যায় আদৃত হওয়া আবশ্যক। অতএব হয় একবারে নিজেকে লয় করিয়া দিয়া ধ্যানদৃষ্ট সুন্দরকে তদবস্থ ভাবেই ছাড়িয়া দিতে হইবে, নয় সর্ব্বজন স্বীকৃত মনোজ্ঞ সাজে সজ্জিত করিয়া তাহাকে জনসমাজে হাজির করিতে হইবে। বাড়াবাড়ি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় তাহা অসভ্যতা ও কুরুচির নামান্তর এবং বিশেষ দূষণীয়। এই কারণে যে, তাহাতে সুন্দরকে ঢাকিয়া সুতরাং প্রকারান্তরে অপমান করিয়া নিজের ঐশ্বর্য্যই দেখান হয়। এখানেও সহজবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুশিক্ষার আবশ্যক। কাজ হাতে লইয়া শ্রমে কৃপণতা করিলে চলিবে না, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যাহা ধারণা তাহা নিরলঙ্কার বা সালঙ্কার যাহাই হউক ঠিক্ সেই ধারণা শিল্পে পরিস্ফুট করিবার জন্য কলাবিৎকে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার শ্রম সাফল্যের দুইটি মাত্র মানদণ্ড। (১) তাঁহার শিল্প 'অহুরীর' নিকট অর্থাৎ যাঁহার প্রাণ অনুরূপ সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার নিকট আদর পাইবে। (২) দ্বিতীয়তঃ তিনি নিজে তাহাতে তৃপ্ত হইবেন, এবং এই খানেই তাঁহার

প্রধান পরীক্ষা। যাহারা যশাকাঙ্ক্ষী তাহারা সহজেই নিজেকে প্রতারণা করে, কিন্তু সাধক মাত্রেই জানেন যে জগতে সকলকে ঠকান যায় নিজেকে ঠকানই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কলাবিৎও সাধক, তাই তাঁহার কলাসাফল্যের প্রধান পরীক্ষক তিনি নিজে। পরকে দেখাইবার বা শুনাইবার জন্য নহে, নিজের ধ্যানদৃষ্ট বস্তু নিজের নিকট সর্ব্বসময় লভ্য করিয়া রাখিবার জন্যই তাহার যত প্রয়াস স্বীকার,—সুতরাং ভালমন্দ বিচার তাঁহার মত সূক্ষ্মভাবে আর কে করিতে পারিবে? তিনিই বলিতে পারেন তিনি কি গড়িতে চাহিয়াছিলেন এবং তিনিই বলিতে পারেন তাহা তিনি ঠিক গড়িতে পারিয়াছেন কি না। সব খাঁটি জিনিষই অন্তরাত্মার আদেশ পালন, পরকে ভুলাইবার জন্য যাহা করা যায় তাহা ছলনা, কৃত্রিমতা, অন্ধকারে ঢিল মারা—সে সব জিনিষ পরীক্ষাযোগ্যই নহে। এখানে বৃদ্ধ Polonius এর কথা স্মরণীয় :—

To thy own self be true
And it will follow as the night the day
That thou canst not be false to any man.

অর্থাৎ দিনের পর যেমন রাত্রি আসিতে বাধ্য তুমি নিজের কাছে খাঁটি থাকিলে সেইরূপ জগতের কাছেও খাঁটি থাকিতে পারিবে। ভক্ত রামপ্রসাদ দত্ত বলিয়াছেন "যা চা'বি তা বসে পাবি চাইলে নিজ অন্তঃপুরে"। সুতরাং বড় জিনিষের পরীক্ষার ভার সর্ব্বত্রই নিজের হাতে। যদি সে বিচারে সমাজকে সন্তুষ্ট করিতে না পারা যায় তাহা হইলে আর উপায় কি? কলাবিৎকে ভবভূতির মত মনের মানুষের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে ও বলিতে হইবে "কালো হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী"। সাধকের এ প্রতীক্ষা কালে ত সার্থক হয়ই, কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সঙ্গে সঙ্গেই সফল হয়,—কারণ চিত্রটা তাঁহার অন্তর্দেবতার আদেশ পালন এবং ভাল কাজের অনুষ্ঠানই তাহার পুরস্কার।

কিন্তু কেহ কেহ কলাবিৎকে এত সহজে পরিত্রাণ দিতে চাহেন না, তাঁহারা বলেন যাহা সত্য ও সুন্দর তাহা শিব হওয়াও আবশ্যক, নহিলে সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। কলাবিদ্যা ব্রহ্মাস্ত্রের মত, বহুশক্তি সম্পন্ন, সুতরাং সুপাত্রন্যস্ত হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ কাল বিদ্যায় অধিকারী ভেদ উঠিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় যদি কোন উচ্ছৃঙ্খল যুবক চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত বা কোন বুভুক্ষু ব্যক্তি জীবিকানির্ব্বাহের জন্য আপনাপন অধীত বিদ্যার অপব্যবহার করে তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? এ সমস্ত শিল্পীর জন্য সমাজদণ্ড বা রাজদণ্ডের ব্যবস্থা না করিলে উপায় নাই। কিন্তু মুস্কিল হইবে প্রকৃত কলাবিতের অশ্লীল ছবি লইয়া। এ সমস্ত লোক দণ্ডের ভয় রাখেনা, কারণ তাহাদের শিল্প ভিতরকার প্রেরণা সুতরাং শাস্তির ভয়ে বন্ধ হইবে না। আমার মনে হয় এরূপ লোকের অশ্লীল ছবিতে ভয় নাই,—মহাভারতকারও কুন্তীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সাপ লইয়া যেমন খেলা করিয়াছিলেন তেমনি বিষের ঔষধও তাঁহার জানা ছিল,—তাই কুন্তীদেবীকে আমরা গরীয়সী জননী ছাড়া অন্যমূর্ত্তিতে দেখিতেই পারি না। প্রকৃত কলাবিতের হাতে অশ্লীলতা বিষশূন্য হয়,—নগ্নমূর্ত্তির ভিতর দিয়াও শালীনতা ফুটিয়া

উঠে, কারণ কলাবিতের চিত্রে নগ্নতার স্বষ্টিকর্ত্তাও পরিস্ফুট থাকেন। এরূপ চিত্রকে অনাবশ্যক বলিবারও উপায় নাই। ভয়ানক রোগের চিকিৎসা যদি বীভৎস হয় তাহা হইলে কি কুণ্ঠিত হওয়া উচিত? অশ্লীলতারও জগতে ছড়াছড়ি, যদি কেহ তাহার গূঢ়স্বরূপ, ও উচ্চতর মূর্ত্তি দেখাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কলাবিৎ কোন নৈতিক উদ্দেশ্যে কাজ করেন না বটে, কিন্তু তাঁহার শিল্পের ফল হয় মালিন্য বহিষ্কার। অবশ্য সকলেই যে তাঁহার ছবিকে ঠিক্‌ভাবে লইতে পারে তাহা নহে, সুতরাং অনিষ্টও যে অনেকের হয় তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তাহাদিগের ক্ষতিরোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, যাহারা মরিয়াই আছে তাহাদিগকে রাখিবে কে? তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয় সর্ব্বত্র। এরূপ লোকের ক্ষতির ভয়ে যদি কাহাকেও জীবনের কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে হয়, তাহা হইলে বড়ই অন্যায় কথা। যিনি কাহারো কোন ক্ষতি করিবেননা বলিয়া পণ করিয়া বসেন, তাঁহার কোন কার্য্যই করা চলে না, কারণ ক্ষতিশূন্য লাভ জগতে নাই। সামাজিক ক্ষতিলাভ গণণার ভার সকল সমাজেই সুধীগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, ভারতে সেই সুধীবচন শাস্ত্র আকারে সম্মানিত হইয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রের বিধান সাধারণের জন্য। অসাধারণকে রোধ করিবার উদ্দেশ্য তাহাতে নাই। তাই রামা-শ্যামার পক্ষে ব্রাহ্মণত্বের দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও বিশ্বামিত্রের পক্ষে তাহা ছিলনা। আর ঐ সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তি স্বাধীনতাপ্রয়াসী মাত্র, স্বেচ্ছাচারী নহেন,—হয়ত দেখা যাইবে তাঁহারা পাবিত্র্য ও সংযমের অবতার, নহিলে সৌন্দর্য্যের উচ্চতম স্তরগুলি তাঁহাদের করায়ত্ত হইত না। শেষ কথা যাহা সত্য ও সুন্দর তাহা মঙ্গল না হইয়া কি হইতে পারে? মঙ্গলকে স্বতন্ত্রভাবে চিনিবার কোন উপায় নাই, যাহা সত্য ও সুন্দর তাহাই বরণীয়, শুধু এইটুকু দেখিয়াই জিনিষকে ঘরে তুলিতে হয়; তাহার পর দেখা যায় যে তাহা মঙ্গলেরই প্রসূতি। এ অবস্থায় যদি কেহ সত্য ও সুন্দর মাত্র দেখিয়া কোন কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাঁহাকে সে জন্য দোষ দেওয়া যায় না। তাহা অন্ততঃ তাহার নিকট মঙ্গল হইতে বাধ্য,—ক্রমশঃ সমাজের অপরের নিকটেও তাহা মঙ্গল মূর্ত্তিতেই দেখা দিবে।

শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ।

শরতে

ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ আকাশে—
দেয়না বারি ধারা,
তপন বিলায় সোণায় কিরণ
আকাশে চাঁদ তারা!
সরোবরে পদ্ম ভাসে,
শিউলি ফুলের গন্ধ আসে,
শরৎ এলো পাপিয়া তাই
দিচ্ছে মধুর সাড়া।

ঘরে ঘরে আজকে সবার
পূজার আয়োজন,
জগন্মাতা বলে আমার
কেঁদে উঠছে মন!
কাশের হাসি নদীর কূলে
প্রকৃতি প্রাণ দিচ্ছে খুলে
মায়ের ভাবে ডুব দিয়েছি—
হয়ে আপন হারা!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

বেদান্তে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও পুরুষকার

(২)

মানুষ যে স্বভাব-সিদ্ধ 'প্রকৃতি' লইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হয়, উহা পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। এই প্রকৃতি রাগ-দ্বেষ-চালিত, সুতরাং এ প্রকৃতিতে স্বাধীন কর্ত্তৃত্বের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। স্বাভাবিক প্রকৃতি বশে অবশ হইয়া, মানুষ যে প্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, উহা একরূপ পশুর মত ক্রিয়া। পূর্ব্ব সংখ্যায় এ সকল কথা আলোচিত হইয়াছে। মনুষ্য কি তবে এইরূপে, পশুর ন্যায়, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আত্ম-সুখের আকাঙ্ক্ষায়, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়?

কিন্তু, যে সময়ে মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি,—বিষয়াকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া অন্ধ ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে (Empirical causality), ঠিক্ এই সময়েই আত্মার প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন কর্ত্তৃত্বটীও (Transcendental free causality of the self) অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। মলিন চিত্তে এই তত্ত্বটীর ধারণা জন্মে না। যে ব্যক্তির চিত্ত বা সত্ত্ব যত উৎকর্ষতা লাভ করিতে থাকে, সে ব্যক্তি ততই আত্মার এই স্বাধীন কর্ত্তৃত্বের রহস্যটী বুঝিতে পারে। বুদ্ধিই আমাদিগকে আত্মার স্বাতন্ত্র্যের কথাটী বলিয়া দেয়। যেমন 'বুদ্ধি গুহায়' * বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানের দ্রষ্টারূপে (জ্ঞাতা † আত্মার অনুভব হইয়া থাকে; ঠিক্ সেইরূপ এই 'বুদ্ধি গুহা'তেই আমাদের প্রাণশক্তির মূল প্রেরক-রূপে ‡ আত্মার কর্ত্তৃত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হইলে, আমাদের অন্তঃকরণে কাম ক্রোধাদি প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। যে গুলি সুখকর প্রবৃত্তি, আমরা তৎ-প্রাপ্তির আশায় ধাবিত হই। যে গুলি দুঃখজনক, আমরা তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই। এই প্রকার ক্রিয়াই কি আত্মার ক্রিয়া? না, এ সকল ক্রিয়া হইতে আত্মা স্বতন্ত্র?

অজ্ঞানাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের নিকটে, দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত অপর কোন বস্তুর কর্ত্তৃত্বের প্রতীতি হয় না। সাধারণ মনুষ্য, দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ধরিয়া লয় §। কিন্তু ইহারাই যদি সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে; এই সকল ক্রিয়াই

---

* ইন্দ্রিয় বর্গের সহিত বাহ্যবিষয়ের সম্পর্ক হইলে, আত্মা যে সকল 'বিজ্ঞান' লাভ করিয়া থাকেন, এই বিজ্ঞান গুলিকে 'বুদ্ধি-বৃত্তি' বলা যায়। ইহারা আত্মার স্বরূপেই আংশিক ও অসম্পূর্ণ বিকাশ। এই সকল বিজ্ঞান দ্বারা, ইহাদের অন্তরালবর্ত্তী আত্মা যে পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ, তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সকল বুদ্ধি-বৃত্তির মূলে এই যে আত্মাকে 'জ্ঞাতা' বলিয়া অনুভব—ইহাকেই 'বুদ্ধি গুহা'য় আত্মার অনুভব।

† দ্রষ্টারূপে—Free activity of the self in cognition.

‡ প্রেরকরূপে—Free activity of the self in volition.

§ ইহারই নাম অনাদিকাল হইতে প্রাপ্ত জীবের "অহং-স্বভাব"। শঙ্করের বর্ণনা শুনুন—"অনাদি-কালোয় অহং-স্বভাবঃ। জীবঃ সমস্তব্যবহারবোদ্ধা। করোতি কর্ম্মাণ্যনুপূর্ব্ববাসনঃ। প্রাণ-কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্দেহঃ প্রের্য্যমাণঃ প্রবর্ত্ততে। সম্যক্ সংকল্পনাৎ কামঃ, কামাৎ পুনঃ প্রবর্ত্তনং। কর্ম্মানুরূপেণ গুণোদয়োভবেৎ। গুণানুরূপেণ মনঃ-প্রবৃত্তিঃ"। ইত্যাদি। এই কর্ম্ম-শৃঙ্খলায় জীবের স্বাধীনতা কোথায়?

যদি আত্মার ক্রিয়া হয়; তাহা হইলে আত্মার আর কোন 'স্বতন্ত্র' অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু এ কথা ঠিক্ নহে। আমাদের বুদ্ধিই আমাদিগকে অভ্রান্তভাবে বলিয়া দেয় যে,—আত্মা স্বতন্ত্র, স্বাধীন; আত্মা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার মূল প্রেরক, সকল বিকারের অন্তরালে অবস্থিত। আত্মার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে, আমাদের স্বভাব সিদ্ধ প্রকৃতির শাসন বা উৎকর্ষ-সাধন অসম্ভব হইয়া উঠিত। ধর্ম্মজীবন গঠন করা ও সম্ভব হইত না। জীবন্মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। কেন না, ইন্দ্রিয়-মন-কাম-ক্রোধাদি ক্রিয়া ব্যতীত যদি অপর কিছু না থাকে; এই গুলিই যদি আত্মার ক্রিয়া হয়; তাহা হইলে, কিরূপে এবং কে-ই বা—জীব-প্রকৃতির এই যে কাম-ক্রোধাদির দাসত্ব, এই এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশ্যতা—এই দাসত্ব ও বশ্যতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিত? জীব-প্রকৃতি, কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তির শাসনের অধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু জীব-প্রকৃতি এই সকল হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন আত্মারও শাসনের অধীন। একথা ভুলিলে চলিবে না। ইহা না হইলে, জীব-প্রকৃতির উৎকর্ষ-সাধন একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিত।

শঙ্করাচার্য্য কি প্রকারে আত্মার এই 'স্বাধীন কর্ত্তৃত্বের' কথা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই এখন দেখিতে হইবে।

দেহ-মন-সুখ-দুঃখাদি ক্রিয়াই যে আত্মার ক্রিয়া নহে; আত্মা যে এ সকল হইতে স্বতন্ত্র এবং এই সকল ক্রিয়ার মূল চালক, একথা বেদান্তে সর্ব্বত্রই অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া আছে।

ঐতরেয়-উপনিষদের ভাষ্যে, আত্মা দেহের মধ্যে কি নিমিত্ত প্রবেশ করিয়াছেন, এই তত্ত্বটী বুঝাইতে গিয়া, শঙ্করাচার্য্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। এই সকল কথা হইতে দেহমধ্যে আত্মার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব (Free causality) প্রমাণিত হয়। আত্মাই যে আপন প্রয়োজন সাধনার্থে, দেহ-মন-বুদ্ধ্যাদির পরিচালনা করিয়া থাকেন, এবং উহাদিগকে একই প্রয়োজন সাধনার্থ "সংহত" করিয়াছেন,—ভাষ্যকারের এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি যে স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহিত করিয়া থাকে, এই ক্রিয়াগুলি উহাদের নিজেরই প্রয়োজন-সাধনার্থ নহে। মূলে, আত্মার প্রয়োজন-সিদ্ধির আবশ্যকতা না থাকিলে ও আত্মার প্রেরকতা না থাকিলে, এই দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াই উৎপন্ন হইতে পারিত না এবং উহারা সকলেই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধাবিত হইতেও পারিত না। স্বতন্ত্র, চেতন আত্মার প্রয়োজন-সিদ্ধি ব্যতীত উহাদের ক্রিয়া ব্যর্থ ও উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া পড়িত। আমরা এস্থলে এই সকল মূল্যবান্ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই।

এই বিখ্যাত ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মা দুইটী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। প্রথম উদ্দেশ্য—রূপদর্শন, গন্ধ গ্রহণ, বাক্য কথন প্রভৃতি। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—এই যে দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি, ইহারা সকলে একত্র মিলিত ভাবে, একই উদ্দেশ্যে "সংহত" বা মিলিত হইয়া, ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। ইহা দ্বারা, আত্মাই যে ইহাদের মূল-প্রেরক তাহাই প্রমাণিত হয়। ইহারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং ইহারা যে নিজেরা একত্র মিলিয়া

একই সাধারণ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, আপনা আপনি ক্রিয়া করিবে, একথা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। চেতন পুরুষ, আপন প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, বাগাদি ইন্দ্রিয় বর্গকে গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং সকলকে আপন প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূল পথে পরিচালিত করিতেছেন। প্রেরক এবং বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থ প্রেরণা,—ইহা ব্যতীত বাগাদির ব্যবহার সম্পন্ন হইতেই পারে না।

"অর্থয়িতা হি পুরুষঃ। স্বস্য প্রয়োজনসিদ্ধার্থং, বাগাদিকং প্রেরয়তি। তদভাবে, প্রেরকা ভাবাৎ, বাগ্‌ব্যবহারাদিকং ন ভবেৎ। প্রয়োজন-প্রযুক্তত্বাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তেঃ"।

ইহারা নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মিলিত হয় নাই। 'পরের' উপকার সিদ্ধির জন্যই ইহারা, মিলিয়া মিশিয়া একই উদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল। অতএব এতদ্দ্বারা, স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব ও প্রেরকতা পাওয়া যাইতেছে। আত্মার এই প্রেরকতা, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার ন্যায় কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে—'ব্যাপারাবিষ্ট' নহে। ইহা স্বতন্ত্র স্বাধীন (Not mechanical, but free). *

কেনোপনিষদের ভাষ্যে, শঙ্কর প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন যে,—এই যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি ধাবিত ও ক্রিয়াশীল হয়, এই ক্রিয়াগুলির মূল প্রেরক কে? আমরা ত সাধারণতঃ ইহাই দেখি যে দেহ-মন ইন্দ্রিয়াদি বস্তুগুলিই স্ব স্ব ইচ্ছা, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারাই প্রেরিত হইয়া ক্রিয়া করে; এতদ্ ব্যতীত আর ত কাহারই প্রেরণা দেখিতে পাই না। এই কথা বলিয়া শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, না, ইহারাই নিজেরা প্রেরক নহে। দেহ-ইন্দ্রিয়াদি তাবৎ বস্তুই, 'সংহত' (combined or organised)। ইহারা যে পরস্পর সংহত হইয়া, একই উদ্দেশ্যে ক্রিয়া করে, তদ্দ্বারা, ইহাদের মূলে, ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন আত্মার সত্তা ও প্রেরণ প্রমাণিত হয় —

"সংঘাতব্যতিরিক্তস্য স্বতন্ত্রস্য ইচ্ছামাত্রেণৈব
মন-আদি-প্রেরয়িতৃত্বং"।

এই আত্মার ইচ্ছা দ্বারাই, দেহেন্দ্রিয়াদি প্রেরিত হইয়া, ক্রিয়া করিয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বেদান্তে দেহ-ইন্দ্রিয়-কাম ক্রোধাদির ক্রিয়াই আত্মার ক্রিয়া নহে। প্রেরক আত্মা, এ সকল হইতে স্বতন্ত্র। এবং এই আত্মাই, আপন প্রয়োজনের অনুকূল পথে ইহাদিগকে পরিচালিত করেন।

এইজন্য বেদান্তে, দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি বস্তু গুলিকে "পরার্থ" শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পরার্থ শব্দটীর অর্থ এই যে, ইহারা সকলেই অপরের প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। ইহারা আত্মার প্রয়োজন সাধন করিবে বলিয়াই, মিলিয়া মিশিয়া ক্রিয়া করে।

"সর্ব্বস্যৈব হি করণ কলাপস্য, যদর্থপ্রযুক্তা প্রবৃত্তিঃ, তদ্‌ব্রহ্মেতি প্রকরণার্থঃ।"

আমরা এই সকল আলোচনা দ্বারা দুইটী মূল তত্ত্ব পাইতেছি :—

(১) ইন্দ্রিয়-মন প্রভৃতির মূলে আত্মা 'অধিষ্ঠিত' রহিয়াছেন। সেই মূলে থাকিয়াই, ইহারা

* "অর্থিনা বাগাদিকৃতোপকার ভাজা 'অধিষ্ঠাত্রা' বাগাদিপ্রেরকেণ "পরেণ"। অধিষ্ঠাতৃত্বং—সাক্ষিত্বয়া, ন ব্যাপারঃ"।

স্ব স্ব ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইতেছে। ইহাদের ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য, আত্মা হইতেই আসিয়াছে। অতএব আত্মাই ইহাদের প্রেরক।

(২) ইহাদের সামর্থ্য যে আত্মা হইতে লব্ধ, কেবল তাহাই নহে। ইহারা সকলেই, আত্মারই প্রয়োজন-সাধন করিবে বলিয়া, মিলিত হইয়া একই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে।

গীতায় একস্থলে শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন যে, অচেতন, জড় বস্তুগুলি যে নিজেই নিজের প্রয়োজন সাধন করে, একথা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। যাহা জড়, তাহা চেতনেরই প্রয়োজন সাধনার্থ ক্রিয়া করে—

"অপ্রসিদ্ধে হি আত্মনি, স্বার্থাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ
ব্যর্থাঃ প্রসজ্যেরন্।" "ন চ সুখার্থং সুখং, দুঃখার্থং
বা দুঃখং। আত্মাবগত্যবমানার্থত্বাৎ সর্ব্বব্যবহারস্য।"

সুখ সুখেরই নিমিত্ত; দুঃখ দুঃখেরই জন্য,—ইহা হইতে পারে না। সুখ-দুঃখাদি সমস্তই, আত্মারই প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। নতুবা, ঐ সকল ক্রিয়া ব্যর্থ হইয়া উঠে।

অতএব আমরা বুঝিতেছি যে, আমাদের দেহাভ্যন্তরে প্রাণশক্তির মূলে, আত্মার মূল প্রেরণা, আত্মার স্বাধীন কর্তৃত্ব রহিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, প্রাণশক্তিই কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে আপন আপন বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকে। আমাদের প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতি, রাগ-দ্বেষ চালিত হইয়া, বিবিধ প্রকারে, শুভ ও অশুভ কর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন সাধারণ মনুষ্যের ইহাই ধারণা। সাধারণ মনুষ্যের তাবৎ অনুষ্ঠান ও প্রবৃত্তি এই প্রকার। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত কিছু উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, প্রাণ ও বুদ্ধির মূলে, আত্মা অবস্থান করিতেছেন। এই আত্মার প্রয়োজনই, সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া ও চেষ্টার বীজ। আত্মারই প্রয়োজন-সাধনার্থ, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে ও স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। মানুষ যখন আত্মার এই স্বাধীন কর্তৃত্ব ও মূল-প্রেরকতার তত্ত্বটী বুঝিতে পারে, তখন তাহার উপলব্ধি হয় যে,—এই সকল মন-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ও প্রবৃত্তি যখন আত্মারই প্রয়োজন-সাধনে নিযুক্ত; তখন মানুষ ইহা বুঝিতে পারে যে, আত্মা আপন স্বভাব-সিদ্ধ 'প্রকৃতি'কে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে নিশ্চয়ই সমর্থ। মানুষের চরিত্র-গঠনের মূলে, আত্মার এই স্বাধীন কর্তৃত্ব নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু সে আলোচনা পরে করিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

উত্তরচরিতে পঞ্চমাঙ্ক

পঞ্চমাঙ্কের যবনিকা উঠিল। চন্দ্রকেতু রথে চড়িয়া রণসাজে সাজিয়া আসিল। সঙ্গে মাত্র সারথি সুমন্ত্র। চন্দ্রকেতু বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল—তাহার সৈন্যগণের উপর অনবরত শরতুষার বর্ষণ হইতেছে। কোপে ঈষৎ রঞ্জিতমুখ—ও কে বীর শিশু শরাসনে টঙ্কার দিতেছে। বীরের মন বিস্ময়ে আনন্দে সম্ভ্রমে ভরিয়া গেল। ও যে মুনিবালক, আশ্চর্য্য! এ কি কৌতুক, আর্য্য, সুমন্ত্র!

দশরথের সারথি সুমন্ত্র চন্দ্রকেতুর সম্মানের পাত্র, তাই এই "আর্য্য" সম্বোধন। লবের পানে দৃষ্টি পড়িবামাত্র সুমন্ত্র বিস্মিত হইল। মনে হইল যেন, শিশুরূপে রঘুনন্দন সম্মুখে দণ্ডায়মান। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে রামভদ্র যখন রাক্ষসগণের উপর শরবৃষ্টি করিয়াছিলেন—সেই ছবিটী সুমন্ত্রের মনে পড়িল। সেই নীলোৎপল শ্যামবর্ণ, সেই অনুভব গম্ভীর ভাব, সেই মনোরম কাকপক্ষচূড়া মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠিল, রামের পুত্র, লক্ষ্মণের পুত্র—উভয়েই রাজর্ষি জনকের দৌহিত্র। পরস্পরের আকারগত সাদৃশ্য বিশেষরূপেই বিদ্যমান।

একদিকে লব একাকী। অন্যদিকে শত শত সৈনিক দণ্ডায়মান। একের বিরুদ্ধে এত লোকের অভ্যুত্থান!

চন্দ্রকেতুর বড় লজ্জা হইল। বীর বীরত্বের মূল্য বুঝে। যুদ্ধ যে ক্ষাত্রধর্ম্মের নামান্তর প্রকৃত যোদ্ধার যুদ্ধ যে মানুষ মারার যন্ত্র মাত্র নহে—তাহা লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধেই বেশ বোঝা যায়। বালকের যুদ্ধে আজ বীর সৈনিকগণের পরাজয়, ততোধিক লজ্জা তাহাদের ঘৃণাকর প্রত্যাবর্ত্তন! বিস্ময়ের উপর বিস্ময় লজ্জার উপর লজ্জা, সম্ভ্রমের উপর সম্ভ্রম। চন্দ্রকেতুর রথও মুহূর্ত্ত মধ্যে লবের সম্মুখে উপস্থিত।

চন্দ্রকেতু তখন লবকে ডাকিয়া বলিল—

ভো ভো লব মহাবাহো কিমেভিস্তব সৈনিকৈঃ।
এষোঽহমেহি মামেব তেজস্তেজসি শাম্যতু ॥

ওহে লব ক্ষুদ্র সৈনিকগণের সহিত আর তোমার যুদ্ধে কাজ কি? এই আমি আছি, আমার নিকট এস, তেজ তেজেতেই শান্তি হউক। এই বিনয়মসৃণ তেজ, এই শান্ত মধুর ধীরভাব চন্দ্রকেতুর চরিত্রটি মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃত ক্ষত্রিয়-বীরের বীরগর্ব্ব আজ বাণীরূপে বহিঃপ্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। চন্দ্রকেতুর সদর্পোদ্ধত আহ্বানে লব সৈনিকগণকে ত্যাগ করিয়া তাহারই লক্ষ্যে ধাবমান হইল। যেন গর্ব্বিত সিংহশিশু মেঘনিনাদ শ্রবণে হস্তির দল ত্যাগ করিয়া মেঘের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। পদক্ষেপ যেমন ত্বরিত, তেমনই উদ্ধত।

সাধু, রাজপুত্র সাধু, ইক্ষ্বাকুবংশের যোগ্য তুমি।

"আমি এই যাইতেছি" বলিয়া লব যেমন ফিরিবে, অমনই পশ্চাতে ভীষণ কোলাহল।

ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব রক্ষা যে করিতে জানে, সে সাধুবাদের যোগ্য। পশ্চাতে কোলাহল শুনিয়া—"ধিক মূর্খ, তোদের এই ঘন-তুমুল রণকোলাহল এখনই শান্ত করিতেছি" বলিয়া যেমন লব সৈন্যগণের দিকে ফিরিতে যাইবে অমনই শুনিল—চন্দ্রকেতু বলিতেছে—

অত্যদ্ভুতাদসি গুণাতিশয়াৎ প্রিয়ো মে
তস্মাৎ সখা ত্বমসি যন্মম তং তবৈব।
তৎ কিং নিজে পরিজনে কদনং করোষি
নন্বেষ দর্পনিকর্ষস্তব চন্দ্রকেতুঃ ॥

কুমার লব, এই অতি অদ্ভুত গুণের আতিশয্যে তুমি বড় প্রিয় হইয়াছ। এক্ষণে তুমি যেমন আমার সখা, আমি তেমনি তোমার সখা। আমার পরিজনও তোমারই পরিজন, তবে নিজ পরিজন ক্ষয় করিয়া ফল কি? তোমার বীরদর্পের কষ্টিপাথর আমি রহিয়াছি বীরত্বের প্রকৃত পরীক্ষা আমাতেই হউক।

অসম যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। লোভী দুর্য্যোধন দ্বৈপায়ন-হ্রদে উরুভঙ্গের দিন ভীমকেই স্বেচ্ছায় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বরণ করিয়া লয়। পাপী জরাসন্ধ ও কৃষ্ণার্জ্জুন অপেক্ষা ভীমকে বলবান দেখিয়া তাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। চন্দ্রকেতু উদার স্নেহময় কিন্তু সে ক্ষত্রিয়বীর, ক্ষত্রোচিত তেজ, বীরত্ব, অভিমান তাহার খুবই প্রবল। "নন্বেষ দর্পনিকষস্তব চন্দ্রকেতু" কথাটী প্রসন্ন অথচ কর্কশ। লবের নিকট বড় মধুর, বড় তীক্ষ্ণ লাগিল। বড় হর্ষে, বড় সম্ভ্রমে লব যেমন চন্দ্রকেতুর দিকে গতি ফিরাইবে, অমনই আবার সৈন্যদলের ঘন কলকলধ্বনি শোনা গেল।

চন্দ্রকেতু প্রকৃতই মহানুভব বীর। একের বিরুদ্ধে অনেকের আক্রমণ তাহার প্রাণে সহিবে কেন? তখন সেনানীদের "ধিক মূর্খ" বলিয়া চন্দ্রকেতুও গালি দিল। লব চন্দ্রকেতুরই ত ভাই; সে সৈন্যদিগকে আক্রমণ হইতে বিরত করার আদেশকে তাহার উপর করুণা ও সহানুভূতির নিদর্শন বলিয়া বুঝিল। তাই লবের মনে একটা ব্যথার অনুভব হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট এ দয়া এ সহানুভূতি সে চাহে না। তৎক্ষণাৎ লব ধ্যানযোগে উদ্ভূত জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা সৈন্যদিগকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। সে সৈন্য কোলাহল মুহূর্ত্তের মধ্যেই থামিয়া গেল। এ রণক্ষেত্র তখন চিত্রার্পিতবৎ নিঃস্পন্দ; এ এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার!

প্রথমাঙ্কে চিত্রদর্শন প্রস্তাবে রামচন্দ্র সীতাকে বর দান করেন; আমার এই জৃম্ভকাস্ত্র বিদ্যা তোমার গর্ভস্থ সন্তানে সংক্রামিত হউক।" মন্ত্রশক্তির মত জন্মিবামাত্রই জৃম্ভকাস্ত্র বিদ্যা তাই লবের অধিগত হইল। জৃম্ভকাস্ত্রবিদ্যা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দান, রামের আত্মত্যাগের পুরস্কার। এ অস্ত্র যেন অন্ধকার ও বিদ্যুৎপুঞ্জের সন্নিপাত। এ একপ্রকার বৈদ্যুতিক ব্যাপার। এ অস্ত্রের তমোময় তেজে চক্ষু প্রথমে মুদ্রিত হইয়া আইসে, চাহিতে গেলে চক্ষু ঝলসিয়া যায় পরক্ষণে দারুণ ব্যথা অনুভব করে। তার পর নিস্পন্দ অবস্থা, চিত্রলিখিত দশাপ্রাপ্তি।

লব ও চন্দ্রকেতু উভয়ে সম্মুখীন হইল। তুল্যরূপ, সমান বয়স, মনোবৃত্তিও এক

জাতীয়। পিতৃ সম্বন্ধে এবং মাতৃসম্বন্ধে দুজনের দেহে একই রক্ত বহমান। লব চন্দ্রকেতু পরস্পর পরস্পরের নিকট বড়ই প্রিয়দর্শন বলিয়া বোধ হইল। স্নেহ ও অনুরাগের সহিত উভয়ে উভয়কে দেখিল। এ যেন অহেতুক মিলন, এ যেন "জন্মান্তর নিবিড়বন্ধ পরিচয়," এ যেন অজ্ঞাত রক্তসম্বন্ধের প্রভাব। ইহা জীবগত ধর্ম্ম যে, কাহাকে দেখিবামাত্র কাহারও হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার হয়। কবি এইরূপ অনুরাগের নাম দিয়াছেন তারামৈত্রক বা চক্ষুরাগ। তারায় তারায় মিল, রাশি চক্রে মিল, গ্রহনক্ষত্রে মিল যে ভালবাসার প্রীতিসঞ্চারের হেতু—ইহা আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা।

"অহেতু পক্ষপাতো য স্তস্য নাস্তি প্রতিক্রিয়া
স হি স্নেহাত্মকস্তন্তুরন্তমর্ম্মাণি সীব্যতে ॥

কারণ বিনা যে অনুরাগের সঞ্চার হয়, তাহার কখন উচ্ছেদ দেখা যায় না। সেই স্নেহময় সূত্র দুইটী হৃদয়কে এক সঙ্গে জুড়িয়া দেয়।

চন্দ্রকেতু ও লবের হৃদয়ে যুগপৎ একই ভাবের উদয় দেখা গেল। উভয়েই ভাবিল—আলিঙ্গনাশায় যে অঙ্গে পুলক ফুটিয়া উঠিতেছে, সে চিক্কন কমনীয় অঙ্গে কি করিয়া অস্ত্রক্ষেপ করা যাইবে? উপায় কি? রণক্ষেত্রে আসিয়া রণবিমুখ হওয়া ত যায় না। বীর হইয়া বীরধর্ম্ম পালন না করাও সম্ভব হয় না। কি কঠোর স্নেহহীন বীরের আচার!

"বীরাণাং সময়ো হি দারুণরসো স্নেহক্রমং বাধতে"

রথারূঢ় চন্দ্রকেতু লবকে পাদচারী দেখিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ইহা নহে, বুঝিয়া রথ হইতে অবতরণ করিল। লব পাদচারী, নিজে রথারূঢ়—এ যুদ্ধ ত ন্যায়যুদ্ধ নহে। আর প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সমক্ষেত্রে দাঁড়াইলে নিজেরই সম্মান। কিন্তু চন্দ্রকেতু এই অবতরণকে বীরের পূজা বলিয়া মনে করিল। রঘুকুলের মর্য্যাদাভিজ্ঞ সুমন্ত্র চন্দ্রকেতুর এ সাহসের কার্য্যটিকে বারণ করিতে পারিল না। যদিও চন্দ্রকেতু বালক, তাহার জীবনের শুভাশুভ সুমন্ত্রেরই উপর নির্ভর, তথাপি সুমন্ত্র কর্ত্তব্যের নিকট স্নেহের বলি দিল। ধন্য সুমন্ত্র, ধন্য চন্দ্রকেতু।

লবও বীর, রামের পুত্র। সে রক্তের গুণ কোথায় যাইবে? তাই লব চন্দ্রকেতুকে রথ হইতে অবতরণ করিতে বারণই করিল। অথচ নিজে প্রার্থিত হইয়া অন্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে চাহিল না। ভিতরে প্রচণ্ড গর্ব্ব, তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কেমন বিনয়ের সহিত রথারোহণ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিল।

"কো বিচারঃ স্বেষু উপকরণেসু কিন্তু অরণ্যসদো বয়মনভ্যাস্তরথচর্চ্চাঃ"

অবশ্য রথারোহণে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে অরণ্যচারী আমি, রথারোহণে আমার অভ্যাস নাই। দর্প ও সৌজন্যের কি বিচিত্র মিলন।

লব-চন্দ্রকেতুর ব্যাপারটি আগাগোড়া বিচিত্র রসের মিশ্রণে এক প্রকার উপভোগ্যই হইয়াছে। দুজনের দৃষ্টি স্নেহপয়োধারায় অভিষিক্ত, বাহু কিন্তু জয়াকাঙ্ক্ষায় ধনুর্ব্বাণ আকর্ষণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সুমন্ত্র একবার ভাবিল, লব কি রামচন্দ্রের পুত্র, সীতার গর্ভজাত? হৃদয়

যে ইহাই ভাবিতে চাহে। আবার পরক্ষণে বিবেক আসিয়া সে ভাবনা দূর করিয়া দিল। যে লতা বহুদিন হইল উন্মূলিতা হইয়া গিয়াছে, তাহার পুষ্প প্রসবের আশা কোথায়? হৃদয় যাহা ভাবিতে চাহে, যুক্তি অনেক সময়ে তার বিপক্ষে যায়। যদিও সুমন্ত্র বলিল লবের এই দর্পসৌজন্যের অনুরূপ আচরণ দেখিলে রামভদ্রের হৃদয় নিশ্চয়ই স্নেহে গলিয়া যাইত। কিন্তু তথাপি সুমন্ত্রের হৃদয়ের এক কোণে রামভদ্রের হৃদয় স্নেহে গলিয়া যাওয়ার অপর একটী কারণও ফুটিয়া উঠিতেছিল।

লব তখন নিজ উদার হৃদয়ের এবং ঋষি কুমারোচিত প্রশান্ত ভাবের দিক দিয়া বিচার করিয়া লজ্জিত হইল। সেই রামায়ণকথা-নায়ক সুজন রাজর্ষি রামচন্দ্র, তাঁহার অশ্ব ধরিয়াছি মনে করিয়া ব্যথিত ও হইল। তাই সুমন্ত্রকে কহিল "আর্য্য, আমরা সেই রাজর্ষির অশ্বমেধযজ্ঞ পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞীয়াশ্ব ধরি নাই। শৌর্য্য সৌজন্যের আদর্শ অযোধ্যানাথের উপর আমরা কোনরূপ দ্বেষ ভাব ও পোষণ করি না। তবে অশ্বরক্ষকের ক্ষত্রিয় অবমাননাকারী উদ্ধত বাণী *

অয়মশ্বঃ পতাকেয়ম্ অথবা বীরঘোষণা।
সপ্তলোকৈকবীরস্য দশকণ্ঠকুলদ্বিষঃ।

আমাদের চিত্তে বিকার জন্মাইয়া দিয়াছে—তাই অশ্ব ধরিয়াছি। এ গর্ব্বিত বাণী কোন্ বীর সহ্য করিতে পারে?

লবের এ কথা শুনিয়া চন্দ্রকেতুও হাসিতে হাসিতে বলিল—সে হাসির মধ্যে ব্যঙ্গের সুর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। "জ্যেষ্ঠতাতের প্রভাবোৎকর্ষের প্রতি লবের এ অমর্ষ মাত্র" রামচন্দ্রের প্রভাব যতই উৎকর্ষতা লাভ করুক না কেন, তাহাতে লবের হৃদয়ে অমর্ষ আসা অন্যায়; বীরের সৌভাগ্য গর্ব্বে এ অসহিষ্ণুতা উদারতার পরিচায়ক নহে—তাই চন্দ্রকেতু ঈষৎ বিরক্ত, অসন্তুষ্ট এবং ব্যথাপ্রাপ্ত হইল।

"ন তেজস্তেজস্বী প্রসৃত অপরেষাং প্রসহতে" লবের উক্তি। তেজস্বী কখন অপরের তেজ সহ্য করিতে পারে না; ইহা তাহার প্রকৃতি। কাজেই লবের হৃদয়ে এ অসহিষ্ণুতা জন্মিলেও তাহা কিছুতেই অন্যায় হইত না। লব কিন্তু আপনার হৃদয়ের গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া রামচন্দ্রের উপর যে তাহার কোন অমর্ষ আছে তাহা বুঝিতে পারিল না। লবের ধারণা অশ্বরক্ষকের গর্ব্বিত বাণীই এই যুদ্ধের মূল কারণ। স্বভাবতঃ দান্ত সুজন রামচন্দ্র ও গর্ব্বিত নন, জনসাধারণের উপর তাঁহার ত কোনদিনই ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় নাই; তবে তাঁহার সৈনিকেরা এ উদ্ধত বাণী প্রচার করে কেন? এ ত রামচন্দ্রের প্রকৃতির যোগ্য নহে। যে বাণী সর্ব্ববিধ বৈরভাবের পোষক, যাহা দেশের অলক্ষ্মীস্বরূপা, তাহা যে রাক্ষসী বাণী। ঋষিগণ এ রাক্ষসী বাণীর নিন্দা করিয়াই থাকেন। লব যদিও ক্ষত্রিয় কুমার, তথাপি সে শান্তিময় তপোবনে বাস করিয়া, মহর্ষির নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া আর্য সংস্কারপূত হইয়াছে; সে কেন না, সকল ক্ষত্রিয় পরিভাবী বাণীকে অশুভকরী অলক্ষ্মী সর্ব্বনাশিনী রাক্ষসী বলিয়া মনে করিবে?

---

* এই অশ্ব সপ্তলোকের মধ্যে একমাত্র বীর, দশানন কুলনাশন শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়পতাকা, অথবা বীরত্বের ঘোষণা।

লব যখন দেখিল,—"এই অশ্ব জয়পতাকা" এই রাক্ষসী বাণীই যুদ্ধের কারণ তখন নিজের অমর্ষ হউক বা না-ই হউক—তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাই চন্দ্রকেতুর কথার খোঁচাটি অনেকক্ষণ ধরিয়াই লবের মর্ম্মে বিঁধিয়া রহিয়াছে। তাই লব চন্দ্রকেতুর কথার উত্তর দিল "আমার যদি রামচন্দ্রের প্রভাবোৎকর্ষের প্রতি অমর্ষই হইয়া থাকে, তাহাতে কোন দোষের কথা নাই। ক্ষাত্র ধর্ম্ম ত আর ব্যক্তি বিশেষেই আবদ্ধ নহে।" বাস্তবিকই বীর গর্ব্ব, কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, যে, অপর কাহারও তাহাতে অধিকার থাকিবে না।

সুমন্ত্র স্থির ধীর, লবের প্রতি স্নেহ বিশিষ্টও বটে। কিন্তু সে প্রভুভক্ত, রামচন্দ্রের উপর তাহার অগাধ শ্রদ্ধা। লবের এ দর্পিত বাণী সুমন্ত্রের ও প্রাণে একটী জ্বালার সৃষ্টি করিল। বালকের এই অনধিকার চর্চ্চায়, প্রভু রামচন্দ্রের উপর সাবহেল ব্যবহারে বিরক্তও হইল। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র আনন্দিত হয়, আবার বিক্ষুব্ধও হইয়া থাকে। সুমন্ত্রেরও তাহাই হইল। ক্ষুব্ধচিত্তে লবের কথার তীক্ষ্ণ উত্তর না দিয়া পারিল না।

"তুমি সে ইক্ষ্বাকু কুলাবতংস রামচন্দ্রকে জান না, অতএব তাঁহার বিষয়ে এ অতিপ্রসঙ্গ হইতে বিরত হও। সৈনিকগণকে জয় করিয়া বীর্য্যবত্তা দেখাইয়াছ বলিয়া সেই জামদগ্ন্য বিজেতার উপর তোমার কটাক্ষ করা সাজে না।" রামচন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞাসূচক এ উক্তি লবের পক্ষে অতি প্রসঙ্গ বলিয়াই সুমন্ত্র এই তিরস্কার করিল।

লব সাধারণ ভাবে যাহা বলিল, তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে রামচন্দ্রের কোন রূপ অসম্মান করা হয় নাই। কিন্তু সুমন্ত্র প্রত্যক্ষ ভাবেই লবকে আঘাত করিল। লব বীর, ইক্ষাকু রক্ত তাহার ধমনীতে বহমান, সে সহ্য করিবে কেন? কথায় কথা বাড়িয়া যায়, স্ফুলিঙ্গে ফুৎকার দিলে তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। লবও ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উপহাসের সহিত সুমন্ত্রকে কহিল —

ব্রাহ্মণের বাক্যে বল, ক্ষত্রিয়ের বাহুতে বল—ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব শাস্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্মণ জামদগ্ন্যের বিজেতা বলিয়া রামচন্দ্রের প্রশংসা কি?"

চন্দ্রকেতুর আর সহ্য হইল না। জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি এত বড় অবজ্ঞাসূচক কথা সে কখন শোনে নাই। লক্ষ্মণ পুত্র এ তীব্র আঘাতে আহত প্রায় হইয়া উঠিল। আর কথোপকথন চলে না। লবকে এ প্রকাণ্ড আক্রমণের উত্তর দেওয়া চন্দ্রকেতুর পক্ষে অসম্ভব। ক্রুদ্ধ ব্যথিত স্বরে সুমন্ত্রকেই বারণ করিল। অবশ্য পরোক্ষভাবে লবের আক্রমণ প্রতিহত করাই হইল।

আর্য্য কৃতমুত্তরোত্তরেণ
কোঽপ্যেষ সম্প্রতি নবঃ পুরুষাবতারঃ
শ্লাঘ্যো ন যস্য ভগবান্ ভৃগুনন্দনোঽপি।
পর্য্যাপ্ত সপ্তভুবনাভয়দক্ষিণানি
পুণ্যানি তাতচরিতানি চ যো ন বেদ॥

আর্য্য আর কথা কাটাকাটির প্রয়োজন নাই। কে ইনি নূতন পুরুষাবতার হইয়া আসিয়াছেন

ভগবান ভৃগুনন্দনও ইঁহার শ্লাঘ্য বিবেচিত হন না। সপ্ত ভুবনের অভয়দাতা শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যময় চরিত্রও তুচ্ছ প্রতীত হয়।

"স্ত্রীহত্যায় যাঁহার বীরত্ব, বালিবধে যাঁহার কৌশল, তাঁহার বীরত্বকৌশল সকলেই জানে। লব যখন রামচন্দ্রের প্রতি এই তীব্র বিদ্রূপোক্তি করিল তখন চন্দ্রকেতু দণ্ডাহত বিষধরের মত গর্জ্জাইতে লাগিল "আঃ তাতাপবাদভিন্নমর্য্যাদ অতি হি নাম প্রগল্‌ভসে" বলিয়া চন্দ্রকেতু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, স্বভাবতঃ আরক্তিম চক্ষু দিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। লবের এ প্রগল্‌ভতা উত্তেজিত হৃদয়ের ফল বলিয়া আমরা ধরিয়া লইয়াছি নচেৎ লবচরিত্র-মহত্ত্ব একটু ক্ষুণ্ণ হইত।

তখন দুই মহাবীর সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য বিমর্দ্দনক্ষমা ভূমিতে অবতরণ করিল। তখন প্রিয়দর্শন, কোমলপ্রকৃতি লব ও চন্দ্রকেতুকে রুক্ষদর্শন এবং কঠোর বলিয়া বোধ হইল।

সংস্কৃত নাটকে নেপথ্যেই * যুদ্ধ হওয়ার প্রথা। যুদ্ধ বল, হত্যা বল এ সকল রঙ্গমঞ্চে দেখান নিষিদ্ধ। বর্ণনা দ্বারা যুদ্ধের ছবিটি হৃদয়ে ফুটাইয়া তোলাই কবির কলা নৈপুণ্যের পরিচায়ক। লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধব্যাপারটি ষষ্ঠ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বিদ্যাধর বিদ্যাধরী সংবাদে বিবৃত হইবে।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

হাসি কান্না

(১)

সেই অমৃতের সন্তানেরা আলোর অনুগামী ;
মোদের আর বার দুঃখ কিসের ?—ভাবছি দিবসযামি।
চিন্তা বৃথা, ব্যর্থ কান্নাকাটি ;
ধর্ম্মপথে চল্‌বো সোজা, রইবো মানুষ খাঁটি!
কাঁদবো কেন? প্রাণটা খুলে হাসবো মধুর হাসি,
কাঁদবে যারা চোখ মুছাবো গভীর ভালবাসি'।
বল্ না তোরা কাঁদবো কেন ভাই?
দুঃখ?—সেটা মনের ব্যথা, দুঃখ কিছুই নাই।
পুষ্প হাসে, চন্দ্র হাসে, হাসে লক্ষ তারা,
হেসেই পাখী গাইছে সুখে হয়ে পাগলপারা ;
প্রাণের হাসির কোথায় সমতুল!
এমন হাসি না হেসে, হায়, মানুষ করে ভুল!
কল্পিত সব মনের দুখে মরতে জানি, ছাই!
সকল রকম দুখের মাঝে হাসবো সর্ব্বদাই।
হাসির আবাদ করবো সবার মাঝে,
কান্না তখন মরবে কেঁদে গভীর সরম লাজে।

(২)

আমায় যারা ভালবাস' দূর করে' দাও তারা,
দুঃখ দিয়ে বহাও নয়ন-ধারা,
আদর পাবার মানুষটি তো নই
ভ্রান্তি ত্রুটির যন্ত্রণাতে ক্লান্ত হয়ে' রই
কাঁদ্‌ছি তবু প্রাণের ময়লা গলতে নাহি চায় ;
দীর্ঘ দিবস রাত কাটে গো নানান্ যাতনায়!
কাঁদার মত কাঁদতে শুধু চাই,
তবে যদি প্রাণের পাওনা প্রাণের মাঝে পাই!
কাজল-কালো মেঘের রাশি আকাশ যেমন ঢাকে
থেকে থেকে চম্‌কে উঠে ডাকে,
তেমনি ধারা আমার বুকের মাঝে,
দুঃখ-দাগায় ঘোর কালিমা দিগ্ দিগন্ত রাজে!
দারুণ হয়ে উঠুক্ ব্যথা, ঝরুক্ নয়ন-ধারা,
সবার কান্না কাঁদবো তখন হয়ে হৃদয়-হারা!
শুকনো জগৎ করবো নরম কাদা,
হৃদয় শেষে হবে শরৎগগন সম শাদা!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বনপর্ব্ব।

চতুর্থ অধ্যায়। নল দময়ন্তী।

বনবাসের পঞ্চম বর্ষ চলিতেছে। পাণ্ডবেরা আবার কাম্যক বনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে চাক্ষুসী নামক রহস্যবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। তদ্দারা দূরের বস্তু দৃষ্ট হয়। যুধিষ্ঠির এখন তাহা অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিলেন * এবং স্বর্গ হইতে দুর্লভ অস্ত্র-শস্ত্র আনয়ন করিবার জন্য তাঁহাকে তথায় পাঠাইলেন।

গমন সময়ে দ্রৌপদী অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "ইহা ভুলিওনা—আমাদের সুখ দুঃখ, জীবন মরণ, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সকলই তোমার উপর নির্ভর করে।"

একদিন মহর্ষি বৃহদশ্ব পাণ্ডবগণকে দেখিতে আসিলেন। যুধিষ্ঠির অতি দুঃখার্ত্তভাবে বলিলেন, "মুনিবর, আমিই সকলের দুঃখের কারণ। আমার ন্যায় দুঃখী ভূমণ্ডলে আর জন্ম গ্রহণ করে নাই।"

ঋষি উত্তর করিলেন, "তাহা ঠিক নহে। তোমাপেক্ষাও কত অধিক দুঃখী কত অধিক সংখ্যায় বিদ্যমান আছে কঠিন পীড়াগ্রস্থ কত চিররোগী দিনরাত আর্ত্তনাদ করিতেছে, অথচ জীবন যায় না, নিশ্চয়ই তাহারা তোমাপেক্ষা অধিক দুঃখী। আর ঐ যে দীন দরিদ্র ভিক্ষুকের দল, সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও উদর পূর্ণ করিতে পারিতেছে না, ঝড় বৃষ্টিতে দাঁড়াইবার গৃহ নাই, শীত হইতে আত্মরক্ষার উপায় নাই, তাহারা নিশ্চয়ই তোমাপেক্ষা অধিক দুঃখী। এই সকল ভাবিয়া মনকে আশ্বস্ত কর। সকলেই যদি ঐ রূপ ভাবিয়া দেখে, তাহা হইলে বিষম দুঃখেও শান্তি লাভ করিতে পারে। অধিক কি এই পাশা খেলার জন্য নলরাজও তোমাপেক্ষা অধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শ্রবণ কর" :—

নল নিষধ দেশের রাজা। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও অতি বলবান। বিদর্ভ দেশের রাজকন্যাও দময়ন্তী পরমা সুন্দরী। উভয়েই উভয়ের রূপ গুণের সংবাদ পাইয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন; স্বয়ম্বর সভায় দময়ন্তি নলের গলায় মালা দিলেন। তৎপরে তাঁহারা বহু যাগ যজ্ঞ করিলেন। তাঁহাদের পুত্র কন্যা হইল; সুখের সীমা থাকিল না।

একদিন নলের ভ্রাতা পুষ্কর ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহাকে পাশা খেলিতে আহ্বান করিলেন। পণ রাখিয়া খেলা আরম্ভ হইল। নলের ধনৈশ্বর্য্য ও রাজ্য, সকলই পুষ্কর জিতিয়া লইল। মন্ত্রীগণ ও দময়ন্তী নলরাজকে কত বুঝাইলেন, তিনি বিরত হইলেন না! শেষে পুষ্কর নলকে বলিলেন "সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ, এখন দময়ন্তীকে পণ রাখ।" ভ্রাতার মুখে এই কথা শুনিবামাত্র নলের প্রাণে ঘৃণার উদয় হইল তিনি তৎক্ষণাৎ সে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, প্রিয় প্রাসাদাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

---

* আদিপর্ব্ব ১৭০—৪৩,৪৫। বনপর্ব্ব ৩৭—১০,১১।

নলরাজা চলিয়াছেন, অতুল ঐশ্বর্য্য স্বীয় কর্ম্মদোষে বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়াছেন। শোকে দুঃখে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। পরিধানে একখানি মাত্র বস্ত্র, যেন উন্মাদ। সাধ্বীগণের শিরোমণি দময়ন্তী কি গৃহে থাকিবেন? তিনি যেই স্বামীর শোচনীয় অবস্থা দেখিলেন, অমনি এক বস্ত্রা হইয়াই, স্বামীর পাছে পাছে ছুটিলেন। প্রিয় পতির দুঃখের সহচরী হইলেন। প্রাণাধিক পুত্র কন্যার মমতা তাঁহাকে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না, গৃহে রাখিতে সমর্থ হইল না।

তাঁহারা তাঁহাদেরই নগরীর নিকট তিন দিন থাকিলেন, তথাপি কেহ তাঁহাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য কিছুই দিল না দিবে কিরূপে? পুষ্কর প্রচার করিলেন, যে ব্যক্তি নলদময়ন্তীকে সাহায্য করিবে, তিনি তাহার শিরচ্ছেদ করিবেন। শেষে নল-দময়ন্তী আহার অন্বেষণে মহাবনে প্রবেশ করিলেন। নলরাজা তথায় এক ঝাঁক পাখী দেখিলেন। তাহাদের মাংস আহার করিবেন ভাবিয়া তাহাদিগকে ধরিবার জন্য লালায়িত হইলেন। স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র তাহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিলেন। অমনি তাহারা সেই বস্ত্র লইয়া উড়িল, আর বলিল, "হতভাগ্য নল, আমরা তোমার সেই প্রিয় পাশা। তোমার যে একখানিমাত্র বস্ত্র ছিল, তাহাও আমাদের সহ্য হয় নাই। তাহাও লইয়া চলিলাম। যাহারা খেলায় মত্ত হয়, তাহাদের এই রূপ দুর্দ্দশাই হয়।'

দুর্ব্বুদ্ধির বিলাপ ভিন্ন আর সম্বল কি? নলরাজা বিলাপ করিতে লাগিলেন। আবার স্ত্রী-পুরুষে একই বস্ত্র পরিয়া চলিতে লাগিলেন। শেষে একটি পথ দেখিয়া নল বলিতে লাগিলেন, "এই পথ বিদর্ভ নগরে গিয়াছে।" দময়ন্তী বলিলেন, "তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আমি কি তোমাকে এইরূপ অবস্থায় ফেলিয়া পিতৃগৃহে গিয়া আশ্রয় লইতে পারি! তবে চল দুই জনেই তথায় যাই। সেখানে তুমি মহাসম্মান প্রাপ্ত হইবে।" নল স্বীকৃত হইলেন না।

এখন তাঁহারা উভয়েই এক বস্ত্র পরিয়া সেই মহাবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা একস্থানে বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রান্ত ক্লান্ত রাজমহিষী সেই মৃত্তিকার উপরে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন নলরাজা উভয়ের পরিধেয় বস্ত্রখানি দ্বিখণ্ড করিয়া পলায়ন করিলেন।

কিছুকাল পরে রাণীর নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। তখন তিনি স্বামীকে না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই অরণ্যে রোদনে কেহই বিগলিত হইল না। তখন তিনি বিলাপ করিতে করিতে সেই মহাবনে প্রিয় পতির অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সময় এক বৃহৎ অজগর সর্প তাঁহাকে গ্রাস করিতে লাগিল। তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া এক ব্যাধ ছুটিয়া আসিল। সে সেই সর্পকে দ্বিখণ্ড করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যাঁহার হৃদয়ে সতীত্ব আছে, ধর্ম্মবল আছে, কে কে তাঁহাকে পরাভব করিতে পারে? দময়ন্তী সেই ব্যাধকে নিহত করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

নল ভাবিয়াছিলেন, দময়ন্তী একাকী হইলে পিতৃগৃহে গমন করিবেন। কিন্তু তাঁহার মনে সে কথা একবারও উদিত হইল না। তিনি অশ্রুজলে ভাসিতেছেন, আর সেই মহাবনে উন্মাদিনীর ন্যায় স্বামী অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন। কেশ মুক্ত কর্দ্দমাক্ত, শরীর ধূলায় ধূসরিত, জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ। পরিধানে সেই মলিন—অতি মলিন কর্দ্দমসিক্ত অর্দ্ধ বস্ত্র। যে দিকে চক্ষু যাইতেছে, সেই দিকেই যাইতেছেন। একে মহাবন, তাহাতে আবার হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। কত কিরাত, ব্যাধ, অসভ্য মানুষ বিচরণ করিতেছে। তথাপি দময়ন্তী ভীত হইলেন না। "পতি পতি" বলিতে বলিতে ছুটিতে লাগিলেন। যেখানে বৃক্ষ দেখিলেন, পশু দেখিলেন, শৈল দেখিলেন, সেখানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "আমি অভাগিনী দময়ন্তী। তোমরা কি আমার পতিকে দেখিয়াছ? এই রূপে পতিবিরহে অধীরা, উন্মত্তা হইয়া বহুদিন বনে বনে ভ্রমণ করিলেন। শেষে এক নদীতীরে এক বণিকসম্প্রদায়কে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চেদিরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজমাতা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন, পরিচারিকা নিযুক্ত করিলেন।

আর নল রাজা? স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া ছুটিয়াছেন। এমন সময় এক সর্প দংশন করিল। তাঁহার অতুল রূপ কৃষ্ণবর্ণ হইল। ক্রমে তিনি অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তথাকার রাজার সারথি হইলেন।

এ দিকে বিদর্ভরাজ স্বীয় জামাতার ও তনয়ার দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতে বহু ব্রাহ্মণীকে বহুদিকে পাঠাইয়াছিলেন। এক ব্রাহ্মণ চেদিরাজ্যে দময়ন্তীকে দেখিয়া তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া গেলেন। তিনি পিতা মাতাকে বলিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে স্বামীর অন্বেষণ করিতে নানাদেশে প্রেরণ করিলেন। এক ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দময়ন্তী কথিত সাঙ্কেতিক বাক্য বলিতে লাগিলেন। নল তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'পতি পরিত্যাগ করিলেও সতী স্ত্রী কখনও পতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় না। স্বামীর নিকট সদ্ব্যবহারই প্রাপ্ত হউক বা অসদ্ব্যবহারই প্রাপ্ত হউক সাধ্বী স্ত্রী কখনও স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট হয় না। পক্ষীগণ যাহার পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়াছিল তাহার প্রতি সতী স্ত্রী কখনও পরাঙ্মুখ হয় না'। সেই ব্রাহ্মণ ফিরিয়া গিয়া সেই উত্তর দময়ন্তীকে শুনাইলেন। তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে পুনরায় নলের নিকট পাঠাইলেন। তিনি নলকে গিয়া বলিলেন, "স্বামী অনুদ্দেশ হওয়ায় দময়ন্তী পুনরায় পতি গ্রহণ করিবেন, শীঘ্রই তাঁহার স্বয়ম্বর হইবে *।" দময়ন্তীর পুত্র কন্যা ছিল। তখন তিনি তাঁহার

* সুপ্রসিদ্ধ সার মনিয়ার উইলিয়মস্ লিখিয়াছেন, "গৃহস্থ জীবনের চিত্র ও চরিত্র অঙ্কণে গ্রীস ও রোমের কাব্য অপেক্ষাও সংস্কৃত কাব্য সমধিক মূল্যবান। হিন্দু কবিরা স্ত্রী-চরিত্র রচনায় অতিশয়োক্তি ত্যাগ করিয়া, যাহা স্বাভাবিক, কেবল তাহারই বর্ণনা করিয়া থাকেন। কৈকেয়ী, মন্দোদরী, কৌশল্যা, এমন কি মন্থরা—সকলেরই চিত্র যেন জীবন্ত ও স্বাভাবিক। সীতা, দ্রৌপদী ও দময়ন্তী—হেলেন বা পেনেলোপ অপেক্ষাও আমাদের স্নেহ ও সহানুভূতি অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। সাধারণতঃ হিন্দু ললনাগণ সত্যই দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণ আদর্শ। পতিব্রতা রমণীগণের এই সকল মনোহর চিত্রে প্রাচীন কালের হিন্দু গৃহের পবিত্রতা

পিতার আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তথাপি তিনি আবার বিবাহ করিবেন, শুনিয়া নল বিচলিত হইলেন। অযোধ্যার রাজার রথে বিদর্ভ নগরের দিকে অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে এক ফল ভক্ষণ করিয়া বমন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীর হইতে বিষ নির্গত হইয়া গেল, আবার পূর্ব্বের কান্তি আসিল। বিদর্ভ নগরে দময়ন্তী নলরাজকে চিনিতে পারিলেন। এইরূপে বহু বৎসরের অশেষ দুঃখের পর আবার নল-দময়ন্তীর মিলন হইল।

নল প্রবাসে পাশাখেলা উত্তম রূপে শিখিয়াছিলেন। এখন তিনি নিষধে গমন করিয়া পুষ্করকে পাশা খেলিতে আহ্বান করিলেন। পুষ্কর একে একে সকলই হারিলেন। এই রূপে নলরাজা স্বরাজ্য উদ্ধার করিলেন। এখন তিনি সেই ভ্রাতার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন? তাঁহাকে বারম্বার আলিঙ্গন করিলেন, মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিলেন। তাঁহাকে বহু ধনরত্ন ও রাজ্যাংশ দিলেন। এই উদার উন্নত মহান্ হৃদয়ের জন্য নলরাজা আজও ভারতে "পুণ্যশ্লোক নলরাজা" বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছেন। উদার উন্নত মহান্ হৃদয়ের তুলনা কোথায়?

মুনি নীরব হইলেন। নলের চরিত্র আজও প্রতি হিন্দুগৃহে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। প্রতি প্রভাতে হিন্দুরা মন্ত্র পড়িয়া গাত্রোত্থান করেন :—

পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকো চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ ॥*

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

ও স্বাভাবিকতার প্রকৃত ছবিই আমরা দেখিতে পাই। রামায়ণ ও মহাভারতে গৃহস্থ জীবনের সুখ ও সামাজিক সুখের যে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাপেক্ষা অধিক সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী আর কিছুই হইতে পারেনা। বস্তুতঃ গৃহের স্নেহ ভালবাসার চিত্র অঙ্কনে ও স্থান কাল অভেদে বিশ্বের সর্ব্বত্র মনুষ্য চরিত্রে যে সকল ভাব দৃষ্ট হয়, তাহার ছবি দিতে সংস্কৃত কাব্য অতুলনীয়।" "Indian Epic Poetry p. 54, 58.

হেলেন গ্রীস দেশের অন্তর্গত স্পার্টার রাজা মেনেলসের পরমাসুন্দরী রাণী ছিলেন। এসিয়া মাইনর প্রদেশের অন্তর্গত ট্রয় নগরের রাজকুমার পারিস অন্যায় পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া যান। তাহাতে গ্রীসের সমুদয় বীর একতায় আবদ্ধ হইয়া বহু সৈন্য লইয়া ট্রয় নগর অবরোধ করেন এবং দশবৎসর যুদ্ধের পর তাহা ধ্বংস ও পারিসকে নিহত করিয়া হেলেনকে উদ্ধার করেন। তখন স্বামীর সহিত তাঁহার পুনর্মিলন হয়।

পেনেলোপ গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ বীর ইউলিসিসের পরমাসুন্দরী স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার স্বামী উক্ত ট্রয় যুদ্ধে গমন করেন ও পরে নিরুদ্দেশ হন। সেই সময় বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করেন। তিনি কোনমতে সম্মত হন না। শেষে তাঁহার স্বামী ২০ বৎসরের অনুপস্থিতির পর গৃহে ফিরিয়া আসেন। তখন উভয়ের পুনর্মিলন হয়।

গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ কবি হোমার তাঁহার Iliad নামক কাব্যে হেলেনের এবং Odyssey নামক কাব্যে পেনেলোপের চরিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন।

* বনপর্ব্ব ৭০—৭৬। পূর্ব্বে পতি মরিলে বা অনুদ্দেশ হইলে পত্নী পুনরায় বিবাহ করিতে পারিত। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে বিধবা বিবাহ দ্রষ্টব্য।

সাবরমতি-সত্যাগ্রহাশ্রম

পথের কথা

আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সাবরমতি নামের সহিত সুপরিচিত। সাবরমতি তাঁহাদের নিকট একটা সুপ্রসিদ্ধ স্থান। কিন্তু ভারতবর্ষের ভূগোলে ইহার বিশেষ কিছু প্রসিদ্ধি নাই; এই নামে একটি গ্রাম আছে বটে, কিন্তু তাহার এমন কিছুই সমৃদ্ধি বা ভৌগলিক বিশেষত্ব নাই, যাহার জন্য ইহা একটি প্রসিদ্ধ নগর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; শত শত গ্রামের ন্যায় ইহাও একটা সাধারণ গ্রাম মাত্র; এইরকম গ্রাম আমাদের বাংলাদেশে অনেক আছে। এই "সাবরমতি" নামে একটি ছোট নদীও আছে ("চৈতন্যভাগবতে" 'শুভ্রমতি' বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে) কিন্তু এই নদীর জন্য আমদাবাদ প্রসিদ্ধ নহে, আমদাবাদের জন্যই আমরা এই নদীটীর নাম শুনিয়া থাকি। ভারত-প্রসিদ্ধ সহর আমদাবাদের পাশ দিয়া এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীটি বহিয়া গিয়াছে, এবং তাহার জন্যই ইহার যাহা কিছু নাম। নদীটীর পরিসর অল্প, গ্রীষ্মকালে সামান্য মাত্র জল থাকে। এই নদীর একদিকে আমদাবাদ, অন্যদিকে সাবরমতি। নদীর উপর দুইটী সেতু আছে; একটী Ellis Bridge, অপরটী Railway Bridge; রেলওয়ে ব্রীজ সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে—ইহার উপর দিয়া বি, বি, এণ্ড, সি, আই রেলওয়ের লাইন (Bombay Baroda and Central India Railway) নদী পার হইয়াছে; সর্ব্বসাধারণের জন্য এলিস্ ব্রীজ।

এই দুই উপায়েই সাবরমতি যাওয়া যায়। কিন্তু সাবরমতির সত্যাগ্রহাশ্রমে যাইতে হইলে কোন্ ষ্টেসনে নামা সুবিধাজনক—আমদাবাদে না সাবরমতিতে? যাঁহাদের সহিত অনেক জিনিষ-পত্র বা ছেলেমেয়ে আছে, তাঁহাদের পক্ষে আমদাবাদে নামাই সুবিধাজনক। ষ্টেসন হইতে আশ্রম প্রায় ৬ মাইল দূরে; কিন্তু যাইবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে; ষ্টেসনে অনেক টাঙ্গা, ট্যাক্সি ও কুলি পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা আশ্রম দেখিবার জন্য আসেন তাঁহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে না লইয়া আসিলেই ভাল হয়; সময় সময় বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আর, জিনিষ পত্রাদি সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহাশ্রমে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ ব্যতীত আর অন্য কোন জিনিষই ব্যবহার করিবার সুযোগ বা সুবিধা হইবে না। আশ্রমবাসী সকলেই এখানে অত্যন্ত দীন দরিদ্র বেশে থাকেন; পরিধানে একখানি খদ্দরের কাপড় ব্যতীত অনেকের দেহে আর কোন প্রকার আবরণ নাই। কেহ কেহ হয়ত কখন গায়ে একখানি খদ্দরের চাদর জড়াইয়া রাখেন; সার্ট কোট খুব অল্পলোকেই ব্যবহার করেন; জুতার ব্যবহার নাই বলিলেই চলে; সকলেই খালি পায়ে থাকে। এই দৈন্যের মধ্যে বাস করিতে কাহারও কোন প্রকার সঙ্কোচ নাই; বরং তাঁহারা যে স্বচ্ছন্দতা ও স্বাধীনতা অনুভব করেন কলিকাতাবাসী বাবুগণ সার্ট কোট গেঞ্জি

জুতা ও মোজা ব্যবহার করিয়াও তাহার শতাংশের একাংশ অনুভব করিতে পারেন কি না সন্দেহ। তাহারা এতই সহজভাবে তাহাদের এই দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন যে বাহিরের লোক এখানে আসিয়া জুতা মোজা ব্যবহার করিতে সাধারণতঃই লজ্জা অনুভব করেন। এই কঠোর আদর্শের সম্মুখে তাঁহাদের স্বচ্ছলভাব অত্যন্তই কটু দেখায়। সেইজন্য আশ্রমে আসিবার সময় অধিক জিনিষপত্র না আনাই সুবিধাজনক; তাহা হয়ত ব্যবহার করা ঘটিবে না, বাক্সের মধ্যেই পড়িয়া থাকিবে।

সঙ্গে জিনিষপত্র ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে না থাকিলে আমদাবাদে না নামিয়া সাবরমতি ষ্টেসনে নামাই সুবিধাজনক। এখানে টাঙ্গা বা ট্যাক্সি পাওয়া যায় না, কুলিও যথেষ্ট নাই, তবে ষ্টেসন হইতে আশ্রম বেশী দূর নহে; ষ্টেসনের সীমানা পার হইলেই সুপ্রসিদ্ধ Ahmedabad Central Jail (এই জেল সাধারণতঃ "সাবরমতি জেল" নামে বিখ্যাত) এখান হইতে আশ্রম এক মাইল মাত্র। সুন্দর পাকা রাস্তা আছে, অনায়াসে হাঁটিয়া যাওয়া যায়। আশ্রমবাসীগণ সাবরমতি ষ্টেসন দিয়াই যাতায়াত করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জিনিষপত্র ও ছেলেমেয়ে সঙ্গে থাকিলে আমদাবাদ ষ্টেসনে নামাই যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে অনেকেই হয়ত মনে করিতে পারেন যে সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে তো এইরূপ করিতেই হইবে, "আমদাবাদে গাড়ি পাওয়া যায় কিন্তু সাবরমতিতে কিছুই পাওয়া যায় না; কেমন করিয়া তবে মেয়েরা সাবরমতি ষ্টেসন হইতে এতটা পথ হাঁটিয়া আশ্রমে যাইবেন? অতএব আমদাবাদে নামাই ভাল।" সাবরমতি গুজরাতে না হইয়া বাংলায় হইলে আমদাবাদে নামাই বোধ করি যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু গুজরাত বাংলা নহে। এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, অর্থাৎ পর্দ্দা নাই। স্ত্রীলোক হাটে যাইতেছেন, বাজার করিতেছেন, বেড়াইয়া আসিতেছেন—কেহ লক্ষ্যও করিতেছে না। এখানে একই কলেজে একই ক্লাসে ছাত্র ছাত্রী একসঙ্গে পড়িতেছে; স্ত্রীলোকের জন্য কোন ভিন্ন কলেজ নাই। তাহারা এক মাইল দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া কলেজে আসিতেছেন, আবার হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেছেন; তাঁহাদের জন্য কোন Bus নাই; ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই। গুজরাত-রমণীগণের আর একটী বিশেষত্ব তাঁহারা কোন প্রকার শারীরিক শ্রম করিতে বিমুখ নহেন; ইহার শত শত নিদর্শন বম্বেতে দেখিয়াছি। তাঁহারা হাটবাজার করিতেছেন আবার তাঁহারাই সমস্ত জিনিষগুলি হাতে করিয়া বা মাথায় করিয়া বাড়ি লইয়া যাইতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের কোনপ্রকার সঙ্কোচ নাই। কুলি নিযুক্ত করা তাঁহারা অপব্যয় মনে করেন; পারৎপক্ষে তাঁহারা কুলি করেন না। বম্বের বড় বড় ষ্টেশনে দেখিয়াছি, অনেক কুলি আছে, হাজার হাজার লোক কোলাহল করিতেছে, কিন্তু গুজরাত-রমণীগণ আপনমনে স্বচ্ছন্দচিত্তে নিজেদের জিনিষগুলি নিজেরাই বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন।

গুজরাত-রমণীগণ প্রায় সকলেই পরমাসুন্দরী *। তাঁহারা অধিকাংশই ধনী। তবে

* Otto Rothfeld I. C. S. তাঁহার সুবিখ্যাত "Women of India" পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, কাশ্মীরের কথা বাদ দিলে, গুজরাতের "নাগার ব্রাহ্মণ" রমণীর ন্যায় সুন্দরী রমণী ভারতবর্ষে দ্বিতীয় নাই। "Web of Indian Life" নামক পুস্তকে ভগিনী নিবেদিতা গুজরাত-রমণীদিগকে "Soft and Silken girls of Guzerath" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ধনী বলিতে সাধারণতঃ বাঙালী যাহা মনে করে ঠিক তাহা নহে; অর্থাৎ ডেপুটি বাবুর স্ত্রীও নহেন বা "বড়বাবুর" কন্যাও নহেন; তবে কোন লক্ষপতির কন্যা বা মিল-মালিকের (Mill owner) স্ত্রী। ইঁহারা আপন আপন জিনিষ নিজেই বহন করিয়া লইয়া যাওয়া নিন্দার কথা বলিয়া মনে করা দূরে থাকুক গৌরবজনক বিবেচনা করেন। বম্বের এক ষ্টেশনে তাহাদিগকে এই প্রকার জিনিষ বহন করিতে দেখিয়া আমার এক বাঙালী বন্ধু বিদ্রূপ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় কঠোর সত্য।" বাঙালী-স্ত্রীলোক হইলে ইঁহারা কিছুতেই এই জিনিষগুলি ব ন করিতে রাজী হইতেন না; কারণ প্রথমতঃ ইঁহারা এত সুন্দরী আর দ্বিতীয়তঃ এত ধনী। তাঁহারা তাঁহাদের গ্ল্যাডিষ্টোন্ ব্যাগ্‌টীও হাতে লইতেন কি না সন্দেহ; কেবলমাত্র ছোট টাকার থলিটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া যাইতেন।" মাথার উপরে জল-ভরা কলসি লইয়া হাঁটা গুজরাত-রমণীগণ সৌন্দর্য্যের এক অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকল বংসের স্ত্রীলোকদিগকেই বম্বের ন্যায় বৃহৎ সহরেও মাথায় করিয়া কলসি লইয়া হাঁটিতে দেখিয়াছি। আমি যে বাড়িতে ছিলাম তাহার গৃহস্বামী একজন লক্ষপতি লোক; আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। একদিন কি কারণে দেখি সকালবেলায় জলের কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আধ মাইল দূরে একটী কূপ আছে; সেখান হইতে সকলে জল আনিতেছে; দেখিলাম আমার বন্ধু-পত্নী একটী কলসির উপর আর একটী কলসি বসাইয়া মাথায় করিয়া জল আনিতেছেন; তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলে তিনি গুজরাতি-ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই "তুমি হয়ত দেখ নাই; আমি কিন্তু রোজই এই ভাবে জল আনিয়া থাকি; কারণ আমরা কলের জল পান করি না। আর চাকরের কথা বলিতেছ? তাহাদের অন্য অনেক কাজ আছে।"

গুজরাতে দেড় মাইল দুই মাইল হাঁটিয়া যাইতে বাঙালী-মহিলার কোনপ্রকার অসুবিধা হইবার কারণ নাই। এখানে বৃদ্ধা হাঁটিতেছে, যুবতী হাঁটিতেছে, বালিকা হাঁটিতেছে— কাহারও কোন দ্বিধা নাই; সহজ স্বচ্ছন্দভাবে সকলেই আপন আপন কাজে চলিয়াছে; দেখাদেখি অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণীর পক্ষেও রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া অনায়াস-সাধ্য।

আশ্রমের কথা

এখন আশ্রমের কথা বলিব; পথের কথা অনেক বলিলাম; প্রসঙ্গক্রমে গুজরাতের সামাজিক জীবনেরও একটী চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছি। অনেকে হয়ত মনে করিবেন "ধান ভানিতে শিবের গান" গাওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিদেশী (বিশেষতঃ বাঙালী) যাঁহারা কয়েকদিন সত্যাগ্রহাশ্রমে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে এ প্রসঙ্গ অনাবশ্যক নহে। আশ্রমে স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে কাজ করিতেছে।—তাহারা একসঙ্গে বয়ন করিতেছে একসঙ্গে পড়িতেছে আবার একসঙ্গে প্রার্থনা করিতেছে। কোন প্রকার বিভেদ নাই, তাহা বলিতেছি না; কারণ তাহা অসম্ভব; যে বিভেদ স্বাভাবিক অর্থাৎ যাহা পরস্পরের স্বভাব বা স্বধর্ম্ম হইতে সহজে উৎপন্ন হয় তাহা এখানে পুরামাত্রায় আছে; তাই বলিয়া ঘোমটার কোন বাড়াবাড়ি দেখি না; অর্থাৎ সমাজ এমন কোন কৃত্রিম আবরণ

তাহাদের উপর ন্যস্ত করে নাই যাহাতে তাহাদের সহজ অঙ্গচালন বা সহজ কথোপকথনের স্বচ্ছন্দতা হানি হইতে পারে। বয়ন করিবার সময় বা পড়িবার সময় আবশ্যক হইলে এত সরল ও এত সহজভাবে তাহারা তাহাদের সহপাঠীদের সহিত কথোপকথন করিতে পারে যে অনভ্যস্ত বাঙালীর নিকট তাহা এক অদ্ভুত দৃশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমার এক বাঙালী বন্ধু পূর্ব্বে বোলপুরে ওকালতি করিতেন; এখন বয়ন শিখিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন, তিনি বলেন যে একই ক্লাসে মেয়েদের নিকট বসিয়া বয়ন শিখিতে প্রথম প্রথম তাহার অত্যন্ত দ্বিধা বোধ হইত; ক্লাসের মধ্যে তাদের পাশ দিয়া যাইতে ও তিনি অসুবিধা বোধ করিতেন; কিন্তু এখন আর তাঁহার কোন সঙ্কোচ নাই। তিনি বলেন যে ছাত্রীদের ব্যবহার এত সুন্দর যে অপরের কথা দূরে থাকুক, যাহারা স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী তাহারাও ইহার প্রশংসা না করিয়া পারে না; স্বাধীনতা আছে, অথচ সে স্বাধীনতা কত নম্র ও কত সংযত। অনেকে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী; কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার আদর্শ যে বিলাত হইতে আমদানি করিতে হইবে তাহা ভাবিতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়! গুজরাতে ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে যে স্বাধীনতা দেখিতেছি তাহা বিদেশ হইতে আনিয়া রোপন করা হয় নাই; ইহা এই দেশেরই মাটি হইতে উৎপন্ন; সেইজন্যই ইহা এত স্থায়ী, সতেজ ও স্বাভাবিক। বাংলায় একদিন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে ভগবানের নামে দেশের ও দশের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু বাংলায় যে স্বাধীনতা নূতন, গুজরাতে তাহা চিরপুরাতন; ব্রহ্মানন্দকে যাহা তৈয়ার করিতে হইতেছিল, মহাত্মা গান্ধি তাহা অনায়াসে পাইয়াছেন; ব্রহ্মানন্দের জন্মভূমিতে যাহা Problem, মহাত্মাজির জন্মভূমিতে তাহা Solution; গুজরাতের আকাশ বাতাস স্বাধীনতার সুগন্ধে ভরপুর! এইপ্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা আছে বলিয়াই স্ত্রী পুরুষ লইয়া একত্রে কাজ করিবার এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মহাত্মাজিকে বেশী ভাবিতে হয় নাই; মহাত্মাজির পক্ষে গুজরাতের ন্যায় প্রদেশে ইহা সফল করা অতি সহজ। সত্যাগ্রহাশ্রমের আদর্শ ও সাফল্য বুঝাইতে গেলে তথাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক আবহাওয়ার কিছু পরিচয় প্রদান করা দরকার; কারণ এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত প্রত্যেক কাজেরই এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাই এত কথা বলিতে হইল।

এখন আশ্রমের ভিতরের কথা বলি। আশ্রম দুইভাগে বিভক্ত; একটী সত্যাগ্রহীদের জন্য, দ্বিতীয়টী ছাত্রদের জন্য; একটীর নাম সত্যাগ্রহাশ্রম ও অপরটীর নাম সোমনাথ ছাত্রালয়। এই সত্যাগ্রহাশ্রমের জন্যই ক্ষুদ্র সাবরমতি গ্রাম আজ এত সুপ্রসিদ্ধ। প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি যে এই সাবরমতির এমন কোন ভৌগলিক বিশেষত্ব নাই যাহার জন্য ইহা ভারতবর্ষে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে; কিন্তু ইতিহাস ইহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। মহাত্মা গান্ধির কোন শত্রু আছে কি না জানি না; কারণ মডারেট্ এমন কি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানও বলেন যে মহাত্মাজির সহিত তাহাদের নাকি কোন শত্রুতা নাই; সত্য মিথ্যা জানি না; তবে ইহা ঠিক আজ শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকলেই এই সাবরমতির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আছে। ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে হয়ত এ আশ্রম একদিন ধূল্য

হইয়া পড়িয়া থাকিবে; ইহার জীবন্ত নির্দ্দেশ কিছুই তখন পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ভারতের ইতিহাস-পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে ইহার নাম খোদিত থাকিবে। ভারত-ইতিহাসের এক সঙ্কট সময়ে ইহার অভ্যুদয়; পরিণামে সফল হউক বা বিফল হউক ভারতবাসীর এক বিপদের সময় ইহা একটী সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং সেইমত প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছে। ইহাই সত্যাগ্রহাশ্রমকে চির-অমর করিয়া রাখিবে।

ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি বাংলো। ইহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সেই বাংলোতে মহাত্মাজি সপরিবারে বাস করেন। এই বাংলোটি মহাত্মাজি নিজে করেন এবং এইখানেই আশ্রমের প্রথম স্থাপনা হয়। প্রথমে এই একটীমাত্র বাংলো ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে ইহারই চারিদিকে অন্যান্য গৃহগুলি হইয়াছে। মধ্যে এক সুপ্রশস্ত বাগান, এখানে অনেকপ্রকার শাক সবজি হয়। বাগানের একদিকে বয়ন বিদ্যালয় ও অফিস, এবং অন্যদিকে আশ্রমের গোশালা। গোশালায় অনেকগুলি গরু আছে; এখান হইতেই আশ্রমে ও ছাত্রাবাসে দুধ সরবরাহ করা হয়; এ দুধ যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তাহা বলাই বাহুল্য। আশ্রমবাসীগণকে অত্যন্ত কঠোর জীবন যাপন করিতে হয়; মাছমাংস বা অন্য কোন-প্রকার উত্তেজক জিনিষ ভক্ষণ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিশুদ্ধ ঘি ও দুধ পায় বলিয়াই তাহারা যেন বাঁচিয়া আছে। এইজন্যই এই গোশালাটী আশ্রমে এত প্রয়োজনীয়।

প্রত্যেক আশ্রমবাসী ইচ্ছা করিলে সপরিবারে বাস করিতে পারেন; তাঁহাকে তদ্রূপ বাসা দেওয়া হয়; কিন্তু আশ্রমের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নিয়ম যে তাঁহাদিগকে সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে; ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। এই ব্রহ্মচর্য্যব্রতই আশ্রমের প্রধান ভিত্তি এবং মহাত্মা মোহনদাস করমচন্দ গান্ধি স্বয়ংই এই মহান আদর্শের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। সকল আশ্রমবাসী ও ছাত্রগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে "বাপুজি" বলিয়া সম্বোধন করে; "বাপুজি" মানে বাবা। শ্রীমতি গান্ধিও তাঁহাকে এইনামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আশ্রমের সকলেই শ্রীমতি গান্ধিকে "বা" (অর্থাৎ মা) বলিয়া ডাকে এবং মহাত্মাজিও তাঁহার কথা উল্লেখ করিতে হইলে "বা" বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকেন।

আশ্রমবাসীগণকে সকালে ৪টার সময় শয্যাত্যাগ করিতে হয়; আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ৪ টার সময় নদীতে স্নান করিতে হয়। শীত হউক, গ্রীষ্ম হউক ৪ টার সময় স্নান করিতেই হইবে, ইহার অন্যথা হইতে পারিবে না। সর্দ্দি, কাশী বা ব্রনকাইটিসের ভয় করিলে চলিবে না। আশ্রমের নিয়মাবলীতে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে যে আশ্রমে পীড়িত হওয়া পাপ; শুনিতে কঠিন বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় ভাবিয়া দেখিলে কথাটি অন্যায় বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতঃ যে সকল কারণে মানুষের রোগ হইয়া থাকে তাহার কিছুই এখানে নাই বলিলেও হয়। আমদাবাদ সহর আশ্রম হইতে অনেক দূরে, আশ্রমের নিকটেও কোন গ্রাম নাই, নদীর উপরেই বিজন মাঠে আশ্রম নিতান্ত একেলা। আশ্রমের ভিতরে বাহিরে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিদ্যমান তাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় পরিচ্ছন্নতার সহিত পবিত্রতার নিকট সম্বন্ধ আছে। বিশুদ্ধ বাতাস, বিশুদ্ধ পানীয় জল, তদুপরি সাত্ত্বিক আহার; ব্যায়াম

হইবার মত কারণ নাই। মাছ মাংস এখানে নিষিদ্ধ; লঙ্কা এলাইচ বা কোনপ্রকার গরম মশলা কেহ খাইতে পারিবে না। ইহা ব্যতীত আহারের যাহা যাহা প্রয়োজন—দুধ, ঘি, চাউল, ডাউল, ময়দা ও শাক সবজি সমস্তই বিনামূল্যে আশ্রম-ভাণ্ডার হইতে সরবরাহ করা হয়। যাহারা আশ্রমে থাকেন তাঁহারা কোন প্রকার মাহিনা পান না; কেবলমাত্র আহারীয় দ্রব্য তাহারা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন। কিন্তু মেস্ (mess) করিয়া একত্রে আহারাদি তাঁহারা করিতে পারিবেন না। যাঁহারা পরিবার লইয়া আছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁহারা একাকী আছেন তাঁহারা সকলেই স্বপাক আহার করিবেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে, তাহারা কিন্তু নিজহস্তে রাঁধিয়া খাইবেন। যিনি একাকী আছেন তাঁহাকে একজনের উপযোগী দ্রব্যাদি দেওয়া হয়, আর যাহারা পরিবার লইয়া আছেন তাঁহারা তদনুরূপ দ্রব্যাদি পাইয়া থাকেন। এই তাঁহাদের আহারের ব্যবস্থা, তাহার উপর নিয়মিত পরিশ্রম আছে, ইহা সত্ত্বেও যদি রোগ হয় তবে কি ইহাকে পাপ বলা যায় না?

তাঁহাদের পরিশ্রমের কথা বলিতেছি। স্নানের পর সকলে একত্রে প্রার্থনা করিয়া ব্যায়াম করিবেন। তাহার পর প্রত্যেকে নিজের নিজের ঘর পরিষ্কার করিয়া বয়ন-বিদ্যালয়ে যাইবেন; বয়নই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ; সকালে ও দুপুরে দৈনিক তাহারা ৮ ঘণ্টা বয়ন করিবেন। এই বয়ন বিদ্যালয়ে কোটের কাপড়, সার্টের কাপড়, ধুতি, সাড়ি, আসন, কম্বল ইত্যাদি সমস্তই তাঁহারা প্রস্তুত করেন। ইহার উপর, তাঁহাদের নিজেদের কাজ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা নিজহস্তে পাক করিবেন নিজের বাসন নিজে মাজিবেন, নিজের কাপড় নিজে ধুইবেন, নিজের ঘর নিজে পরিষ্কার করিবেন। চাকর নাই, ধোপাও নাই, সমস্ত কাজ নিজেকে করিতে হইবে; কোন প্রকার বিলাসিতা করিতে পারিবেন না। যখন যেখানে যাইবার আদেশ হইতেছে, সেখানে যাইতেছেন ও আদেশানুরূপ কাজ করিতেছেন; কোন প্রকার আপত্তি করিতে পারিবেন না। আমি যখন আশ্রমে যাই তখন মহাত্মা গান্ধির বিচার সবেমাত্র শেষ হইয়াছে; আশ্রমবাসীগণ আদিষ্ট হইয়া অনেকেই বরদৌলি গিয়াছেন; কেহ কেহ বা যাইতেছেন। সেখানে তাঁহারা বিপুল উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। হয়ত অনেক বিপদ আসিবে; কিন্তু ভবিষ্যতের সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট বাধা বিঘ্নের জন্য তাঁহারা সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত; ইহাই তাঁহাদের শিক্ষা ও ইহাই তাঁহাদের দীক্ষা। বরদৌলির এই কর্ম্মক্ষেত্রে আজ স্বয়ং শ্রীমতি কস্তুরীবাই গান্ধি তাঁহাদের নেত্রী।

সত্যাগ্রহাশ্রমের কথা অনেক বলিলাম, এখন ছাত্রাবাসের কথা কিছু বলিব। সত্যাগ্রহাশ্রমের নিকটেই "সোমনাথ ছাত্রালয়।" একটী বৃহৎ দোতালা বাড়ি, প্রায় দেড়শত ছাত্র থাকিতে পারে। স্কুলের জন্য কোন ভিন্ন বাড়ি নাই; এই ছাত্রাবাসের মধ্যেই তাহাদের স্কুল হইয়া থাকে। ইহা Residential স্কুল; আশ্রমের বাহির হইতে কোন ছাত্র পড়িতে আসে না, ছাত্রেরা এখানেই পড়ে এবং এখানেই থাকে; সমস্ত খরচ বাবদ প্রত্যেকের মাসে ১৫৲ দিতে হয়। সত্যাগ্রহাশ্রমে যাঁহারা পরিবার লইয়া আছেন তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য এই স্কুলটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। পাঁচ মাইলের মধ্যে আর দ্বিতীয় স্কুল নাই, আর থাকিলেও জাতীয় বিদ্যালয় ব্যতীত অপর কোন স্কুলে তাঁহারা ছেলেমেয়ে পাঠাইবেন

না। এই সকল বালক বালিকা এই স্কুলেই অধ্যয়ন করিয়া থাকে। স্কুলে যাঁহারা শিক্ষকতা করিতেছেন তাঁহারা থাকিবার জন্য ছোট ছোট বাড়ি পাইয়াছেন—সামান্য বেতন ও পান; একাকীও আছেন আবার অনেকে পরিবার লইয়া আছেন। "সোমনাথ মন্দিরে" ছাত্রী থাকিবার কোন বন্দোবস্ত নাই; কেবলমাত্র ছাত্র থাকিবে; কিন্তু স্কুলে ছেলে ও মেয়ে সকলেই পড়ে।

সত্যাগ্রহাশ্রমের সাধারণ নিয়মগুলির সহিত ছাত্রাবাসের নিয়মের কোন পার্থক্য নাই। ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই প্রাতে ৪টার সময় উঠিবে; ছাত্রগণ পালাক্রমে রোজ ছাত্রাবাস ঝাড়ু দিবে; রান্নাঘর ধুইবে, ইন্দারা হইতে জল আনিয়া সমস্ত জলাধারগুলি পূর্ণ করিবে। সেই জলে পাক হইবে, সেইজলে তাহারা থালা বাসন ধুইবে এবং সেই জলই তাহারা পান করিবে। পাক করিবার জন্য দুইজনমাত্র পাচক ব্রাহ্মণ আছে; কিন্তু চাকর একটীও নাই ভৃত্যের করণীয় সমস্ত কার্য্যই ছাত্রদিগকে করিতে হইবে। সত্যাগ্রাহীদিগের ন্যায় তাহাদিগকেও প্রাতে স্নান করিতে হইবে; প্রার্থনা ও ব্যায়াম শেষ করিয়া তাহারা ৬টার সময় রান্নাঘরে আসে; প্রত্যেক ছাত্রকে দুই একখানি রুটি ও আধসের দুধ দেওয়া হয়; এই দুধ বিশুদ্ধ, কারণ ইহা আশ্রম-গোশালা হইতে ছাত্রাবাসের জন্য খরিদ করা হয়। প্রাতরাশের পর সকলে আপন আপন ক্লাসে চলিয়া যায়; কেহ যায় চরকায় সুতা কাটিতে, কেহ যায় পিঁজিতে, আর কেহ বা যায় বয়ন শিখিতে। উত্তমরূপে সুতা কাটা শিখিলে তাহাকে পেঁজার কাজে (Carding class) পাঠান হয়; পেঁজা শেখা শেষ হইলে তবে বয়ন শিখিতে যাইবে।

বেলা দশটার সময়ে সকলে আহার করিতে আসিলে, প্রত্যেকেই নিজের আসন নিজে করিয়া লইবে; আহারের পর নিজের থালা বাটি ও গ্লাস নিজে মাজিবে। আহারের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আবার তাহারা আপন আপন ক্ল্যাসে চলিয়া যায়। দুপুরে নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে কিছু সময়ের জন্য অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়; বয়স্ক সকলেই ৪।।০ টা পর্য্যন্ত সুতা কাটিবে, পিঁজিবে ও বয়ন শিখিবে। কারণ মহাত্মাজি বলেন "ভারতে এখন শান্তি নাই; আমাদের যুদ্ধ চলিতেছে; তাই তদনুরূপ ব্যবস্থা দরকার"।

তিনি বলেন "আমি নিজে তাঁতী ও চাষী, আমার ছাত্রদিগকে ও আমি তাঁত ও চাষ শিখাইতে চাই। কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রমে তাহারা যেন বিমুখ বা ক্ষুণ্ণ না হয়; honest profession যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, তাহাকে তাহারা যেন নিন্দনীয় বলিয়া মনে না করে।"

বেলা ৫টার সময় আবার আহারের ঘণ্টা পড়ে, ইহা জলখাবারের ঘণ্টা নহে; ইহাই দিনের শেষ আহারের আহ্বান। ইহার পর রাত্রে আর কোনপ্রকার আহার হইবে না। মহাত্মাজীর মতানুসারে রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে ভোজন করা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ভোজন শেষ করা উচিত। এই সন্ধ্যাকালীন আহারের পর এক ঘণ্টা ছুটি থাকে; তারপরে আবার সমবেত প্রার্থনা। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই দিনের কাজ শেষ হইয়া আসে; তখন সন্ধ্যায় নদীর ধারে কেহ বা গান করে, কেহ বা খেলা করে—বাগানে কেহ বা গল্প

করে কেহ বা ভ্রমণ করে। কিন্তু ৮॥ টার পরে আর আলো জ্বলিবে না; সব অন্ধকার; সকলেই আপন আপন ঘরে গিয়া ঘুমাইয়াছে।

সপ্তাহে একদিন মাত্র তাহাদের ছুটী থাকে; সেদিন শুক্রবার। কোন কোন ছুটীর দিন শিক্ষকের সহিত তাহারা নিকটস্থ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ দেখিতে যায়। এই দিনটী শিক্ষক ও ছাত্র সমভাবেই উপভোগ করে। আমিও একদিন তাহাদের সহিত গিয়াছিলাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির সে কি ছুটাছুটি। অনেক ঘুরিয়া আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলাম। তখন বেলা প্রায় ৩টা; অত্যন্ত রৌদ্র ও অত্যন্ত গরম। আমার অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল। আমি আমার বন্ধুর নিকট প্রস্তাব করিলাম যে তাহার যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে বরফ ও লিমনেড আনিয়া সকলকে দিই। তিনি শুনিবামাত্রই বলিয়া উঠিলেন 'কি? লিমনেড বরফ? ভারতের কয়জন লোক তাহা খায়? প্রচুর জল আছে; ছেলেরা পেটভরিয়া জল খাক্।" কথাটি খাঁটি সত্য। এখন সোডা লিমনেড দেখিলেই আমার এইদিনকার কথা মনে পড়ে ও নিজের নিকটেই নিজে লজ্জিত হইয়া পড়ি।

তবে, মোটের উপর ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে স্কুলের শাসনে কোমলতা অপেক্ষা কঠোরতার ভাগই যেন কিছু বেশী। শাসন করিতে হইলে যেমন নরম হইতে হইবে, দরকার পড়িলে আবার তেমন কঠোরও হইতে হইবে। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল স্নেহ ভালবাসা, আদর ও কোমলতা স্কুলে যেন তত নাই। তাহাদের ছাত্র-হৃদয় সময় সময় যাহা চায় তাহা প্রায়ই পায় না; ক্ষুধিত হৃদয় ক্ষুধিতই থাকিয়া যায়। হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তি সমূহের তেমন যেন পরিস্ফুরণ দেখি না। অবশ্যই এই অভাবের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কোন শিক্ষক দায়ী নহেন; আমার বোধ হয় আশ্রমের আবহাওয়াই ইহার জন্য বিশেষ দায়ী। আশ্রমের সর্ব্বত্রই যে কঠোরতা ও সংযমের শাসন বিদ্যমান তাহার প্রভাব হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা অসম্ভব। শিক্ষকের অজ্ঞাতসারেই ইহার প্রভাব তাঁহার হৃদয়ের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। কি এক কঠোর রুদ্র ভাব সমস্ত আশ্রমকে যেন চাপিয়া ধরিয়া আছে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধি যখন স্বয়ং আশ্রমে উপস্থিত থাকেন তখন আশ্রমের দেখি আর এক রূপ—এই রূপই অপরূপ; ইহাই সত্যাগ্রহাশ্রমের মাধুর্য্য। সংযম আছে কিন্তু কঠোরতা নাই, শাসন আছে কিন্তু চাপাচাপি নাই। মহাত্মা গান্ধির কোন্ যাদুমন্ত্রে রুদ্র তাহার রুদ্র মূর্ত্তি পরিহার করিয়া সহজ সরল ভাবে আনন্দে মাতিয়া উঠে।

আশ্রমের কথা বলিয়াছি, ছাত্রাবাসের কথাও বলিলাম। এখন এখানকার প্রার্থনার কথা কিছু বলিয়াই আজ এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রার্থনা দুইবার হয়, প্রত্যুষে একবার আর সন্ধ্যা ৭ টায় আর এক বার। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শিক্ষকগণ ও আশ্রমবাসী সত্যাগ্রহীগণ সকলেই এই সময়ে একত্র হন; মোট কথা আশ্রমে স্ত্রী পুরুষ যাঁহারা থাকেন সকলেই এই সময় একই স্থানে সমবেত হন। নদীর ঠিক উপরেই মহাত্মাজীর বাংলোর পাশে বাগানের মধ্যে প্রার্থনা হয়। আচার্য্য বলিয়া তেমন কিছুই নাই; আশ্রমের যিনি সঙ্গীতাধ্যাপক তিনি একটি গান করিয়া প্রার্থনা সুরু করেন। নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ভুলিয়া

নিজের নাম করিবার জন্য এ গান গাওয়া হয় না। এই গানের একটী উদ্দেশ্য ছাত্রদিগকে ও সমবেত ব্যক্তিগণকে কিছু সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া; সেইজন্য অধ্যাপকের সহিত সকলেই সমস্বরে গান করিতে থাকে। গানটী সকলেরই মুখস্থ হইয়া যায়। ক্রমাগত ৭।৮ দিন রোজ একই গান অভ্যাস করিয়া আয়ত্ব করা হইলে দ্বিতীয় একটী গান তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; এই প্রকারে ধীরে ধীরে তাহাদিগকে সঙ্গীতের দিকে আকৃষ্ট করা হইতেছে। স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা সকলেই হাত তালি দিয়া যখন সমস্বরে গানটী গাইতে থাকে, তখন ইহাকে একটী গানের ক্ল্যাস বলিয়া মনে হয়—প্রার্থনা বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা মনে করি (ভয় করি ?) ঠিক তাহা নহে; অথচ গানটী প্রার্থনা বিষয়ক। শিক্ষকের সহিত সকলে একত্রে সমস্বরে গান করিতে, সহজে গানের যে তালমান থাকে, তাহাই যেন যথেষ্ট; নতুবা তালমানের দিকে ছাত্রদের কোন বিশেষ লক্ষ্য নাই। এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে গেলে প্রার্থনায় হানি হইতে পারে। অনেক মন্দিরে দেখিয়াছি গান হইতেছে যেন গানের জন্য, প্রার্থনার জন্য নহে; গায়কের বিশেষ দৃষ্টি তালমান ও নিজের খ্যাতির দিকে, প্রার্থনার দিকে নহে। গানটী ঠিক গাওয়া হইতেছে কি না তাহাই তাহার ভাবনা, কিন্তু প্রাণের ঝঙ্কার তাহার মধ্যে কতখানি তাহার কিছুই ঠিক নাই। গান তখন হইয়া পড়ে বাহিরের জিনিষ। এই প্রকারে সঙ্গীত ও প্রার্থনা ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়ে, তাহাদের সমন্বয় থাকে না। এই দুইটী জিনিষের সুমধুর সমন্বয় দেখিয়াছি কৃষকদিগের কর্ম্ম-শেষে সন্ধ্যা-সঙ্গীতে আর দেখিলাম আশ্রমের প্রার্থনায়। সহজ সরল ভাবে সকলে গান করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে কানের ভিতর দিয়া মরমেও কিছু প্রবেশ করিতেছে; গান কেবল গান নহে, প্রার্থনা দিয়া ভরা গান; আবার প্রার্থনাও সেই জন্য নীরব নীরস নহে। এমন মধুর সরস সতেজ প্রার্থনা আমি অল্পই শুনিয়াছি। আমি ছাত্রদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি তাই বেশ ভাল করিয়া জানি যে তাহারা এই প্রার্থনা সময়ের জন্য সত্য সত্যই উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এই সময়টী তাহাদের নিকট সত্যই অত্যন্ত আনন্দজনক। অধ্যাপক আরম্ভ করিলেন :—

"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং॥" ২য় অধ্যায় ৫৪

সকলে সমস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত স্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭

* * * *

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি ॥ ৭২

(৫৪ হইতে ৭২ পর্য্যন্ত)

কি পরিস্কার তাহাদের উচ্চারণ! বাঙালী ছাত্রদের সংস্কৃত উচ্চারণ একটু অদ্ভুতরকমের। তাহাদের নিকট দুইটী "ব" এর উচ্চারণের যেমন বিভিন্নতা নাই, "শ"ষ" ও "স" এই তিনটী অক্ষরের উচ্চারণে ও তেমন কোন বিভিন্নতা নাই; সব সমান। "ন' ও "ণ"—ইহাদেরও সেই অবস্থা। কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া ও সুর করিয়া পড়িতে পারিলে প্রত্যেক সংস্কৃত শ্লোকই যেন এক একটী গান।

কত যুগ অতীত হইল কে কোথায় এই গীতার শ্লোকগুলি প্রথম গাহিয়াছিল—কেহই জানে না। কিন্তু আজ সাবরমতিতীরে আশ্রমবালকগণের এই মধুর আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছে যেন চক্ষের সামনে উদ্ভাসিত হইতে দেখিতেছি দুইটী অপূর্ব্ব সারথি-মূর্ত্তি।

আমদাবাদ শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার।

চীনে কথা

কলিকাতা হইতে দক্ষিণ চীনের কাণ্টন মহানগর দেখিতে রওনা হইয়া জাহাজে বসিয়া একটী চীনে গল্পের বই পড়িতেছিলাম। আমি চীনে ভাষা জানিনা, ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াই আমাকে সন্তুষ্ট হইতে হইল। গল্পটী কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত। চীন সম্রাজ্ঞী উ সিংহাসনারোহণ করিবার পরে মহিলাগণ পরীক্ষা দিবার অনুমতি পান ও পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখাইয়া উপাধি লাভ করিতে লাগিলেন। সে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কথা। তাং নামক এক উপাধিধারী চীনে যুবক পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা ও উপাধির উপর তিতিবিরক্ত হইয়া চীনের বাহিরে মানব সভ্যতার বিকাশ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। সঙ্গে তাঁহার জন কয়েক বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা অনেক অদ্ভুত দেশ ও অদ্ভুত সমাজ দেখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটীর নাম ছিল "ভদ্রলোকের দেশ।" জাহাজ হইতে নামিয়া তাঁহারা ভদ্রলোকের দেশের প্রধান নগর দেখিতে গেলেন। নগরে প্রবেশ করিবার সময় দেখিলেন নগরদ্বারে চীনে ভাষায় লেখা আছে "সদ্গুণই মানবের একমাত্র রত্নাভরণ।" নগরটী দেখিয়া মনে হইল সমৃদ্ধিশালী। সেখানকার লোকেরা সকলেই চীনে ভাষায় কথা বলে। তাং পথের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,'তোমাদের দেশ সৌজন্যের জন্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে কিরূপে। সে লোকটী তাং এর প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারিল না। তাং এবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের দেশ "ভদ্রলোকের দেশ" নামে পরিচিত কেন? সে উত্তর করিল, "তা'তো জানি না।" তাং ও তাঁহার বন্ধুগণ অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও পথে আরও কয়েক জনকে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে সে দেশের লোকেরা জানেই না যে তাহারা সৌজন্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছে বা তাহাদের দেশ

"ভদ্রলোকের দেশ" নামে পরিচিত। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে নিকটের অপর দেশের লোকেরা ইহাদের সৌজন্য দেখিয়া এদেশের নাম দিয়াছে "ভদ্রলোকের দেশ।" কিছুকাল সেদেশে থাকিয়া তাং ও তাঁহার বন্ধুগণ দেখিতে পাইলেন যে সেদেশে ধনী দরিদ্র, মানী অমানী, বড় ছোট সকলেই একে অন্যকে সম্মান করে। ধন, পদমর্য্যাদা কি বংশগৌরব থাকুক বা নাই থাকুক, কেহ অপর কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত নহে। একদিন তাং ও তাঁহার বন্ধুগণ বাজারে গেলেন। দেখিলেন এক দোকানে একটী সরকারী পেয়াদা কি জিনিষ কিনিতেছে। পেয়াদা জিনিষটী হাতে করিয়া দোকানদারকে বলিতেছে, 'মশ'য় এই উৎকৃষ্ট জিনিষের জন্য আপনি অসম্ভব কম দাম চাহিতেছেন। আপনিই বিচার করিয়া বলুন, অত কম দামে এমন উৎকৃষ্ট জিনিষ আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভবপর কি না। আপনি যদি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক দ্বিগুণ মূল্য নিতে রাজি হন, তবেই আমি জিনিষটা নিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারি। আর তাহাতে আপনি রাজি না হইলে আমি বুঝিব যে আজ আমার সহিত কারবার করিবার আপনার ইচ্ছা নাই।" দোকানদার উত্তরে বলিল, "পেয়াদা ম'শয়, আমি জানি আপনার কথা শিরোধার্য্য করাই আমার পক্ষে বিধেয়। কিন্তু যে দাম আমি চাহিয়াছি তাহা এতবেশী যে তাহা চাহিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত। জিনিষের গায়ে দাম লিখিয়া রাখা, ওটা ত ব্যবসায়ের দস্তুর। দাম লেখা আছে বলিয়াই যে তার কমে জিনিষ বিক্রয় করিবনা, এমন বাঁধ বাঁধি নিয়ম তো আমার নাই। খরিদ্দারের উচিত, দাম কমাইয়া নিয়া ন্যায্য দামে জিনিষ কেনা। ম'শয় কি না চেষ্টা করিতেছেন অসম্ভব বেশী দাম দিতে। আপনার সৌজন্যে আমি প্রীত হইলাম বটে, কিন্তু যে জিনিষ আপনি কিনিতে চাহিতেছেন তাহার জন্য অপর দোকানে সন্ধান করিতে হইবে। আপনার আদেশ পালন করা আমার পক্ষে অসাধ্য।" পেয়াদা বলিল, "এই উৎকৃষ্ট জিনিষের দাম যা' ধরিয়াছেন, সে অতি কম। তার পরে আবার উল্টো চাপ দিতেছেন যে আমি দাম কমাইয়া নিয়া কিনিবার চেষ্টা করিতেছি না। এটা ত সৌজন্য হবে না। সুবিধা যা কিছু তা যদি খরিদ্দারের ভাগে পড়ে আর অসুবিধা সব যদি দোকান-দারের ভাগে পড়ে ত হলে কারবার চলে কি?" এইরকম কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাং এর মনে হইল যেন পেয়াদা দোকানদারের কথায় রাজি হইয়াছে। দোকানদার যে দাম চাহিয়াছিল, পেয়াদা তাহাই দিল, কিন্তু জিনিষ নিবার সময় অৰ্দ্ধেক। দোকানদার ত কিছুতেই রাজি হইল না। অবশেষে পথ হইতে দুটী বৃদ্ধ আসিয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন যে পেয়াদা যা দাম দিয়াছে তাই ঠিক। কিন্তু জিনিষের অৰ্দ্ধেক না নিয়া তাহাকে বার আনা অংশ নিতে হইবে। তাং ও তাঁহার বন্ধুরা বাজারে ঘুরিয়া দেখিলেন যে সব দোকানদারই ঐ রকমের। আর খরিদ্দারের মধ্যে শুধু যে পেয়াদাই বিক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণে মনোযোগী, তা নয়। সেদেশেই সৈন্যেরা পর্য্যন্ত ঐরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করে। আর একদিন তাং দেখিলেন এক দোকানে পাড়াগেঁয়ে খরিদ্দার দরদস্তুর করিয়া কতকগুলি জিনিষ কিনিয়া দাম দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। দোকানদার পিছু ডাকিতেছে "ম'শয়, ম'শয় দাম দিয়াছেন যে রূপোর টাকায়, এত ভাল রূপো আমাদের এখানে সচরাচর পাওয়া যায় না। ম'শয়ের ভুল হয়েছে, নিশ্চিত। ভাল রূপোর বাবদ আপনি অনেক বাট্টা পাবেন। অবশ্য আপনার

ন্যায় মানী পদস্থ লোকের কাছে ওটা হিসাবের বিষয়ই নয়। কিন্তু আমার উপর কৃপাদৃষ্টি করুন।" সেই পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোকটী উত্তরে বলিলেন, "এও কি একটা কথা! কতই বা বাট্টা হবে? তা যাই হোক্, অনুগ্রহ করে হিসাবে আমার নামে জমা করে রেখে দিন্। আপনার দোকানের জিনিষ সব অতি উৎকৃষ্ট। আবার তো কিনতে আস্‌বো। তখন কাটান্ দেবেন।" দোকানদার বলিল, "মাফ্ করিবেন, তা সুবিধা হবে না। গতবৎসর এক ভদ্রলোক ঐ রকম বলে গিয়েছেন, আজ পর্য্যন্ত আমি তাঁর সন্ধান পাচ্ছিনা। চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ইহজন্মে যে আবার দেখা হবে, তার সম্ভাবনা নাই। পরজন্মে আমি ঘোড়া হব, না গাধা হব, তা জানি না। তখন যদি আমার পাওনাদারের খুঁজে বেড়াতে হয়, তা হলে তখন আর আমার পরিশ্রমের শেষ হবেনা। না, তার আর দরকার নাই। এখনই হিসাব চুকিয়ে দেওয়া ভাল।" কিছুকাল এইরূপ কথোপকথনের পর সেই পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোকটী সামান্য কিছু বাট্টা নিতে রাজি হইলেন ও সামান্য টাকা বাট্টা নিয়ে তাঁর জিনিষ নিয়া চলিয়া গেলেন। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যেতে লাগিল, ততক্ষণ দোকানদার বলিতে লাগিল যে সে অপকৃষ্ট জিনিষ অত্যধিক মূল্যে ঐ ভদ্রলোকের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। ঘোর কলি উপস্থিত। এযুগে সততা পুণ্য অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই সময় সেখান দিয়া একটী ভিক্ষুক যাইতেছিল। দোকানদার হিসাব করিয়া যে টাকাটা তাহার পাওনা নয়, অথচ বাধ্য হইয়া তাহাকে নিতে হইয়াছে, সেই টাকাটা ঐ ভিক্ষুককে দিয়া কিছুটা নিশ্চিন্ত হইল ও বলিতে লাগিল "কে জানে, পূর্ব্বজন্মে হয়ত এই ভিক্ষুক অপরের নিকট বেশী টাকা আদায় করিয়াছিল, তাই বুঝিবা এজন্মে ইহার এই দুর্দ্দশা।" ডাং তাঁহার বন্ধুদিগকে বলিলেন, "এরা ভদ্রলোক বটে।"

আমার জাহাজে কয়েকটী দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, চীনে পুরুষ ও মহিলা, ও দুইশতাধিক তৃতীয় শ্রেণীর চীনে যাত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এই শ্রেণীর ভদ্রলোক যে কেহ ছিলেন না এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর য়ুরোপায় যাত্রীদের মধ্যে যে এ ধরণের ভদ্রলোক কেহ ছিলেন না তাহা ধ্রুব নিশ্চিত। চীনে যাত্রীরা কেহ বা পেনাং হইতে কেহবা সিঙ্গাপুর হইতে দেশে ফিরিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ভাড়া না দিয়া দেশে ফিরিবার মতলব করিয়াছিল। জাহাজের কর্ম্মচারী যখন সকলের টিকিট দেখিতে সুরু করিল তখন সে চীনে এক বাক্সের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। বাক্স দড়ি দিয়া বাঁধা। নিশ্বাস প্রশ্বাসের বাতাসের জন্য সামান্য একটু যায়গা খোলা ছিল। জাহাজের ডাক্তার আমাকে বলিলেন যে চীনে যাত্রীদের মধ্যে এই রকম বাক্সে পোরা মানুষ প্রতি যাত্রায়ই দুই তিনটী তাঁহারা পাইয়া থাকেন। এ যাত্রায় বরং কম, মোটে একজন। বাক্স-অবতার হইয়া জাহাজের কপিকলে ঝুলিয়া বিদেশীভূতের (Foreign Devil) লৌহ-কাষ্ঠময় অনিত্য দেশে অবতীর্ণ হওয়া ও পরে তথা হইতে পুনরায় বাক্স অবতার হইয়া লোহার ক্রেনে (Crane) চড়িয়া শূন্যে দোদুল্যমান হইবার ইচ্ছা ও অবশেষে শাশ্বত দিব্য রাষ্ট্রের অধিবাসীরূপে বিচরণ করিবার ইচ্ছা মর্ত্ত্যজনোচিত সততার পরিচায়ক না হউক, দিব্যলোকোচিত সহিষ্ণুতাও কৌতুকপ্রীতির পরিচায়ক বটে। মনে পড়ে বহুপূর্ব্বে আমার পিসিমার নিকট গল্প শুনিয়াছিলাম। একবার তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়া দেশে যাইবেন। সঙ্গে কে যাইবে?

পিসে মহাশয়ের এক মাতুল বলিলেন, "আমার সঙ্গে ওরা যাইবে। ব্যস্ত হইবার কিছু নাই।" পিসিমা ত মামাশ্বশুরের আশ্বাস পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে রওনা হইলেন। মামাশ্বশুর ছিলেন সে যুগের গুণী বৈদ্য ভদ্রলোক। জাহাজ যখন নারায়ণগঞ্জে আসিয়াছে, তখন পিসিমার অভিভাবক আর মাথা তুলিতে পারেন না। মাত্রা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। অগত্যা পিসিমা জিনিষপত্র জাহাজ হইতে নামাইবার জন্য নিজেই মুটের যোগাড় করিলেন। দুইটী মুটে বেশী লাগিল। তাহাদের স্কন্ধে মামাশ্বশুরকে চাপাইয়া, ছেলেমেয়েদের ও জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়া পিসিমা জাহাজ হইতে নামিলেন। দিনকয়েক পরে পিসেমহাশয়কে তাঁহার কর্ম্মস্থানে তাঁহার এক বন্ধু গিয়া সংবাদ দিলেন, "আপনার বাড়ীর সকলে নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন। তবে নারায়ণগঞ্জে দেখিলাম আপনার মাতুল বাক্স অবতার হইয়া মুটের স্কন্ধে আরূঢ়।" পেনাং ও সিঙ্গাপুরের চীনে যাত্রীরাও পুনঃ পুনঃ বাক্স অবতার রূপে আবির্ভূত হন। সেটা নিশ্চয়ই বাংলার তান্ত্রিক সাধনা নহে। আমার মতে, বিদেশীভূত পরিকীর্ত্তিত সাগরকণাসিক্ত লবণাক্ত ওজোন্ (Ozone) তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা কমলাকান্তের বড়বাজারের পাকা খরিদ্দার ও "সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্য জীবন" মনে করেন বলিয়া এরূপ করিয়া থাকেন। আগ্রা-নিবাসী শাংহাই-প্রবাসী এক হিন্দুস্থানীর সহিত পরিচয় হইল; তিনি শাংহাই বন্দরে চীনে পাহারাওয়ালার সর্দ্দারের কাজ করেন। তিনি বলেন যে কয়েক বৎসর ধরিয়া চীনেরা "all steal men" বা সব তস্কর হইয়া উঠিয়াছে। আমার এ কথাটা মনে লাগিল না বরং বিশ্বাস করা যায় যে কং ফুচের শিষ্য ও বৌদ্ধ সাধকগণ বাক্সের ভিতরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শান্ত সমাধিস্থ হইয়া দিব্যভূমি স্বদেশে বিনাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করা যায় কি না তাহার সাধনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ ঘোর কলি। বিদেশী ভূতের উৎপাতে সাধনায় প্রায়ই বিঘ্ন ঘটে।

কলিকাতায় আমরা চীনেদের মুচি ও ছুতোর মিস্ত্রী বলিয়াই জানি। পেনাং ও সিঙ্গাপুরে দেখিলাম সর্ব্বঘটে চীনে। মনে হইল যেন ইংরাজের অধীনে চীনের উপনিবেশ। মুটে মজুর, ফেরিওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, দোকানদার, বণিক, কেরাণী, মেছুনী, চিকিৎসক, সরাইয়ের মালিক, মোটরগাড়ীর মালিক, অট্টালিকার মালিক—সব চীনে। জন কয়েক ইংরাজ উপর হইতে কর্ত্তৃত্ব করে। দেশের কাজ চালায় চীনেরা। ভারতবাসী দোকানদার ও বণিক কিছু আছে। ভারতবাসীদের মধ্যে পাঞ্জাবী, সিন্ধুদেশীয়, ও দক্ষিণভারতের লোকই বেশী। মহারাষ্ট্রীয় বা বাঙ্গালী কেহ নাই বলিলেও চলে। পেনাং বন্দরে একজন বাঙ্গালীর সহিত কথা বলিলাম। কলিকাতার বাঙ্গালী ভদ্রলোক; কোঁচান ধুতি পরিয়া, ছড়ি হাতে তিনি আমাদের জাহাজে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকশত মেষ ও ছাগ কলিকাতা হইতে আমাদের জাহাজে পেনাং আসিল। ঐ বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী ঐ কারবার করেন। আর এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সপরিবারে শ্রীরামপুর হইতে কর্ম্মস্থান সিঙ্গাপুরে আমাদের জাহাজে আসিলেন। তিনি পূর্ত্তবিভাগে চাকরী করেন। ইহা ছাড়া পেনাং ও সিঙ্গাপুরে যত ভারতবাসী দেখিলাম তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী খুঁজিয়া পাইলাম না। তামিলভাষী কারবারী ভারতবাসী অনেক

পাইলাম। আর দেখিলাম রেশম, মণিরত্ন ও আজগুবি শিল্পসামগ্রীর (Curios) কারবার করে সিন্ধুদেশের লোকেরা। তাহাদের কাহারও কাহারও সহিত আলাপ হইল। সিন্ধু-দেশের লোকেরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই কারবার করে। দার্জিলিং ও কলিকাতায় যেমন ইহাদের কারবার তেমনই সিঙ্গাপুর, হংকং, শাংহাই, মানিলা, বোর্ণিও, জাভা, জাপান, আমেরিকা, এমন কি অষ্ট্রেলিয়াতেও ইহাদের কারবার। কিন্তু মলয় উপদ্বীপের আদিম অধিবাসী বা ভারতবাসী মলয়দেশে অর্থোপার্জ্জক নহে। সে দেশের প্রকৃত অর্থোপার্জ্জক চীনে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশই হউক বা শীতপ্রধান দেশই হউক, চীনে সর্ব্বত্র ঘরবাড়ী করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে থাকিতেছেও অকাতরে পরিশ্রম করিতেছে। উপনিবেশস্থাপনে ওস্তাদ্ চীনে ইংরাজ উপনিবেশ শাসন করিতে পারে। চীনে উপনিবেশে অর্থোপার্জ্জন করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইংরাজ কায়িকশ্রমে কাতর, সেখানে সে পরকে খাটাইয়া কাজ চালায়। চীনে শীতগ্রীষ্মে সমান শ্রমশীল। সে নিজে খাটিতে পারে। সাহেবেরা বলে গরম দেশে নিগ্রো কায়িকশ্রমে পটু। চীনে কায়িকশ্রমে নিগ্রোকেও পরাস্ত করে। সিঙ্গাপুর, হংকং, শাংহাই বন্দরে ঘুরিয়া দেখিয়াছি। সেখানে যাই, বাঁখ কাঁধে, জোড়া জোড়া চীনে মজুর অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্ত মধুর অনুনাসিক ধ্বনি। তখন মনে পড়িল ষ্টুটগার্ট নগরে মধ্য-এশিয়া-পরিব্রাজক ভূগোলবিৎ এক জার্ম্মান পণ্ডিত আমাকে বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর সকল শ্রমশীল জাতির মধ্যে প্রথম স্থান চীনেদের। ইংরাজ ও জার্ম্মান শীতপ্রধান দেশে খাটিতে পারে। চীনে সেখানে তাহাদের সমকক্ষ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খাটিতে চীনের সমকক্ষ কেহ নাই। এ জাতি যদি আফিং ছাড়িতে পারে ও সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যোগের (organisation) মূলমন্ত্রটুকু একবার আয়ত্ত করিতে পারে, তবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা চীনেদের জন্য।"

নানা কারণে জাপানী য়ুরোপীয় জাতির অপ্রিয়। জাপানী য়ুরোপীয় জাতির সমকক্ষ বলিয়া দাবী করিতেছে। য়ুরোপীয়ের মন্ত্রণা সভায় এশিয়াবাসী জাপানী কেন আসিয়া বসিয়াছে বলিয়া রুশিয়া অভিযোগ করিয়াছিল। জাপানী তাহার জল-স্থল-শূন্য-বিহারী সৈন্যের দিকে তাকাইয়া উত্তর দিল, "তুমি পছন্দ কর আর নাই কর, আমি আসিয়াছি। এ সভা ছাড়িয়া যাইবার আমার একটুও ইচ্ছা নাই।" জাপানীর প্রতি ঈর্ষ্যা য়ুরোপীয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বিদেশে জাপানী অসৎ এটা যে শুধু ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত নিন্দা, তাও নয়। জাপানীকে গালি দিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মার্কিনের লোকেরা বলিয়া থাকে, সততা চীনেদের প্রকৃতিগত। অথচ মার্কিন পরিব্রাজকগণ হংকং বা শাংহাইয়ে আসিলে তথাকার রৌপ্য মুদ্রা না নিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রচারিত কাগজের নোংরা নোট নিতে চাহেন। খারাপ-রূপা দিয়া এমন সুকৌশলে চীনেরা খাঁটি ডলারের নকল করিয়াছে যে নূতন লোক সহজে তাহা নকল বলিয়া ধরিতে পারিবে না। এত বুদ্ধি খাটাইয়া এত পরিশ্রম করিয়া এত কম লাভ করিতে চীনে রাজী হয় কেন? ইহাত প্রকৃতিগত সততার পরিচয় নয়। আমার মনে হয়, সততা, সত্যকথন, সকল জাতিরই প্রকৃতিগত। যাহার ঘোর মিথ্যাবাদী বলিয়া দুর্নাম, সেও দিনে শতকরা ৯৯টী সত্যকথা বলে। শতকরা

১টা যে মিথ্যা বলে তাহার একটা কারণ থাকে। সকলে এক কারণে মিথ্যা বলে না। মিথ্যা বলিবার কারণ চীনের এক জাপানীর আর এক, ইংরাজের তৃতীয় প্রকার। কারণ উপস্থিত থাকিলে চীনে কি ইংরাজ কেহই তাঁহার বর্ণিত ভদ্রলোক নয়। এই হইল মোটামুটি নিয়ম, ইহার অন্যথাও কচিৎ হয়।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

সমসাময়িক কথা

(৭)

দুর্গোৎসবের স্মৃতি

(১)

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাংলার সম্পন্ন হিন্দুগৃহস্থের বাড়ীতে যেভাবে দুর্গাপূজা হইত তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত বড় বড় সহরে ত কথাই নাই, সুদূর পল্লীগ্রামেও বোধ হয় আজ একেবারে লোপ পাইয়াছে। সেকালের দুর্গোৎসবের মধ্যে একটা সাত্বিকভাব দেখা যাইত। পূজার তিন দিন গৃহস্থের বাড়ীতে একটা উচ্ছ্বসিত ভক্তির স্রোত বহিয়া যাইত। সেই স্রোতে আবালবৃদ্ধবনিতা, পণ্ডিত ও অপণ্ডিত সকলেই নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী ভাসিয়া যাইত। বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা লোপ পায় নাই। যাঁরা নিষ্ঠাবান বা আচারবান হিন্দু নহেন, ঠাকুর-দেবতায় যাঁহাদের শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাও দু'পয়সা হইলেই নিজেদের ঐশ্বর্য্য-বিস্তারের জন্য মহা সমারোহে দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন। বছর বছর বাংলা দেশে কত দুর্গা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার একটা "সেন্সাস্" (census) লইলে বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা এখন বেশীসংখ্যক প্রতিমারই পূজা হইয়া থাকে, ইহা প্রমাণ হইবে। কিন্তু এ সত্বেও আগেকার মতন দুর্গাপূজা বাংলা দেশ হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে, চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া এইরূপই মনে হয়। আমাদের প্রাচীনেরা দেবীকে যে চক্ষে দেখিতেন, আধুনিকেরা সে চক্ষে দেখেন না, দেখিতে পারেন না। তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন কি না, এ প্রশ্নটা তোলাই বেয়াদবী বলিয়া মনে হয়। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়" পড়িয়া ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ, পুত্তলিকার প্রাণ নাই, এই জ্ঞান লাভ করিয়া পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে নানা বাদ বিতণ্ডা তুলিয়াছি। আমাদের প্রাচীনেরা "বোধোদয়"ও পড়েন নাই, এবং দেশ প্রচলিত প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে তাঁহাদের অন্তরে কোনও সন্দেহের বা প্রশ্নেরই উদয় হয় নাই। এবিষয়ে তাঁহারা বালকের মত ছিলেন। বাল্যকালে আমাদের মনেও এসকল জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই। ঠাকুর

দেবতাতে একটা সহজ সরল বিশ্বাস ছিল। কালী, দুর্গা প্রভৃতির প্রতিমাকে সামান্য পুতুল বলিয়া কখনও ভাবি নাই। এসকল প্রতিমা-পূজার প্রথমেই যে প্রতিমাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে বাল্যকালে এ কথা শুনি নাই।

ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি

এখানে এই প্রতিমাতে আবির্ভূত হও, ইহাতে প্রতিষ্ঠিত হও, ইহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাক—পূজার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতেন শুনিতাম, কিন্তু তখন ইহার অর্থবোধ হয় নাই, মর্ম্মগ্রহণ ত দূরের কথা। সুতরাং পরে বড় হইয়া হিন্দু পুনরুত্থানকারীদিগের মুখে প্রতিমা-পূজা যে পুতুল পূজা নহে, ইহার স্বপক্ষে যে সকল "বৈজ্ঞানিক" যুক্তি এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম, বাল্যকালে তাহার কোনই খোঁজ খবর পাই নাই। কিন্তু প্রতিমাতে দেববুদ্ধি ছিল। তর্কযুক্তি না করিয়াই এ সকল প্রতিমা যে সামান্য পুত্তলিকা নহে, ইহাদের চেতনবৃত্তি চাক্ষুষ না হইলেও এ সকল প্রতিমা যে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ অচেতন বস্তু নহে, এই বিশ্বাস অন্তরে জাগরূক ছিল। আমাদের প্রাচীনেরাও এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই যুক্তি-তর্কের ধার না ধারিয়া, সন্দেহ, বিচার, সঙ্গতি ও সমন্বয়—প্রাচীন মীমাংসা শাস্ত্রের এই পথ অবলম্বন না করিয়াও, বিনা বিচারে প্রতিমাতে দেবতার অধিষ্ঠান হয়, ইহা বিশ্বাস করিতেন। এবং এরূপ বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই সে কালের পূজা পার্ব্বনের মধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই একটা সত্য সাত্বিকতা ও ভক্তির প্রেরণা জাগিয়া থাকিত। আর এই জন্যই শারদীয় পূজার কয়দিন বাংলা দেশ জুড়িয়া একটা ভক্তি ও আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইত।

২

একদিকে দেখিতে গেলে এ সকল পূজার ভিতরে একটা অতি প্রাকৃতের প্রভাব রহিয়াছে, ইহা মানিতেই হইবে। ইংরাজীতে এই অতি প্রাকৃতকে Supernatural কহে। যাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত অনুমান এবং উপমান, এই ত্রিবিধ লৌকিক প্রমাণের উপরে গড়িয়া উঠে না, তাহাকেই আমরা অতিপ্রাকৃত বা Supernatural কহিয়া থাকি। এই অর্থে আমাদের চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাসও অতিপ্রাকৃতে বা Supernatural এ বিশ্বাস ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই ঈশ্বর তত্ত্বকে আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না। আর অনুমান এবং উপমান নিজের প্রামাণ্যের জন্য যখন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অপেক্ষা রাখে, তখন লৌকিক ন্যায়ের বা formal logic এর হাত ধরিয়াও আমরা সত্যভাবে এই অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরতত্বে পৌঁছিতে পারি না। অনুমান-উপমানাদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্ভাবনা পর্য্যন্তই প্রতিষ্ঠিত করে। ইহার বেশী বিশ্বাস করিতে গেলেই অতি প্রাকৃতের রাজ্যে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়। ফলতঃ অতিপ্রাকৃতের বা ইন্দ্রিয়াতীতের অনুভূতির উপরে জগতের যাবতীয় ধর্ম্মবিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছে। আধুনিক ধর্ম্মবিজ্ঞান সকল ধর্ম্মের মূলে এই অতিপ্রাকৃতের অনুভূতি বা Sense of the Supernatural দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাই সকল ধর্ম্মের মূল। আমাদের দেশপ্রচলিত প্রতিমা-পূজার মূলেও এই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটাই রহিয়াছে। বাল্যকালে এ সকল কথা কিছুই জানিতাম

না ও বুঝিতাম না। কিন্তু পুরুষপরম্পরাগত অন্তর্নিহিত এই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটাই ছিল বলিয়া বাড়ীতে যে সকল পূজা পার্ব্বণ হইত, তাহাতে একেবারে মজিয়া যাইতাম। আমাদের প্রাচীনেরা এ বিষয়ে বালকের মতনই ছিলেন। আর এই জন্যই তাঁহারাও এই সকল পূজানুষ্ঠানের সাহায্যে সরল ভক্তিবৃত্তির অপূর্ব্ব অনুশীলন করিতে পারিতেন।

(৩)

দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষকে পিতৃপক্ষ কহে। আজিকালিকার ইংরাজী-নবীশেরা এই পিতৃপক্ষের কোনও খোঁজখবরই রাখেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ সেকালে বাংলার হিন্দুমাত্রেই এই প্রতিপদ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত পনর দিন নিয়মিত মত পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন। কেহ বা নদীজলে স্নান করিয়া সেই স্রোতের মাঝখানে আবক্ষ দাঁড়াইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল লইয়া নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সেই জল নিবেদন করিতেন। কেহ বা নিজেদের বাড়ীর অথবা বাড়ীর নিকটস্থ পুষ্করিণীতে যাইয়া অবগাহন স্নান পূর্ব্বক সেই জলে দাঁড়াইয়া এই এক পক্ষকাল প্রতিদিন পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে দলে দলে তর্পণকারীরা নদীর বা পুষ্করিণীর ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদের গম্ভীর পরলোক-ধ্যান-নিমগ্ন পিতৃলোকের স্মৃতিমণ্ডিত মুখমণ্ডলে শরতের তরুণ অরুণের কোমল রশ্মিপাতে এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিত। আর তর্পণের মন্ত্র শতকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া সমগ্র জনপদকে মুখরিত করিয়া তুলিত। সে ছবি এখনও চোখের উপর ভাসিতেছে সেই মন্ত্রের প্রতিধ্বনি আজিও কানে বাজিয়া উঠে। এই একপক্ষকাল নিষ্ঠাবান হিন্দুরা স্ত্রীতৈলমৎস্যমাংসাদি বর্জ্জন করিয়া সংযম সাধন করিতেন। আমরা এ সকল ভুলিয়া গিয়াছি। এখনকার কৃতবিদ্যেরা যতই হিন্দুত্বের গৌরব করুন না কেন, সে সংযমের অনুশীলন কেহই করেন না; আর পিতৃপক্ষের কর্ত্তব্য তর্পণাদিও কচিৎ কেহ করেন কিনা সন্দেহ। আমরা যে কেবল প্রাচীনদিগের শ্রদ্ধাই হারাইয়াছি তাহা নহে, এ সকল আচারানুষ্ঠানের মধ্যে যে অপূর্ব্ব কবি-কল্পনা জাগিয়া আছে, এ সকলের ভিতর দিয়া যে বিশ্বমানবতার বা Humanityর এবং অক্ষুণ্ণ সমাজধারার অনুভূতির যে অনুশীলন হইত, তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। মুখে বলি আর না বলি, মনে মনে প্রাচীন লোকায়তদিগের—"মরা গরু ঘাস খায় না"—এইভাবটা আমাদের মধ্যে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অঞ্জলি অঞ্জলি ভরিয়া প্রত্যেকের নাম করিয়া পিতৃপুরুষদিগের তর্পণের মধ্যে যে কোনও পৌত্তলিকতা নাই, কেবল একটা অতি মিষ্টি Symbolism মাত্র আছে ইহা আমরা ধরিতেই পারি না। এ সকলের ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে আমরা অনেকেই এখন বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম পর্য্যন্তই জানি; তার উপরের কোন খবরই রাখি না। এই সকল পিতৃপার্ব্বণের অনুষ্ঠান লোপ পাইতেছে বলিয়া জাতটা যেন ভুঁইফোঁড় হইয়া উঠিতেছে। এই পিতৃপক্ষের বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিলে অন্তরে এই সকল ভাবনারই উদয় হইয়া থাকে। অনেক সময় ভাবি এই তর্পণ শ্রাদ্ধগুলির পুনরুত্থান কি সম্ভব নয়? আমরাত মৃতের স্মৃতি-সভা সর্ব্বদাই করিয়া থাকি। এ সকল মেমোরিয়াল

সভা প্রাচীনদিগের পিতৃশ্রাদ্ধের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। কিন্তু সকলেরত আর মেমোরিয়াল সভা করা যায় না। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই তর্পণ-শ্রাদ্ধাদিই নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতি রক্ষা করিবার উপায়। এই জন্য এখনও এই পিতৃপক্ষে প্রতি দিন প্রত্যূষে ভগবানের নাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে পিতৃ-তর্পণ করিয়া থাকি। আর যখনই এই পিতৃপক্ষের বাল্য-স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তখনই এ সকল প্রাচীন অনুষ্ঠানাদির বিলোপে বাংলার অন্তরাত্মা যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারি।

(৪)

এই পিতৃপক্ষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পূজা আসিতেছে, এই আনন্দের সংবাদও চারিদিকে প্রচারিত হইত। দুর্গোৎসবের স্মৃতি জড়িত বলিয়া আজও পর্য্যন্ত শরতের রোদ, শরতের আকাশ, শরতের বাতাস বিশ্বটাকে যেন উৎসবের সাজ সাজাইয়া তোলে। শরতের রোদের রূপ যেন স্বতন্ত্র এমনি মনে হয়। মহালয়ার দিন হইতেই বাবার আদালত বন্ধ হইত। আর আমরা হয় তার পর দিন, আর মহালয়া যেবার সোমবারে পড়িত, সেবারে তার দিন দুই পূর্ব্বেই শ্রীহট্ট হইতে বাড়ী রওনা হইতাম। শ্রীহট্ট জেলাটা একদিকে পাহাড়ময়, আর একদিকে নীচু সমতল ভূমি। বর্ষার সময় এই সমতল ভূমি জলাকীর্ণ হইয়া যাইত। মাঠের উপর দিয়া সোজাসুজি নৌকা চলাচলের পথ খুলিত। নৌকাতেই আমরা শ্রীহট্ট হইতে বাড়ী যাইতাম। শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিম অঞ্চলে আমাদের বাড়ী। আমাদের অঞ্চলের নৌকাগুলির একটা বিশেষত্ব ছিল। এসকল নৌকা ছিপের মত লম্বা, কিন্তু ছিপ হইতে অনেক বেশী চওড়া। এত লম্বা বলিয়া এসকল নৌকার ছৈ দুইভাগে বিভক্ত হয়। মাঝখানটা খোলা থাকে। বৃষ্টি বা রৌদ্রের সময় ছাপ্পর টানিয়া দিয়া এই খোলা যায়গাটা ঢাকিতে পারা যায়। এই মাঝখানের খোলা জায়গায় আড়াআড়ি বাঁশ বাঁধিয়া নৌকার গর্ভের বাহিরে মেয়েদের স্নানেরও পায়খানার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এসকল নৌকায় প্রায়ই তিন জন মাঝি থাকে। মাঠের উপর দিয়া ঘাস বা ধানক্ষেতের ভিতরে নৌকা চালাইতে হইলে দাঁড় টানা সম্ভব হয় না। মাঠের জল খুব বেশী নহে বলিয়া দাঁড়টানার কোন প্রয়োজনও হয় না। লগিতেই এসকল নৌকা বেশী চলে। দুইজন মাঝিতেই লগি চালায় একজন বিশ্রাম করে। এইজন্য এসকল নৌকা দিনরাত সমানভাবে চলে। শ্রীহট্ট হইতে আমাদের বাড়ী যাইতে এই নৌকায় একরাত ও পুরা একদিন লাগিত। রাত্রি কালে আহারান্তে আমরা নৌকায় চাপিতাম। আর পরদিন সন্ধ্যার পরে বাড়ী যাইয়া পৌঁছিতাম। কখনও কখনও বেশী রাত হইয়া যাইত। পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে বর্ষাকালে আমাদের গ্রামটা জলে ডুবিয়া যায়। হেমন্তকালের গোপাট বা গোপথই তখন নৌকা চলাচলের পথ হইয়া দাঁড়ায়। গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পল্লীর মাঝখান দিয়া যাইতে হয়। অপরিচিত অন্যগ্রামের মাঝিরা গ্রামের ভিতরকার পথঘাট ভাল করিয়া জানে না সুতরাং রাত্রিকালে গ্রামের ভিতরে ঢুকিলেই চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া

যায়। নৌকার শব্দ পাইয়া গৃহস্থেরা জাগিয়া শয্যা হইতেই কার নৌকা কোথায় যাইতেছে এ সংবাদ লইত। কেহ কেহ বাবার নাম শুনিয়া নিজেদের বাড়ীর ঘাটে আসিয়া কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিত, এবং মাঝিদিগকে পথ দেখাইয়া দিত। সেও একটা আনন্দের স্মৃতি হইয়া এখনও অন্তরে জাগিয়া আছে।

(৫)

আমাদের বাড়ীতে প্রতিমা বসাইয়া দুর্গাপূজা হইত। শুনিয়াছি বাবা যখন ঢাকার সদরালার আদালতে পেস্কারী করিতেন, তখন হইতেই আমাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব আরম্ভ হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম হয়। বোধ হয় তাহার তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫৪সাল হইতে আমাদের বাড়ীতে পূজা হয়। ১৮৮৫সালের প্রথম ভাগে বাবা স্বর্গারোহণ করেন। তাহার পূর্ব্ব বৎসরই আমাদের বাড়ীতে শেষ দুর্গাপূজা হয়। কলিকাতা অঞ্চলে কুমারেরা দুর্গা প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। আমাদের অঞ্চলে অন্ততঃ পূর্ব্বকালে এই বৃত্তি কুমারদিগের ছিল না। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা দেবতার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতেন। পিতৃপক্ষের প্রারম্ভেই দিন ক্ষণ দেখিয়া আমাদের "দ্বারস্থ" দৈবজ্ঞ আসিয়া দেবীর "পাটেখিলি" দিতেন; অর্থাৎ যে কাঠের পীটের উপরে কাঠামো গড়িয়া তোলা হইত, সেই কাঠে খিলি দিয়া যাইতেন। বোধ হয় এই উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান হইত। আমাদের "দ্বারস্থ" দৈবজ্ঞের নাম কালীনাথ আচার্য্য ছিল। ইনি একদিকে ফলিত জ্যোতিষে কৃতবিদ্য ছিলেন; অন্যদিকে দেবমূর্ত্তি রচনাতেও সুপটু ছিলেন। ভাস্করশিল্পের হিসাবেও আমাদের কালীঠাকুরের রচিত প্রতিমা সর্ব্বদাই বেশ উৎকর্ষ লাভ করিত। "পাটেখিলির" পরে কাঠাম প্রস্তুত করিয়া বাঁশ এবং খড়ের ঠাট তৈয়ার করিতেন। তাহার উপরে এঁটেলো মাটি লাগাইয়া দেবতাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়িয়া তুলিতেন। এবং সর্ব্বশেষে মুখ ও গলা নির্ম্মাণ করিয়া মূর্ত্তিকে পরিপূর্ণ করিতেন। এইরূপে মৃন্ময় দেহ নির্ম্মিত হইলে তাহার উপরে রং দেওয়া হইত। আমাদের বাড়ী পৌছিবার পূর্ব্বেই মাটির কাজ শেষ হইয়া যাইত। কোনও কোনও বারে বা রংয়ের কাজও শেষ হইত। কেবল বেশ ভূষা দিয়া প্রতিমা সাজানই বাকী থাকিত। প্রায়ই বিল্ব-ষষ্ঠীর রাত্রে প্রতিমা সাজানোর কাজ শেষ হইত। আর আমরা সারারাত জাগিয়া এই সাজানো দেখিতাম। তখন পর্য্যন্ত আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকিবার অধিকার ছিল, প্রতিমা স্পর্শ করিলেও কোনও দোষ হইত না। ফলতঃ যে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা দেবীমূর্ত্তি রচনা করিতেন, তাঁহাদের জল চল ছিল না। সুতরাং তাঁরা যতক্ষণ দেবীমূর্ত্তিকে ছুঁইতে পারিতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরাও স্বচ্ছন্দে চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া দেবী প্রতিমা স্পর্শ করিতে পারিতাম। তখন পর্য্যন্ত এই প্রতিমা যে কেবল পুতুল ছিল, দেবতা হইয়া উঠে নাই। পরদিন মহাসপ্তমীর প্রত্যুষে পুরোহিত যখন কলাবধূকে—আমাদের দেশে ইহাকে নবপ্রতিমা কহে—স্নাত ও মন্ত্রপূত করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আনিয়া স্থাপন করিতেন, তখন হইতেই আর আমরা চণ্ডীমণ্ডপেও যাইতে পারিতাম না, প্রতিমাও স্পর্শ করিতে পারিতাম না। তখন হইতেই আমাদের অন্তরে এই পুত্তলিকাতে বা প্রতিমাতে দেববুদ্ধি জাগিয়া উঠিত।

পূজার জন্য দেবীপ্রতিমা যতক্ষণ না মন্ত্রপূত হইয়াছে, ততক্ষণ তাহা সামান্য পুত্তলিকা আর মন্ত্রপূত হইলেই তাহা দেবতা হইয়া যায় কেন এবং কিরূপে এ প্রশ্নটাই তখনও মনে উঠে নাই। যেরূপেই হউক না কেন, পূজা আরম্ভ হইলেই প্রতিমাতে দেববুদ্ধি জাগিয়া উঠিত। আবার পূজা শেষ হইলে এই প্রতিমাই ঠিক পুত্তলিকা হউক আর না হউক, আপনার শুচিতা হারাইয়া ফেলিত। তখন তাঁহাকে যে সে ছুঁইতে ধরিতে পারিত। এ রহস্যটা যে কি, বাল্যকালে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই; যৌবনেও হই নাই। শেষ বয়সে এ সকল তত্ত্বের অনুসন্ধানে যাইয়া বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার সত্যটা যে কি ইহার কতকটা আভাস প্রাপ্ত হই। বাল্যকালে এসকল বিচারের প্রয়োজনও হয় নাই। সরল পুরুষপরম্পরাগত সহজ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আপনার অধিকার মাফিক্ এসকল পূজাপদ্ধতিতে যোগদান করিতাম। শৈশবে কেবল দূর হইতেই পূজা দেখিতাম। ক্রমে বড় হইয়া উঠিলে ফুল তুলিয়া বেলপাতা বাছিয়া, আরতি ও বলির সময় কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইয়া পূজার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সামিল হইতাম। রাত্রি থাকিতে বাড়ীর এবং পাড়ার সমবয়স্ক বালকদিগকে জুটাইয়া পাড়ায় পাড়ায় ফুল তুলিতে যাইতাম। আমাদের গ্রামে অনেক বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীর বালকদিগের মধ্যে ফুল তোলা লইয়া একটা প্রতিযোগিতা বাধিয়া যাইত। কে কত ফুল সংগ্রহ করিবে তাহা লইয়া একটা রেষারেষি চলিত। তার পর প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া আমরা বালকের দল বেলপাতা বাছিতে বসিয়া যাইতাম। এও এক আনন্দের ব্যাপার ছিল। এক একটী করিয়া বেলপাতা গামলার জলে ফেলিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া টুকরি ভরিয়া দিতাম। আর সেই বেলপাতা যখন পুরোহিতের হাতে অর্ঘ্যরূপে অর্পিত হইয়া দেবীর পাদদেশে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিত তাহা দেখিয়া অন্তরে একটা গৌরব অনুভব করিতাম। কেবল পুরোহিতই পূজা করিতেছে না, আমরাও পূজার সামিল হইতেছি, এই ভাবটায় হৃদয় ভরিয়া উঠিত। তার পর বলির সময় কি আনন্দ ও উৎসাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত মনে করিলে এখনও প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে। ছাগাদি বলির নৃশংসতা বিন্দু পরিমাণেও অনুভব করিতাম না। শক্রনিবহনিধনে যুযুৎসু বীরের আততায়িতার ভিতর দিয়াই যে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এই বলি ব্যাপারে তাহাই আস্বাদন করিতাম। ছাগ-মহিষাদি অসুর মনে করিতাম। যে মহিষাসুর দেবীর অস্ত্রবিদ্ধ হইয়াও তাঁহার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত—প্রতিমাকে দেখিতাম, সেই মহিষাসুরেরই বংশধররূপে ছাগমহিষাদি বলি হয়, এরূপ কল্পনা করিয়া এই বলি ব্যাপারের নৃশংসতা অনুভব করিতে পারিতাম না। এই বলির ভিতরে একটা ভীতিও অন্তরে জাগিয়া উঠিত। যদি খড়্গের এক আঘাতে যূপবদ্ধ পশুর শিরশ্ছেদ না হয়, তাহা হইলে দেবী বলি গ্রহণ করিলেন না, এইরূপই বুঝিতে হইবে। এবং দেবতার অপ্রসাদনিবন্ধন যজমানের অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। লোক পরম্পরায় এসকল কথাও শুনিতাম। আর এই কারণে যখন বলির বাদ্য বাজিয়া উঠিত, তখন প্রাণের মধ্যে আশা ও ভয়, আনন্দ ও ত্রাস, উৎসাহ ও অবসাদ এসকল বিরুদ্ধ ভাব মিলিয়া দেহমনে এক প্রবল ঝড় বহাইয়া দিত।

ঢুলি বলির বাজনা বাজাইত, ব্রাহ্মণ শঙ্খধ্বনি করিতেন, কীর্ত্তনীয়ারা খোল করতাল বাজাইতেন, আমরা নিজে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতাম, বৃদ্ধেরা গললগ্নীকৃতবাসে করজোড়ে দাঁড়াইয়া নিমীলিতনেত্রে ধ্যানস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া ভক্তি গদগদকণ্ঠে "মা, মা" বলিয়া চীৎকার করিতেন। এসকলে মিলিয়া একটা অদ্ভুত ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিত, যাহার প্রভাবে আমরা বুঝি আর না বুঝি মনটা অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। এসকল অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বিফল হয় নাই। প্রচলিত প্রতিমা-পূজা বর্জ্জন করিয়াও এসকল বাল্যের ও প্রথম যৌবনের অনুভূতি অভিজ্ঞতার কল্যাণেই আজ পর্য্যন্ত যতটুকু সামান্য ধর্ম্ম ও ভক্তি আস্বাদন করিতে পারিয়াছি, তাহা সম্ভব হইয়াছে। সাত্বিক, নিষ্ঠাবান, হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া এই সকল পূজা অনুষ্ঠানের ভিতরে বাড়িয়া উঠিয়াছিলাম বলিয়া নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়াছি বলিয়া হিন্দু সমাজে জন্মিয়া সেখানেই বাড়িয়া উঠিয়াছিলাম, ইহাকে কোনও দিন দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিনা। হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছিলাম, ইহাও মহাভাগ্য, ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম ইহাও মহা ভাগ্য। হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির কল্যাণে ধর্ম্মবস্তুর মর্ম্ম যা কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। আর ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণেই এই সকল হিন্দু অনুষ্ঠানের ভিতরে যে সার সত্য টুকু আছে, তাহারও মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছি। হিন্দুসমাজে না জন্মিলে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম, ব্রাহ্ম সমাজে না আসিলে সেইরূপ কিম্বা ততোধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম।

(৬)

সেকালের দুর্গোৎসবেও যে একেবারে ঐশ্বর্য্যবিস্তারের চেষ্টা হইত না কিম্বা সকলেই যে সাত্বিকভাবে পূজা করিত এমন বলা যায় না। রং-তামাসাও যথেষ্ট হইত। কলিকাতা অঞ্চলে বাইজীদের গান হয়; আমাদের দেশে সেকালে বাইজীর আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু "ঝুমুরওয়ালী" বলিয়া বাইজিরই অনুরূপ এক শ্রেণীর নর্ত্তকী ও গায়িকা ছিল। তবে ইহারা আদিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান গাহিত না, শ্যামাবিষয়ক গানই বেশী প্রচলিত ছিল। আমার মনে আছে যে প্রথমে এই ঝুমুরওয়ালীদের মুখেই—

সদা কালী কালী বলে ডাকরে রসনা
বেদাগমে শিব উক্তি ডাকরে মন মহামুক্তি
নিতান্ত জেনেছি রে মন শমন ভয় আর রবেনা —

এই সঙ্গীতটা শুনিয়াছিলাম। বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়া ও কীর্ত্তনওয়ালীদের সকল গানের পূর্ব্বেই যেমন "গৌরচন্দ্র" গাহিবার রীতি আছে, সেইরূপ আমাদের দেশের ঝুমুরওয়ালীরা কালীর নাম গাহিয়া তাদের নাচ-গান আরম্ভ করিত। কিন্তু দুর্গাপূজার সময় প্রায়ই ঝুমুরওয়ালীদের গান হইত না। যাত্রাগানও হইত না। গ্রামে গ্রামে সখের দল গড়িয়া কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সখীসম্বাদ গানই বেশী চলতি ছিল। এই উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে কবির লড়াইও হইত। বাবা পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া সপ্তমী ও অষ্টমী দিনে আমাদের বাড়ীতে কোনও গান-বাজনা হইতে দিতেন না। ভোর ও সন্ধ্যাগমে ঠাকুরের আরতি হইত। আমাদের "দ্বারস্থ" নাপিতের একটা কীর্ত্তনের দল

ছিল। গ্রামে শ্রাদ্ধাদিতে ইহারাই কীর্ত্তন করিত। পূজার সময়ে পূজা-বাড়ীতেও ইহারাই ভোর বেলা আসিয়া ঠাকুরকে জাগাইত। এই ভোর-কীর্ত্তনটার দু'একটা পদ এখনও মনে আছে ;—

জাগ গো কুলকুণ্ডলিনী
শতদল মাঝে শম্ভুসহিতে কত আর নিদ্রা যাবে জননী
জাগো গো কুলকুণ্ডলিনী।

পরজীবনে "ষট্‌চক্র", "ঘেরণ্ডসংহিতা" প্রভৃতি দু'একখানা তান্ত্রিক বই পড়িয়া কিছু কিছু এই গানটার অর্থবোধ হইয়াছিল। কিন্তু বাল্যকালে কুলকুণ্ডলিনীই বা কে, শতদলই বা কি, আর শম্ভুই বা কে, এ সকলের কোন কিছুই বুঝিতাম না। কিন্তু না বুঝিলেও রাত্রি অবসান হইতে না হইতে পূজাবাড়ীর পরিশ্রান্ত পরিজনদিগের নিস্তব্ধ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যখন নাটমন্দিরে খোল-করতালের সহযোগে এই গানের সুর বাজিয়া উঠিত, তখন যেন অন্তরে-বাহিরে একটা মোহিনী প্রভাব ছড়াইয়া পড়িত। অমনি গা ঝাড়িয়া উঠিয়া আবার পূজার আয়োজনে সকলে লাগিয়া যাইতাম। সন্ধ্যাকালে হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইত। এই সন্ধ্যা-আরতির একটা গান এখনও মনে আছে।

সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাক রে রসনা
শমন এসে বাঁধবে রে যখন তখন কোথায় রবে ঘর-দরজা কোথায় রবে ধন
তখন বন্ধুজনায় বিদায় দিবে রে, সাথের সাথী কেউ হবে না।

এই আরতির সময় ব্যতীত সপ্তমী অষ্টমীর দিনে আমাদের বাড়ীতে আর কোনও গান-বাজনা হইত না আমাদের গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের সখীসম্বাদের দল আমাদের বাড়ীতে আসিবেন এই সম্বাদ পাঠাইলেই বাবা মহানবমীর দিন রাত্রের কথা বলিয়া দিতেন। সুতরাং তাঁরাও সেইদিনই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। তাঁদের আসার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। কোনও কোনও বারে বা আসিবেন যে তাহার কোনই খবর পর্য্যন্ত দিতেন না একেবারে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক চারি ছয়খানা খোল ও করতাল লইয়া নুপুর পায়ে দিয়া নাট-মন্দিরের মাঝখানে আসিয়া খোলে চাটি দিতেন ও তার সঙ্গে সঙ্গে নুপুরের সিঞ্চিনি তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিতেন। সেই খোলের শব্দে ও নুপুরের সিঞ্চিনিতে আমরা বাড়ীর লোকেরাই যে জাগিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ইহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইতাম তাহা নহে, কিন্তু পাড়ার লোকেরাও ছুটিয়া আসিত। এইরূপে নিমেষের মধ্যে গায়ক ও শ্রোতা মিলিয়া আমাদের নাট-মন্দিরটা লোকাকীর্ণ করিয়া তুলিত। এই সকল সখীসম্বাদ গান কেবল এক দলে হইত না ; একদল কোন বাড়ীতে গিয়াছে শুনিলেই তাহার প্রতিযোগী দলও পিছনে পিছনে আসিয়া উপস্থিত হইত। এইরূপে প্রায়ই নবমীর দিন রাত্রি দুই প্রহরের পরে কখনো বা দুই বা কখনও বা তিন চার দলও আসিয়া জুটিতেন। বিজয়া দশমীর দিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ইহাদের গান ও ছড়া-কাটা চলিত। তার পর ইহাদিগকে জলপান করাইয়া বিদায় করিতে হইত। সেকালে

আমাদের দেশে লুচি-মিঠাই প্রচলিত হয় নাই। চিঁড়া, মুড়কি, বাতাসা এবং দইই জলপানের উপকরণ ছিল। সখি-সম্বাদের অধিকাংশ গানই "খণ্ডিতা"র বা "মানে"র গান ছিল। একটী গানের প্রথম পদ মনে পড়ে; অথবা বোধ হয় এটী ঠিক প্রথম পদও নয়। সারা নিশি শ্রীরাধিকা কুঞ্জ সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের আশার আসায় জাগিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আশা পূর্ণ করিলেন না।

নিশি প্রভাত কালে, নাগর জয় জয় রাধা বলে
রাধার কুঞ্জে উদয়।
বৃন্দাদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে—
ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর
আছে ঘুমাইয়ে।
বাসি ফুল হয় না শয্যা, কুলের বৌ পেলাম লজ্জা
শ্যাম, হে শ্যাম তোমার একি পর্য্যা ?
আমরা এই এলাম ফুলের শয্যা বিসর্জ্জিয়ে।

(৭)

এ সকল আমোদ-প্রমোদ সত্বেও মহানবমীর সন্ধ্যাকাল হইতে চারিদিকে একটা বিষাদের ছায়া ছাইয়া পড়িত। সন্ধ্যা-আরতির সময় চণ্ডীমণ্ডপের দ্বারে বড় বড় ধুনুচি জ্বালাইয়া যখন ধূপ-গুগ্‌গুলের গন্ধে ও ধূমে মণ্ডপ ঢাকিয়া পড়িত, তখন সেই ধূমের ভিতর দিয়া দেবীর মুখের পানে চাহিয়া আমাদের সত্য সত্যই মনে হইত যেন তিনি কাঁদিতেছেন। তখন এ যে মাটির পুতুল, এ বোধটা একেবারেই লোপ পাইত। এ যেন মেয়ে, বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুর বাড়ী চলিয়া যাইতে হইবে এই ভাবনায়, স্বজন-বিরহের আশঙ্কায়, মলিন হইয়াছে; এমনই বোধ হইত। বিজয়ার প্রত্যুষে এই রূপের যেন আরও পরিবর্ত্তন ঘটিত। পূজার তিনদিন দেবী প্রতিমায় যে প্রফুল্ল ভাব দেখিতাম, বিজয়ার প্রভাতে তাহা যেন একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে এমনই বোধ হইত। এ সকল আমাদের নিজেদের মনের ভাবের আরোপ, আমাদের কল্পিত সৃষ্টি, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাকে আমরা বাস্তব রূপ বলি তাহার ভিতরেই কতটা সত্য, কতটা কল্পনা কতটা বস্তু ও কতটা আরোপ মিশাইয়া থাকে, ইহা কে বলিবে ? অন্ততঃ বাল্যে ও প্রথম যৌবনে এ সকল অনুভূতি যে কল্পিত বা অধ্যাস এরূপ মনে করিতাম না। বিজয়ার দিনে সত্য সত্যই একটা গভীর বিচ্ছেদ-বেদনা অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। সন্ধ্যাকালে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম, তখন শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ দেখিয়া প্রাণটা উদাস হইয়া উঠিত। তারপর শান্তিবচন। ইহার মর্ম্ম তখন কিছুই বুঝি নাই; কিন্তু এই শান্তি-বারি সিঞ্চনে বাস্তবিকই অন্তরে একটা শান্তি অনুভব করিতাম।

বহুদিন ত দুর্গোৎসব করি না। যে ভাবে বাল্যে দুর্গোৎসব করিতাম, সেভাবে এখন

করিতেও পারি না। বহুদিন প্রতিমা-পূজা বর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু আজিও দুর্গোৎসবের স্মৃতিতে প্রাণটা কেমন কেমন করিয়া উঠে।

(৮)

তারপর দুর্গোৎসব কেবল দেবতার পূজা ছিল না। এই উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল সামাজিকতা। দশজনকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়ান দাওয়ান। আর এই সামাজিকতায় সত্যই—"অতিথি দেবোভব" দেবতাজ্ঞানে অতিথির অভ্যর্থনা করিবে, এই শাস্ত্রীয় অনুশাসনের অনুশীলন হইত। গৃহস্বামীকে জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সকল আমন্ত্রিতের নিকটে যাইয়া গলায় গামছা দিয়া করজোড়ে দাঁড়াইতে হইত। আর খাদ্যাদি বিষয়েও বড়লোক গরিব লোকের মধ্যে কোন প্রকারের ভেদ করিলে চলিত না। বরঞ্চ যাঁহারা ধনী নিজেরা সর্ব্বদা ভাল জিনিষ খাইতে পারেন, তাঁহাদিগের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তেমন দৃষ্টি না রাখিলেও চলিত; কিন্তু গরীব নিমন্ত্রিতদিগের সম্বন্ধে এবিষয়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইত। আমি একটু বড় হইলে লোকজনকে খাওয়ান দাওয়ানর ভার অনেকটা আমার উপরে আসিয়া পড়ে। সে সময়ে মা আমাকে বারবার কহিতেন, এ কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিও যে ভদ্রলোকেরা তোমার বাড়ীতে খাইতে আসে না; তাঁদের নিজেদের বাড়ীতেও তাঁরা সর্ব্বদা ভাল জিনিষ খাইতে পারে ও খায়; কিন্তু গরীবদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইও। তাদের নিজের বাড়ীতে পূজা হয় না; তোমার বাড়ীতে তারা যেন পূজার সকল আমোদ উপভোগ করিতে পারে, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিও।

আমরা রক্তের জাত ও বংশের জাত ভাঙ্গিয়া যে নূতন টাকার জাত গড়িয়া তুলিয়াছি, তাহার প্রভাবে আমার মায়ের কথাগুলির মূল্য ও মর্য্যাদা গ্রহণ করা হয় ত কঠিন হইবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দীঘির পাঁকে

শোন্ দাদু, শোন্
আমি তোর মায়ের পেটের বোন;
একই মায়ের বুকের দুধ পড়েছে দুই মুখে
একই কোলে, হেসে খেলে বেড়েছিলাম সুখে।
মায়ের হাতের মাখা ভাত খেয়েছি এক থালে,
দোল খেয়েছি দুজন বসে হিজলের এক ডালে,
একই সাথে ফুল তুলেছি গেয়েছি এক গান
আজ হে দাদা, তোমার ঘরে নাই কো আমার স্থান।

পরের ঝি সে আপন হয়, হোক্ না, তাতে কি ?
আমি খাই সিদ্ধ পোড়া সে খাক্ পাতে ঘি ;
থাকুক্ তার শাঁখা সিঁদুর বাজু বালা হাতে,
কোলের ছেলে বাড়ুক্ তার নিত্য দুধে ভাতে,
আমার তাতে আনন্দ বই দুঃখ কিছু নাই,—
দুঃখ এই, যে, তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই
আজ ও আমায় চিন্‌লে নাকো। তোমার মায়ের ঝি
আমি দিব কুলে কালী ? ছি !—ছি !—ছি !
মায়ের পেটের সাথী তোমার চির দিনের জানা
তারে শেষটা চিন্‌লে না কো এত বড় কাণা !
পরের মেয়ের সন্দেহেতে বিশ্বাস হ'ল বেশী,
এ কুলের যে কেউ নয় সে, নিতান্ত বিদেশী।
আমার নামে নিন্দা হ'লে তোমার বংশে লাগে
সে কথাটা বারেক্ কি তার অন্তরেতে জাগে ?
তোমার লজ্জায় যে তার লজ্জা, তোমার মানে মান
আমায় মারতে গিয়ে যে তার গেছে সেটুক জ্ঞান।
সত্যি হলে ও রাখ্‌ত চেপে, তোমার মুখ চেয়ে,
একটু যদি বাস্‌ত ভাল কঠিন পরের মেয়ে।

তুমি ছাড়া আপন বল্‌তে আমার কেউ নাই।
তোমার ছেলে বুকে করে মানুষ করি তাই।
তোমার যত্নে কিসের দাবী ? খোকার স্নেহে ভাগ
কেন বসাই ?—ব'লে তার আমার উপর রাগ।
বলি আমি সকল কথা, শোন স্থির হয়ে।
গিছ্‌লাম আমি দীঘির পারে খোকায় কাঁখে লয়ে।
কাজের সময় কাঁদ্‌লে খোকা বউ যে বেজায় মারে
ভুলিয়ে তাকে নিয়ে গেলাম দীঘির পূব ধারে।
দীঘরি জলে বড় বড় পদ্ম ফুটে আছে
মনে হয় ধরা যায়, পারের খুবই কাছে।
ছেলে তোমার ফুল চাইছে, ভাব্‌ছি কি করি
এমন সময় দেখি, আস্‌ছে ও পাড়ার শ্রীহরি।
ডেকে তাকে বল্‌লাম "ভাই এদিক্ হয়ে যাও,
ফুলের তরে কাঁদ্‌ছে ছেলে, একটি তুলে দাও।
কাছে যে টা,— নাই ওখানে হাঁটুর বেশী জল—"

"হলেই বেশী কষ্ট টা কি ?"—"হায়রে অমঙ্গল!
যেমন নামা পাঁকের মাঝে ডুবল সারা দেহ,
উঠতে নারে! ডাকি কারে? কাছে তো নাই কেহ।
পরের ছেলে পাঁকের তলে তলিয়ে মরে যায়
ভাবতে আমার সর্ব্ব অঙ্গ ভরল যে কাঁটায়।
"থাক খোকা চুপ্‌টি করে, আমি ফুলটি আনি—"
বলে আমি সাঁতার দিয়া তুলতে গেলাম টানি।
কত ক্ষণ সে সাঁতার ডুব টানাটানি কত।
আমার কোন হিসাব নাইকো পাগল মেয়ের মত
তুলে নাকি হেসেছিলাম দিয়ে গড়াগড়ি,
শ্রীহরির কাদা মাথা পা দুখানি ধরি।
বউ যে কখন বাঁধা ঘাটে তুলতে এল জল
খ্যাল করিনি, দেখ্‌লাম পরে মস্ত মেয়ের দল।
আনন্দ তো হয়েই ছিল, ঘুচে মহা ত্রাস,
বিধবার ঐ একটি ছেলে, কি যে সর্ব্বনাশ—
আমা হতে হ'ত তার,—তুল্‌তে গিয়ে ফুল
ভাব দেখি? হাঁটু জল? আমারিতো ভুল!
পরের ছেলে মারি নি তো, যা হবার তাই হোক্‌!
বউ বলেন অনেক কিছু, শোনে অন্য লোক।
প্রেম কাহিনী তৈরী হয়ে বাড়্‌ছে মুখে মুখে।

...   .

ভেবে ছিলাম দুঃখের জনম যাক্‌ না কেন দুঃখে
আর কাহার ও নাই কো ক্ষতি, নাই কো পরিতাপ,—
শেষটা একি হ'ল কিন্তু? কার এ অভিশাপ?
বিনা দোষে লোক-নিন্দা, কলঙ্ক রটন,
আমার উপর তোমার ঘৃণা—একি অঘটন!
ছেলে বেলা দুই দেহেতে ছিল একই প্রাণ

...   .

আজ যে দাদু দুই মনেতে এতই ব্যবধান!
এক ভিটাতে, এক মাটিতে, জনম একই ঘরে
তোমায় আমায়, দণ্ড খানিক আগে আর পরে;—
সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই সবই আছে,
তেম্‌নি দেখ ঝুলছে ফুল বাঁকা হিজল গাছে,

বকুল তলা ভরে আছে ঝরা ফুলের রাশে
খালের জলে চাল্‌তা ফুলের সাদা পাঁপড়ি ভাসে—
হাঁা ভাই দাদু, খসে পড়া চালতা ফুলের মত
আমি যাব ভেসে ভেসে? দুদিন হলে গত
ভাস্‌বনা আর, ঠেক্‌ব কোথাও। বাপের ভিটায় বটে
জন্মে মেয়ে, মরণ তো তার অন্যত্রই ঘটে।
যাবার আগে চরণ ছুঁয়ে বল্‌ছি বারে বারে
মায়ের পেটের সাথী তোমার ভুল বুঝ'না তারে।
থাকতে আমি চাইনা হেথা, স্থানের ভাবনা নাই,
কোথা ও না হয়, দীঘির পাঁকে হবে নাকি ঠাঁই!

শ্রীকামিনী রায়।

সঙ্কণিকা

ব্যবস্থাপক সভা

অসহযোগীদের দলের মধ্যে কেহ কেহ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার উপযোগীতা বিষয়ে এখন চিন্তা করিতেছেন, ইহার আভাষ পাইয়াই বিলাতের দলবিশেষে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ পাইতেছে। সেই উদ্বেগের যে শোচনীয় চিহ্ন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড্‌জর্জ্জের বক্তৃতায় পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই হাস্যোদ্দীপক। ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা অতি সামান্যই; কিন্তু এই সামান্য ক্ষমতাও পাছে কেহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে, এই ভয়ে অনেকেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। সেই জন্য Reform Scheme কে Experiment ইত্যাদি বিশেষ বিশেষণে অভিহিত করা হইতেছে। রিফর্ম্ম Expriment ই হউক, বা আর কিছুই হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। গবর্ণমেণ্টের কথাতেই রিফর্ম্ম স্বরাজের সূচনা মাত্র; কিন্তু এ কথাটা এখন ভুলিয়া, রিফর্ম্মের অন্যান্য condition এর উপর জোর দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে অনেকেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এদেশীয় লোকেরা রিফর্ম্ম চালাইতে পারে কি না, তাহার বিচার যে সম্পূর্ণ Parliament এর উপর নির্ভর করে, এবং এ দেশীয় লোকের সহযোগীতার মাত্রা দ্বারাই ইহার বিচার করা হইবে একথা এখন অত্যন্ত উঁচু গলায় বলা হইতেছে। Legislative Assemblyর সভায় সেদিন Lord Reading ও যথেষ্ট জোর দিয়া নিজের এবং বিলাতের লোকের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মনের ভাব এই,—"তোমরা যদি সুবোধ শান্ত ছেলের মত Reform Act এর ক্ষমতা ব্যবহার কর, এবং আমাদের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে জব্দ করিতে চেষ্টা না কর, তবেই Reform কে successful বলা যাইবে। নতুবা, সাবধান, এই Experiment unsuccessful হইয়া পড়িবে। দানের

জিনিষের ইহার অধিক আর কি দাম হইতে পারে? স্বরাজ কেহ কাহাকে ও দান করিতে পারেনা, এমন কি British Parliament ও না। আমাদের নিজের চেষ্টায় ইহা লাভ করিতে হইবে। আশাকরি, আমাদের moderate বন্ধুগণ বেশ ভাল করিয়া এসব কথা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ইত্যবসরে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন রিফর্ম্মের চূড়ান্ত ক্ষমতাগুলি খাটাইবার চেষ্টা করেন। দেখা যাক্, এই Experiment কতদুর গিয়া দাঁড়ায়।

* * *

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবার চৌকিদারী আইনের পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেসরকারী সভ্যগণ চৌকিদারের বেতন নির্দ্ধারণের ভার ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে না দিয়া পঞ্চায়েতের হাতে দিলেন, অবশ্য ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমোদন সাপেক্ষে। কিন্তু ইহাতেই সরকার পক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন; কারণ এখানে গবর্ণরের Veto বা অন্য কোন ক্ষমতা নাই। যদি কোন পঞ্চায়েত চৌকীদার রাখিতে না চায়, বা চৌকিদারের বেতন না দিতে চায়, তবে সেই এলাকার চৌকিদারী ট্যাক্স উঠিয়া যাইবে। যে চৌকীদারী ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়ার জন্য কোন কোন অসহযোগী এতদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই ট্যাক্স ব্যবস্থাপক সভা ৫ মিনিটের মধ্যে প্রকারান্তরে উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, ইহা কি গবর্ণমেণ্টের সহ্য হইতে পারে? ইহা কি সহযোগীর কাজ? অমনি কল্পনা, জল্পনা, পরামর্শ, অনুরোধ, উপরোধ চলিতে লাগিল; ব্যবস্থাপক সভা কি Deadlock করিতে চায়? অনেক অনুরোধের পর ঠিক্ হইল, আইনের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাই থাকুক, তবে যে পর্য্যন্ত এই নূতন আইনের প্রচলন না হইবে, সে পর্য্যন্ত পুরাতন আইন অনুসারে কাজ চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ চৌকীদারদের পূর্ব্ব বেতন ও পূর্ব্বের চৌকীদারী টেক্স বহাল থাকিবে। নূতন আইনের মতে magistrate এর অনুমোদন দরকার। অতএব Deadlock এর ভয় আর রহিলনা। ব্যবস্থাপক সভ্যেরা ও সরকার বাহাদুর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

তার পর, বরিশাল জেলের অত্যাচার কাহিনী লইয়া আলোচনার জন্য সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হইল; ৫ জন অসহযোগী কয়েদীকে নিষ্ঠুর ভাবে বেত প্রহার করা হইল, বুত ব্যাপারটার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য মহাশয় মনে করিতে পারিলেন না। তিনি এই আলোচনাতে বাধা দিলেন; কিন্তু বাধা টিঁকিলনা। আঢ্য মহাশয় এদেশের দুগ্ধের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য কমিটি নিয়োগ কাজে এত ব্যস্ত যে পাছে বরিশালের জেলের কাহিনীর আলোচনায় সময় নষ্ট হইলে, তাঁহার দুধের Resolution আলোচনা করিবার সময় না হয় ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার দুধের Resolution পাশ হইল না। দুধের কথা উঠিতেই—মুসলমান সদস্যগণ গোহত্যা নিবারণের ধ্বজা দেখিলেন, অমনি ঘোরতর আপত্তি উঠিল। অমূল্য বাবু ইচ্ছা করিলেই অন্য ভাবে দুধের পরিমাণ বাড়াইতে পারেন। committeeর দরকার কি?

যাহা হৌক্,—বরিশাল জেলের অত্যাচার কাহিনী আলোচনা হইল। সদস্যগণ তীব্রভাবে

এবং তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়া মনের ঝাল মিটাইলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট একটু দমিলেন না। বেত্রাঘাতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লম্বা বক্তৃতা করিয়া ষ্টিফেন্সন্ সাহেব সাফাই গাহিলেন। Adding insult to injury একজন সদস্য শাসাইলেন, যে তাঁহাদের কথা না শুনিলে তাঁহারা একজোট হইয়া গবর্ণমেণ্টকে জব্দ করিবেন। ফলেন পরিচীয়তে; দেখা যাউক কি হয়।

ফজলাল্ হক্ মহোদয় মুসলমানদের নাম করিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দু মুসলমানের প্রভেদের সূচনা হইয়াছিল। ফলে, তাঁহার Resolution টি‘কে নাই। সেদিন গোলদীঘিতে মুসলমান ছাত্রগণ সভা করিয়া বাংলা ভাষায়ই শিক্ষা দেওয়া উচিত এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফজ্লাল হক্ মহোদয়কে বড়ই বিপদে ফেলিয়াছেন। একেই বলে, “যার জন্য করি চুরী, সেই বলে চোর।”

বেতাল।

* * * *

৺ মতিলাল ঘোষ

দেশের পরমহিতৈষী সংবাদ পত্রের প্রবীন ও তেজস্বী সম্পাদক দেশমান্য মতিলাল ঘোষ মহাশয় আর ইহ জগতে নাই; কালের আহ্বানে তাঁহার অতিপ্রিয় অমৃতবাজারপত্রিকা তাঁহার চিরজীবনের মহাব্রত স্বদেশের হিতানুষ্ঠান—এ সকলই পরিত্যাগ করিয়া গত ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার তিনি পরলোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের সকল সম্প্রদায়েরই শিক্ষিত লোক শোক প্রকাশ করিতেছেন। দেশের নানাস্থানে তাঁহার স্মরণার্থ সভাসমিতি হইতেছে। মতিবাবু তাঁহার পরলোকগত অগ্রজ শিশিরবাবুর সহিত এমনই অচ্ছেদ্য প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন যে আজ তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে শিশির বাবুর স্মৃতি সকলের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের অন্তরে মনুষ্যত্বের এমন এক আদর্শ, এমন এক নিঃস্বার্থ ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, যে তাঁহারা অন্যান্য লোকের ন্যায় আপন আপন সুখ স্বার্থ ও যশ মান লইয়া দিন কাটাইতে পারেন নাই। তরুণ বয়স হইতেই তাঁহারা স্বদেশের কল্যাণার্থ মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। মতিবাবুরা শুধু যে পত্রিকা প্রচার এবং রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা দেশের অনেক সৎকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের আন্দোলনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে “আনন্দবাজী দল” নামে চিহ্নিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। সকলেই জানেন শিশির বাবু ও মতিবাবুর চেষ্টায় দেশের মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের যথেষ্ট প্রচার হইয়াছে। মতিবাবু সুলেখক, সংবাদ পত্রের সাহসী সম্পাদক এবং নির্ভীকচিত্ত স্বদেশহিতৈষী বলিয়াই অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ সালে তাঁহারা নিজেদের গ্রাম হইতেই অমৃতবাজারপত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথমে উহা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইত। ১৮৭২ সালে তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন; এই সময় কলিকাতা হইতে পত্রিকা ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে। শিশির বাবু ও মতিবাবু নির্ভীক চিত্তে এমনই তেজের সহিত উহাতে

অনেক রাজকর্ম্মচারীদের অন্যা। কার্য্যের বিরুদ্ধে লিখিতেন যে, তাঁহাদের অনেক সময় সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইতে হইয়াছে। ঐ সময় বাংলা সংবাদপত্রের মুখবন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। এক দিনের ভিতরেই অমৃতবাজার পত্রিকাকে তাঁহারা ইংরাজী পত্রিকায় পরিণত করিয়া অসম সাহস ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। কাগজ চালাইতে তাঁহাদের অনেক দুঃখ সহিতে ও বিপন্ন হইতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সংকল্পভ্রষ্ট হন নাই। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিবারস্থ সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন "পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রেখ" আর ও বলিয়া গিয়াছেন—"আমার দুঃখ এই যে, মাতৃভূমির জন্য আমি অতি সামান্য কার্য্যই করিতে পারিলাম। ইহলোক হইতে বিদায় লইবার সময় আমি এই আশাই হৃদয়ে পোষণ করিতেছি যে, আমার অপেক্ষা উপযুক্ত আমার দেশবাসিগণ স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলিয়া, আমরা এবং আমাদের সহকর্ম্মিগণ যে কার্য্য করিয়া যাইতে পারিলাম না, তাহা করিতে সমর্থ হইবেন। আমার নশ্বর দেহ না থাকিলে ও আমার আত্মা দেশের উন্নতি ও অবনতি লক্ষ্য করিবে।"

কচুরি পানা।

পূর্ব্ববঙ্গে কচুরিপানার নাম বিশেষ পরিচিত। এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে যে, একজন অষ্ট্রেলিয়ান মহিলা ইহার ফুলের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া একটি কচুরি পানা ফুল শুদ্ধ আনিয়াছিলেন। এত দীর্ঘ দিনের পথেও ইহা বিনাশ পায় নাই, ঐ একটী পানা হইতে আজ কচুরি পানায় দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। কথাটী সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না কিন্তু ইহা অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইয়া বাংলাদেশের কৃষককুলের সর্ব্বনাশ করিতেছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় কচুরী পানা বিনাশের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, মূলশুদ্ধ পোড়ান ব্যতীত ইহার উচ্ছেদের বৈজ্ঞানিক উপায় এখনও তিনি দেখিতে পান নাই। তিনি কয়েকজন বিজ্ঞানবিদ যুবককে এ কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের আশা আছে, তিনি এই কৃষিবিপদ হইতে দেশকে রক্ষা করিবেন।

বন্যা ও জলপ্লাবন।

এদেশ যেন বিধাতার অভিশপ্ত দেশ বলিয়া মনে হয়। যত দুর্দ্দৈব অবটন বা দুর্ঘটন এ দেশে হইবেই। গ্রীষ্মকালে যখন সকল রকমে সকলেরই জলের অত্যন্ত দরকার তখন অনাবৃষ্টি হইয়া সমস্ত খাল বিল পুকুর সব শুকাইয়া যায়, পিপাসায় মানুষ পশু পাখী সমস্তই শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া উঠে। আবার যখন বর্ষা আসে তখন কোথাও অতিবৃষ্টি কোথাও বা বন্যা আসিয়া দেশ ভাসাইয়া লইয়া যায়। যেমন আমাদের নির্জ্জীবতা, চেষ্টার অভাব, তেমনি বুঝি বিধাতার ও অভিশাপ! আমরা বছর বছর রিলিফ করিতে যাই। চাঁদা করিয়া ও গবর্ণমেণ্টের কাছে ভিক্ষা করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত নর নারীকে সাহায্য করিয়া, সেবা করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করি। কিন্তু এ সেবায় তাহাদের কতখানি মঙ্গল হয় তাহা কি ভাবিয়া দেখি? যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যাহাতে এইবন্যা বা অতিবৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিয়া অনাবৃষ্টির সময় কাজে লাগান যায় তবে হয়ত কিছু উপকার হইতে পারে। এ জন্য গবর্ণমেণ্টের

ীর অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেরা চেষ্টা করিলে যে কিছু হয় না এমন ত মনে হয় না। সাময়িক সাহায্য হইতে স্থায়ী উপকারের চেষ্টাই শ্রেয়। বারে বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে বাহির হইলে লোকের দিবার আগ্রহ কমিয়া যায় এবং বারে বারে ভিক্ষার্থী বা সাহায্যপ্রার্থী হইলে মানুষের আত্মসম্মানও নষ্ট হইয়া যায়।

গর্হিতউপায়ে লব্ধ অর্থ গ্রহণে অসম্মতি

রেঙ্গুন টার্ফ ক্লাব হইতে তথাকার লর্ড বিশপের নিকট পিতৃ মাতৃহীন অনাথ, মূঁক বধির ও অন্ধদিগের সাহায্যার্থ কিছু অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল। জুয়া খেলা দ্বারা ঐ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। অন্যায় উপায়ে লব্ধ বা সংগৃহীত বলিয়া লর্ড বিশপ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার এই কাজটী সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে ডাকাইতি করিয়া দান করার কথা অনেক সময় শোনা যায়, কিন্তু অন্যায়ার্জ্জিত অর্থ দানে পুণ্য লাভ হয় না। জুয়া খেলায় সর্ব্বত্রই মানুষের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়, এমন কি কখনো কখনো দুঃখে ক্ষোভে প্রাণ নাশ করিতেও শোনা যায়। সম্প্রতি উহা দেশে অবাধ গতিতে চলিতেছে—এ ভাবে ধিকৃত হইলে জানিনা লোকের চৈতন্য হইবে কি না।

গুরু-কা-বাগ।

পঞ্জাবে গুরু-কা-বাগ লইয়া যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আধুনিক শাসননীতির একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সকল দেশের সকল যুগের জবরদস্ত শাসন-কর্ত্তাগণ, তাঁহাদের মতবিরুদ্ধ কাজ লাঠির চোটে বন্ধ করিতে প্রয়াস পান। জনসাধারণ যাহা করিতে চায় তাহাতে সত্যের অভাব থাকিলে এই লাঠির ভয়ে তাহারা শান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যেখানে আলোকের সন্ধান পাইয়াছে, সত্যের জন্য যখন সে পাগল, ধর্ম্মের প্রেরণায় যখন সে অনুপ্রাণিত, তখন সাধারণতঃ দেখা যায় মানুষ পীড়ননীতির ভয় করে না। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। পঞ্জাবে আজ ধর্ম্মের নামে শিখগণ নানা দুঃখ সহ্য করিতেছে। যাহাকে ন্যায্য অধিকার বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহার জন্য বাহুবলের বিরুদ্ধে আজ তাহারা সাত্বিক প্রতিরোধ আরম্ভ করিয়াছে

সংশোধন।

এই সংখ্যা ভ্রমবশতঃ ২৮৭ পৃষ্ঠার পরিবর্ত্তে ২৭৯ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে। ২৮৬ পৃষ্ঠা হইতে ৮ নম্বর বেশী ধরিয়া পড়িতে হইবে।

নব্যভারত

চত্বারিংশ খণ্ড] কার্ত্তিক, ১৩২৯ [৭ম সংখ্যা

ভারতীয় অব্দ-রীতি

মুখবন্ধ

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-তত্ত্ব বড়ই জটিল। ভারতবাসিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সময়ের গ্রন্থ-মধ্যে অনেক ঘটনা সেই সেই সময়ে প্রচলিত প্রথানুসারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কোন্ ঘটনা কোন্ সময়ে হইয়াছে তাহার কাল-নিরূপণ করা নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। বেদের কাল, পুরাণ-উপনিষদের কাল, কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরের কাল, এমন কি বুদ্ধদেবেরও কাল নিরূপণ করিতে গিয়া বড়ই গোলে পড়িতে হয়। প্রথমতঃ, গ্রন্থ, মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রশস্তি প্রভৃতিতে বিশেষ বিশেষ ঘটনা-নিরূপক যে সমস্ত অব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেগুলিও একরূপ নয়। অব্দগণনার পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। বিশেষতঃ সেই সমস্ত অব্দের মধ্যে এখন অনেকগুলিই লুপ্ত বা অপ্রচলিত; কাজেই ইতিহাস-তত্ত্ব জানিতে হইলে অব্দজ্ঞানের যে নিতান্তই প্রয়োজন, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ দিন দিন ভারতবাসীদিগের নূতন নূতন মুদ্রা, নব নব তাম্রলিপি ও প্রস্তর-ফলক আবিষ্কার করিয়া একদিকে যেমন ইতিহাস-আলোচনার পথ কিছু কিছু সরল করিয়া দিতেছেন, অন্য দিকে তাঁহারা অব্দাদির ইতিবৃত্ত ও গণনা-প্রণালীর নিয়মাদি লিপিবদ্ধ করিয়া কাল-নির্ণয়ের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময় নির্দ্ধারণ বিষয়েও যথেষ্ট সহায়তা হইতেছে। ওয়ারেনের (Warren) 'কাল-সঙ্কলিত' নামক গ্রন্থে ভারতের কতকগুলি অব্দের বিবরণ পাওয়া যায়। মুসলমান আবু রিহান্ অল্ বিরুনী ও ফরাসী রেনো (Renaut) ভারতীয় অব্দ বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত ২০টীর অধিক অব্দের গণনা-পদ্ধতি কনিঙ্‌হামের (Cunningham) ভারতীয় অব্দবিষয়ক পুস্তকে কিছু কিছু পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের সাময়িক পত্রেও অব্দ সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচনা সময়ে সময়ে হইয়াছে। এখানে সেগুলির একটা প্রকাণ্ড ফিরিস্তি দিয়া পাঠকের ধৈর্য্য-চ্যুতি করিতে চাই না। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতও কাল ও অব্দ সম্বন্ধে স্থূলভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের হিউইট্ (Hewitt), প্যাটেল (Patel), ফ্লীট (Fleet), কীলহর্ন্ (Kielhorn), শ্রাম (Schram), গিরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার, যোগেশচন্দ্র রায় ও বেঙ্কটচেলম

আয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সুপণ্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের অশেষ যত্নে ও অদম্য অধ্যবসায়ে দিন দিন বিভিন্ন শিলালেখ প্রভৃতিতে প্রাপ্ত নূতন নূতন অব্দের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। এগুলি দিয়া ইতিহাস-লেখকদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে তাঁহাদের অনুমানের সাহায্য ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না, এখন সেইখানে অনায়াসে অব্দ-সাহায্যে তাঁহারা কাল নিরূপণ করিবার সুবিধা পাইতেছেন।

আমাদের কাল-গণনার নিয়ম অন্যান্য জাতির গণনা হইতে পৃথক্। আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থে ২০ খানি জ্যোতিষ-গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। সেগুলির নাম **সিদ্ধান্ত।** ইহাদের নাম নীচে দেওয়া হইল।

১।	ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত	১১।	অত্রি-সিদ্ধান্ত
২।	সূর্য্য-সিদ্ধান্ত	১২।	কশ্যপ-সিদ্ধান্ত
৩।	সোম-সিদ্ধান্ত	১৩।	মরীচি-সিদ্ধান্ত
৪।	বৃহস্পতি-সিদ্ধান্ত	১৪।	মনু-সিদ্ধান্ত
৫।	গর্গ-সিদ্ধান্ত	১৫।	অঙ্গিরঃসিদ্ধান্ত
৬।	নীরদ-সিদ্ধান্ত	১৬।	লোমস-সিদ্ধান্ত
৭।	পরাশর-সিদ্ধান্ত	১৭।	পুলিস-সিদ্ধান্ত
৮।	পুলস্ত্য-সিদ্ধান্ত	১৮।	যবন-সিদ্ধান্ত
৯।	বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত	১৯।	ভৃগু-সিদ্ধান্ত
১০।	ব্যাস-সিদ্ধান্ত	২০।	চ্যবন-সিদ্ধান্ত

'অইন-ই-অকবরি'তে প্রথম নয়খানি সিদ্ধান্তের নাম পাওয়া যায়।

এই ২০ খানির মধ্যে প্রথম চারিখানি আপ্তবাক্য বলিয়া খ্যাত। প্রথমখানি ব্রহ্মকর্ত্তৃক জগতে প্রকটিত। দ্বিতীয়খানি সূর্য্য, তৃতীয়খানি চন্দ্র এবং চতুর্থখানি বৃহস্পতি দ্বারা প্রকটিত। অপরগুলি মানব-প্রণীত বলিয়া কথিত আছে। সিদ্ধান্তগুলির দশম সংখ্যা ব্যাস-সিদ্ধান্ত। ১০ সংখ্যক সিদ্ধান্ত হইতে ২০ সংখ্যক পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের অস্তিত্ব আছে কি না, জোর করিয়া বলা যায় না। শোনা যায়, কাশীধামে ভৃগুসিদ্ধান্তের পাণ্ডুলিপি আছে। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, গণিতশাস্ত্রের লেখকদিগের উদ্ধৃত বাক্যের মধ্যে ইহাদের নাম স্থান পাইয়াছে মাত্র।

পূর্ব্বোল্লিখিত-তালিকার অন্তর্গত না হইলেও ভাস্করাচার্য্যের **সিদ্ধান্ত-শিরোমণি** (১১৫০ খৃঃ) একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তখানি **ব্রহ্মগুপ্ত** দ্বারা সুসংস্কৃত হইয়া ৫৩০—৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে **ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত** নামে পুনঃপ্রচারিত হইয়াছিল। সূর্য্য-সিদ্ধান্তের টীকাকার **নৃসিংহ** বলেন যে, ব্রহ্মগুপ্তের নিয়মাবলী **বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর** পুরাণ হইতে

সংগঠিত (ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ইহারই অন্তর্গত)। শোনা যায় যে, ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ব্বেও এই নামে অন্য গ্রন্থ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ **শাকল্যের** ব্রহ্মসিদ্ধান্তের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। **পঞ্চপদ্ধতির** মধ্যে এক পদ্ধতি হইতেই বরাহমিহির নাকি তাঁহার **পঞ্চসিদ্ধান্তিকা** সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

হিন্দুগণ সাধারণতঃ যুগকল্পাদি নির্ণয় তিনখানি প্রধান জ্যোতিষ গ্রন্থাবলম্বনে করিয়া থাকেন। সে তিনখানি গ্রন্থের নাম **সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত** ও **আর্য্যসিদ্ধান্ত।** বেণ্ট্‌লি সাহেবের মতে সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৫৩৮ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ১০৬৮ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ এবং আর্য্যসিদ্ধান্ত ১৩২২ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থ। দক্ষিণদেশে আর্য্যসিদ্ধান্তের এবং আর্য্যাবর্ত্তে সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনাই প্রসিদ্ধ।

হিন্দুশাস্ত্রের কালবিভাগ সকলে গ্রন্থে সমান নয়। আমরা নিম্নে নানা পুস্তক হইতে কালবিভাগ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

কাল দ্বিবিধ—**খণ্ড** (ইহা **জীবন্তক**) এবং **অখণ্ড** (ইহা মানবজ্ঞানের বিষয়)।

এই খণ্ডকাল আবার দুই প্রকার—**মূর্ত্ত** (স্থূল) ও **অমূর্ত্ত** (সূক্ষ্ম)। মূর্ত্ত কালের আদিবিভাগের নাম "**প্রাণ**"=৪ সেকেণ্ড। অমূর্ত্ত কালের আদিবিভাগের নাম "**ত্রুটি**"।

জ্যোতিষশাস্ত্রে মূর্ত্ত কালই ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণতঃ ৬০ দিয়া সকলকে ভাগ করিতে হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও অন্যান্য জ্যোতিষশাস্ত্র মতে দিনের বিভাগ নিম্নে দেওয়া হইল:—

৬০ ক্ষণ=১ লব
৬০ লব=১ নিমেষ
৬০ নিমেষ=১ কাষ্ঠা
৬০ কাষ্ঠা=১ অতিপল
৬০ অতিপল=১ বিপল=৩, ৪ সেকেণ্ড (ইং)
৬০ বিপল=১ পল=২৪ সেকেণ্ড (ইং)
৬০ পল=১ দণ্ড=২৪ মিনিট (ইং)
৬০ দণ্ড=১ অহোরাত্র
৬০ অহোরাত্র=ঋতু

ভারতীয় কাল-নিরূপণ-পদ্ধতি বড়ই দুরূহ। প্রণালীভেদ সত্ত্বেও বর্ষবিভাগ-প্রণালী অনুসারে অব্দগুলিকে চারিটী প্রধান শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

১। মাসিক বিভাগীয়াব্দ (Eras founded on sideral divisions of the months).
২। চান্দ্র সৌরাব্দ (Eras founded on Luni-Solar computations).
৩। গ্রহাবৃত্তিগণনাব্দ (Eras reckoned on cycles).
৪। মুসলমানি অব্দ (Mahomedan Eras).

হিন্দুরা সৌরমান দ্বারা যুগাদি গণনা করিয়া থাকেন। এক নক্ষত্র হইতে সমুদায় রাশি-চক্র (Zodiac) ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যের পুনরায় সেই নক্ষত্রে প্রত্যাগমন কালের নাম "**রবিবর্ষ**"। এক সূর্য্যোদয় হইতে পর সূর্য্যোদয়ের যে কাল, তাহার নাম **সাবন দিন** বা **কুদিন**। ক্রান্তিবৃত্তের এক অংশ গমন করিতে সূর্য্যের যে সময় লাগে, তাহার নাম **সৌরদিবস**। এক রাশি সঞ্চরণ কালের নাম **সৌর মাস**। ফলিত জ্যোতিষগণনায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা চান্দ্র দিবস।

৩০ সাবনদিন = ১ সাবন মাস।

১২ সাবন মাস = ১ সৌর বর্ষ।

৩৬০ সৌর (মানব) বর্ষ = ১ দিব্য বর্ষ।

১ সৌর বর্ষ = ১ দিব্য দিন।

৩৬০ দিব্য অহোরাত্রি = ১ দিব্য বর্ষ।

১২০০ দিব্য বর্ষ = ১ মহাযুগ = ৪৩২০০ রবিবর্ষ।

৭১ মহাযুগ = ১ মন্বন্তর।

১৪ মন্বন্তর = ১ কল্প = ৪৩২০০০০১০০ রবিবর্ষ।

২ কল্প = ১ ব্রাহ্ম অহোরাত্রি।

৩৬০ ব্রাহ্ম অহোরাত্রি = ১ ব্রাহ্মবর্ষ।

৫০ ব্রাহ্মবর্ষ = ১ পরার্দ্ধ।

২ পরার্দ্ধ = ১ পরা, মহাকল্প বা ব্রাহ্ম আয়ু।

আর্য্য-গণনাসারে ৪৩২০০০০০০০ রবিবর্ষে এক **কল্প** হয়। ব্রহ্মার এক দিনের নাম **কল্প**। **কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,** এই চারি যুগে এক **মহাযুগ** হয়। এক কল্পে ১০০০ **মহাযুগ** ও ১৪ **মন্বন্তর** থাকে। ব্রহ্মার পরমায়ু ১০০ বর্ষ। এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিন, এক কল্পে তাঁহার এক রাত্রি। এইরূপ তাঁহার ৩৬০ অহোরাত্রি লইয়া তাঁহার এক বৎসর। এইরূপ ১০০ বৎসর ব্রহ্মার আয়ু। এই দীর্ঘতম কালের নাম—"পর"। বর্ত্তমান কল্পের প্রারম্ভে ব্রহ্মার আয়ুর এক পরার্দ্ধ চলিয়া গিয়াছে। এখন দ্বিতীয় পরার্দ্ধের "**বরাহ**" নামক আদিকল্প চলিতেছে। এই বরাহকল্পের ছয় মন্বন্তর শেষ হইয়াছে। এখন, বৈবস্বত মনুর সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। বৈবস্বত মন্বন্তরে ২৮ কৃত (সত্য), ২৮ ত্রেতা, ২৮ দ্বাপর অতীত হইয়াছে। এখন, ১৮শ কলিযুগ চলিতেছে। অধুনা ২৮শ মন্বন্তরের বর্ত্তমান বরাহ কল্পের ৪৫৭শ বর্ত্তমান যুগ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ১ কল্প। প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১ মহাযুগ থাকে; সুতরাং ১৪ মন্বন্তর ৯৯৪ (১৪ × ৭১) মহাযুগের সমান। ১০০০ মহাযুগে কল্প হইবে। কাজেই এক কল্প হইতে আরও ছয় মহাযুগের দরকার। এই ছয় মহাযুগকে এরূপ ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় যে, প্রত্যেক প্রথম মন্বন্তরের পূর্ব্বে এক কৃতযুগ (= ০.৪ মহাযুগ) পরিমিত

একটী 'সন্ধ্যা' এবং প্রত্যেক মন্বন্তরের পরে সম-পরিমিত 'সন্ধ্যাংশ' (১৫ × ০.৭ = ৬ মহাযুগ) থাকিবে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে (১।১৮) মন্বন্তরের সন্ধ্যা বলিলে একটী জলপ্লবকে বুঝায়। বৈবস্বত, স্বায়ংভুব, সংবরণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ মনুর নামের কারণ স্থির করিবার জন্ত বোধ হয় মন্বন্তরের এই পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। চতুর্দ্দশ মনুর নাম পূর্ব্ব হইতে বৈদিক গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। তখন হইতেই লোকে ভিন্ন ভিন্ন মনু মানিয়া আসিতেছে। পৌরাণিকগণ এই সমস্ত বিশ্বাসকে বিধিবদ্ধ করেন। দেব-পরিমাণে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সমেত যুগকাল এইরূপ—

যুগ	সন্ধ্যা	সন্ধ্যাংশ	যুগকাল	সমষ্টি
সত্য	৪০০	৪০০	৪০০০	৪৮০০
ত্রেতা	৩০০	৩০০	৩০০০	৩৬০০
দ্বাপর	২০০	২০০	২০০০	২৪০০
কলি	১০০	১০০	১০০০	১২০০
				১২,০০০

"এবং দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে।"

ইহাই মহাভারতে চতুর্যুগ-পরিমাণ। মনুস্মৃতিতেও এইরূপ বর্ষের উল্লেখ আছে।

পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু আমরা পৃথিবীর সে গতি অনুভব করিতে পারি না। গতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কোন চালিত বস্তুতে আরোহণ করিয়া যেমন অচল বস্তুকে চালিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ আমরা সচল পৃথিবীর উপর থাকিয়া সূর্য্যের গতি অনুভব করিয়া থাকি। এই নিয়মে প্রাতঃকালে সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে উদয় ও সায়ংকালে অস্ত আমরা দেখিয়া থাকি। যে পথ দিয়া সূর্য্যকে নভোমণ্ডলে গমনাগমন করিতে দেখা যায়, সেটী প্রকৃতপক্ষে ভূকক্ষ বা অয়নমণ্ডল। অয়নমণ্ডল সম্পূর্ণ গোল নয়। ইহার উত্তর-দক্ষিণে কিছুদূর ব্যাপিয়া যে আর একটী কল্পিত চক্র ইহাকে পরিবেষ্টন করে, তাহাকে রাশিচক্র বলে। রাশিচক্র ও অয়নমণ্ডল উভয়ে ১২ ভাগে ও ৩৬০ অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকেই রাশি বলে এবং রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ। এই বারটী রাশির নাম খগোলবিদ্যার শৈশবাবস্থায় দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জের নামানুসারেই হইয়াছিল।

৬৬ তারকা সংযুক্ত মেষের আকারের মত যে নক্ষত্রপুঞ্জ গগনমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম মেষ নক্ষত্রপুঞ্জ। ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ রাশিচক্রের যে ভাগে অবস্থিতি করে খগোলবিদ্যার ঐ ভাগের নাম মেষরাশি।

এইরূপ বৃষের আকারের স্থায় নভোমণ্ডলে যে ১৪১টী তারকা সংযুক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে বৃষনক্ষত্রপুঞ্জ বলে। ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ রাশিচক্রের যে ভাগে অবস্থিতি করে, তাহার নাম বৃষরাশি। এইরূপ ৮৫ তারকাসংযুক্ত স্ত্রীপুরুষাকারসদৃশ মিথুন নক্ষত্রপুঞ্জ রাশিচক্রের যে ভাগে অবস্থিতি করে, তাহা মিথুনরাশি। এইরূপে কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীনরাশির নামকরণ হইয়াছে। কর্কটরাশিতে ৮৩ তারকাসংযুক্ত

কর্কট নক্ষত্রপুঞ্জ, সিংহ রাশিতে ৯৫ তারকা সংযুক্ত সিংহ নক্ষত্রপুঞ্জ। কন্যায় ১১০ তারকা সংযুক্ত কন্যা নক্ষত্রপুঞ্জ, তুলায় ৫১ তারকা সংযুক্ত তুলা নক্ষত্রপুঞ্জ, বৃশ্চিকে ৪৪ তারকাসংযুক্ত বৃশ্চিক নক্ষত্রপুঞ্জ, ধনুতে ৬৯ তারকাসংযুক্ত উপরের অর্দ্ধেক নরাকার এবং নীচের অর্দ্ধেক ঘোটকাকার ধনুর্ধারীর ন্যায় ধনুনক্ষত্রপুঞ্জ। মকররাশিতে ৫১ তারকাসংযুক্ত মকরাকার ছাগমুখ সদৃশ মকর নক্ষত্রপুঞ্জ। কুম্ভে ১০৮ তারকাযুক্ত ঘটধারী মানবাকার কুম্ভ নক্ষত্রপুঞ্জ, মীনে ১১৩টী তারকাসংযুক্ত পরস্পর-পুচ্ছাভিমুখ মীনাকার মীন নক্ষত্রপুঞ্জ।

প্রসিদ্ধি আছে যে, এই দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জ অচল, ইহাদের প্রায় ৩ বিকলা করিয়া একটী বার্ষিক গতি আছে।

রাশিচক্র নভোমণ্ডলের মধ্যখণ্ডে অবস্থিতি করে। ঐ চক্রের উত্তর-দক্ষিণে আরও অসংখ্য তারকা আছে, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে সপ্তর্ষি, ধ্রুবতারা প্রভৃতি কয়েকটী নক্ষত্র ছাড়া অন্য কোন নক্ষত্রের উল্লেখ নাই।

এ ছাড়া প্রাচীন জ্যোতিষে ২৭টী নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা রাশিচক্রের আরও সূক্ষ্মবিভাগ আছে।* প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। সুতরাং দেখা যাইতেছে $২\frac{১}{৪}$ নক্ষত্রে একএকটী রাশি হয়। এই ২৭টী নক্ষত্রের মধ্যে বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা, পূর্ব্বভাদ্র, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, উত্তর-ফল্গুনী ও চিত্রা

* পুরাণে লেখা আছে যে দক্ষ প্রজাপতির ২৮টী কন্যা ছিল। ইহাদের মধ্যে তিনি সতীনামে কন্যাকে মহাদেবের সহিত বিবাহ দেন। বাকী ২৭টি কন্যার বিবাহ সোমের সহিত হইয়াছিল। দক্ষ প্রজাপতি এক সময়ে একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে তিনি প্রধান প্রধান দেবতা, ঋষি, মুনি প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। মহাদেব কিন্তু তাঁহার পত্নী সতীর বিশেষ আগ্রহে তাঁহাকে দক্ষযজ্ঞে পাঠাইতে বাধ্য হন। সতী দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হইলে তিনি যে শুধু পিতৃকর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়াছিলেন তাহা নয়, দক্ষ প্রজাপতি শিবের যারপরনাই নিন্দাবাদ করেন। ইহাতে সতী মনোদুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। †

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্রেনাণ্ড (Brenand) তাঁহার হিন্দুজ্যোতিষগ্রন্থে দক্ষযজ্ঞের একটী জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অন্যান্য জ্যোতির্বিদেরাও দক্ষযজ্ঞ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। জ্যোতিষমত অনুসারে দক্ষপ্রজাপতি—রাশিচক্র। ইঁহার ২৮টী কন্যা ছিল। ইঁহার ২৮টী কন্যা ২৮টী নক্ষত্র। তাঁহাদের মধ্যে সতী অর্থাৎ অভিজিৎ নক্ষত্রের সহিত মহাদেব অথবা মহাকালের পরিণয় হয়। সতীর প্রাণত্যাগ অর্থে বুঝিতে হইবে অভিজিৎ নক্ষত্রের নক্ষত্রগণনা হইতে বিচ্যুতি। ইহার পর হইতে ২৭টি নক্ষত্র লইয়া জ্যোতির্গণনা চলিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বকালে কার্ত্তিকমাস হইতেই বর্ষারম্ভ হইত। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে বর্ষারম্ভের সূত্রপাত হয়। এই বর্ষপরিবর্ত্তন ব্যাপার স্মরণার্থ সূর্য্য যে রাশিতে মাঘমাসে অবস্থিতি করে, সেই রাশির কল্পিত মুখ ছাগমুখ করা হয়। পূর্ব্বে এই মুখ মকর মুখ ছিল। আবার এই ঘটনার পর হইতে অভিজিৎ নক্ষত্রকে আর গণনার মধ্যে আনা হয় না। এই জন্য অভিজিৎ নক্ষত্র পরিত্যক্ত। পরবর্ত্তী গণনায় ২৭টী নক্ষত্র অবলম্বনে জ্যোতিষের গণনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

† এই পৌরাণিক গল্পের নানা ধরণ প্রচলিত আছে।

এই ১২টী নক্ষত্র হইতে বৈশাখ প্রভৃতি ১২ মাসের নাম হইয়াছে। যেমন বিশাখা হইতে বৈশাখ, পূর্ব্বভাদ্রপদ হইতে ভাদ্র, মৃগশিরা হইতে মার্গশিরা বা অগ্রহায়ণ। আদিম অবস্থায় প্রায় সকল জাতিই চান্দ্রমাসে বৎসর বিভাগ করিতেন। হিন্দুদের মধ্যেও চান্দ্রমাস প্রচলিত ছিল। এখনও ভারতের অনেক স্থানে চান্দ্রমাসের প্রচলন আছে। আমাদের দেশে সৌরমাস প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে চন্দ্রের গতি ও স্থিতি অনুসারে মাস নিরূপিত করিবার নিয়ম ছিল। যেমন বিশাখা নক্ষত্রে চন্দ্র উপস্থিত হইলে পূর্ণিমা হইত বলিয়া বৈশাখ মাসের নাম বৈশাখ।

জ্যোতিষের শেষাবস্থায় অভিজিৎ নক্ষত্র লইয়া ২৮টী নক্ষত্র প্রথমে স্থির হইয়াছিল। ঐ নক্ষত্রগুলির প্রত্যেকের পরিমাণ ১২ অংশ, ৩৪ কলা, ১৭ বিকলা ও কিঞ্চিৎ অধিক ৮ অনুকলা। এত ভগ্নাংশ লইয়া গণনা দুরূহ বলিয়া বোধ হওয়ায়, কালে অভিজিৎ নক্ষত্র পরিত্যক্ত হয়।

ঋগ্বেদের সময়ে অব্দ-নিরূপণের ব্যবস্থা ছিল। তখন ৩৬০ দিনে বৎসর ধরা হইত। বার মাসে বৎসর পূর্ণ হইত। মাসও ৩০ দিনে ছিল। দেখা যাইতেছে (Synodic) চান্দ্র বর্ষ অপেক্ষা বৈদিক বর্ষ ৬ দিন বেশী ছিল। আর সৌর বর্ষ অপেক্ষা প্রায় সওয়া পাঁচ দিন ছোট ছিল। দেখা যায় সৌর ও সাধারণ বর্ষের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বৈদিক যুগে একটা চেষ্টা হইয়াছিল। ফলে একটী মলমাস বা অধিমাস (intercalary month) ত্রয়োদশ মাস বলিয়া স্বীকৃত হয়। সংহিতায় এই পদ্ধতির বিশেষ উৎকর্ষ হইয়াছিল। বর্ষ ও ঋতুর ঐক্য-সাধনের জন্য পঞ্চসংবৎসর চক্রের (Cycle of five years) সৃষ্টি হয়। এই সংবৎসরচক্রের দ্বিতীয় ও পঞ্চম বর্ষে অতিরিক্ত একটী মাস (অধিমাস) ধরিয়া এইরূপ করা হইয়াছে।

যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের সময়-নির্দ্দেশ ভারতবর্ষে সৌরবর্ষ অপেক্ষা চান্দ্রবর্ষের উপরই বেশী নির্ভর করে। এই নির্দ্দেশপ্রথা ঋগ্বেদেও স্বীকৃত হইয়াছে। চান্দ্রবর্ষের দ্বারা ঋতু নির্ণীত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কাল নির্ণয়ে চন্দ্রের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, এই তিন ঋতুই তখন প্রচলিত ছিল। পরে পাঁচ বা ছয় ঋতু স্বীকার করা হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের নামকরণের সঙ্গেও চন্দ্রের কোন সম্পর্ক নাই।

তবে মাসের নাম বলিলে চান্দ্র মাসই বুঝাইত। নভোমণ্ডলে চন্দ্রের পথ নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জের হিসাবেই ধরা হয়। ইহারই মধ্য দিয়া চন্দ্রের গতি। চন্দ্রের স্থিতি অনুসারে এই গতিকে ২৭ (পরে ২৮) ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। চীন ও আরবেরা চান্দ্র রাশিচক্র প্রস্তুত করে। তবে আমাদের চন্দ্রের স্থিতির সঙ্গে চীনেদের Sieu র কি সম্বন্ধ তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। আরবেরা তাহাদের মনাজিল (Manāzil) হিন্দুদের নিকট হইতেই লইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হিন্দুরা বাবিলোনিয়দের নিকট হইতে তাঁহাদের বর্ষগণনাবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়াছে। এটী একেবারেই ভুল ধারণা। প্রাচীন হিন্দুদের গণনার বর্ষ চান্দ্র, প্রাচীন বাবিলোনিয়দের গণনার বর্ষ সৌর। যাহা হউক, চন্দ্রের এই ভাগগুলি প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্র নামে বৈদিক পুঞ্জিকায় ব্যবহৃত। বৈদিক সাহিত্যের

কাল নিরূপণ করিতে হইলে মুখ্যভাবে ইহার সাহায্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই বলিলেই চলে। চান্দ্রমাস ছাড়া বৈদিকযুগে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুইটী পক্ষের প্রচলন ছিল। বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরে সপ্তাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদিক পঞ্চবর্ষচক্র পাঁচটী, এগুলি বর্ষে বিভক্ত। প্রত্যেক বর্ষের নাম ও অধিপতি স্বতন্ত্র। সংবৎসরের অধিপতি অগ্নি, পরিবৎসরের অধিপতি সূর্য্য, ইদাবৎসরের অধিপতি চন্দ্র, অনুবৎসরের অধিপতি ব্রহ্মা এবং উদবৎসরের অধিপতি রুদ্র। পরবর্ত্তী বৃহত্তর বর্ষচক্রকেও এইভাবে বিভাগ করা হইয়াছে।

বর্ষগণনার আরও কয়েকটী পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কল্যব্দ গণনা ও সপ্তর্ষিসংবৎ পদ্ধতি। শতবৎসরে একবার মাত্র সপ্তর্ষিগণ স্থান পরিবর্ত্তন করে। নক্ষত্রের গতি অনুসারেই এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে সপ্তর্ষি নক্ষত্রও অবস্থিত। নক্ষত্র ২৭টী; এইজন্য সপ্তর্ষিকালচক্র ২৭০০ বৎসরের। মধ্যযুগে ঐতিহাসিকেরা এই কালচক্র গণনার পদ্ধতি নিরূপণ করিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব। সাধারণের বিশ্বাস, কলিযুগের যখন আরম্ভ, তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল ৭৫ বৎসর মঘা নক্ষত্রে ছিল। বৃহস্পতিসংবৎসর বলিয়া দুইটী অব্দ-গণনাপদ্ধতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। একটী দ্বাদশবর্ষাত্মক, অপরটী ষষ্টিবর্ষাত্মক। প্রথমটীতে গ্রহের ১২ বৎসরে একবার সংক্রমণ (revolution) হয়। দ্বিতীয়টীতে গ্রহের ৫ বার চক্রগতি। ইহার প্রথম বৎসর কল্যব্দের সহিত সমান। দক্ষিণ-ভারতে এই বর্ষ সৌর বর্ষের সহিত সমান বলিয়া গণ্য করা হয়। অন্যান্য বর্ষচক্রের তেমন প্রাধান্য সাধারণের নিকট নাই। পরশুরামের ১০০০ বর্ষচক্র দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত, কিন্তু উত্তরভারতে জ্যোতিষীদের কাছে ইহা নামে মাত্র পরিচিত। ইয়ুরোপীয়েরা বলেন, বর্ষচক্রের মধ্যে ষষ্টি সংবৎসরই অত্যন্ত প্রাচীন।

বৃহস্পতি সংবৎসরের প্রত্যেক বর্ষের একটী করিয়া পৃথক্ নাম আছে। খোদিত লিপিতে এই সংবৎসরের সহিত শকাব্দ অথবা যে রাজার লিপি তাঁহার রাজ্যাঙ্ক লিখিত থাকে।

এই ষষ্টি সংবৎসরের নাম আমরা নিম্নে দিলাম :—

প্রভব	চিত্রভানু	হেমলম্ব	পরিধাবী	বিভব	স্বভানু
বিলম্বী	প্রমাদীশ	শুক্ল	তারণ	বিকারী	আনন্দ
প্রমোদ	পার্থিব	শর্ব্বরী	রাক্ষস	প্রজাপতি	ব্যয়
প্লব	অনল	আঙ্গিরস	সরজিৎ	শুভকৃৎ	পিঙ্গল
শ্রীমুখ	সর্ব্বধারী	শোভন	কালযুক্ত	ভাব	বিরোধী
ক্রোধী	সিদ্ধার্থী	যুব	বিকৃতি	বিশ্বাবসু	রৌদ্র
ধাতু	খর	পরাভব	দুর্ম্মতি	ঈশ্বর	নন্দন
প্লবঙ্গ	দুন্দুভি	বহুধান্য	বিজয়	কীলক	রুধিরোদ্গারী
প্রমাদি	জয়	সৌম্য	রক্তাক্ষ	বিক্রম	মন্মথ
সাধারণ	ক্রোধন	বিষ্ণু	দুর্ম্মুখি	বিরোধকৃৎ	ক্ষয়

(ক্রমশঃ) শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

এই প্রবন্ধের পরবর্ত্তী অংশ পৌষ মাসে যাইবে

উপহার

তুমি ভাল বাস তাই বাঁধি শত গান,
গেয়ে এত সুখ পাই। নিত্য নব সুর
কোথা হ'তে আসে কণ্ঠে, রচে সুমধুর
বিচিত্র রাগিণী কত না জানি সন্ধান।
তুমি এস বস কাছে রাখি হাতে হাত
আমারে গাহিতে বল, হৃদয় আমার
বিগলিয়া বয়ে যায় সহস্র প্রপাত
সঙ্গীতের ঝরণায়, হিমানী সম্ভার
ঝরে যথা কলস্বনে অরুণ উষার
কনক অঙ্গুলি ভরা তপ্ত পরশনে।
কত দিবা বিভাবরী কত না ঝঙ্কার
তুলেছ আমার কণ্ঠে অপূর্ব্ব নিক্কণে।
আজি তারি সুরহারা দুচারিটি বাণী
কুড়ায়ে এসেছি গাঁথি, লহ মালাখানি।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

বেদান্তে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও পুরুষকার

[৩]

আমরা গত সংখ্যায় দেখিয়া আসিয়াছি যে বেদান্তে আত্মার স্বতন্ত্রতার স্থান আছে। আমরা দেখিয়াছি যে—যাহারা মূঢ়, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, সাধারণ মনুষ্য, তাহারা আপন প্রবৃত্তি-বশে, অবশ-ভাবে চালিত হইয়া থাকে। ইহারা দেহেন্দ্রিয়াদিকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া লয়; দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মা যে স্বতন্ত্র, সে কথা ইহারা জানে না। যখন যখন যে প্রকার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, ইহারা তদনুরূপ কার্য্যে ধাবিত হয়। সুতরাং ইহারা কার্য্যের শুভাশুভ 'বিচার' করিতে সমর্থ হয় না।

শঙ্কর বলিয়াছেন—

"মূঢ়ত্বাৎ তৎপ্রাপ্তি-প্রয়োজন সাধন-বিশেষং নোপপত্তিষ্ঠতে" (কঠ—ভা, ২।৭)।

ইহারা মূঢ়; ইহারা আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্বের কোন সংবাদ রাখে না। ইহারা দেহাত্মবাদী, সুতরাং ইহাদের কর্ম্ম বিচার-বিহীন; ইহারা আত্ম-সুখার্থ, প্রবৃত্তি-বশে

চালিত। স্বাভাবিক জৈব-প্রকৃতির অবস্থাই এইরূপ। কিন্তু যাঁহারা বিবেকী, যাঁহারা আত্মার স্বতন্ত্রকর্তৃত্বে শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা আপন কল্যাণার্থ, সত্ত্বশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত, 'সাধন' অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেহেন্দ্রিয়-মনবুদ্ধি প্রভৃতিকে আপন কল্যাণ সাধনার্থ একলক্ষ্যে—এক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আত্মার স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই এই প্রকারে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, ইহা আমরা গত দ্বিতীয় সংখ্যায় আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এই সকল ব্যক্তি কি প্রকারে ক্রিয়া করিয়া থাকেন, এখন আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

ছান্দোগ্য-উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে ইঁহাদের ক্রিয়ার স্বরূপ বা Psychology of Volition অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কঠোপনিষদের ভাষ্যেও এই তত্ত্বটী বিশদীকৃত রহিয়াছে। চিত্তের স্বাভাবিক মালিন্য বা প্রবৃত্তি-বশ্যতা দূর করিবার জন্য, সত্ত্বের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত কি প্রকারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; কি প্রকারে একটি মহৎ ফলের উদ্দেশে আপনার জীবনের মুখ্য প্রয়োজন (The highest End) বাছিয়া লইয়া সাধন অবলম্বন করিতে হইবে,—ইহাই ধর্ম্মজীবনগঠনের মূল ভিত্তি। এই বিচার-প্রক্রিয়ায় আত্মার স্বতন্ত্রতা ও পুরুষকার সুস্পষ্টরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

শঙ্কর এই তত্ত্বটী এই প্রকারে বলিয়া দিয়াছেন—

যাহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর এবং যাহা আত্মার প্রকৃত কল্যাণকর—এই দুইটী, পরস্পর মিশ্রিতভাবে মনুষ্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়। যাহা আপাততঃ ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রদ, তাহার ফল এবং যাহা আত্মার প্রকৃত-কল্যাণ-প্রদ, তাহার ফল—এই উভয়প্রকার ফলের মধ্যেও বিশেষ ভেদ আছে। যাহারা মূঢ়, তাহারা যেটী প্রকৃত কল্যাণকর সেটীকে বাছিয়া লইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা উভয়ের গুরু-লঘু বিচার করিতে সমর্থ হন। উভয়ের মধ্যে যেটী গুরু, যেটী সারভূত, যেটী প্রকৃত কল্যাণ-প্রদ—সেইটীকে ইহাঁরা অপরটী হইতে, বিচার-প্রয়োগে, পৃথক্ করিয়া লন এবং সেইটীকেই গ্রহণ করেন। অপরটীকে ত্যাগ করেন। মূঢ়, প্রবৃত্তি-পরায়ণ লোকেরা এ প্রকার বিচার করিতে পারে না; পৃথক্ করিতেও পারে না।*

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যরূপে এই যে বিষয়-বিভাগ, ইহাকে শঙ্কর "সংকল্প" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"কোন্‌টী কর্ত্তব্য, কোন্‌টী অকর্ত্তব্য,—এইরূপ নির্দ্ধারণ করিবার সামর্থ্যের নাম 'সংকল্প'। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইলে, সেইটী করিবার ইচ্ছা উপস্থিত হয়" †

---

* মূঢ়ত্বাৎ তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজন সাধনবিশেষং নোপতিষ্ঠতে। (কঠ, ২।৭)

সাধনতঃ ফলতশ্চ মন্দবুদ্ধীনাং ব্যামিশ্রীভূতেইব মনুষ্যমেতঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ।

অতো হংসইব অম্ভসঃ পয়ঃ .....মনসা সম্যগালোচ্য, গুরু-লাঘবং বিবিনক্তি—পৃথক্ করোতি ধীরঃ। (কঠ, ১।২.২)।

† সংকল্পোহি অন্তঃকরণবৃত্তিঃ। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিভাগেন সমর্থনং। বিভাগেন হি সমর্থিতে বিষয়ে, চিকীর্ষাবুদ্ধিঃ মনস্তাননন্তরং ভবতি (ছা, ৭।৪)।

শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ে মিশামিশিভাবে উপস্থিত হইল। কোন্‌টী গ্রহণ করিলে ফল প্রকৃত মঙ্গলপ্রদ হইবে বা ফল অমঙ্গল-জনক হইবে,—এইরূপ তুলনা করাই হইতেছে প্রথম অঙ্গ। তৎপর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ দ্বিতীয় অঙ্গ। তৃতীয় অঙ্গ—যে বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলে, তাহা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা। শঙ্করের ভাষায় ইহা "চিকীর্ষা বুদ্ধি"। আমরা এ স্থলে শঙ্করের কথায় তিনটী অঙ্গ পাইতেছি।

ইহার পরের অঙ্গ-গুলির বিবরণ শঙ্কর এইপ্রকারে দিতেছেন—

যে কার্য্যটী করিতে যাইতেছ, উহার ফল দূর-ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে, তদ্বিষয়ে বিচার। এই ভবিষ্যৎবিচারে, অতীতেরও আবশ্যকতা আছে। এইটী চতুর্থ অঙ্গ। অতীতের সঙ্গে তুলনা করিয়া, কার্য্যের এই যে ভবিষ্যৎ ফলের বিচার, ইহাতে মনঃসংযোগেরও বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এই মনের একাগ্রতাকে শঙ্কর "ধ্যান" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ কর্ত্তব্যই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য,—ইহাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন; এই প্রকারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিলেই ক্রিয়ার লক্ষ্য সুসিদ্ধ হইতে পারিবে,—ইহা ধ্যানবলেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। শঙ্কর এ স্থলে বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহারা সংসারের ক্ষুদ্র বস্তুতে আসক্তচিত্ত, তাহারা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয়। যাহারা ধ্যান-বলে চিত্ত স্থির করিয়া লইতে সমর্থ, তাহারাই কেবল কর্ত্তব্যের প্রকৃত লক্ষ্যে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতে পারেন।

এই প্রকারে শঙ্করাচার্য্য কর্ম্মের পাঁচটী প্রধান অঙ্গের কথা বলিয়া দিয়াছেন।

তারপর—

"তথা কর্ম্মানি কুর্ব্বীয় ইতি "চিকীর্ষা-বুদ্ধিং" কৃত্বা ...ইচ্ছেয়েতি প্রাপ্তীচ্ছাং কৃত্বা, তৎ-প্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানেন......প্রাপ্নোতি"।

ইহার পরেই 'উপায়ানুষ্ঠান'। কি উপায় অবলম্বন করিলে, মৎ সংকল্পিত কর্ত্তব্যকর্ম্মটী সম্পাদিত হইতে পারে? এই উপায় বা সাধন অবলম্বনই—ষষ্ঠ অঙ্গ। কঠ-ভাষ্যেও, এই উপায় বা সাধন অবলম্বনের কথা উক্ত হইয়াছে।*

যাহারা সাধারণ লোক, যাহারা মূঢ় অবিবেকী, তাহারা ত প্রবৃত্তি-চালিত; তাহারা ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আশায় অবশ-ভাবে, প্রবৃত্তিদ্বারা (Mechanical Causality) শাসিত। তাহারা আত্মার স্বাধীন কর্ত্তৃত্বের, বিচার সামর্থ্যের (Free Causality) কোনই খবর রাখে না। এই জন্যই, ইহাদের নিকটে, জীবনের লক্ষ্য যে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত, ইহাদের কোন 'সাধন' বা উপায় অবলম্বন করা আদৌ সম্ভব হয় না। ইহারা কেবলমাত্র প্রবৃত্তির অধীন হইয়া, ক্ষুদ্রসুখাশায়, অবশভাবে কর্ম্ম করিয়া যায়। কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি আপন পুরুষকারের বলে, যথোপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা আত্মার প্রকৃত কল্যাণে উপস্থিত হন। এই স্থলেই আত্মার পুরুষকারের ও স্বাধীন কর্ত্তৃত্বের প্রমাণ আসিয়া পড়িতেছে।

---

* তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজন সাধনবিশেষঃ শাস্ত্রীয়ঃ সাম্পরায়ঃ। স চ অবিবেকিনং প্রতি ন ভাতি...... পুত্র-পশ্বাদিপ্রয়োজনেষু আসক্তমনসং"।

আমরা উপরে দেখিয়া আসিলাম যে, জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বিচার বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বুদ্ধিই, বিচার দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ। বিচার বুদ্ধির যেমন আবশ্যকতা আছে, শঙ্কর—'সুখ'লাভেরও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়তার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"সাপিকৃতিঃ, যদা সুখংলভতে, সুখং নিরতিশয়ং লব্ধব্যং ময়েতি মন্যতে, তদা ভবতি"।

মূঢ় ব্যক্তির প্রবৃত্তি যেমন ক্ষুদ্র বিষয়-সুখ দ্বারা চালিত হয়, বিবেকী ব্যক্তি তাদৃশ সুখ ইচ্ছা করিতে পারেন না। যে সুখ নিরতিশয়, যাহা পরম মঙ্গলকর, তদুদ্দেশেই ইহাঁরা ক্রিয়া করিয়া থাকেন। মূঢ় লোকেরা বিষয়-সুখে মগ্ন হয়; কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি এরূপ ক্ষুদ্র সুখের আশায় জীবনের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লন না। নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তিই ইহাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই আনন্দলাভের উদ্দেশ্যেই, ইহাঁরা ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। এবং তন্নিমিত্ত উপায় বা সাধন অবলম্বন করেন। এই প্রকারে শঙ্করাচার্য্য জীবনের লক্ষ্য সাধনে, বুদ্ধি ও সুখ—উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা সংস্থাপিত করিয়াছেন।

এখন আমরা জীবনের লক্ষ্য-প্রাপ্তির সেই সকল উপায় বা সাধন সম্বন্ধে বেদান্তের সিদ্ধান্ত কিরূপ, তাহাই সংক্ষেপে দেখিতে অগ্রসর হইব। কিন্তু সাধনগুলির কথা বলিবার পূর্ব্বে, একটী প্রয়োজনীয় তত্ত্বের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

পাঠক দেখিবেন, তৈত্তেরীয় উপনিষদে ব্রহ্মকে "সুকৃত" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুকৃত শব্দটীর সাধারণ অর্থ—পুণ্য। এই "সুকৃত"-ব্রহ্মলাভের উদ্দেশ্যে বিবেকী ব্যক্তি, আপনার চিত্তের উৎকর্ষ সাধনার্থ, উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যাঁহার সত্ত্ব বা চিত্তের যতদূর উৎকর্ষতা লাভ হয়, তাঁহার চিত্তে ততদূর জ্ঞান-সুখ-ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

শঙ্করের নিজের উক্তি শুনুন্—

"উক্তানাং উপাধীনাং শুদ্ধিতারতম্যাৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-সুখরূপ-শক্তীনাং তারতম্যরূপা বিশেষা ভবন্তি।...তৈরেকরূপস্য আত্মনঃ মনুষ্যাদিহিরণ্য গর্ভান্তিষু "আবির্ভাব-তারতম্যং" শ্রূয়তে"॥

আমাদের চিত্ত (সত্ত্ব) মলিন। উহা রজঃ ও তমঃ দ্বারা কলুষিত। ক্রিয়া-বলে, সাধন-প্রভাবে, এই চিত্ত ক্রমেই বিশুদ্ধ হইতে থাকে। মনুষ্য-প্রকৃতিও ক্রমে ধর্ম্ম-পরায়ণ হয়। যতই বিশুদ্ধ হইতে থাকে, ততই চিত্তে আনন্দ ফুটিয়া উঠিতে থাকে। চিত্তের উৎকর্ষতার তারতম্যে, আনন্দ-অভিব্যক্তির তারতম্য হয়। এই প্রকারে যতই চিত্ত সাধন-প্রভাবে পরিশুদ্ধ হয়, ততই উহার শক্তি নির্ম্মল হইতে থাকে। রজঃ ও তমঃ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় চিত্তের শক্তিগুলি সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে আনন্দেরও অভিব্যক্তি হইতে পারিতেছে না। এই রজঃ ও তমঃ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায়, চিত্তের কামনাগুলিও নিতান্ত নিকৃষ্ট, মলিন ও বিষয়াভিমুখী থাকে। কিন্তু যতই যাহার চিত্ত পরিশুদ্ধ, ততই তাহার কামনাও পরিশুদ্ধ ও উন্নত হয়। চিত্তের এই কামনা যখন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়, তখন কামনা আর ক্ষুদ্র বিষয়-সুখে ধাবিত হয় না। তখন কামনাও বিশুদ্ধ, সত্ত্বপ্রধান হইয়া উঠে; রজ ও তমের আচ্ছাদন বিলুপ্ত হইয়া যায়।*

* শঙ্কর বলিয়াছেন—আমাদের ইন্দ্রিয়ের বোধ কেবল বর্ত্তমানকালে আবদ্ধ। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি—

এই বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান কামনাকে, ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে, "সত্যাঃ কামাঃ" বলা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভের কামনা এইরূপ বিশুদ্ধ ও সত্য। এই বিশুদ্ধ সত্য কামনাকে আমরা, Kant এর ভাষায়, Ideas of Reason বলিতে পারি।†

এই বিশুদ্ধ, সত্য 'কাম' গুলি (Constitutive Principles) রজঃ ও তমঃ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায়, প্রস্ফুট হইতে পারিতেছে না—পূর্ণ বিকাশ পাইতে পারিতেছে না। সংসারের যাবতীয় পদার্থ, বৃক্ষ-লতা-মনুষ্যাদি তাবৎ বস্তু,—এই সকল 'সত্যকামের'ই অভিব্যক্তি। এই "কামাঃ" বা ideas গুলি ব্রহ্মেরই সঙ্কল্প-শক্তি। ব্রহ্মেরই সঙ্কল্প বা কাম, সংসারে রজঃ ও তমঃ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হইতেছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে শঙ্করাচার্য্য, ব্রহ্মের 'কাম' বা Ideas গুলির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ব্রহ্মের সঙ্কল্পবশতঃ যখন জগৎ-সৃষ্টির কথা বর্ণিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মেরও 'চিত্ত' বা 'সত্ত্ব' আছে, বুঝিতে হইবে। কেননা চিত্ত ব্যতীত, সঙ্কল্প বা কামের উদয় অসম্ভব। এই জন্য, "নিরতিশয় সত্ত্ব" বলিয়া মায়াশক্তি, গীতায় শঙ্করকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সত্ত্বে রজ ও তমের মালিন্য নাই; ইহা নিতান্ত বিশুদ্ধ। এই কামনাগুলি, —ব্রহ্মকে পরিচালিত করিতে পারে না; ব্রহ্মই ইহাদিগের চালক বা নিয়ন্তা। আমাদের কামনা যেমন আমাদিগকে বশীভূত করিয়া লয়, ব্রহ্ম-কামনা সেরূপ নহে। শঙ্করের বর্ণনা শুনুন্—

"কাময়িতৃত্বাৎ অস্মদাদিবৎ অনাপ্তকামত্বংচেৎ?
ন; স্বাতন্ত্র্যাৎ। যথা অন্যান্ পরবশীকৃত্য
কামাদিদোষাঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি, ন তথা ব্রহ্মণঃ
প্রবর্ত্তকাঃ কামাঃ। কথং তর্হি? সত্য-জ্ঞান-লক্ষণাঃ;
স্বাত্মভূতত্বাৎ বিশুদ্ধাঃ। ন তৈর্ব্রহ্ম প্রবর্ত্ত্যতে।...
স্বাত্মনোঽনন্যাঃ। সোঽকাময়ত, স আত্মা"।

ব্রহ্ম,—এই 'কাম' হইতে স্বতন্ত্র ও কামের 'অধিষ্ঠান' বলিয়াই, বেদান্তে ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' "তুরীয়" শব্দেও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম—এই সংকল্প বা কামনার প্রবর্ত্তক, প্রেরক, নিয়ন্তা। নিরতিশয় বিশুদ্ধ সত্ত্বের (চিত্তের), এই সকল কামনাও—নিরতিশয় বিশুদ্ধ। আমরা সাধন-বলে, আমাদের চিত্তেরও মালিন্য দূর করিতে সমর্থ। যতই আমাদের সত্ত্বোৎকর্ষ হইতে থাকিবে, ততই কামনাও বিশুদ্ধ হইতে থাকিবে। ব্রহ্ম-সত্ত্বই আমাদের সাধনার চরম-লক্ষ্য। তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে বর্ণিত

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালে বদ্ধ। কিন্তু এই বুদ্ধি যখন বিশুদ্ধ, সত্ত্বপ্রধান হয়, তখন বুদ্ধি—দেশ ও কালের গণ্ডীর অতীত হইয়া যায় (ছাঃ; ৮।১২।৫)।

† সাধন বলে যখন বুদ্ধির রজ ও তমের মলিনতা দূর হয়, তখন বুদ্ধি এইরূপ হয়—"সমস্ত মৃদিতদোষং (Pure Reason) সুক্ষ্মব্যবহিত সর্ব্বোপলব্ধিকরণং নৈবচক্ষুঃ"। [Dr. Roy's "Neglected aspects of Kant's Philosophy" দেখুন]।

আছে যে, বিদ্যা ও জ্ঞান প্রভাবে সাধকের চিত্তের এত দূর উৎকর্ষ হইতে পারে যে, সেই বিশুদ্ধ চিত্ত, ঠিক্ হিরণ্যগর্ভের চিত্তের ন্যায় বিশুদ্ধ হয়। এই চিত্ত আনন্দও বিপুলীকৃত হইয়া উঠে। আমরা যতই পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তাদৃশ কর্ম্মের মুখ্য লক্ষ্য —সেই পরম-সুকৃত ব্রহ্মবস্তুই। এই "সুকৃত"কে—Absolute Good বলিয়া অনুবাদ করিলে অসঙ্গত হইবে না। শঙ্কর বলিয়াছেন -

"পুণ্যরূপেণাপি তদেব ব্রহ্ম কারণং, "সুকৃত" মুচ্যতে। সর্ব্বব্যাপিত্বু ফলসম্বন্ধাদিকারণং সুকৃতশব্দবাচ্যং প্রসিদ্ধংলোকে। যদি পুণ্যং যদিবা অন্যৎ, সা প্রসিদ্ধি নিত্যে চেতনাবৎকারণে সতি উপপদ্যতে"।

ব্রহ্ম-সত্ত্ব যেমন বিশুদ্ধ * আমাদের সত্ত্বকেও (চিত্তকে) তদনুরূপ বিশুদ্ধ করিতে যত্ন লইতে হইবে। সত্ত্বের উৎকর্ষসাধনই ক্রিয়ার একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য হইবে। আমাদের চিত্ত, রাগ-দ্বেষ দ্বারা কলুষিত; বিষয়াকাঙ্ক্ষা দ্বারা জড়িত; এবং উহা তুচ্ছ সুখলাভার্থ নিয়ত ধাবিত। চিত্তের এই সকল স্বাভাবিক মালিন্য দূর করিয়া দিতে হইবে। প্রথম সংখ্যায় আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, আমাদের চিত্তের 'স্বভাবই' এই যে, উহা বিষয়াভিমুখী, বহির্মুখ এবং স্বার্থচালিত। চিত্তের এই স্বাভাবিক গতি, এই বহির্মুখীনতা ও বিষয়-প্রবণতা ঘুরাইয়া লইয়া,—উহাকে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে। ইহার 'উপায়' কি? ইহার 'সাধন' কিরূপ? এখন আমরা শঙ্কর-কথিত সেই 'সাধনগুলির উল্লেখ করিতে অগ্রসর হইব। অনেকের ধারণা যে, বেদান্তে ধর্ম্মসাধনের—Ethical discipline এর—কোন স্থান নাই। এই ধারণাটী যে অসঙ্গত, তাহাও আমাদের এই বিবরণ হইতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। কিন্তু আগামীবারে, সেই সাধন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রী কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

বনপর্ব্ব।

পঞ্চম অধ্যায়।

তীর্থ ভ্রমণ।

রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী—ধৌম্য পুরোহিত ও লোমশ ঋষিকে সঙ্গে করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে নির্গত হইয়াছেন। পাণ্ডবদিগের মস্তকে জটা, পরিধানে চর্ম্ম, হস্তে করণ্ড, শরীরে অভেদ্য কবজ, পৃষ্ঠে তূণ ও ধনু। লোমশ ঋষি তাঁহাদের পথশ্রম দূর করিবার জন্য ও শিক্ষার নিমিত্ত বহুবিধ বিষয় বলিতে লাগিলেন। একদিন বলিলেন,—"একদা দেবগণের সহিত অসুরগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। দেবগণ কোনরূপে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। শেষে তাঁহারা দধীচি মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে বলিলেন, 'মহাত্মন্, আপনার অস্থি ভিন্ন অসুররাজ বৃত্রাসুর নিহত হইবে না, আমাদের দুঃখেরও অবসান হইবে না।' মুনিবর উত্তর করিলেন, 'আমি প্রাণ দিলে আপনাদের উপকার হইবে, ইহাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কি আছে? আমার সমুচয় তপস্যা সার্থক যে পরোপকারের জন্য এইরূপ আত্মোৎসর্গ কবিবার অবসর পাইলাম।' তিনি তখনই যোগবলে প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবগণ তাঁহার অস্থিদ্বারা ভয়ঙ্কর বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্রাসুরকে নিহত করিলেন"।*

আর একদিন আর এক তীর্থে লোমশ ঋষি বলিলেন,—"উশীনর নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। এক কপোত এক শ্যেন পক্ষীর আক্রমণে ভীত হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। শ্যেনও রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'আমি ক্ষুধার্থ, কপোতকে প্রদান করুন।" রাজা কহিলেন, 'শরণাগতকে রক্ষা করাই ধর্ম্ম, এমন অবস্থায় আমি কিরূপে উহাকে দিতে পারি?' শ্যেন উত্তর করিল, 'ক্ষুধিতকে আহার দেওয়াই ধর্ম্ম। আপনি কিরূপে উহাকে রাখিতে পারেন? যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের অন্তরায়, তাহা ধর্ম্ম নহে, তাহা কুধর্ম্ম। আর যে ধর্ম্মের সহিত অন্য কোন ধর্ম্মের বিরোধ নাই, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।' তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'আমার শরীর হইতে এই কপোতপরিমাণ মাংস কাটিয়া তোমার আহারার্থ প্রদান করিতেছি। তাহাতে শরণাগতকে রক্ষা করাও হইবে, ক্ষুধিতেরও আহার দেওয়া হইবে।' শ্যেন তাহাতে সম্মত হইল। রাজা স্বীয় শরীর হইতে মাংস কাটিয়া লইয়া তাহা তুলা-যন্ত্রে সেই কপোতের সহিত পরিমাণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহু মাংস কাটিয়া দিলেও তাহা সেই কপোতের সমান হইল না। তখন রাজা তাঁহার সমুদয় শরীর সেই শ্যেনকে অর্পণ করিলেন ও তাহা আহারার্থ তাহাকে প্রদান করিলেন। শ্যেন

* বনপর্ব্ব ১০০ অধ্যায়। এই গল্প আবার উদ্‌যোগপর্ব্বের ৯।১০ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। তথায় ফেণপুঞ্জ দ্বারা বৃত্র-সংহার বর্ণিত হইয়াছে।

বলিল, 'মহারাজ, যিনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অপরের প্রাণ রক্ষা করেন, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা। আমি এইরূপ মহাত্মাকে বিনষ্ট করিতে পারি না। সর্ব্বভূতে আপনার এইরূপ অসাধারণ দয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। আমি আর কপোত চাহি না।' এই বলিয়া শ্যেনপক্ষী উড়িয়া অদৃশ্য হইল।*

ক্রমে ক্রমে পাণ্ডবেরা সমুদয় ভারতবর্ষ ও ভারতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিলেন। সমুদ্র মধ্যে যে সকল তীর্থ ছিল, তথায়ও গমন করিলেন। পূর্ব্বে সমুদ্র-যাত্রা হিন্দুর নিষিদ্ধ ছিলনা।† শেষে তাঁহারা গঙ্গাদ্বার দিয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। পার্ব্বতীয় পথে গমন করিতে করিতে দ্রৌপদী অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অকস্মাৎ অচেতন হইয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। অমনি নকুল আসিয়া ধরিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। কেহ তাঁহার শরীরে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, কেহ বাতাস দিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! দ্রুপদ-রাজ দ্রৌপদীকে আমাদিগের হস্তে অর্পণ করিবার সময় কতই না আশা করিয়াছিলেন! ভাবিয়াছিলেন, আমরা তাহাকে সুখে ও সম্মানে রাখিব। তাঁহার সকল আশাই ব্যর্থ হইয়াছে। আমার দোষেই দ্রৌপদী এত দুঃখ ভোগ করিতেছে।" পার্ব্বতীয় বাতাসে ও স্বামীগণের সেবা শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে কৃষ্ণার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। ক্রমে তিনি সুস্থ হইলেন।

এখন তাঁহারা অসভ্য জাতির স্কন্ধে চড়িয়া ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বহু জাতি দেখিতে দেখিতে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া আবার সকলে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। এখানে অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। এখন সকলে মিলিয়া বদরিকাশ্রম হইয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণের নিকট বিদায় লইয়া পূর্ব্বেই হিমালয় প্রদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি এখানে এক কিরাতকে পরাজয় করিয়া ভয়ঙ্কর পাশুপাত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অর্থহীন, সহায়হীন ও একাকী হইয়াও প্রবল পুরুষকার-বলে হিমালয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, অতি দুর্গম স্থান সকল উত্তীর্ণ হইয়া অসভ্য ও বর্ব্বরের বসতিস্থানের মধ্য দিয়া গমন করিয়া শেষে সশরীরে স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে হিন্দুগণ পৃথিবীর সকল অংশেই গমন করিত, পৃথিবীর সকল অংশেই উপনিবেশ স্থাপন করিত।† অর্জ্জুন স্বর্গে পাঁচ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সেখানেই নৃত্য গীত বাদ্য শিখিয়াছিলেন। সেখানেই দেবগণের পক্ষে যোগদান করিয়া দানবগণের সহিত সতত সংগ্রাম করিতেন। এইরূপে সুখের স্বর্গেও তাঁহাকে সতত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইত, সতত দানবগণকে হত ও

* এই গল্প সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে দর্শন' প্রবন্ধে 'বৌদ্ধ-দর্শন' দ্রষ্টব্য।
† এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'সমুদ্র-যাত্রা' দ্রষ্টব্য।
* গঙ্গাদ্বারকে এখন হরিদ্বার বলে।
† এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'বিদেশ গমন' দ্রষ্টব্য।

আহত করিতে হইত। কিন্তু এইরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করায়, সতত যুদ্ধে লিপ্ত থাকায়, তিনি অসাধারণ বীর হইয়া উঠেন। পরে আসিবার সময় স্বর্গ হইতে অনেক দুর্লভ অস্ত্র-শস্ত্র ভারতে আনয়ন করিয়াছিলেন। হায়! কল্পনাময় সুখের স্বর্গেও মানুষ মারিবার যন্ত্রের অভাব নাই!

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুধিষ্ঠির ও নাগরাজ

একদিন ভীম একাকী হিমালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নাগরাজ তাঁহাকে বন্দী করিলেন * যুধিষ্ঠির ভ্রাতার অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন নাগরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

(১) নাগ। ব্রাহ্মণ কে?

যুধি। সত্য, সরলতা, দয়া, দান, ক্ষমা ও তপস্যা যাঁহাতে বিদ্যামাণ তিনিই ব্রাহ্মণ।

নাগ। ঐ সকল গুণ ত শূদ্রেরও আছে!

যুধি। ঐ সকল গুণ যে শূদ্রের আছে, তিনি ব্রাহ্মণ। আর ঐ সকল গুণ যে ব্রাহ্মণে নাই, তিনি শূদ্র।

নাগ। যদি চরিত্রের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, তবে যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া না যায়, ও চরিত্রের কার্য্য আরম্ভ না হয়, সে পর্য্যন্ত জাতি বিভাগ বৃথা?

যুধি। বৃথা। কারণ মনুও বলিয়াছেন, "পুরুষ যে পর্য্যন্ত বেদ অধ্যয়ন না করে, সে পর্য্যন্ত শূদ্র-সম থাকে"; আমি প্রথমেই বলিয়াছি, জাতি বর্ণ অভেদে, যিনি সুসংস্কৃত চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। †

নাগ। তুমি সত্য বলিয়াছ। অহিংসা, দান, দম, সত্য, তপস্যা ও ধর্ম্মাচরণই শ্রেষ্ঠ। জাতি ও কুল নহে।‡

(২) নাগ। জ্ঞেয় বস্তু কি?

যুধি। সুখ দুঃখ রহিত ঈশ্বর জ্ঞেয়।

(৩) নাগ। সুখ দুঃখ রহিত কোন বস্তু আছে কি?

যুধি। যেরূপ শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ের সন্ধিস্থলে শৈত্য ও উষ্ণতা বিরহিত কোন এক

---

* নাগ বা তক্ষক শক জাতীয় লোক। ইহারা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। Tod's Rajasthan I p. 61

† বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়। শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবৎ বেদে ন জায়তে। মনুসংহিতা ২—১৭২। মহর্ষি বসিষ্ঠেরও এই মত। বসিষ্ঠ সংহিতা ২ অধ্যায়। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের বনপর্ব্বের ১৪শ অধ্যায়ের ৭ম প্রশ্ন ও উত্তর এবং শান্তি-পর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ের 'জাতি ভেদ' দ্রষ্টব্য।

‡ বনপর্ব্ব ১৮১—৪২।৪৩।

অনির্ব্বচনীয় অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে হয় সেইরূপ সুখ দুঃখ বিহীন বস্তু থাকাও অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

নাগরাজ যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ভীমকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন যুধিষ্ঠির নাগকে বলিলেন, "আপনি বেদ-বেদাঙ্গ পারগ* এখন আমার সংশয় দূর করুন।" নাগ সম্মত হইলেন।

(৪) যুধি। মনুষ্যের সদ্গতির উপায় কি?

নাগ। অহিংসা, দান, প্রিয় ও সত্যকথন।

(৫) যুধি। দান ও সত্য, এই দুটীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? অহিংসা ও প্রিয় ব্যবহার, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

নাগ। এই সকলের পরিণাম ফল দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হইবে ইহাদের মধ্যে যাহা দ্বারা অধিকতর দেশ-হিত সাধিত হয়, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব কোন দান হইতে সত্য শ্রেয়, আবার কোন সত্য হইতে দান বিশিষ্ট। সেইরূপ কোন অহিংসা হইতে প্রিয় ব্যবহার শ্রেষ্ঠ, আবার কোন প্রিয় ব্যবহার হইতে কোন অহিংসা বিশিষ্ট।

(৬) যুধি। আত্মা কিরূপে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ বিষয় ভোগ করে? সুখ দুঃখ অনুভব করে?

নাগ। শরীরস্থিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন একটি ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি, এই তিনের সাহায্যে আত্মা বিষয় ভোগ করে। এই তিন একত্রে বর্ত্তমান না থাকিলে, আত্মা বিষয় ভোগ করিতে পারে না, সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। আবার এক মন একই সময়ে বহু বিষয়ে লিপ্ত হইতে পারে না।†

(৭) যুধি। মন ও বুদ্ধি, ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি?

নাগ। কেহ মনকে উৎপন্ন করে না। কিন্তু বুদ্ধি ও বিষয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, আবার লয় হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ রূপ রসাদি বিষয়ে সংযুক্ত হইলে বুদ্ধি বা বিষয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আবার ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয় হইতে বিযুক্ত হইলে বুদ্ধি লুপ্ত হয়। মনের সাহায্যেই এই সংযোগ ও বিয়োগ সাধিত হয়। সুতরাং মনের সাহায্যেই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই বুদ্ধি বা বিষয় জ্ঞান সুখ দুঃখ উৎপন্ন করিতে পারে না, মন পারে। যেখানে মন নাই, সেখানে বিষয়-জ্ঞান নাই, সুতরাং সুখ দুঃখেরও বোধ নাই।‡

যুধিষ্ঠির সকল শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন ভীমকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। এখন সকলে মিলিয়া হিমালয় হইতে আনন্দে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

* বনপর্ব্ব ১৮১-১।

† এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায় 'দর্শন' প্রবন্ধে 'বৈশেষিক দর্শন' দ্রষ্টব্য।

‡ এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ভীষ্মপর্ব্বে 'ভগবদ্গীতা এবং শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে দর্শন দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়।

ঈশ্বর।

পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া মহাতপা মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিলেন। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন অনুসারে বলিতে লাগিলেন :—

বৈবস্বত মনু এক মৎস্যকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সে ক্রমে ক্রমে বৃহদাকার প্রাপ্ত হয়। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি এক তরণী নির্ম্মাণ করিলেন। যখন সমুদয় পৃথিবী জলমগ্ন হইল, তখন তিনি সপ্ত ঋষিকে লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। সর্ব্বপ্রকার বীজ তাহাতে তুলিলেন। পরে সেই মৎস্যের শৃঙ্গের সহিত সেই নৌকা বাঁধিয়া দিলেন। মৎস্য সেই তরী টানিয়া লইয়া, সমুদ্র ভেদ করিয়া হিমালয়ের এক উচ্চ শৃঙ্গের নিকট উপস্থিত হইল। মনু তথায় অবতরণ করিয়া সকল রক্ষা করিলেন।*

আমি সেই বনে বিচরণ করিতে করিতে এক বটবৃক্ষে এক সুন্দর শিশু শয়ান রহিয়াছে, দেখিলাম। আমি বহু চিন্তা করিয়াও তাহাকে জানিতে পারিলাম না। পরে বুঝিলাম, সেই শিশুর উদরে ভ্রমণ করিতেছি। তথায় চন্দ্র সূর্য্য সমন্বিত অনন্ত গ্রহ, সমুদ্র, পর্ব্বত, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নদনদী প্রভৃতি সমুদয়ই দেখিলাম। আমি বহুকাল সেই উদরে ভ্রমণ করিলাম, তথাপি তাহার অন্ত পাইলাম না। পরে যখন নির্গত হইলাম, তখন দেখিলাম সেই শিশুর উদরে যাহা কিছু ছিল, সকলই বাহিরে বিরাজ করিতেছে, জগৎ শোভা পাইতেছে।

ফলতঃ ঈশ্বরে এই বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, আবার ঈশ্বর এই বিশ্বে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই আধার, তিনিই আধেয়। তিনিই স্রষ্টা, পাতা ও বিলয়কর্ত্তা। তিনি নিরাকার অথচ সর্ব্বশক্তিমান। তিনি রসহীন, গন্ধবিহীন। তিনি শব্দ নহেন, স্পর্শ নহেন, রূপ নহেন। তিনি স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, নপুংসক নহেন। তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন, সদসৎ নহেন।† তবে তিনি কি? অবাঙ্মনসগোচরং, অশব্দং, অস্পর্শং, একমেবাদ্বিতীয়ং। তিনি অনির্ব্বচনীয়, অচিন্তনীয়, শব্দাতীত, স্পর্শাতীত; তিনি অদ্বিতীয়।

যদি স্বীকার করিতে হয়, ঈশ্বরের স্রষ্টা আছেন, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে সেই স্রষ্টারও আবার সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। তাহা হইলে এই প্রশ্ন-প্রবাহের শেষ হয় না। আবার ঈশ্বর যে এক, অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশক্তিমান, এ সত্য স্থির থাকে না এই জন্য যিনি ঈশ্বর, তাঁর আর স্রষ্টা নাই। যেমন মৃত্তিকা হইতে পুতুল নির্ম্মিত হয়,

* বনপর্ব্ব ১৮৭। অধ্যায়। ইহার সহিত বাইবলে বর্ণিত জল প্লাবনের আশ্চর্য্য সৌসদৃশ্য আছে। আরও আশ্চর্য্য যে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় জাতির মধ্যেই জলপ্লাবনের গল্প প্রচলিত আছে। তাহার কারণ এই গ্রন্থের শান্তি পর্ব্বে ৫ম অধ্যায়ে 'বিদেশে গমন' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

† শান্তিপর্ব্ব ২০১—২৫।২৬।২৭।

আবার তাহা ভাঙ্গিলে মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তেমনি ঈশ্বর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, আবার তাঁহাতেই বিলীন হইবে।*

ঈশ্বর এই বিশ্ব ব্রাহ্মণ্ড কার্য্যকারণ পরম্পরের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন! একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার সত্তা বুঝায়। ঈশ্বরই একমাত্র বেদ্য ও সত্য। তাহা বুঝিতে না পারায়, বহু উপাস্য দেবতা কল্পিত হইয়াছে।†

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

ভারতবর্ষ।

(১৮৬১ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ৺ কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিরচিত "India" শীর্ষক ইংরাজী কবিতার অনুবাদ)

জানো কি সে দেশ যথায় সবিতা উজ্জ্বলতম কিরণ বর্ষে?
জানো কি সে দেশ যথায় সন্ধ্যা জ্যোৎস্নার মাঝে মিলায় হর্ষে?
যথায় তুঙ্গ গিরির শৃঙ্গ রাজার গর্ব্বে তুলিয়া শির,
চুমিছে উজল উদার আকাশ শূন্যের মাঝে দাঁড়ায়ে স্থির।
যথায় পিপুল, বাবুলের, আর সুরভি চন্দন তরুর রাজি,
খেলিছে হরষে, মলয়ের সাথে, অপরূপ রূপ-গরবে সাজি।
খেলিছে হরষে, মনে হয় যেন, ক্ষুদ্র সরলা বালিকা যত,
অন্তর যার হরষের খনি, হৃদয় স্বচ্ছ মুকুতা-মত;
যথা সুবিশাল প্রবাহিনী কত গর্ব্বে উছলি উছলি চলে,
প্রতিবিম্বিত করিয়া বক্ষে সূর্য্য-আলোক-কিরণ-দলে।
যথায় গোলাপ বেল যুঁই আদি অযুত অযুত প্রসূন ফুটি'
সৌরভে তা'র দিক্ আমোদিত করিছে অযুত হৃদয় লুটি',
যথায় প্রকৃতি হন আবির্ভূতা উজ্জ্বলতম শোভন বেশে,
মানব-রচিত বিধিগুলি বিনা সবি যথা সুখ আনিছে হেসে,
সে যে আমাদের আলোকের দেশ, সে প্রাচীন দেশ জান না তুমি?
জগত-বিশ্রুত হয়েছিল যা'র ঐশ্বর্য্যের কথা, সুফলা ভূমি!

---

* ইহা বেদান্তের মত। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'দর্শন'নামক প্রবন্ধে বেদান্ত দর্শন দ্রষ্টব্য।

† উদ্‌যোগ পর্ব্ব ৪৩—৪৩।৪৪। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'দর্শন' প্রবন্ধে 'সাংখ্য', 'পাতঞ্জল' 'বৈশেষিক', 'ন্যায়', পূর্ব্বমীমাংসা', 'বেদান্ত', 'বৌদ্ধ' ও 'চার্ব্বাক' দর্শন দ্রষ্টব্য।

দেবতাগণের প্রিয় লীলাস্থল চির আদরের জনম-ভূমি
তা'দের, যাহারা অপূর্ব্ব বীরত্ব-কীর্ত্তি রাখিয়া রয়েছে ঘুমি' !
এই সেই দেশ, যথা উজলিলা জ্ঞানের জ্যোতিঃতে ভারতী, বিশ্ব ;
এই সেই দেশ, নানা শিল্প মাঝে যথায় কমলা হ'ন অদৃশ্য,
এই সেই দেশ, আজি বা অতীতে, তাহার সমান কাহার নাম ?
যশের উচ্চ শৈল শিখরে অধিষ্ঠিতা ছিল ভারতধাম !
ভারতবর্ষ ! ভারতবর্ষ ! চির প্রিয় মোর জনমভূমি !
ভাগ্যচক্রে কত না দুঃখ কত অপমান সহেছ তুমি !
গরব পতাকা কোথা আজি এর ভূমিলুণ্ঠিত হয়েছে হায় !
কোথা উদ্যম, কোথা সে জীবন, কি আছে তোমার আজি ধরায় ?
কেবা আছে হেথা তোমার স্তন্যে পালিত হইয়া থাকিবে স্থির,
তোমার দুর্দ্দশা নিরখি' নয়নে নাহি বিসর্জ্জিয়া নয়ন-নীর ?

* * * *

ভারতবর্ষ ! ভারতবর্ষ ! ভাগ্যাকাশ তব যদি আঁধার,
যদিও তোমার গিয়াছে সকলি যদিও কিছুই নাহিক আর,
তথাপি হয়ত, দূর ভবিষ্যে, কখনো উজল গরিমালোক
উদ্ভাসিবে তব কনক কিরীট বিদূরিত করি সকল শোক,
অতল জলধি হইতে যেমতি উদিলা কমলা জগত-পূজ্যা,
বহুকাল-ব্যাপী নিদ্রার পরে উঠিতেছে আশা ত্যজিয়া শয্যা,
কহিছে গোপনে অস্ফুট স্বরে, আসিবে সেদিন আসিবে দিন
যেদিন তোমার দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিঁড়ে যাবে, তুমি হবে স্বাধীন !
সকল জাতির আসনের মাঝে গৌরবময় আসন লবে,
উজ্জ্বলতম যশের মুকুট সম্মান পূজা তোমার হবে,
এই শুধু দুখ পাব না হেরিতে আমার জীবনে সে শুভদিন,
জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হবে, যেদিন তুমি গো হবে স্বাধীন ।
হয়ত কহিবে সংশয়-বাদী, এ শুধু স্বপন নাহিক আন,
তথাপি, তথাপি, স্বপনেই আমি সাদরে হৃদয়ে দিব গো স্থান,
কারণ, সে যে গো,—হোক না স্বপন—লয়ে আসে হৃদে আশা নবীন,
পিতৃপুরুষের পদরজঃপূত আমারি দেশের সুখের দিন।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ।

ভাগবত বিধান

ইংরেজরা যদি পাঠান মোগলের মত এদেশের বাসিন্দা হইয়া যাইত তাহা হইলে আজ স্বরাজের কথা এদেশে উঠিত কিনা সন্দেহ। এই জাতিভেদভরা দেশে মুসলমান যেমন একটা স্বতন্ত্র জাতি হইয়া আছে, ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা মিলিয়া তেমনি একটা জাতি সৃষ্টি করিয়া বসিত মাত্র। সেটা আমাদের বড় একটা গায়ে লাগিত না; কেননা জাতিভেদটা আমাদের ধাতে সহিয়া গিয়াছে। বাদসাহী আমলে বড় ঘরের হিন্দুরা যেমন দুই দশটা বড় বড় পদ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন, ইংরেজ আমলেও তাহাই হইত; মোগল বা পাঠানেরা যেখানে যেখানে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছেন সেই খানেই হিন্দু স্বরাজ্য স্থাপনের কথা উঠিয়াছে। আর উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর সাহায্য লইয়াই স্বরাজ্যস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র জাতি গঠনের সময় স্বামী রামদাস মারাঠীদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; গুরু গোবিন্দসিংহও পাঞ্জাবের জাঠদিগকে লইয়া একটা নূতন ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতবর্ষ যদি পরাধীন না হইত তাহা হইলে এই সমস্ত নিম্নশ্রেণীর সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা হইত কিনা সন্দেহ।

ইংরেজ যে আমাদের সহিত জবরদস্তি করিয়া একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিয়াছে, কেহ কেহ সেটাকে ভক্তিভরে ভাগবত বিধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এক হিসাবে দেখিতে গেলে কথাটার ভিতর অনেক খানি সত্য আছে বলিয়াই মনে হয়। কবি যে বলিয়াছিলেন—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

ইংরেজ এদেশে আসিয়া ঠিক ঐ কাজটুকু করিয়া দিয়াছে। আজ চোখে আঙ্গুল দিয়ে সকলকে সে বুঝাইয়া দিয়াছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সৈয়দ, মোগল, পাঠান হইয়া আরম্ভ করিয়া চণ্ডাল, পারিয়া, মাঢ় পর্য্যন্ত আমরা সবাই সমান পতিত! আজ বাধ্য হইয়া সকলকে এক ঘাটে জল খাইতে হইয়াছে, আর বুঝিতে হইয়াছে যে আবার ঘরে গিয়া জল খাইতে হইলে সকলকেই এক সঙ্গে ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আর তা না হইলে আজ যাহারা ঘরে ঢুকিয়া কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের ঘরের বাহির করিবার উপায় নাই। আরও একটা সুখের কথা এই ভারতবর্ষ স্পানিয়ার্ড, পোর্ত্তুগিজ বা ফরাসীর হাতে না পড়িয়া ইংরেজের হাতে পড়িয়াছে। লাতিন জাতিদিগের মানসিক প্রকৃতি কতকটা মুসলমানদের মত। তাহারা অপরের জাতি মারিয়া তাহাকে আপনার সঙ্গে মিশাইয়া লইতে চেষ্টা করে। পোর্ত্তুগিজেরা গোয়ায় তাহাই করিয়াছে; গোয়ার লোকে নিজেদের আচার, ধর্ম্ম, সমাজ সব ছাড়িয়া নকল পোর্ত্তুগিজ সাজিয়াছে। ফিলিপাইনের লোকেরাও স্পানিয়ার্ডদের হাতে পড়িয়া আপনাদের ভাষা ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার ছাড়িয়া

আধাআধি স্পানিয়ার্ড হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা পণ্ডিচারীতে ও কোচিন চীনে গিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে ফরাসীদের মতিগতিও ঐ দিকে। এই সকল জাতি আপন আপন অধিকৃত রাজ্যের লোকদিগকে আচারে ও সভ্যতায় নিজের মত করিয়া লইয়া অনেকটা রাজনৈতিক অধিকার তাহাদের হাতে তুলিয়া দেয়।

কিন্তু ইংরেজের প্রকৃতি একটু ভিন্ন রকমের। সে যাহাকে নিজের ধর্ম্ম বা আচারে ভূষিত করে তাহাকেও বেশ একটু দূরে ঠেলিয়া রাখে। আমাদের দেশে সখ করিয়া অনেকেই সাহেব সাজিয়াছেন, কিন্তু ইংরেজ কাহাকেও আপনার সমান অধিকার দেয় নাই। জগতের আর কোন জাতি সাজিয়া গুজিয়া যে ইংরেজ বনিতে পারে না, এ কথাটা ইংরেজ বেশ ভাল করিয়াই বোঝে। তাই ইংরেজ রাজত্বে লর্ড সিংহের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু একটাও মুরসিদ কুলি খাঁ জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের মত হতভাগা জাতকে ইংরেজ যদি একটু কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে দেশ এতদিন 'স্বদেশী ফিরিঙ্গি'তে ভরিয়া যাইত; স্বরাজের কথা অনেকের হয়ত মনেই উঠিত না।

আরও একটা কথা এই যে রাজত্ব করার অপেক্ষা ব্যবসা চালানর দিকেই ইংরেজের লোভটা একটু বেশী। যেখানে যেখানে সে রাজদণ্ড খাড়া করিয়াছে, সেখানে ব্যবসাই তাহার গোড়ার কথা। ক্ষমতা, প্রভুত্ব যে সে ভালবাসে, তাহার কারণ ওগুলা থাকিলে পকেটে টাকা কড়ি আসিয়া পড়ে; আর এই অসার সংসারে টাকাই যে একমাত্র সারবস্তু সে বিষয়ে ইংরেজের মনে কোনই সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে আসিয়া এই ব্যবসার খাতিরে ইংরেজকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই সমান ভাবে আঘাত করিতে হইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্ট ধনী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণী ইংরেজের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা বেশ প্রীতিকর নয়। দেশটা যদি এত দরিদ্র না হইয়া পড়িত, কৃষক ও শ্রমজীবিদিগের দুইবেলা উদরান্নের সংস্থান থাকিত, তাহা হইলে আজ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এতটা চাঞ্চল্য বোধ হয় দেখা দিত না। ইংরেজের চাপে পড়িয়া যদি শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণী কতকটা দরিদ্র হইয়া পড়িত তাহা হইলে হয় ত একটু চেঁচামেচি বা একটু আধটু মারামারি করিয়া তাহারা ইংরেজের সহিত কতকটা রফা করিয়া লইত। দেশকে স্বাধীন করিবার সংকল্প যদি বা দুই চারিজনের মাথায় আসিত তবুও তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিত না।

কিন্তু এখন ত্র্যহস্পর্শ দোষ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, ইংরেজ এদেশের কেহ নয়, এদেশে বাস করিতেও আসে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা পাতাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ রাজত্বের ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর স্বার্থ অনেকটা এক রকমের হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে।

জমিদার, বড় বড় কলওয়ালা বা মাড়োওয়ারীদের মত সওদাগরের স্বার্থ ইংরেজ রাজত্বে রক্ষিত হইতে পারে। সুতরাং এ সমস্ত সম্প্রদায় যে কখনও আন্তরিক ভাবে স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দিবে তাহা মনে হয় না। ইংরেজের হাতে একটু খাতির

যন্ত্র পাইলেই তাহারা ভুলিয়া যাইবে। আজ যে Indianisation of Services এর কথা লইয়া এত আন্দোলন চলিতেছে তাহা যদি সফল হয়, তাহা হইলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিয়দংশও যে ইংরেজ রাজত্বের পক্ষপাতী হইয়া পড়িবে তাহাও অসম্ভব নয়। কিন্তু কৃষক, শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশের আর্থিক অবস্থা দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইতেই থাকিবে। সুতরাং স্বরাজের জন্য আন্দোলন এই সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই যে প্রসার লাভ করিবে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। যাহাদের স্বার্থ ইংরেজের স্বার্থের সহিত জড়িত তাহারা দিন দিন স্বরাজের আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া যাইবে।

ইংরেজ রাজত্বের স্বরূপবোধের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্য্য প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; কিন্তু কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয় না যে ইংরেজ রাজত্বের সহিত এদেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জড়িত, এ গোড়ার কথাটা তাঁহারা বেশ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সকলকার মন সমানভাবে জাগাইতে গিয়া কংগ্রেসের শক্তিহানি হইয়াছে মাত্র। হিন্দুস্থান ও রাজপুতানার উৎপীড়িত কৃষকেরা জমিদারদিগের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যখন কৃষাণ সভা করিল, কুলি মজুরেরা কলওয়ালাদের হাতে নিপীড়িত হইয়া যখন ধর্ম্মঘট করিল, তখন তাহাদের সেই আন্দোলনে যোগ দেওয়া কংগ্রেস কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। কংগ্রেস তখন অহিংসা পরম ধর্ম্ম কিনা এই আধ্যাত্মিক গবেষণায় মনোনিবেশ করিলেন। ফলে পুলিশের সাহায্য লইয়া তালুকদারেরা কৃষক-দিগের আন্দোলন দাবাইয়া দিল। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসে ভাব-বিলাসিতা যতটা প্রশ্রয় পাইয়াছে, কার্য্য-কুশলতা ততটা পায় নাই।

কিন্তু দেশ যদি স্বাধীন করিতে হয় তাহা হইলে জনকতক স্বার্থান্ধ জমিদার, কলওয়ালা বা উচ্চ পদলোভী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চেষ্টায় তাহা হইবে না। দেশের মধ্যে যাহারা পতিত তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টাই আগে করিতে হইবে। তাহাদের সাহায্য ভিন্ন কংগ্রেসের সমস্ত আয়োজনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। যাহাদের পেটে দুই বেলা ভাত জুটে না, কুঁড়ে ঘরের ভিতর যাহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া শিয়াল কুকুরের মত পড়িয়া থাকে, সময়ে অসময়ে যাহারা জমিদারের নায়েব ও পুলিসের পেয়াদার হাতে লাঞ্ছিত, তাহাদিগকে দেবতা বানাইবার আগে মানুষ বানাইবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। যাহারা মাটির সহিত দিন দিন মিশিয়া যাইতেছে তাহাদিগকে তিতিক্ষা সাধন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার প্রলোভন সংযত করাই ভাল।

এই কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করিয়া কি করিয়া তাহাদিগের অবস্থা ভাল করা যাইতে পারে, কি করিয়া তাহাদিগকে অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে খাড়া করান যাইতে পারে তাহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহাদিগকে সংঘবদ্ধ করা ভিন্ন আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক হিসাবে ইহাদিগকে সমান অধিকার দেওয়া ভিন্ন স্বরাজ লাভের অন্য উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। বাহির

হইতে যাহারা আমাদের ঘাড়ে চড়িয়া আছে তাহাদিগকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইলে আগে এই দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। হিংসা বা অহিংসার কথা পরে ভাবিলেও মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবার ভয় নাই। এরূপ ব্যবস্থা করিলে দেশের স্বাধীনতার ফল শুধু শ্রেণীবিশেষ মাত্র ভোগ করিবে না; সকলেই স্বাধীনতার সমান ভাগী হইবে।

অল্পচেষ্টায় যদি স্বাধীনতা পাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুই দশ জন মিলিয়াই সে কাজ টুকু করিয়া ফেলিতাম; দেশের নিম্নশ্রেণী নিম্ন-স্থানেই পড়িয়া থাকিত। কিন্তু ইংরেজের হাতে যখন আমরা পড়িয়াছি তখন সে ভয় নাই। ইংরেজ কথায় ভুলিবার ছেলে নয়; বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া সে ধরাশায়ী হইবে না। এতদিন যাহারা সমাজের পায়ের তলায় পড়িয়া আছে তাহাদের সকলকেই খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে; সকলকে লইয়া ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অল্পেতুষ্ট হইয়া বর দিবার মত দেবতা ইংরেজ নয়। এ হিসাবে ইংরেজ রাজ্য যে ভাগবত বিধান তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গবেষণার পরিচয়

শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" লিখিয়া খ্যাতনামা হইয়াছেন। আজকাল যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা বা সাহিত্য সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করেন তাঁহাদের অনেকেই ইঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে নানাস্থল উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকারের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ দেখা যায়। আমিও দীনেশবাবুর গবেষণার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিবার স্পৃহা দমন করিতে পারিলাম না। আমি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" প্রথম সংস্করণ দেখি নাই। তবে দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে এ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্করণগুলিই দেখিয়াছি। তিনি অসমীয়া ভাষা জানেন বলিয়া মনে হয় না; তাই অনন্ত রামায়ণখানিকে বাঙ্গালাভাষার গ্রন্থ মনে করিয়া "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র মধ্যে উহার সংবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ঐ পুস্তকখানির পরিচয় সম্বন্ধে দ্বিতীয় সংস্করণে যাহা লিখিত ছিল, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রথম সংস্করণ দেখি নাই, হয়তো তাহাতেও এইরূপই ছিল:—

"অনন্ত রামায়ণ।

"কৃত্তিবাসের পরে যাঁহারা রামায়ণ রচনা করেন তন্মধ্যে 'অনন্তরামায়ণ' খানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত করুণানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়াছেন; ইহা বকলে লিখিত, অবস্থা অতি জীর্ণশীর্ণ, পশ্চাতের কয়েকখানি পত্র নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সময় নির্দ্ধারণের উপায় নাই; বকলে লিখিত ও 'দেখিতে অতি প্রাচীন' ইহাই এই পুস্তকের প্রাচীনত্বের প্রমাণ, ইহা ছাড়া আর একটি বিশেষ প্রমাণ ভাষা। শেষোক্ত বিষয়ে

অনুমান বড় নিরাপদ নহে, অন্য প্রমাণাভাবেই গ্রন্থের ভাষায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সময় নিরূপণের চেষ্টা দেখিতে হয়, কিন্তু নিতান্ত মফঃস্বলের ভাষা এখনও প্রাচীন শব্দপরম্পরায় এরূপ জটিল রহিয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়েও যদি বঙ্গের কোন সীমান্তপল্লীর প্রচলিত ভাষা লিখিত আকারে উপস্থিত হয়, তবে অদ্ভুত গবেষণার সাহায্যে আমরা তাহা প্রাকৃতিক যুগে কি বৌদ্ধাধিকারে লইয়া পৌছাইতে পারি। তবে অন্যান্য প্রমাণের অভাব লইলে ভাষা পরীক্ষা ভিন্ন, সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে গত্যন্তর নাই; অনন্ত রামায়ণের ভাষা অত্যন্ত জটিল ও প্রাচীন, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, কত প্রাচীন সে সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত; আমরা ইহা ন্যূনপক্ষে ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। গ্রন্থকারের বাসস্থান কি তৎসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ের বিবরণই অবলম্বিত পুঁথিখানিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কতকগুলি শব্দদৃষ্টে একবার বোধ হয়, গ্রন্থকার শ্রীহট্ট কিংবা তৎসন্নিহিত কোন জনপদের অধিবাসী; 'চ' স্থলে 'ছ' ব্যবহারের জন্য আমরা চিরকাল শ্রীহট্ট বাসী বন্ধুগণের সহিত আমোদ করিয়া আসিয়াছি, এই পুঁথিতে 'চরণ' স্থলে 'ছরণ', 'বচন' স্থলে বছন, 'চাস' (চাহিস) স্থলে 'ছাষ' প্রভৃতি-রূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, অন্যান্য শব্দও শ্রীহট্ট প্রচলিত ভাষার সহিত সান্নিকট্যের পরিচয় দেয়; তবে একথাও একবার মনে উদয় হয়, যে কবি না হইয়া গ্রন্থলেখকও শব্দের এবম্বিধ রূপান্তর করিয়া থাকিতে পারেন; প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে তদ্রূপ বিকৃতির উদাহরণও আমরা বিলক্ষণ পাইয়াছি।

এদিকে হিন্দী শব্দের সঙ্গেও এই পুঁথির ভাষার বিলক্ষণ নৈকট্য দৃষ্ট হয়, সুতরাং শ্রীহট্ট না হইয়া বঙ্গের পশ্চিমোত্তর প্রান্ত হইতে এই কবির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র হইবে না। আমরা এই পুস্তকের প্রণেতাকে বঙ্গের পূর্ব্বোত্তর কি পশ্চিমোত্তর সীমান্তস্থিত কোন পল্লীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত করুণানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুঁথি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা একেবারে উল্লেখ করেন নাই।"

অতঃপর গৌহাটি কটন কলেজের প্রফেসার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয় দীনেশ বাবুকে চিঠি দিয়া "অনন্ত রামায়ণ" এবং ইহার কবি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানাইয়া দিয়াছিলেন, তাই "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের তৃতীয় (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত) সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের ঐ লেখাটা অব্যাহত রাখিয়া উহার নীচে একটি ফুট্ নোট্ দিয়া লিখিয়াছেন:—

"সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এই অনন্ত আসাম-বাসী। ইনি অনন্ত কন্দলী নামে আসামবাসীগণের নিকট পরিচিত। ইঁহার রচিত রামায়ণের অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত আছে। সুতরাং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে ইহাকে বাদ দেওয়ার জন্য আমাদের নিকট অনুরোধ আসিয়াছে। কিন্তু যে যুগের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আমি লিখিতেছি, তখন আসামী ভাষা বাঙ্গলা ভাষা হইতে পৃথক ছিল না। আজ যদি ত্রিপুরায় কিংবা শ্রীহট্টে তদ্দেশীয় প্রাদেশিক ভাষার আধিপত্য হয়, তবে সঞ্জয়, শ্রীকর, নন্দী প্রভৃতি লেখকগণকে আমরা কখনই কি বঙ্গ সাহিত্য হইতে বাদ দিতে পারি? অথচ, প্রাদেশিকত্ব ধরিলে

তাঁহাদের রচনাও অনন্ত রামায়ণ হইতে কম দুরূহ নহে। আসামের প্রাচীন কবিগণের বিষয় আমরা সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহি। তাঁহাদের বিবরণ পাইলে আমরা এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আসামে অল্পদিন হইল বঙ্গাক্ষর এবং বঙ্গভাষার গৌরব নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আসামের ভাষাকে আমরা বঙ্গভাষার প্রাদেশিকভেদ ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া স্বীকার করি না।

"কবি অনন্তের আপন নাম রাম-সরস্বতী : ইনি কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন।" ১৪৩ পৃষ্ঠা

পাঠকগণ দেখুন, তিনি অনন্ত রামায়ণের কবির নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় পাইয়াছেন, অথচ দ্বিতীয় সংস্করণে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই "সংশোধিত" সংস্করণেও রাখিয়া ছিলেন। এইরূপ ঠিক্ সংবাদ পাইবার পরেও কিরূপে তিনি অনন্ত রামায়ণের কবিকে একবার শ্রীহট্টের আবার "বঙ্গের পশ্চিমোত্তর" প্রান্তের "অধিবাসী" বলিয়া অনুমান করিতেছেন? তিনি ঐ ফুট্‌নোটে লিখিতেছেন "কিন্তু আসামের ভাষাকে আমরা বঙ্গভাষার প্রাদেশিকভেদ ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া স্বীকার করি না।" ভাল কথা যদি তাহাই হয় তবে আসামের ভাষায় যে সকল অন্যান্য গ্রন্থ আছে, সেগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের বিবরণীও "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন না কেন? এ সম্বন্ধে তো দেখা যায় অধ্যাপক পদ্মনাথ বাবু তাঁহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই যেন সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন—তাঁহার নিকট হইতেও তো অনেক কথা জানিতে পারিতেন। তাঁহার যদি গবেষণায় ঔৎসুক্য থাকিত, তবে তিনি অনন্তরামায়ণ হইতেই "শঙ্কর" নামক কবির নাম দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিতেন। পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন, হয়তো তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হইবার সময়ে পদ্মনাথ বাবু হইতে ঐ তথ্যটুকু পাইয়া পরিবর্ত্তনাদির অবকাশ পান নাই। বেশ কথা। সম্প্রতি ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় আছে "এবার পুস্তকখানি আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল।" কৌতূহলী পাঠকবর্গ একবার অনুগ্রহ করিয়া এই সংস্করণের ১৩১ ও ১৩২ পৃষ্ঠা দেখিবেন। তাহাতেও ২য় সংস্করণের (এবং তৃতীয় সংস্করণেরও) অনন্ত রামায়ণ কবির বাসস্থান শ্রীহট্ট কি বঙ্গের উত্তর পশ্চিম কোনও স্থানে ছিল, ইত্যাদি রহিয়াছে —এবং তৃতীয় সংস্করণের ফুট্‌নোট্‌টি—যাহাতে অনন্ত রামায়ণের কবি যে কামরূপবাসী তাহাও রহিয়াছে!! অসমীয়া ভাষা যে "বঙ্গভাষার প্রাদেশিকভেদ" মাত্র; স্বতন্ত্র ভাষা নহে, ইহাও অবশ্যই এই ফুট্‌নোটে—এই চতুর্থ সংস্করণেও বিদ্যমান। কিন্তু এই চতুর্থ সংস্করণেরই ভূমিকায় আছে :—"আমাদের বঙ্গসাহিত্যের আশ্রয় মহীরুহ স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ কক্ষের দ্বার বঙ্গভাষার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দী, তেলেগু, গুজরাটী কেনারিজ, মালবীয়, প্রভৃতি দ্বাদশটি প্রাদেশিক ভাষা বঙ্গভাষার সঙ্গে পাঠ করিবার সুবিধা তিনি করিয়া দিয়াছেন।" ইহাতে দীনেশ বাবু অসমীয়া ভাষাকে বঙ্গভাষার ন্যায় একটি স্বতন্ত্র প্রাদেশিক ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া নিলেন না কি?

জনৈক আসামবাসী

উত্তরচরিতের ষষ্ঠ অঙ্ক

ষষ্ঠ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বিদ্যাধরযুগলের আবির্ভাব। লব চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিবার জন্য তাঁহারা উজ্জ্বল বিমানে চড়িয়া অন্তরীক্ষে উপস্থিত। একদিকে দেবতাগণ "গম্ভীর মাংসল" দেবদুন্দুভিধ্বনি দ্বারা সমররাগ বর্দ্ধন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, অন্য দিকে দেবীগণ "তরুণমণিমুকুলমকরন্দসুন্দর" পুষ্প বর্ষণ দ্বারা মাঙ্গল্য বিধানার্থ উন্মুখ রহিয়াছেন।

লবচন্দ্রকেতুর যুদ্ধ বাস্তবিকই অদ্ভুত, বিস্ময়কর। এ যুদ্ধকৌশলের নিকট আজি কালিকার বিংশ শতাব্দীর রণ কৌশলও হার মানে। এক সময়ে সহসা বিদ্যুচ্ছটা বিস্ফুরিত হইয়া সমস্ত আকাশ পিঙ্গলবর্ণ করিয়া তুলিল যেন উহার ঊর্দ্ধ প্রসৃত শিখা দেবদেবীগণের বস্ত্রাঞ্চল রক্তচন্দনলিপ্ত করিয়া দিল। কি তাহার প্রদীপ্ত রশ্মি—যেন বিশ্বকর্ম্মার শানযন্ত্রে আরূঢ় মার্ত্তণ্ড জগৎধ্বংশকর করজাল বিস্তার করিতেছে। তাহার লেলিহান জ্বালা সম্ভার সহ্য করিতে না পারিয়া রথ লইয়া দেবদেবীগণ সেস্থান ত্যাগ করিয়া পলাইতেছে। ইহাই চন্দ্রকেতুর প্রযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্রের লীলা। বিদ্যাধরও দেখিল, তাহার প্রিয়ার অঙ্গ ঝলসিয়া যায় তখন সে তাড়াতাড়ি নিবিড় বাহু আলিঙ্গনে সে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া দূরে প্রস্থান করিল। সে "মৌক্তিকসরশীতল" "মসৃনমাংসল" নাথ দেহস্পর্শে আনন্দমুকুলিতলোচনা বিদ্যাধরী সে সন্তাপ ভুলিয়া গেল।

তারপর "ময়ূরকণ্ঠ শ্যামল" মেঘদল আসিয়া সমস্ত নভস্তল সহসা ঘনকৃষ্ণ করিয়া তুলিল। সে মেঘদল হইতে এক্ষণে অবিরলপ্রবৃত্ত এমনই বারিধারাসম্পাত দেখা গেল যে মুহূর্ত্তের মধ্যে সে বিশ্বপ্রলয়কারী আগ্নেয়াস্ত্র-জ্বালা কোথায় মিলাইয়া গেল। ইহাই লবের বারুণাস্ত্র। এই বারুনাস্ত্র প্রভাবেই লবের আগ্নেয়াস্ত্র প্রশান্ত হইল।

উঃ—কি অন্ধকার! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন সেই অন্ধকাররাশির মধ্যে ডুবিয়া আছে। কালকণ্ঠের ব্যাদিত বিশাল মুখগহ্বরে প্রাণিগণ যেন বিচেষ্টমান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

ষষ্ঠ অঙ্কের বিষ্কম্ভক শেষ হইল। নায়ক রামচন্দ্র ধীরোদাত্ত (নায়ক) পৃথিবীর আদর্শ-পুরুষ। কুসুমের মত কোমল, আর বজ্রের মত কঠোর। বীরত্ব এবং দাক্ষিণ্যের সম্মিলন স্থল। তাঁহার পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃভাব, পত্নীপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি আর প্রজানুরাগও যেমন অতুলনীয় বাৎসল্যস্নেহও তদ্রূপ অনুপম। ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর প্রাণঢালা ভালবাসা বড়ই মধুর। পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করিয়াই রামচন্দ্র

"দিনকরকুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো
সরভসমেহ দৃঢ়ং পরিষ্বজস্ব।"

"সূর্য্যকুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো, এস আমাকে আলিঙ্গন দৃঢ়বদ্ধ কর; তোমার তুহিনশীতল অঙ্গের সংস্পর্শে আমার চিত্তদাহ শান্ত হউক।" এই বলিয়া সস্নেহে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

তারপরই লবের দিকে তাঁর চক্ষু পড়িল। বৎস চন্দ্রকেতুর বয়স্য, এই বালকটীর গম্ভীরাকৃতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। মনে হইল, লোকপালনের জন্য ধনুর্ব্বেদ যেন শরীরী হইয়া উপস্থিত, বেদরূপ রত্নাগার রক্ষার জন্য ক্ষাত্রধর্ম্ম যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দণ্ডায়মান। এ যে বীর্য্য শৌর্য্যের সমবায়! দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের সমষ্টি, জগতের পুণ্যনির্ম্মাণ রাশি কি সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে!

লবেরও কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সে বিরোধভাব, সে ঔদ্ধত্য দূরে গিয়া তাহার স্থানে মুহূর্ত্তের মধ্যে এক "প্রীতিঘন" রসের আবির্ভাব দেখা গেল, বীরের গর্ব্বোন্নত শির কি এক যাদুমন্ত্রে বিনয়াবনত—হইয়া পড়িল। আশ্বাস, স্নেহ এবং ভক্তির একমাত্র অবলম্বন—প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান প্রসাদ—এই কি মহাপুরুষ রামচন্দ্র! কি পুণ্যানুভব দর্শন!

চন্দ্রের উদয় হইলে চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হয়, লবের মুখচন্দ্রদর্শনে রামচন্দ্রেরও মন বিগলিত হইল। রাম আর থাকিতে পারিলেন না; লবকে সস্নেহালিঙ্গন করিলেন। সে "পদ্মদলপীন মসৃণসুকুমার" সে চন্দ্রচন্দননিষ্যন্দ জড়স্পর্শ রামকে এক অজ্ঞেয় আনন্দ অনুভূত করাইল। অজ্ঞাত পুত্রস্নেহই যে এই নিভৃত ঘন রসের সঞ্চার, এই অজ্ঞেয় আনন্দের জনক—রাম ইহা কিরূপে বুঝিবেন? তিনি ইহাতে নিমিত্তনিরপেক্ষ অহেতুক স্নেহ প্রবৃত্তিরই খেলা বলিয়া মনে করিলেন।

রামচন্দ্রের এই অকারণ স্নেহ দেখিয়া লব নিজের আচরণের জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইল। "মৃষ্যন্তিদানীং লবস্য বালিশতাং তাতপাদায়"—"লবের এই অবিমৃষ্যকারিতা ক্ষমা করুন" বলিয়া মার্জ্জনা চাহিল। রামচন্দ্র গুণগ্রাহী—তিনি লবের এই কার্য্যটিকে ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার বলিয়া আরও গৌরব দানই করিলেন তেজস্বী অপরের তেজ সহ্য করে না ইহা তাহার প্রকৃতি সিদ্ধ ধর্ম্ম। সূর্য্যদেব অশ্রান্ত তাপ দিলে সূর্য্যকান্তমণি তেজক্ষরণ করিবেই ত।*

অকস্মাৎ লবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুশের গুরুগম্ভীর স্বর নেপথ্য হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনের পথেই কুশ রাজসৈন্যের সহিত লবের যুদ্ধ ব্যাপার শুনিয়া আসিয়াছিল। সে আজ পৃথিবী হইতে সম্রাট্ শব্দ তুলিয়া দিবে, ক্ষত্রিয় জাতির শস্ত্রাগ্নি চিরদিনের মত নির্ব্বাণ করিবে, এমনই তার দৃঢ় সঙ্কল্প। তার সেই মেঘগম্ভীর ধ্বনি কোথায় উত্তেজনা আনিয়া দিবে, না—রামকে আরও পুলকিত করিল। অলক্ষ্যে পুত্রস্নেহও যে কার্য্য করিতেছিল না, তাহাও বলা যায় না। শকুন্তলার তনয় ভরতের দেহস্পর্শে দুষ্মন্তের উপরও একটি অজ্ঞাত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। লব ও কুশ দুইজনেই মহাবীর। অথচ উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কিঞ্চিৎ পার্থক্যও বিদ্যমান। কুশের তুলনায় লব অপেক্ষাকৃত কোমলপ্রকৃতি কুশ অধিকতর তেজস্বী। বিশেষতঃ কনিষ্ঠভ্রাতা লবের সহিত রাজসৈন্যের সংগ্রাম শুনিয়া

---

* অনুরূপ শ্লোক কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে যথা—"স্পর্শানুকূলা অপি—সূর্য্যকান্তা স্তেহন্য তেজোহভিভবাদ্দহন্তি" এমন যে সুখস্পর্শ সূর্য্যকান্তমণি, অন্যতেজের আক্রমণ পাইলে সেও দাহ জন্মাইয়া থাকে। ভারবিতে ও আছে—কিমপেক্ষ্যমানং পয়োধরানং ধনতঃ প্রার্থয়তে মৃগাধিপঃ প্রকৃতিঃ মহীয়সঃ সহতে—নান্যসমুন্নতিঃ যয়া—। ভারবি ২য় সর্গ।

কুশ বিশেষরূপ উত্তেজিত হইয়াই আসরে অবতীর্ণ হইয়া ছিল; তাই কুশকে অত উদ্ধত, অত গর্ব্বিত, অত যুদ্ধপ্রিয় দেখাইয়াছিল। নতুবা বস্তুগত্যা কুশ ঠিক ঐরূপ নহে।

কুশ আসিয়া রামের সম্মুখে দাঁড়াইল। তার দৃষ্টি "তৃনীকৃতজগৎত্রয় সত্বসারা" ত্রিজগতের বলপ্রকর্ষকে যেন তুচ্ছ করিতেছে। তাহার গতি এমতই ধীরোদ্ধতা যেন পদ ভরে ধরিত্রীকে নামাইয়া দিয়া যাইতেছে। বয়সে কুমার কিন্তু পর্ব্বতের মত দৃঢ়। একি মূর্ত্তিমান বীররস—না সাক্ষাৎ দর্প আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল।

লবের অনুরোধে আর রামচন্দ্রের অনুভাব দর্শনে কুশ তখন রামায়ণকথানায়ক অযোধ্যানাথকে অভিবাদন করিল। তখন রামচন্দ্রও সেই "সজলজলধরস্নিগ্ধ" দেহখানি আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী এবং রাজ্যাধিকারী বলিয়া সাধারণতঃ পিতার প্রিয়তর হইয়া থাকে। আর পিতার সাদৃশ্যও জ্যেষ্ঠেই অধিকতর লক্ষিতও হয় তাই কুশকে আলিঙ্গন করিয়াই রামের বিশেষভাবে মনে হইল কিমপত্যময়ং দারক :—" (পুত্রঃ)

অঙ্গাদঙ্গাৎ স্রুতইব নিজো দেহজঃ স্নেহ সারঃ
প্রাদুর্ভূয় স্থিত ইব বহিশ্চেতনা ধাতুরেব।
সান্দ্রানন্দ ক্ষুভিত হৃদয় প্রস্রবেণেব স্পৃষ্টো
গাত্রং শ্লেষে যদমৃততর স্রোতসাসীঞ্চতীব।

এ কি আমার সন্তান! সর্ব্ব অবয়ব হইতে ক্ষরিত আমার দেহজাত স্নেহসার কি সন্তানরূপে পরিণত হইয়াছে? শরীরমধ্য হইতে নিঃসৃত আমার চেতনাধাতু কি মূর্ত্তিমান্ হইয়া আসিয়াছে। "সান্দ্রানন্দ ক্ষুভিতহৃদয়" কি দ্রবীভূত হইয়া পুত্ররূপে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তাই কি আলিঙ্গনে আমার গাত্র অমৃতরসস্রোতে সিঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

শকুন্তলায় দুষ্যন্তেরও মনে হইয়াছিল—আমারই এই সুখ, না জানি পুত্রদেহস্পর্শে জন্মদাতা পিতার কি সুখ হয়?

রামচন্দ্র তখন কুশ ও লবের মধ্যেও রঘুকুলকুমারের ছায়া প্রত্যক্ষ করিলেন। সেই "কপোতকণ্ঠ শ্যামল" দেহ সেই সৌষ্টবপূর্ণ সুন্দরগঠন সেই "প্রসন্নসিংহস্তিমিত" দৃষ্টি, সেই "মার্দ্দিল্যমৃদঙ্গ" মাংসল ধ্বনি—রঘুকুমার না হইয়া যায় না। আরও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে গিয়া দেখিলেন,—একি, জনকতনয়ার সেই সৌসাদৃশ্য পরিস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান। প্রিয়ার আমার অভিনব শতদলের মত মুখশ্রীটী পর্য্যন্তও যেন সম্পূর্ণ বিদ্যমান। সেই মতই মনোহারিণী মুক্তাদন্তচ্ছবি, সেই মতই আরক্তিম অধরোষ্ঠ ভঙ্গী, সেই মতই শোভমান কর্ণযুগল। নেত্রদুটী যদিও বীরোচিত, "রক্তনীল" তথাপি সেই মতই সৌভাগ্যগুণযুক্ত, সেই মতই নয়নানন্দকর।

রামের চিত্তে তখন কতই আশায় নূতন নূতন তরঙ্গ ফুটিতে লাগিল। ইহাদের অস্ত্রকাস্ত্র স্বতঃপ্রকাশ, জন্মসিদ্ধ দেখিতেছি ইহা আমার একটি আশ্বাস (প্রথম) আর সেই নির্জ্জন বিশ্রম্ভা "সহজলজ্জাজড়নয়না" সীতারও গর্ভগ্রন্থি দ্বিধা অনুভব করিয়াছি (ইহা দ্বিতীয়) পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, আর সীতার সেই "নিন্দিত নির্ব্বাসন" তখন মনে

পড়িল। রামের নেত্র হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া কপোল দুটী প্লাবিত করিল।

কুশলব আপনাদিগকে বাল্মীকির শিষ্যরূপেই মনে করে; রামচন্দ্রের পুত্র সীতাদেবীর সন্তান ইহা তাহারা জানে না। তবে বাল্মীকির রচিত রামায়ণে রাম সীতার অনেক কথাই তাহারা পাঠ করিয়াছে। পুত্রের মুখে বিশেষতঃ শিশুজনের মুখে পিতা মাতা বা রাজরাণীর অর্থাৎ রামচন্দ্র সীতাদেবীর প্রণয়ের কথা বড়ই মিষ্ট লাগে। কুশ লবকে বুঝাইতেছে—"সীতার বিহনে রামের কত দুঃখ, প্রিয়ানাশে সমগ্র জগৎ তাঁহার কাছে অরণ্য, তাঁহাদের কি ভালবাসা, আর সেই নিরবধি বিরহ কি মর্ম্মান্তিক।" "নিরবধি" বিরহ—তৃতীয়াঙ্কে একবার রাম নিজেই বলিয়াছেন। তবু এখানে রাম কাঁপিয়া উঠিলেন। পাঠকগণ কাঁপিয়া উঠুন, তাহা হইলে নিরবধি বিরহকে সাবধি করায় (রাম সীতার মিলন দ্বারা) কবি পাঠকগণের সহানুভূতির পাত্র এবং প্রশংসার ভাজন হইবেন।

কুশ রামকে রামায়ণের শ্লোক শুনাইতেছেন :—কি মধুর কি! উপভোগ্য মন্দাকিনী তীরে চিত্রকূট বনবিহারে সীতাদেবীর উদ্দেশ্যে রঘুপতির উক্তি :—

ত্বদর্থমিব বিন্যস্তঃ শিলাপট্টোঽয়মগ্রতঃ।
যস্যায়মভিতঃ পুষ্পৈঃ প্রবৃষ্টইব কেশরঃ॥

দেবি! এই শিলাপট্টের আসন তোমারই বসিবার জন্যই বিন্যস্ত আছে। দেখ ইহার চারিধার বকুলতরু পুষ্প বৃষ্টি করিয়া কেমন সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে।

রামের চক্ষুর উপর তখন ভাসিয়া উঠিল—"সীতার সেই বায়ু তরলিত" অলকাবলী, সেই রক্তিমোজ্জ্বল কপোল দুখানি, সেই "নিরাভরণসুন্দর" মুখশ্রী। রাম তন্ময় হইয়া স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিলেন।

এদিকে বশিষ্ঠারুন্ধতী বাল্মীকি জনক এবং দশরথ মহিষীরা বালকদের যুদ্ধ সংঘটন শুনিয়া দ্রুতপদে যুদ্ধভূমি অভিমুখে আসিয়া পড়িলেন। বহুদিনের পর রামের সহিত সাক্ষাৎ; রাম কোন্ মুখে আর তাঁহাদের নিকট মুখ দেখাইবেন। ইহার অপেক্ষা রামের হৃদয় যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেলেও ভাল ছিল। দূর হইতে জনক কৌশল্যাদিরাও "অনুভবমাত্রাবশেষ" সীতাশোকে শীর্ণকায় রামকে দেখিবা মাত্র মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তারপর দুঃখের মধ্যে, মর্ম্মবেদনার মধ্যে, সান্ত্বনার মধ্যে তাঁহাদের মিলন সংঘটন হইল। সে মিলন ভাষায় প্রকাশের নহে, তাহা রঙ্গমঞ্চের অন্তরালেরই যোগ্য। ঘটিলও তাই। আদি এবং বাৎসল্য রস যেন হাত ধরাধরি করিয়া পাশাপাশি দণ্ডায়মান। দুই ক্ষুদ্র নদী একই সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া ধীরে ধীরে প্রবহমান। আদি এবং বাৎসল্য দুইটী রসই রামচন্দ্রে আসিয়া প্রকৃত পরিণতি লাভ করিয়াছে। দুইটী নদী একই সাগরে পঁহুছিয়া কৃতার্থ হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রী রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী।

রামমোহন রায়ের হৃদয় সম্বন্ধে দু' একটি কথা

কখনও কখনও এমন দু' একটি শিশু দেখিতে পাওয়া যায়, যাদের মনের ভাবগুলি খুব প্রবল, কিন্তু সে সকল প্রকাশ পায় না, চাপা থাকে। তারা খুব ভালবাসে, খুব ভালবাসা চায়, কিন্তু বলিতে পারে না। অনেক চিন্তা করে, কিন্তু সে চিন্তা মনে মনেই রাখে, প্রকাশ করে না। রামমোহন রায় বাল্যকালে এই রকম ছেলে ছিলেন।

এরূপ প্রকৃতি নির্জ্জনতাপ্রিয় হয়। নির্জ্জনে বসিয়া নিজের ভাবনা ভাবিতে, ভবিষ্যতে কি করিব তাহার কল্পনা করিতে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আকাশকুসুম রচনা করিতে, ভালবাসে। রামমোহন রায়ের বাল্য জীবনে এই প্রকৃতির লক্ষণ দেখিতে পাই।

এ রকম ছেলেদের অভিনিবেশশক্তি প্রবল হয়। অনেকক্ষণ একবিষয়ে মন দিয়া থাকিতে পারে। বালক রামমোহন তাহা পারিতেন। একদিন পড়িতে পড়িতে এমন মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে আহার নিদ্রা মনে ছিল না; আহারের সময়ে তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিতে

।

এ রকম ছেলেরা সন্ন্যাসী হইবার কল্পনা করে। রামমোহন তাহাও করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম লইয়া পিতামাতার সঙ্গে বিরোধ হইলে এরূপ প্রকৃতিতে যাহা হওয়া সম্ভব, রামমোহনের জীবনে তাহাই হইয়াছিল। পিতার সঙ্গে তর্কে, বিনয় ও সঙ্কোচ বশতঃ তিনি মনের সব কথা বলিতে পারিতেন না; অনেক কথা মনেই চাপিয়া রাখিতেন। প্রচলিত মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে তাঁহার মনে কত যে গভীর বিরাগ ছিল, তাহা পিতার সম্মুখে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। বহু বৎসর মনের ভিতর যে বিরক্তি চাপা ছিল, পিতার মৃত্যুর পর "তুহ্ফৎ উল্ মুওয়াহিদ্দীন্" নামক যে ফারসী বইখানি লিখিলেন তাহাতে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। বহুদিনের রুদ্ধ মনোবেগের তীব্রতা ঐ পুস্তকের পত্রে পত্রে রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এরূপ প্রকৃতি খুব ভালবাসে, খুব ভালবাসা চায়, কিন্তু ভালবাসার গভীরতা সহজে প্রকাশ করিতে পারে না; অল্প বাধাতেই ভালবাসার বাহিরের প্রকাশটা বাধিয়া যায়; বিশেষতঃ বালকবয়সে প্রায়ই এরূপ ঘটে। এরূপ প্রকৃতিতে, অন্তরের গোপন অথচ সতেজ ও প্রবল পারিবারিক প্রীতির সহিত যখন ধর্ম্মবিশ্বাসের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন তাহা সমগ্র হৃদয় মনকে আন্দোলিত, আলোড়িত করিয়া তোলে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহনের মত যখন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তখনও তিনি মাকে কত যে ভালবাসিতেন, তাহা হয়ত কোনও দিন মার কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম না করিয়া কখনও বাড়ীর বাহির হইতেন না, ইহাতেই তাঁর মাতৃভক্তির গভীরতা বুঝিতে পারি। একবার তিনি বিদেশ হইতে বাড়ী আসিয়া, মাতার বক্ষে স্থান পাইবেন বলিয়া মাতার দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মা বলিলেন, "দাঁড়াও, আগে আমার রাধাগোবিন্দজীউকে প্রণাম করিয়া এস, নতুবা আমার কাছে আসিতে পারিবে না।" রামমোহনের মাতৃভক্তি

প্রবণ হৃদয়ে তখন কি আন্দোলন, কি সংগ্রাম! কথিত আছে, রামমোহন ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, তারপর মার কোলে গিয়া বসিলেন। এ কাহিনী সত্য কি না, জানি না; এরূপ কাজ সমর্থনযোগ্য কি না, তার বিচারও করিব না। কিন্তু এই ছবিখানি ভাল করিয়া দেখিতে বলি; ইহাতে রামমোহনের সেই সময়কার মনের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলার বৈষ্ণবপরিবারগুলি ভাবপ্রধান প্রকৃতির বিকাশের অনুকূল স্থান। বৈষ্ণব-পরিবারে জন্ম বলিয়া রামমোহন কোমল হৃদয় পাইয়াছিলেন। সহজে অপরের দুঃখে বিচলিত হয়, কাহারও সম্বন্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে না, ব্যবহার নম্রমধুর, স্বীয় ইষ্টদেবতাকে ভক্তির অধিগম্য লীলাময় পুরুষ (person) বলিয়া অনুভব করিতে ও সমবিশ্বাসীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার ভজনা করিতে উৎসুক,—এই ভাবগুলি বৈষ্ণব সমাজে সহজে ফুটিয়া উঠে। পরিবার সূত্রে রামমোহন এগুলি পাইয়াছিলেন।

কিন্তু রামকান্ত রায়ের পরিবারে বৈষ্ণব পরিবারের আর কোনও বিশেষত্ব বিদ্যমান ছিল না। তিন চারিপুরুষ ধরিয়া বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহাদের মধ্য হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্যান্য লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়াছিল। সে লক্ষণ কি ?

শ্রীচৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম নিজসম্প্রদায়ের মানুষকে শুধু ভক্তিপ্রবণ করে নাই, তাহাদিগকে একটা ধর্ম্মের ইতিহাসও দিয়াছিল। বিজেতা জাতির লোকেরা যেমন আপনা-দিগকে দেশের আর সকল মানুষ হইতে কোনও কোনও বিষয়ে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করে, যেমন আপনাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা বিশেষ গৌরবে গৌরবান্বিত বলিয়া অনুভব করে, তেমনি যাহাদের মধ্য দিয়া কোনও নূতন ধর্ম্মবিধান জগতে অবতীর্ণ হয়, তাহারা আপনাদিগকে ও আপনাদের বিশেষ ভাব ও সাধনগুলিকে অত্যন্ত গৌরবের চক্ষে দর্শন করে। নিজেদের অতি প্রিয় বিশেষ ভাব ও বিশেষ আদর্শগুলি, সুরার মত, তাহাদিগকে মত্ত ও উত্তেজিত রাখে। ভবিষ্যৎকে তাহারা আলোকময় দেখে, ও আপনাদিগকে সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অঙ্গ বলিয়া অনুভব করে।

রামকান্ত রায়ের সময়েও বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের স্মৃতিতে এমনি প্রমত্ত, তাঁহাদের গৌরবে এমনি অনুপ্রাণিত বৈষ্ণবপরিবারসকল বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রামকান্ত রায়ের পরিবার এইরূপ ছিল না। এজন্য রামমোহন রায় পৈতৃক ধর্ম্ম হইতে কোমল ও উদার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন; ঈশ্বরকে প্রীতিভক্তির অধিগম্য পুরুষ (person) রূপে প্রতীতি করিবার জন্য মানসিক প্রবণতা লাভ করিলেন; মিলিতভাবে ঈশ্বরের ভজনা বন্দনায় স্বাদ গ্রহণের শক্তি পাইলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবসংক্রান্ত যে সকল তত্ত্ব ও ভাব বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ নিজস্ব, সে সকল পাইলেন না।

রামমোহন রায়ের কর্ম্মময় জীবনের কথা চিন্তা করিবার সময় তাঁহার অন্তরের দিকটিও খুব ভাল করিয়া মনে রাখা দরকার। তাঁহার কার্য্য ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির আলোচনার দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে এই ধারণা হয় যে প্রধানতঃ তিনি জ্ঞানবীর, তর্কবীর ও কর্ম্মবীর ছিলেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক হইবে। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের প্রধান লক্ষণগুলি দেখিয়া বুঝা যায় না যে তাঁহার অন্তরের প্রধান ঝোঁকটি কোন্ দিকে ছিল।

দেশের অবস্থা তাঁহাকে তার্কিক যোদ্ধা ও সংস্কারক হইতে বাধ্য করিয়াছিল। তিনি বেদান্ত লইয়া এত নাড়াচাড়া করিলেন কেন? 'বৈদান্তিক' বলিলে সাধারণতঃ যে—প্রকৃতির মানুষ আমরা বুঝি, তিনি কি সেই—প্রকৃতির মানুষ ছিলেন? কখনও নয়। বহুদেববাদ ও নাস্তিক্যবাদ খণ্ডনের জন্য ভারতবর্ষে চিরদিনই বেদান্তকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে; রামমোহনও তাই করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে বেদান্ত তখন খুব কম লোকই পড়িত, তাই বেদান্ত বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে বাংলা সংস্কৃত ও ইংরাজীতে এত বই লিখিতে হইয়াছিল; পশ্চিমে হইলে এত দরকার হইত না। রামমোহন রায় বেদান্তকে যত্ন করিয়া হাতে রাখিয়াছিলেন; প্রাণ জুড়াইবার জন্য বুকে রাখেন নাই।

নিরাকার একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের উপাসনা যে সম্ভব ও তাহাই যে শ্রেষ্ঠ উপাসনা ইহা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া, এবং ব্রহ্মসভায় ব্যবহারের উপযোগী উপাসনাপ্রণালী প্রণয়ন করিতে গিয়া, তিনি প্রধানতঃ বেদান্তবচনেরই সাহায্য লইলেন বটে; কিন্তু বেদান্তের শীর্ণ ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার হৃদয় ব্যক্তিরূপী ভগবান্‌কে ধরিবার জন্য তৃষিত ছিল। এই জন্য, যাই খ্রীষ্টিয়দিগের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিল, অমনি তাঁহার মন প্রবল আবেগে যীশুর পিতা ঈশ্বরকে ধরিল। শুধু তাই নয়; তাঁহার জীবনচরিতে ইহা দেখিতে পাই যে, "কে জানে তোমায় তারা, তুমি সাকারা কি নিরাকারা" এই শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতটী ভক্তির সহিত তাঁহার নিকটে গাওয়া হইয়াছে, আর তিনি ভাবে বিভোর হইয়াছেন। এ সকল হইতে বেশ বুঝিতে পারি, তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতাকে লোকের কাছে প্রমাণ করিয়াছেন ও প্রচার করিয়াছেন জ্ঞানের দ্বারা। কিন্তু নিজ জীবনে তাঁহাকে ধরিয়াছেন ভক্তির দ্বারা। এই ভক্তির স্রোত তাঁহার জীবনে অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন ছিল; কিন্তু ইহাকে ভুলিলে চলিবে না।

১৮১৪ হইতে ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মজীবন। এই ষোল বৎসরে তিনি কত সংগ্রাম করিলেন; বীরোচিত চরিত্র কত দিক দিয়া প্রকাশ করিলেন; বড়লাট সাহেবের কাছেও নিজ তেজস্বী মনুষ্যত্বের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। কিন্তু তাঁহার এই বীরত্বের মধ্যে কোন উগ্রতা ছিল না, উষ্মা ছিল না। শুধু তাই নয়। তাঁহাকে তাঁহার জীবনের ছোট বড় নানা কাজে ও মানুষের সঙ্গে নানা ব্যবহারে কর্ত্তৃত্বপ্রধান অথবা বুদ্ধিপ্রধান মানুষ বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে নিজ হৃদয়ের মহত্তম ভাবের প্রেরণায়, উন্নত হৃদয়াবেগের চালনায় চলিতেছেন। তাঁহার এই হৃদয় যে কত মহত্ত্ব, উদারতা ও কোমলতার আধার ছিল, তাঁর প্রাণ যে ভাবে উচ্ছ্বসিত ভক্তিতে উদ্বেলিত হইতে জানিত, এ কথা ভুলিলে তাঁহাকে কিছুই বোঝা হইল না। তিনি শিশুদের সঙ্গী হইয়া তাহাদের দোল দিয়াছেন; দাসীকেও অগ্রে আসন দিয়া পরে নিজে আসন গ্রহণ করিয়াছেন; রাজপথে শ্রান্ত তরকারীওয়ালার চেঙ্গারী তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়াছেন—ইহা আমরা ভুলিব না। দেশের লোকের কতরকম ব্যথায় তিনি যে ব্যথিত হইতেন, তাঁহার বহুমুখীন সংস্কার প্রয়াসের দ্বারা তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় কত যে বিশাল ছিল, অপরাপর দেশের স্বাধীনতার সম্মান করিয়া তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

আবার স্মরণ করি, তিনি ভালবাসিতেন অনেক, ভালবাসা চাহিতেনও অনেক। ভালবাসা দেওয়া, ভালবাসা চাওয়া, এই দুই আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্মজীবনের সাহচর্য্যের আস্বাদন পাইলে মানুষের প্রাণে অনেক অধিক গভীর আকার ধারণ করে। রামমোহন য়ুনিটেরিয়ানদের সঙ্গে প্রথমে সংবেত উপাসনার আস্বাদ পাইলেন। ক্রমে তাঁহার নিজের একটি দল প্রস্তুত হইল। তখন সেই দলের মানুষ গুলিকে তিনি কত যে ভালবাসিতে লাগিলেন, তাহাদের কত যে মূল্যবান মনে করিতেন! তাঁহার ঐশ্বর্য্যশালী হৃদয়ের সকল প্রেমরত্ন তাহাদের উপরে যেন ঢালিয়া দিলেন। একটু সুখী হইলে অমনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেন। এত বড় বীর, তাদের কাছে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

কিন্তু ব্রহ্মসভার সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার দ্বারা তিনি ধর্ম্মজীবনে সাহচর্য্য যতটুকু লাভ করিলেন, তাহা তাঁহাকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারিল না। ব্রহ্মসভার সভ্যদের মধ্যে প্রায় কেহই ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হৃদয় লইয়া, সত্য ঈশ্বরভক্তি লইয়া, আসিতেন না। তাঁহারা যুক্তি তর্ক শুনিয়া একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন, তাই ব্রহ্মসভায় বসিয়া ব্রহ্মের স্বরূপদ্যোতক শ্লোক ও স্তুতিবন্দনা শুনিয়া সুখী হইতেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের প্রাণ এত টুকুতে তৃপ্ত হয় নাই। যাঁহাকে পিতা, মাতা, প্রভু, সখা বলিয়া ডাকা যায়, এমন ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে (personal God) প্রাণ দিয়া ধরিতে ও ভক্তি দিয়া ভজনা করিতে তিনি ব্যাকুল ছিলেন; ভক্তি দিয়া যাহারা তাঁহার ভজনা করিতেছে এমন সঙ্গীদের সঙ্গলাভের জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন। এমন ভক্তিমান্ সমবিশ্বাসী মণ্ডলীর সঙ্গ তিনি এদেশে লাভ করেন নাই।

এই সঙ্গলাভের জন্য তাঁহার প্রাণ ইংলণ্ডের দিকে তৃষিত হইয়া চাহিতেছিল। তাঁহার কাছে ইংলণ্ড ছিল হৃদয়ের ভক্তিবৃত্তির তৃপ্তি সাধনের স্থান,—আত্মার সেই স্বদেশ, যেখানে এক পিতার চরণ বন্দনা অনেক ভাই ভগিনী মিলিয়া করিবেন। এই জন্যই স্বদেশের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সেবক, ভারতের সর্ব্ববিধ হিতে উৎসৃষ্ট জীবন রামমোহন, এমন অনুরাগরঞ্জিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে ইংলণ্ডকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শেষ জীবনে রামমোহন রায়ের প্রাণে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের অর্চ্চনা ও ভক্তিমান সমবিশ্বাসীর সঙ্গ অন্বেষণ এই দুইটাই প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা (absorbing passion) হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার ইংলণ্ড গমনের নানা কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে; আমার মনে হয় তাঁহার অন্তরের গোপনে তিনি এই কারণটিকেই সর্ব্বপ্রধান স্থানে রাখিয়াছিলেন।

সেখানে গিয়া তিনি আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে কেবল খণ্ডন প্রতিবাদ ও বিশুদ্ধ মত লইয়া ধর্ম্মসমাজের (church) জীবন গাঢ় হয় না; এ সকলে মানব-প্রাণের গভীরতম ক্ষুধা মিটে না। এইজন্য জীবনের শেষ এক বৎসর তিনি য়ুনিটেরি-য়ানদের মন্দির অপেক্ষা ত্রিত্ববাদী খৃষ্টিয়ানদের মন্দিরে অধিক যাতায়াত করিতেন। প্যারিস হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার এ ভাব আরও বাড়িয়াছিল। তিনি দেখিয়া

আসিয়াছিলেন যে শুধু যুক্তি ও জ্ঞানের পথে চলিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে কেহ বা আস্তিক হইয়াছে ও কেহ বা নাস্তিক হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সকলেরই জীবন সমান ভাবে ঈশ্বরবিহীন।

রামমোহন রায়ের জীবন আলোচনা করিতে গিয়া সাধারণতঃ আমাদের মনে তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্মের কথাই বারবার উদয় হয় ও ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় সূত্রটি বারবার ছিন্ন হইয়া যায়। আজ আমরা সেই রামমোহনকে স্মরণ করি, যিনি আবাল্য ভক্তিতে দীক্ষিত, যিনি বাল্যে ভাগবত শ্রবণ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না, যিনি শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জনের অভিনয় দেখিতে পারিতেন না; যিনি পরম মাতৃভক্ত, মাতৃ-অনুগত ছিলেন; প্রেমের সরল সাধক হাফিজকে যিনি জীবনের সঙ্গী করিয়াছিলেন; যিনি বালকের কাছে বালক, দরিদ্রের বন্ধু ও নারীর পরম সহৃদয় পরমশ্রদ্ধাবান্ সেবক ছিলেন, ভাবপূর্ণ কথায় সঙ্গীতে অভিনয় দর্শনে যাঁহারা চক্ষু আর্দ্র হইত, ভাবাবেশে যিনি প্রিয়বন্ধুগণকে আলিঙ্গন করিতেন; ভক্তিমান্ সর্ব্ববিশ্বাসীর সহিত হৃদয়ের দেবতার অর্চ্চনার জন্য যিনি চিরব্যাকুল ছিলেন, এই ব্যাকুলতার বশে যিনি স্বদেশে ও বিদেশে মন্দির হইতে মন্দিরে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন হৃদয় কোথায় তৃপ্ত হয়; গাড়ীতে বসিয়াও যিনি নিরন্তর প্রার্থনা করিতেন; সমবেত ঈশ্বর-বন্দনার ক্ষেত্রে যাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, নয়নযুগল অশ্রুর প্লাবনে ভাসিয়া যাইত। তিনি ইংলণ্ডের কাছে ভারতবর্ষের, পশ্চিমের কাছে প্রাচ্যের, প্রথম দূত; কিন্তু তিনি শুধু নব্যভারতের প্রথম জ্ঞানী প্রথম ধর্ম্মসংস্কারক, প্রথম রাজনীতিবিৎ, প্রথম লোকহিতৈষীরূপে তথায় উপস্থিত হন নাই। তিনি নব্যভারতের প্রথম ভক্ত, সর্ব্বপ্রথম ভক্তি-দূত। তিনি সুনির্ম্মল ঈশ্বর ভক্তিতে ইংলণ্ডকে আপন ভাবিয়াছিলেন, আপন করিয়াছিলেন। এখন রাজনীতি লইয়া ইংলণ্ডের সহিত ভারতের মন কষাকষি চলিতেছে; ইহাতে আমরা সুখী নই। হয়তো সেই এক পরমদেবের প্রতি মানব হৃদয়ের বিমল ভক্তিই আবার দুই দেশকে বাঁধিয়া এক করিতে পারিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নৈরঞ্জনা তীরে।

ফল্গু নদী আঁকা বাঁকা রজত ধারার মতন বহিয়া যাইতেছে। ওদিকে পাহাড় নিঝুম হইয়া তাহার রজত লীলা দেখিতেছে। নীল আকাশ উপরে নিথর হইয়া আছে। সমগ্র প্রকৃতি চুপ করিয়া যেন ধ্যান করিতেছে। ফল্গুর ধারে ধারে একখানা টম টমে চড়িয়া দুইটি বাঙ্গালী বন্ধু বুদ্ধ গয়া দেখিতে যাইতেছি। সেথায় পৌছিলাম। প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরের ওপাশে একটা প্রাচীন নদীর ভগ্নাবশেষ। শব্দটা নদীর

পক্ষে না খাটিলেও ভগ্নাবশেষই বলিলাম, কেন না তাহার নদীত্ব যেন পুকুরত্বে পরিণত হইয়াছে। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে তাহার এদশা ছিল না। সে তাহার শুভ্র পার্ব্বত্য স্রোত একসময় ফল্গুতে ঢালিয়া স্থানটাকে একটা প্রয়াগ বানাইয়া রাখিয়াছিল। তখন ওখানে বস্তি ছিল না, মন্দির ছিল না, ছিল শুধু একটা জঙ্গল। ঐ জঙ্গলের নাম ছিল উরুবিম্ব, আর ঐ নদীটার নাম ছিল নৈরঞ্জনা।

যে পথ দিয়া আমাদের একাশ্ব যান উরুবিল্বের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সম্ভবতঃ সেই পথ দিয়াই সে যুগে সন্ন্যাসী রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজগৃহের আশ পাশের পাহাড় গুলি হইতে, আপনার গুরুগণের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া জীবন প্রহেলিকার মর্ম্মোদ্ভেদার্থ, একাকী পদব্রজে উরুবিল্বের ঐ প্রয়াগের দিকে ধীরে ধীরে পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অহো! আমাদের কি ভ্রান্তি! তীর্থে আসিলাম গাড়িতে চড়িয়া! আমাদের উচিত ছিল, ফল্গুতীরে ঐ রাজসন্ন্যাসীর পদ চিহ্ন খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে চিহ্ন গুলিতে চুম্বন করিতে করিতে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু সে চিহ্ন কোথায়। কালস্রোতে ফল্গুনদী সে চিহ্নগুলি ধুইয়া লইয়া গিয়াছে। ভারতের বুকে সে রাজসন্ন্যাসীর পদ চিহ্ন আর নাই। থাকিলে স্বার্থের সেবায় আমরা কেন পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছি? ধর্ম্মের ঝঙ্কারে বিপণি খুলিয়া ধর্ম্মের নামে কতকগুলা মন গড়া পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেছি? ধিক আমাদের! ধিক্ আমাদের!

দুই বন্ধু নৈরঞ্জনার তীরে গেলাম। সিদ্ধার্থ কোথায়? প্রাচীন বোধিদ্রুমের স্থানে নব বোধিদ্রুম উদ্গত হইয়াছে। বোধিদ্রুমের নীচে বুদ্ধ নাই। প্রকাণ্ড প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মাতার বুদ্ধভক্তির পরিচয় দিতেছে। কিন্তু সে মন্দিরে ভক্তি নাই। কতকগুলি মূর্ত্তি আছে; কিন্তু গয়ালিরা সেগুলিরও নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। স্বার্থ ও পেটের সেবায় তাহারা তীর্থযাত্রীগণকে নানা উপায়ে ঠকাইয়া খাইতেছে। স্থান আছে, স্থানের মাহাত্ম্য নাই!

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

সমসাময়িক কথা।

(৮)

পারিবারিক কথা

আমাদের নিজের পরিবার খুব ছোটই ছিল। আজি কালিকার হিসাবে বাবা, মা, আমার ছোট ভগিনী এবং আমি—আমরা চারিজন মাত্র এই পরিবারের লোক-সংখ্যা ছিলাম। কিন্তু সে কালে প্রায় সকল সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতেই অনেক আত্মীয়-স্বজন বাস করিতেন। আমাদের শ্রীহট্টের বাসায়ও অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিলেন। কেহ বা চাকুরীর চেষ্টায় সহরে আসিতেন। চাকুরী পাইলেও আমাদের

একসঙ্গেই থাকিতেন ; আর কেহ বা লেখাপড়া শিখিবার জন্য আসিতেন। এইরূপে শ্রীহট্টের বাসায় আমার ছাত্রাবস্থায় কখনও একাকী থাকিতে হয় নাই। আমার নিজের ছোট মাতুল, আমার বিমাতার ছোট ভাই, আমার মাসতুত ভাই দু'জন একজন আমার বড় একজন আমার ছোট, দু'জন জ্ঞাতিসম্পর্কে আমার খুড়তুত ভাই ও একজন জাঠতুত ভাই—এ ছাড়া একেবারে নিঃসম্পর্কিত একটী ভদ্রসন্তান আমাদের বাসায় থাকিয়া শ্রীহট্টের স্কুলে পড়িতেন। সুতরাং বাবার একমাত্র পুত্র বলিয়া আমাকে বাল্যে ও যৌবনে কোনও দিন নিতান্ত একাকিত্বের মধ্যে বাস করিতে হয় নাই। সেকালে যাঁহারা সহরে একটু ভাল কাজ-কর্ম্ম করিতেন তাঁহাদের সকলের বাসাই এইরূপ আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত, আর প্রায় সর্ব্বত্রই এ সকল আত্মীয়-স্বজনেরা গৃহস্বামীর পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইতেন। খাওয়া-পরা সম্বন্ধে ইঁহাদের সঙ্গে বাড়ীর ছেলেদের কোন প্রকারের প্রভেদ ছিল না। আধুনিক বাবুয়ানা জিনিষটা তখনও সমাজে প্রবেশ করে নাই। সাদামাটা ভাবে ধনী লোকেরাও বাস করিতেন। সখ-সৌখীনতাতে কেহই প্রায় অযথা অর্থ ব্যয় করিতেন না। অতি বাল্যকালে বাবার যে আদর পাইতাম, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন অনেকগুলি সমবয়স্ক আত্মীয়-স্বজন শ্রীহট্টের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন হইতে আমার শৈশবের আদর-যত্নের মাত্রা একেবারেই কমিয়া গেল। এতগুলি বালককে ভাল ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ দেওয়া সম্ভব ছিল না। আর এইজন্য আমাকেও ভাল ভাল কাপড়-চোপড় দেওয়া অসঙ্গত হইয়া উঠিল। বৎসরে একবার করিয়া পূজার সময় আমরা সকলেই একটি জামা ও একজোড়া জুতা পাইতাম। এই জুতা ও জামা ছিঁড়িয়া গেলে বছরের মধ্যে আর জামা জুতা পাইতাম না। কেবল শীতের সময় মাঝে মাঝে, বাবুয়ানার জন্য নহে, কিন্তু শীত-নিবারণের জন্য, এক একটা গরম কোট পাইতাম। বর্ষার সময় একটু বড় হইলে এক জোড়া রবারের জুতা পাইতে আরম্ভ করি। শ্রীহট্টে থাকিতে কোনও দিন চটীজুতা পায় দিই নাই, খড়মই সচরাচর ব্যবহার করিতাম। আর বৎসরের অধিকাংশ সময়ই খালি পায়ে স্কুলে যাইতাম। মোজা ব্যবহার করা তখন একটা বিশেষ সৌখীনতার লক্ষণ ছিল। সুতরাং শ্রীহট্টে থাকিতে কোনও দিন মোজা পরিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। নয় দশ বৎসর পর্য্যন্ত বাবার কাছেই শুইতাম। তার পরে বাহির বাড়ীতে অন্যান্য সমবয়স্কদিগের সঙ্গে প্রায়ই তক্তপোষের উপরে সতরঞ্চি ও চাদর বিছাইয়া শুইতাম। শীতকালে লেপ ও তোষক মিলিত। গ্রীষ্মকালে প্রায় পাটীর উপরেই শুইতে হইত, তবে বাল্যাবধি আমার একটু কু অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল ; পাশবালিশ না হইলে ঘুমাইতে পারিতাম না। এজন্য বড় হইয়া বাবার নিকটে অনেক তিরস্কার ভোগ করিয়াছি। কিন্তু এ সকল তিরস্কার সত্বেও প্রায় সর্ব্বদাই কলে কৌশলে একটা পাশবালিশ জোগাড় করিয়া লইতাম। এ ছাড়া সাজসজ্জা সম্বন্ধে বাসার অন্যান্য ছেলের সঙ্গে আমার কোনও প্রভেদ ছিল না। বাবা কোনও প্রকারে আমার অন্তরে এরূপ ভেদজ্ঞান জন্মাইতে দেন নাই।

কিন্তু এবিষয়ে মায়ের শাসন বাবার শাসন অপেক্ষা বেশী কড়া ছিল। মা এসকল সমবয়স্কদিগের সঙ্গে আমার কোনও প্রভেদ করিতেন না। কেবল তাহাই নহে, বরঞ্চ তাহাদিগকে সর্ব্বদাই আমাপেক্ষা বেশী যত্ন করিতেন বলিয়া মনে হইত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও শ্রীহট্ট সহরেও সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্নের আমদানী হয় নাই। জিলাপীই বাজারের একমাত্র মিষ্টান্ন ছিল। কিন্তু জিলাপীও কেবল কালেভদ্রে বাড়ীতে আসিত। সচরাচর আমরা চার বেলাই ভাত খাইতাম। প্রাতঃকালে গরম ভাত, ঘী এবং কচু, বেগুণ, কুমড়া প্রভৃতি সিদ্ধই আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল। দশটা সাড়ে দশটার সময় স্নানান্তে ডাল ভাত মাছ খাইয়া স্কুলে যাইতাম। আমার একজন জ্ঞাতিসম্পর্কে বিধবা জ্যাঠাইমা এ সময়ে আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। এ সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না বলিয়া জীবনের শেষভাগ আমাদের বাড়ীতেই কাটাইয়া যান। তাঁর পাকশালায় আমাদের বৈকালের জন্য ভাত ও নিরামিষ তরীতরকারী রান্না করিতেন। স্কুল হইতে আসিয়া আমরা তাহা খাইতাম। এই বিকালের আহারের একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে এসময়ে প্রায়ই মা আমাদের সকলকে নিজের হাতে খাওয়াইয়া দিতেন। একটা বড় গামলায় ভাত লইয়া বসিতেন। তাহাতেই ভাত তরকারী মাখিয়া নিজের হাতে আমাদের মুখে তুলিয়া দিতেন। আমরা ঐ গামলাটার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিতাম। এই আহারের সময় আমি মাঝে মাঝে বড় রাগ করিতাম। মা, আমি যেখানেই বসি না কেন,—বৃত্তের গোড়ায়ই বসি কিম্বা মাঝখানেই বসি,—সর্ব্বদাই অপর সকলের মুখে দিয়া সর্ব্বশেষে আমার মুখে দিতেন। তাঁহার এই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া আমি চটিয়া লাল হইয়া যাইতাম। কোনও কোনও দিন বা রাগ করিয়া খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া যাইতাম। কিন্তু মার এমনি কঠোর শাসন ছিল যে তিনি একদিনও আমার রাগ ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করেন নাই। রাগ করিয়া খাবার ফেলিয়া গেলে কখনও আদর করিয়া ডাকেন নাই, বরঞ্চ বেশী বাড়াবাড়ি করিলে বেদম মারিয়াছেন। বাবার মক্কেলেরা মামলা জিতিয়া প্রায়ই নানাপ্রকারের খাদ্যদ্রব্য ভেট পাঠাইয়া দিতেন। আর মা বাড়ীর অপর সকলকে না দিয়া কোনও দিন আমাকে এ সকল খাবারের এক টুকরাও দিতেন না। তাঁহার এই কঠোর শাসনে প্রথমযৌবনেও আমার মনে ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে আমার নিজের মা মরিয়া গিয়াছেন, ইনি আমার বিমাতা। বড় হইলে মা আমার এই ভুলটা ভাঙিয়া দেন। একদিন আমাকে ডাকিয়া কহিলেন যে এখন আমার বয়স হইয়াছে; এখনও কি আমি বুঝিব না যে পরের ছেলে যাহারা তাঁহার ঘরে আছে, তাহাদের আগে না খাওয়াইয়া তিনি আমাকে খাওয়াইতে পারেন না। সেদিনের কথা এখনও মনে আছে। আমি কহিলাম, "তা যেন হল; কৃপা আমার আগে পায় কেন?" কৃপাময়ী আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম ছিল। মা কহিলেন, "এ সংসারের যা কিছু সকলই ত তোমার; কৃপা দু'দিন পরে পরের ঘর করিতে যাইবে। এ সংসারের উপর তখন ত তার আর কোনও দাওয়াদাবী থাকিবে না। এইজন্য এই দু'দিন তাকে একটু বেশী আদরযত্ন করি; ইহাতে তোমার আপত্তি হইবে কেন?" মা লিখিতে

পড়িতে জানিতেন না। সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রমহিলারা কেহই কোনও কেতাবী শিক্ষা লাভ করিতেন না, কিন্তু সমাজের রীতিনীতির মধ্যেই তাঁহারা যে উদারতার শিক্ষা করিতেন, অনেক বই পড়িয়াও সে শিক্ষালাভ সম্ভব হয় না। সে কালের এই সামাজিক শিক্ষার মূল-মন্ত্র ছিল সংযম ও সৌজন্য। সংযম ভদ্রতার অঙ্গ ছিল। এই সংযম সেকালের ভদ্রমহিলাদিগকে সকল বিষয়েই আত্ম-গোপন করিতে সমর্থ করিত। এইজন্য কি নিজের বাড়ীতে কি যখন মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ী গিয়াছি তখন মা কোথায়ও আমার খাওয়া-দাওয়া লইয়া কোনও প্রকারের আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। অপর বালকেরা যখন খাইবে তখন আমিও খাইতে পাইব; ইহা জানিয়া মা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। নিজের ছেলেপিলের খাওয়াদাওয়ার জন্য কোনও প্রকারের ব্যস্ততা প্রকাশ করা সে কালে সদাচারবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত। সকলেই যখন পরের ছেলের খাওয়া দাওয়ার প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেন তখন কেহ নিজের ছেলের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেও কোনও অসুবিধা হইত না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

স্মৃতি।

বহুবর্ষ চলে গেছে বহু স্মৃতি নিয়া
হৃদয়ের ছিন্ন পত্রে হিসাব লিখিয়া
যোগ বিয়োগের ঘর
গরমিল পূর্ব্বাপর
যোগের কোটায় খালি বিয়োগের জের
খতিয়া দেখিতে গেলে শূন্য পড়ে ঢের।
অতীতের নিদর্শন
স্মৃতি করে' আকর্ষণ,
যা গিয়াছে, পুনর্ব্বার তাই আনে তুলে,
ভুলিতে চাহিলে কভু নাহি যাই ভুলে,
শৈশব কৈশোর আর
যৌবনের সমাচার,
একে একে ফুটে উঠে কল্পনার আগে
পুরাতনে জাগাইয়া নব অনুরাগে।

বাল্যের সে ধূলা খেলা
স্বজন বান্ধব মেলা
হাসি কান্না দ্বন্দ্ব প্রীতি বিচ্ছেদ মিলন
ক্ষণে অভিমান, ক্ষণে প্রিয় সম্ভাষণ,
যৌবনের প্রাণ খোলা
ভালবাসা আত্মভোলা
দিয়া নাহি তৃপ্তি মানে, আরো দিতে চায়,
নিয়া দিয়া কাড়াকাড়ি, প্রণয় বাড়ায়,
তুমি আমি নাহি দূর,
সব খানি ভরপুর
হিয়ায় হিয়ায় বহে প্রেমের জোয়ার,
আনন্দ মিলনে ভাসে জীবন দোঁহার,
সেদিনের যত কথা
আজি স্বধু মর্ম্মব্যথা,
ছিল, নাই ; আসিবেনা আবার কখন,
যা যায় সে একেবারে, স্মৃতির স্বপন,
বিস্মৃতির মাঝ খানে
স্মৃতি জাগাইয়া আনে,
হরষ বিষাদ কত, বর্ষ কতদিন,
ধরিয়া রাখিতে নারে ক্রমে হয় ক্ষীণ,
আধ মুছা চিত্র হেন
বর্ণ রাগ নাহি যেন,
তবু স্মৃতি আঁকাইয়া ধরে নেত্র পরে
আঁকা বাঁকা দৃশ্যপটে শোভে থরে থরে।
যুগান্তর গেছে বয়ে
আধেক জীবন লয়ে,
আজি সব ফাঁকা ফাঁকা শূন্যতায় ভরা
"হরণ পূরণ" বিশ্বে নাহি যায় করা।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

সঙ্কলনিকা।

বঙ্গীয় যুবক সঙ্ঘ।

বাঙ্গালা দেশের যুবকদের লইয়া এক যুবক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে। রাজনীতির মতভেদ হইতে দূরে থাকিয়া দেশের ভিতরের কাজ, পল্লীগ্রামের সংস্কার সাধন ইত্যাদি করাই ইহার উদ্দেশ্য। আজ কাল রাজনীতি হইতে দূরে থাকা কতদূর সম্ভব হইবে বলা যায় না। যাহা হউক ইহার উদ্দেশ্য মহৎ. আমরা ইহার সফলতা কামনা করি। শুধু উৎসাহ ও উত্তেজনা বেশীদিন কোন কাজেই প্রেরণা দিতে পারে না—চাই প্রাণের টান। প্রাণের টানে আপনার নিজের ভাবিয়া কাজ করিতে পারিলে সেই কাজটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে। পল্লীসংস্কার বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কাজ। এ কাজ বিশেষ হৃদয়বান্ সুবিজ্ঞ কর্ম্মঠ লোক দ্বারা পরিচালিত হওয়া দরকার। পল্লীগ্রামে যাইয়া তাহাদের আপনজন হইয়া, তাদের সুখ দুঃখে এক হইয়া কাজ না করিলে কাজ করা সম্ভব হয় না। আমরা গ্রামকে বইএর ভিতর দিয়া চিনি, অনেক সময় বিদেশী সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাহার একটি রূপ মনের ভিতর আঁকিয়া রাখি। তাই আমাদের গ্রামের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় যখন কল্পনার সহিত মেলে না তখনই উৎসাহ হারাই ও একনিষ্ঠভাবে উহার কাজে লাগিয়া থাকিতে পারি না। এই অভাব সকলেরই মনে জাগিয়াছে। যখন অভাববোধ হইয়াছে তখন উপায়ও হইবে আশা করা যায়।

এই সকল কাজের কেন্দ্র হইল কলিকাতা। তাই এখান হইতে খাঁটি নিঃস্বার্থ কর্ম্মী তৈয়ারী করা চাই। কর্ম্মী হইতে হইবে ছাত্রমণ্ডলীর ভিতর হইতে। ছাত্রমণ্ডলীর নানা অভাব অভিযোগ সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারা আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এখানে যে জীবন যাপন করে তাহা শুধু শুষ্ক, নীরস, পাসের পড়া মুখস্থ করিয়া যন্ত্রের মতন জীবনযাপন। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কেহ কেহ গতানুগতিক ভাবে লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করে, কেহবা বিপথগামীও হইয়া যায়। কেহবা তরুণ জীবনের বুভুক্ষা মিটাইতে গিয়া অনেক সময় ভুল পথে গিয়া পড়ে। সাধারণতঃ একটী কথা আছে বাংলা দেশের ছেলেদের মুখে হাসি নাই—তাহারা অল্প বয়সে বৃদ্ধ হইয়া যায়। ইহার কারণও তো যথেষ্ট রহিয়াছে। যুবক-সঙ্ঘ যদি এই দিকে দৃষ্টি দিয়া যাহাতে এই যুবকসম্প্রদায় স্বাস্থ্যবান্, চরিত্রবান্ ও হৃদয়বান্ হইতে পারে, সেই দিকেও চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন ও দৃষ্টি দেন তবে অদূর ভবিষ্যতে দেশের মস্ত বড় অভাব দূর হইবে ও পল্লীজননীর যথার্থ সেবক আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে।

* * *

সন্তরণ প্রতিযোগিতা।

এতদিন বাঙ্গালীর ছেলেরা শান্ত শিষ্ট জীবনযাপনই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে তাহাদের মনে ক্রীড়া কৌতুক ব্যায়াম প্রভৃতি নানা সাহসের কাজে উৎসাহ জাগিয়া উঠিতেছে। ইহা দেশের পক্ষে আশার কথা। সম্প্রতি চন্দননগর ও আহিরীটোলায় যে সন্তরণের প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে যদিও তাহার বিষম শোকজনক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—তবুও এই উদ্যম ও চেষ্টাটী প্রশংসনীয়। ঘটনাটী অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক, কিন্তু আকস্মিক বিপদপাত কোথায় না হইতে পারে? এবং আকস্মিক ঘটনার উপর মানুষের কোন হাত নাই। কলিকাতায় অনেক লোক সাঁতার জানে না। প্রায় প্রতিবৎসরই সাঁতার না জানার জন্য নানারূপ দুর্ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। সন্তরণ প্রতিযোগিতা চলিলে অনেকে সাঁতার শিখিবার উৎসাহ পাইবে আশা করা যায়। বিপদ বাধা সকল কাজেই আছে ও থাকিবে। তাহা দেখিয়া ভয় পাইলে, দমিয়া গেলে কখনও কোনও কাজই হয় না। সাহস অর্জন তো হয়ই না। আমাদের তো ইহার বিশেষই অভাব। যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত; তাই বলিয়া সাহসের কাজে বিপদ বা বাধা আছে বলিয়া পশ্চাদ্‌পদ থাকিলে চলিবে কেন?

* * * *

উত্তরবঙ্গে বন্যা

আমাদের কেবল দুঃখের কথা শুনিতে ও শুনাইতে হয়। সেদিন মেদিনীপুর, ঘাটাল, আবার দুইদিন যাইতে না যাইতে উত্তর বঙ্গ জলপ্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, সন্তানহীন মানুষের তপ্তশ্বাসে দেশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের জড়তা, অবহেলা ও পরমুখাপেক্ষিতার ফলে আজ তাহারা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তাহাদের বাঁচাইবার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কমিটি এবং স্থানীয় কংগ্রেসের সভ্যগণ যাহা করিতেছেন তাহার তুলনা নাই।

* * * *

"রাজসাহী বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার কতক অংশ জলে ডুবিয়া গিয়াছে। হঠাৎ ৭।৮ হাত জল হওয়ায় বাড়ী ঘর শস্যাদি ত নষ্ট হইয়াছেই, মানুষ এবং পশু অনেক ভাসিয়া গিয়াছে। গত পঞ্চমীর দিন হইতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয় আর পূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে। কতক লোক রেল লাইনে আশ্রয় লইয়া জীবন বাঁচাইয়াছে, আবার কতক বা ঘরের চালায় বসিয়া আছে। তাহাদের মাথার উপর জল, পায়ের নীচে জল। মানুষ ও পশু অনাহারে ও অসুস্থ হইয়া মরিতেছে। মৃতদেহ পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে। জল অপেয় হইয়াছে।

আমরা রিলিফ্ কমিটি হইতে নওগাঁ, সান্তাহার, রাণীনগর, আত্রাই ও মাধানগরে কেন্দ্র খুলিয়া সাহায্য পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রায় পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবক এই কমিটি হইতে প্রেরিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। আবার দুর্দ্দৈব যে যাহাদের উঠানে

অথই জল তাহাদের দেশে নদীও নাই যে নৌকা পাওয়া যাইবে। কলার ভেলায় কাজ হইতেছে। আমরা ছয়খানা নৌকা রেলযোগে পাঠাইয়াছি। এক্ষণে টাকার আবশ্যক, কাপড়ের আবশ্যক। সকলে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেই জলমগ্ন বিশাল অঞ্চলের কতক লোক বাঁচান যাইবে।

বৃষ্টির জলে দাঁড়াইয়া ঐ যে নরনারী কাঁপিতেছে, উহাদের অবস্থা স্মরণ করিয়া আজই কিছু সাহায্য দিন। উহারা আপনাদের সাহায্যের প্রতীক্ষায় আছে। অর্থ ও বস্ত্র সাহায্য করিয়া উহাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করুন। অর্থ পাইলে অন্ততঃ দাঁড়াইয়া অনাহারে মরা বন্ধ করা যাইবে। তারপর জল নামিয়া গেলে যে মড়কের আশঙ্কা আছে, ভগবান্ কেবল জানেন তখন কি হইবে।

অনাহারে মৃত্যু কি ভীষণ! যাহারা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে আজই তাহাদের নিকট অন্ন প্রেরণ আবশ্যক। মুহূর্ত্ত বিলম্বে অধিক প্রাণহানি হইবে।

কলিকাতা সহরের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ করিয়া অনেকগুলি কেন্দ্র হইতে আমার স্বাক্ষরযুক্ত রসিদ দিয়া সেবকগণের হাতে অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। তাঁহাদের নিকট অথবা সায়েন্স কলেজে আমার নিকট অর্থ ও বস্ত্রাদি প্রেরণ করিবেন। এই কমিটি হইতে অন্য সমস্ত রিলিফ্ অনুষ্ঠানের সহিত একযোগে কর্ম্ম করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রেসিডেন্ট, বঙ্গীয় রিলিফ্ কমিটি

ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ্ সায়েন্স, কলিকাতা।"

আমাদের শাশ্বত-ভিখারী বিধাতার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইবে কি?

* * * *

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বন্যার খবর পাইয়াই উত্তর বঙ্গে গিয়াছেন। তাঁহার পত্রে দেখা যায় যে এই এত বড় দুর্দ্দিনে,—যখন সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই—তখনও এই দুর্দ্দশাক্লিষ্ট লোকেরা বলিতে পারিয়াছে যে এইরূপ সাময়িক সাহায্যে কি লাভ, যদি প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া তাহার প্রতিকার করা না হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে বর্ত্তমান প্লাবনের কারণ ঐ অঞ্চলের নূতন রেলওয়ের বাঁধ, উহার উত্তরে রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলায় জলনিকাশের পথ নাই; পদ্মা বা যমুনার জল বাহির হইবার পথ ছিল, নূতন রেলওয়ে লাইনে সেইটি বন্ধ হইয়াছে, তাই যেই বর্ষা বেশী হইয়াছে বা পাহাড় হইতে বেশী জল নামিয়াছে তাহা আর বাহির হইয়া যাওয়ার পথ পায় নাই, প্লাবনে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। বাংলা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডাক্তার বেণ্টলিও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে উত্তরবঙ্গে সহজে জল-চলাচলের পথ না রাখিয়া সমস্ত দেশটাকে রেল ও সরকারী রাস্তা দিয়া বাঁধিয়া এত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করা হইয়াছে যে অচিরে তাহার প্রতিকার না করিলে ঘন ঘন বন্যার প্রকোপে ঐ অঞ্চলের কৃষিকার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ম্যালেরিয়ার আক্রমণে দেশ জনশূন্য হইয়া পড়িবে।

রেল লাইনের মধ্য দিয়া বহুতর সেতু ও জল নিকাশের পথ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

ইহাতে অনেক অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বারে বারে এইরূপ প্লাবনের সম্ভাবনার কারণ দূরীভূত না করিলে প্লাবনে যে প্রাণনাশ ও গৃহনাশ হয় তাহার সঙ্গে অর্থের তুলনা হয় কি? আর তাহা ছাড়া এইরূপ দুর্দ্দশার সাহায্যার্থও অর্থ ব্যয়িত হয় নাকি? কাজেই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও ইহা সদ্ব্যয়ই হইবে। ভয় বা আশঙ্কার কারণ দূরীভূত হইলে পরে এ ব্যয় বৃথাব্যয় বলিয়া আর মনে হইবে না।

* * *

অতএব জলপ্লবঘটিত উপস্থিত আপদ্ নিবারণের জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ কর্ম্মীগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহার যথোচিত প্রশংসা করিয়াও আমরা এই কথা বলিতে চাই যে এই সাহায্যই দেশের পক্ষে চরম কিম্বা যথেষ্ট হইবে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে যেন অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় কোনও প্লাবন-প্রভৃতির জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে দাঁড়াইতে না হয়।

* * * *

শুধু তাহাই নহে। জল নিষ্কাষিত হইলেই প্লাবনঘটিত যাবতীয় দুর্দ্দশা নিঃশেষিত হয় না। প্লাবনে যে সাময়িক ভাবেই লোকের অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, গবাদি নাশের দ্বারা ক্ষতি হয় তাহা নহে। নূতন ভাবে এই সমুদয় সংগ্রহ করিতে যে ঋণ হয় তাহা শোধ দিবার পূর্ব্বেই আর একটী প্লাবন কিম্বা মহামারী-প্রভৃতি অনুরূপ উপদ্রব দেখা দেয়। এই সমস্ত নিবারণের উপায় চিন্তার জন্য এখন হইতেই অন্তত একবৎসরের জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে লইয়া একটী স্থায়ী কমিটি নিযুক্ত হওয়া উচিত। জলপ্লবাদির মূলকারণ-প্রভৃতি নিরাকরণের জন্য অন্যান্য দেশ কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন, আমাদের দেশের অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া লইয়া সেই সব পন্থা স্বাধীনভাবে অবলম্বন করিবার, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সব ঘটনার প্রকৃত সংবাদাদি প্রকাশের দ্বারা নিরপেক্ষভাবে লোকমত গঠন করিবার বিষয়ও এই কমিটি চিন্তা করিবেন। তাহার জন্য একটী স্থায়ী ফণ্ড আবশ্যক। তাহা সহজেই হইতে পারে। যে অর্থ উঠিতেছে তাহার সামান্য অংশ সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করিয়া রাখিলেই পরে কার্য্য আরম্ভ হইবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।

* * * *

নারীর পরিচ্ছদ ও লেডী এ্যাস্টর্

'লেডীস্ হোম্ জার্ণাল্' নামক পত্রিকায় লেডী এ্যাস্টর্ মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদের প্রচলিত রীতি সম্বন্ধে কতকগুলি বেশ সুন্দর, শিক্ষাপ্রদ উক্তি করেছেন। নীচে তার থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল।

"আমার সন্দেহ হয় যে বাস্তবিক সংবাদপত্র ও পত্রিকাসমূহে আমাদের পোষাক পরিচ্ছদের বিষয়টাকে যতটা বাড়িয়ে দেখানো হয় আমরা নারীরা সে সম্বন্ধে ততটা ভাবি কি না। রাজনীতি নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর থেকেই আমি দেখতে পাচ্ছি যে সংবাদপত্রওয়ালাদের, বিশেষভাবে ইংলণ্ডে, আমাদের রাগবিরাগ—অর্থাৎ কোন্

বিষয়টা নারীদের বেশী প্রিয় আর কোনটি নয়—সে সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে একটা ভুল ধারণা জন্মিয়ে দেবার প্রতি কেমন যেন একটা প্রবণতা আছে। অবশ্য সংসারে এমন সহস্র সহস্র নারী আছেন যাঁরা অত্যন্ত তুচ্ছ ও ছেলেভুলানোগোছের সব জিনিষে একান্ত আসক্ত; কিন্তু একথাও ত আমাদের অবিদিত নয় যে অনেক পুরুষও এমন সব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন যেগুলো হয় অত্যন্ত মূঢ়োচিত, নয়ত বিশেষ কোন প্রয়োজনেই লাগে না। বল্‌লে হয়ত অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হতে পারে তথাপি বলছি, এই যে থেকে থেকে একটা গরিষ্ঠ জাতির চিত্র তুলে ধরে দেখানো হয় যাতে পুরুষরা যাবতীয় মহৎ ও সুষ্ঠু বিষয় নিয়ে খালি উচ্চভাবে চিন্তা করছেন আর নারীরা শুধু বেশভূষার ধ্যানেই মগ্ন আছেন, এটি প্রকৃত জীবনচিত্র নয়। একথা সত্য বটে যে বিবাহব্যাপারে, মাতৃত্বের ক্ষেত্রে ও গৃহ-পরিবারের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সামান্য নারীকে সংসারের "সাংসারিকতার" সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়তে হয় যার জন্য জীবনের অতি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে তাকে তৃপ্ত থাকৃতে হয়। তথাপি, নারীর দিক থেকে সমস্ত কৈফিয়ৎ দেবার পরেও, কি আমরা জোর করে একথা বল্‌তে পারি যে আমাদের বিষয়ে এই যে একটা অপবাদ চলেছে যে মোটামুটি নারীজাতিটি মনের চেয়ে শরীরের দিকে লক্ষ্যটা রাখেন বেশী, অন্তরের বিকাশের চেয়ে বাহিরের সজ্জার জন্যই অধিক সময় ক্ষেপণ করেন, এ অপবাদ থেকে কি আমরা সম্পূর্ণ নির্মুক্ত?

"পরিপাটী পরিচ্ছদ পরিধান কর্‌তে চায় সকলেই। করা উচিতও বটে। কারণ সুন্দর বেশ সৌম্য মনের পরিচায়ক। কিন্তু ঠিক্ শ্রীসম্পদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তোমার প্রসাধনব্যাপারে যদি সেই সীমারেখাকে লঙ্ঘন করে চল, তবে বুঝতে হবে যে ভূষণ-শ্রী বা অ ল ঙ্কা রে র সার্থকতা হতে তুমি চ্যুত হয়েছ। অপরের চিত্তে অস্বস্তির কারণ জমিয়ে দেওয়া একেবারেই শ্লীলতা নয়। অথচ ঘটেও তাই, যখন অতি-ভূষণের দ্বারা অন্যকে ম্লান করা, অতিক্রম করাটাই তোমার উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে। তখন শুধু অপরের অসূয়াকেই উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চাও।

"হয়ত তুমি বলবে, "তা ত নয়; আমরা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে চাই।"

"কিন্তু শ্রদ্ধা কিসের প্রতি? তোমার চারিত্র, তোমার ভূষা, না তোমার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের প্রতি? নিশ্চয়ই এ তিনের একটী—।

"যে চরিত্র যথার্থ সুন্দর সে কখনও অপরের শ্রদ্ধান্বেষণের জন্য চিন্তা করে না। সে করে, যে অহঙ্কারী সেই।—

"আর ভূষণের প্রতি মোহাকর্ষণ?—সে ত রুচির নগ্নতম কদর্য্যতা।

"আর তোমার দেহযষ্টির অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য প্রশস্তিলাভের যে প্রয়াস, সে তোমার চারিত্রে যা হীনতম তারি উদ্বোধনের দ্বারা পুরুষজাতিকে আকর্ষণ করবার বাসনামাত্র। তার সার্থকতা কোথায়? আমাদের, নারীদের জীবনে কি পরিশেষে এই সমস্ত আচরণের, পন্থার জন্য মূল্য দিতে হয় না?

"বহুতর স্বস্তিহীন ও নিরানন্দ বিবাহের মূলই হল কামনার এই মগ্নচৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ

করে তুলবার জাগ্রত প্রয়াসে;—কারণ যে বিবাহ ঐরূপ আকর্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে পরিণয়-বন্ধন কখনও স্থায়ী হয় নি। সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে সমস্ত দম্পতীজীবন সুখী হয়েছে, তাদের বিবাহসূত্রে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল যা দৈহিক আকর্ষণ বা মোহমাত্রের চেয়েও অধিকতর শাশ্বত। ঐ যে সার্কাসের চূড়ায় পতাকাগুলো উড়ছে ঠিক তাদের মত যে সব তরুণীরা নিয়ত ভেসে ভেসে বেড়ায় তাদের সুন্দর সুন্দর মুখগুলিতে রং মেখে, আর যতরকম উগ্র, চকিত বেশে অঙ্গগুলিকে ব্যস্ত করে তুলে, তাদের দিকে চাইলেই আমার সমস্ত চিত্ত ব্যথায় ভরে উঠে। আমি বিশ্বাস করিনা তাদের মধ্যে অর্দ্ধেক মেয়েও জানে নিজেরা কি করছে। আর জানবেই বা কি করে যদি আমরাই তাদের না বলে দিই? আর এ সব কথা ধরতেই বা পারে কেমন করে যদি আমরা নিজেদের আচরণ দ্বারা না শিখাই?

"আমি আশা করি, এখন যে নারীরা নাগরিকের গুরুভার লাভ করলেন, এইবার যেন আমাদের চেষ্টা হয় যে এই প্রাচীন পৃথিবীটি—আর নবীন জগতও বটে—আরও একটু শ্রেয়, আরও একটু শ্রীমান্ হয়ে ওঠে।" (মডার্ণ্ রিভিউ, অক্টোবর)

আমরা কি নিশ্চিন্ত মনে বলিতে পারি যে উগ্র-বেশ-বাহুল্য সম্বন্ধে লেডী এ্যাস্টরের এই উক্তির প্রয়োজন আমাদের দেশে নাই? শ্রী ও সজ্জা দুটী ভিন্ন বস্তু অথচ দুয়ের সামঞ্জস্য সম্ভব।

আর যে-মগ্নচৈতন্যের কথা ঐ উক্তির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদেরও কন্যা ও তৎস্থানীয়াদের বিবাহ-আয়োজনের মধ্যে তার প্রভাব ক্রমশ স্ফুটতর হয়ে উঠছে কি?

* * * * *

অকালী সত্যাগ্রহ

লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকা হইতে একটী বিবরণ আমরা তুলিয়া দিতেছি।

"লাহোর জেলার একশত অকালী দলবদ্ধ হইয়া বেলা দুইটার সময় স্বর্ণমন্দির হইতে যাত্রা করে। যাইবার পূর্ব্বে অকাল তখ্‌তের নিকট গিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, যত অত্যাচারই হোক্, কেহ অহিংসা বৃত্তি ত্যাগ করিবে না। রেল ষ্টেশন হইতে রাজাশংসী পর্য্যন্ত মোটরে যাইবার সময় দেখিলাম, বহুলোক টোঙ্গাতে টমটমে এবং পদব্রজে ঘটনা-স্থলের দিকে যাইতেছে। ঐ স্থানটি মেলার মত দেখাইতেছিল। শিখের দল পৌনে পাঁচটার সময় রাজাশংসীতে পৌঁছিল। সেখানে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ম্যাক্‌ফার্সন ও তাঁহার সহকারী মিঃ বেটী অপেক্ষা করিতেছিলেন। দলটিকে চলিয়া যাইতে বলা হইল। উত্তর আসিল—সকলে গুরু-কা-বাগে যাইবে, কোনো নিষেধ শুনিবে না। তহশীলদার ঐ স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিতেছিলেন। তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় দলকে সম্বোধন করিলেন। দল চলিয়া যাইতে অসম্মত হইল। ম্যাক্‌ফার্সন পুলিশকে হুকুম দিলেন সকলকে তাড়াইয়া দিবার জন্য। পুলিশ রেগুলেশন লাঠি লইয়া তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অকালীদের উপর এলোপাথালি লাঠি পড়িতে লাগিল। একজন পুলিশ ঢোল পিটিতেছিল, বাকি সকলে তালে তালে লাঠি চালাইতেছিল। ১৫ মিনিট লাঠি চালানোর পর অকালীরা সোজা হইয়া মাটির উপর শুইয়া পড়িল। অনেকে অজ্ঞান হইয়া গেল। যাহাদের জ্ঞান ছিল তাহারা সরিয়া পড়িল। পুলিশ আবার লাঠি চালাইতে লাগিল। ইট-পাথরের মত সকলকে রাস্তা

হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল। অজ্ঞান ও আহতদিগকে দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করা কঠিন। আহতদিগের ভিতর অনেক ৬০ বৎসরের বৃদ্ধকে দেখিয়াছি। অনেকের মাথার চুলে রক্ত লাগায় জটা পড়িয়া গিয়াছিল। লাঠিগুলির একদিকে পাঁচ ছয় ইঞ্চি পরিমিত স্থান লোহা বাঁধা ছিল। সকলে 'ওয়া গুরু' 'ওয়া গুরু' বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে মার খাইতেছিল। মিঃ বেটি মারের সময় খুব কাজ করিতেছিলেন—ম্যাকফারসন দূরে দাঁড়াইয়া আদেশ দিতেছিলেন।" (প্রবাসী)

* * * * *

অকালীশিখদের সত্যাগ্রহ এখনও চলিতেছে। মন্দিরের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য তাহারা পুলিশের লাঠিতে জখম হইতেছে, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেছে তবুও তাহারা সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইতেছে না। অধিকার দাবী করিবার জন্য দলেদলে জাঠাদলভুক্ত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় দুই সহস্র অকালী গ্রেপ্তার হইয়াছে। শুনা যায় নারী-সম্প্রদায়ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। এত সংঘর্ষের মধ্যেও অকালীরা নিরুপদ্রব। অনেক গণ্যমান্য লোক যাঁহারা এই ব্যাপারের আপোষে নিষ্পত্তির জন্য পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন তাঁহারাও লাঞ্ছিত হইতেছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে গুরুকাবাগে যাইতে দেওয়া হয় নাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পিনালকোডের ১৪৩ এবং ১১৭ ধারা অনুসারে একবৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অকালীদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই ইহাই কি তাঁহার অপরাধ ?

* * * * *

অকালী-নিগ্রহ সম্পর্কে একটী বিষয় আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠে। মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ নীতির সঙ্গে ঘটনাচক্রে এদেশে রাজনীতি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়াতে, শুধু গবর্ণমেন্টের নয়, জনসাধারণের মনেও এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে এগুলি নিছক্ রাজনীতি। সেইজন্য মহাত্মা গান্ধী বারংবার আত্মার শক্তি ও শুদ্ধির কথা বলিলেও তাহার প্রকৃত অর্থ সাধারণের চিত্ত ধারণা করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় নাই। ফলে রাজনীতিরই একটা অধ্যাত্মশোধনের ইচ্ছা জাগিয়াছিল। কিন্তু আজ বীরধর্ম্মী শিখ-অকালী শুধু ধর্ম্মসাধনের জন্য সত্যাগ্রহের আশ্রয় লইয়া দেখাইলেন যে সত্যাগ্রহ বা অসহযোগ রাজনীতিমাত্র নহে, ব্যক্তি বা সমাজ বা জাতির জীবনে শুদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের জন্য প্রচলিত বিভিন্ন পন্থার মধ্যে অন্যতম পন্থা। শ্রেষ্ঠ পন্থা কিনা এদেশের ও বিদেশের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। অকালীদিগের এই নব ধর্ম্মসংগ্রাম অসহযোগের ইতিহাসে নূতন যুগ আনয়ন করিবে।

নব্যভারত

চত্বারিংশ খণ্ড] অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ [৮ম সংখ্যা

ওঁ

বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ

কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার যুবকদিগের এক বৈঠক বসিয়াছিল। এই যুবক-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার মতামত জানিতে চাহিয়াছ। এ বিষয়ে কিছু না লিখিতে চাহিলে অন্ততঃ সাধারণভাবে আজিকালিকার বাঙ্গালী যুবকদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা কিছু লিখিয়া পাঠাই, তোমার বড়ই ইচ্ছা।

প্রথম কথা, যুবক সম্মিলনী সম্বন্ধে। এ সম্মিলনীর কথা আমি বিশেষ কিছুই জানি না। শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ম্মকর্ত্তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই। খবরের কাগজেও তাঁহাদের আলোচনার বিশেষ কোনও বিবরণ পড়ি নাই। সুতরাং এসম্বন্ধে কোনও কথা বলা সম্ভব নহে; সম্ভব হইলেও বলিতাম কি না সন্দেহ। শুনিবে কে?

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং আপদ্‌কালমুপস্থিতে—বিষ্ণু শর্ম্মার জ্ঞানগর্ভ কথাটা ত জান; আমিও ভুলি নাই। আপদ্‌কাল যে উপস্থিত হয় নাই, এমন কথা বলা কঠিন। কিন্তু উপস্থিত হইয়া থাকিলেও তার অনুভব আছে কি? আর কোন বিপদের অনুভব থাকিলেই লোকে বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে না। সকল অবস্থাতেই পরের উপদেশ লইবার একটা যোগ্যতা লাভ করা আবশ্যক। মানুষ যতক্ষণ নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং শক্তিসাধ্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিবার ভরসা রাখিতে পারে, ততক্ষণ সত্যভাবে অপরের উপদেশ লইতে চাহে না। আর যে যাহা চাহে না, জোর করিয়া তাহার উপরে সেগুলি চাপান শাস্ত্র ও সদাচারবিরুদ্ধ। বাংলার যুবকেরা নিজেদের হালে পানি পাইতেছেন না, এ কথাটা কি সত্য? তাঁদের ভিতরে কি কোনও গভীর জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, বলিতে পার? আর অন্তরে জিজ্ঞাসা না জাগিলে, খামকা তাহার আলোচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

শেষ কথা, আরসীর কাছে দাঁড়াইলে বৃদ্ধ যে হইয়াছি, একথা প্রত্যক্ষ করি। জন্মপত্রিকার সাক্ষ্যে বয়স গুনিলে বার্দ্ধক্য কেন, কলিকালের ওজনে জরাগ্রস্ত হইয়াছি, একথাটাও

অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু বাহিরের চেহারা ও দৈবজ্ঞের কোষ্টিপত্র যাহাই বলুক না কেন, ভিতরে এখনও সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ যৌবনের সাড়া পাইয়া থাকি। সুতরাং নিজেকে যুবক-পর্য্যায়ের বাহিরে ফেলিতে রাজি নহি। নাতি নাতিনীরা একথা শুনিয়া উপহাস করিবে জানি। কিন্তু তাহাদের উপহাসের ভয়েও অন্তরে যাহা অনুভব করি না, বাহিরে তাহা বলিতে রাজী নহি। সুতরাং বৃদ্ধ বলিয়া নহে, বার্দ্ধক্যের বয়সোচিত জ্ঞান-গরিমার দাবীর উপরেও নহে, কিন্তু ভিতরে প্রাণের মধ্যে আমিও সত্যসত্যই তোমাদের যুবকদলের একজন, এই ভাবিয়া যদি আমার কথা কেহ শুনিতে চাহে, তাহা বলিতে রাজী আছি।

২

কোনও বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সকলের আগে সে বস্তুটা কি, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। আমাদের দেশে চিরদিন ধর্ম্ম বলিতে কোনও বাহিরের বিধি নিষেধ বুঝেন নাই। এইজন্য আমাদের পরিভাষায় কেবল মানুষের ধর্ম্ম আছে, এ কথা বলে না। সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থেরই নিজের নিজের এক একটা ধর্ম্ম আছে। সেই ধর্ম্ম তাহাদের প্রকৃতির ভিতরেই ফুটিয়া রহে। এই জন্য আগুনেরও ধর্ম্ম আছে—দাহন শক্তি, জলেরও ধর্ম্ম আছে—শৈত্য। কোনও বস্তু তাহার নিজের স্বভাবের উপরে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই সেই বস্তুর ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। স্বভাবের বিপর্য্যয় ঘটিলেই ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মের আলোচনায় ইহাই প্রথম কথা। সুতরাং যৌবনের ধর্ম্মাধর্ম্ম কি ; ইহা বিচার করিতে হইলে সকলের আগে যৌবনের প্রকৃতিটা কি, ইহা বোঝা প্রয়োজন। একথাটা যুবকমণ্ডলীর ধর্ম্মোপদেষ্টারা মনে রাখেন না। তাঁরা যুবকদিগের উপরে বার্দ্ধক্যধর্ম্মের বোঝা চাপাইতে যাইয়া সর্ব্বদাই নিরীহ যুবকদিগের সর্ব্বনাশ করেন এবং যাদের ভিতর সত্য যৌবন আছে, তাদের সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া নিষ্ফলতা আহরণ করিয়া থাকেন।

৩

"যৌবন বিষম কাল"। যৌবনে পা দিতে না দিতে চারুপাঠে একথা পড়িয়াছিলাম। কথাটা একদিকে সত্য বটে। কত সত্য, যাঁহারা যৌবনের আগুনে নিজেদের হাতমুখ পোড়াইয়া বসিয়াছেন, তাঁরাই ভাল করিয়া জানেন। আগুনমাত্রেই একটা আপদ্ ঘটাইবার শক্তি ও সম্ভাবনা আছে ; নৈসর্গিক আগুনেরও আছে, যৌবনের আগুনেরও আছে। আগুনে ঘর দোর পোড়ায়, আবার এই আগুন দিয়াই মানুষ অন্ধকারে পথ দেখিয়া চলে, নিজের খাদ্য রন্ধন করে, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে এই আগুনের ধারে যাইয়াই নিজের হিমাঙ্গ গরম করিয়া লয়। আগুনে পোড়াইয়া মারে বলিয়া মানুষ আগুনকে দুষমন বলিয়া নিঃশেষে নিভাইয়া দেয় না, কেবল তাহার সম্ভাবিত আপদের পথটাই বন্ধ করিবার চেষ্টা করে। বাহিরের আগুনের সম্বন্ধে যাহা সত্য, যৌবনের আগুনের সম্বন্ধেও তাই সত্য। যৌবনকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। যৌবনের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষণ করিলে চলিবে না, সে সকল প্রবৃত্তির অমর্য্যাদা করিলেও চলিবে না। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালে সাগ্নিকেরা যেমন শুদ্ধমনে যজ্ঞের অগ্নি চয়ন

করিতেন এবং চিরদিন উপাসনাবুদ্ধিতে সেই আগুনকে জাগাইয়া রাখিতেন। সেইভাবে শ্রদ্ধা-সহকারে পবিত্র দেহমনে এই যৌবনের আগুন চয়ন করিতে হয় এবং সেইরূপ উপাসনা বুদ্ধিতেই এই আগুনকে আমরণ অন্তরের মণিকোঠায় জাগাইয়া রাখিতে হয়। কিন্তু মামুলী-নীতিবাদীরা এবং মতবাদী ধার্ম্মিকেরা একথাটা এখনও বুঝেন না। এই জন্যই তাঁহারা সর্ব্বদাই যৌবনের সম্মুখে কেহ বা বেত্রদণ্ড আর কেহ বা লালনিশান হাতে লইয়া দিনরাত দাঁড়াইয়া রহেন। তাঁদের চক্ষে যৌবন বিষমকালই ত বটে।

শিশুরা নির্ম্মল। যৌবনের উন্মাদনা তাহাদের মধ্যে এখনও জাগে নাই। কুমার কুমারীরাও মিষ্ট, কোমল নূতনগাছের পাতার মত ফুলও ফুটিতে আরম্ভ করে নাই, কাঁটাও গজাইয়া উঠে নাই। এদেরও আদর করিতে পারা যায়। কিন্তু যৌবন! সর্ব্বনাশ! তাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু কাঁটাও গজায়। আর ঐ ফুলের ভিতরে সাংঘাতিক কীটও প্রবেশ করিয়া থাকে। যৌবন সয়তানের ফাঁদ, পাপের জন্মভূমি। তাইত যৌবন বিষম কাল। এই কালেই মানুষের ভিতরে পাপ প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া উঠে। এই কালেই ইন্দ্রিয়ের বাণচাল ডাকিয়া মানুষকে বিপথে কুপথে ঠেলিয়া লইয়া যায়। অতএব যৌবনকে চারিদিকে শাসনের বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। ইহাই পুরাতন নীতিবাদী ও মতবাদী ধার্ম্মিকদিগের কথা। প্রথম যৌবনে এঁদের দশআজ্ঞার উপদেশই শুনিয়াছিলাম। সারাজীবন ভরিয়া দেখিলাম, দশ-আজ্ঞার দ্বারা প্রকৃতির স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

৪

প্রথম যৌবনে চারুপাঠে পড়িয়াছিলাম—যৌবন বিষমকাল। বার্দ্ধক্যের দরজায় আসিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অদ্ভুত কথা দেখিলাম—

বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বয়সকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান? ইহার উত্তরে রায় রামানন্দ কহিলেন—বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ। আধুনিক বাংলা অভিধানে কিশোর এবং কৈশোর এর একটা কদর্থ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় এখন কৈশোর বলিতে বাল্যই বুঝায়। চতুর্দ্দশবর্ষকাল পর্য্যন্ত কৈশোরকাল। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে কৈশোর বলিতে প্রস্ফুট যৌবনই বুঝিতেন। বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্ত্তী সময়কে কবিগণ বয়ঃসন্ধি বলিয়াছেন। যৌবনকালই লীলার কাল। আর এই লীলাকে লক্ষ্য করিয়া রায় রামানন্দ কিশোর বয়সকে বয়সের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কাল বলিয়া কহিয়া গিয়াছেন। এমন কথা কেন কহিলেন ভাবিতে লাগিলাম।

ভাবিয়া দেখিলাম যে এই কৈশোর বা যৌবনকালেই ত মানুষের পূর্ণ বিকাশের ইঙ্গিতটি ফুটিয়া উঠে। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবন পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের ক্রম-বিকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু শিশুর মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাড়া পাই না। শিশুতে এই পর্য্যন্ত বুঝা যে এ আরও ফুটিবে। কিন্তু সে ফুটিয়া যে কি হইবে, ইহার পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাই না। মনুষ্যপ্রকৃতির পরিপূর্ণ পরিণতির আভাস শিশুর মধ্যে মিলে না। এই আভাস মিলে কেবল প্রস্ফুট যৌবনের ভিতরে। যৌবন ফুরাইলে আবার এ আলো

মিশিয়া যায়। তখন মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপের প্রতিবিম্ব আর প্রতিফলিত হয় না। এই জন্যই মহাপ্রভু কৈশোর বয়সকে বা যৌবনকে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে যৌবনকালে মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সম্ভাবনার সন্ধান মিলে পরিপূর্ণ মানুষ কিরূপ, যে যৌবনে ইহার পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হই, তাহাকে উপেক্ষা করিতে বা তাহার উপর হাত চালাইতে সাহস হয় না।

৫

আর এ সাহস হয় না এইজন্য, মানুষই যে দেবতার প্রতিচ্ছবি। এই মানুষকে না পাইলে দেবতাকে পাইতাম না। মানুষের মধ্যেই অনাদিকাল হইতে দেবতা আত্মপ্রকাশ করিতেছেন ও করিয়াছেন। দেবতার প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম আধার পরিপূর্ণ মানুষ। আর এই পরিপূর্ণ মানুষ যে কি বস্তু, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, বিশুদ্ধ ও প্রস্ফুট যৌবনের মধ্যে। শিশুতেও তাহা দেখি না, বৃদ্ধতেও তাহা দেখিতে পাই না। যৌবনের ছবিতে রূপের মধ্যেই অরূপের লীলা, ইন্দ্রিয়ের ভিতরেই অতীন্দ্রিয়ের খেলা; সসীমের মধ্যেই অসীমের টান প্রস্ফুট হইয়া থাকে। এইজন্যই বিশুদ্ধ ও প্রস্ফুট যৌবনকে দেবতার বিগ্রহ বলিয়া প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়।

৬

বিশুদ্ধ কথাটার কদর্থ করিও না মামুলী নীতিবাদীরা এবং মতবাদী ধার্ম্মিকেরা শুদ্ধাশুদ্ধের যে অর্থ করেন, সে অর্থে বিশুদ্ধ কথা ব্যবহার করিতেছি না। বিশুদ্ধের সত্য অর্থ তাহা নহে। কোনও বস্তু যখন নিজের প্রকৃতিতে অবস্থান করে, ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর সঙ্গে যখন তাহা আত্মহারা হইয়া মিশিয়া না যায়, অথবা যতক্ষণ তাহা নিজের প্রকৃতির উৎকর্ষতা লক্ষ্য করিয়া চলে ততক্ষণই তাহাকে বিশুদ্ধ কহা যায়। দুধ যতক্ষণ দুধই থাকে অন্য কোনও জিনিসের সঙ্গে মিশিয়া না যায়, ততক্ষণ তাহা বিশুদ্ধ দুধ। ইহাই শুদ্ধতার প্রথম অর্থ। শুদ্ধ জিনিসে ভেজাল থাকে না কিন্তু দুধ অন্য জিনিসের সঙ্গে না মিশিয়াও যখন দুধের যে বিশিষ্ট গুণ তাহা স্বাভাবিক বিকৃতি নিবন্ধন হারাইয়া ফেলে, তখনও দুধ আর শুদ্ধ থাকে না। বিশুদ্ধ যৌবন বলিতে যে যৌবন নিজের সহজ প্রকৃতিতে অবস্থিতি করে, তাহাই বুঝি। আর পরিপূর্ণ যৌবন বলিতে তাহাই বুঝি যাহার মধ্যে যৌবনের নিত্যসিদ্ধ আদর্শটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাড়া পাইয়া থাকে। ইংরাজী দর্শনে এই নিত্যসিদ্ধ কথাটাকেই eternally realised কহে।

৭

কথাটা একটু খুলিয়াই বলিব। মানুষ তিলে তিলে ফুটিয়া উঠে, ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। জরায়ুতে মাতৃগর্ভে সে একটা ক্ষুদ্রতম অবয়বশূন্য জীবকোষাণুরূপে প্রথমে সঞ্চারিত হয়। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া কহিয়াছেন। জীবকোষাণু হইতে ক্রমে ক্রমে মানুষের অবয়ব ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। গর্ভবাসকাল পূর্ণ হইলে ঐ আদি জীবকোষাণু পূর্ণাবয়বসম্পন্ন মানবশিশু রূপে ফুটিয়া উঠে। এখানে প্রশ্ন উঠে,—

সেই নিরবয়ব সূক্ষ্ম জীবকোষাণু হইতে এই পূর্ণাবয়ব মানবশিশুর প্রকাশ কিরূপে সম্ভব হইল? অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়না, হইতেই পারে না। সুতরাং একথা বলিতে হয় যে, এই বিকাশধারা প্রবর্ত্তিত হইবার আদিতেই ঐ সূক্ষ্মতম জীবকোষাণুর মধ্যেই শিশুরূপে লুকাইয়া ছিল—বটবীজের মধ্যে যেমন সাকুল্য বটবৃক্ষের রূপ বা স্বরূপটী লুকাইয়া থাকে, বটবীজে বটরূপ বা বটস্বরূপটি নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised হইয়া আছে। জরায়ুমধ্যে আদি জীবকোষাণুর পূর্ণাবয়ব শিশুর রূপ বা বা স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised হইয়া থাকে। সেই নিত্যসিদ্ধ রূপই তিলে তিলে ভ্রূণের মধ্যে অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্যে আপনাকে ফুটাইয়া তোলে, এবং গর্ভবাসকাল পূর্ণ হইলে, পূর্ণাবয়বসম্পন্ন মানবশিশুরূপে ভূমিষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই ক্রমবিকাশের এই বিধান। যেখানেই ক্রমবিকাশ বা ক্রমাভিব্যক্তি বা evolutionএর প্রক্রিয়া প্রকাশিত হয়, সেইখানেই এই ক্রমবিকাশধারার আদিতে বা মূলে যাহা তিলে তিলে ফুটিয়া উঠে, তাহার পরিপূর্ণ স্বরূপটী নিত্যসিদ্ধ eternally realised অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এই সিদ্ধান্তটি স্বীকার করিয়া না লইলে ক্রমাভিব্যক্তির বা evolutionএর কোন অর্থ থাকে না, কোনও অর্থ করা সম্ভব হয় না।

মানবজীবনের ক্রমাভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ বা evolution প্রত্যক্ষ কথা। নিরবয়ব অদৃষ্ট কেবল শক্তিশালী অনুবীক্ষণগ্রাহ্য সূক্ষ্মতম জীবকোষাণু হইতে মানুষ তিলে তিলে ফুটিয়া উঠে, এবং আপনার দেহমনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই প্রত্যক্ষ ক্রমবিকাশধারাতে পৌগণ্ড, বাল্য এবং কৈশোর তিনটি বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ অবস্থা। কৈশোর পর্য্যন্তই এই বিকাশধারা সচরাচর অক্ষুণ্ণভাবে চলে। কৈশোর বা যৌবন ফুরাইলে মানুষ আর ফোটে না, ঝরিতে আরম্ভ করে। এই ঝরতি অবস্থায় মানুষের সম্ভাবিত পূর্ণতার আর সন্ধান পাই না। কিন্তু এই ঝরতি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ যৌবনের চরম সীমা পর্য্যন্ত মানুষ ফুটিতেই থাকে। এই যৌবনকালে অবান্তর কারণে মানুষের বিকাশের ব্যাঘাত না ঘটিলে, তাহার মধ্যে মনুষ্যত্বের সম্ভাবিত পরিপূর্ণ স্বরূপের মানস-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকি। মানুষ যে সত্য বস্তু কি, মানুষের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটাই বা কি, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আর এই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটি রক্তমাংসের ভিতর দিয়া আপনাকে ফুটাইয়া তুলিলেও রক্তমাংসের অতীত। এ বস্তু অতীন্দ্রিয়। এই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত। এইখানেই মানুষের সঙ্গে দেবতার গুণসামান্য প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত। দেবতার সঙ্গে মানুষের সমান ধর্ম্ম বা সমানগুণ আছে বলিয়াই মানুষ দেবতাকে জানিবার অধিকারী। এই সামান্যধর্ম্ম আছে বলিয়াই মানুষ দেবতার ভজনের অধিকারী। এই ভূমিতেই মানুষের সঙ্গে দেবতার প্রেমের আদান প্রদান সম্ভব। এই গুণসামান্য আছে বলিয়াই মানুষ আপনার মধ্যে দেবতার স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারে। অথবা এই গুণসামান্য অবলম্বন করিয়াই দেবতা মানুষের মধ্যে আং-

প্রকাশ করিতে পারেন। আর মানুষের কৈশোর বা যৌবনই দেবতার আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠতম ও শুদ্ধতম ক্ষেত্র।

এইজন্যই রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছিলেন—বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ।

যৌবন-ধর্ম্মের এবং যৌবনসাধনার ইহাই মূলসূত্র। যুবকেরা নিজের যৌবনের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য যে সাধনাই অবলম্বন করুন না কেন, তাহাকে এই মূলসূত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সাধনামাত্রই উপাসনা। যৌবনের সাধনা করিতে গেলে যৌবনের উপাসনা করিতে হইবে। যৌবনের উপাসনা করিতে গেলে যৌবন যে কি বস্তু, তাহার প্রকৃতি এবং স্বরূপ কি, ইহা বুঝিতে হইবে। যৌবন যে মানবজীবনে দেবতার আত্মপ্রকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র ইহা বুঝিয়া যৌবনের প্রতি শ্রদ্ধালু ও ভক্তিমান হইতে হইবে। যৌবনের সার্থকতালাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই। কিন্তু এ বড় কঠিন উপাসনা। যদি ঠাকুর বলান আর এক দিন সে কথা কহিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

জাতীয় উন্নতির উপায়।*

সমবেত বন্ধুগণ, এই সভার সভাপতির গৌরবান্বিত আসন গ্রহণ করতে আহ্বান করে আপনারা আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন তজ্জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই সভায় এবং সভার বাহিরে আমা অপেক্ষা যোগ্যতর অনেক লোক আছেন। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এবং ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত, যাঁহারা আত্মোৎসর্গের মহান্ দৃষ্টান্তে দেশময় বরেণ্য হয়েছেন—অথবা আজকার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসুর মত, যাঁহারা "লয়েড জর্জ্জের লোহার কঙ্কালের (steel frame) ক্রূপ বা পেরেক" হ'তে অস্বীকার করে নিজের আত্মাকে মুক্তির পথে প্রবর্ত্তিত করেছেন; আমি দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ কোন গৌরবের অধিকারী হতে পারি নাই, তথাপি আজ আমাকে আপনাদের আহ্বানকে আদেশের মত শিরোধার্য্য করে সভায় অবতীর্ণ হ'তে হচ্ছে।

সভার প্রারম্ভে এই সভার উদ্যোক্তা আমাদের সর্ব্বজনপূজ্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী বাণী আপনাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—"আমার স্থির বিশ্বাস বাঙ্গালীর দ্বারাই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন সাধনার পথ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই গৌরবের পদ অধিকার করতে হলে বাঙ্গালীর জীবনের আজ চাই সাধনা—তিল তিল করে আত্মদান। বাঙ্গালী আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে ব্যক্তিগত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে লেগে পড়ে থাকলে ভারতের নিদারুণ দুর্দ্দশা ঘুচবেই—আজ বিধাতার ইঙ্গিতে বাঙ্গালীর সাধনা ভারতে সিদ্ধি আনয়ন করবে।

* বঙ্গীয় যুবক সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে সভাপতির প্রদত্ত বক্তৃতা।

কোন্ পথে আমাদের সাধনা করতে হবে, তাহাই এখন বিবেচ্য। কিন্তু সে পথ যে নেহাৎ সুখ বা আরামের নয় তাহা আর কাহাকেও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। এই প্রসঙ্গে একটা পৌরাণিক গল্প মনে পড়ছে। পুরাণে আছে কোন সময়ে দুইজন দেবদূত কোন ঋষিকে অবমাননা করায় ঋষি রেগে তাদের শাপ দেন যে তাদের স্বর্গ-চ্যুত হয়ে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। দেবদূত দুইজন খুব কান্নাকাটি করলে ঋষি একটু নরম হয়ে বললেন যে "তোমরা যদি পৃথিবীতে দেবতাদের সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার কর তাহলে সাত জন্ম পরে তোমাদের উদ্ধার হবে, কিন্তু যদি শত্রুভাবে সাধন কর তাহলে তিনজন্ম পরে স্বর্গে ফিরে আসতে পারবে।"

বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন অতি সহজেই তাঁরা গল্পটির তাৎপর্য্য অনুভব করতে পারবেন। বহু শতাব্দীর পাপের ফলে আমাদের মনুষ্যত্ব ও মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠদান ও স্বাধীনতা হারিয়েছি। সেই মনুষ্যত্ব সেই স্বাধীনতা পুনর্ব্বার লাভ করতে হলে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত শক্তির বদান্যতার উপর নির্ভর করলে চলবে না,—সে প্রতিষ্ঠিত শক্তি রাজকীয়ই হউক বা সামাজিকই হউক, আমাদিগকে মনুষ্যত্ব লাভের জন্য সাধন করতে হবে; সে সাধন আমেরিকা, গ্রীস, হাঙ্গেরী এবং আমাদের চোখের সামনে আয়র্লণ্ড ও পোল্যাণ্ড করেছে; প্রতিষ্ঠিত শক্তি যদি দয়া ক'রে আমাদের হৃত অধিকার ফিরিয়ে দেন, সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন কিছু হবে।

যাহাহউক, আমি রাজনৈতিক দিকটা বিশেষ আলোচনা করব না, তাহা করবার বহু যোগ্যতর লোক আছেন। রাজনৈতিক সমস্যাই আমাদের একমাত্র সমাধানের বিষয় নহে বাংলার বর্ত্তমান সমস্যা দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া, শিক্ষার অভাব, অস্পৃশ্যতা, হিন্দু-মুসলমানে মিলন। কি কি কারণে আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পড়েছি, তাহা ভেবে দেখতে হবে। বেঁচে থাকতে হলে—জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে, আমাদিগকে যে বহিঃশত্রু ও অন্তঃ-শত্রুর সাথে সংগ্রাম করতে হয়, তা নয়, প্রকৃতির সাথে ও সংগ্রাম করতে হয়। মানুষ ও জাতির চরিত্র বলে একটা জিনিষ—ইহা বহুশতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল। প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে জয়ী হতে পেরেছে—প্রথমতঃ পাশ্চাত্য জাতি সমূহ; তাহার কতগুলি কারণও আছে। ভারতবর্ষ ও ইউরোপে, প্রকৃতি বিভিন্নভাবে মানবের নিকট প্রতীয়মান। ইউরোপে, বিশেষতঃ উত্তর ইউরোপে দারুণ শীত, অনুর্ব্বর ভূমি, তিনদিকেই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র, তাই বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত মানবাত্মা সুপ্ত থাকার পর যখন আবার জেগে উঠল তখন প্রথমেই তারা সমুদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। Anglo Saxon জাতি Scandinavia, উত্তর পশ্চিম জার্ম্মেনী প্রভৃতি স্থান হতে সাগর পেরিয়ে ইংল্যাণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাসস্থান করল। তখন দক্ষিণ দিকস্থ ল্যাটিন জাতিদিগের সভ্যতার সংস্রবে এসে তাহারা ও অপরাপর উত্তর ইউরোপস্থ জাতিরা সুগঠিত সংবদ্ধ হয়ে, আইন কানুন বেঁধে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে শিখল। কিন্তু তাহাতেই তাদের শক্তি পর্য্যবসিত হল না, তাদের দেশে যতই লোক বাড়তে লাগল, দেশের উৎপন্ন দ্রব্যে আর তাদের অভাব সঙ্কুলান হল না। পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও আফ্রিকা তাদের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য দুস্তর বাধা ছিল। শতাব্দীব্যাপী চেষ্টার পর তারাও বিজিত হয়ে নিজেদের উপর দিয়ে বিজেতার জয়ের পথ তৈয়ের করে দিল। এই যে সমুদ্র ও প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে করতে এদের একটা চরিত্র গঠিত হয়েছে—যে চরিত্রের মূল ভিত্তি হয়েছে আত্মনির্ভরতা, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, অথচ সংবদ্ধ হয়ে কাজ করার ক্ষমতা, এবং উদ্যম ও সাহস—সেই চরিত্রের বলেই আজ তারা পৃথিবী জয় করতে পেরেছে। এখন রেল ষ্টিমার ও তারের দিনেও অনেক বাঙ্গালী পিতামাতা ছেলেকে বিলাতে পাঠাতে ভয় পান। কিন্তু যখন এ সব ছিল না, সমুদ্রের

উপর দিয়া বায়ু প্রবাহের গতিবিধিও কিছুমাত্র জানা ছিল না তখন তারা পাল উড়িয়ে আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে পচামাংসে দেহ রক্ষা করে এ দেশে বাণিজ্য করতে আসত।

এদেশে এসে তারা দেখতে পেল যে, এদেশে তাদের দেশের মত "জাতি" বলে কিছু নেই, আছে একটি ইটের পাঁজা; এই পাঁজার ইট একটি একটি করে সরিয়ে যদি নিজের কাজে লাগান যায়, বাকীগুলি ভুলেও সাড়া দেবে না। আমাদের এই যে "জাতীয় চরিত্র," ইহাও বহুশতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল। ভারতবর্ষের 'প্রকৃতি' ইউরোপের তুলনায় অতি উদার ও মুক্ত হস্ত। এক শতাব্দী পূর্ব্বে এখানে উদরান্ন ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্য কাহাকেও ভাবতে হত না। মানুষ অতি সামান্য আয়াস করিলেই প্রকৃতি মুক্তহস্তে তাহাকে শস্য-সম্ভার ও অপরাপর প্রয়োজনীয় জিনিষ যোগাতেন। দেশ এত বিস্তৃত ছিল যে লোক-বাহুল্যজনিত অনটনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। পাশ্চাত্যদেশে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে করতে মানুষের একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জন্মে গেছে যে প্রকৃতিকে নিজের বশে আনতে হবে, কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ চিন্তা বা আকাঙ্ক্ষা কাহারও মস্তকে প্রবেশ করার কোন ও রূপ অবকাশ ঘটে নাই। সত্য বটে, মাঝে মাঝে এক একটা প্রকাণ্ড দৈবদুর্ব্বিপাক যেমন গৌড়ের মহামারী, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, দামোদরের বা ত্রিস্রোতার বন্যা বা বাখরগঞ্জের ঝড় আসিয়া মাঝে মাঝে এই শান্তিময় জীবনকে উলট পালট করে দিত, কিন্তু মানুষ এসবকে ভগবানের শাস্তি বলেই গ্রহণ করত; এসব যে কোন দিন দমন করা বা এড়ান যেতে পারে সে চিন্তা বা সে আশা তাদের নিকট আকাশ কুসুমবৎ অলীক মনে হত। যাহা হউক এর ফল হল মানুষ কোমল প্রকৃতি ঘর-মুখো এবং নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীতেই তাদের শক্তি সীমাবদ্ধ রহিল। এমন কি মধ্যএসিয়া হইতে পাঠান, তুর্কী, মোগল প্রভৃতি যে সমস্ত কঠোর প্রকৃতির জাত ইসলামের পতাকা বহন করে ভারতে রাষ্ট্রীয়তা পরিচালনা করেছিলেন, কয়েক পুরুষ এদেশে থেকে তারাও অনুকূল প্রকৃতির স্নেহের দুলাল বনে গেলেন, নিজেদের শৌর্য্য বীর্য্য ও মনুষ্যত্ব অনেকটা হারিয়ে ফেললেন।

এমন সময় বাণিজ্য উপলক্ষে এদেশে এল ইংরাজ ও অপরাপর ইউরোপীয় জাতি। তাদের সামনে ছিল বাণিজ্যের পশরা—পেছনে ছিল সংঘবদ্ধ বিরাট জাতীয় ঐক্য, এদেশে সাম্রাজ্য গঠনের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। এই সংঘর্ষের ফল যে কি হয়েছে তাহা সকলেই জানেন। তার আরম্ভ হয় পলাশীর যুদ্ধে যেটা সপ্তদশ অশ্বারোহীর বাংলা বিজয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ। আপনারা সতেরজন ঘোড়সওয়ার তুর্কী যে লক্ষণসেনের নিকট নদীয়া জয় করেছিল তাহা হয়ত বিশ্বাস করেন না—কিন্তু পলাশীর যুদ্ধত আর উড়িয়ে দেবার নয়। যে যুদ্ধে বাংলা বিহারের চারকোটী লোকের স্বাধীনতা গেল সে যুদ্ধে কয়জন ইংরাজ ছিল?

সতেরজন অশ্বারোহীর বাংলা জয়—এই অপবাদ বাঙ্গালী হিন্দুকে দেওয়া হয়। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের কলঙ্কটা বাঙ্গালী মুসলমানদেরই বেশী প্রাপ্য কারণ মুসলমানই ছিলেন তখন বাংলার রাষ্ট্রনিয়ন্তা। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, সপ্তদশ অশ্বারোহীর বাংলা বিজয়ের অভিনয়টা শুধু রাজনৈতিক জীবনে নয় বাঙ্গালীর economic life'এ ও অতীতে ও বর্ত্তমান সময়ে আমাদের চক্ষের সামনে বহুবার ঘটেছে। বাঙ্গালার কৃষিজাত দ্রব্য ধান ও পাট, বাঙ্গালার অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্য—কারণ সমগ্র উত্তর ভারতের বাণিজ্য বাংলা দেশ দিয়া চলে বাংলা বিহার আসামের খনিজ সম্পদ এ সমস্ত ক্ষেত্রেই সপ্তদশ অশ্বারোহী ও মুষ্টিমেয় বিদেশী লোক এসে আমাদিগকে বিতাড়িত করে রেখেছে, আমাদিগকে ক্রীতদাস করে রেখেছে।

কি কি কারণে আমাদের এমন দুরবস্থা ঘটল, শুধু বিদেশী গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে, একটু তলিয়ে দেখা দরকার। ইংরেজ যখন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠ হলেন তখন দেশে তাঁরা কয়লা ও লোহার সাহায্যে শক্তি উৎপাদন করে পরুতিনিরপেক্ষ হতে শিখেছেন। কি করে ভারতের 'পতিত ক্ষেত্র' চাষ করতে পারেন সে দিকে পড়ল তাদের প্রথম নজর, তাদের নিজের দেশে যা উৎপন্ন হয় তাতে তাঁদের কুলোয় না। যে কোন প্রকারে বিদেশের দ্রব্য আত্মসাৎ কর্ত্তে না পারলে তাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব। এই হ'ল প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চাত্যের রাজনীতির মূলমন্ত্র। ভারতের খনিজ-সম্ভার, ভারতের বাণিজ্য ও কৃষিসম্পদ অফুরন্ত। এ সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হ'বার জন্য তাঁরা কি কি বিষয় অবলম্বন করলেন, আপনারা একবার Chambers of commerce, Geographical Survey, Trigonometrical survey, Agricultural and Botanical survey, Mining Federation, Planters' association প্রভৃতি সরকারী, বেসরকারী সঙ্ঘগুলির কার্য্য করিবার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। এই সমস্ত সঙ্ঘটন করে ইংরেজ ভারতের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য নিজেদের হস্তগত করে রেখেছেন। আমি এদের দূরদর্শিতার ও কার্য্যতৎপরতার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বোধহয় ১৮৩৮ খৃীঃ অব্দে বা তার কিছুপূর্ব্বে এদেশে Geological survey ও Trigonometrical Surveyর প্রতিষ্ঠা হয়, এই Geological surveyর কর্ম্মচারিগণ ১৮৩৯ খৃঃ অব্দ হইতে ভারতের কোথায় কোন খনিজ দ্রব্য আছে তা অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন, তাঁরাই রাণীগঞ্জের কয়লা, মহীশূরের স্বর্ণ খনি, ব্রহ্ম ও আসামের কেরাসিন, বরাকরের লোহা ইত্যাদি আবিস্কার করেছেন। এই সমস্ত Geological surveyর কর্ম্মচারিগণ কার্য্য হতে অবসর গ্রহণ করে বিলাতে যান এবং সেখানকার (capitalist) ধনস্বামীদের পরামর্শদাতা হয়ে এদেশে বড় বড় কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন।

কলিকাতার বড় বড় সওদাগরী অফিসের ইতিহাস এই। এই বিশাল দেশ তন্ন তন্ন করে জরীপ করবার জন্য সৃষ্টি হল Trigonometrical survey, আর তার পেছনে এল লৌহপথের নাগপাশ, যাতে সমস্ত দেশ বাঁধা পড়েছে।

আমি আজ রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা না করে এই সব বিষয় আলোচনা করছি কারণ আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধরে রাজনৈতিকেরা শাসন ও রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করেছেন, কিন্তু এই সমস্ত ছোট খাট জিনিষ, যার ফল হল যে জীবিকান্নের জন্য বাংলার অধিকাংশ ভদ্রসন্তান, শুধু ইংরেজের নয়, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া বা পার্শী, গ্রীক, জার্ম্মান, ইহুদী প্রভৃতি ব্যবসাদার জাতির দাসত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে—ইংরাজিতে যাকে বলে Economic tharldom সেঁ ব্যাপারটা একা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ব্যতীত কেহ দেশবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না। অদ্যকার বক্তা তাঁরই পদতলে বসে এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন এবং তাঁরই উপদেশের পুনরুক্তি করছেন মাত্র। Economic tharldom কথাটার গুরুত্ব বুঝে দেখুন। এই যে বড় বড় বিলাতী ও বিদেশী সওদাগরী অফিস প্রতিবৎসর কোটী কোটী টাকা বিলেতে চালান দিচ্ছে, কলিকাতা ও মফঃস্বলের ভদ্রসন্তানগণ বলতে গেলে, এদের ক্রীতদাস হয়ে পড়েছেন, আজ যদি এই সমস্ত অফিস তালাবন্ধ করে উঠিয়ে নিয়ে চলে

যায় তাহলে বাংলার অর্দ্ধেক ভদ্রলোক না খেয়ে মারা যাবেন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজেরা যখন এই পতিত দেশকে চাষ করবার জন্য এইরূপ জাল বিস্তার করছিলেন তখন এ দেশের লোক সব কি করছিলেন? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এ কথার উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর চাকুরীর দিকে ঝোঁক পড়েছিল, সেই পুরাতন হিন্দু-কলেজের ছাত্র হতে আরম্ভ করে সকলেই আজ চাকুরীর উমেদার; হিন্দুকলেজের ছেলেরা যাঁরা, মাইকেল, রাজনারায়ণের সমপাঠি, তাঁরা গ্রাজুয়েট হলেই প্রথম Lord Hardinge এর গভর্ণমেণ্ট তাদের ডেকে বড় বড় চাকুরী দিতেন। সেই সময় থেকে মতিগতি যে চাকুরীর দিকে গেল, আর সে ফিরল না। বাংলার ধনে, ইংরেজ, মাড়োয়ারীর সিন্দুক বোঝাই হ'ল আর বাংলার গোপালেরা শান্ত শিষ্টভাবে ডিগ্রীলাভের সাধনা করতে লাগলেন। সাধনা ডিগ্রী—তাই সিদ্ধি চাকুরী।"

কোনও জাতির প্রতিভা একদিকে বিকশিত হওয়া সে জাতির পক্ষে মহা অমঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে কালে, শিক্ষালাভ করে সমাজে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, তাঁদের উচ্চতম লক্ষ্য ছিল গভর্ণমেণ্টের চাকুরী। কিন্তু দেশের Aristocrat ব্যবসায়ীগণের আদর্শ কি ছিল? তখন কলিকাতার ও মফঃস্বলের অনেকেই ব্যবসা করে বেশ বড়লোক হয়েছিলেন। সমস্ত উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতের বাণিজ্য কলিকাতা দিয়ে যাচ্ছে, বাঙ্গালী জাতি তেমন উপযুক্ত হলে বা কার্য্যকারিতা ও দূরদর্শিতা থাকলে, এই বাণিজ্যের অধিকাংশই বাঙ্গালীর হস্তগত হত; কিন্তু সর্ব্বনাশ করল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ঐ জমিদার নাম কেনার প্রবল প্রলোভন। কলিকাতার বড় বড় পরিবার, যোঁড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার, হাটখোলার দত্তপরিবার, লাহা, মল্লিক ও শীলপরিবার রাণাঘাটের পালচৌধুরী, ইঁহারা অনেকেই ব্যবসা ক'রে বড়লোক হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর জমিদারী কিনে, কোম্পানীর কাগজ কিনে, এঁরা সকলেই ব্যবসা থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়লেন। বাণিজ্য আস্তে আস্তে এক চেটিয়া হল, মাড়োয়ারী ও বাঙ্গলার বাহিরের অন্যান্য জাতির। বাঙ্গালীর যে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শিখবার সুযোগ ছিল তা ও ঢের কমে গেল। এই যে আর্থিক পরবশতা, এর জন্য রাজনৈতিক অধীনতাকেই শুধু দায়ী করলে চলবে না, আমাদের প্রকৃত জাতীয় চরিত্রই ইহার জন্য দায়ী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বাঙ্গলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে এইরূপ মতি বিপর্য্যয়ের কারণ বলে নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা আরও তলিয়ে দেখতে হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাতে সকল দেশেতেই উকীল, ডাক্তার, কেরাণী, স্কুলমাষ্টার, গভর্ণমেণ্টের চাকুরে তৈরী করে, তজ্জন্য শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষী সাব্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিলাতের Oxford, Cambridge ও এই সুকীর্ত্তি বা কুকীর্ত্তির ভাগী; তফাৎ এই, সে দেশ স্বাধীন ব'লে সে দেশের প্রতিভাবান, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বড় বড় রাজনৈতিক হতে পারেন, সৈন্য বা নৌবিভাগে প্রবেশ করে নিজেদের প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু এদেশে সে পথ বন্ধ; এ দেশে সকলকেই উকীল, ডাক্তার, কেরাণী, স্কুলমাষ্টারের গাদায় পড়তে হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকেও জোর করে এই গাদায় ঠেলে দিচ্ছে না, গাদায় পড়া আমাদের জাতীয়

চরিত্রের গুণ। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচশ্রেণীর লোক পড়ে; মারহাট্টী, পার্শী, গুজরাতী, মুসলমান ও সিন্ধি। সকলেই একই প্রণালীতে শিক্ষিত। কিন্তু পার্শী ও গুজরাতীদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়, কিন্তু মারহাট্টিরা আমাদের মত উকীল, ডাক্তার, কেরাণী ও স্কুলমাষ্টারের গাদায় পড়ে। একই প্রকার শিক্ষাসত্ত্বেও বিভিন্ন জীবন পথে যাওয়ার একমাত্র কারণ—জাতীয় প্রবৃত্তি।

আমার বক্তব্য এই যে—আমাদের এই স্বাধীনবৃত্তিতে বিমুখতা, যার জন্য আমাদের দারিদ্র্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে আমদানী করে নাই; এ দেশের আব-হাওয়া, এ দেশের Tradition এর গুণে তাহা আপনিই এ দেশের মাটিতে বেড়ে উঠেছে। বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত সমাজ বরাবরই পরগাছার মত, তার কারণ এখানে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোনওরূপ আয়াস করতে হত না। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence) এর অভাব হেতু বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও প্রতিভা বরাবর যে পথে ধাবিত হচ্ছিল, বাঙ্গালীর চরিত্র যে দিকে বিকশিত হচ্ছিল, যখন সেই জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত হল, তখন বাঙ্গালী জাপানীর মত আপনাকে সামলাইয়া বদলাইয়া নিতে পারল না, সেই সংগ্রামের স্রোতে ভেসে তলিয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন সকলেই বিদেশীয়, কাজেই যেরূপ শিক্ষাদীক্ষায় বর্ত্তমান যুগের সংগ্রামের উপযোগী লোক তৈয়ার হতে পারে, সে রূপ শিক্ষাদীক্ষার বন্দোবস্ত করা স্বার্থহানিকর ছিল বলিয়া তাঁরা যতদূর সম্ভব সে ব্যাপারটাকে চেপে গেছেন, প্রতিকার আর হয় নাই।

বন্ধুগণ—এই অতীতের বিবরণ আপনাদের প্রীতিকর হবে কি না জানিনা, বাংলার সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন দারিদ্র্য মোচন এবং বিদেশীয় কর্ত্তৃক ধনলুণ্ঠন নিবারণ। এই রোগের সিদ্ধমকরধ্বজ যাহা রাজনৈতিক নেতারা তাহা নির্দ্ধারণ করছেন, আমরা শুধু অনুপানের ব্যবস্থা করছি। একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, এ জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না। পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মস্ত বড় একটা দোষ। সেকেলে লোকে বিশ্বাস করতেন যে, কল্কী অবতার এসে আবার সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা করবেন, এ যুগেও অনেকে কিছু দিন পূর্ব্বে বিশ্বাস করতেন—যে জার্ম্মেণী জাপান বা রাশিয়া আমাদিগের উদ্ধার সাধন করবেন। এ সমস্ত বিশ্বাসই যে অতি ভ্রান্ত তাহা প্রতিপন্ন করবার জন্য বিশেষ কিছু বলবার দরকার নেই, কিন্তু এখনও ছাপার অক্ষরে ব্যক্তিবিশেষকে 'অবতার' বা সেরূপ একটা কিছু প্রতিপন্ন করার জন্য যে সব লেখা হয়, তাহাতে মনে হয় যে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা সম্পূর্ণ অভ্যাস হতে আমাদের এখনও ঢের দেরী। আমরা নিজেরা মানুষ না হলে ভগবান বা তাঁহার কোনও ভগ্নাংশ এসে কখনও সমাজের শিকল কেটে দিবে না। এই মুসলমান-আমলেই অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সমাজ সংস্কারককেই অবতার করা হয়েছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভগবানের এত অনুগ্রহ সত্ত্বেও আমরা তুর্কী, পাঠান, মোগল ও ইংরাজদের পায়ের নীচে হাজার বছর ধরে মাথা লুটোচ্ছি কেন? অনেক অবান্তর কথা বলতে হ'ল, আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে পরনির্ভরতা ও অলসতার জায়গায় কর্ম্মশীলতা ও আত্মনির্ভরতাকে প্রতিষ্ঠিত না করলে আমাদের মুক্তির উপায় নেই।

শিক্ষা বিষয়টাকে একটু বিশেষ করে তলিয়ে দেখতে হবে। শিক্ষা না পেলে মানুষের কার্য্যকরী শক্তি জেগে উঠতে পারে না, মানুষ সমাজের সেবায় লাগবার উপযুক্ত হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যেরূপ শিক্ষা চাচ্ছি, সেরূপ দিচ্ছে না বা দেবার তাদের সাধ্য নাই। কিন্তু শুধু কতগুলো ছেলে ভাঙ্গিয়ে একটা জাতীয়বিদ্যালয় খাড়া করলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হল না। আশা করি আমার কথাটা কেহ ভুল বুঝবেন না; জাতীয় বিদ্যালয় একটা মস্ত কাজ করছে—সেটা হচ্ছে একটা moral revolution বা আদর্শের বিপ্লব। যে সব ছেলে জাতীয়বিদ্যালয়ে ঢুকেছে তাহাদিগকে প্রথম হ'তেই গভর্ণমেণ্টের চাকুরীর প্রলোভন ছাড়তে হচ্ছে, স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হবে, এই জেনে শুনে তাদের জীবন আরম্ভ করতে হচ্ছে। এমন লোক যদি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে, মাসে ১৫৲ টাকাও রোজগার করে, তাহলে সে, যে লোক এম, এ, পাশ করে মুচিরামগুড়ের ন্যায় সেলাম করতে করতে গভর্ণমেণ্ট চাকুরীর এক ধাপ হতে অন্য ধাপে উঠছে, তাদের চেয়ে ঢের বেশী দেশের কাজে লাগবে। এই নৈতিক আদর্শটা খুব বড়, কিন্তু শুধু এই আদর্শেই চলবে না। শিক্ষার আদর্শের আর একটা দিক আছে—মানুষের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগিয়ে তোলা এবং দেশের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকেন্দ্রকে পরিচালিত করার মত শক্তি সংগ্রহ করা। যে শিক্ষাতে আমাদের বৃহত্তর পৃথিবীর সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না ঘটে সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। শুধু অতীতের জ্ঞানে কুলাবে না, অতীতে যাহা জ্ঞান বলে গণ্য হত এখন তাহা অজ্ঞানতা। আমাদের যুবক কর্ম্মীদের শুধু দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করলেই কর্ত্তব্য শেষ হল না, তাদের কর্ত্তব্য আরম্ভ হল মাত্র। তাহাদিগকে বর্ত্তমান সভ্যজীবনের সকল রকম কর্ম্মকেন্দ্রে নেতৃত্ব করবার ও সকল কেন্দ্র চালাবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। দুই হাজার বছর পূর্ব্বে চীনবাসিগণ তাদের দেশের উত্তরে প্রকাণ্ড দেওয়াল তুলে মনে করেছিল যে, তারা বৈদেশিক আক্রমণ হতে চিরকালের জন্য নিরাপদ হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মোগল মাঞ্চু প্রভৃতি জাতি তাদের পুনঃ-পুনঃ দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সংরক্ষকগণ মনে করেছিলেন যে, আচার ধর্ম্ম ও কুসংস্কারের একটা চীনাপ্রাচীর তুলে ভারতের নিম্নবর্ণদিগকে চিরকাল পদতলে রাখবেন, কিন্তু তার ফল হ'ল যে হাজার বৎসর ধরে তাঁরা ফুটবলের মত একবার তুর্কী, একবার আফগান, মোগল বা ইংরাজদের পদতলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন। আমরা যদি মনে করি যে, বর্ত্তমানে সরল অনাড়ম্বর জীবনের একটা আদর্শ তুলে আমাদের জাতিকে পাশ্চত্য যান্ত্রিক-সভ্যতার স্রোতের প্লাবন হতে রক্ষা করতে পারব, তাহলে একটা মস্ত ভুল হবে। মানবসভ্যতা যতই প্রাচীন হয় ততই সংবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বাড়ে, ততই বিজ্ঞানের সুসম্বদ্ধ জ্ঞানকে মানবের কাজে লাগাবার প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। এমন এক ভবিষ্যতের কথা কেহ ভাবতে পারে না, যখন রেল, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, পোষ্টঅফিস দেশ হতে উঠে যাবে, যখন কয়লা বা লোহার খনি আর মানুষের কাজে লাগবে না! সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য, এই সমস্ত হতে দূরে না থেকে যাতে এই সমস্ত ব্যাপারে পারদর্শিতা লাভ করতে পারি, দেশের সকল রকম বাণিজ্য শিল্প ও কৃষিকে বিদেশীর কবলমুক্ত করে নিজেদের হস্তগত করিতে পারি। ত্যাগ খুবই বড় জিনিষ, কিন্তু শক্তি ও কর্ম্ম তার চেয়ে

কম বড় জিনিষ নহে, আমরা অনেক সময়ে আমাদের অযোগ্যতাকে ত্যাগ বলে প্রচার করি।

বর্ত্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, বেঁচে থাকতে হ'লে আমাদের প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে হবে এবং প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে জয়ী হ'তে হ'লে আমাদের বিজ্ঞানের সেবা করতে হবে। এ বিষয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহু স্থলে বলেছেন। আজকাল Back to nature রব উঠেছে; কলকারখানা সব তুলে দেও; দৌলত (Capital) ও মেহনৎ (Labour) কে একই পর্য্যায়ে আন। অনেকেরই বিশ্বাস যে বলশেভিক রাশিয়াতে সমস্ত কলকারখানা তুলে দেওয়া হয়েছে। একথা ঠিক নয়—রাশিয়াতে বরং বেশী উৎসাহে দেশময় কল কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে, দেশের লোককে কলকারখানার ব্যবহারে শিক্ষিত করা হচ্ছে।

রাশিয়ার প্রায় অধিকাংশ রেলপথ তাড়িতশক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এবং লেনিনের জীবনে মস্ত একটা আকাঙ্ক্ষা যে, দেশের সমস্ত কাজ—কলকারখানা, খাথানির কাজ এমন কি চাষ বাস পর্য্যন্ত তাড়িতশক্তিতে চালান। বলসেভিকগণ শুধু যান্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহার—ধনীও দরিদ্রের তারতম্য—উঠাইয়া দিয়াছেন। যান্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহারকে বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফল বলে ধরে নেওয়া একটা মস্ত ভুল। আমরা যদি বর্ত্তমানে Back to nature এই নীতি অবলম্বন করে বৈদিক ঋষিদের মতন জীবন চালাতে আরম্ভ করি এবং যদি ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট দয়া করে আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়ে দেশে ফিরে যান এবং আমেরিকা, জাপান যদি আমাদের দয়াকরে আক্রমণ নাও করেন তথাপি আমরা আমাদের স্বাধীনতা রাখতে পারবো না। দশ পনর বৎসর মধ্যে আফ্রিকার কাফ্রীগণ ক্রমে আমাদের প্রভু হয়ে বসবে।

কলকারখানার নাম শুনেই ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই; শক্তিকে ঠিক ভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার জন্য কারখানার দরকার। সভ্যতার আদিম স্তর হতেই কলকারখানা উদ্ভাবন করা মানবের প্রকৃতিগত স্বভাব। সে হিসাবে আমাদের চিরপরিচিত লাঙ্গল ঢেঁকী বা কুলো চরকাও কল; কারণ নাগা কুকী প্রভৃতি জাতি এখন ও এ সমস্তের ব্যবহার জানে না। বর্ত্তমান যুগের উন্নত প্রণালীর কলকারখানা দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। শিক্ষা-প্রণালী উন্নত হলে আমাদের দেশের শিল্পীজাতীয় লোকে সমস্ত রকম যন্ত্রপাতি তৈয়ের ও ব্যবহার করতে শিখবে। অনেকে বোধ হয় জানেন না, যে E. I. Railway. Jessop Co, King Co. প্রভৃতি বড় বড় কোম্পানির এঞ্জিন, ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বেহালা, বাঁটরা ও অন্যান্য জায়গায় দেশী মিস্ত্রীদের হাতে তৈয়ারী। সমগ্র কাযই এই সব দেশী মিস্ত্রীরা করে, উপরিওয়ালা ইংরেজ তাদের পরিচালনা করেন মাত্র। যদি বাঙ্গালী অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জমিদারী ও কোম্পানির কাগজে সমস্ত অর্থ invest করে 'জড়ভরত' না সেজে বাঙ্গালী শিল্পীদের সাথে মিলিত হয়ে নিজেদের অর্থ ও বুদ্ধি এই সব দিকে পরিচালিত করতেন, তাহলে এই নিদারুণ দৈন্যদশা ঘটতনা। দশটা 'সংঘ' অকৃতকার্য্য হ'ত কিন্তু আর দশটা টিঁকে যেত!

বিজ্ঞানের প্রসাদে আমরা প্রকৃতিরাণীর রাজ্যের যতটুকু দখল করতে পাচ্ছি, ইউরোপ

আমেরিকার লোকে তখনি তাকে কাজে লাগিয়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করছে। আমরা প্রতি বৎসর দামোদরের বন্যায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছি, কিন্তু আমেরিকায় তাহারা Colorado নামক একটী পাগ্‌লা নদীকে এমন ভাবে বেঁধেছে যে সেই নদী এখন মানবের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় ৭২ লক্ষ লোকের সমস্ত কাজ করে দিচ্ছে—যায় কারখানা চালান, খনি খোঁড়া, চাষবাস ইত্যাদি। বেশী দূর যেতে হবে কেন—এই ভারতবর্ষে মহীশূর রাজ্যে কাবেরী নদী এইরূপ বাঁধা পড়েছে। দামোদরের মত কাবেরী নদীতেও মাঝে মাঝে বন্যা হয়ে লোকের বিষম ক্ষতি হ'ত। কিন্তু দেওয়ান বাহাদুর বিশেশ্বর রায়ের চেষ্টায় কাবেরী নদীতে বাঁধ দিয়ে একটী বিশাল হ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই হ্রদের সঞ্চিত জল রাশিকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে তাড়িত শক্তিতে পরিণত করা হচ্ছে। এই তাড়িত শক্তিতে মহীশূর রাজ্যের সমস্ত কাজ চলছে; আর, কাবেরীর জল হঠাৎ হুড়মুড় করে সমস্ত দেশ ভাসিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ না করে, সমস্ত বৎসর ধরে একটু একটু করে মহীশূরের কৃষিজীবী প্রজার ক্ষেত্রে জল যোগাচ্ছে।

গত বৎসর মাদ্রাজ সহরে নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞানসভার অধিবেশন হয়েছিল। সভাপতি ডাঃ মিডলমিসের বক্তৃতা ছিল ভারতের এই water power সম্বন্ধে। তিনি বলেন যে হিমালয় পর্ব্বতে কোন খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু হিমালয়ের জলরাশিকে যদি তাড়িত শক্তিতে পরিণত করা যায়, তাহলে ভারতবর্ষ তাড়িতশক্তিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করবে। মনে করবেন না যে বিলাতের ধনস্বামী (Capitalist) দের শ্যেনদৃষ্টি এদিকে পতিত হয় নাই। অনেকে হয়ত জানতে না পারেন যে, কিছুকাল পূর্ব্বে একদল সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার এই জলধারার জরীপ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু Reformed Council এর মন্ত্রীগণ এই কার্য্যে ভারতের লোকের কোনও রূপ উপকার হবে না মনে করে, এই বিভাগটা তুলে দিয়েছেন। বিলাতের ইঞ্জিনীয়ার ও ধনীদের পক্ষ হইতে প্রায়ই লেখালেখি হচ্ছে যে ভারতবাসীরা নিজেদের ইষ্ট বোঝে না এবং আমরা বোঝাতে চাইলেও তারা বুঝ্‌বে না। আপনারা মনে করবেন না, ইহাতেই আমাদের পরিত্রাণ হ'ল। এই যে শক্তির বিশাল উৎস, একে যদি আমরা কাজে না লাগাই, নিশ্চয় কিছুদিন পরে কোন বিদেশীয় কোম্পানি, বা পার্শী কি ভাটিয়া কোম্পানী এসে তাদের নিজেদের কাজে লাগাবে; তখন বাঙ্গালীর একটা শক্তির কেন্দ্র পরদেশীর হস্তগত হবে, বাঙ্গালীর ধনাগমের একটা প্রবাহ অপর দেশের মুখে প্রবাহিত হবে, বাঙ্গালার জনসাধারণের দাসত্বশৃঙ্খলের আর একটী গ্রন্থি বাড়বে। কিন্তু এই শক্তির উৎসকে আয়ত্ত করার জন্য দেশের কোনরূপ চেষ্টা করা হচ্ছে না, এবং দেশের কোনও প্রতিভাবান ছাত্র এই বিষয়ে শিক্ষিত হবার কোন চেষ্টা করছেন বলে মনে হয় না।

বন্ধুগণ, উপসংহারে আমি আবার আমার প্রথম কথারই পুনরুক্তি করছি। বাঙ্গালার প্রধান সমস্যা—দারিদ্র্য। ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশ কৃষি বাণিজ্য ও খনিজ সম্পদে বাঙ্গালার তুল্য নয়, তথাপি আমাদের অকর্ম্মণ্যতা বশতঃ এই সমগ্র সম্পদের অধিকাংশ অবাঙ্গালীর হস্তগত হচ্ছে। দারিদ্র্য ঘুচ্‌লেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেকটা কমবে। কারণ পীড়িত লোকে দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অতি সাধারণ

উপায় ও অবলম্বন করতে পারে না। সুতরাং রোগের সাথে সংগ্রাম করার ক্ষমতা তাদের ঢের কমে যায়। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে গঙ্গার দুধারে পাটের কলের বস্তি ও ইংরেজ মার্চ্চেণ্টদের কুঠি; ম্যালেরিয়া এদের ধারে কাছেও ঘেস্‌তে পারে না, কিন্তু একটু ভেতরেই গ্রামে অর্দ্ধেকলোক ম্যালেরিয়ায় অর্দ্ধমৃত। ইংরাজ কলওয়ালাদের অর্থ আছে, তারা জঙ্গল কেটে, নর্দ্দামা করে, ম্যালেরিয়া তাড়িয়েছে। বাঙ্গালী অদৃষ্টের উপর দোষ চাপিয়ে উৎসন্ন যাচ্ছে।

দেশের দারিদ্র্যমোচন করতে হ'লে শুধু 'ত্যাগ' চলিবে না। যে ব্যক্তি সমর্থ, ত্যাগ তাহাকেই সাজে, অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগ 'অযোগ্যতার'ই নামান্তর মাত্র। দেশের যুবকদের আদর্শ হবে যে, দেশের দারিদ্র্যমোচন করতে হবে, দেশের শিল্প বাণিজ্য ও সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনবৃত্তি যা এখন বিদেশীর হস্তগত, তাহাতে ক্রমে ক্রমে ঢুকতে হবে। এই দেশে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাবার জন্য ভবিষ্যতে যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, তার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু এই সংগ্রামের উপযুক্ত হতে হলে নিয়তির উপর নির্ভরতা কমাতে হবে, জীবনব্যাপী সাধনা ও শিক্ষা করতে হবে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষাতেই শেষ করছি—

"সাধনা বিনা সিদ্ধিলাভ হবে না।"

শ্রীমেঘনাদসাহা।

কর্ত্তব্য পঞ্চক

যুবকমণ্ডলীতে বৃদ্ধের স্থান কোথায়? উপদেষ্টার আসনে। সে আসনে বসিবার যোগ্য আমি নই, তবে বৃদ্ধ বলিয়া পরামর্শরূপে দুএকটী কথা বলিতে পারি। 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে উপস্থিতে'। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিপদসঙ্কুল বলিয়া কি যুবক-বৃন্দের ধারণা হইয়াছে? যদি হইত, তাহা হইলে এই অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট ও নানাবিধ লাঞ্ছনার সময়ে যুবকেরা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া এবং গোরা সার্জেণ্টদের বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া গড়ের মাঠে খেলা দেখিতে যাইতেন না। এই লাঞ্ছনা সহিয়া দেশের এই দুর্দ্দিনে ঐ সার্জেণ্টদিগকে পুষিবার জন্য যে অতিরিক্ত আড়াই লক্ষ টাকা আমাদিগকে দিতে হইয়াছে, একথাটা তাঁহারা ভাবেন না। তাঁহারা ভাবেন না, রোমনগর ধূ ধূ করিয়া দগ্ধ হইবার সময় তানলয় সমন্বিত সঙ্গীত শ্রবণ আর এই ভীষণ দুর্দ্দিনে আমোদপ্রমোদে সময় অতিবাহিত করা, অভিনয়-কুশল কবিদের কবিতারসমাধুর্য্য কিম্বা বিলাসসজ্জাশোভিত অভিনেত্রীদের অভিনয়সৌন্দর্য্য উপভোগ করা একই প্রকার নিষ্ঠুরতা। সেই আমোদসর্ব্বস্ব জীবনের প্রতিবাদ স্বরূপ এই বঙ্গীয় যুবকসম্মিলনী। সংখ্যায় লক্ষ বা সহস্র না হইলে ও এই সমবেত যুবকবৃন্দ ভবিষ্যতের আশা ও কর্ম্মযোগের বিরাট মূর্ত্তি বলিয়া আমাদের নমস্য।

বর্ত্তমান সময়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই সম্মিলনীর অধিবেশন। গুরুজন এবং কর্ম্মীদের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

নানা মুনির নানামত শুনিয়া অনেকে বাঁশবনে ডোম কাণার মতন হইয়া পড়েন। কিন্তু সকল কথার মধ্যে কয়েকটী সার কথা বাছিয়া লওয়া যায়।

প্রথম কথা দেশের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করা। সভাপতির মতে দারিদ্র্য দূর করিবার উপায়, পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিজ্ঞান বলে প্রকৃতিকে জয় করা। কলকারখানা প্রতিষ্ঠা যুবকমণ্ডলীর সাধ্যায়ত্ত নয়। কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে প্রতীচ্যে মঙ্গলের তুলনায় অমঙ্গলের দিকে ওজনের কাঁটাটা অধিক নত হইয়া পড়িয়াছে কি না এ বিষয় আলোচনা পরে হইতে পারে। এখন দারিদ্র্য নিবারণের কোন উপায় যুবকমণ্ডলীর সাধ্যায়ত্ত তাহাই স্থির করা উচিত।

দ্বিতীয় কথা বিজ্ঞান বলে প্রকৃতিকে জয় করা। প্রকৃতিকে জয় করিতে পারে বলিয়াই মানুষ সৃষ্টপদার্থের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রতীচ্যের জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের অনুকরণ চলে না। আমাদের দেশে প্রকৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলেন :—

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ
প্রকৃতেজ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি
নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

"জ্ঞানবান স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করেন। ভূতসকল প্রকৃতিতে যায়; নিগ্রহ কি করিবে?" জ্ঞানবান স্বীয় প্রকৃতি বা স্বধর্ম্ম অনুসারেই কর্ম্ম করেন; তাই শাস্ত্র বলেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।" অন্যদেশের প্রকৃতি জয় এবং আমাদের প্রকৃতি জয় এক কথা নয়। প্রকৃতি কি? "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"। এই সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া গেলে প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রীয়াশীল হন। একভাগ "অপরা," অন্য ভাগ "পরা"। অপরা প্রকৃতি অষ্টবিধা—ভূমি, আপ, অনল, বায়ু, খং, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। পরাপ্রকৃতি—জীবভূতা জগদ্ধাত্রী। এই জীব যখন শিব হইবার জন্য ব্রতী হন, তখন তিনি প্রকৃতিকে বশ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা কি প্রকার? পাশ্চাত্যের চেষ্টার সীমা ভূমি, আপ, অনল, বায়ু এবং খং পর্য্যন্ত। অরুণ, বরুণ, পবন, ভুবন জয় করিয়াও কি বিজ্ঞান-রাবণ আপনাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিল? পৃথিবীর সমুদয় অভেদ্য পদার্থে তরী নির্ম্মাণ করিয়া, বায়ু অগ্নিকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া, মৃত্যুকে উপহাস করিয়া, পাশ্চাত্য ধনীমানীগণ চলিলেন জলপথে বিহার করিতে। এক ঘনীভূত জলখণ্ডের আঘাতে মূর্ত্তিমান বিজ্ঞান-দর্প টাইটেনিক চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। তাই বলিয়া এ কথা অস্বীকার করি না, বিজ্ঞানের আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু বিজ্ঞানবলে ভূতপ্রপঞ্চকে জয় করাই মানুষের চরম লক্ষ্য নয়। যাঁহারা ভূমি আকাশ ও সমুদ্র জয় করিয়াছেন তাঁহারাই যে মানবশ্রেষ্ঠ বা আদর্শ মানুষ একথা কেহ স্বীকার করিবেন না। এই পঞ্চভৌতিক দেহটাকেই যাঁহারা যথাসর্ব্বস্ব মনে করেন, তাঁহারাই কেবল ঐ দেহরক্ষার জন্য পঞ্চভূতকে নিযুক্ত করিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করেন। ভূতপ্রপঞ্চকে জয় করিয়া দেহ-

রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলাম। ততঃ কিং? সর্ব্বপ্রকার ভয়মুক্ত হইলাম কি? দেহসর্ব্বস্বজ্ঞানকে শাস্ত্রে বলেন "দ্বিতীয়াভিনিবেশ"। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃস্যাৎ"। ভয়ের কারণ দেহাত্মাভিমান। এই দেহলাঞ্ছনার ভয়েই আমরা পরাধীনতা প্রভৃতি নানাপ্রকার বন্ধন বরণ করিয়া লই। তাই শাস্ত্রে বলেন 'মনকে জয় কর, তাহা হইলেই পঞ্চভূত জিত হইবে।'

"যতো যতো নিশ্চরতি
মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতৎ
আত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥

মন যাহার বশে আসিয়াছে তাহার ভয় নাই, ভাবনা নাই; সমুদয় ক্লেশ নির্য্যাতন তাহার নিকট তুচ্ছ। সে সত্যের জন্য কারাশৃঙ্খল পরিতে ভয় পায় না। সে জনসেবার জন্য ঝড়বৃষ্টি শীতাতপের উপদ্রব অগ্রাহ্য করিয়া অক্লান্ত কলেবরে পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ত। মনকে নিন্দা উপহাস ভয়ের অতীত করিয়া জনসেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে।

তৃতীয় কথা, শ্রমগৌরব। বাঙ্গালী দরিদ্র কেন? দেশের সমুদয় ধন ও ব্যবসা পরকে বিলাইয়া দিয়া আজ বাঙ্গালী দেউলিয়া হইয়াছে কেন? দৈহিকশ্রম নিম্নশ্রেণীর কাজ মনে করে বলিয়া। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এ বিষয় অনেক কথা বলিয়াছেন। আমার নিকট অনেক ছাত্র অনেক সময় বিনা দক্ষিণায় অধ্যয়নের জন্য আবেদন করে এবং এই আবেদন অগ্রাহ্য করিলে অধ্যয়ন অসম্ভব একথাও জানায়। আমেরিকা প্রভৃতি-দেশের ছাত্রগণ পাঠের ব্যয় সঙ্কুলান না হইলে অবসরকালে দৈহিক পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। প্রাতে ও রাত্রে ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজও করিয়া থাকে। এই প্রকার উপার্জ্জনের ব্যবস্থার জন্য একটী সংবাদ-আফিস বা Information Bureau প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। ছাত্রেরা অবসর কালে ঘরে ঘরে খদ্দর বিক্রয় করিয়াও কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে পারেন। এই কার্য্যে অনেক ব্যাঘাত আছে বটে। প্রথম ব্যাঘাত বন্ধুদের উপহাস। কিন্তু কর্ত্তব্যসাধন করিতে হইলে, মনকে স্তুতি নিন্দা ভয় উপহাসের অতীত করা আবশ্যক। দ্বিতীয় ব্যাঘাত বিজ্ঞতা। অনেক ইংরাজীনবীশ অর্থনীতিজ্ঞ বিজ্ঞতাপূর্ণ মাথা নাড়িয়া বলেন ইহাতে লোকের খরচ বাড়িয়া চলিবে। যে বাবুদের গায়ে খদ্দর পরিলে ফোস্কা পড়ে, তাঁহারাই প্রায় এই কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে জানান আবশ্যক কাবুলের আমীর স্বয়ং খদ্দর পরেন এবং প্রজাদিগকে খদ্দর পরিতে বলেন। তিনি যখন আমীরজাদা বা যুবরাজ ছিলেন পোষাকের জন্য তাঁহার বাৎসরিক ব্যয় ছিল ১২০০০৲ টাকা। এখন ৬০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া খদ্দর পরিয়া তিনি আমীর সাজিয়াছেন। খদ্দর পরিলে বিলাসবাসনাক্ষয় ও সংযমশিক্ষা হয় এই কথাটা ঘরে ঘরে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। বস্ত্রের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য কমাইলেই খরচ অনেক কমিয়া যায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আজানুলম্বিত আটহাতী খদ্দর পরিয়া মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় বিলাসী প্রতীচি কি এই সমুদয় বিষয়ে সংযম অবলম্বন করে নাই? ভাল বিষয়ে তাহাদের অনুকরণ করা কি কর্ত্তব্য নয়?

চতুর্থ কথা, অস্পৃশ্যতা দূর করা। আমাদের দেশের ধর্ম্ম কাহাকেও অস্পৃশ্য বলে না। কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান শ্রীগৌরাঙ্গ মুসলমান হরিদাসের মৃতদেহ বহন করিয়া সমাধিস্থ করিয়াছিলেন এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

পঞ্চম কথা, দেশকে রোগমুক্ত করা। এই বাঙ্গালায় প্রতিবৎসর পাঁচলক্ষ লোক ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কবলস্থ হয় এবং ৫০।৬০ লক্ষ লোক তাহারই স্পর্শে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। একথা সত্য যে দারিদ্র্যই রোগে আক্রান্ত হইবার প্রধান কারণ এবং স্বরাজ ভিন্ন দারিদ্র্য ঘুচিবার নান্য পন্থা বিদ্যতে। কিন্তু আমি রাজা হইতে পারিলাম না বলিয়া যে গৃহস্থ হইব না তাহা উচিত নহে। গৃহরক্ষা করিতে হইলে দেহরক্ষার প্রয়োজন। স্বরাজের অপেক্ষায় থাকিয়া কি সকলকে মরিয়া ভূত হইতে হইবে? স্বরাজের চেষ্টাও যেমন অবশ্যকর্ত্তব্য, দেশবাসীকে রোগমুক্ত করাও তেমন প্রয়োজনীয়। সুচিকিৎসায় ও সু সুশ্রূষায় অনেক লোক মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা বাতুলতা মাত্র।

এই আগামী সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কলিকাতা সহরে লক্ষাধিক যাত্রী আসিবার সম্ভাবনা। ১৯০৮ সালের অর্দ্ধোদয় যোগে যখন সহর ৩।৪ লক্ষ যাত্রীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, যুবকেরাই স্বেচ্ছাসেবক সাজিয়া তাহাদিগকে ওলাউঠা প্রভৃতি রোগ এবং আকস্মিক মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। যাত্রীসেবার ব্যবস্থার জন্য যে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠিত হইতেছে, যুবকমণ্ডলী তাহাতে যোগদান করিয়া অনেক বালক বৃদ্ধ যুবাকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারেন।*

নিয়তং কুরুকর্ম্ম ত্বং
কর্ম্ম জ্যায়োহকর্ম্মণঃ

তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর; কর্ম্ম অকর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনেকে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া কিম্বা পুলিস-ভীত হইয়া কর্ম্মত্যাগী সাজিয়া রোগ মৃত্যু দেহধারণের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন এবং নানাবিধ অত্যাচার অনিবার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। এই নিশ্চেষ্টতা ও উদাসীনতা দূর করাই স্বরাজমন্দিরে প্রবেশের প্রথম সোপান।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস।

ক্রমবিকাশ ও আকস্মিক বিকাশ*

আমি প্রবীণ হয়েও আজ নবীনদের কাছে দাঁড়ালাম। একজন বক্তা বল্লেন যে সব কাজে যুবকেরাই অগ্রণী। শুনতে শুনতে মনে পড়লো সেই পঞ্চাশ বৎসরের আগেকার কথা। তখন ও একদল যুবক বিংশতিবৎসর বয়স্ক যুবককে নেতা করে ব্রাহ্মসমাজ গড়ে দেশকে সমাজকে তোলপাড় করেছিলেন, সে আন্দোলন সমগ্র ভারতে ছড়িয়েছিল; পশ্চিমেও তাঁহার সংবাদ গিয়েছিল। আর প্রবীণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের বরণ করে নিয়ে নবীন কেশবকে ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য করেছিলেন। তারপর ত্রিশ বৎসরের কথা। যখন পশ্চিমে প্রবাসে

* (যুবকসঙ্ঘে প্রদত্ত বক্তৃতা)।

বাঙ্গালাভাষার চর্চ্চা করতাম, তখনও মনে পড়ে, একদল যুবকই মাতৃ ভাষার সাধনা করে বাঙ্গালা সাহিত্যকে গড়ে তুলেছিলেন। তার পর যখন সুদূর পশ্চিমে ছিলাম তখন স্বদেশী আন্দোলনের কথা পড়েছিলাম। তাও সম্পূর্ণই যুবকদের কাজ ছিল। তাই আমিও সায় দি যে সবকাজে যুবকরাই অগ্রণী।

প্রবীণ হয়ে আপনাদের কি উপদেশ দিব জানি না, তবে বাঙ্গালী যুবককে অনেকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। এই সে দিন দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের Chancellor (চান্সেলর) Cambridge এর ডিগ্রী ধারী বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর বাঙ্গালী যুবককে উপদেশ দিয়ে গেলেন। তাঁর মতে বিজ্ঞান বলছে যে প্রকৃতিতে (nature) ও সমাজে ক্রমবিকাশের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। অতএব তোমরাও তিল তিল করে অগ্রসর হও, অল্পে অল্পে সংস্কার কর,—আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিও না। বক্তৃতা পাঠ করে মাথা হেঁট হল। যে Cambridgeএ ডারুইনীয় যুগের ক্রম-বিকাশের (evolution) রীতির সীমা ধরা গেল, সেই Cambrige এর লোক কি করে হঠাৎ-বিকাশ, আকস্মিক বিকাশ (revolution) এর কথা ভুলে গেলেন। জানি না Cambribgeএর অধ্যাপকদিগের হাতে Ronaldshay এর বক্তৃতা পৌঁছেছে কিনা। ডারুইনের যুগে তাঁরা বলতেন Natura non facit saltum—প্রকৃতি কখনও লম্ফ দেয় না। কিন্তু এখনকার কথা Nature creeps and leaps—প্রকৃতি ধীরে ধীরেও চলে, লাফিয়েও চলে। প্রকৃতিতে ক্রমবিকাশও আছে, আকস্মিক বিকাশ ও আছে। ক্রমবিকাশের রীতি আছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক বিকাশের নীতি ও রীতি আছে।

মনোরাজ্যের কথা যখন দেখি তখন দেখি সেখানে পদে পদে হঠাৎ বিকাশ। চেতনার বিকাশ ত আকস্মিক বিকাশ। চেতনার বিকাশে হঠাৎ নিজের সঙ্গে নিজের পরিচয় হয় এবং পরের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় হয়। বাস্তবিক বলতে গেলে revolution আগে evolution পরে।

মনে পড়ে ১৯০০ সালে যখন প্রথমে কলিকাতায় আসি তখন আমার বন্ধুরা সকলেই Whiteaway Laidlaw দোকানের জিনিষ না থাকিলে লোককে অবজ্ঞা করিতেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদে জোলাদের মোটা কাপড় মোটা গামছা ও ঝাড়ন ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু কলিকাতায় তখন বিদেশীর খুব প্রচলন। কয়েক বৎসর পরেই যখন বিলাতে বসে কলিকাতায় বিদেশী কাপড় ত্যাগের ও পোড়ানর কথা শুনলাম তখন আশ্চর্য্য হতে হলো। সে ব্যাপারকে revolution বলেই মনে হলো।

আজ এই যুগে আবার নূতন চেতনার বিকাশ হয়েছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে নূতন কাজও এসেছে। আজ আমাদের এবং আপনাদের নূতন কাজ—সামঞ্জস্য ও সমন্বয়। নবীন বাঙ্গলা ও নবীন ভারতে সামঞ্জস্যের ও সমন্বয়ের নূতন আহ্বান এসেছে। ধর্ম্মে ধর্ম্মে সামঞ্জস্য, সমন্বয় করতে হবে।

সমাজে সকল পার্থক্য দূর করে ধনী নির্ধনের সামঞ্জস্য, ভদ্র ইতরের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে। এখনও হিন্দুর কাছে, হিন্দুর ধর্ম্মই ধর্ম্ম; ইসলাম অধর্ম্ম। মুসল-মানের কাছে ইসলামই ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম অধর্ম্ম। এই প্রভেদ ঘুচাতে হবে। হিন্দুকে ইসলাম নিতে হবে, মুসলমানকে হিন্দু হতে হবে। তবেই যথার্থ একতা হবে।

কোনও জন্ বুল (John Bull) জিজ্ঞাসা করেছিলেন "কি করে জানবো অমুক ভদ্রলোক (gentleman) কি না ?" আমেরিকার কবি তার উত্তর করলেন—

"Think him so J.B."

সকলকেই ভদ্র মেনে নিতে হবে। তবে ভদ্র ইতর প্রভেদ চলে যাবে। পরস্পরের মধ্যে think him so নিয়মটি চালাতে হবে। কে ইতর বাঙ্গালা দেশে ? যদি তুমি কাউকে ইতর ভাব, তাহলে তোমার মধ্যে ইতরতা আছে। এই ইতরজ্ঞান চলে গেলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদান চলিবে। ইতরশ্রেণী যাদের বলা হয় তাদের যদি ভদ্র বলে গণ্য করতে পারি, তবে তাদের সঙ্গে চলাফেরা, তাদের সঙ্গে বসবাস, তাদের সঙ্গে আদান প্রদান সবই সহজ হয়ে উঠে। প্রকৃত জাতীয় একতা আসবেনা যতদিন এই প্রভেদ না ঘুচবে। ধনী নির্ধনের প্রভেদও না ঘুচালে জাতীয় একতা আসবে না।

পূর্ব্বে বলেছি চেতনার বিকাশে আকস্মিক বিকাশের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ক্রমবিকাশ চলে বুদ্ধি দিয়া। চেতনার মতে চলতে হলে revolution আসে। বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক ও বিচার দিয়ে চলতে হলে ক্রমবিকাশের পথে যেতে হয়। ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র যা ডারুইনের যুগে সমাজ দেশ প্রভৃতিতে Biologistরা লাগিয়ে দিয়েছিলেন—সেটি "অবস্থা মত ব্যবস্থা" (adaptation to environment)। সেই শিক্ষা, এই যুগে আমরাও পেয়ে আসছি। কিন্তু সে শিক্ষা মানবোচিত নয়। মানুষের দেহ অনেকটা ঐ নিয়মের বশীভূত কিন্তু মানুষের দেহ ছাড়াও আর কিছু আছে। মানুষের মন, মানুষের আত্মা ওনিয়মের অধীন নয়। মায়ের মন যদি এই নিয়মের অধীন হতো তাহলে আমাদের অনেককেই বহুপূর্ব্বেই মানবলীলা সাঙ্গ করতে হতো। martyr যেখানে অগ্নিকুণ্ডে পা বাড়িয়ে দেন সেখানে ক্রমবিকাশ খাটে না। সেখানে আত্মার বিকাশ, সেখানে অবস্থামত ব্যবস্থা খাটে না। সেখানে আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়ম খাটে। সে নিয়মটি "আদর্শমত ব্যবস্থা", আদর্শ বুঝে ব্যবস্থা আজ আমাদের দেশে এই সমস্যাই উঠেছে। জড় জগতেরও ইতর প্রাণীজগতের নিয়ম পালন ক'রে, তাদের নিয়মের অধীন হয়ে আমরা অবস্থামত ব্যবস্থা করবো—না, মনুষ্যোচিত অধ্যাত্মনিয়ম স্বীকার করে, আদর্শ বুঝে ব্যবস্থা করবো ? বিজ্ঞান আমাদের বলে দেন জড়প্রকৃতি (matter) কোন পথে যায়। যে পথে কম বাধা—সব চেয়ে কম বাধা, The path of least resistance সেই খানে সকল জড়শক্তি ধাবিত হয়। যে ইথরতরঙ্গের সহিত আমাদের সভাপতি মহাশয়ের সুপরিচয়, সেই ইথর তরঙ্গ বাধা পেলে ঈষৎ হেলিয়া চলে। জড় জগতের এই নিয়ম কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে খাটে না। মানবত্বের পরিচায়ক নয়। Spiritual law হচ্ছে the path of greatest resistance যেখানে যত বেশী বাধা, সেখানে ততই আত্মার গতি স্থিতি ও বিকাশ।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ।

'গোষ্ঠীবিহারে' দেশসেবা। *

আজ মাতৃবৈদেশযজ্ঞের ঋত্বিক হব্যসংগ্রহের জন্য দেশবাসীকে যে আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে সাড়া দিয়াছে প্রধানতঃ দেশের যুবকবৃন্দ। এখন আর বক্তৃতার দিন নাই অনুষ্ঠানের যুগ আসিয়াছে। যুবকগণ লাগিয়া পড়িয়া কর্ম্মে উন্মুক্ত হইয়াছে। স্বদেশ-ভক্তি, স্বদেশ-প্রীতি কাহাকেও শিখাইতে হয় না। স্বদেশ-ভক্তি-প্রীতি মনের সাধারণ বৃত্তি অন্যান্য বৃত্তির মত এই বৃত্তিরও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। নিজের জিনিষকে সকলেই ভালবাসে, নিজের জিনিসের সংরক্ষণের জন্য সকলেরই চেষ্টা হয়। যুবকদের মধ্যে তাহাদের এই সুপ্ত বৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

সকল দেশে যুবকেরাই দেশের মেরুদণ্ড, দেশের আশা ভরসা; দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির অপরিসীম শক্তি যুবকের বাহুতে, যুবকের প্রাণেই রহিয়াছে। যৌবনের অপরিমেয় শক্তি না হইলে বিশ্বের গঠন হয় না। সেই জন্য যুবকের কাছে আমরা প্রত্যাশা করিনা, এমন কোনও কাজ নাই। কি করিয়া যে সকল কাজে, সকল দিকে যুবকদের চিন্তাশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও সংহতিশক্তি সম্মিলিত করিতে পারা যায়, দেশের নানা অবস্থার ভিতর দিয়া তাহাও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার দিন। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির শোচনীয় পরিণাম কি, তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে, নবীন ও প্রাচীন ইতিহাসে সংহতিশক্তির জয় আমরা বেশ দেখিতেছি। ধর্ম্মপ্রচারে, সমাজ সংস্থাপনে, রাজনৈতিক অভ্যুদয়ে, কৃষি, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনায় এই সংহতিশক্তির দিব্য বিকাশ যে কোনও উন্নতিশীল জাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই।

প্রাচীন ভারত যখন উন্নতিশীল ছিল, আদর্শ ছিল, তখন ভারতেও এই সংহতিশক্তির দিব্য বিকাশ দেখিতে পাই। প্রাচীনভারতে লোকে "গোষ্ঠীবিহার" করিত। নগরবাসীদের সকল কাজের মধ্যে গোষ্ঠিতে যাওয়া একটা কাজ ছিল; তা আবার যখন তখন নয়—প্রত্যহ। সহরের লোকের দেখাদেখি গ্রামের লোকেরাও গোষ্ঠী তৈরী করিতে ছাড়ে নাই। এই সমস্ত গোষ্ঠীর উপর নজর রাখিতেন ঋষিরা। দরকার মত দু'চারটা কঠোর নীতিও তাঁহারা চালাইতেন। ঋগ্বেদের যুগে ঠিক এই রকমই একটা অনুষ্ঠান ছিল। তবে তাকে 'গোষ্ঠী' না বলিয়া 'সভা' বলা হইত। সভায় অনেক কাজের কথা হইত। গরু ও চাষের উন্নতি লইয়া আলোচনা হইত। পাশা খেলাও হইত। বাজী রাখিয়া খেলাও চলিত। সভায় খেলোয়াড়দের মধ্যে এই রকম খেলায় অনেকে ফতুরও হইত। তবে যারা পাশা খেলিত, তাহাদের উপর লোকে খুসী ছিল না। সভায় তর্কযুদ্ধ হইত, কবির

---

* আনন্দের বিষয় যুবকেরা এই আহ্বান অগ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে বহু লোককে রোগ ও বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন এবং জলপ্লাবনের পীড়িতদিগের সেবার জন্য নির্ভীক চিত্তে ও অক্লান্ত কলেবরে পরিশ্রম করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।

লড়াই হইত। মাঝে মাঝে কাব্যকলার আলোচনার জন্য অধিবেশনও হইত। রচনাকুশল, তর্কনিপুণ ব্যক্তিকে পুরস্কারও দেওয়া হইত। ইহাদেরই নাম হইত 'সভ্য'। এই সভাগুলি দেশেরও অনেক কাজ করিত। এখান থেকে সময় সময় বিচারালয়ের কাজও হইত। ধর্ম্ম নীতি ও সমাজরক্ষার কাজও হইত। রাস্তাঘাট তৈরী করা, এগুলি যাহাতে খারাপ না হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা, এই সভার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। নগরবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও অসুবিধা নিবারণের জন্য সভার চেষ্টা বড় কম ছিল না। নগরে বা গ্রামে খানা, ডোবা যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয় তাহার জন্য এই সকল সভায় আলোচনা হইত। নগরের জল নিকাশের পথ যাহাতে বন্ধ না হইয়া যায় তজ্জন্য সভা হইতে ব্যবস্থাও হইত। এই সভাই পরযুগে 'সমাজে' পরিণত হয়। নাম পৃথক হইলেও ইহার কাজও সভার অনুরূপ ছিল। সমাজও এই রকম দেশের উন্নতিবিধায়ক ছিল।

আজকাল আমাদের দেশের যুবকেরা 'ক্লাব' করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন, ইহাও পাশ্চাত্য আধুনিক প্রথা। এই সব ক্লাবে গিয়া যুবকেরা নানারকম আমোদপ্রমোদও করিয়া থাকেন। আমোদ আহ্লাদের সঙ্গে অনেক সময় দেশের ও দশের কাজের কথাও হয়। ভাল ভাল প্রসঙ্গ লইয়াও আলোচনা হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ ক্লাবই সহরে বা গ্রামে গঠন করিয়া যদি পাড়ায় পাড়ায় এক বা ততোধিক স্থাপন করা যায়, এবং তাহাতে অন্ততঃ সেই সেই পাড়ার অভাব, অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, তাহা হইলে এই ক্লাবের দ্বারাই সেই প্রাচীন ভারতের 'গোষ্ঠীর' কাজ অনায়াসে সুসম্পন্ন হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন। প্রতিবেশীর অভাব, অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা এখনও যে উদাসীন নই, তাহা নহে। বরং দূরের সঙ্গে আমরা নিকট সম্পর্ক করিতে চাই, কিন্তু নিকটের সম্পর্কিত যাহা কিছু, অবিমৃশ্যকারীর মত অনায়াসে তাহা উপেক্ষা করি। এই উপেক্ষার মূলে কখনও জড়তা, কখনও ঔদাসীন্য, কখনও হিংসা, কখনও অজ্ঞতা; কিন্তু এককথায় ইহা অজ্ঞতারই নামান্তর।

আমাদের ক্লাবে উন্নতিমূলক, চিত্তশোধক সকল মূল্যবান্ গ্রন্থের আলোচনা হইতে পারে। বিজ্ঞ, সজ্জন ও সুবক্তার নানাবিষয়ে বক্তৃতা হইতে পারে। কুটীর শিল্পের বা অর্থকরী যে কোনও শিল্প, কৃষির আলোচনা হইতে পারে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, চিকিৎসার আলোচনা হইতে পারে। জ্ঞানরাজ্যের যে কোনও বিভাগের প্রয়োজনীয় আলোচনায় ক্লাব যোগ দিতে পারেন। এই অনুষ্ঠানটী সামান্য হইলেও ইহার মূল্য এত বেশী যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা না হইতে পারে, এমন কাজ সেই পাড়ায় খুব কমই থাকিতে পারে। গ্রামে গ্রামে এখন অপাঠ্য ও কুপাঠ্য নাটক উপন্যাস ও গল্পের বই লইয়াও লাইব্রেরী হইতেছে। এই লাইব্রেরীগুলিকেও ক্লাবে পরিণত করিয়া, জনসেবা তাহার উদ্দেশ্য করিয়া, মূল্যবান্ অল্পসংখ্যক গ্রন্থ রাখিয়াও এই অনুষ্ঠান সফল করা যাইতে পারে। সহর বহুপল্লীর সমবায়। প্রতি পল্লীতে এক, দুই, তিন, প্রয়োজন বুঝিয়া যত ইচ্ছা, এইরূপ ক্লাব বাড়াইয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। সহরে এখন ক্লাবের অন্ত নাই। এই সমস্ত ক্লাবের জন্য অর্থব্যয়ও বেশ হয়। আমোদ আহ্লাদ না হইলে মানুষ বাঁচে না। কিন্তু আমোদ যত বিশুদ্ধ হয়, জীবনীশক্তি মানুষের

তত বাড়িয়া যায়। এই জন্য, এই জীবনীশক্তিবর্দ্ধক আমোদের সঙ্গে যাহাতে ক্লাবে ক্লাবে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আলোচনা হয়, আমাদের প্রতিবেশীরও আমাদের নানা অভাব অভিযোগের প্রতিকার হয়, দেশের ভবিষ্যবংশ, সমাজপতি ও সামাজিক যুবকবৃন্দের কাছে আমরা তাহাই দাবী করি।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার

ডাক্তার রোগীর উপর অস্ত্র চিকিৎসা করিবার পর যদি বলেন—The operation was successful but the patient died; (অস্ত্রচিকিৎসাটা বেশ শাস্ত্রসম্মত ভাবেই করা হইয়াছিল, তবু রোগী বেচারা মারা পড়িল); তাহা হইলে তাঁহার হাতযশ যে খুব বাড়ে না, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের দেশের উপর এতদিন যাঁহারা চিকিৎসা চালাইয়া আসিতেছিলেন তাঁহারা কতকটা ঐ রকম কথাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কথার সার মর্ম্ম এই—"আমরা যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম তাহা ঠিক; তবু রোগীর এখন ধাত ছাড়িয়া যাইবার ভয়। অতএব সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এখন কিঞ্চিৎ stimulant চাই'। আর সেই উত্তেজক ঔষধের নাম কাউন্সিল প্রবেশ।"

কাউন্সিল প্রবেশ করিয়া লাভ হইবে বা ক্ষতি হইবে আপাততঃ সে বিচার করিতেছি না; রোগীর এমন ধাত ছাড়িয়া যাইবার মত অবস্থা কেন হইল সেই কথাটাই ভাবিতেছি। সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স কমিটির প্রকাণ্ড রিপোর্টের মধ্যে সে কথাটার বিচার কোথাও দেখিলাম না। তাঁহাদের মতে স্কুল কলেজ প্রভৃতির বয়কট বেশ ভাল রকমই চলিয়াছে, যেখানে আধিভৌতিক (material) ফল লাভ হয় নাই, সেখানে আধ্যাত্মিক (moral) ফললাভ যথেষ্ট হইয়াছে। আদালতের উকিল ব্যারিষ্টারেও নাকি লজ্জায় একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। আর অন্যান্য বিষয়ের ত কথাই নাই। ১৯২২ সালের জুন মাসে নিখিলভারতীয় কংগ্রেস কমিটি বলিয়াছিলেন, যে বারদোলিতে যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা বেশ ভাল রকমই চলিতেছে। তাহার পর ডিসোবিডিয়েন্স কমিটির রিপোর্টে দেখা গেল যে না, তাহা হয় নাই। বারদোলির অনুশাসনের পর হইতেই কর্ম্মীদের মধ্যে উৎসাহভঙ্গের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তাহারা হতাশ হইয়া কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন, তাহাদের উপর একটা stimulant না লাগাইতে পারিলে কাজকর্ম্ম অচল হইয়া পড়িবে। শুনিতে পাওয়া যায় যে বারদোলি অনুশাসনের উপর শ্রদ্ধার অভাবই নাকি এইরূপ শিথিলতার কারণ। রিপোর্টের কর্ত্তারা সেজন্য কর্ম্মীদেরই দোষ দিয়াছেন; বারদোলির অনুশাসনের কোনও দোষ দেখিতে পান নাই। সেই জন্যই মনে হইতেছিল—The operation was successful but the patient died.

আমার মনে হয় আমাদের স্বরাজের আদর্শের মধ্যে ও স্বরাজ পাইবার কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে যে গোঁজামিল রহিয়া গিয়াছে, উৎসাহভঙ্গের তাহাই কারণ। আর বারদোলির সেটুকু ধরা

পড়িয়াছিল। একটা উদাহরণ দিয়া আমার মোট কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। দেশের জনসাধারণ যে স্বরাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল তাহা মহাত্মা-প্রচারিত আধ্যাত্মিক স্বরাজ নহে; তাহা ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়। সাধারণ লোকে ভাবিয়াছিল যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা জমিদার বা পুলিসের অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচিবে, আর খাজনাট্যাক্সের দায় হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইবে। সেই জন্যই তাহারা স্বরাজের নামে মাতিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বারদোলির পর কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ হুকুম জারি করিলেন :—

"Complaints having been brought to the notice of the Working Committee that the ryots not paying rents to the Zeminders, the Working Committee advises Congress Workers and organisations to inform the ryots that such withholding of rents is contrary to the resolutions of the Congress and that it is injurious to the best interests of the country.

The Working Committee assures the Zeminders that the Congress movement is in no way intended to attack their legal rights and that even where the ryots have grievances the Committee's desire is that redress should be sought by mutual consultation and by the usual recourse to arbitration.

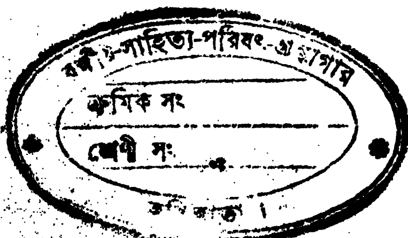
প্রজাদের উপর হুকুম হইল যে, তোমরা খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করিও না। জমিদারদের বলা হইল যে তাহাদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিবার অসদুদ্দেশ্য কংগ্রেসের মোটেই নাই। আগে বাকি খাজনা প্রজারা মিটাইয়া দিক, তাহার পর প্রজাদের যদি কোন অভাব অভিযোগ থাকে ত সালিসী আদালতে তাহার বিচার হইবে। কিন্তু জমিদারেরা যদি সালিসী মানিতে রাজী না হন তাহাহইলে যে কি হইবে সে সম্বন্ধে কংগ্রেস একেবারে চুপ!

হুকুমের সুরটি একেবারে ইংরেজ সরকারের মত। আগে আমাদের কথা মানিয়া লও; ন্যায় অন্যায়ের বিচার পরে হইবে।

ফল যাহা হইল ডিসোবিডিয়েন্স কমিটির রিপোর্টে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রজাদের আর কর্ত্তাদের উপর বিশ্বাস রহিল না; কর্ম্মীরাও হাল ছাড়িয়া দিল। প্রজারা ত কর্ত্তাদের সখের আধ্যাত্মিক স্বরাজের জন্য আসে নাই, তাহারা আসিয়াছিল পেটের জ্বালায়! কর্ত্তারা সে কথা বুঝিলেন না, আজও বুঝেন নাই।

আজ কথা উঠিয়াছে কর্ত্তারা নাকি কাউন্সিলে গিয়া প্রজাদের নষ্ট উৎসাহ উদ্ধার করিয়া দিবেন। হায় দুর্দ্দৈব!

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।



সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা

আমরা গেয়ে থাকি ;—

আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী॥

একথা সত্য। আমরা কোন দেশবিশেষের বা কালবিশেষের প্রভাবে জন্মেছি এবং সেই দেশের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে। কিন্তু যদি আমাদের প্রাণে বিশ্বজগতের অন্য কোথাকার আকাশ বা বাতাস স্পন্দন উৎপাদন না করে, যদি আমরা অন্য দেশের বায়ুতে আড়ষ্ট মৃতপ্রায় হয়ে থাকি, তবে আমরা হয়ত বাঙ্গালী হব, কিন্তু মানুষ হব না। আমাদের জাতীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে, জাতীয়তার বড়াই করে, আমরা যদি বিশ্বজগতের যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, বিশ্বমানবের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন তাহা হতে নিজকে বঞ্চিত করি, তবে আমরা শুধু যে নিজেদের ছোট করব, মনকে পঙ্গু করব তানয়, এরূপ লিলিপুটদের সাধের ধন "জাতীয় ভাব" বা "স্বদেশীত্ব" বেশীদিন বাঁচবে না।

কেন? কারণ, আমরা শুধু বাঙ্গালী নই, আমরা মানুষও। আমাদের বাঙ্গালীত্ব একটা বিশেষ গুণ মাত্র, আমাদের প্রধান গুণ হচ্ছে মনুষ্যত্ব ;—যুগে যুগে দেশে দেশে যে মানুষ হয়েছে, কাজ করেছে, স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে, আমরা তাহাদের ভাই ; আমরা বিশ্বের সর্ব্ববিধ সত্যের, সর্ব্ববিধ ধনের সমান অধিকারী। যদি আমরা আমাদের নিজ দেশ বা কালকেই সব চেয়ে বড় করে দেখি, যদি অন্য দেশ বা অন্য যুগের মানবের সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করি, তবে আমাদের বাঙ্গালীত্ব পূর্ণত্ব লাভ করবে না। আমাদের প্রাণ ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ গাছের মত শুকিয়ে যাবে, মরে যাবে, তার ফুল হবে না, ফল ধরবে না। আবদ্ধ বাতাস, সঙ্কীর্ণতা, প্রাণের মধ্যেও ক্ষয়কাশ আনে। জগত জুড়িয়া মানবের নব নব জ্ঞানের, নব নব ভাবের, নব নব উদ্যমের অতি প্রশস্ত, অতি বিচিত্র প্রবাহের জাহ্নবী বহিতেছে। আমরা যদি তাহা হতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে, নিজ দেশে একটি ডোবা খুঁড়ে তাহাতেই বাস করি, তাহার জল হতে খাদ্য সংগ্রহ করি, তাহার মধ্যেই ডানা আস্ফালন করি, এবং পরস্পরকে লেজের চাঁটি মারি, তবে আমরা পোনা মাছ হব, মানুষ হতে পারব না।

শরীরের মত, মনেরও শ্রেষ্ঠ খাদ্য সংগ্রহ করতে হলে বিশ্ব সংসারে খোলা বাতাসে খোলা আকাশতলে বাহির হতে হবে।

কারণ আমাদের বাঙ্গালীত্ব অপেক্ষা আমাদের মনুষ্যত্ব অনেক বেশী বিস্তৃত এবং বেশী মূল্যবান। যদি আমরা বিশ্বমানবের সঙ্গে আমাদের বেশভূষা রীতি নীতির বাহ্য পার্থক্য সত্বেও, তাহার চেয়ে অধিকতর গভীর অন্তরের একতা অনুভব করতে না পারি, যদি মানবের সনাতন ভাবে, ভাবনায় এবং বলে চলতে না পারি, তবে বুঝতে হবে যে আমাদের মানব হতে এখনও দেরী আছে, আমরা প্রাণীজগতের অন্য এক শ্রেণীর জীব ; অভিব্যক্তির সোপানে এখনও পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারি নাই। এটা গর্ব্ব করবার কথা নয় ; এই অবস্থায়

সন্তুষ্ট থাক্‌লে, এই নিয়ে বড়াই করলে আমাদেরই ক্ষতি হবে, বিশ্বজগতের, মানবজাতির ক্ষতি হবে না।

যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, যাহা শিব, তাহা দেশ বা কালের সীমায় আবদ্ধ নয়। কোন দেশ বা কাল তাহার দেহটা, তাহার ভাষাটা, তাহার বাহ্য আবরণটা মাত্র দেয়, কিন্তু তাহার প্রাণটি দেশকালের অতীত। যাহা মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাহার চিহ্ন হচ্ছে যে, তাহা সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব যুগে মানবের প্রাণে প্রবেশ করবে, সকলেই তাহাকে আদর করবে, স্বীকার করবে; জিজ্ঞাসা করবে না মহাশয়, আপনি কোন্ আশ্রম, কোন্ বর্ণ? আর যে সৃষ্টি এই পরীক্ষায় আটকা পড়ে যায়, তাহাকে মানবমনের দ্বিতীয় শ্রেণীর বা নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলতেই হবে। তাহার চল্‌তি বড় কম দূরে, তাহার জীবন সংক্ষিপ্ত।

বিজ্ঞানের সত্য দেশ কালের অপেক্ষা করে না, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি সকলের স্বীকার্য্য, রসায়নের নির্দ্ধারিত সত্যগুলি যে দেশে, যে বৎসরে ইচ্ছা পরীক্ষাগারে স্বহস্তে প্রমাণ করা যায় একথা আপনারা সকলেই জানেন। কুইনাইন, বা তাহাকে রং করে সংস্কৃত নামের টিকিট লাগিয়ে ছদ্মবেশী সংস্করণটি, সব দেশে সব যুগেই সর্ব্বজ্বরহরসের কাজ করে। বসন্ত রোগের সিদ্ধ চিকিৎসা প্রণালী কোন্ দেশে বা কোন্ যুগে আবিষ্কৃত হয় আমরা ভুলে গিয়েছি, কিন্তু তাহার ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করছি। এগুলি বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি।

কিন্তু অনেকে বলেন, অন্ততঃ ভাবেন, যে এ কথা জড় বিজ্ঞানে খাটে, সাহিত্য ও কলার পক্ষে সত্য নহে। আজ আমি দেখছি যে এই বিশ্বাস ভুল। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের চিহ্ন হচ্ছে যে তাহার মূল্য ভাষার উপর, সমকালীন আচার ব্যবহারের উপর, কবির দেশের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে না। অনুবাদে তাহার ক্ষীরটুকু ক্ষয় করতে পারে না, জলটুকু মাত্র উড়িয়ে দেয়। এই জন্য সেক্সপিয়র জগতের কালিদাস হয়েছেন, ইংলণ্ডের নিজস্ব সম্পত্তি মাত্র নহেন। এই জন্য আমাদের পিতামহেরা—কালো চামড়া, ধুতিপরা, ভাতখেকো, পরাধীন, খোলারঘরবাসি, কালাপানি পার হবার ভয়ে ভীত, রাজনারায়ণ বসুর যুগের বাঙ্গালীরা —সেক্সপিয়র পড়িয়া পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আর, তাঁহারা এবং ঠিক তাঁহাদের পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গালী ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রসে মন স্নিগ্ধ, সরস, সবল করেছিলেন বলেই তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় অমর সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে; বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীরামপুরের মিশনারী কেরী প্রমুখ সুধীগণের দ্বারা। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড ওয়েলেস্‌লী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সংস্থাপন করেন তখন কেরী হলেন সেই কলেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক এবং তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রামরাম বসু, রাজীবলোচন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি মনীষিগণ নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা করে বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। যে বিদ্যাসাগরকে বর্ত্তমানযুগের প্রাঞ্জল সুরুচি-সঙ্গত 'মধুমাখা' গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না তিনিও ছিলেন এই ফোর্টউইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক এবং সেই আবেষ্টনের মধ্যেই তিনি গদ্যসাহিত্যের 'শিক্ষানবিশি' করেছিলেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের এই যে আমাদের সাহিত্যিক মহারথীগণ, আমাদের বিদ্যাসাগর,

বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীন এবং রবীন্দ্রনাথ (মাইকেলের কথা ত বলতে হবে না) ইহারা ইউরোপের সাহিত্যের রসে মাতোয়ারা হয়েছিলেন বলেই তাঁহাদের বৃত্তিগুলি এত সজাগ, নিজস্ব প্রতিভা এত প্রখর ও সতেজ হয়েছিল। সাহিত্যকাননের বনস্পতিদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, হাঁ আমাকেও বড় হতে হবে, এই সব বিদেশী আদর্শে আমার মন যে মাতুল, আমার রচনায়ও যেন সেই মত সার্ব্বজনীন, সর্ব্বকালীন সৌন্দর্য্যমহিমা থাকে, তবেই আমার চেষ্টা সফল হবে। ইহার কমে আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হব না।

"বিরচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি...............

মনে করবেন না আমি বল্‌ছি যে, তাঁহারা অনুকরণ ক'রিয়া ইংরাজী কবির কবিত্ব চুরি করে বড় বাঙ্গালী কবি হয়েছেন। তাঁদের মৌলিক প্রতিভা ছিল, সমকক্ষের সঙ্গে নীরব গোপনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেই প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে—স্বদেশীর গণ্ডীর মধ্যে চোখ বেঁধে ঘুরতে ঘুরতে হয় নাই। অনেকেই ভয় পান যে অন্য জাতির নিকট কিছু গ্রহণ করলেই স্বজাতির অবমাননা হবে। ইটালীয় সাহিত্যরথীগণের রচনায় মুগ্ধ চসার এবং স্পেন্‌সার ইংরাজি সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছিলেন। তাঁহাদের অপূর্ব্ব সাহিত্যে পেত্রার্ক (Petrarch) দান্তে (Dante) বোকাশিও (Boccaceio) প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যিকগণের ছায়া দেখা যায়। আর অমর কবি শেক্সপিয়র অনুবাদের অনুবাদ পড়ে ইংরাজি সাহিত্যকে মহামূল্য রত্নরাজি উপহার দিয়েছিলেন। শেক্সপিয়র সম্বন্ধে কথিত আছে—"He knew little Latin and less Greek নর্থ প্লুটার্কের অনুবাদ করেছিলেন (North's Translation of Plutarch's Lives আর শেক্সপিয়র তাহা হতেই তাঁহার জুলিয়াস সিজার, (Julius Ceaser) করিওলেনাস, (Coriolanus) এণ্টনি-ক্লিওপেট্রা (Anthony-Clopetra) প্রভৃতি নাটকের আখ্যায়িকা সংগ্রহ করেছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মলেয়ার (Moliere) প্রধানতঃ ইটালীয় ভাষায় লিখিত রহস্য অবলম্বনে মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। কেহ কেহ এমনও বলেন যে বিলাণ্ড্ (Weiland) জর্ম্মান ভাষায় শেক্সপিয়রের নাটকাবলীর যে সকল অনুবাদ করেছিলেন তাহাতেই জর্ম্মন সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। এ কথা সর্ব্বজনবিদিত যে গেটে (Goethe) জন্মিবার অন্যূন দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ কবি মার্লো ফৌষ্ট (Faust) রচনা করেছিলেন। কিন্তু একথা কেহ বলেন না যে, চসার শেক্সপিয়র মলেয়ার ও গেটে মৌলিকতাবিবর্জ্জিত। আমাদের মধুসূদনদত্ত দান্তে ও মিলটন আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন বলেই মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করতে পেরেছিলেন। সেই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের সন্তান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তখনকার সাহিত্যিকগণ রিচার্ডসন্ ও ফিল্ডিং থেকে আরম্ভ করে স্কট, ডিকেন্স ও থ্যাকারে পর্য্যন্ত সমস্ত ইংরাজি সাহিত্যের রস নিঃশেষে গলাধঃকরণ করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে কেহ একথা বলতে পারেন না যে 'আলালের ঘরের দুলাল,' 'বিষবৃক্ষ', 'স্বর্ণলতা' প্রভৃতি অসামান্য প্রতিভা প্রসূত গ্রন্থ সকল ইংরাজি সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ মাত্র।

আর আমাদের আধুনিক, এই বর্ত্তমান যুগের দেশী সাহিত্য যে এত নীরস, এমন প্রাণহীন, এত খেলো, তাহার প্রধান কারণ এই যে আমরা আমাদের জীবনকে স্বদেশীর ডোবায় ডুবিয়ে বিশ্ব মানবের শ্রেষ্ঠধন হতে নিজকে বঞ্চিত কর্‌ছি—সেক্‌পিয়র পড়ে প্রাণকে মাতিয়ে তোলা দূরে থাকুক, গোলদিঘীর স্বরস্বতীজেল হইতে খালাস পাইবার পর আর তাহা পড়্‌তেও ঘৃণা বোধ করি। ভাবি ইহাতে আমাদের স্বদেশীত্বের হানি হবে, বিদেশী মালের ব্যবহার করা হবে। এই অহঙ্কারের ফলে আমাদের মন যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ কর্‌তে পারেনা, আমাদের প্রতিভা জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আদর্শের সংস্রবে আসতে না পারায় মার্জ্জিত, সবল ও বিচিত্র হতে পারে না। পণ্ডগ্রামে পুষ্ট জমিদারসন্তানের মত তাহার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে না। সে নিজের মধ্যে নিজেকে খর্ব্ব করে রাখে, বনগাঁয়ে খাট্টাস হয়ে চোখের সাম্‌নে একটা দেয়াল তুলে ক্রমে হ্রস্বদৃষ্টি হইয়া পড়ে।

বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ত কথাই নাই। বাঙ্গালাভাষা যে এমন অসম্পূর্ণ, সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ হয়ে আছে তাহার অন্যতর কারণ আমাদের বিজ্ঞানচর্চ্চার অভাব। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাহিত্য যে এত প্রসার লাভ করেছে তার একটি কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক তথ্যসকল তাহাকে পুষ্ট করেছে। কেবল বিজ্ঞান নয়, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র-বিদ্যা এবং গন্ধর্ব্ব-বিদ্যা প্রভৃতি কলার চর্চ্চা যতদিন না এদেশে পুনর্জ্জীবিত হয়ে উঠ্‌বে ততদিন বাঙ্গালা সাহিত্য সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হতে পারবে না।

লোহা ও পাথরের সংঘর্ষে অগ্নির উৎপাদন হয়। এক জ্বলন্ত দীপ হইতে অপর দীপ জ্বালান যায়, যদি দ্বিতীয়টীর প্রকৃত তেল সল্‌তে থাকে। বিদেশী সাহিত্যের কলার উজ্জ্বল জীবন্তরশ্মি হতে যদি আমরা দূরে থাকি তবে আমাদের অন্তরের দীপ সাজান থাকবে, জ্বলবে না।

বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে—একঘরেদের সমাজে নহে। গ্রীসের মহান সভ্যতার উদয় ক্রীট দ্বীপে যেখানে মিশর, সিরিয়া, ইজিয়ান জাতি একত্র মিলিত। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভায় ভারতীয় ও রোমীয় সভ্যতা মিলিয়া কালীদাসীযুগের স্বদেশী সাহিত্যে সৃষ্টি করে। খালিফ হারুণ ও মামুনের সভায় গ্রীক, হিন্দু, আরব ও পারসীক প্রতিভা ও সাহিত্যের সামঞ্জস্য হয়। আর আকবরের সভায় হিন্দু ও সারাসেন, খৃষ্টান ও পারসীক সাহিত্য, জ্ঞান কলার একত্র সমাবেশ হওয়ায় অপূর্ব্ব সাহিত্য, চিত্র ও হর্ম্ম্য সৃষ্টি হয়। সেই মত বৌদ্ধ যুগে জগৎ ও ভারতের সভ্যতার ও জাতীয় ভাবের সংঘর্ষে এক অপূর্ব্ব দ্রব্য সৃষ্টি হয়, যাহা আমরা অশোকের ও কনিষ্কের ইতিহাসে দেখিতে পাই—ইহাই ভারতের বহির্জ্জগতকে শ্রেষ্ঠ দান।*

কলিকাতা, ২২শে কার্ত্তিক ১৩২৯।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

---

* লেখক এই প্রবন্ধের জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের নিকট বিশেষ ঋণী।

চীনে কথা

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, "মরদ্‌কা বাৎ ঔর হাতীকা দাঁৎ"। হাতীর দাঁতই মহামূল্য সম্পত্তি। দাঁত গেলে মালিকের নিকট হাতীর দাম থাকে না—শিকারের জন্যও নয়, বিক্রয়ের জন্যও নয়। মানুষের তেমনি কথা। কথা দিয়েছ, কি কথা রাখ্‌তে হবে। কথা যে মানুষ রাখেনা তার মূল্য নাই। সত্যপালন এখন আমাদের দেশে সাধারণ লোকের প্রকৃতিগত নয় বলিয়া বিদেশীরা বলিয়া থাকে। পুরাকালে পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম রাজসিংহাসন পায়ে ঠেলিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করিতে গিয়াছিলেন। সে আদর্শ এখন সাধারণ ভারতবাসীর দৈনিকজীবনে বিদেশীরা দেখিতে পায় না। জাহাজে একজন চিত্র-শিল্পীর সহিত পরিচয় হইল। তিনি কয়েকমাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বাস করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ ডেন্‌মার্ক। তিনি বলিলেন ভারতবাসীর অনেকগুণ আছে, কিন্তু কয়েক-মাস ভারতবর্ষে বাস করিয়া তাঁহারও ধারণা হইয়াছে যে ভারতবাসী সত্যপালনে তৎপর নহে। আমার সহিত আলাপে তিনি স্বীকার করিলেন যে ভারতবাসী ভদ্রলোকদের সঙ্গে সময় সময় পরিচয় হইয়া থাকিলেও, তেমন ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল বলিতে পারেন না। পরিচিত ভদ্রলোকেরা সত্য কথা বলিতেন, মিথ্যা বলিবার তাঁহাদের প্রয়োজন হইত না। অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যপ্রিয় হইলেই ত দেশের সাধারণ লোকে সত্যপ্রিয় হয় না। তিনি বলিলেন, "আমার এক য়ুরোপীয় বন্ধু, মুসলমান, একটী খ্যাতনামা দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক। তিনি ভারতবাসীকে প্রীতি করেন। তাঁহারও ভারতবাসী সম্বন্ধে এই ধারণা। যাহাদের সহিত নিত্য কারবার করিতে হয়, তাহাদের কথায় তাহাদের সততায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। চাকর বাকর অকারণ মিথ্যা কথা বলে।" আমি বলিলাম, "তোমার কথায় কিছু সত্য নাই, তা বলিতে পারি না। চাকর বাকর যে মিথ্যাকথা বলে তার জন্য মুনিবের দোষ বেশী। তোমার চাকর যখন তার মা, বোন, ভাই বা বন্ধুর সহিত কথা বলে, বা কাজ করে, তখন সে কি তাহাদের কাছেও মিথ্যা বলে? তবে তোমার কাছে বা তোমার য়ুরোপীয় মুসলমান বন্ধুর কাছে মিথ্যা ওজুহাত দেয় কেন? চাকরকে বেতন দিবে মাসে ২০৲; আর তাহার হাত হইতে চায়ের পেয়ালা পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিলে জরিমানা ১৲। সে বেচারী বাধ্য হইয়া একটী টাকা বাঁচাইবার জন্য বলিবে যে বিড়াল লাফ দিয়া মেজের উপর উঠিবার সময় পেয়ালা ফেলিয়া ভাঙ্গিয়াছে। তাহাতেও টাকাটী বাঁচাইতে না পারিলে, পরের দুই সপ্তাহের বাজারের টাকা হইতে যেমন করিয়াই হউক একটী টাকা বেমালুম সরাইবে। তোমার মেয়ের হাত হইতে চায়ের পেয়ালা পড়িয়া ভাঙ্গিলে তাহার নিকট এক টাকা আদায় করিবার কথা ত তোমার মনে আসে না। মেয়ের বেলা প্রেমের শাসন, চাকরের বেলা ভয়ের শাসন। সুতরাং মেয়ে সত্য কথা বলে, চাকর মিথ্যা কথা বলে। আমি বলিতে চাই না যে তুমি বা তোমার মুসলমান বন্ধু চাকরকে ভয়দ্বারা শাসন করিতে। কিন্তু তোমার চাকর অপর য়ুরোপীয় প্রভুর নিকট ভয়ের শাসন-পাইয়া অভ্যস্ত হইয়াছে।" আমি কথায় কথায় তাঁহাকে বলিলাম যে আমি বিদেশে বেড়াইতে যাইতেছি।

অন্যূন পাঁচ হাজার টাকার বই আসবাব, আমার চাকরের হাতে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তাহার বাড়ী কোথায় তাহাও ঠিক জানি না। আমার কাছে সে ছয় বৎসর আছে। আমাতে ও তাহাতে ভয়ের সম্বন্ধ নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে চুরি করিবে না। ১৯১৩ সালে যখন আমি য়ুরোপ বেড়াইতে গিয়াছিলাম তখন আমার সব জিনিষ যে চাকরের হাতে রাখিয়া গিয়াছিলাম সে ত তখন সবে ছয় মাস আমার নিকট চাকুরী করিয়াছিল। আমি ফিরিয়া গিয়া আমার সব জিনিষ পাইয়াছিলাম। একথাও বলিলাম যে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিবার সময় দেখিয়াছি, পদস্থ সাহেব বণিক্ টাকার খাতিরে অম্লান বদনে মিথ্যা চিঠি লিখিয়াছে। ইংরাজ বণিক্ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বা অসৎ আচরণ করিলে মহামান্য হাইকোর্টের স্বদেশী ও বিদেশী বিচারপতিগণ অনেকেই বলেন সেটা সেই বণিকের স্মৃতিভ্রম কিম্বা বুঝিবার ভুল। আমার পরিচিত বিচারকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত র‍্যাঙ্কিন্ ও শ্রীযুক্ত পীয়ার্সনকে দেখিয়াছি, প্রয়োজন হইলে পদস্থ সাহেবকে মিথ্যাবাদী বলিতে তাঁহারা দ্বিধা করেন নাই। শুধু ভারতপ্রবাসী বৃটিশ বণিক্ কেন, খাস লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদার কারবারের লোকসানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় নির্লজ্জভাবে বুকটান করিয়া মিথ্যা চিঠি লিখিতেছে। তাংএর বর্ণিত ভদ্রলোকের দেশ "ভারতবর্ষ ও নয়, ইংলণ্ডও নয়। তাংএর মতে চীন ত "ভদ্রলোকের দেশ" নিশ্চয়ই নয়।

পেনাং বা সিঙ্গাপুর চীনদেশে নয়। হংকং দক্ষিণ চীনের উপকূলে সমুদ্রবেষ্টিত পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে ও পাহাড়ের পাদদেশে হংকং সহর। ইংরাজের তৈয়ারী আধুনিক সভ্য সহর। বিজলিবাতি, প্রশস্ত রাজপথ, তড়িৎশক্তি চালিত ট্রামগাড়ী, প্রকাণ্ড অট্টালিকা, সাহেবী হোটেল, সাহেবী দোকান বন্দরে জাহাজের মেলা। এপারে হংকং, ওপারে কাওলুন। সারাদিন খেয়ার জাহাজ চলিতেছে। জাহাজে বিজ্ঞাপন, টাইফুন্‌ঝড়ের সংবাদ আসিলে যে কোন মুহূর্ত্তে জাহাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। কাওলুন চীন মাদেশেরই অংশ। সেখানেও কোনও যায়গা বা জাপানের কাছে ইজারা দেওয়া কোনও যায়গা বা ইংলণ্ডের কাছে ইজারা দেওয়া, কোনও যায়গা বা যুক্তরাজ্যের কাছে ইজারা দেওয়া। সাংহাইও ঐরূপ। হংকং সহর ত ইংরাজের শাসনাধীন। হংকং সহরে পুলিশ পাহারা সবই ভারতবাসী। তাহারা হয় পাঞ্জাবের, নয় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোক, যেমন লম্বা, তেমন চওড়া, এক এক পালোয়ান। শাংহাই বন্দরের যে যায়গাটুকু ইংরেজের হাতে সেখানে ঐ ভারতবাসী পুলিস পাহারা। সাংহাইয়ের অন্যান্য অংশে ফরাসী, জাপানী প্রভৃতি বিদেশী পুলিস পাহারা আছে। ভারতবাসী পুলিস দেখিয়া আমার মনে হইল, কার দেশ, কে পাহারা দেয়। তাও যদি ইংরেজ পুলিস রাস্তায় পাহারা দিত! পাহারা দিতেছে ভারতবাসী। দেবতাদের পরিহাস আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

বিগত ৩০শে ও ৩১শে মার্চ্চ আমি মায়াপুরী কান্টনে। কাওলুন হইতে রেলগাড়ীতে আন্দাজ চারি ঘণ্টার পথ। এক চীনে যুবক কান্টন রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে "অরিয়েণ্টাল হোটেলের" মোটর বোটে আমাকে নিয়া উঠাইল। সুন্দর পরিষ্কার মোটর বোট্। তার

পরে নদীতে অন্ধকারে শুধু নৌকার আলো ও নৌকার ছায়া। মনে হইল তীরের একদিক যেন অন্ধকার। কাণ্টন সহরের দিকের তীরে দূরে চিক্ মিক্ আলো জ্বলিতেছে। আরও কিছু দূরে আসিয়া দেখি বিজলিবাতির আলোতে কোথায়ও বা পাঁচতালা ছয়তালা অট্টালিকা সব ঝক্ ঝক্ করিতেছে। বেশীর ভাগ যেন মিটি মিটি আলো নীচে পড়িয়া আছে। এক এক জায়গায় আলোর ঝলক্ যেন আকাশে উঠিতেছে। মোটর বোট্ থামিল। আমার চীনে বন্ধুর—চীনে ইংরাজীতে "ফ্রেন্দ্"—পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৌকার পর নৌকা পার হইতে লাগিলাম। ছোট সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া এক নৌকা পার হইয়াছি কি আবার আর এক সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আর এক নৌকায় হাজির। তার পরে নৌকা পার হওয়া শেষ হইল। জেটিতে উপস্থিত। তার পরে রাস্তা পার হইয়াই নদীর ধারে "অরিয়েণ্ট্যাল হোটেল"। চীনের সাহেবী হোটেল, চীনে চাকর, চীনে অতিথি। য়ুরোপীয় অতিথিও আছে। ছাদের উপর য়ুরোপীয় ধরণের বাগান। রাত্রিতে য়ুরোপীয় ভোজ খাইয়া, বিংশ শতাব্দীর স্প্রীংয়ের খাটে, পালকের লেপের নীচে যখন শুইতে গেলাম তখন ভুলিয়া গেলাম যে আমি মায়াপুরী কাণ্টনে। চীনে চাকরেরা যদি চেঁচাইয়া কথা না বলিত, তাহা হইলে মনে হইত আমি য়ুরোপে। একটা কথা ভুলিতে পারিতেছিলাম না। সিঙ্গাপুরে ও সে বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম। "Sincere Company, Limited" এর আপিস আমার হোটেলের পাশেই। এটা নিতান্তই চীনে নাম। কোম্পানী সৎ, সরল, অকপট; কিন্তু তার সততার ও সরলতার সীমা আছে।

কাণ্টনের নদীর ধারের সহর রাত্রিতে ও দিনে দেখিলে সে দৃশ্য মনে চিরমুদ্রিত থাকে। রবিবাবু কলিকাতার বর্ণনায় বলিয়াছিলেন—"ইটের পরে ইট্, মাঝে মানুষ কীট।" তারও বেশী মানুষ কাণ্টনে পোকার মত কিল্‌বিল্ করে। নদীতে জাহাজ, মোটর বোট্, অসংখ্য নৌকা। পাশে রাস্তায় অসংখ্য রিক্‌শা, অসংখ্য মানুষ। সব এলোমেলো। নৌকা হইতে তীরে আসিতে হয়ত দশ বারটী নৌকার উপর দিয়া আসিতে হইবে। শেষ নৌকা হইতে তীরে পৌছিতে হয়ত সিঁড়ী বাহিয়া দশহাত উপরে উঠিতে হইবে। নদীতে জাহাজের ভোঁ, জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ, ইঞ্জিনের ধস্‌ধস্ আওয়াজ। পাশে রাস্তায় ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা, বাঁশী, হার্ম্মোণিকা, কন্‌সার্টিনা, গ্রামোফোন, আর অসংখ্য চলন্ত রিক্‌শার টুং টুং ঘণ্টা। এখানে সিনেমার কোলাহলপূর্ণ বিজ্ঞাপন, ওখানে নাগরদোলার সঙ্গীতপূর্ণ আমোদ, কিছু দূরে পুরোহিতদের গম্ভীর বিচিত্র শোভাযাত্রা, আর সর্ব্বত্র নৌকাবাসী চীনে বালক-বালিকার আনন্দপূর্ণ কলরব। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, সঙ্কীর্ণ গলি, দোকানের ও ব্যাঙ্কের ভিড়, আমোদ, উল্লাস, দারিদ্র্য, রোগ, সৌন্দর্য্যের ও আনন্দের ছবি, পাশেই মানবের দুঃখের বীভৎস দৃশ্য, আর প্রতি গলির মোড়ে অনাঘ্রাতপূর্ব্ব দুর্গন্ধের ঝলক্। ডাকঘরে যাও, দেখিবে বিজ্ঞাপন—"সাবধান, গাঁটকাটা আছে কিন্তু।" রাস্তায় যাও, দেখিবে চীনে পুলিসের পিঠে দোনালা গুলিপোরা বন্দুক ঝোলান। নৌকায় ছেলেরা হয়ত পুলিসকে ব্যঙ্গ করিয়া পিঠে এক বাঁশ ঝুলাইয়া তীরে আসিয়া গম্ভীরভাবে পাহারা দিতেছে; আর বেই পুলিশ কাছে আসিয়া পড়িতেছে, অমনি দৌড়। কোথায়ও বা ৮।১০ বৎসরের ছেলে মেয়েরা রাস্তায়

বসিয়া জুয়া খেলিতেছে। যে হারিতেছে সে যে জিতিল তাহাকে ২০১২৫টা ছোট ছোট কাঠির মত কি আনি দিতেছে। আবার খেলিতেছে। আর যেই পুলিস কাছে আসিতেছে, দৌড়িয়া পালাইতেছে। আমার মাথায় টুপি দেখিয়া আমার ভয়েও একদল ছুটিয়া পালাইল। আমি যখন হাসিয়া আশ্বাস দিলাম, তখন আবার খেলিতে বসিল। আমি কাণ্টনে যাইবার দুইদিন পূর্ব্বে কাণ্টন রেলওয়ে ষ্টেশনে একজন লোক সেনাপতি ভাং হেংকে দুইগুলি মারিয়া বধ করিয়া প্রস্থান করে। রাত্রিতে কাণ্টন মায়াপুরী, দিনে কাণ্টন মানব সভ্যতার এক বিচিত্র লীলাভূমি।

কাণ্টনের সরুগলি এখন প্রশস্ত রাজপথ হইতে চলিয়াছে। কাণ্টনে মোটরবাস্ (motor omnibus) চলিতেছে। কাণ্টনে কলকারখানা খোলা হইয়াছে ও আরও অনেক খুলিবে। উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীনের বিবাদ মিটিলে আর ১৫ বৎসরে কাণ্টন আধুনিক য়ুরোপীয় নগর হইয়া দাঁড়াইবে। কাণ্টন সুন্-য়াৎ-সেনের রাজধানী।

কাণ্টনে বসিয়া তথাকার এক সংবাদপত্রে পড়িলাম, জি, টি, আর্মষ্ট্রং নামক এক মার্কিন সাহেব, যুক্তরাজ্যের প্রজা, শাংহাই বন্দরে এক চীনে রিক্‌শা কুলিকে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া তাহার বিচার হয়। যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি বিচারক বিচার করিয়া ঐ সাহেবের ৪০ ডলার জরিমানা ও দুইদিনের কারাবাসের আদেশ দেন। এই শাস্তি কমাইবার জন্ত সাহেব উকিল দরখাস্ত করেন। বিচারপতি কমিশনার শূল্ (schuhl) শাস্তি লাঘবের জন্ত উপরওয়ালার নিকট অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ যে কারাবাসের আদেশ প্রত্যাহার করা হউক, তবে জরিমানা মাফ্ হইবে না, আর জরিমানার ১৫ ডলার সেই প্রহৃত কুলিকে যা দেওয়া হইয়াছে তাহাও বজায় থাকিবে। অধিকন্তু বীরপুরুষ আর্মষ্ট্রং ছয় মাসের জন্ত শান্তি রক্ষা করিতে মুচলকা দিবে; এই শাস্তি লাঘবের জন্য দরখাস্ত করিবার সময় সাহেব উকিল বক্তৃতায় বলেন—"এই ধরণের অপরাধ শাংহাইয়ের রাস্তায় প্রায় প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যায়। বিচারপতির অবস্থান এষ্টর হাউসে (Astor House)। দুইদিন পূর্ব্বে এষ্টর হাউসের ফটকের কাছে দেখিয়াছি রাস্তায় শিখ্ পুলিশ পাহারাওয়ালা এক রিক্‌শা কুলিকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিল। কুলির অপরাধ, সে এষ্টর হাউসের ফটকে ঢুকিয়াছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ন্যাঙ্কিং রোডে ট্রামগাড়ীর জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম। এক ভিখারী আমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে এক শিখ্ পুলিস পাহারাওয়ালা আসিয়া সেই ভিখারীকে ঘুসো লাথি ও ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে কয়েক গজ পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া নিয়া গেল। বিচারপতি এষ্টর হাউসের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে দিনের মধ্যে কয়েকবার প্রত্যহ এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাইবেন। এ অপরাধের জন্ত কারাবাসের ব্যবস্থা হইলে শাংহাইয়ের রাস্তায় পুলিস খুব কমই পাওয়া যাইবে, কারাগার অনেক বড় করা দরকার হইবে।" সাধে বলি, দেবতাদের পরিহাস আমাদের বুদ্ধির অগম্য! কাণ্টনে ও শাংহাইয়ে "চীনে স্বরাজ" দেখিয়া মনে বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম।

আমরা কলিকাতায় যে সব চীনে দেখি তাহারা বেশীর ভাগ দক্ষিণ চীনের লোক। দক্ষিণ চীন ও উত্তর চীনে আবহমানকাল হইতে সংগ্রাম চলিয়া আসিয়াছে। ১৯১২ সালে

রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে যখন মাঞ্চু বংশীয় সম্রাট দিব্যরাষ্ট্রের সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন তখনও প্রজাতন্ত্র সংস্থাপনের সময় উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীনের সনাতন বিরোধ আসিয়া দেখা দিল। এবার সুন্-য়াৎ-সেন দক্ষিণ চীনের পক্ষ হইতে নিজের রাষ্ট্রপতিত্বের দাবী প্রত্যাহার করিয়া উত্তর চীনের য়ান্-শী-কাইকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি মানিয়া নিয়া গৃহ-বিবাদের শান্তি করেন। সেদিন যে চীনেতে চীনেতে যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহারও মূলে উত্তর চীনে ও দক্ষিণ চীনে বিরোধ। দক্ষিণ চীন উত্তর চীনের তুলনায় গরম দেশ। দক্ষিণ চীনে ধানের চাষ হয়, উত্তর চীনে হয় না। উত্তর চীনের লোক সুশ্রী, বলিষ্ঠ, এক এক জন প্রায় ৬ ফুট লম্বা। হংকং ও কাণ্টন ছাড়িয়া শাংহাই বন্দরে আসিয়া দেখি লোকগুলি ফরসা, সুশ্রী, লম্বা। বইয়ে পড়িয়াছি পশ্চিম চীনের লোকেরা আরও লম্বা, তাহারা এসিয়ার পালোয়ান। হংকং সমুদ্রবেষ্টিত পাহাড়। শাংহাই বন্দর ঠিক সমুদ্রতীরে নয়, য়াং-সি-কিয়াং নদীর তীরে। সমুদ্রের নীল জল ছাড়িয়া প্রায় পাঁচ ঘণ্টা য়াং-সি-কিয়াং নদীর ঘোলা জলে জাহাজ চলিয়া তবে বন্দরে পৌছিল। কি উত্তরে কি দক্ষিণে সর্ব্বত্র চীনে শ্রমশীল। বন্দরের প্রবেশ পথে দেখিবে চীনে পাইলট্ অতি প্রত্যুষে দড়ির সিঁড়ী বাহিয়া জাহাজে উঠিতেছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দেখিবে চীনে জেলের দল সমুদ্রে মাছ ধরিবার জন্য নৌকায় পাল তুলিয়া মহাসাগরের দিকে চলিয়াছে। বন্দরে দেখিবে নৌকা বাহিতেছে চীনে স্ত্রীলোক। প্রত্যুষে মা তাহার শিশু সন্তানটিকে পিঠে কাপড়ে জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিয়া হাতে নৌকার হাল ধরিয়াছে, কেহ বা প্রকাণ্ড বাঁশের চৈড় দিয়া নৌকা ঠেলিতেছে, শিশু মায়ের পিঠে চুপ করিয়া ঘুমাইতেছে। আর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চীনে পুরুষ বাঁধ কাঁধে তাহার দিনের শ্রম সুরু করিতেছে।

হংকং, কাওলুন্, কাণ্টন্, শাংহাই—সব সহরে রাস্তায় সাধারণ লোকের মধ্যে সৌজন্যের অভাব চোখে খুব লাগে। বিদেশী কোন কথা বলিতে গিয়াছে কি চীনের মুখ দিয়া যেন স্বভাবতঃ বাহির হইতেছে "না", "না"। মাথার টুপি খুলিয়া হাসি মুখে, যথা সম্ভব ভদ্রতা প্রকাশ করিয়া কথা বলিতে গিয়াছি, সর্ব্বপ্রথম উত্তর—"নো", "নো", (No, no)। তারপর ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, সহাস্য শিষ্টাচার ও মহামহিম শ্রীলশ্রীযুক্ত ডলারদেবের প্রভাবে সেই "নো"-"নো"-বাদী চীনেরই নিকট এক পেয়ালা চা আদায় করিতে পারিয়াছি। চীনেরা সকলেই বিদেশী ভূতের (Foreign Devil) উপর হাড়ে চটা। বিদেশীর শুদ্ধ ইংরাজী তাহারা বুঝিতে পারে না, "চীনে ইংরাজী" অনেকেই বলিতে পারে ও বুঝিতে পারে। যে বিদেশী ভূত দিব্যভূমির ভাষা জানে না, ইংরাজীও জানে না তাহার সহিত ভাববিনিময়ের চেষ্টা, বৃথা কালক্ষয়। সে বিদেশী ভূত সাদাই হউক, আর কালই হউক, খৃষ্টিয়ান, হিন্দু বা বৌদ্ধ যাই হউক, প্রথম হইতেই হাত নাড়িয়া, "নো" "নো" (No, no) বলিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই শ্রেয়ঃ। জাপানে কিন্তু ঠিক বিপরীত সম্ভাষণ। বেশী দিনের কথা নয়, ৭০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে বিদেশী ভূত পদার্পণ করিতে পারিত না। রাষ্ট্রের নিয়ম ছিল জাপানী বিদেশে যাইতে পারিবে না; বিদেশে যাইবার জন্য বড় জাহাজ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ ছিল। তাহার কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রোমান্ ক্যাথলিক্ পাদ্রীরা জাপানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন। ১৫৬৮ সালে ওদা নোবুনাগার অনুমতি ক্রমে

কিওটো সহরে প্রথম খ্রীষ্টীয় ভজনালয় নির্ম্মিত হয়। ১৬১২ সালে ইয়েয়াস্থর আদেশে জাপান হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হয়। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাপানীদিগকে ক্রুশ কাষ্ঠে বিধাইয়া বা আগুনে পোড়াইয়া শেষ করা হয়। কোন্ জাপানী খ্রীষ্টীয়ান্, আর কে খ্রীষ্টীয়ান্ নয়, তাহা নির্ণয় করিবার জন্ম জাপানের কোন কোন প্রদেশে নিরক্ষর জাপানীদিগকে আদেশ করা হইত যে, বৎসরে একবার তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে আসিয়া যীশুর মুদ্রিত ছবি মাটিতে ফেলিয়া পদদলিত করিবে। যে জাপানী ঐরূপ করিতে অস্বীকৃত হইত, সে খ্রীষ্টিয়ান্ গণ্য হইত ও বিনষ্ট হইত। আজও টোকিওর যাদুঘরে যীশুর ঐরূপ ৭ ইঞ্চি লম্বা, ৪॥০ ইঞ্চি চওড়া মুদ্রিত প্রতিকৃতি কয়েকটি দেখা যায়। ১৮৫৭ সালে এই নৃশংস প্রথা নিবারিত হয়। তিন পুরুষ সুশিক্ষার ফলে আজ জাপানের রাস্তায়, কি সহরে, কি গ্রামে, যেখানে বিদেশী ভদ্রভাবে সাধারণ জাপানীর নিকট কিছু জানিতে চাহিতেছে, জাপানী তাহাকে দ্বিগুণ ভদ্রতা দেখাইয়া তাহার সাহায্য করিতেছে। বিদেশের প্রতি দেশ-ব্যাপী এমন সৌজন্ম অন্যত্র বিরল। জাপানী হয়ত ইংরেজী জানে না। বিদেশী টুপি খুলিয়া ইংরাজীতে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সে তাহাকে দাঁড় করাইয়া "চোত্তো, চোত্তো" (Please, Please) বলিয়া ইংরাজীজানা কোনও জাপানীকে ডাকিয়া, বিদেশী যাহা জানিতে চাহিতেছে তাহা জানাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে। বিদেশীকে যদি ভারতবাসী বলিয়া বুঝিতে পারে, তবে ত কথাই নাই। জাপানে জাপানীরা "ইন্দো"কে যে আদর খাতির করে ভারতবাসীর এতটা খাতির বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানীর স্থানে স্থানে দেখিতে পাইয়াছিলাম। পৃথিবীর আর কোথাও ভারতবাসীর এত খাতির দেখি নাই। আমার কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে সব চীনেই বিদেশীর সহিত অভদ্রতা করে বা জাপানী মাত্রই সৌজন্মের প্রতিমূর্ত্তি। টোকিওর সর্ব্বোচ্চ আদালতের উকিল দফতরে একদিন তিনবার চেষ্টা করিয়াও সামান্ম সৌজন্ম পাই নাই। উকিল মহাশয়েরা আমাকে মক্কেল ঠাওরাইয়া তদনুযায়ী ভদ্রতা করিয়াছিলেন। আবার বিদেশে যায় নাই, খ্রীষ্টিয়ান নহে এমন চীনের নিকট ক্যাণ্টন হইতে ফিরিবার সময় যে সৌজন্ম পাইয়াছিলাম তার চেয়ে বেশী সৌজন্ম দেশেও আশা করিতে পারিতাম না। কিন্তু সাধারণ চীনে তাংএর বর্ণিত ভদ্রলোক ত নয়ই, আমাদের মোটা হিসাবেও সে বিদেশীর প্রতি ভদ্র নয়। আর হংকং ও শাংহাই বন্দরের স্বদেশী পাহারাওয়ালারা আমার প্রতি সৌজন্ম প্রদর্শন করিয়াছিল বলিয়াই কি বলিব তাহারা ভদ্র?

পেট্রোগ্রাড্ (তখন ছিল পিটার্স্‌বুর্গ্) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত চের্‌বাটস্কির সহিত দার্জ্জিলিং এ পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আমাদের দেশে আসিয়া সব চেয়ে কৌতুককর দৃশ্য তুমি কি দেখিলে?" তিনি বলিলেন, "তোমাদের মেয়েরা আঁট ইজের পরে ও পুরুষেরা ঢোলা গাউন পরে।" শাংহাইয়ের চীনেদের পোষাকের এই বর্ণনা করিলে সত্যের তেমন অপলাপ হয় না। সাধারণ চীনে পুরুষের পোষাক নীল রংএর ইজের ও নীল রংএর কোর্ত্তা। চীনে পুরুষের এ পোষাক কলিকাতায়ও দেখা যায়। শাংহাইয়ে দেখিলাম অনেকেই তার উপরে এক লম্বা ঢোলা গাউন্ পরে, অনেকটা

ইংরাজী গির্জ্জার পাদ্রীদের মত গাউন্ কাঁধ থেকে পা পর্য্যন্ত ঝোলান। শাংহাইয়ের আপিসের বেয়ারা পর্য্যন্ত এই গাউন্ পরে। চীনে মেয়েরা ইজের পরে, কলিকাতায়ও দেখিয়াছি। চীনে আসিয়া ভদ্র মেয়েদের ফ্যাশান্-সই পোষাক দেখিলাম। গায়ে শার্ট বা পিরাণ প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত ঝোলে। তার নীচে ইজের, রেশমের মোজা, ও য়ুরোপীয় বিবিদের উঁচু গোড়ালি জুতা। মাথায় লম্বা চুল অতি পরিপাটিরূপে বিন্যস্ত, তাহাতে হাতীর দাঁতের বা অপর বহুমূল্য দুই চারিটী কাঁটা বসান। শার্ট ও ইজেরপরা মেয়েদের পোষাক সুন্দর কিনা, ইহার উত্তর যাঁর যেমন রুচি তিনি সেইরূপ দিন। তবে লজ্জানিবারণ, ভদ্রতা বা চলাফেরার সুবিধা হিসাবে চীনে মেয়েদের পোষাকের নিন্দা করা যায় না। আমাদের দেশে দক্ষিণাত্যের উচ্চজাতির হিন্দু মেয়েদের যেমন মাথায় সুবিন্যস্ত কেশরাশি ছাড়া আর কিছু থাকে না, চীনেও জাপানী মেয়েদের ও তাই; টুপি, আঁচল, ওড়না বা শাল কিছুই মাথায় থাকে না। কেশবিন্যাসের ঘটা জাপানী মেয়েদের যতটা, আমাদের মেয়েদের ততটা নাই। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ব্রাহ্মণকন্যাগণ যেমন যত্নের সহিত চুল বাঁধিয়া, রেশমী সাড়ীতে সাজিয়া, অনবগুণ্ঠিত, মনোরম বেশে রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন, চীনে ও জাপানী মেয়েরাও তাঁহাদের নিজেদের দেশে তদ্রূপ করেন। আর্য্যাবর্ত্তের অবগুণ্ঠন বা মুসলমানী পর্দ্দার ব্যবস্থা এদেশে নাই। রাস্তায় মেয়েদের খাতির সকলেই করে। আজও চীনে পুরুষের মাথায় লম্বা চুলের বিনুনি মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। আড়াই শত বৎসরের প্রথা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। আর চীনে মেয়েদের ছোট্ট খর্ব্ব পা এখনও ক্যাণ্টনে ও শাংহাইয়ে মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। রেঙ্গুনে এক রেশমী কাপড়ের দোকানে প্রথম আমি এক খর্ব্বপদ চীনে সুন্দরী মহিলাকে দেখি। তিনি তাঁহার ব্রুহাম্ গাড়ী হইতে নামিয়া কোনও প্রকারে ফুটপাথ পার হইয়া দোকানে আসিয়া হাসিয়া আমার পাশে বসিলেন। আমি তখন বৌদ্ধ ফুঙ্গীর পোষাক কিনিতেছিলাম। মহিলাটী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পোষাক নিয়া তুমি কি করিবে?" আমি হাসিয়া বলিলাম "কে জানে? হয়ত একদিন এই পোষাক পরিয়া আর হাতে এক ঘণ্টা ও এক ধ্যান-চক্র (Prayer wheel) নিয়া বাহির হইব।" রাষ্ট্র এখন চীনে আইন করিয়া দিয়াছে যে মেয়েরা পা বাঁধিয়া পা ছোট করিতে পারিবে না। চীনের রাষ্ট্র এখনও এত শক্তিশালী নয় যে ছোট খাটো সব আইন লোকে মানিতেছে কি না সে দিকে নজর রাখিতে পারে।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

বন্যার সুফল

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং
ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ
প্রভবত্যহরাগমে॥

'হে পার্থ, এই সেই ভূতসমূহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া রাত্রির আগমে লয় পাইয়া থাকে; আবার দিবসাগমে অবশভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।'

প্রলয়ের মধ্যে সৃষ্টির বীজ নিহিত আছে। তাই সান্তাহারে রুদ্রের ভীষণ প্রলয়কাণ্ড দেখিয়া ভীত হই নাই। দেখিলাম উৎরাইল, ইন্দ্রাইল, দলস্বা, পাইকপাড়া, আদমদীঘি, তালসোন প্রভৃতি গ্রামে ঘরগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে। যাহারা মাটির ঘরে ছিল, তাহাদের কিছুই নাই; যাহাদের টিনের ঘর ছিল, তাহাদের যেন দেহটী ভাসিয়া গিয়াছে, মাথার লৌহ মুকুটটী খসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বাসহীন বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে শীতাগমে জ্বরে কাঁপিতেছে, কাসি ও পেটের অসুখে ভুগিতেছে। ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা ধান্য বৃক্ষ শূন্য, কোথাও বা শস্যশ্যামল দেখাইতেছে বটে, কিন্তু বৃক্ষগুলি অন্তঃসারশূন্য, ফসল চারিআনা পরিমাণের অধিক হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষিজীবির প্রধান সম্বল গো মহিষ বংশ প্রায় লুপ্ত। এই ত প্রলয়ের ঘোর অন্ধকার; ধ্বংসগামী জগতের প্রাণস্পর্শী হাহাকার। জন্মের পূর্ব্বে যেমন প্রসব-বেদনা-কাতরার আর্ত্তনাদ, তেমনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ধ্বংসের হাহাকার। ধ্বংসকারী রুদ্র সৃষ্টিকামনায় কাঁদিয়াছিলেন। রোদন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি রুদ্র।

"রোদনাদ্রুদ্র ইত্যেবং
লোকে খ্যাতিং গমিষ্যসি।"

ভূমিষ্ট হইয়াই রুদ্র রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন 'বাছা, তুমি কাঁদচ কেন?' রুদ্র বলিলেন "আমার নাম দাও, স্থান দাও আর বৌ দাও"।

নামানি কুরু মে ব্রহ্মণ
স্থানানি চ জগদ্গুরো।
পত্নীশ্চ দেহি ভগবন্
ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি॥"

"বৌ না দিলে আমার শান্তিই হবে না।" নাম ধাম দিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, তোমাকে সুন্দরী স্ত্রী দিলাম, অতঃপর তুমি

"প্রজাঃ সৃজ মহাভাগ
জগদেতৎ প্রপূরয়।

প্রলয়কর্ত্তা রুদ্রের কান্নাও সৃষ্টির জন্য। তাই এই প্রলয়ের মধ্যে সৃষ্টির বীজ আছে কি না ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, এই প্রলয় হইতে ভারতে সংঘবদ্ধতা ও একতার সৃষ্টি হইয়াছে। কোথায় ব্রহ্ম, কোথায় আসাম, কোথায় মান্দ্রাজ, কোথায় বোম্বাই, আজ সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজাতির মধ্যে একটা একতার সাড়া পড়িয়াছে। সকলে মিলিয়া ঐ রাজসাহী, বগুড়ার চাষী ভাইদের ঘর প্রস্তুত করিতেছে, মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে, গায়ে কাপড় পরাইতেছে, মাঠে শস্য ছড়াইতেছে, গরুর আহার যোগাইতেছে এবং রোগীর রোগ যন্ত্রণা নিবারণ করিতেছে। নিরক্ষর ভিক্ষুক আপনার ভিক্ষার পাত্র নিঃশেষ করিয়া দূরবর্ত্তী বন্যাপীড়িতের উদ্দেশে যথাসর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছে; পতিতা সঙ্কুচিত চিত্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বন্যাপীড়িতা কুলললনাদের উদ্দেশে দান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে। প্রলয়কর্ত্তার এই সুন্দর 'সৌম্য স্রষ্টামূর্ত্তি দেখিয়া বারম্বার প্রণাম করিলাম এবং বলিলাম 'হে রুদ্র! তোমার দক্ষিণ মুখ দেখিয়া ধন্য হইলাম।'

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস।

নিঃসম্বলের দান

একদিন সকালবেলা একটী ভিখারী আমাদের দুয়ারের সম্মুখে বসিয়া ভিক্ষা করিতেছিল। বেলা বাড়িতে লাগিল, লোক এবং গাড়ীর সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিল। রৌদ্রের তেজ প্রখর হইল। আমি মধ্যে মধ্যে জানালা দিয়া দেখিতে লাগিলাম—সে সেইখানেই বসিয়া গান গাহিতেছে এবং ভিক্ষা করিতেছে। লোকের পর লোক তাহার পাশ দিয়া ব্যস্ত হইয়া আপন আপন কর্ম্মে চলিয়া গেল, কেহ তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, কেহবা দেখিল না; কদাচিৎ কোন একজন বা দয়াপরবশ হইয়া একটা পয়সা দিল। দ্বিপ্রহর হইল, সমস্ত রাস্তাটা একটা চুল্লীর মত তপ্ত হইয়া উঠিল, রাস্তার লোক এবং গাড়ীর স্রোত মন্দ হইয়া আসিল। আকাশের অতি উচ্চে দু'একখণ্ড সাদা মেঘের পাশে দু'একটা চিল ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে এবং মধ্যে মধ্যে করুণ সুরে ডাকিয়া উঠিতেছে। গানের বিরাম নাই। ক্রমে রৌদ্রের তেজ কমিয়া আসিল, লোক ও গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। স্কুল হইতে ছেলেরা হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার দিকে একদল যুবক দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যের জন্য গান করিয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল। তাহারা প্রচুর কাপড়, পয়সা ও চাউল সংগ্রহ করিয়াছিল। ভিখারী তাহার গান থামাইয়া তাহাদের দিকে উৎসুক হইয়া দেখিতে লাগিল। উঃ কত পয়সা! কত চাউল! সে অন্নহীন, এক মুঠা অন্ন দয়া করিয়া কেহ তাহাকে দিবার নাই। উঃ কত কাপড়! একটি ছিন্ন বস্ত্রও কি কেহ তাহাকে দিবে না? চাহিয়া চাহিয়া কিছুতেই যেন চোখের তৃপ্তি মিটে না।

যুবকদল গাহিতেছিল—

"গৃহহীন যারা কাঁদে নিরাশায়,
তাদের নয়ন কে মুছাবি আয়!
নগ্ন অন্নহীন লক্ষ ভাই যার,
নিশ্চিন্ত আরামে সে কি রহে আর?
ভিক্ষাজীবি কুলি নিজ দৈন্য ভুলি
হের অন্নবস্ত্র আনিয়া যোগায়।"

গান শুনিতে শুনিতে তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। সে উত্তরবঙ্গের প্লাবনের কথা শুনিয়াছিল। আহা! কত নরনারী অন্ন, বস্ত্র ও গৃহহীন হইয়া হাহাকার করিতেছে! সে তবু নিজে এই সহরে ভিক্ষা অনায়াসেই পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা কি করিবে? যাহাদের সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছে তাহারা বাঁচিবে কি করিয়া? ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে নিজেকে টানিয়া টানিয়া ফুটপাথের কিনারায় লইয়া গেল। পক্ষাঘাতে তাহার পা দুইখানা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল। ফুটপাথের ধারে আসিয়া সে একটা ল্যাম্পপোষ্ট ধরিয়া একটুখানি উঁচু হইয়া উঠিল। তাহার পর কাপড়ের ভাঁজের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত দিনের ভিক্ষালব্ধ পাঁচটি পয়সা সেই যুবকদের পয়সার ছালার মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আকাশের দিকে চাহিল। অস্তসূর্য্যের রঙিন আভা তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল; দানের আনন্দে তখন তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।*

শ্রীজীবনময় রায়।

* সত্যঘটনা অবলম্বনে।

বৌদ্ধযুগে নারীর স্থান

মহাপ্রজাপতীর বিশেষ আগ্রহে মহাত্মা গৌতম নারীগণের জন্য সন্ন্যাসাশ্রমের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ে নানাশ্রেণীর নারী স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজপত্নী, রাজকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া দীনা হীনা নারী পর্য্যন্ত সকলেই ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিতেন। কুমারী, সধবা, বা বিধবা; চিরনির্ম্মলা, বা পতিতা সকলের জন্যই ইহার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। নিম্নজাতি বলিয়া কাহাকেও এ অধিকারে বঞ্চিত করা হয় নাই—উচ্চ এবং নীচ সর্ব্বজাতির নারীই এই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগের বৈষ্ণবী এবং মধ্যযুগের "খৃষ্টান ভগিনী" সম্প্রদায়কে দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণও সম্ভবতঃ ঐ প্রকার অশিক্ষিতা ছিলেন। কিন্তু এই প্রকার বিশ্বাস নিতান্তই অমূলক। অনেক ভিক্ষুণী ধর্ম্মের গভীরতম ও জটিলতম তত্ত্ববিষয়েও পারদর্শিনী ছিলেন। কোশলের রাজা প্রসেনজিতও তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহের সহিত ইহাদিগের নিকট গমন করিতেন। উপনিষদে দুইজন প্রসিদ্ধা রমণীর নাম পাওয়া যায়—একজন মৈত্রেয়ী, অপরজন গার্গী। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত প্রকাশ্য রাজসভায় ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে বিচার করিয়াছিলেন। যিনি প্রকাশ্য সভায় এই ভাবে বিচার করিতে পারেন, তিনি সাধারণ নারী নহেন। কিন্তু বৌদ্ধভিক্ষুণীগণ নূতন কিছু করিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধনায় সিদ্ধা ও তত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শিনী হইতেন—তাঁহারা পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সকলকেই ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

অনেক ভিক্ষুণী ধর্ম্মকবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা 'থেরীগাথা' নামে বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। থেরীগাথাতে ৭৩জন ভিক্ষুণীর বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন 'সংযুক্তনিকায়,' 'মজ্‌ঝিমনিকায়' প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থেও ইহাদিগের উপদেশ নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অদ্য তিনজন ভিক্ষুণীর জীবন ও উপদেশ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

(১) মহাপ্রজাপতী।

ভিক্ষুণী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিবার জন্য মহাপ্রজাপতী কি প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা 'ভিক্ষুণী' নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের আজ্ঞাতে তিনিই ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রজাপতীর ধর্ম্মজীবন যে অতি উন্নত ছিল, মহাত্মা বুদ্ধদেবও তাহা প্রকাশ্য ভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

'অপদান' নামক গ্রন্থে মহাপ্রজাপতীর রচিত একটী অংশ পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত অংশ ঐ স্থল হইতে গৃহীত। বুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন:—"হে সুগত! আমি তোমার মাতা; হে বীর! তুমি আমার (ধর্ম্ম) পিতা। হে নাথ! তুমি সদ্ধর্ম্ম সুখ-দাতা। হে গৌতম! তোমা দ্বারা আমি (অর্থাৎ আমার ধর্ম্মজীবন) জাত। হে সুগত! আমি

তোমার দেহ বর্দ্ধিত করিয়াছিলাম; আর তুমি আমার অনিন্দিত ধর্ম্মতনু বর্দ্ধিত করিয়াছ। আমি তোমাকে যে দুগ্ধ পান করাইতাম, তাহা দ্বারা মুহূর্ত্তের জন্ম তোমার তৃষ্ণা নিবারিত হইত; কিন্তু তুমি আমাকে যে ধর্ম্মক্ষীর পান করাইয়াছ তাহাতে আমি পরাশান্তি লাভ করিয়াছি। মান্ধাতাদি নরেন্দ্রদিগের মাতার নাম ভবসাগরে নিমজ্জিত; আর তোমার জন্ম আমি ভবসাগর পার হইয়াছি। 'রাজমাতা' বা "রাজমহিষী" এ প্রকার নাম স্ত্রীলোকের পক্ষে সুলভ কিন্তু "বুদ্ধমাতা"—এ নাম পরম দুর্ল্লভ। স্ত্রীলোকদিগকে প্রব্রজ্যায় অধিকার দিবার জন্ম আমি পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিয়াছিলাম। হে সুরশ্রেষ্ঠ! ইহাতে যদি আমার কিছু দোষ হইয়া থাকে তুমি তাহা ক্ষমা কর। হে বীর! তোমার আজ্ঞাতে আমি ভিক্ষুণীদিগকে শাসন করিয়াছি, তাহাতে যদি আমার কোন ক্রটী থাকে, তাহা তুমি ক্ষমা কর।"

মহাপ্রজাপতী ধর্ম্মসাধন করিয়া 'অর্হত্ব' লাভ করিয়াছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্রে 'রাগক্ষয়, 'দ্বেষক্ষয়' ও 'মোহক্ষয়' কে 'অর্হত্ব' বলা হয় (সং নিঃ ৩৮।২)। 'অর্হত্ব' লাভ হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহাই নির্ব্বাণ মুক্তি।

থেরী গাথার একটী গাথা (৫৫) মহাপ্রজাপতীর রচনা।

২। ক্ষেমা

ক্ষেমা মগধদেশে সাগল নামক স্থানে রাজপরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা বিম্বিসারের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বুদ্ধের উপদেশে ইনি "থেরী" হইয়াছিলেন এবং সাধনবলে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে ইঁহার জ্ঞান অতি গভীর ছিল।

এক সময়ে রাজা প্রসেনজিৎ ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ববিষয়ে ইঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং ক্ষেমা তাহার যথাযথ উত্তরও দিয়াছিলেন। (সংযুক্তনিকায় ৪৪।১)।

প্রশ্ন কয়েকটী এই :—

(১) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন ইহা কি সত্য ?

(২) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না ইহা কি সত্য ?

(৩) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন এবং থাকেন না—এতদুভয়ই কি সত্য ?

(৪) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন এমনও নহে এবং থাকেন না এমনও নহে—এতদুভয়ই কি সত্য ?

ইহার প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তরে ক্ষেমা বলিলেন—"ভগবান্ বুদ্ধ এপ্রকার বলেন না।

প্রসেনজিৎ—জিজ্ঞাসা করিলেন "হে আর্য্যে! কি হেতুতে কি উদ্দেশে ভগবান ইহা প্রকাশ করেন নাই ?

তখন ক্ষেমা বলিলেন—

"হে মহারাজ! এস্থলে একটী প্রশ্ন করিতেছি। আপনার কি এমন গণক, বা মুদ্রারক্ষক বা 'সংখ্যায়ক' আছে যে গঙ্গার বালুকা গণনা করিয়া বলিতে পারে যে এতসংখ্যক বালুকা আছে বা এতশত, এত সহস্র বা এতলক্ষ বালুকা আছে ?"

প্র। "হে আর্য্যে! নাই"

ক্ষে। "হে মহারাজ! আপনার কি এমন গণক, মৌদ্রিক বা সংখ্যায়ক আছে যে সমুদ্রের জলরাশি পরিমাপ করিয়া বলিতে পারে যে, ইহাতে এত আঢ়ক জল আছে বা এত শত আঢ়ক বা এত লক্ষ আঢ়ক আছে?"

প্র। "হে আর্য্যে! নাই"

ক্ষে। "ইহার কারণ কি"?

প্র। "কারণ এই মহাসমুদ্র গভীর অপ্রমেয় ও দুরবগাহ।

ক্ষে। "হে মহারাজ! যে "রূপ", যে বেদনা, যে সংজ্ঞা, যে সংস্কার এবং যে বিজ্ঞান দ্বারা তথাগতকে বিজ্ঞাপিত করা যাইতে পারে, তথাগতের সেই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, উচ্ছিন্নমূল হইয়াছে, জ্ঞানবৃক্ষের ন্যায় উৎপাটিত হইয়াছে এবং পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা বিদূরিত হইয়াছে। তথাগত এই সমুদয় হইতে বিমুক্ত এবং মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর অপ্রমেয় এবং দুরবগাহ। সুতরাং মৃত্যুর পর (১) তথাগত থাকেন এপ্রকার বলা যায় না, (২) থাকেন না এপ্রকার বলা যায় না; (৩) থাকেন এবং থাকেন না উভয়ই সত্য এপ্রকার বলা যায় না; (৪) "থাকেন এমনও নহে, থাকেন না এমন ও নহে" এই দুইটাই সত্য এরূপ বলাও সঙ্গত নহে।"

ইহা শুনিয়া কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভিক্ষুণী ক্ষেমার বাক্যকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্ষেমা যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই :—

যাঁহারা তথাগত (তত্রাগত), যাঁহারা মৃত্যুর পরপারে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে কোন কথাই বলা যায় না। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ভিন্ন আমরা কিছুই জানি না। কোন বিষয় বর্ণনা করিতে গেলে রূপ বেদনাদি দ্বারাই তাহা বর্ণনা করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা মুক্ত পুরুষ তাঁহারা রূপ বেদনাদির অতীত, সুতরাং ইহাদিগের বিষয়ে কোন কথাই বলা যায় না। গীতাকার এই পরম সত্তার বিষয় বলিয়াছেন, যে তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন। ক্যাণ্টের (Kant) Thing-in-itself উপনিষদের তুরীয় ব্রহ্ম ইত্যাদিও অবাঙ্মনসোগোচর।

প্রসেনজিতের মত রাজা যাঁহার নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হন, তিনি সামান্যা নারী নহেন। আর তিনি যে প্রকার জটিল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, তাহা হইতেও তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা অনুভব করা যাইতে পারে।

থেরী গাথার একটী গাথা (৫২) ইঁহার রচনা।

তিনি যে কেবল পণ্ডিতাই ছিলেন তাহা নহে; তিনি অর্হৎও হইয়াছিলেন। জনসমাজ ক্ষেমাকে আদর্শ ভিক্ষুণী বলিয়া সম্মান করিত। এক স্থলে (সংনিঃ ২৭।২৪) বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,

"হে ভিক্ষুগণ। যখন উপাসিকা নিজের একমাত্র প্রিয় এবং মনোমোহিনী কন্যাকে সম্যক্ উপদেশ প্রদান করে, তখন বলিয়া থাকে—"যদি তুমি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর, তবে ভিক্ষুণী ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণার ন্যায় হইও। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা যে প্রকার, তাহাই (ধর্ম্মজীবনের) তুলা এবং পরিমাপ।"

গৌতম বুদ্ধও ক্ষেমাকে কি ভাবে দেখিতেন, এখানে তাহা বুঝা যাইতেছে। (উৎপলবর্ণার বিষয় পরে আলোচিত হইবে)।

৩। সুমেধা।

সুমেধার জন্ম মন্তাবতী নগরে। ইনি রাজার কন্যা; পিতার নাম কোঞ্চ; রাজার প্রধান মহিষী ইঁহার মাতা। থেরীগাথাতেই ইঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাটী পাওয়া যায় (থেঃ ৭৩)।

বাল্যকাল হইতেই সুমেধা "শীলবতী, সুবক্ত্রী, বহুশাস্ত্রে পণ্ডিতা এবং বুদ্ধানুশাসনে নিষ্ঠাবতী ছিলেন। একদিন তিনি মাতা ও পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"হে মাতা, হে পিতা, তোমরা দুইজনেই আমার কথা (একবার) শুন। নির্ব্বাণে আমি অভিরত। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহা স্বর্গীয় হইলেও অশাশ্বত। কাম্যবস্তু অল্পাস্বাদ এবং বহুবিঘ্নপূর্ণ, ইহাতে কি লাভ? কামনা আশীবিষের ন্যায় তীব্র, মূর্খেরাই ইহাতে মুগ্ধ হয়। তাহারা নিরয়ে গমন করিয়া দীর্ঘকাল দুঃখে মুহ্যমান হইয়া থাকে। পাপকর্ম্মা ও পাপবুদ্ধি অধোগতি লাভ করিয়া শোক প্রাপ্ত হয়। মূর্খ ব্যক্তি কায় বাক্য ও মনে সর্ব্বদাই অসংযত। মূঢ়গণ প্রজ্ঞাহীন এবং অচেতন। কি প্রকারে দুঃখের উৎপত্তি হয়, সে বিষয়ে তাহারা অজ্ঞ; উপদেশ দিলেও, তাহারা ধারণা করিতে পারে না; 'আর্য্যসত্য' তাহারা বুঝে না। বুদ্ধ-শ্রেষ্ঠ যে উপদেশ দিয়াছেন, বহুতর লোকে তাহা জানে না। সুখ উৎপন্ন হইবে ইহাই তাহারা অভিনন্দন করে, এবং দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিবার জন্য স্পৃহা করিয়া থাকে। দেবগণের মধ্যে যে উৎপত্তি, তাহাও অশাশ্বত; যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহাই অনিত্য। তোমরা দুই জনেই অনুমতি দাও—আমি বুদ্ধানুশাসনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব। ঔৎসুক্য-বিহীন হইয়া, জন্ম মরণ বিনাশ করিবার জন্য আমি সচেষ্ট হইব। এই জন্মগ্রহণে, এই অসার দেহে কি সুখ! তোমরা অনুমতি দাও, 'ভবতৃষ্ণা' নিরোধ করিবার জন্য আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব। এখন বুদ্ধগণের উৎপত্তির যুগ; অক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, সুক্ষণ আসিয়াছে। জীবিতাবস্থায় যেন 'শীল' ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য অবহেলা না করি।" তিনি আরও বলিলেন—

"হে মাতা পিতা! গৃহস্থা থাকিয়া আমি আর আহার গ্রহণ করিব না, বরং আমি অনাহারে মরিব।"

ইহা শুনিয়া মাতা দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন, পিতা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং সুমেধাও ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তখন পিতা তাহাকে বলিলেন:—

"বৎসে! উঠ! কেন শোক করিতেছ? অনিকর্ত্ত বারণাবতীর রাজা এবং তিনি সুরূপ। (তুমি জান) তাঁহারই হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। তুমি অনিকর্ত্ত রাজার ভার্য্যা ও অগ্রমহিষী হইবে। 'শীল' ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য এবং প্রব্রজ্যা অতি দুষ্কর। হে পুত্রি! রাজ্যের প্রভুত্ব, ধন, ঐশ্বর্য্যভোগ সব তোমারই হইবে! কাম্যবস্তু তুমি ভোগ কর। এ সমুদয় তুমি বরণ করিয়া লও।"

সুমেধা বলিলেন:—

"এ সমুদয় অসার। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, না হয় মৃত্যুকে বরণ করিব। আমি অদ্যই অভিনিক্রমণ করিব। অসার ভোগসুখে আমার বাসনা নাই। কাম্যবস্তু আমার নিকট ঘৃণিত।"

তদনন্তর সুমেধা বিলম্বিত কৃষ্ণকেশ খড়্গদ্বারা ছেদন করিলেন এবং প্রাসাদদ্বার রুদ্ধ করিয়া "প্রথম"ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তখন তাঁহার প্রাণ সংসারের অনিত্যতা অনুভব করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে সুমেধার সম্মতি গ্রহণ করিবার জন্য অনিকর্ত্ত সেই দিন এই স্থলে সমাগত হইবেন। তদনুসারে তিনি মণিকনকভূষিত-অঙ্গে সেই প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সুমেধার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন:—

"আমার রাজ্যের প্রভুত্ব, ধন ঐশ্বর্য্য, ভোগসুখ তোমার হউক। কাম্যবস্তু ভোগ কর; পৃথিবীতে কাম্যবস্তুর ভোগ সুদুর্ল্লভ। ভোগ্যবস্তু ভোগ কর, যথেচ্ছ দান কর। দুঃখিতমনা হইও না, তোমার মাতা পিতা দুঃখিত হইয়াছেন।"

কিন্তু সুমেধার সমুদয় কামনা ও মোহ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বলিলেন:—

"কামভোগ অভিনন্দন করিও না; ইহার দুঃখবিপদ দর্শন কর। চাতুর্দ্দ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি মান্ধাতা কামভোগিগণের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ হয় নাই—অতৃপ্ত অবস্থাতেই তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দশদিকে কেবল যদি সপ্তরত্নই বর্ষিত হয়, তথাপি কামনার পরিতৃপ্তি নাই; মানুষ অতৃপ্ত অবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কামনা অসিধারবৎ; কামনা সর্পশিরঃসদৃশ, উল্কাবৎ দহনকারী অস্থিকঙ্কালসন্নিভ (ঘৃণিত); কামনা অনিত্য, অধ্রুব, বহুদুঃখপূর্ণ এবং মহাবিষময়। কামনা তপ্ত লৌহ-গোলকসম সন্তপ্ত; পাপ ইহার মূল, দুঃখ ইহার ফল। কামনা দুরারোহ বৃক্ষের ফল-সদৃশ, কামনা স্বপ্নবৎ বঞ্চক; কাম শক্তিশেলোপম। কাম রোগবিশেষ, ইহা গণ্ড, 'অঘ' ও 'নিঘ'; ইহা জলন্ত অঙ্গার সদৃশ; ইহা পাপ, ভয় ও বধের মূল। কামনা বহু দুঃখের কারণ এবং মুক্তির অন্তরায়। তোমরা যাও, সংসারে আমার আর বিশ্বাস নাই। আমি দীপ্তশীর্ষা, অপরে আমার কি করিবে? জরামরণ সকলকে অনুসরণ করিতেছে। ইহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য আমি কৃতসঙ্কল্প।"

সংসারের অনিত্যতার বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিবার পর রাজাকে সম্বোধন করিয়া সুমেধা পুনরায় বলিলেন:—

"অমৃতত্ব থাকিতে কেন তোমার পঞ্চকষায় সেবন? আর পঞ্চকষায় অপেক্ষা কামনা ও আসক্তি যে কটুতর। অমৃতত্ব থাকিতে কেন তোমার কামলালসা? সমুদায় কামনা ও আসক্তি প্রজ্জলিতা 'কুথিতা' 'কুপিতা' এবং 'সন্তাপিতা'। মোক্ষ বিদ্যমান থাকিতে বধবন্ধমূলক কাম কেন? কামই বধবন্ধ; কামকামী দুঃখ অনুভব করে। তৃণ-রচিত জলন্ত উল্কা যে হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকে তাহার হস্তই দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যে উল্কা ফেলিয়া দেয় তাহার হস্ত দগ্ধ হয় না। উল্কার ন্যায় কামও দগ্ধ করে; কিন্তু যে পরিত্যাগ করে, তাহাকে দগ্ধ করেনা। কামজনিত অল্প সুখের জন্য বিপুল সুখ পরিত্যাগ করিও না। মৎস্যের ন্যায় বড়শী গিলিয়া পশ্চাতে যেন অনুতপ্ত হইতে না হয়। কামে অনুরক্ত হইলে অপরিমিত দুঃখ, চিত্তের বহু গ্লানি অনুভব করিতে হইবে। অধ্রুব কামনা পরিত্যাগ কর। অজরত্ব বর্ত্তমানে জরামূলক কামনা কেন? আমি যে বস্তুর কথা বলিতেছি তাহা অজর অমর। ইহা অজরামর পদ; ইহা অশোক, শত্রুহীন, বাধাবিহীন, অচ্যুত অভয়, উপতাপহীন। বহুজন এই অমৃতপদ লাভ করিয়াছে—এখনও ইহা লাভ করা সম্ভব। যাঁহারা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন তাঁহারাই লাভ করেন, অপরে পারে না।"

এই কথা বলিয়া সুমেধা কর্ত্তিত কেশরাশি অনিকর্ত্তের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন।

তখন অনিকর্ত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে সুমেধার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

সুমেধাকে প্রব্রজ্যায় অনুমতি দিন; ইনি বিমোক্ষ ও সত্য দর্শন করুন।"

মাতাপিতা অনুমতি দিলেন। তখন সুমেধা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। তিনি সাধন করিয়া ষড়ভিজ্ঞা (= ছয়টি বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান) এবং অগ্রফল' (=সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল) লাভ করিলেন।

থেরী গাথাতে ইহার পরে লিখিত আছে—''ইহা আশ্চর্য্য! ইহা অদ্ভুত! রাজকন্যা নির্ব্বাণ লাভ করিলেন।"

পর প্রবন্ধে অপরাপর ভিক্ষুণীদিগের বিষয় আলোচিত হইবে। শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

জাগো

নব জাগরণ গান উঠিয়াছে ব্যাপিয়া অম্বর
হে ভারত, আপনারে কোরোনা বঞ্চিত। দিগম্বর]
বেশে আজি ভিক্ষাপাত্র লয়ে করপুটে, অন্নহীন
তোমার দুয়ারে আসি ডাকিছেন হের নিশিদিন
তোমার দুর্ভাগ্য দেশ—তোমার সর্ব্বস্বহারা ধন
এসেছে ফিরিয়া তব দ্বারে আজি ; ওগো পৌরজন
ফিরাও না, ফিরাও না তারে। হের তিমির-বিদার
নব আশা-রবি তার, দীপ্তি রেখা আঁকি চারিধার
বিশ্বের অন্তরলোকে সঞ্চারিছে নব জাগরণ,
আপন গৌরবে সবে জাগো, আজি জাগো পৌরজন।
যাহার যা আছে লয়ে চিররুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া
বাহিরে দাঁড়াও আসি, আপনার ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া
দাঁড়াও বিশ্বের মাঝে গৌরবে উন্নত করি শির,
সাজাও নবীন বেশে—দূর কর তার জীর্ণ চীর ;
আপন অন্নের অংশে তোল তার চেতনা সঞ্চারি,
জাগরে সুষুপ্ত চিত্ত জাগ অমৃতের অধিকারী।

শ্রীজীবনময় রায়।

সঙ্কলিকা

কাউন্সিল বর্জ্জন

১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যে নির্দ্ধারণ হইয়াছিল, তাহাতে কংগ্রেস অসহযোগনীতি অবলম্বন করিয়া কাউন্সিলবয়কটের পরামর্শ দিয়াছিলেন। নিজ নিজ ব্যক্তিগত মতের পক্ষেই হউক বা বিপক্ষেই হউক, কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগপুর ও আহমদাবাদ কংগ্রেসে ও মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে এই মত প্রবল রহিয়াছিল। তারপর, দেশময় সরকারপক্ষের দমন-নীতি, চৌরীচৌরার কাণ্ড, ও পরে বরদৌলির রিজলিউশনের ফলে অসহযোগনীতির অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বরদৌলির মন্তব্যের পর অনেক স্থানেই কংগ্রেস সমিতিগুলির কার্য্যের উৎসাহ হ্রাস হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তারপর মহাত্মা গান্ধীর ছয়বৎসর কারাদণ্ডের সংবাদেও দেশব্যাপী বিপ্লব ত হইলই না, কোন আন্দোলনও হইল না। ইহাতে একপক্ষে সরকারবাহাদুর মনে করিলেন অসহযোগনীতির শেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, অপরপক্ষে দেশের লোকে বুঝিল যে এবার লোকেরা প্রকৃতপক্ষে অসহযোগনীতির নিরুপদ্রবতা (Non-violence) বুঝিতে পারিয়াছে।

এমতাবস্থায় সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে দেশের কাজের জন্য আবার নূতন করিয়া প্রোগ্রাম্ করা দরকার। অসহযোগপথে আরো অধিক অগ্রসর হইতে হইবে, না অন্য কোনরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট পথ ঠিক্ না করিলে কাজের সুবিধা হইতে পারে না।

সেইজন্য কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটি হইতে আইন অমান্য করা উচিত কিনা এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য দুইটি কমিটি নিযুক্ত হইল। সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া অনেক লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া কমিটিদ্বয় তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই মন্তব্য লইয়া দেশে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। অসহযোগিতার অনেক কাজই, যথা স্কুল কলেজ বা আইন আদালতের বর্জ্জন বিষয়ে এই কমিটি এখন রাশশিথিল করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আইন অমান্য বিষয়ে সমগ্র দেশ এখনও প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া, মত ব্যক্ত করিয়াছেন; শুধু তাহাই নয়, কাউন্সিল বয়কট বিষয়েও তাঁহারা মন্তব্যপ্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেসের নিযুক্ত কমিটির সভ্যগণের মধ্যে তিনজন কাউন্সিল বর্জ্জনের পক্ষে ও তিনজন বিপক্ষে মত দিয়াছেন, খিলাফৎ নিযুক্ত কমিটির অধিকাংশই বর্জ্জনের পক্ষে মত দিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত মত কাউন্সিলে যাওয়ার পক্ষে বলিয়াই আমরা মনে করিতাম, এখন তিনিও তাহা বিশদ্‌ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় নেতারা কাউন্সিলবর্জ্জনের বিপক্ষে অনেক যুদ্ধ করিয়াও মহাত্মা গান্ধীকে টলাইতে পারে নাই। এখন, মহাত্মার অনুপস্থিতিতে মহাত্মার দলের অনেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট মত ব্যক্ত করিতেছেন।

তবে যাহারা কাউন্সিল বর্জ্জনের বিপক্ষে চলিতেছেন, তাঁহারা ইহাকে অসহযোগেরই একটা অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। কাউন্সিল বাহির হইতে বর্জ্জন না করিয়া ভিতরে গিয়া বর্জ্জন করিব, শুনিতে paradoxical শুনায় বটে, তবে যুক্তিতর্কের অনেক আবরণ দ্বারা ইহাকেও বেশ এক রকম খাড়া করা হইয়াছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল্ খাঁ প্রভৃতি দেশমান্য ব্যক্তিগণ কাউন্সিলে প্রবেশের যে সব কারণ দেখাইয়াছেন, তাহার মধ্যে কতগুলি তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তির উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যেমন এক জায়গায় তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অসহযোগীরা যদি Councilএ এমন সংখ্যাধিক্য (majority) পান যাহাতে Councilএ quorum না হইয়া সভাবন্ধ হয়, তবেই তা Council অচল হইবে। ইহা শুনিতে খুব সুন্দর, কিন্তু দেখা যাউক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কি অবস্থা হয়। মোট ১৩৯ জন সদস্যের মধ্যে, সরকারী Official সদস্য ২৩ জন, গবর্ণমেণ্টের মনোনীত ৬ জন, Bengal Chamber of Commerce হইতে মনোনীত সাহেব ৬ জন, Indian Jute Association হইতে সাহেব ২ জন, Indian Tea Association হইতে ১ জন, Indian Mining Association হইতে ১ জন, এবং Trade Association হইতে ১ জন, এই ৪০ জন কখনও অসহযোগী লইতে পারে না। অথচ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ২৫ জন উপস্থিত থাকিলেই কোরাম্ হয়। যদি সমস্ত হিন্দু মুসলমান সদস্যও অসহযোগনীতি অবলম্বন করেন, তবুও কোরাম্ অভাবে কাউন্সিল বন্ধ হইবে না। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কমিটির সভ্যগণ এরূপ একটা ভিত্তিহীন কারণ কেন দেখাইলেন বুঝিতে পারি না। তারপর দেশবন্ধু দাসমহাশয় বলিতেছেন, "কাউন্সিল বাহির হইতে বর্জ্জন না করিয়া, ভিতরে গিয়াই বর্জ্জন করিব; এক, হয় ইহা শেষ করিব, নতুবা ইহার পরিবর্ত্তন করিব"। ইহাতে দেখা যায় যে কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া ইহার ধ্বংস অথবা পরিবর্ত্তন করার (To end it or to mend it) ক্ষমতা সদস্যদের আছে। তাঁহারা কি ইহা সত্য বলিয়া মনে করেন? তবে এই সত্যটা দুই বৎসর আগে স্বীকার করিলে, আজ Reformed Councilএর এ অবস্থা হইত না। অসহযোগীরা কাউন্সিল বর্জ্জন করাতে, কাউন্সিলের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল্ খাঁ, দেশবন্ধু দাস প্রভৃতি যে সব যুক্তি দেখাইয়াছেন সে সব ত দুই বৎসর পূর্ব্বেও অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। Reformed Actএর ত কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, এখন অসহযোগনীতি সম্যক্ বজায় রাখিয়া তাঁহারা এমন

তর্কজাল বিস্তার করেন কি করিয়া। কাউন্সিলে গেলে Oath of Allegiance, রাজভক্তি সূচক শপথ গ্রহণ করিতে হয়, সেখানে গেলে উচ্চদরের সরকার পক্ষীয় লোকের সান্নিধ্যে মনুষ্যত্বলোপের আশঙ্কা আছে, সেখানে ভাল লোক প্রবেশ করিলে, বাহিরে দেশের কাজ করিবার লোকের অভাব হইবে, ইত্যাদি কথা ত ইঁহারা কেহই খণ্ডন করিতেছেন না। তবে কি সে সব কথার বাস্তবিক কোন মূল্য ছিল না?

অসহযোগমন্ত্র সাধন করিবার জন্যই Councilএ প্রবেশ করিতে হইবে, এ কথা আমাদের কাছে একটু দুরূহ বলিয়া বোধ হয়। অসহযোগীরা যদি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন, যে Council বর্জ্জন করা ভুল হইয়াছে, Councilএ গিয়াই জলে নামিয়া কুমীরের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে, তবে তাহাতে লজ্জার কোন কথাই নাই। রাজনৈতিক চালে ভুল ক্রটি হইয়াই থাকে, তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়া নিজের কার্য্য প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া স্বরাজের পথে পুনরায় নূতন উৎসাহে অগ্রসর হওয়া গৌরবের বিষয়। বৃথা তর্কজাল সৃষ্টি করিয়া কাউন্সিলবর্জ্জন ও কাউন্সিলে প্রবেশ এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করায় বিশেষ উপকার হয় না।

বেতাল।

বন্যা ও গবর্ণমেণ্ট

এতদিন পরে উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িতের সাহায্যকল্পে ৩০০০০৲ হাজার টাকা মঞ্জুর করিবার জন্য বঙ্গীয়গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভায় একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। এত দিন পরে যে গবর্ণমেণ্ট জাগিয়াছেন সেটা শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু লোকে এখন গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন সাহায্য চায় না। যে গবর্ণমেণ্টের মুখপাত্র বর্দ্ধমানের মহারাজা দেশবাসীর বিগলিত হৃদয়কে ভাবুকতার নিদর্শন বলিয়া শ্লেষ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, এবং গবর্ণমেণ্ট এখানে business lineএ কারবারের হিসাবে চলে, এখানে দানদাক্ষিণ্যের কোন কথা উঠিতে পারে না বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন, সেখানে গবর্ণমেণ্টের এই দান গ্রহণ করিবার জন্য কেহই উদ্‌গ্রীব হইবে না। যেখানে হৃদয় কাঁদে না, সেখানে লোকদেখান এই দয়ার কোন মূল্য নাই।

আমরা গবর্ণমেণ্টের এই 'দান' চাই না; তবে ক্ষতিপূরণের দাবী করি। মিঃ জে, চৌধুরী মহাশয় তদন্ত করিয়া, রেলওয়ে লাইনে উপযুক্তসংখ্যক জলপ্রণালীর অভাবের দরুণই এই প্লাবন হইয়াছে, সে বিষয়ে পরিষ্কার মত দিয়াছেন। এমন কি তিনি বলিয়াছেন যে ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া সেক্রেটরী অফ্ ষ্টেটের নামে মোকদ্দমা চলিতে পারে। চৌধুরীমহাশয় আইনজ্ঞ, রাজনীতিতেও মডারেট, এ বিষয়ে তাঁহার মত উপেক্ষা করা যায় না। গবর্ণমেণ্টের পাব্‌লিক্ হেল্‌থের ডিরেক্টর ডাঃ বেণ্টলীও রেলওয়ে লাইনের দোষ দিয়াছেন। Y. M. C. A. এর সেক্রেটরী মিঃ ট্রটার বলিয়াছেন, যে জর্ম্মান যুদ্ধে বেলজিয়াম ও ফরাসী দেশের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, এখানে বন্যায় সেইরূপই দুর্দ্দশা হইয়াছে। জার্ম্মানীর নিকট হইতে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, কিন্তু এখানে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে কে?

সেবা-যজ্ঞ

কলিকাতা অপার্‌সার্কুলার রোডস্থ বিজ্ঞানমন্দির (Science College) আজ পরমতীর্থে পরিণত হইয়াছে। এ পুণ্যতীর্থের অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারের সেবাযজ্ঞের পূজারী, ঋষিপ্রতিম আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁহার আহ্বানে দেশবাসী যে ভাবে সাড়া দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই আশার কথা, গৌরবের বিষয়। দুর্দ্দশাক্লিষ্ট নারায়ণের সেবায় কিছু দিয়া কৃতার্থ হইব, এত বড় ভাবে সমগ্র দেশবাসী ইহার পূর্ব্বে উদ্‌বুদ্ধ নাই।

শুনিতে পাই, প্রকৃতি তাহার সকল কাজেরই প্রতিশোধ না দিয়া বা না নিয়া থাকিতে পারে না। এ ব্যাপারেও মনে হয় প্রকৃতি রুদ্র সংহারিণী মূর্ত্তিতে যেরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, অন্ন হীন বস্ত্র হীন গৃহ হীন ও সম্বলবিহীন করিয়া যেরূপ নির্ম্মমভাবে নিপীড়িত করিয়াছে, অন্যধারে তেমনি লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে সহানুভূতি ও করুণার ধারাও সেইরূপ আশাতীত অননুভূতপূর্ব্ব প্রবলবেগে প্রবাহিত করাইয়াছে। এবার যেরূপ প্রবল বন্যা হইয়াছে—অতি বৃদ্ধ লোকেরাও নাকি এরূপ পূর্ব্বে আর দেখেন নাই। এই বৃহৎ প্লাবনে—দেশের হৃদয়েও এক বৃহৎ প্লাবন বহিয়াছে। কোথায় সুদূর কাশ্মীরে কোন্ বাঙ্গালী আছেন, কোথায় পাঞ্জাবে কে বাঙ্গালী থাকেন, কোথায় জয়পুর, কোথায় উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ, কোথায় বার্ম্মা—যেখানে, যতদূরেই—বাঙ্গালী রহিয়াছেন সেই অতি দূর হইতেও বাঙ্গালী আপন রক্তের টানে, হৃদয়ের স্পন্দনে সাড়া দিয়াছেন। যিনি যাহা পারেন, অতি বড় হইতে সামান্য পর্য্যন্ত যাহা পারিয়াছেন, ক্লিষ্টনারায়ণের ক্লেশনিবারণার্থ দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। ভিখারী—যার ভিক্ষার উপর দিনান্তের উদরান্নের সংস্থান সেও তার দিনের উপার্জ্জিত অর্থ বা চাউল নিঃশেষে দান করিয়াছে।

অনেক নারী—যাহাদের সমাজে স্থান নাই—তাহারাও তাহাদের মাতৃহৃদয়ের প্রেরণায় স্থির থাকিতে পারে নাই। তাহারা জানে—দেশের লোক তাহাদের ঘৃণা করে, অন্তঃপুরে তাদের প্রবেশ নিষেধ—সমাজে তাহারা পতিতা—এ সব জানিয়া শুনিয়াও তাহারা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া, ভিক্ষালব্ধ বস্ত্র অর্থ কুণ্ঠিতচরণে অশ্রুসজলনেত্রে আচার্য্যের পায়ে অর্ঘ্য দিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে। কোথাও কোথাও প্রশ্ন উঠিয়াছে এ অর্থ নেওয়া উচিত কি না? কেহ বা বলিতেছেন সংগৃহীত অর্থের ভিতর তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থও হয়ত দিতেছে। তাহা গ্রহণ করা যায় কি না? কে কোথায় কত খানি পাপী, কত বেশী অপরাধী, বিচারকর্ত্তা ভগবান সে বিচার করিবেন। হৃদয়ের যে প্রেরণায়—যে-ই হউক না কেন—শুধু দিয়াই কৃতার্থ হইতে চাহিতেছে সেই প্রেরণায় যে মহৎ জিনিষ আছে তাহা শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করিলে সেইখানে ভগবানেরই দর্শন মিলে। আর, কে জানে, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে কার মনের গতি কোন্ পবিত্র ধারায় প্রবাহিত হইবে? এক মহৎ কাজ অন্য মহত্তর কাজের জন্মদাতা।

এইরূপ নানা রকম হৃদয়ের নানা প্রেরণায়, দেশে যে একটা প্লাবন আসিয়াছে তাহা দেশের পক্ষে খুব বড় আশার কথা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্ররায় বলিয়াছেন, এই ভাণ্ডারের অধিকাংশই দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রের দানের সমষ্টি। ধনীসাধারণ অপেক্ষা দেশের জনসাধারণই (mass) ইহার প্রধান দাতা। তাই মনে হয়, সরকার বাহাদুরের দয়ার উপর প্রত্যাশা না রাখিয়া এই যে আত্মনির্ভরতা—এই যে আপন ভাব—এবং এই যে ঐক্য, এখানেই স্বরাজসাধনার—স্বরাজলাভের মূলমন্ত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

তুরস্কের সুলতান

তুরস্কের সুলতান ও সমগ্র মুসলমানজাতির খলিফাকে সরাইয়া দিয়া এঙ্গোরা গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত মুসলমানের মত কাজ করিয়াছে কি না তাহা লইয়া অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের খিলাফতকমিটি এ পর্য্যন্ত মুসলমানধর্ম্মের দোহাই দিয়া এঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ছিলেন। এখন তাঁহারা কামালপাশাকে সমর্থন করিতে পারেন কিনা তাহা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছে। এঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানধর্ম্মের খলিফা, তুরস্কের সুলতানের শক্তি বাড়াইয়া দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে যখন কামালপাশা গ্রীকদিগকে এশিয়া মাইনর হইতে তাড়াইয়া দিয়া, শেষে কনষ্টাণ্টিনোপাল পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসিলেন, তখন শুধু খেলাফৎকমিটি নয়, ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলমানগণ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তারপর কনষ্টাণ্টিনোপালে গিয়া রাজনৈতিক

কারণেই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, তুরস্কের সুলতানকে খলিফাপদচ্যুত করিয়া সুলতানের পরিবার হইতে অন্য একজনকে খলিফা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কোন কোন মুসলমান বলিতেছেন যে ইহা কামালিষ্টদের রাজনৈতিক চাল মাত্র, তাহারা মুসলমান-ধর্ম্মের কোন ধার ধারেন না। এমনকি "ইংলিশম্যান্" প্রমুখ কাগজগণ এবং ইংরেজেরাও হঠাৎ মুসলমানধর্ম্মের ভক্ত হইয়া পদচ্যুত খলিফা সুলতানকে আবার খলিফা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। এমন কি সুলতানকে ভারতবর্ষে আনিয়া এদেশের মুসলমানদের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করার কথাও উঠিয়াছে। কিন্তু সার সৈয়দ আমির আলি ও আগা খাঁর ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যখন মুসলমান ধর্ম্মের পক্ষ হইতে কামালিষ্টদের কার্য্য সমর্থন করিয়াছেন, তখন মনে হয় যে খলিফা নিয়োগ ব্যাপারে নির্ব্বাচন প্রথা ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। কামালপাশার অধীনস্থ Young Turk এর দল আর যাহাই হউন না কেন, তাহারা ভক্ত মুসলমান বটে!

ইসলাম ও ভারত

খিলাফৎ মুসলমানের একান্ত নিজস্ব। ভারতবর্ষ নানা জাতি ও ধর্ম্মের পান্থনিবাস। তথাপি এই বিচিত্রমনা ভারতবর্ষই একদিন স্বরাজকামনায় মুসলমানের খিলাফতকে নিজস্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। সেই আগ্রহের মূলে কতটুকু সত্য ছিল আর কতটুকু সুনীতি ছিল তাহা সূক্ষ্ম বিচারের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু একথা সত্য যে এই সাধনার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মিলন সূত্র গ্রন্থিবদ্ধ হওয়া সহজ হইল। এ মিলন, পথের মিলন। ধর্ম্মে ও তত্ত্বে, রীতি ও নীতিতে, গৃহে ও সমাজে যত প্রভেদই থাকুক না কেন, একই পথে কিছুকাল যাত্রার জন্য একটা সুদৃঢ় গ্রন্থির বন্ধন গড়িয়া উঠিতেছে। সে পথ মুসলমানের জেহাদ্, হিন্দুর নৈষ্কর্ম্য,—সমগ্র নব্য ভারতের অসহযোগ।

তথাপি ইহা পথ মাত্র। আজ খিলাফতের নূতন জয়লাভে যদি স্বরাজ-সাধক মুসলমানের পথ ভিন্ন হয়, তবে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এবং সেই পথে যদি ভারতবাসী অ-মুসলমান (non-Mahommedan) সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তাহাতেও দোষ দেওয়া যায় না। কেননা পন্থাটাই শুধু এক হইয়াছিল, হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর সমান মন কিম্বা সমান হৃদয় হয় নাই। আজ তাই জাতীয় রাষ্ট্রে খিলাফত 'নীতির' অন্তরালে খিলাফতকে আশ্রয় করিয়া ইসলামের যে বিরাটপ্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে তাহাকে জানিতে হইবে, অ-মুসলমান ভারতবাসীর হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশে কোথাও তাহার স্থান আছে কি না দেখিতে হইবে।

হিন্দুমুসলমানের মিলনের জন্য অসহযোগ নীতির ন্যায় আরও বহুতর সূত্র বা নীতির নাম করা যাইতে পারে, যথা অন্তর্বিবাহ, অন্তর্ভোজন, বহুল-শিক্ষাপ্রচার, অস্পৃশ্যতা নিবারণ প্রভৃতি। হয়ত এই সমস্ত আচরণ বা নীতির অনুষ্ঠানমাত্র দ্বারা এই মিলন সম্ভব হইতে পারে। নাও হইতে পারে। সে বিচার এখন থাকুক। আপাততঃ দেখা যাক্ যে পাশ্চাত্য ইউরোপের বিভিন্ন নেশনকে একীকরণের বহু আয়োজন, যুক্তি ও নীতিকে উপেক্ষা করিয়া যেমন বাঁচিয়া থাকিবার একটা বিরাট্ অধিকার-সাম্য (Economic-Democracy) সমগ্র পশ্চিমকে একাকার করিতেছে, বর্ত্তমান বৃহৎ-ইসলামের জাগরণের মধ্যেও সেইরূপ কোনও প্রাণস্পন্দন আছে কিনা যাহা জাতি-ও-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মুসলমান কি অ-মুসলমান সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিতে পারে।

শরীর ও মন লইয়া মানুষ। শরীরকে বাঁচাইয়া রাখা তাহার সহজাত-প্রবৃত্তি, আদিমতম চেষ্টা। এই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহাকে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, সেই

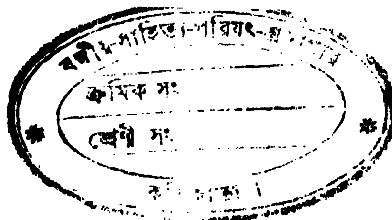
খাদ্যকে নিরাপদে রক্ষণ ও সম্ভোগের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এমনি করিয়া তাহার দল ও নেশন গড়িয়া উঠিল।

মানুষের চঞ্চল মনেরও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিজের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করা, এবং প্রথমাবধি আজ পর্য্যন্ত কোনও দিন সে তাহা হইতে বিরত থাকে নাই। মনুষ্য-কল্পনার একটী প্রাচীনতম অন্নপান ভগবান, । এই ভগবান ও জীবনের সমস্ত ঘটনাকে লইয়া মানুষের মন যাহা রচনা করিতে লাগিল তাহাতেই তাহার ধর্ম্ম ও সমাজ গড়িয়া উঠিল।

দেশ ভেদে যেমন মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী ভিন্ন হইয়াছে, তেমনি তাহার ধর্ম্ম ও সমাজও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই, কি রাষ্ট্রে, কি ধর্ম্মে ঐকান্তিক অধিকারের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে প্রবল থাকিয়া গণ্ডীর মধ্যে গণ্ডী, স্তরের পর স্তর সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া একদিকে যেমন একটির পর একটি রাজা, বাদশা, অভিজাত, বণিক প্রভৃতির উদ্ভব হইয়া জনসমাজ ছাইয়া গিয়াছে এবং মানুষের সহজ জীবনের উপর বৈষম্যের কঠিন শৃঙ্খল পড়িয়াছে, অপরদিকে ঠিক তেমনই গুরু, পুরোহিত, পোপ, লামা প্রভৃতি ধর্ম্মের বিস্তৃত রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই বৈষম্যের বন্ধন কঠিনতর করিয়াছিল। বাঁচিয়া-থাকার সমান-অধিকারের বলে ধনী ও রাজার বৈষম্য আজ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম ও সমাজে বৈষম্য আজিও প্রবল।

পৃথিবীর মধ্যে যে কয়টী বৃহত্তম ধর্ম্ম ও সমাজ বর্ত্তমান আছে, ইসলামের মধ্যে স্তরবিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা কম। আল্লার কাছে প্রত্যেক মুসলমান সমান। এবং মুসলমানের চোখে ভগবানের কোনও প্রতিনিধি বা অবতার নাই। মুসলমান তিনটী জিনিস জানে আল্লা, তাঁহার দাস মহম্মদ, আর সেই আল্লাকে যে স্বীকার করে সেই মুসলমান। মুসলমানের কাবা আছে, কিন্তু কাবার অধিপতি—ঈশ্বরের কোনও প্রতিনিধি—নাই। ইসলামের কোন কুলগত বা রাষ্ট্রনিযুক্ত পুরোহিতশ্রেণী নাই। সন্ন্যাসী নাই, কিন্তু আদর্শ সন্ন্যাসী-জীবন আছে।

ইসলাম ঈশ্বরকে সহজ ভাবে স্বীকার করে, জীবনকে সরলভাবে গ্রহণ করে, বর্জ্জন করে না। আল্লার স্বরূপ আল্লাই, সেই আল্লার উপাসনায় আমীর হইতে কুলী ও মজুরের আসন একই স্তরে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনাকাঙ্ক্ষার দিনে খিলাফত নীতি বা অন্তর্ব্বিবাহের সমস্যা ছাড়াও বৃহৎ-ইস্লামের ধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত এই সার্ব্বজনীন গণ-সাম্যের (social democracy) সুর স্মরণ রাখা ভাল। এই গণ-সাম্যের কথা স্মরণ রাখিলে ভারতের বাহিরের ঐ খিলাফত বা ইসলামের সঙ্গে মন ও হৃদয় দিয়া মিলিবার আন্তরিক বাধা কাটিয়া যাওয়া সহজ হইতে পারে।



নব্যভারত

চত্বারিংশ খণ্ড] পৌষ, ১৩২৯ ৯ম সংখ্যা

কবীরের প্রেমসাধনা

(১)

কবীরের যদি পরিচয় দিতে আমি চেষ্টা করি তাহলে একটু আগে থেকে বল্‌তে হবে। পূর্ব্বে রামানুজের সময় হতে আচারি সম্প্রদায় চলে আস্‌ছিল। আচারি বৈষ্ণবসম্প্রদায় খুব আচার মেনে চলতেন, তাঁদের আচারের বন্ধন খুব বেশী ছিল। যেমন খাওয়ার সময় কেউ দৃষ্টি দিলে তাদের খাওয়া বন্ধ হোত, "দৃষ্টি দোষ" হত। যিনি প্রথম অনাচারী হন তিনি হলেন গুরু রামানন্দ। কাহারও কাহারও মতে তিনি রামানুজের ৫ "পীঢ়ি" অর্থাৎ ৫ জন গুরুর পরে। আচার নিয়েই রাঘবানন্দের সঙ্গে তাঁর লাগ্‌ল। বিরোধ এতদূর বেড়ে উঠ্‌ল যে রাঘবানন্দ তাঁকে বললেন যে "তোমার ধর্ম্ম বুদ্ধিতে যদি বাধে তাহলে তুমি তোমার নতুন মত নিয়ে নতুন দল গড়ে তোল। আমাদের এতকালকার পুরাণো সম্প্রদায়ের উপর আঘাত করোনা। দোহাই তোমার, এত কালের জিনিসটার উপর হাত চালিও না। নতুন কিছু করতে হয় যে তুমি নিজে আলাদা করে নেও।"

রামানন্দ বেরিয়ে এলে পরে রামানুজ সম্প্রদায়ের মধ্যে রাঘবানন্দই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হয়ে উঠ্‌লেন। রামানন্দের মনের মধ্যে এই যে নতুন একটি বিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল বোধ হয় রাঘবানন্দের সঙ্গে ভাগ হয়ে যাবার অনেকদিন পূর্ব্বেই সেটার সূত্রপাত হয়েছিল। কারণ, দেখ্‌তে পাই রামানন্দ সমস্ত ভারত ঘুরে এলে, তাঁর দলের লোকেরা তাঁকে আর গুরু বলে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। কেননা তিনি তার আগেই আচার ভঙ্গ করেছিলেন।

আরো দেখ্‌তে পাই, রামানন্দের প্রধান শিষ্যেরা সবাই প্রায় অন্ত্যজ। সেই সময় নারীদের হীন বলে মনে করা হোত। তিনি তাঁদেরও শিষ্য করে নিয়েছিলেন। নারী সাধিকাদের মধ্যে রামানন্দের শিষ্যা পদ্মাবতী আমাদের এমন অনেক জিনিস দিয়ে গেছেন যার মূল্য হয় না। তা ছাড়া তাঁর আর একটি শিষ্যার নাম ক্ষেমশ্রী। তিনি জাতে ছিলেন গোয়ালা। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ক্ষেমশ্রীর একটি কবিতা তাঁর Personality নামক গ্রন্থে অনুবাদ করবার প্রলোভন ছাড়তে পারেন নি।

কবীরও গুরু রামানন্দের অন্ত্যজ শিষ্য। তবে কেমন করে তিনি রামানন্দের শিষ্য হলেন তার নানা রকম ব্যাখ্যা চলিত আছে। এ বিষয়ে গুরু রামানন্দের মান বাঁচাতে গিয়ে

অনেক ভক্তিগ্রন্থ অদ্ভুত সব গল্প চালিয়েছেন। গল্প আছে, একদিন কবীর অন্ধকারে রামানন্দের স্নানের পথে শুয়েছিলেন। কবীরের গায় রামানন্দের পা লাগে। তাতে রামানন্দ "রাম" "রাম" বলে উঠেন। কবীর বললেন, "তবেই ত তুমি আমার গুরু হলে। আমি তোমার কাছে "রাম" নাম মহামন্ত্র পেলাম।" এই রকম করে কবীরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও শিষ্যত্ব হয়। রামানন্দের ৭২ জন অপ্রধান শিষ্যের মধ্যে প্রায় ৫৬ জন হীনজাত বা অন্ত্যজ। প্রধান শিষ্যদেরও অধিকাংশই অতি নীচ ও ছোট জাতির লোক।

কবীর সন্ন্যাসীও ছিলেন গৃহস্থও ছিলেন। তিনি বল্‌তেন, সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে প্রাচীরের মত কোন ব্যবধান নাই। যিনি সংসারী তিনিও সন্ন্যাসী হবেন, এই তাঁর মত ছিল। কারণ তিনি বলতেন :—

কঁহৈ কবীর অস উদ্যম কীজৈ।
আপ জীয়ৈ ঔরনকো দী জৈ ॥"

অর্থাৎ এতটা শ্রম তোমার করা দরকার যাতে তুমি আপনি জীবনধারণ করে আর ও দুচার জনকে বেঁচে থাক্‌তে সাহায্য করতে পার।

যাঁর সংসারের ভার আছে ও পরিশ্রম করার শক্তি আছে তিনি অন্যের পরিশ্রমের ফলের ভাগ নিতে পারেন না। যতক্ষণ শক্তি আছে কেন পরিশ্রম করবে না? তাই তিনি তাঁত বুনে শেষ পর্য্যন্ত নিজের জীবিকা নিজে উপার্জ্জন করেছেন। তিনি সন্ন্যাসী অথচ তিনি বিবাহ করলেন। শত্রুরা নিন্দা করতে লাগল। তারা বলতে লাগ্‌ল—"যাহোক, বিয়ে করেছেন বটে কিন্তু তাঁর সন্তান হবে না।" পরে যখন তাঁর সন্তান হল শত্রুরা খুব খুসী হল। তারা বল্‌ল "ডূবা বংশ কবীরকা জবহি উপজা পুত্র কমাল" অর্থাৎ কবীরের পুত্র কমাল যে জন্মাল তাইতেই কবীরের বংশ, অর্থাৎ গুরু-শিষ্য ক্রমে সন্ন্যাসীর যে সম্প্রদায়ের ধারা তা ডুব্‌ল।

যেদিন তাঁর সন্তান হবে সেদিন তিনি আগে থাক্‌তে তা বুঝতে পারেন নি। বাজারে গিয়াছিলেন সূতা কিন্‌তে। নিন্দুকের দল ভিড় করে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, তাঁকে খবর দিয়ে জব্দ করবে বলে। তিনি কাপড় বিক্রি করে, সূতার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসছিলেন পথে জনতা দেখে অবাক হলেন। বড় আনন্দে তারা সবাই বল্‌লে—কবীর, তোমার পুত্র হয়েছে। তারা ভেবেছিল, কবীর বুঝি কথাটী শুনে মুষড়ে যাবেন। কবীর প্রসন্ন হয়ে সূতোর বোঝাটি কাঁধ থেকে নামিয়ে ছয়টি পংক্তি উচ্চারণ করিলেন। মানবশিশুর জন্ম সম্বন্ধে এই রকম কথা আর কোথাও বলা হয়েছে কিনা জানি না। টেনিসন De Profundis নামে যে কবিতাটি লিখেছেন সে এর চেয়ে অনেক দীর্ঘ অথচ তাতেও যে গভীর কথাটুকু এবং মানব-জীবনের যে রহস্যটুকু তিনি বুঝিয়ে বলতে পারেন নি, কবীর ছয়টি মাত্র পংক্তিতে তা অনায়াসে বলে গেছেন। তিনি বললেন :—

"অহদ মুসাফির পহুনা আয়া ধরো মঙ্গল থার।
ঘর আংগনকী কদর ভয়ী হৈ রাহ্ হ্বৈ গুলজার॥
জনম মরণমেঁ কদম তুমহারা অরস ভয়াহয় কাল।
মেরা ঘরমেঁ ডেরা লাগায়া পায়া হাম কমাল।

কৌনসী সেবা করিহোঁ তুমকো কোন করিহোঁ পূজা।
পংথ পংথী ঘর একহি হৈজী ভার মিটা অব দূজা ॥"

এই যে আমার পুত্র সে অসীমের যাত্রী। অসীমযাত্রার সাধনা করবার জন্য দুচার দিনের জন্য সে আমার ঘরে অতিথি এসেছে। তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য শুভ অর্ঘ্যের থালটি সাজিয়ে ধর। আজকে আমার ঘর, আমার আঙ্গিনা অর্থাৎ আমার ঘরের ভিতর বাহির আজ তার যথার্থ কদর পেয়েছে। এই ক্ষুদ্র যাত্রীটি তার যাত্রাপথ খানিকে একেবারে পুষ্পিত করে আমার ঘরে এসেছে। "হে অসীমের যাত্রী আমার পুত্র, জন্ম ও মৃত্যু তোমারই অসীম যাত্রার এক একটি পা ফেলা ও পা তোলা। জন্ম মৃত্যুর মধ্যে পা ফেলে তুমি চলেছ, কাল তোমার কাছে হার মেনেছে। আমার ঘরেতে যে তুমি এসে আশ্রয় নিলে, আমি তাতে কমাল অর্থাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হলাম। কেমন সেবা বলত তোমায় আমি করি? সেবা আবার কি? তোমাকে আমি কোন্ পূজা দিয়ে ধন্য হব? আজ আমার সব দ্বৈত-ভাব ঘুচে গেছে, আজ প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছি যিনি অসীম লক্ষ্য হয়ে বিরাজমান তিনিই অসীমের যাত্রী হয়ে সেই লক্ষ্য লাভের সাধনায় যাত্রা করেছেন। আর তিনি পথ হয়ে অসীম-যাত্রীকে অসীম লক্ষ্যের দিকে উপনীত করে দিচ্ছেন।" শত্রুরা নিস্তব্ধ হয়ে চলে গেল। এই যে কমাল অর্থাৎ পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন বলে কবীর বল্‌লেন, তাতেই পুত্রের নাম হল "কমাল"। এবং পরে যখন তাঁর কন্যা হল তারও নাম রাখলেন "কমালী"।

কবীরের যে কি প্রভাব উত্তরভারতে আছে তা যাঁরা উত্তর ভারতে ভ্রমণ করেছেন তাঁরা ছাড়া কেউ জানেন না। তিনি ভগবানকে নিজের গুরু মেনে নিয়েছিলেন! তিনি বলেছেন, আমি অসীমের বার্ত্তা এনেছি, গুরু রামানন্দ আমায় চৈতন্য দিয়াছেন। কিন্তু আমার গুরু বলতে এক ভগবান।

"প্যাস অহদকা সাথ হাম লায়া রামানন্দ চেতায়ে"।

অসীমের তৃষ্ণা নিয়ে আমি এই জগতে এসেছি। রামানন্দ আমার চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছেন; কারণ আমি যে কিসের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছিলাম সে আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। সে তৃষ্ণা যে অসীমের তৃষ্ণা, জন্ম মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে এই তৃষ্ণার সূত্র ধরেই আমি চলেছি, এ কথা ভুলেই গিয়াছিলাম। চেতনা যিনি দিলেন, তিনি গুরু রামানন্দ। তবে সত্য গুরু যদি বলতে হয়, তবে সে স্বয়ং ভগবান। তিনি এই অসীমের তৃষ্ণা দিয়েছেন, তিনিই প্রতিদিন আমার সেই বন্ধন ক্ষয় করে, তাঁর দিকে আমাকে অগ্রসর করে নিচ্ছেন। তাঁরই উপলক্ষ্য হয়ে রামানন্দ আমার গুরু হয়েছেন। একজন ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক তাঁকে তাঁর সাধনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছিলেন, "তোমার সাধনার পথটি আমায় বুঝিয়ে বল্‌তে পার?"

কবীর বল্লেন "পথ কি আমি দেখেছি? রাত্রি ছিল অন্ধকার। তাঁর বাঁশীর সুর শুধু কানে আস্‌ছিল। মন আমার উদাস যখন হোলো, তখন কি আর পথের খোঁজ খবর নিয়েছি? পাগলের মত সুর শুনেই এগিয়ে চলেছিলাম।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "কে তোমার গুরু?" তখন কবীর গান গাইলেন—

"বাঁসুরী জব মোহে ডগরা ধরাঈ।
রৈন অন্ধেরী রহী কারী বাদরনসে,
ডগরা মোহে কৌন দিখাঈ।
ঠাড়ী কোঈ দেখত অপনে অংগনসে,
জিন্‌হে কভী বাঁসুরী বুলাঈ।
ডগরা মোহে কৌন দিখাঈ।
ডর নাহি কুছো, ডগরা ন পুছো
বাঁসুরী সুনত কবীরা বঢ় জাঈ।
আজি বালম বুলাবত আন্‌হর কে পারসে
কৌন বেসরম আজ তোর সাথ জাঈ॥

• পথ আমি জানি না, সেই বাঁশরী যখন আমায় রাস্তায় বের করল, যখন বাঁশরী আমাকে পথে ডাক দিলে, তখন রাত্রি ছিল অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন। আমার ভীত প্রাণ বল্‌তে লাগ্‌ল, "কে আমাকে পথ দেখাবে?"

যে সমস্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তেরা (বশিষ্ঠ, নারদ খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি যাঁরা বাঁশী শুন্‌তে পেয়েছিলেন, বাঁশরী শুনে যাঁরা বেরিয়েছিলেন, তাঁরা, নিজের নিজের আঙ্গিনার দরজা খুলে এসে দাঁড়ালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে আমাকে পথ বলে দেবে? তাঁরা বল্‌লেন, যিনি তোমায় এবং আমাদেরও বাঁশীতে ডাকছেন তিনিই পথ বলে দেবেন। পথ জিজ্ঞাসা করো না। বাঁশী শুনে আজ বেরিয়ে পড়; সোজা চলে যাও। জীবনবল্লভ অন্ধকারের পার হতে আজ তোমায় ডেকেছেন; প্রেমের মিলনবাসরে তোমার সঙ্গে তাঁর আজ গভীর মিলন হবে। কে এমন নির্লজ্জ আছে, আজ যখন তুমি প্রিয়তমের কাছে বাসরঘরে চলেছ, তখন সাথে সাথে পথ দেখাবার জন্যে সেও সেখানে যাবে।

আজ রাত্রি বাদল অন্ধকার। বাঁশী দিয়ে তিনি ডাকছেন, তিনি দিনে ডাকলে আলো দিয়ে ডাকতেন কিন্তু রাত্রে ডেকেছেন যে, পথ দেখতে পাবেনা, শুধু বাঁশী শুনে নির্জ্জনে অন্ধকারে তাঁর প্রেমস্বরূপের ভিতরে ডুবে যাবে। যিনি গুরু তিনি এভাবেই পথ দেখাচ্ছেন। রামানন্দ শুধু আমার মনের মধ্যে এই ভাবটিকে সচেতন করে দিয়েছেন।

এর পরেই সেই পণ্ডিতটীর সঙ্গে কবীরের যে প্রসঙ্গ হল (কবীরপন্থীদের সাধনার শাস্ত্রে এই সব প্রসঙ্গকে "বহস্" বলে) কবীরের প্রেম সম্বন্ধে প্রসঙ্গের মধ্যে এটী একটি উল্লেখযোগ্য "বহস্"। এই প্রসঙ্গে কবীর বল্‌লেন যে ভগবানকে প্রেম দিয়েই সাধনা করতে হবে। সেই পণ্ডিতটী জিজ্ঞাসা করলেন—যাঁকে প্রেম দিয়ে তুমি সাধন করবে তাঁর স্বরূপ কি? কোথায় তাঁর নিবাস? কেমন তাঁর প্রকাশ?" কবীর বললেন—

ঐসা লো নহি তৈসা লো।
মৈঁ কেহি বিধি কহো গম্ভীরা লো।
• ভীতর কহূঁ তো জগময় লাজৈ, বাহর কহূঁ তো ঝুটা লো॥
বাহর ভিতর সকল নিরন্তর চিত অচিত দউ পীঠা লো।
দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর বাতন কহা জাঈ লো॥

তিনি কোন একটা জায়গায় আছেন, একথা ভাবলে ভুল হবে। যদি বলি তিনি এমন নয় তিনি তেমন, তাহলে ভুল হবে। তিনি যে কেমন তা আমি কি করে, কি কথা দিয়ে বুঝিয়ে বল্‌ব? এ বড় গভীর কথা। যদি আমি বলি যে তিনি ভিতরে আছেন তাহলে বাইরের বিশ্বজগৎ লজ্জায় মরে যাবে। যেমন, যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামী চিন্‌তে না পারেন তাহলে সে স্ত্রীর তো আর লজ্জা রাখবার জায়গা হয় না। তেমি তিনি যদি বলেন এই বাহিরের বিশ্বজগতে আমি নাই, তাহলে এত বড় বিরাট ব্রহ্মাণ্ড এক পল কাল কোন লজ্জায় বেঁচে থাকে? যদি বলি, তিনি বাইরে আছেন তাহলে আবার আমার অন্তরাত্মা লজ্জিত হয়—এবং সেকথা মিথ্যাও হয়। বাহির এবং ভিতর সকলকে নিরন্তর করে তিনি এক করেছেন। বাহির ও অন্তর অচেতন ও সচেতন তাঁর পাদপীঠ। তিনি দৃষ্ট একথা বল্‌তে পারি না, আবার তিনি অপ্রকাশিত একথাও বল্‌তে পারি না। তিনি অপ্রকাশিতও বটে, অগোচরও বটে; বাক্যে ইহা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। তবে বাইরের আচার অনুষ্ঠানের ভিতর তাঁকে পাই না, একথা বল্‌তে পারি না কিম্বা পাই তাও বল্‌তে পারিনা। তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে জলে ভরা কুম্ভ জলের মধ্যে রেখেছি তার বাহিরেও জল ভিতরেও জল। এমনি আমার বাহিরে ও অন্তরে তিনি বিরাজিত।

"জল ভর কুম্ভ জলৈ বীচ ধরিয়া বাহর ভীতর সোই।
উনকা নাম কহনকো নাহি দূজা ধোখা হোই ॥"

বাহিরেও তিনি ভিতরেও তিনি তবে সব জিনিসেই যদি তিনি প্রকাশিত তবে তিনি স্বতন্ত্র হয়ে প্রকাশিত হন না কেন? তিনি বাহির ও ভিতর উভয় স্থানই পূর্ণ করে আছেন, তাই আলাদা করে তাঁকে জানি না। তিনি বিশ্বের আত্মা, বিশ্বের জীবনেশ্বর তাই তাঁর নাম নাই। যদি কেহ তাঁর নাম দেয়, তবে তিনি আমাদের হতে আলাদা হয়ে যান। মানুষ নাম দিয়ে পরকেই ডাকে নিজেকে তো নাম দিয়ে কেউ ডাকে না। যেমন স্ত্রী স্বামীর নাম ধরে না। নাম ধরলে স্বামী স্ত্রী হতে আলাদা হয়ে যান, কিন্তু স্ত্রী ও স্বামী যে এক। তাই তাঁর নাম ধরতে নাই। তিনি বিশ্বনাথ, বিশ্ব যদি তাঁর নাম নেয়, তবে তিনি যে বিশ্ব হতে আলাদা হয়ে যান। তিনি কি বাইরের আলাদা জিনিস?

উনকা নাম কহনকো নাহি দূজা ধোখা হোই ॥

পণ্ডীতটী কবীরকে বল্‌লেন এসম্বন্ধে যে তত্ত্বটী আপনার মনে প্রত্যক্ষ হয়েছে তা আপনি সকলের কাছে প্রচার করেন না কেন?" তিনি বল্‌লেন "এ ভাবে ধর্ম্মপ্রচার আমার কাজ নয়। অতি তীব্র ভাষায় বলেছেন যে, জলের কলসী নিয়ে সকলকে "জল খাও জল খাও" বলে বেড়ানটা কাউকে উপকার করা নয়।

"পানী প্যারত ক্যা ফিরো ঘর ঘর সাগর বারি।
তৃষাবংত জো হোবৈগা পীবেগা ঝখ্‌মারি ॥"

আর এমন জল খাইয়ে ফিরবার দরকারই বা কি আছে? প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরেই অনন্তরসের সাগর। যেদিন পরমাত্মার জন্য তৃষ্ণা জাগবে সেদিন সকলে নিজের মধ্যে যে অমৃতরস আছে, তৃষ্ণার দায়ে ঠেকে সেই জল পান কর্‌তেই হবে।

"পিবৈগা ঝখমারি"।

তৃষ্ণা জাগাও, অন্তরে তৃষ্ণা জাগাও; যেদিন প্রেম জাগ্রত হবে সেদিন আপনি তৃষ্ণা আস্‌বে; প্রেম জাগাও। এই প্রেম যেদিন জাগ্‌বে সেইদিন বৈরাগ্যও আস্‌বে অথচ সংসারের প্রতি যে বিরাগ, বিতৃষ্ণার নামান্তর তা আসবে না। সংসারের মধ্যে কবীর প্রেমে পূর্ণ হয়ে থাক্‌তেই বলেছেন। তিনি বলেছেন সংসার আমার বাপের বাড়ী, ব্রহ্মধাম স্বামীর বাড়ী। স্বামীর বাড়ীকে ভালবাসতে হবে বলে যে বাপের বাড়ীর প্রতি বিদ্বেষ জন্মাতে হবে একথা ভেবো না। এই সংসারেই তাঁকে জান্‌তে পেরেছি, স্বামীর বাড়ী না গেলে যেমন নারীর জীবন সার্থক হয় না তেমনি পরমাত্মাকে না জান্‌লে জীবাত্মার কোন সার্থকতাই হয় না। যেদিন স্বামীকে চিনেছি, সেদিন বাপের বাড়ীর সকল আকর্ষণ সহজে ছেড়ে গেছে, বিদ্বেষ থেকে নয়, ঘৃণা থেকে নয়; এই প্রেমেরই বলে। এই প্রেমকে জাগ্রত কর। এই প্রেমের বলেই বালিকা মা হয়। একটি ছোট বালিকা যে সন্ধ্যাতেই ঘুমিয়ে পড়ত, আজ সে মা হয়ে রাত দুটোতেও না ঘুমিয়ে বসে আছে; কেননা তার ছেলে ঘুমুচ্ছে না। ভগবান এই প্রেমই সকলের মধ্যে দিয়েছেন। বালিকাকে শুধু মা করে দিয়েছেন; আর কোন উপদেশ দিতে হয় নি। অথচ শিশুর দাসীকে সহস্র উপদেশ দিয়েও ঢের কথা বাকী থেকে যায় এবং পদে পদেই তার সেবার ত্রুটি হয়ে যায়। মাকে বিধাতা শুধু প্রেম দিয়েই নিশ্চিন্ত আছেন। প্রেম দিয়েছেন বলে আর কিছুই তাঁকে শেখাতে হয়নি। ভগবান তার ভবিষ্যত-সাধক শিশুদিগকে ঘরে ঘরে মায়েদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। টাকা পাঠাননি, রসদ পাঠাননি, মায়ের হৃদয়ে শুধু প্রেম দিয়েছেন। এই প্রেমের বলেই মা কি তার নিজ সব সুখ ত্যাগ করতে পারবে? পারবে। স্বামীর জন্য নিজের দেহ পর্য্যন্ত তো এই প্রেমের বলেই সে জালিয়ে দেয়!

"সতী কো কৌন শিখারতা হৈ
সঙ্গ স্বামীকো তন জারনা জী।
প্রেম কো কৌন শিখারতা হৈ
ত্যাগমাহি ভোগকা পানা জী॥"

"সতীকে প্রেম দিয়েই বিধাতা নিশ্চিন্ত হয়েছেন, স্বামীর জন্য তাকে যে পুড়ে মরতে হয় এ শিক্ষা কে তাকে দিলে? ত্যাগের মধ্যেই যে ভোগকে পেতে হবে এই শিক্ষা প্রেমকে কে দিলে?"

একটিমাত্র পংক্তিতে কবীর প্রেমের একটী পরিপূর্ণ সংজ্ঞা (definition) দিয়াছেন। প্রেম কি? না "ত্যাগের মধ্য দিয়া ভোগকে পাওয়া।" প্রেমের এই মজা সে ত্যাগ করে অথচ ভোগও করে; সে কিছুই রাখে নি অথচ সবই পেয়েছে।

ত্যাগের মধ্য দিয়ে যে পরমানন্দ মেলে তা যে কত গভীর, কত মধুর ও সুন্দর তা কেবল সেই বৈরাগীই জানেন যিনি বৈরাগ্য দিয়ে প্রেমকে গভীর ও মধুর করে ভোগ কচ্ছেন। ভগবান এই বৈরাগী-প্রেমের রহস্য জানেন, তাই বিশ্বে যেমন তাঁর প্রেমের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, তেমনি সর্ব্বত্র বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ রয়েছে।

এই প্রেমের মধ্যে কামনার স্থান নাই। যে অমৃত দেবতার পানীয় তা দানব এসে খেতে চাইলে হবে কি? সে অমৃতের আনন্দই ত সে জানে না।

"সূর পরকাস তঁহ রৈন কঁহ পাইয়ে
রৈন পরকাস নহি সূর ভাসৈ।
জ্ঞান পরকাস অজ্ঞান কঁহ পাইয়ে
হোয় অজ্ঞান তঁহ জ্ঞান নাসে॥
কাম বলবান তঁহ প্রেম কঁহ পাইয়ে
প্রেম জঁহ হোয় তঁহ কাম নাহী́।
কহৈঁ কবীর যহ সত্ত বিচার হৈ
সমঝ বিচার দেখ মাহী॥

সূর্য্য যেখানে প্রকাশিত সেখানে রাত্রি পাবে কেমন করে? রাত্রি যেখানে বিরাজমান সেখানে সূর্য্য নাই। যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ সেখানে অজ্ঞানের স্থান কই? অজ্ঞান যদি থাকে তবে জ্ঞানকে পালাতে হয়। কাম যেখানে বলবান সেখানে প্রেম কোথায় থাকে? প্রেম যেখানে বিরাজমান কাম সেখানে নাই। কবীর বলেন এই আমার সত্য সিদ্ধান্ত। একথা আমি বাইরে থেকে বলছিনা; অন্তরের মধ্যে বিচার করে' দেখ তুমি তোমার অন্তরেই একথার সাক্ষ্য পাবে। বাইরের থেকে পাবার কোন দরকার নেই।"*

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

স্বপ্ন

বাল্যে অনেক দুঃখ পাইয়াছি। ভাবিতাম, যৌবনে সুখের ফোয়ারা ফুটিবে। আকাশ হইতে অজস্র অর্থ বর্ষিত হইবে। দারিদ্র্য ঘুচিবে। পেট ভরিয়া খাইব—ইচ্ছানুরূপ পরিব, সুখে ঘর সংসার করিব—আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লইব।

কিন্তু যৌবন যখন আসিল, তখন সুখ জিনিসটা যেন সাথে আনিতে ভুলিয়া গেল। ধরা খানা সুন্দর মূর্ত্তি ধরিল, প্রকৃতি ফলে ফুলে সাজিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জ পুঞ্জ সৌন্দর্য্য ছড়াইতে লাগিল। জীবনের সম্মুখে সবই জিনিষ থরে থরে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কেবল জিনিষটাতেই আমার যেন স্বত্ব নাই। চক্ষু দেখে, কিন্তু ছুঁইবার অধিকার নাই। কানে কত সঙ্গীতের রব শুনি কিন্তু একটা গানও গাইতে পারি না—গলায় সুর নাই। জীবন সঙ্গীতময় নহে, সংগ্রামময়। মানুষ শত শত রশ্মির কথা বলে। কিন্তু আমার চোখে যেন ধাঁধাঁ লাগিয়া গিয়াছে, রশ্মির বদলে অন্ধকার দেখি।

ধর্ম্মের নামে আত্মীয়গণকে কত কষ্ট দিলাম। ঈশ্বর প্রেমময়, কিন্তু পাগলামির নাম তো প্রেম নহে। যে মায়ের মুখে জগন্মাতার মুখ দেখিতে পারে না, সে যে ধর্ম্মের ক খ ও শেখে নাই, তখন তাহা বুঝিতাম না। তাই মাকে ছাড়িয়া জগন্মাতাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম,

---

* বক্তৃতা হইতে গৃহিত।

মা কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইলেন—অকালে বৃদ্ধ হইয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন! কিন্তু পার্থিব মাতার বুকে ছুরি হানিয়া জগন্মাতাকে পাইলাম কি?

জগন্মাতা মুখ ঢাকিলেন। শান্তির নামে তরল গরল পান করিলাম। পৌত্তলিকতা ছাড়িয়া নিরাকারের উপাসনা করি। কিন্তু সম্মুখে কি যেন ছবি। প্রাণটা ঐ ছবির পানে প্রধাবিত হইতেছে। ঈশ্বর ও ছবি উভয়েরই উপাসনা করি—বরং ছবির পূজা অধিক। এযে মায়া মরীচিকা। কিন্তু মরীচিকাই তখন জল ছিল। জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতাম। স্বপ্ন যে স্বপ্ন, তাহা ও জানিতাম। তবু প্রাণটা স্বপ্নে ডুবিয়া থাকিতেই ভালবাসিত। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জীবনের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় সকলি স্বপ্নে মিলাইয়া গেল। মানুষ হইয়া মানুষের ছায়ার মতন জীবন যাপন করিতে লাগিলাম।

জীবনটা শুধু স্বপ্নই নহে। প্রাণের ভিতর প্রবৃত্তি নামে একটী উপদেবতাকে দেখিলাম। ঐ প্রবৃত্তি আমার স্কন্ধে চড়িয়া যথা ইচ্ছা লইয়া যায়। আমি যাহা করিতে চাহি না, তাই—আমি করি। সে আমার স্কন্ধ হইতে নামে না। যত তাহাকে নামাইতে চেষ্টা করি, সে তত আমাকে ভূতের ন্যায় জড়াইয়া ধরে। হায়রে! মানুষ হইয়া আমি পশু হইয়া পড়িলাম! অথবা পশুর ও অধম। পশুদেরও একটা পশুবুদ্ধি আছে। তাহারা সেই বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া কিছু করে না। আমি যে তদপেক্ষাও অধম। বিবেক নামে একটা জিনিষ প্রাণের ভিতর আছে। কিন্তু সে বিবেকের কথা শুনিয়া যে চলনা—চলিতেও পারিনা। বিবেকের নামে বিধবা মাকে কাঁদাইলাম কিন্তু বিবেকের নামে পাপের উপর জয় লাভ তো করিতে পারিলাম না। পাপ যে সাপের ন্যায় ক্রমাগতই কাটিতেছে। প্রাণের বৃত্তিগুলি পাপের সেবায় ক্রমাগত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইতেছে। উৎসাহ, উদ্যম, সকলই প্রাণ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে। সংগ্রামে পরাজয়। পূজা করিতে বসি, পূজার ঘর ও ভূতের আলয়। অপবিত্র অশুদ্ধ জীবনে ব্রহ্ম জ্যোতি কোথায়? কেবল অন্ধকার—নিরেট অন্ধকার! জীবন বিভীষিকায় পরিপূর্ণ! কোথা শান্তি? কোথা সুখ? কোথায় পবিত্রতা? কোথায় স্বর্গ? আমি যে নরকের কীট! আমি যে নরকের আগুনে পুড়িয়া মরিতেছি!

প্রবৃত্তির মূল পাই নাই। বিষাদের কারণ পাই নাই। প্রবৃত্তি ভূতের ন্যায় ঘাড়ে চাপিয়া আছে। বিষাদ প্রাণের ভিতর মহা অন্ধকার স্থাপন করিয়াছে। সেই অন্ধকারে বসিয়া প্রাণ স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নের আগাগোড়া নাই। ছাই ভস্ম। হা হুতাশ! তবু বিষন্ন জীবন ও জীবন। অস্তিত্বহীন কে হইতে চায়? স্মৃতি ও কল্পনা সোণার পাহাড় গড়ে। সে পাহাড়ে রূপার ঝরণা ঝরায়। শত গাছে শত ফুল ফুটায়—শত ডালে শত বিহগের কাকলী তোলে। তারপর? তারপর কিছুই নাই। শুধু স্বপ্ন। ঐ পাহাড়ের স্থানে প্রকাণ্ড সাহারা মরু আসিয়া দেখা দিয়াছে—রৌদ্র ও তাপ ধূ ধূ করিতেছে। এ স্বপ্ন কেন দেখি? এ জীবন ভরা ধূ ধূ কেন?

কেনর উত্তর নাই। বুদ্ধি কথাটা বোঝেনা। মন যুক্তি শাস্ত্র পড়ে নাই। কেহ কোন একটা যুক্তি দিলেও মন তাহা মানে না। এ ক্ষেত্রে যুক্তি বালির বাঁধ। প্রবৃত্তির একটা ঢেউ বিষাদের একটা তরঙ্গ সে বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলে। শূন্য প্রান্তরে শুধুই ধূ ধূ।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

চীনে কথা

চীনে গ্রামে বাস করিবার সুযোগ আমার ঘটে নাই। রেলগাড়ীতে বসিয়া দূর হইতে কয়েকটী চীনেগ্রাম দেখিয়াছি ও তাহাকে বসিয়া চীনের গ্রাম্য সমাজের বিবরণ পড়িয়াছি। কাওলুন হইতে কাণ্টনে যাইতে দুইপাশে ধানের ক্ষেত। তাহাতে চীনে পুরুষ ও স্ত্রী হল-চালনা করিতেছে। গ্রামের রাস্তা অতি সঙ্কীর্ণ, দুই চাকার গাড়ী দুইটী পাশাপাশি যাইতে পারে না। চীনে গ্রামে যে এক চাকার গাড়ী চলে, তাহা কাণ্টনের রাস্তায় দেখিয়াছি। তাহাতে মানুষও চড়ে, বোঝাও চাপান হয়। মানুষ যখন সেই গাড়ীতে চড়ে, তখন তাহাকে তাহার আসনের দুই পাশে দুই পা ঝুলাইয়া ঘোড়ায় চড়িবার মত বসিতে হয়। গাড়ী চলিবার সময় তাহার পা যাহাতে মাটিতে না ঠেকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। গাড়োয়ান গাড়ী ঠেলিয়া নিয়া যায়। এছাড়া গরু ঘোড়া বা গাধায় টানে এমন গাড়ীও আছে। শোভাযাত্রা চীনে লেগেই আছে। আমি কাণ্টন যাইবার সময় পথে এক গ্রামে দেখিলাম এক শোভাযাত্রা চলিয়াছে। বাজনদারেরা শিঙ্গা, বাঁশী, প্রভৃতি বাজাইতেছে। জনকয়েক বেহারার কাঁধে রঙ্গীন কাপড়ে মোড়া দুইটী ডুলিতে বসিয়া দুই জন। বাজনদার ও অনুচরবর্গ গ্রামের সঙ্কীর্ণ পথে সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। রেলগাড়ী হইতে গ্রামের দুইটী দৃশ্য চোখে পড়ে। প্রথম, পাহাড়ের গায়ে রংকরা সমাধিস্থানগুলি। দেখিলেই মনে হয়, জীবিত মানুষদের বাসগৃহগুলির জীর্ণ সংস্কার হয় না বটে; মৃতদেহের বিশ্রামস্থানের যত্ন নিতে কিন্তু ক্রটী হয় না। দ্বিতীয় দৃশ্য প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক বা একাধিক টাওয়ার। এবাড়ীগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত। অপর সব বাড়ী হইতে অনেক বেশী উঁচু। অপর বাড়ীগুলি দেখিয়া মনে হয়, পুরাণো কাঁচাবাড়ী, সামনের বর্ষার ঝড়ে টিঁকিবে কি না সন্দেহ। এ টাওয়ার গুলি পাকাবাড়ী। মনে করুন, কলিকাতায় হেরিসন্‌রোড ও কলেজষ্ট্রীটের মোড়ের উত্তরে প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা ৺শরৎকুমার লাহিড়ীর নূতন বাড়ী। লম্বায় চওড়ায় ছোট, অতি ছোট বাড়ী; কিন্তু উঁচু মনে করুন ছয় সাত তালা। আমি গ্রামের চারিপাশের দেওয়াল ও গ্রামের ঘরগুলি সহজেই চিনিতে পারিলাম। কিন্তু জীর্ণ ঘর-গুলির পাশে ঐ উঁচু ঝক্‌ ঝকে পরিষ্কার টাওয়ার কি জন্য করা হইয়াছে বুঝিতে পারিতে-ছিলাম না। দুইটী চীনে যুবক আমাকে বলিয়া দিল ও গুলি গ্রামের মহাজনের দোকান ঘর। মহাজন সোনা রূপার অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া গ্রামের লোককে টাকা ধার দেয়। যুবক দুইটী হাসিতে হাসিতে আমাকে দেখাইয়া দিল এক গ্রামে তিনটী বন্ধকের দোকান।

চীনে গ্রাম্যসমাজের বিবরণ পড়িয়া আমি তাহাতে প্রহেলিকা বা দুর্ব্বোধ্য রহস্য কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার মনে হইল, আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের চিত্র। মোটামুটি খুটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য আছে বটে; সে কয়টী কথা মনে রাখিলে যাঁহারা আমাদের দেশের পল্লীসমাজের সহিত পরিচিত, তাঁহাদের চীনে পল্লীসমাজ বুঝিতে

কিছু মাত্র বেগ পাইতে হইবে না। মাঝে মাঝে সাদৃশ্য এত বেশী, যে মনে হয় যে চীনে পল্লীসমাজ দেখিবার জন্য চীনে না আসিয়া বাংলা দেশে বাস করিলে ও চলে। একটা চীনে কথার ইংরাজী অনুবাদ সব ইংরাজী বইয়ে পাওয়া যায়, ছেটো পাদ্রী হইতে সুরু করিয়া তীক্ষ্ণধী মহামনা বার্টরাণ্ড রাসল্ পর্য্যন্ত সকলেই সে ব্যাপারটাকে যেন একটা প্রহেলিকা-ময় চীনেরহস্য মনে করিয়াছেন। ইংরাজীতে তাঁহারা বলেন, The Chinaman's eagerness "to save his face" কথাটা বাংলায় বলিলে বাঙ্গালীর নিকট ইহাতে রহস্য কিছুই থাকেনা। বাঙ্গালী পল্লীসমাজে ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। "সমাজে মুখরক্ষা" করিতে কোন্ হিন্দু যত্নবান নয়? "সমাজে মুখরক্ষা" কথাটা যে আমরা চীনে ভাষা হইতে ধার করিয়াছি আমার তো তা মনে হয় না। ছেলেবেলা হইতে ওকথা শুনিতেছি ও পড়িতেছি। মার্কিন ও ইংরাজের নিকট কথাটা নূতন হইতে পারে। আমাদের নিকট অতি পুরাতন ও সনাতন।

সাধারণ চীনে আজ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় জীব নহে। প্রধানতঃ সে সামাজিক জীব। তাহার ব্যক্তিগত জীবন, তাহার পারিবারিক জীবন ও তাহার সমাজিক জীবন লইয়াই সে ব্যস্ত। নিজের দেশে ও যেমন, যে সব বিদেশে সে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে সেসব দেশেও তেমনি। বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করিতে গিয়া সেদেশের রাষ্ট্র-নীতি নিয়া সে মাথা ঘামায় না, নির্ব্বিবাদে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলেই সে সন্তুষ্ট। সে-দেশের রাষ্ট্রনীতি যতক্ষণ তাহাকে, তাহার পরিবারকে বা তাহার চীনে সমাজকে বাঁধিতে চেষ্টা না করে ততক্ষণ সেদেশের রাষ্ট্রনীতি সাপ না বেঙ্, তাহা জানিতে সে ব্যস্ত নয়। সমগ্র চীনদেশকে রাষ্ট্র বলিয়া দেখিতে সে আজও শেখে নাই। চীনের লোকেরা যে এক "নেশান" (nation) সমষ্টিভাবে তাহাদের যে একটা জাতীয়জীবন আছে, তাহা সে আজও বোঝে না। তাহার ফলে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতি ব্যাপারে চীনের সাধারণ লোকের দৃষ্টি কিছুদূর গিয়া আর যায় না। তাহার দৃষ্টির পরিসর অতি সঙ্কীর্ণ। আমাদের দেশের অবস্থা ও ঠিক এই। কলিকাতায় এক বাড়ীতে আমি বাস করিতাম। আমার প্রতিবেশী ছিলেন একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। তাঁহার বা তাঁহার বাড়ীর কাহারও সহিত আমার মনোমালিন্য ত ছিলই না, সৌহার্দ্দ্যই ছিল। তিন চারি দিন দেখা গেল তাঁহার বাড়ির উপরতালা হইতে কাগজে মোড়া দুর্গন্ধ আবর্জ্জনা আমার বাড়ীর প্রবেশদ্বারের ঠিক সম্মুখে, পায়ে চলিবার রাস্তার উপরে আসিয়া পড়িয়া জমা থাকিত। আমার চাকর তাহাতে আপত্তি করাতে আমার প্রতিবেশীর বাড়ীর একজন ভদ্রলোক আমার চাকরকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের বাড়ীতে ময়লা ফেলি না, সদর রাস্তায় ফেলি, চোপ্ রহো।" আমার চাকরকে আমি বলিলাম, "তুমি কিছু বলিও না, আমি বুঝাইয়া বলিব।" বলা বাহুল্য যে আমি বলিবার পর আর কাহাকেও আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে বা আমার বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়ে ফুটপাথে আমার প্রতিবেশীর বাড়ীর জাকারজনক আবর্জ্জনা দেখিতে হইত না। ওটা যে আবর্জ্জনা উহা যে প্রীতিকর দৃশ্য নহে, তাহা আমি যেমন জানিতাম, আমার প্রতিবেশীর বাড়ীর লোকেরাও ঠিক তেমনিই

জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই প্রতিদিন তাঁহাদের বাড়ি হইতে তাহা দূর করিয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহাদের বাড়িতে ওটা যেমন অশোভন, ফুটপাথেও উহা তেমনই অশোভন, সে জ্ঞান ততটা তাঁহাদের ছিলনা। তাঁহাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে সে বিষয়ে দৃষ্টি ছিল; কিন্তু সে দৃষ্টির সীমা ছিল, তাঁহাদের বাড়ীর দেয়াল পর্য্যন্ত। রাস্তা তাঁরও নয়, রাস্তা আমারও নয়। রাস্তা যে অদৃশ্য ব্যক্তিসমষ্টির সে সমষ্টির সহিত তাঁহাদের কোনও সম্পর্ক নাই। থাকিলেও তাহা শুধু খাদ্য-খাদক সম্বন্ধমাত্র। রাস্তা দিয়া যাহারা যাতায়াত করেন তাঁহাদের সহিত ও কোনও সম্পর্ক নাই। সুতরাং রাস্তা পরিষ্কার রাখিবার দায়িত্ব তাঁহারও নাই, আমারও নাই। আমাদের এই সনাতন স্বদেশীভাব, চীনেও বর্ত্তমান। জাপান ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। জাপানে একটা সহরেও কলিকাতার মত ভাল বাঁধানো পরিষ্কার রাস্তা নাই। বৃষ্টি হইলে জাপানের রাস্তায় কাদা; বৃষ্টি না হইলে যত চাও তত ধূলা। জাপানী তাহাতে কাতর নহে, সে কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া রাস্তায় চলে ও সে খড়ম কখনও ঘরের ভিতরে নেয় না। খড়ম জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলেই হইল। রাস্তা খারাপ, সে দোষ জাপানের মিউনিসিপ্যালিটীর। সহরের অধিবাসী প্রত্যেকে তাহার বাড়ী বা দোকানের সম্মুখে রাস্তায় জল দিয়া দিনে অন্ততঃ দুইবার ধূলা মারিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিতে পাইবে। চীনের গ্রামের সরকারী রাস্তা মাঠের ভিতর দিয়া। বর্ষাকালে দুই পাশের মাঠ হইতে জল আসিয়া রাস্তা ডুবাইয়া দেয়। ক্রমে রাস্তা খাল হইয়া দাঁড়ায়। চীনেপ্রবাদ বলে, "বয়স হইলে বৌ হয় শাশুড়ী, আর রাস্তা হয় নদী।" রাষ্ট্রের সঙ্গতি ও নাই, সামর্থ্য ও নাই যে এ বিশাল মহাদেশের অসংখ্য গ্রামের রাস্তা মেরামত করে। গ্রামের অধিবাসিদের দৃষ্টি তো রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। রাস্তা তাহাদের নয়। আর গ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের ভার যে গ্রাম্য পঞ্চায়তের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা প্রাচীন সভ্যতার কুহকে আমাদের ন্যায় শান্তিতে জাগিয়া ঘুমাইতেছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসল্ বলেন—পাশ্চাত্য মানব একটা কিছু করিতে ব্যস্ত, চীনে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত শান্তিতে থাকিতে পারিলেই সন্তুষ্ট।

চীনেদের মতে তাহাদের সভ্যতার মূলে তিন শিক্ষা—(১) কং ফুচের প্রচারিত আদর্শ ও শিক্ষা—(২) লা-ও-ৎজীর প্রচারিত পথ ও (৩) বৌদ্ধধর্ম। কোন ও একজন মহাপুরুষ চীনের সভ্যতাকে ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবার চেষ্টায় সফল হইয়াছেন কি না, ইহার উত্তরে কাহারও নাম করিতে হইলে বলিতে হয়, উত্তরচীনের কং ফুচ্। তাঁহার আদর্শে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার সবই আছে। মানুষ রাষ্ট্রের সমাজের ও পরিবারের অঙ্গীভূত। আদর্শ সজ্জন রাষ্ট্রে সমাজে ও পরিবারে উর্দ্ধতন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতা ও নিম্নতন ব্যক্তির হীনতা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রতি আচরণে সৌজন্য অভ্যাস করিবেন। মানুষের প্রকৃতিকে সংযত ও নিয়মিত করিবার জন্য কংফুচ এক সজ্জনের আদর্শ সম্মুখে ধরিয়াছিলেন ও রাষ্ট্রে সমাজে ও পরিবারে, সকল সম্বন্ধে, সেই আদর্শানুযায়ী নিয়মে সাধারণ মানুষের ছোট বড় সকল দৈনিক আচরণকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একটা বাঁধাবাঁধির চেষ্টা যেখানে, সেখানে নিয়মশৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক।

দক্ষিণ চীনের লা-ও-ৎজীর মতে মানুষ স্বভাবতঃ সৎ। তাহাকে স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হইতে দেও, দেখিবে সে আপনাআপনি সুজন হইবে। নিয়ম-শৃঙ্খলের কোন প্রয়োজন নাই। প্রাচীন চীনের পথ বা "তাও" এই শৃঙ্খল-মুক্তির পথ। চীনেশাস্ত্র মতে, 'তাও' কি, তাহা যাহারা জানে তাহারা বলেন', যাহারা বলে তাহারা জানেনা। সুতরাং আমার ন্যায় অজ্ঞানীর 'তাও" সম্পর্কে কিছু না বলাই গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক হইবে। এই দুইটী হইল চীনের স্বদেশী শিক্ষা। তারপর ভারতের শুদ্ধ বৌদ্ধমত বিকৃত হইয়া চীনসমাজে প্রভাব বিস্তার করে। চীনেরা বলে চীনসমাজ বিশাল সাগর, তাহাতে অনেক নদীর ধারা আসিয়া মিশিয়াছে, সব জলই শেষে লোনা সাগরজল হইয়াছে। মহম্মদের মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্ব্বে, খ্রীষ্টীয় ৬২৮ সালে একদল আরব নৌকা করিয়া মদিনায় বন্দর য়ান্বূ হইতে চীনের কাণ্টন সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহারা চীনসম্রাট তাইৎসুংএর রাজসভায় আরবে প্রচারিত মহম্মদীয় একেশ্বরবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। চীন সম্রাট তাঁহাদের নূতন ধর্ম্মমতের কথা শুনিয়া তাহাতে ভীত হইবার কোনও কারণ খুঁজিয়া পান নাই। আরব সওদাগরেরা কাণ্টনে এক মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। সেই পুরাতন মস্‌জিদ্ আজও বর্ত্তমান। তারপর খ্রীষ্টীয় ৬৩১ সালে পারস্য দেশ হইতে এক দল খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক আসিয়া সম্রাট তাইৎসুংকে তাঁদের ধর্ম্মমতের কথা বলেন। সম্রাট তাঁহাদের ধর্ম্মমতের কথা শুনিয়া খ্রীষ্টিয়ান্ শাস্ত্রগ্রন্থ চীনে ভাষায় অনুবাদ করিতে বলেন। অনুবাদের পর ৬৩৮ সালে রাজসভা হইতে ঘোষণা প্রচারিত হয় যে এ নূতন ধর্ম্মে দোষের কিছু নাই, চীনদেশে এ ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে। সম্রাটের অনুমতি পাইয়া খ্রীষ্টিয় নগণও এক ভজনালয় নির্ম্মাণ করেন। মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান্ কেহই কিন্তু চীনে সমাজের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তাহা সাগরজলে মিশিয়া গিয়াছিল। অনেক সংগ্রামের পর বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে সমাজে স্থান পাইয়াছে। আজ বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম ও "তাও"মতের মঙ্গলপ্রদ ও অমঙ্গলনিবারক দেবদেবী চীনে জনসাধারণের ধর্ম্মবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকেন। অমর মানবাত্মা ও পরকাল লইয়া চীনে জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত কিনা জানি না। জাপানে এরূপ ব্যস্ততার কোনও পরিচয় পাই নাই। ওটা বোধ হয়, আমাদের নিজস্ব। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি, আমাদের উঠিতে ধর্ম্ম, বসিতে ধর্ম্ম, সূর্য্যোদয়ে ধর্ম্ম, সূর্য্যাস্তে ধর্ম্ম। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে পুণ্যার্জ্জনার্থী গঙ্গাস্নানযাত্রীর কথোপকথন মন দিয়া শুনিলে শোনা যাইবে যে তাহাদের আলাপে প্রতি দশ কথার এক কথা সেই নিত্য প্রয়োজনীয় "পয়সা"। পরকালে স্বর্গলাভ ও ইহকালে "পয়সার" আসক্তি এ দুইয়ের বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে আমরা যেমন পাকা নৈয়ায়িক, প্রয়োজন হইলে প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী চীনেও তেমনি নৈয়ায়িক হইতে পারে।

উত্তরচীনে শাণ্টুংএর এক গ্রামে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক এক সাহেব বাস করিতেন। সাহেবের সহিত গ্রামের লোকের সৌহার্দ্দ্য ছিল। এক পুত্রের পর যখন দ্বিতীয় শিশুপুত্র আসিয়া সাহেবের গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিল, তখন পাদ্রী সাহেবের উপর্য্যুপরি দুইটী পুত্র-সন্তান লাভের সৌভাগ্যে গ্রামবাসী চীনেরা এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী হইতে চাঁদা তুলিয়া সেই শিশুপুত্রের জন্য এক রূপার হার উপহার দিলেন। পাদ্রী সাহেব

এই সৌজন্যে প্রীত হইয়া গ্রামবাসীদিগকে বলেন যে গ্রামের হিতার্থ নিজব্যয়ে তিনি এমন কিছু করিতে চান, যাহাতে গ্রামের সকলে সন্তুষ্ট হইবে। পানীয় জলের জন্য গ্রামে ৪।৫টী কূপ আছে, তাহার একটী কূপ পাদ্রী সাহেবের বাড়ীর নিকট। কূপ হইতে জল তুলিতে অনেক পরিশ্রম হয় ও অনেক সময় লাগে। অনেককে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহারা জল তুলিবার পালা পায়। পাদ্রী সাহেবের বাড়ীর নিকটের কূপটীতে একটী পাম্প্ (Pump) বসাইলে, যে কেহ সে কূপ হইতে জল তুলিতে আসিবে তাহারই সুবিধা হইবে; পাম্পের হাতল চালাইয়া জল তোলা অতি সহজ। পাদ্রী সাহেব নিজব্যয়ে একটী পাম্প বসাইবার প্রস্তাব করেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, পঞ্চায়েৎ জানাইলেন যে বিবেচনা করিয়া যথাসময়ে বিচারফল প্রকাশ করা হইবে। চীনে উপাধিধারী গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় নিশ্চয়ই পঞ্চায়েতের একজন ছিলেন। বিচারের পর পঞ্চায়েৎ পাদ্রী সাহেবকে বলেন যে তাঁহাদের কয়েকটী প্রশ্ন করিবার আছে। প্রথম—গ্রামে ৪।৫টী কূপ আছে, "পাশ্চাত্য বিদেশী মেষপালক" কি প্রত্যেক কূপেই "জল চোষা" কল বসাইবেন? উত্তর পাওয়া গেল যে এত অর্থব্যয় করিবার সঙ্গতি নাই, শুধু একটী কূপে পাম্প বসান হইবে। তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন—মেষপালকের পুত্রসন্তানকে যে হাঃটী দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য গ্রামের প্রত্যেক পরিবার সমান চাঁদা দিয়াছিল। একটী মাত্র কূপে "জলচোষা" কল বসাইলে, যাহারা সে কূপ হইতে দূরে বাস করে তাহাদের প্রতি ন্যায় বিচার হয় কি? খ্রীষ্টধর্ম্ম ন্যায় ও সাম্যের আদর্শ প্রচার করে। ইহা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনুমোদিত আচরণ হইবে কিনা? তৃতীয় প্রশ্ন—তাঁহাদের গ্রামে এমন পরিবার আছে, যাহাদের এক কাঠাও জমি নাই। তাহারা কূপ হইতে জল তুলিয়া বাড়ী বাড়ী জল বিক্রয় করে। "জল চোষা কল বসাইলে কূপ হইতে জল তোলা সহজ হইবে। সুতরাং ঐ শ্রেণীর লোকের জীবিকাউপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইবে। মানব-মেষদলের হিতাকাঙ্ক্ষী পাশ্চাত্য মেষরক্ষক কেমন করিয়া ঐ লোকগুলির জীবিকাউপার্জ্জনের পথে অন্তরায় হইতে পারেন? পঞ্চায়েৎ জানাইলেন যে আরও একটী প্রশ্ন আছে। পাশ্চাত্য আবিষ্কার সকল যে, সে দেশের লোকের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু চীনে গ্রামবাসী নির্ব্বোধ। শোনা যায়, পাশ্চাত্য আবিষ্কারসমূহ "কালের সুতীক্ষ্ণ দন্তের দংশনে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মনে করুন, কয়েকবৎসর পর এই "জলচোষা" কলের সেই দুর্দ্দশা হইল, আর পাশ্চাত্য মেষরক্ষক তখন গ্রামে নাই। গ্রামের লোকের তখন অবস্থা কিরূপ হইবে? বলা বাহুল্য, এ ন্যায়ের তর্কে বেচারা পাদ্রীকে হার মানিতে হইয়াছিল। সনাতন দড়ী ও কলসী বজায় রহিল, কূপ হইতে হাতে জলতোলা হইতে লাগিল।

বান্ধবর শ্রীযুক্তরাধিকামোহনলাহিড়ী মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া এখন ফরিদপুর জেলায় গ্রামের হিতসাধনে নিযুক্ত। তিনি বলিবেন, পূর্ব্বের ঘটনা চীনে শাণ্টুং প্রদেশে নয়, বাঙ্গালায় ফরিদপুর জেলায় ঘটিয়াছিল। তাহা বলিলে, আমি নাচার। পুরাণো বনেদী ঘরের অকর্ম্মা ছেলে পেকিং এ ও যেমন, বারাণসীতেও তেমনি, রোমেও প্রায় তদ্রূপ। পার্থক্য খুব সামান্য।

২৩ শে জুন, ১৯২২ শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

মালিনী

"ভারতের শিক্ষিতা মহিলা" একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় উহার লেখক। অনেক দিন হইল এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্যাচার্য্য পরলোকগত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি এ দেশের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি বহিখানির বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ইতিপূর্ব্বে "ভারতের শিক্ষিতা মহিলা" আমাদের পাঠ করিবার সুযোগ হয় নাই; সম্প্রতি উক্ত গ্রন্থে প্রাচীন কালের কয়েকটি শিক্ষিতা ও ধর্ম্মশীলা নারীর জীবনের কাহিনী পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। আজ সেই সকল মহিলাদিগের মধ্যে তপস্বিনী মালিনীর জীবনচরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের আধ্যাত্মিক শক্তি বিস্তর নরনারীর অন্তরে আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, সেই সময়ে কাশী নগরীতে কৃকী নামক এক ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান রাজা ছিলেন। তিনিই হিন্দুধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের কঠোর আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের তাঁহার উপরে অতিশয় আধিপত্য ছিল। রাজা তাঁহাদের মন্ত্রণা ও উপদেশ অনুসারেই প্রজাপালন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে প্রয়াস পাইতেন। এই রাজার পরম স্নেহের কন্যার নামই মালিনী। মালিনীর অনুপম রূপলাবণ্য, বেদাদি হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান। রাজা তাঁহাকে উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। মালিনীর বয়স ষোল বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তবু তিনি কুমারী অবস্থায় পিতৃগৃহেই বাস করিতেছেন। রাজা ও রাণীর এই কন্যার প্রতি অতুলনীয় স্নেহ। শুধু তাহাই নহে; রাজপ্রাসাদে তাঁহার স্বাধীনতাও যথেষ্ট; তিনি ইচ্ছানুসারে অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। তিনি ব্রাহ্মণ প্রতিপালক পিতার মনোবেদনার ভয়ে, গোপনে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি এই রাজকন্যার অন্তরের অটল শ্রদ্ধা ছিল। তাই তিনি পিতামাতার অজ্ঞাতসারেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সেই ধর্ম্মের অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ভাবে আত্মহারা হইয়া মালিনী কঠোর সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে জ্ঞানের বিমল জ্যোতি ও আত্মায় এক অনুপম আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিল। তাহার পর বিশ্বপ্রেমে তাঁহার সুকোমল নারী-হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল।

কিন্তু এই রকম একটা ব্যাপার যে রাজপুরীতে অনেক দিন গোপন থাকিবে, তাহা ত কখনই সম্ভব নয়; একটি ঘটনাতেই রাজকন্যার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইল। একদিন মালিনী এক দল জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও সর্ব্বত্যাগী বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আলোকমণ্ডিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মালিনীর অন্তর ভক্তি ও পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সেই তপস্বীদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী ও অনেকগুলি ক্ষৌমবস্ত্র প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পরেই রাজকুমারীর সমস্ত গুপ্ত কথা

প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সহসা কাশী নগরীতে যেন এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। আগেই বলিয়াছি, মহারাজ স্বয়ং হিন্দুধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণদিগের রক্ষক। তাই কাশীর বিস্তর ব্রাহ্মণ, রাজকন্যার বিরুদ্ধে মহারাজার নিকটে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"মহারাজ, রাজকন্যা এখনো কুমারী, সম্পূর্ণরূপে আপনারই অধীন; তবুও তিনি বে-ধর্ম্মী বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগকে রাজ-প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্ব্বে আপনার অনুমতি গ্রহণ করিলেন না কেন? তিনি কোন্ সাহসে আপনার অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন? তিনি তাঁহার স্বাভাবিক কোমলতা ও দয়ার জন্যই যদি সন্ন্যাসীদিগকে খাদ্যসামগ্রী দান করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন, তবে ঐ সকল দ্রব্য তাঁহাদের মঠে পাঠাইয়া দিলেই ত হইত; ঐ সমস্ত ভিক্ষু-দিগকে রাজবাড়ীতে আহ্বান করিয়া আনিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? আসল কথা এই যে, রাজকন্যা রাজ্যলোলুপ বৌদ্ধদিগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া, এই পবিত্র কাশী নগরী বে-ধর্ম্মীদিগের হস্তে অর্পণ করিতে চাহেন। এই জন্যই আমরা প্রার্থনা করি, মহারাজ! আপনি সত্বর আপনার এই অবাধ্য কন্যাকে বারাণসী রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করুন।"

রাজা স্নেহময় পিতা হইয়াও ব্রাহ্মণদিগের অন্যায় অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি বাধ্য হইয়াই কন্যার প্রতি চিরনির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিলেন। ষোড়শ বর্ষীয়া রাজকন্যা মালিনীকে চিরদিনের জন্য পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু এই কঠোর দণ্ডের আদেশ শুনিয়া রাজকুমারীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি একটুকু ম্লান হইল না; তাঁহার মুখে বিষাদের রেখাটিও ফুটিয়া উঠিল না। তিনি পুলকিত চিত্তে পিতৃ আদেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। তবে তাঁহার স্নেহপরায়ণ পিতার নিকট একটি মাত্র প্রার্থনা ছিল। তাই তিনি রাজার সম্মুখে নির্ভীকচিত্তে অথচ নম্রভাবে দাঁড়াইয়া কহিলেন—"পিতা, আমার প্রতি আপনার যে সুগভীর স্নেহ, তাহার আর তুলনা কোথায়? আমি সেই স্নেহের জন্যই এতদিন পরম সুখে রাজান্তঃপুরে বাস করিয়াছি। এখন আপনার দণ্ডাজ্ঞা নত মস্তকে গ্রহণ করিয়া, রাজপুরী হইতে চলিয়া যাইবার নিমিত্ত মাত্র সাত দিন সময় প্রার্থনা করিতেছি। আপনি দয়া করিয়া আমার এই প্রার্থনা কি পূর্ণ করিতে পারিবেন না?"

রাজা কন্যার প্রার্থনা ত পূর্ণ করিলেনই; তাহা ছাড়া মালিনীকে বলিলেন—"প্রিয় কন্যা, তুমি কি নিজের জন্য কোনরূপ দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে চাহ? সে বিষয়ে তোমার মনের অভিলাষ কি?"

রাজকুমারী কহিলেন—"না পিতা; সুখের কোন সামগ্রীই আমি আর চাহি না। উহাতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। তবে আপনি যদি আমার প্রতি অনুগ্রহই প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আপনার চরণ তলে আমার একটি মাত্র মনের বাসনা প্রকাশ করিব। আপনার এবং এই কাশী নগরীর সমস্ত লোকের নিকট আমার অনেকগুলি কথা বলিবার আছে। আপনার অনুমতি পাইলেই সাত দিন এখানে বাস করিয়া সাতটি উপদেশের মধ্যে সেই কথাগুলি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব। তাহার পরেই নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিবার জন্য আমি এই নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।"

রাজা ন্যায়বান বিচারকই হউন আর ব্রাহ্মণদের রক্ষকই হউন, তিনি যে স্নেহময় পিতা; তাই কন্যার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, এই তরুণী রাজকুমারী সাত দিন নগরের লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিলে, কাহারই বা কি অনিষ্ট হইবে? কিন্তু তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা এক অপার্থিব শক্তিতে শক্তিশালিনী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় সত্য সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত বাণী শ্রবণ করিয়া নরনারীর চিত্ত এক অভিনব আধ্যাত্মিক ভাবে বিগলিত হইয়া যাইতে লাগিল। তপস্বিনীর আত্মার শক্তির কাছে বৌদ্ধধর্ম্ম বিরোধী ব্রাহ্মণদিগের পাণ্ডিত্য এবং পার্থিব শক্তি হার মানিল। সাত দিনের মধ্যে কাশীর রাজা, রাণী, রাজকুমার, রাজমন্ত্রী, রাজসৈন্য ও পণ্ডিতমণ্ডলী এবং নগরের দশ সহস্র পুরুষ ও নারী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সকলেরই মনে হইল রাজকন্যা ত মানবী নহেন, তিনি যে দেবী।

দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। রাজকন্যার যাহা বলিবার ছিল, তাহাও বলা হইল। তখন তিনি রাজাকে কহিলেন—"মহারাজ, আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, এইবার আপনি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করুন। আমি অদ্যই এই রাজপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।" রাজা কহিলেন, "প্রিয় কন্যা, আমি পিতা হইয়াও তোমাকে চিনিতে পারি নাই; তোমার মহত্ব, তোমার জ্ঞান, তোমার তপস্যা, তোমার অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শক্তি আমার ধারণা করাও অসম্ভব ছিল। কিন্তু এখন তোমার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া আমার জ্ঞানদৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে আমি সত্য ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তোমার নব ধর্ম্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আর কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি? তুমি কি দেখিতেছ না, কাশীর হাজার হাজার লোক বিমল জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, তোমার প্রচারিত নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এখন তুমি এই নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, কে তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবে? তাই বলি, তুমি আর সন্ন্যাসিনী হইতে পারিবে না; তোমাকে এই রাজপুরীতেই বাস করিতে হইবে।"

মালিনী কহিলেন—"মহারাজ, এই কাশী নগর কোলাহল পূর্ণ; তাহা ছাড়া ধনরত্নপূর্ণ রাজপ্রাসাদ শুধুই ভোগ বিলাসের স্থান; এরূপ জায়গা তপস্যার অনুকূল নহে। সেই জন্য আমাকে এই নগর পরিত্যাগ করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে যাইতেই হইবে। অতএব আপনি প্রসন্নমনে আমাকে এই রাজবাটী হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করুন।"

রাজা কহিলেন—"কাশীর নিকটেই সারনাথ তীর্থ; উহা অতি শান্তিপূর্ণ স্থান। তুমি সেই স্থানে বাস করিয়া তপস্যা এবং শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হও। তাহা ছাড়া নারীদিগের কল্যাণার্থ এক সুবৃহৎ বিদ্যালয় সংস্থাপন কর। আমি উহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ তোমার হস্তে প্রদান করিব। তুমি মহীয়সী নারী হইয়া বৌদ্ধ রমণীদিগের যথার্থ কল্যাণ সাধন কর।"

মালিনী পিতৃ আদেশের অনুবর্ত্তিনী হইয়া সারনাথে গমন করিলেন। সেই স্থানে দশ হাজার মহিলার বাসের উপযোগী বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মিত হইল। রাজকন্যা উক্ত গৃহে নারীদিগকে জ্ঞান এবং ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতে লাগিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি সাধন ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়াও তাঁহার নারীজন্ম সার্থক করিলেন।

শুনা যায়, এখনো সারনাথে এই তপস্বিনী রাজকন্তার স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু শুধু সারনাথে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন থাকিলে কি হইবে? এ দেশের প্রত্যেক নারীর অন্তরে এই প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলার স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠা প্রয়োজন। আমরা বর্ত্তমান সময় সাগর-পারের মহাত্মা জেনেরল বুথের প্রতিষ্ঠিত মুক্তিফৌজ সম্প্রদায়ের মহিলাদিগের ধর্ম্মজীবনের ও ত্যাগের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হই, কিন্তু আড়াইহাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই ভারতবর্ষেই যে কত রাজকুমারী, কত গৃহস্থের কন্যা তপস্যা ও ত্যাগের দ্বারা পুণ্যজীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র কাহিনী আমরা স্মরণ করিতেও পারি না। আমরা এ যুগে তাঁহাদের সন্ন্যাস গ্রহণের ও সংসার ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করিব না, করিবার কোন আবশ্যকও নাই। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের ও আশ্চর্য্য ত্যাগের আদর্শ হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করা, এ দেশের নারীদিগের একান্তই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। নচেৎ কিছুতেই আমাদের দেশ এবং সমাজ উন্নত হইয়া উঠিবে না।

আমার বলিতে আনন্দ হয় যে, কবি রবীন্দ্রনাথ এই রাজকন্তার অপূর্ব্ব জীবন হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার "মালিনী" নাটক রচনা করিয়াছেন। অনেক বৎসর পূর্ব্বে কবির কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে যখন এই উৎকৃষ্ট নাটকখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, আমি তখন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া উহার প্রথম অংশটি পাঠ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে জানিতাম না যে সেই অংশের সমস্ত কথাই কবির কল্পিত নহে; উহার অনেক কথাই সত্য; এবং সেই সত্য একটি পুণ্যবতী রাজকুমারীর জীবনের ঘটনা হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটক হইতে এ স্থানে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিলে আমার এই তুচ্ছ রচনাটি পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে এবং মালিনীর মহত্ত্ব ধারণা করিবার পক্ষেও তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইবে। তাই রবীন্দ্রনাথের সেই নাট্যকাব্যের প্রথমাংশ হইতে সামান্য গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

ব্রাহ্মণেরা মালিনীর নির্ব্বাসন দণ্ডের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া রাজমহিষী রাজাকে বলিতেছেন—

"নিশ্চিন্ত রয়েছ মহারাজ? ভাব মনে
এ কন্যা তোমার কন্যা, সামান্য বালিকা?
ওগো তাহা নহে। এ যে দীপ্ত অগ্নিশিখা!
আমি কহিলাম আজি শুনি লহ কথা—
এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা
এসেছে তোমার ঘরে। করিয়োনা হেলা;
কোন্ দিন অকস্মাৎ ভেঙে দিয়ে খেলা
চলে যাবে—তখন করিবে হাহাকার—
রাজ্যধন সব দিয়ে পাইবে না আর!"



রাণীর কথা শুনিয়া মালিনী রাজাকে কহিলেন—

"পিতা তুমি নরপতি,
রাজার কর্ত্তব্য কর। জননী আমার,
আছে তোর পুত্র কন্যা এ ঘর সংসার,
আমারে ছাড়িয়া দে মা! বাঁধিসনে আর
স্নেহ পাশে।"

রাজমহিষী কন্যাকে কহিলেন—

"মা আমার,
তুই কি জগৎলক্ষ্মী, জগতের ভার
পড়েছে কি তোরি পরে? নিখিল সংসার
তুই বিনা মাতৃহীনা, যাবি তারি কাছে
নূতন আদরে;—আমাদের কে আছে মা
তুই চলে গেলে?"

মালিনী কহিলেন—

"জন্মাবধি, চতুর্দ্দিকে সুখের প্রাচীর,
আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির
কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
ওগো ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ
নহি রাজসুতা—যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি!"

রাজমহিষী কহিলেন—

শুনিলে ত মহারাজ? এ কথা কাহার?
শুনিয়া বুঝিতে নারি! এ কি বালিকার?
এই কি তোমার কন্যা? আমি কি আপনি
ইহারে ধরেছি গর্ভে!"

রাজার উক্তি—

"যেমন রজনী
উষারে জনম দেয়। কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী
রজনীর কেহ নহে, সে যে বিশ্বজয়ী
বিশ্বে দেয় প্রাণ।"

মালিনী যখন রাজপুরীর অট্টালিকার বাহিরে নগরের লোকদিগের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার অপূর্ব্ব বাণী শ্রবণ করিয়া একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—

"ভাসি নয়নের জলে
মা তোমার কথা শুনে।"

সমস্ত লোক বলিয়া উঠিল—

"আমরা সকলে
পাষণ্ড পামর।"

রাজকন্যা প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন—

"আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা,
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ ব্যথা আছে সকলের পরে
অনন্ত প্রবাহে।"

মালিনীর অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মণগণই বলিয়াছিলেন—

"একি দেবী! এ কি বেশ! দয়াময়ী এ যে
এসেছেন ম্লানবস্ত্রে নরকন্যা সেজে!"

আমাদেরও কাশীর পণ্ডিতদিগের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া রাজকন্যাকে দেবী বলিতেই ইচ্ছা হয়। বর্ত্তমান সময় ভারতবর্ষে এইরূপ দেবীর, এইরূপ মহানারীর জন্মগ্রহণ কতই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে!

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়

ইতর প্রাণীদিগের বিষয়ে যতই আমরা আলোচনা করি ও জ্ঞান লাভ করি, ততই আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি যে, ইহাদের মধ্যে অনেকের এরূপ ইন্দ্রিয় আছে যে, মনুষ্যে সেরূপ ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান নাই। অথবা মনুষ্যের বিকাশ প্রক্রিয়ায় তাহা সম্পূর্ণভাবেই অন্তর্ধান করিয়াছে।

বিড়াল এবং সম্ভবতঃ অপর জন্তও, ভূমিকম্প হওয়ার পূর্ব্বে তাহা অনুভব করিতে পারে। জানা গিয়াছে যে, ভূমিকম্পের দুই দিবস পূর্ব্বেই বিড়ালের অস্থির ভাব প্রকাশিত হয় এবং কোনও মনুষ্যকর্ত্তৃক ভূকম্পনের প্রথম ধাকা অনুভূত না হইতেই, বিড়ালের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার কর্ণ পড়িয়া গিয়াছিল। *

একটী বাদুড়কে অন্ধ করিয়া দিয়া সরু তার দেওয়া প্রকোষ্ঠে ছাড়িয়া দিলে, সে তার এড়াইয়া উহাতে উড়িতে লাগিল। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের কি ব্যাখ্যা আছে? অথবা কোকিলশাবক, পিতা মাতা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কিছু কাল পরে যে

* কখন কখন বৃষ্টির পূর্ব্বে ভেকের ডাক এবং ঝড়ের পূর্ব্বে বক পক্ষীর আকাশে ভীত ভাবে উড্ডয়ন সাধারণ অভিজ্ঞতারই বিষয়।

ইংলণ্ড হইতে একা বিশাল স্থল ও জলভাগের উপর দিয়া পথ খুঁজিয়া আফ্রিকাতে পিতামাতার নিকট উপস্থিত হয়, তৎসম্বন্ধেই বা আমাদের কি ব্যাখ্যা দেওয়ার আছে?

কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞভাবে "জন্মগত সংস্কার" দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কথার কোন অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না। পক্ষীদিগের দেশান্তর গমনের সমগ্র বিষয়ই নিতান্ত রহস্যাবৃত। পক্ষী সকল যে অধিকাংশই রাত্রিতে বিদেশ যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়, ইহাতে বিষয়টীকে আরও অধিক রহস্যাবৃত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের এবম্প্রকার যাত্রায় এবং কুকুর ও বিড়াল যে বহু মাইল বিস্তীর্ণ অজ্ঞাত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আবাস স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে, এই সমস্তের ব্যাখ্যার জন্য ইহাদের দিঙ্‌নির্ণয়ের একটি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আছে, ইহাই মনে করিতে হয়।

কীটরাজ্যে আসিলে, আমরা এরূপ সব সমস্যার সম্মুখীন হই যে তৎসমস্তের সমাধানের জন্য ষষ্ঠেন্দ্রিয় বা সপ্তমেন্দ্রিয় স্বীকারের আমাদের একান্তই প্রয়োজন হয়।

লর্ড এভিবেরি (সার্ জন্ লাবক্) স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত পাটল বর্ণের অতি মাত্রার আলোকরেখা অনুভব করিবার শক্তি পিপীলিকাদিগের আছে। তিনি ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্ণের দ্বারা মনুষ্য যেরূপ-ভাবে সংক্রান্ত হয়, পিপীলিকা তদপেক্ষা ভিন্নরূপে সংক্রান্ত হইয়া থাকে।

পিপীলিকাদের মধ্যে অন্যরূপ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, একটী পিপীলিকা অপর পিপীলিকার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া জানিতে পারে :—

(ক) পথ যাওয়ার উপযুক্ত কিনা।

(খ) কোন্ দিকে পথ চিহ্নকারী পিপীলিকা চলিয়া গিয়াছে।

(গ) ঠিক্ কোন্‌দিকে আবাসস্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে।

তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, পিপীলিকাদিগের কাণ না থাকিলেও, তাহাদিগের যথেষ্ট বিকাশপ্রাপ্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয় আছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাহাদের শুঁড়ের মধ্যে অবস্থিত বলিয়াই অনুমিত হয়। এই শুঁড়েতেই আমাদের অপরিজ্ঞাত অপর অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের স্থান থাকা সম্ভবপর।

"ইতর প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়" নামক গ্রন্থে লর্ড্ এভিবেরি লিখিয়াছেন :—

"আমাদের পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে এবং আমরা কখনও ভাবিয়া থাকি আর অন্য কোন ইন্দ্রিয় সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইহা স্পষ্ট প্রতীতির বিষয় যে, আমাদের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধতা দ্বারা অসীমের পরিমাপ করা যাইতে পারে না। আমরা ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের জটিলতাযুক্ত যন্ত্র দেখিতে পাই। এই যন্ত্র সকলের সহিত সাধারণতঃ স্নায়ুর যোগ না থাকিলেও, ইহাদিগের ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করিতে আমাদের ক্ষমতায় কুলায় না।*

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ইণ্ডিয়ান্ ডেলিনিউজ হইতে সঙ্কলিত।

বিলাতের কথা

১৯০৯ সালে আমার ইংল্যাণ্ডের সহিত প্রথম পরিচয়, কিন্তু সেবার মোটে ৭।৮ মাস সেখানে থাকায় আমার সে পরিচয় গভীর হইতে পায় নাই। তবে সেই প্রথম দেখার সময় আমার মনে যে ভাবটা উদয় হইয়াছিল, আজও তাহা মনে আছে। প্রথমে মার্সেলসে নামিয়াই একটা কেমন পর্দার মত চোখের উপর হইতে উঠিয়া যায়। সেখানকার শ্রমজীবি লোকগুলির মলিন বেশ, অপরিষ্কার দেহ, সেখানকার অনেক রাস্তাঘাটের অপরিপাট্যতা দেখিয়া আমাদের শ্রমজীবি, বিশেষতঃ আমাদের পাহাড়ের শ্রমজীবিদের এবং আমাদের সহরের কোন কোন রাস্তাঘাটের কথা মনে পড়িয়া গেল, আর মনে হইল মানুষের সঙ্গে মানুষের তফাৎ কোথায়?

আর মাটী, জল, আকাশের সঙ্গেই বা মাটী জল আকাশের তফাৎ কোথায়? ইংল্যাণ্ডে গিয়াও সেই একই মাটী, একই আকাশ, একই জল, একই মানুষ দেখিলাম, বর্ণ ও ব্যবহার মানুষের মনুষ্যত্ব কোথাও উল্টাইয়া দেয় না। শিক্ষা, সভ্যতা ও নিরক্ষরতা সকলস্থানেই একই ফল উৎপাদন করে। দ্বিজবাবু ঠিকই গাহিয়াছিলেন "বিলেত দেশটা মাটীর, সেটা সোণারূপার নয়।" টিলবারীডকে জাহাজ হইতে নামিয়া ট্রেনে করিয়া লণ্ডনে পৌঁছিবার রাস্তায় যখন দেখিলাম, যে সেখানকার গাছের ও ঘাসের রং আমাদের দেশের গাছের ও ঘাসের রঙেরই মত সবুজ, তখন আমার নিজের দেশ আর দূরে ছাড়িয়া আসিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। আজও বিলাতের সেই প্রথম তৃণশ্যামল মাঠের সৌন্দর্য্য আমার চোখে লাগিয়া আছে। আমার মনে হইল, জননী বসুন্ধরা তাঁহার মাতৃবাহু ও মাতৃঅঞ্চলে আমায় বেষ্টিত ও আচ্ছাদিত করিয়া চুপি চুপি কাণে কাণে বলিয়া দিলেন, "আমি সেই একই, আমি যেমন সেখানে, তেমনি এখানেও আছি।"

সেবারকার আমার ইংল্যাণ্ডপ্রবাস, পরে ১৯১৩ হইতে ১৯২০র শেষ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডে বাসের সহিত তুলনা করিলে, সপ্তাহান্তের আতিথ্য স্বীকারের মত মনে হয়। কিন্তু সেই অল্পদিনের ভিতরেই স্কটল্যাণ্ডের সহিতও অল্প পরিচয় ঘটিয়াছিল।

এডিনবরায় প্রিন্সেপ ষ্ট্রীটের একটী হোটেলে কয়দিনের জন্ত [illegible] হইতে আমরা এডিনবরার ও তাহার আশে পাশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক জায়গাগুলি দেখিতে গিয়াছিলাম। তন্মধ্যে স্যর ওয়ালটার স্কটের বাসভবন ও তাঁহার অতি প্রিয় টুইড নদী দেখিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা আজও মনে উজ্জ্বলভাবে রহিয়াছে। এখনও তাঁহার বাড়ী, বসিবার ঘর, পড়িবার ঘর, তাঁহার প্রকাণ্ড পুস্তকালয় সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। এবং দেশ বিদেশের যাত্রীদের জন্ত সেই জ্ঞানতীর্থের দ্বার প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উন্মুক্ত হইবার ব্যবস্থা আছে। এডিনবরা হইতে মোটরে করিয়া আমরা লর্ড রোজবেরীর প্রসিদ্ধ ড্যালমেনী পার্ক দেখিতে গিয়াছিলাম। উত্তালতরঙ্গ ফার্থ নদীর উপর একটী খুব চমৎকার ব্রিজের উপর দিয়া সেখানে যাইতে হয়।

ইংল্যাণ্ডে সেবার বেশী বেড়ান হয় নাই, কিন্তু যে কয় জায়গায় গিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্ম ক্লিফ্‌টন খুব ভাল লাগিয়াছিল। সেখানে ছেলেদের একটী বড় স্কুল আছে; অনেক ভারতবর্ষীয় বালকগণও সেখানে পড়িতে যায়। ক্লিফ্‌টনের খুব কাছে ব্রিষ্টলে মহামনীষী রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি আছে, আমাদের দেশের অনেক লোক সে পবিত্র তীর্থভূমি দর্শন করিতে যান। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (কবি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ) যখন সেখানে যান, তখন সেই সমাধিটির সংস্কার সাধন করাইয়াছিলেন কিন্তু এখন আর কেহ এই সমাধি ভূমি ভাল করিয়া রাখার জন্ম বেশী চেষ্টা করেন বলিয়া শুনি নাই। সমাধি রক্ষকের কাছে একটী দর্শকপুস্তকে সমাধিদর্শকদের নাম লেখা থাকে, নামের তালিকার মধ্যে আমার পূজনীয় শ্বশুর ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত নাম সহিতে এক মহাভক্তের চরণে আর এক মহাভক্তের ভক্তিঅর্ঘ্য অর্পণ দেখিলাম।

আমরা গরমের সময় টেমস্‌নদীর ধারে স্যারবিটন বলিয়া একটী জায়গায় কাটাইয়াছিলাম। বসন্তে ও গ্রীষ্মে ইংল্যাণ্ডের গ্রামগুলির যে শোভা হয়, সে শোভা বড়ই চক্ষু ও মনোরঞ্জন। এমন রঙের বাহার, এমন সবুজের শ্রীর একসঙ্গে সমাবেশ আমি খুব কম দেখিয়াছি। দীর্ঘকাল হিমশয়নে শায়িত প্রকৃতি দেবীকে হঠাৎ একদিন প্রথম বসন্তের সূর্য্যকর আসিয়া বাহিরে বিশ্বের মাঝে নীল আকাশের নীচে কখন্ যে টানিয়া আনে, অনেক সময়ে তাহা বোঝাও যায় না। তারপর একদিন বসন্তের আগমনে দিক হইতে দিগন্ত আনন্দে উদ্বেলিত করিয়া তোলে। কোথা হইতে দীর্ঘ দূর প্রবাসের পর দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা রকমের পাখীরা আপনার আপনার বাসস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বহুদিনের নীরব প্রকৃতির কুঞ্জকে তাদের মধুর সঙ্গীতে উষায় ও সন্ধ্যায় মুখর ও মধুময় করিয়া তোলে। আকাশ তাহার শীতের কুহেলিকা আস্তে আস্তে গুটাইতে আরম্ভ করে; একটার পর একটা, তারপর শত শত, সহস্র সহস্র নানা রঙের নানা গন্ধের ফুল দলে দলে পথে ঘাটে বনে বাগানে ফুটিয়া উঠিতে থাকে; হাল্কা সবুজের পর গাঢ় সবুজের রং, তারপর সবশেষে লালের ছটা, অদৃশ্য চিত্রকর প্রকৃতির বুকে ফলাইতে থাকেন।

এই রং ফলান শরৎকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। শরৎকালে ফুলের চেয়ে পাতারই রঙের বাহার বেশী চলিতে থাকে। যাঁরা সৌন্দর্য্যের উপাসক তাঁরা সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামেই এই কয় মাস বেশীর ভাগ কাটান। আমরা স্যারবিটন হইতে প্রায় প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের আহারান্তে দুচার জন মিলিয়া দাঁড়ানৌকায় হ্যামটনকোর্ট বলিয়া একটা বিখ্যাত প্রাসাদের বাগানে যাইতাম। "হ্যামটন কোর্ট" অষ্টম হেন্‌রীর বাসস্থান ছিল। তাঁহার আমলের অনেক ঘটনা এখানে ঘটিয়াছিল এবং সে সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি আছে। অনেকে এখানে কোন ঘরে অষ্টম হেনরীর একতম সম্রাজ্ঞীর শিরশ্ছেদন-দণ্ডপ্রাপ্তি সংবাদে, উক্ত সম্রাজ্ঞীর কাতরোক্তি এখনও শুনিতে পাওয়া যায় বলেন।

আমরা যেখানে বাগানে বেড়াইতে যাইতাম এরূপ সুন্দর ও বড় বাগান ইংল্যাণ্ডে খুব কম। সব প্রথমে আমি যেবার সেখানে যাই তখন "সুইটপীজ" ও "হেলিওট্রোপ" ফুল

সবেমাত্র ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের সুগন্ধ বোধহয় একমাইল পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, সে গন্ধ ও সে বাহার এখনও আমার মনে খুব উজ্জলভাবে জাগিয়া আছে। ইংল্যাণ্ডের আর একটি ফুল "ব্লুবেলের" বড় বাহার, তবে এ ফুলটী বন্যফুল! যখন শীত চলিয়া যায়, বসন্তের আগমনবার্ত্তা এই ফুলই প্রথম পৃথিবীকে জানায়। গ্রাম্য জমিদারেরা অনেকে এই ফুলের সময়, সহরের লোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া এর শোভা দেখান। আমাদের বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব এখন স্বর্গগত লাট সার চার্লস্ এলিয়ট তাঁহার উইম্বলডনের বাড়ীর প্রকাণ্ড বাগানে এই ফুল ফোটার সময় তাঁহার লণ্ডনের অনেক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিতেন; আমরাও সেবার গিয়াছিলাম। সে চমৎকার শোভার, সবুজ ঘাসের উপর অসংখ্য ছোট ছোট নীল তারার বর্ণনা করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত।

লণ্ডনে ও লণ্ডনের আশেপাশে অনেক বাগান, ময়দান এবং স্কোয়ার আছে। কিউ-গার্ডেনের কথা বোধ হয় সকলেই জানেন, সেখানে পৃথিবীর সকল জায়গার ফুলও ফলের গাছের নমুনা আছে। যেখানকার যে রকম আবহাওয়ার মধ্যে তাহাদের থাকা অভ্যাস, সেই রকম আবহাওয়া কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের রাখা হয়। লণ্ডনের মধ্যে কেনসিংটনগার্ডেনটী খুব বড় ও সুন্দর; প্রকাণ্ড হাইডপার্কও তারই পাশে; এই বাগান ও ময়দান লণ্ডনের ছেলে, বুড়ো, গরীব, বড় মানুষ সকলেরই দৈনিক হাওয়া খাইবার জায়গা। কেনসিংটন গার্ডেনের কেনসিংটন প্যালেসে (প্রাসাদে) চিরস্মরণীয়া ভারতসম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জন্ম হয়। এই বাগান ও প্রাসাদটি আগে রাজবংশের নিজসম্পত্তি ছিল। এখনও প্রাসাদটীতে রাজবংশীয় লোকেরাই বাস করেন, কিন্তু বাগানটীতে জন সাধারণের যাইবার অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের সময় খাদ্যবস্তু দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ায় লণ্ডনের মধ্যে ও বাহিরে অনেক বাগানে ও স্কোয়ারে তরী তরকারী লাগান হইয়াছিল। ফুলের গাছ উপড়াইয়া তখন আলুর চাষ খুব উৎসাহের সহিত চলিয়াছিল।

শ্রীমৃণালিনী সেন।

প্রতাপের মুক্তি।*

চমৎকার!

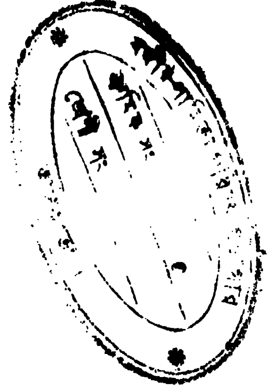
ভগ্ন তরী যাচ্ছে ডুবে ধন্য গীতি গাচ্ছে তার!
—বলছ হেঁকে ডুব্‌ছ খাসা, মরছ খাসা, ডুবছ বেশ!
মৃত্যু দেখে চমৎকৃত গর্ব্বে ভরে যাচ্ছে দেশ!
বুভুক্ষিত কুঁকড়ে মরি বিষের দাহে জলছে ক্ষুধা!
বলছে হেসে ধন্য আহা এই ক্ষুধাতে অগাধ সুধা!

---

* পৃথ্বিরাজের পত্র পাঠে।

পশুর মত অদ্রিশিরে গিরি গুহায় লুকিয়ে রই !
প্রাসাদবাসে যাপন করি বলছে কিবা স্বর্গ ওই !
উদ্দীপনাবাক্য বলে দেশের তুমি ভরসা আশা !
বন্ধ কর, বন্ধ কর সন্ধি হেন সর্ব্বনাশা !
জ্বালিয়ে দেব, পুড়িয়ে দেব ; কিসের তরে কিসের লাগি ?
একলা আমি দাঁড়িয়ে আছি, একলা আমি শ্মশান জাগি ?
রাজপুতানা আমার শুধু, একলা আমি দেশের ছেলে ?
শ্মশান করে ফেলব এরে আপন হাতে গরল ঢেলে !
ওই যে শিশু ক্ষুধায় কাঁদে পায় নি বাছা অন্ন দুটি ;
তৃপ্ত আশা ঘৃণ্য পশু কেউ কি দিবি একটি মুঠি ?
জ্বালিয়ে দেব পুড়িয়ে দেব শ্মশান করে ফেলব দেশ !
আজকে আমি পিশাচ পশু মহত্তেরি নাইক লেশ !
আপন হাতে বক্ষ ছিঁড়ে রক্তধারা করব পান !
সর্ব্বনাশে আগিয়ে এসে উল্লসিত গাইব গান !
পুণ্য পায়ে কাঁদবে লুটে ঈশ্বরেরি সৃষ্টি নাশ !
স্বাধীনতার কণ্ঠ পিষে উঠব করে অট্টহাস !
স্বর্গ যাবে পঙ্কে ডুবে তৃপ্ত চোখে দেখবো চেয়ে ;
ধ্বংস বিষে ছড়িয়ে দেব বিশ্বনাথের বিশ্ব ছেয়ে !
ভস্মীভূত করব আজি কিসের তরে কিসের লাগি ?
একলা আমি দাঁড়িয়ে আছি একলা শুধু শ্মশান জাগি !
একটা যেন সুদূর বওয়া আকুল হওয়া সুরের মত,
বড় আপন গভীর ব্যথা সুখের সেরা তীব্র ক্ষত !
বড় ব্যাকুল ক্রন্দনেরি করুণ আশা আসছে নেমে,—
স্বর্গ হতে লুটিয়ে পড়ি যেবাররবুকে পড়ল থেমে !
সৃষ্টি জ্যোতি কাঁপছে যেন ঘনিয়ে আসে সর্ব্বনাশ !
প্রলয় ভেরী উঠ্‌ছে বেজে বিশ্বপ্রাণে জাগিয়ে ত্রাস !
সৃষ্টিপতি সশঙ্কিত সৃষ্টিমাতা মূর্ত্তি খানি
ত্রস্ত ভীতা প্রকম্পিতা ভিক্ষা চাহে যুগ্মপাণি !
কে তুমি মা অশ্রুমুখী কে তুমি মা কাতর চোখে ?
দাঁড়িয়ে আছ দিব্যদ্যুতি ধূলির মাঝে মর্ত্ত্য লোকে ?
সঞ্জীবনী দীপ্তি একি কি মহিমায় উদ্ভাসিত ;—
দেখছি আজি শ্মশান মরু কি গরিমায় উজ্জীবিত !
দৈন্য এ যে বিশ্বজিত রিক্ততারি কি রাজবেশ !
সৃষ্টিবুকে সাধের মণি জ্বলছে যেন যেবার দেশ !

—সুখের সারা ললাটখানা কি কালিমায় কলঙ্কিত ?
উচ্চ চুড়া প্রাসাদগুলা ধুলার মাঝে বিলুণ্ঠিত !
বিলাস যেন শূকরশিশু পঙ্ক ক্লেদে লুটিয়ে রয় ;
দুঃখ শিরে দীপ্তি কিবা বীর্য্যবিভা কি মহাজয় !
কর্ব্বনাক কর্ব্বনাক সন্ধিকথা প্রলাপবাণী।
একলা আমি দাঁড়িয়ে রব মুক্তিসেবী শস্ত্রপাণি !
নৈলে যাবে সৃষ্টি হতে পুণ্যপ্রীতি মহৎ আশা !
জ্বলবে শুধু বিকট তেজে নরক জ্বালা সর্ব্বনাশা।
ভক্তি যাবে শ্রদ্ধা যাবে বীরত্ব সে নির্ব্বাপিত ;
শোভন শুচি পবিত্রতা শক্তি হবে নির্ব্বাসিত !
দুর্ব্বলেরে পিষ্ট করে উঠবে বেড়ে অত্যাচার ;
অসুরগুলা পূজ্য হবে দৈবী হবে খর্ব্বতার !
ক্ষুধার্ত্ত সে শিবাধ্বনি আকাশ জুড়ে বাজবে শুধু ;
স্তব্ধ হবে স্তোত্রগীতি রুক্ষ মরু কর্ব্বে ধূ ধূ !
মাতার বুকে স্তন্য ধারা শুকিয়ে যাবে ঝরবে না ;
প্রাণের বোঝা বইবে সবে বীরের মত মরবে না !
কে তুমি মা জ্যোতির্ম্ময়ী কে তুমি মা কাতর চোখে !
আজকে মোরে বাঁচিয়ে দিলে, বাঁচিয়ে দিলে সর্ব্বলোকে !
সৃজন ক্ষণে প্রণবগীতি উচ্চসুরে গাইছি শোন !
স্বাধীন আমি মুক্ত চির অটুট মম মুক্তি পণ !!



শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন

হিউগো (Hugo of St. Victor)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এপর্য্যন্ত আমরা মধ্যযুগের আদর্শবাদেরই আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি আর একটি প্রধান তত্ত্বের অবতারণা আবশ্যক। ইহাকে মধ্যযুগের রহস্যবাদ (Medieval Mysticism)* বলা যাইতে পারে। আদর্শবাদেই ইহার উৎপত্তি এবং খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মত

* আমরা পূর্ব্বাপর Mysticism এর "রহস্যবাদ" আখ্যা দিয়া আসিয়াছি ; তাহার কারণ, গ্রীক mu হইতে mystic শব্দের উৎপত্তি এবং mu এর অর্থ অবরুদ্ধ (closed up) লুক্কায়িত (concealed), গোপন (secret) ; অতএব, যে মতের অনুসরণ করিলে "অসীমের" সহিত গোপন ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাকে Mysticism বা রহস্যবাদ বলে।

লইয়া ঘোর আন্দোলন হইয়াছিল। আবিলার্ড ইহার প্রচারক এবং সেণ্টভিক্টরের হিউগো ইহার পরিপোষক।

খৃষ্টীয় আদর্শবাদ হইতে কিরূপে রহস্যবাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল, আবিলার্ড্ প্রসঙ্গে তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আদর্শবাদের যেমন মৌলিক (গোঁড়া) সাধারণ ও নামমূলক তিনটি পর্য্যায় দেখা গিয়াছে, রহস্যবাদেরও সেইরূপ কয়েকপ্রকার ভেদ আছে। বস্তুতঃ, শাস্ত্রমাত্রেরই নিয়ম এই যে, কেহ একটি মূলতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিলে, তদীয় সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারয়া সেই মূলতত্ত্বের সহিত সর্ব্বাংশে একমত হইতে পারেন না; ফলে, তাহাকে এতই পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলেন যে তাহা একটি স্বতন্ত্র মত বলিয়াই গণ্য হয়। এই হেতু প্রত্যেক মূলমতের পাশাপাশি এক বা ততোঽধিক লৌকিক বা ব্যবহারিক মত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রহস্যবাদে প্রথমতঃ (১) ব্যবহারিক বা Practical এবং (২) আধ্যাত্মিক বা Speculative নামে দুইটি ধারা বাহির হয়। ব্যবহারিক রহস্যবাদের মূল, ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ধর্ম্মভাব যতই গভীর ও প্রশস্ত হইত, এই মতেরও ততই পরিপুষ্টি হইতে থাকিত। আবার ধর্ম্মভাবের লাঘবতার সহিত ইহার অবনতিও সুনিশ্চিত ছিল। আধ্যাত্মিক রহস্যবাদের ভিত্তি চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত, এজন্য ইহার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। ইহাকে মোটামুটি হিসাবে বৈজ্ঞানিক মত বলিয়াই ধরা হয়। কি প্রকারে আত্মার সহিত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ যোগ হয় ও তাহার ফলে জাগতিক ব্যাপারের কিরূপ মীমাংসা হইতে পারে, ইহাতে সেই সকল বৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক রহস্যবাদে ধ্যান (Contemplation) ঈশ্বরের সহিত আত্মিক যোগের প্রশস্ত উপায়। ধ্যানে মানব ভগবানের অনন্তরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া অভূতপূর্ব্ব প্রেমও শান্তিরসে নিমগ্ন হয়। ইহা ভগবানের সেই বিশ্বরূপ যাহা দেখিয়া অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

অনেক বাহূদর বক্ত্র নেত্রং
পশ্যামি ত্বাম্ সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥

যিনি ভগবানের এই "নান্ত ন-মধ্য, ন-আদি" রূপের প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি সেই অনন্তের মধ্যে আপনাকেও হারাইয়াছেন; সুতরাং এই ধারণার ফলে সংসারে নির্লিপ্ত ভাব ও বৈরাগ্যের উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। রহস্যবাদীর পক্ষে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ, (Intuitive) তুলনাসাপেক্ষ নয়, অর্থাৎ জীবস্তরের আলোচনা হইতে ক্রমশঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসপরায়ণ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এস্থলে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে তৃতীয় বস্তুর ব্যবধান নাই। রহস্যবাদীরা ইন্দ্রিয়জ সংস্কার ও বিচারবুদ্ধি ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের অন্য উপায়ও স্বীকার করেন, তবে সেই সকল উপায়ের সকলগুলিই আত্ম-দর্শন (Internal Vision) নামক একটি মাত্র সুবৃহৎ গণ্ডীর অন্তর্ভূত। আত্মদর্শনের ক্রিয়া হইতে আত্মার অংশ বিশেষে স্পন্দন উপস্থিত হইয়া, সেই স্পন্দন দেহেও ব্যাপ্ত হয়। আধ্যাত্মিক রহস্যবাদের

আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সাধককে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হয় না, ঈশ্বর স্বয়ংই সাধককে আপনার করিয়া ল'ন। ঈশ্বরের সহিত এই যোগই মহাযোগ, অন্তর্জগতের ইহাই শেষ সীমা, জীবজগতের যাবতীয় চেষ্টা, নিখিল তত্ত্বজ্ঞান, এই মহামিলনেই নিয়ন্ত্রিত।

উপরে যে দুইটি প্রধান ধারার বিষয় বলা হইল, তাহার ভিতরে আরও কয়েক প্রকারের ভাব প্রকটিত হইয়াছে ;—যথা (১) সমষ্টিগত (Panthiest) ও ব্যষ্টিগত (Individualist) এবং (২) অলৌকিক (Supernatural) ও লৌকিক (Natural)। শেষোক্ত ভাবটিকে যথাক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ও দর্শন শাস্ত্রানুমোদিত বলা যায়। কেন না, যাহা কিছু অলৌকিক, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত ; আর যাহা লৌকিক বা নৈসর্গিক, তাহা দর্শনশাস্ত্রের বিষয়ীভূত। Pantheist ভাবের রহস্যবাদীরা ভগবৎদর্শনকে উচ্চাঙ্গের মানসিক ক্রিয়াসমূহের ফল বলিয়া বিবেচনা করিতেন, অর্থাৎ ধ্যান, ধারণা ও মনন ভিন্ন অন্য উপায়ে ঈশ্বর লাভ হয় না। Individualist শাখার লোকে ঈশ্বরের সহিত মানবের এক অঙ্গাঙ্গীভাব বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করিতেন। ঈশ্বর ব্যতীত মানবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, এমন কি মানব স্বয়ংই দেবতা। Supernaturalist দলের লোকেরা বলিতেন যে, ভগবৎকৃপাই ভগবদ্দর্শনের একমাত্র উপায়। ইহারা Theologist বলিয়া গণ্য হইতেন। Natural কিম্বা Philosophical Mystics অর্থাৎ দার্শনিক রহস্যবাদীরা, জীবনের উচ্চতম অভিব্যক্তিকে পরমার্থলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতীয় দার্শনিকগণ, গ্রীসীয় দার্শনিক প্লোটিনাস্ এবং খ্রীষ্টীয় দার্শনিক স্কোটাস্ ঈরিগিনা এই মতের পক্ষপাতী। খ্রীষ্টীয় দার্শনিকগণ মোটের উপর ধর্ম্মমূলক রহস্যবাদে বিশ্বাস করিতেন। দার্শনিক রহস্যবাদের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার যতগুলি ঐতিহাসিক সূত্র দেখা যায়, সকল গুলিতেই ঈশ্বরের বিরাটত্ব বা নিখিলত্ব সূচিত হইয়াছে। এই ত গেল সাম্প্রদায়িক মত সমূহের বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত সাধারণ রহস্যবাদেও কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। উচ্চস্তরের ধ্যানমাত্রেই এমন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়, যাহা কতকটা কবিকল্পনার অনুরূপ এবং যাহাতে সাধকের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া পড়ে। রহস্যবাদীরা এই জন্যই রূপকের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাঁহাদের রচনায়ও দেবতার কল্পনা, দৈববাণী, সঙ্কেতবাক্য প্রভৃতির বাহুল্য দেখা যায়। আবার, ঈশ্বরের সহিত আত্মার মিলনই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া এই সকল দার্শনিক স্ব স্ব নৈতিক ও মানসিক উন্নতি লইয়া অধিক ব্যস্ত থাকেন। বিশেষতঃ, ইহারা যে Mystic, এই ভাবটি তাঁহাদের প্রত্যেক যুক্তি তর্ক ও ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পায়। সেই ভাবটি যে তাঁহাদের নিজস্ব, তাহাতে যে তাঁহাদের গণ্ডীর বাহিরের কাহারও অধিকার নাই, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেণ্ট আগষ্টাইনের উপদেশমত তাঁহারা অন্তরাত্মারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন এবং দেহ ও আত্মার পার্থক্য ইন্দ্রিয়জাল ভেদ করিয়া পরিশেষে আত্মার মুক্তিলাভ, এই সকল বিষয়ে তাঁহারা সহজেই বিশ্বাস করেন। সর্ব্বোচ্চ স্তরের সাধকেরা দর্শনশাস্ত্রের বিধিনিষেধ ও অতিক্রম করিয়া এমন এক অবস্থা প্রাপ্ত হন যে, সেই অবস্থা হইতে দার্শনিক ও দর্শন শাস্ত্রের কূটতর্কের

প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন*; এবং সর্ব্বশেষ, সাধনমার্গ হইতে বিচারবুদ্ধিকে একেবারেই বিতাড়িত করিয়া দেন। সেই অবস্থায় ভাবই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল।

ইংরাজ পণ্ডিতগণ মধ্যযুগকে "অবস্থার যুগ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রহস্যবাদের পক্ষে এই যুগ সুবর্ণ সুযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। Practical Mystics অথবা যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া রত ছিলেন, তাঁহারা লোকসমাজে বড় একটা মিশিতেন না, পরন্তু গির্জ্জার অভ্যন্তরে নিরালায় আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিতেন। আর Speculative Mystics বা দার্শনিক রহস্যবাদীরা গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রচনায় ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত, দুই প্রকার মতেরই আভাস পাওয়া যায়। ব্যষ্টিগত রহস্যবাদ প্রথমতঃ স্কোটাস্ ঈরিগিনায় প্রকাশিত হইয়া কিছুকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল, পরে খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উহার পুনরাবির্ভাব হয়। এই মতের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে আত্মার উর্দ্ধগতি বা ঈশ্বরাভিগমন এবং চরমোৎকর্ষ, ভগবৎকৃপা ভিন্ন অন্য উপায়ে সিদ্ধ হয় না বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান জীবনেই মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার বা ঈশ্বরের আদান প্রদান স্থাপিত হইতে পারে। দার্শনিক রহস্যবাদীরা যুক্তিমার্গে বড় সূক্ষ্ম বিচারক ছিলেন না; কারণ, তাঁহারা একপক্ষে বলিয়াছেন যে, মানবজ্ঞানের প্রকৃতিই তুলনামূলক, জীবস্তরের সাহায্য ব্যতীত মানবের পক্ষে ঈশ্বরের ধারণা করা অসম্ভব; আবার তাঁহারাই বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের বিরাট রূপের ধারণা তুলনামূলক নয়, প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সাধকগণ যে সকল আশ্চর্য্য উপায়ে ভগবানের অনন্ত রূপে মুগ্ধ ও আনন্দে পুলকিত হন, ভগবদ্দর্শনজনিত সেই আনন্দ সেই নৃত্য, সেই গদগদ বা হত-চৈতন্যভাব, যাহার মাহাত্ম্য সেণ্ট বনাভেন্টুর (St. Bonnaventure) ও সেণ্ট্ ভিক্টরের হিউগো এমন উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরবিষয়ক দার্শনিক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐ সকল উপায় যে জীবন সাফল্যের মহোত্তম সোপান, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই এবং সেগুলি যে ঈশ্বরেরই কৃপালব্ধ, তাহাও ঠিক।

প্যারী নগরে সেণ্ট্ ভিক্টর চার্চ্চের পুরোহিত হিউগো খৃষ্টীয় ১০৯৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া চুয়াল্লিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ১১৪০ খৃঃ অঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ব্ল্যাকেন্‌বুর্গের (Blakenburg) হিউগো বলিয়াও পরিচিত।

পণ্ডিতেরা হিউগোর সহিত তাঁহার সমসাময়িক দার্শনিক অ্যাবিলার্ডের পার্থক্য দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, সেই পার্থক্য উভয়ের জন্মগত সংস্কারের ফল। অ্যাবিলার্ড ফরাশী বলিয়া তীক্ষ্ণধী ও সূক্ষ্মবিচার এবং নিয়ম শৃঙ্খলার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি, তিনি বিশ্বাসকেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত মনে করিতেন, তর্কশাস্ত্র তাঁহার নিকট শ্রদ্ধার বিষয় ছিল। হিউগো জর্ম্মাণ বলিয়া তদীয় কর্ত্তব্য ও অভিরুচি ভিন্ন প্রকারের এবং সে কারণ অ্যাবিলার্ড প্রতিভার যে উজ্জ্বল আলোকে বিচরণ করিতেন, তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তিনি তাহার নিভৃত উপাসনাগৃহে অধ্যয়ন, চিন্তা ও ধ্যানে সর্ব্বদা আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতেন। তবে অ্যাবিলার্ড অপেক্ষা যে তিনি ভাবুকতায় কিছু কম ছিলেন, তাহা বলা যায় না। প্রভেদ

এই যে, তাঁহাতে ভাবুকতার অপেক্ষা ভাবপ্রবণতার ভাগ বেশী ছিল। তদীয় স্বাধীন চিন্তা অ্যাবিলার্ডের তুলনায় অল্পরূপ হইলেও উভয়ের সিদ্ধান্তগুলি মোটের উপর একই প্রকার। যুক্তিবাদ ও রহস্যবাদ একই পথের প্রদর্শক, ইহাদের মিলনবিন্দু এক, অর্থাৎ একেশ্বরের প্রতিষ্ঠা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, dogma বা বিশুদ্ধবিশ্বাসের দিক দিয়া এই দুই মত বিশেষ কিছু উপকার করে নাই। ইহারই ফলে, ফ্রান্স রহস্যবাদ (mysticism) ও সর্ব্বদেবত্ববাদের (pantheism) এর একই অর্থ।

হিউগো স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহসিকতা দেখাইয়াছিলেন! তিনি বলেন যে, মুক্তির জন্য সকলকেই যে একটি মাত্র পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। স্ব স্ব বিশ্বাসের ভিত্তি সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ না থাকে, তবে আর তাহার বিশ্লেষণ জন্য অপরের প্রদর্শিত কোন বিশেষ মত গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। বিশ্বাসের বস্তু যদি এক হয়, তবে সেই বস্তুতে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি এক না হইলেও ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে সকলের ধারণা এক হওয়া অসম্ভব, কারণ ঈশ্বর সকল ধারণারই অতীত। এই প্রকার ভাব রহস্যবাদের অঙ্গস্বরূপ, সুতরাং ইহা অ্যাবিলার্ড ও সেণ্ট অ্যান্‌সেল্‌ম্ এর যুক্তিবাদ হইতে মূলতঃ পৃথক। অ্যান্‌সেলমের মতানুসারে ত্রিমূর্ত্তিকে পরমপিতা বা মহাশক্তি (Supreme Power), পরম পুত্র বা মহাবুদ্ধি (Supreme Intelligence) এবং পবিত্রআত্মা বা পরমমঙ্গল (Supreme Goodness) রূপে গণ্য করিলেও হিউগো বলেন যে, অসীম মহাসত্তা বা বিরাট পুরুষ (Infinite Being) একান্তই জ্ঞানাতীত।

ঈশ্বর যে শুধুই মানবজ্ঞানের অতীত, তাহা নয়; এমন কি, জাগতিক কোন সৃষ্ট বস্তু দ্বারা তাঁহার তুলনা হয় না। কি পৃথিবী, কি স্বর্গ, কি আত্মা, কি দেবতা, কেহই ঈশ্বর নহেন। তুমি হয় ত বলিবে, "আমি জানি, ইহাদের কেহই ঈশ্বর নহেন, তবু পৃথিবী, স্বর্গ, আত্মা, প্রভৃতির সহিত তাঁহার কিছু না কিছু সাদৃশ্য ত আছে অতএব ঈশ্বরকে বুঝিতে হইলে এই সকল বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক।" তোমার এরূপ যুক্তির সারবত্তা কি? পৃথিবী কিম্বা স্বর্গের সহিত ঈশ্বরের তুলনা করাও যা, দেহ ও মনকে এক বলিয়া গণ্য করাও তাই। বরং দেহ ও মনের ঘনিষ্টতা পৃথিবী ও ঈশ্বরের অপেক্ষা অনেক বেশী। পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী দুই বস্তুর পার্থক্যও বরং কম হইতে পারে, কি স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির পার্থক্য কম হওয়া অসম্ভব। অতএব মানব বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে অবগত হওয়ার প্রয়াস নিস্ফল; একমাত্র বিশ্বাসেই ঈশ্বরের স্থিতি সম্ভব। বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী অ্যাবিলার্ডের পক্ষে ঈশ্বর অজ্ঞেয়, সুতরাং তাঁহার প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব; রহস্যবাদী হিউগোর পক্ষে ঈশ্বর পরম সত্তা ও সত্যস্বরূপ।

সেণ্ট আগষ্টাইনের পর হিউগোই মনোবিজ্ঞানের বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে দেহ ও আত্মা দুইটি পৃথক বস্তু, অথচ একেবারে বিরোধাত্মক নয়, কারণ উভয়ের মধ্যে দ্বিবিধ সংযোগসূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদের একটি কল্পনা (imagination), অপরটি অনুভূতি (Sensibility); কল্পনা আত্মার স্থূল অংশের বিকাশ, অনুভূতি

দেহের শক্তি-অংশ। আত্মাতে আবার ত্রিবিধ মূল শক্তির ক্রিয়া লক্ষিত হয় ; যথা (১) প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক শক্তি (natural force), (২) জীবনীশক্তি (vital force) এবং (৩) জৈবীশক্তি (animal force)। প্রাকৃতিক শক্তির উৎপত্তিস্থল যকৃৎ, যেখানে রক্ত ও রসের সৃষ্টি হয় ; ইহা একাধারে উত্তেজক, স্মারক ও সঞ্চারক এবং সর্ব্বজীবেই বিদ্যমান। জীবনীশক্তির আধার অন্তঃকরণ এবং শ্বাসক্রিয়ায় ইহার প্রকাশ ; গৃহীত বায়ু দ্বারা রক্ত শোধিত করিয়া সেই রক্ত ধমনীর ভিতর দিয়া প্রেরণ করা ইহার ধর্ম্ম। এই শক্তিতে জৈবিক উত্তাপও সংরক্ষিত হয়। মানসিক শক্তির অপর নাম জৈবীশক্তি ; ইহার আধার মস্তিষ্ক। মানসিক শক্তিতে বেদনা (sensation), গতি (movement) এবং চিন্তার (thought) উৎপত্তি। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে এই তিন প্রকার ক্রিয়া সাধিত হয়। বেদনার উৎপত্তি সম্মুখ ভাগে, গতির উৎপত্তি পশ্চাদ্ভাগে, চিন্তার উৎপত্তি মধ্যভাগে। যখন যে প্রকার ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তখন সেই অংশই নিয়োজিত হইয়া থাকে।

সম্বিত্তাত্মক (sensative) ও ভাবাত্মক (intelligent), দুইটী পৃথক আত্মার কল্পনা করা ভুল। আত্মা (soul) এবং পরমাত্মা (spirit) দুই-ই একবস্তু, তবে ইহাকে যখন আমরা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবি, তখন ইহার পরমাত্মা নাম দেই, অন্যথা আত্মাই বলা হয়। হিউগো *De animia* গ্রন্থে এবিষয়ে এমন কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যাহা দ্বৈতবাদীদিগের দেহ ও আত্মার ঐক্যস্থাপনের বিফল প্রয়াসের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি *Libri didascalici* গ্রন্থে উদ্ভিদ হইতে মানব পর্য্যন্ত জীবস্তরের ভিতর দিয়া মানবরাজ্যের যে ক্রমোন্নতি দেখাইয়াছেন তাহা বর্ত্তমান কালের তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান ও তাহার অভিব্যক্তির পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে হয়।

স্বাধীন চিন্তার প্রসার

হিউগোর শিষ্য ও সেন্ট্‌ভিক্টর মুক্তি-পীঠের (Convent) অধ্যক্ষ রীচার্ড তদীয় *De trinitate* গ্রন্থে এক প্রকার ধর্ম্মমূলক দর্শনশাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, স্বাধীন সত্যানুসন্ধান। Trinity বা ত্রিমূর্ত্তি সম্বন্ধে তাঁহার তর্ক এইরূপ "আমি গ্রন্থাদিতে সর্ব্বদাই পড়িয়া থাকি যে, বস্তুত্বে ঈশ্বর অদ্বিতীয়, ব্যক্তিত্বে, সংখ্যায় তিন। এই পবিত্র ব্যক্তিত্রয় (Divine persons) বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মে পরস্পর হইতে বিভিন্ন, আবার এই তিন ব্যক্তি একই ঈশ্বরের তিন পৃথকরূপ। আমরা এই প্রকার শুনি ও পাঠ করি বটে, কিন্তু কেমন করিয়া যে ইহা সম্ভব, তাহার কোন প্রমাণ পাই না। অন্ততঃ, এইরূপ প্রমাণ যে কেহ দিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। এই সকল উক্তির রাশি রাশি নজির আছে কিন্তু প্রমাণের একান্তই অভাব। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য, এমন এক দৃঢ়, অকাট্য ও স্থির ভিত্তি নির্ণয় করা, যাহার উপরে যাবতীয় যুক্তি ও তর্ক দাঁড়াইতে পারে।"

রীচার্ড ঐশী প্রেমেই (divine love), ত্রিমূর্ত্তি সংক্রান্ত বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঐশীপ্রেম স্বাধীন, স্বকীয় উদ্দেশ্য সৃজনে পটু, তবে ইহাই যে যথেষ্ট

প্রমাণ, তদ্বিষয়ে তিনি সন্দিহান্ ছিলেন। রীচার্ড্ চিন্তা বা বিচার সাহায্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ভাবের সাহায্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আত্মার ঊর্দ্ধাভিগমনের ছয়টি স্তর (six stages) আছে। নিম্নস্তরগুলিকে অতিক্রম করিয়া আত্মা যতই উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে থাকে, ততই আত্মার প্রসার হয়; অবশেষে আত্মা দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া একেবারেই মুক্তিলাভ করে। রীচার্ডকে যুক্তিবাদী বা রহস্যবাদী যাহাই বলা হউক, তাঁহার উপদেশ কতকটা নব-আদর্শবাদের (Neo-platonic) অন্তর্গত বিকাশবাদের অনুরূপ। ইহার উদ্দেশ্য প্রকৃতির সহিত ঐশ্বরিক করুণার মিলন সাধন।

লীল্ (Lisle) নগরীর অ্যালনাস্ (Alanus) একজন গোঁড়া-পাদরী হইয়াও গণিত শাস্ত্রর সাহায্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলিকে নিয়মাবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা এক নূতন মতের (a system of domatics প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাহার উপসংহারে দেখাইয়াছিলেন যে, বস্তুমাত্রেরই মূল ঈশ্বরে এবং ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তুতেই বিদ্যমান।

রীচার্ড, অ্যালান্ প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি ব্যতীত আর যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কিন্তু দর্শনশাস্ত্রকে বড় একটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে, বিশ্বাস মানসিক ভাবের ফল, ইহাতে যুক্তি তর্কের অধিকার নাই এবং দার্শনিক গবেষণা একান্তই অনাবশ্যক। একার্ড্ (Achard) ও গড্ফ্রী (Godfrey) নামে সেণ্ট ভিক্টরের আর দুইজন পাদরীর রচনায় দর্শনশাস্ত্রের প্রতি শ্লেষের খরস্রোত বহিয়াছিল এবং ইহার চূড়ান্ত হইয়াছিল রীচার্ডের পরবর্ত্তী, অধ্যক্ষ ওয়াল্টারের (Walter) রচনায়। ওয়াল্টার দার্শনিক গবেষণাকে সয়তানের ফাঁদ বলিয়াছেন। মুক্তিপীঠের (Convent) বাহিরে ও অ্যাডাম্ (Adam) প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি এই পথের পথিক হইয়াছিলেন। ইঁহারা 'স্কলাষ্টিসিজম্' এর বিরোধীদল এবং ইহাদিগকে মধ্যযুগের Non-scholastic সম্প্রদায় বলা হইয়াছে।

মোটের উপর এখন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের ভিতর সামঞ্জস্যের পরিবর্ত্তে অসামঞ্জস্যের দিকটাই ফুটিয়া উঠিতেছিল এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে যেন শত্রুতার বাঁধ গড়িয়া উঠিতেছিল। রবার্ট্ পুলেন (Robert Pulleyn) নামক একজন ইংরাজও নেভারোর পীটর (Peter the Lombard) তাঁহাদের কৃত "Sentences" গ্রন্থে যে সকল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহাতে খ্রীষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রে দার্শনিক তর্কের অসারতাই দেখান হইয়াছে। পুলেনের প্রশ্নগুলি এইরূপ,—ঈশ্বরের সর্ব্বদর্শিতার সহিত ঈশ্বরের স্বাধীন সৃষ্টির সম্বন্ধ কি? অর্থাৎ, ঈশ্বর, সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা যদি পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন, তবে তিনি সৃষ্টি করিতে বাধ্যই হইয়াছিলেন; তাহা হইলে সৃষ্টিবিষয়ে তাঁহার স্বাধীনতা কোথায়? আবার সৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ব্ব জ্ঞানের অভাব হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাই বা কোথায় রহিল? সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর ছিলেন কোথায়? স্বর্গে? স্বর্গ ত হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থাই কি জগতের সর্ব্বোত্তম অবস্থা?—না, ইহাপেক্ষাও তিনি উৎকৃষ্টতর উপায়ে বিশ্ব রচনা করিতে পারিতেন? স্বর্গ সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বর্গীয় দূতেরা

কোথায় থাকিত? স্বর্গীয় দূতগণ কি পাপ কাষ করিতে পারে? তাহাদের কি দেহ আছে? ঈশ্বর কিম্বা দেব দূতেরা কি মূর্ত্তিতে মানুষকে দেখা দেন। প্রেতাত্মারা কি উপায়ে নরদেহ আশ্রয় করে? মর্ত্তাবরোহণের পূর্ব্বে আদমের (Adam) মূর্ত্তি কি ছিল? আদম-দেহের অন্য অংশ হইতে না হইয়া, পার্শ্বদেশ হইতে ঈভের (Eve) উৎপত্তি হইল কেন? কেনই বা আদমের নিদ্রিতাবস্থায় ঈভের জন্ম হইল? পাপ না করিলে কি মানুষ অমর হইতে পারিত? আর অমর হইলে কি মানবের বংশ বৃদ্ধি সম্ভব হইত? তাহা হইলে কি শিশুরা একেবারেই পূর্ণবয়স্ক হইয়া জন্মিত? পরমপুত্র (The Son) মনুষ্য-রূপী কেন হইয়াছিলেন? পরম পিতা (The Father) এবং পবিত্র আত্মা (The Holy Ghost) কি মানুষ হইতে পারিতেন না? স্ত্রীদেহের পরিবর্ত্তে পুরুষদেহেও কি ঈশ্বর সহজেই অবতার হইতে পারিতেন না? এই সকল প্রশ্ন,—এই যে "কেন ও কেমন করিয়া?" উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছিল। এইরূপ প্রশ্নে শিশুজনসুলভ কৌতূহল ও অবিবেকিতা প্রকাশ পাইলেও ইহাদের মূলে যে ভবিষ্যতকালের এক স্থায়ী, অতি গভীর স্বাধীন চিন্তার ভাব অঙ্কুরিত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ওয়াল্টারপ্রমুখ শাস্ত্রকারেরা যে ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত দর্শনশাস্ত্রের সম্বন্ধ উঠাইয়া দিতেছিলেন, তাহাতে চার্চ্চ-বিদ্বেষীদিগেরই দলপুষ্টি হইতেছিল। এখন হইতে এমনই একটা সাড়া পড়িয়া গেল যে, দর্শনশাস্ত্রে যে তত্ত্বটি সত্য বলিয়া গ্রহনীয়, ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা সত্য না হওয়াও সম্ভব। একদল স্বাধীনচিত্ত ভাবুক এই সময়ে আরবীয় মুসলমান দার্শনিক-দিগের অনুকরণে ঈশ্বরের অন্তর্লীনত্বের ভাব (Philosophy of immanancy) প্রচার করিতে উদ্‌যোগী হইলেন। তাঁহারা ত্রিমূর্ত্তির (Trinityর) যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহাতে উহা দ্বারা ঈশ্বরের পর পর তিনবার আত্মপ্রকাশ' অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানব-ধারণার তিনটি পৃথক পর্য্যায় বুঝাইল। ওল্ডটেষ্টেমেণ্টের ঈশ্বরই পরম পিতা (the Father) যাঁহাকে স্বর্গের অধিবাসী বলা হইয়াছে; নিউটেষ্টেমেণ্টের ঈশ্বরই পরম পুত্র। (the Son) যাঁহার কল্পনায় ওল্ড এবং নিউটেষ্টেমেণ্টের অন্তর্গত সুবৃহৎ খাত পূর্ণ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে পরমেশ্বর অপেক্ষা মানবের অধিক নিকটবর্ত্তী বিবেচনা করা হয়; আর পবিত্র আত্মা (the Holy Ghost), যাঁহাকে ভাবী জগতের ঈশ্বর, সর্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক ঈশ্বর বলা হইয়া থাকে। এই ঈশ্বরই সব এবং সৃষ্টিমাত্রেই ইহাতে বিদ্যমান। ইহার মহিমা বা শক্তি কেবল পীর ফকির বা খৃষ্টান পুরোহিত নয়, অখৃষ্টান গ্রীক পণ্ডিতদিগের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছিল। আর স্বর্গও নরক? বিবেক ও সাধুতা ভিন্ন স্বর্গ নাই, সন্তাপ ভিন্ন নরক নাই। সাধুদিগের পূজাও পৌত্তলিকতা মাত্র।

উপরোক্ত যুক্তিসমূহ টুর্নের সাইমন্ (Simon of Tournay), বেনার আমল্‌রিক (Amalric of Bena) এবং ডিনাণ্ডের ডেভিড্) Devid of Dinand) প্রভৃতির দ্বারা দক্ষতার সহিত প্রচারিত হইয়া খ্রীষ্টীয় পুরোহিত ও সাধারণ লোকের মনে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। খৃঃ ১২০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এই সকল অখৃষ্টীয় মত ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হইয়া চার্চ্চের আদেশ বাণীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। চার্চ্চও

চিরসঞ্চিত শক্তির হ্রাস আশঙ্কা করিয়া বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে বিধর্ম্মীর অপরাধে মৃত্যু দণ্ড প্রদান এবং অ্যারিষ্টটলের বিজ্ঞানশাস্ত্রকে এই প্রকার ব্যভিচারের কারণ জানিয়া তাহাকে অভিশপ্ত করিয়া আশু বিপদে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

এই অংশে মধ্য যুগের ইউরোপীয় দর্শনের প্রথম খণ্ড শেষ হইল।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

সঙ্কল্প

আমি　সত্যের ধ্রুব রথে
সদা　চলিব সত্য পথে ;
বচনে কর্ম্মে ভাবে কি মর্ম্মে
টলিব না কোনো মতে।
নিন্দা কি খ্যাতি যা হবার হোক্,
শাস্তি অথবা পাই দুখ-শোক,
জয়-পরাজয় সকল সময়ে
চলিব সত্য পথে ;
আমি　টলিব না কোনো মতে।

হেরি　দুখীর মলিন মুখ,
আমি　ভুলে যাব নিজ সুখ ;
সবার বেদন করিবে রোদন
জুড়িয়া আমার বুক।
রোগী শোকী আর পাপী তাপী জনে,
মমতার ডোরে বাঁধিব যতনে,
করি প্রাণপণ করিব সেবন,
ঘুচাব অভাব-দুখ ;
আমি　ভুলিব আপন সুখ।

আমি　পাপ-পথে চলিব না,
মোহ　প্রলোভনে গলিব না ;
রহিবে বীর্য্য অতুল শৌর্য্য
তিল মাত্র টলিব না।
দূর—দূর পথে তব ইঙ্গিতে
নীরবে চলিব সংযত-চিতে
বিনা কৃপাবল—সকল বিফল,
কভু তাহা ভুলিব না ;
আমি　পাপ-পথে চলিব না।

প্রতি　প্রভাত-সন্ধ্যা বেলা,
হবে　তব সনে মোর খেলা ;
তব আগমনে হিয়ার কাননে
ফুটিবে কুসুম মেলা।
কুঞ্জ-কুটীরে পাখীরা গাইয়া,
নীরবে নাচিবে তোমারে পাইয়া,
আরতির ধূপে প্রতি রোমকূপে
সৌরভ দিবে দোলা ;
প্রতি　প্রভাত-সন্ধ্যা বেলা।

—যরবেশ

আইন্‌স্‌টাইন্‌ ও বর্‌

(১)

১৯২২ খৃঃ অব্দে পদার্থ-বিদ্যার নোবেলপ্রাইজ পাইয়াছেন অ্যালব্রেক্‌ট্‌ আইন্‌সটাইন (Albrecht Einstein)।

১৯০৫ খৃঃ অব্দে জার্ম্মাণিতে প্রাকৃতিক দর্শনের মুখপত্র Annalen Der Physik নামক পত্রিকায় A. Einstein এই স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল আপেক্ষিক তত্ত্ব Theory of Relativity। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে হল্যাণ্ডের বিখ্যাত লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এইচ লোরেন্‌ট্‌জ্‌ এই বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করেন। উক্ত প্রবন্ধে কতকগুলি অদ্ভুত কথা দৃষ্ট হয়, যথা আলোক ও বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করার জন্য ইথারের কল্পনা করা অনাবশ্যক; কালের ও স্থানের পরিমাণ স্থির নয় তাহা পরিমাণকর্ত্তার গতি বা স্থিতির উপর নির্ভর করে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ক্যাম্‌ব্রিজ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল্‌ সর্ব্বব্যাপী ইথারের কল্পনা করেন এবং আলো ও বিদ্যুৎ উক্ত ইথার সমুদ্রে তরঙ্গ বিশেষ বলিয়া ঘোষণা করেন। ১০ বৎসর পরে বার্লিনের হার্টজ্‌ সাহেব কতকগুলি সুনিপুণ পরীক্ষা দ্বারা ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের মত সত্য বলিয়া প্রমাণ করিলেন। দেখাইলেন যে প্রেক্ষাগৃহে (লেবরেটারীতে) যন্ত্র সাহায্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপন্ন করাইলে উহা সর্ব্বব্যাপী ইথার সমুদ্রকে তরঙ্গায়িত করে; যেমন জলে কোথাও ঢিল ফেলিলে প্রহত বিন্দুর চারিদিকে তরঙ্গ ছড়াইয়া পড়ে। হার্টজএর এই পরীক্ষাগুলি হইতে তারহীন টেলিগ্রাফের সূত্রপাত হয়।

আইন্‌সটাইন্‌ বলিলেন "ইথরের অস্তিত্ব নাই। ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া যদি এক খণ্ড যষ্টিকে একবার পৃথিবীতে রাখিয়া ও একবার কোন তারকায় রাখিয়া তাহার দৈর্ঘ্য নিরূপণ করি তবে এই দুইবারের পরিমিত দৈর্ঘ্য সমান হয় না"। এই ভাবের অনেক কথা লোরেন্টজ্‌ও তের বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন কিন্তু কাল, স্থান, পরিমাণ আপেক্ষিক বলিয়া লোরেন্‌ট্‌জ্‌ যে মত প্রচার করেন, তাহা কোন যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মীমাংসার জন্য এই মতের অবতারণা করা হয়।

কিন্তু আইন্‌ষ্টাইন্‌ যুক্তিতর্কের দৃঢ় ভিত্তির উপর আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখন অ্যানালেন্‌ ডার ফিজিক্‌ এর অধিকাংশ পাঠকবর্গ অন্ততঃ জুরিচের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আচার্য্য ক্লাইনারের নিকট আইন্‌সটাইনের মতবাদ অদ্ভুত ঠেকিল। কেহ কেহ তাঁহাকে পাগল ঠাওরাইলেন। আইন্‌ষ্টাইন্‌ তখন জুরিচের পেটেণ্ট্‌ আফিসে সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেছিলেন। তিনি জুরিচ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ্‌ ডি, উপাধি লাভের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উক্ত প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। সনাতন মত-পন্থী প্রফেসার ক্লাইনার প্রবন্ধটিকে উপাধি প্রাপ্তির যোগ্য মনে করিলেন না। তিনি আইন্‌সটাইন্‌কে বলিলেন, "দেখ ছোক্‌রা, তুমি এত বাজে বক কেন? ইথর নাই, সময় স্থির নয়, তাহা পরিমাণকর্ত্তার অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, এসব কি কথা? কিন্তু শুনিয়াছি যে গণিতে তোমার মাথা

খুব পরিষ্কার, লাগিয়া থাকিলে তোমার দ্বারা উন্নতি অসম্ভব নহে। তুমি এক কাজ কর,—এমন কোনও গবেষণাপত্র লিখ, যাহা পদার্থবিদ্যার বৈজ্ঞানিকদের নিকট গ্রহনীয় হইতে পারে।"

এইরূপে রিলেটিভিটি প্রবন্ধ অগ্রাহ্য হইল এবং তাহার স্থানে একটা যেমন-তেমন বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া আইন্‌সটাইন্ উপাধি লাভ করিলেন, কিন্তু সকল বৈজ্ঞানিকই ক্লাইনারের মত আপেক্ষিক তত্ত্বকে উড়াইয়া দিলেন না। কোয়াণ্টাম্ থিওরির (Quantum Theory) প্রবর্ত্তক বার্লিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত প্রফেসার ম্যাক্‌স্ প্লাঙ্ক্ (Max Planck) আইন্‌সটাইনের কাছে একখানা অশেষ প্রশংসাপূর্ণ পত্র লিখিলেন। ফরাসী দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত পঁয়কারের (Poincare) নিকট হইতেও ঐরূপ একখানা পত্র আসিল। য়ুরোপের দুইটী শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদের দুইটী প্রশংসাপত্র বৈজ্ঞানিক-জগতের নিকট আইন্‌সটইনের যশ ও প্রতিষ্ঠার পথ চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিল। পঁয়কারে পরে এক পত্রে লিখেন,—

"Herr আইন্‌সটাইন্ বয়সে নবীন হইলেও আমি তাঁহার চিন্তাপ্রণালীর মৌলিকতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তিনি চিন্তার জগতে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিতেছেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা তাঁহাকে অধ্যাপকতায় বরণ করিয়া লইবেন তাঁহারা পরে দেখিতে পাইবেন যে তাঁহারা কত লাভবান হইয়াছেন"।

এইবার আইন্‌ষ্টাইনের জীবন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাউক। আইন্‌সটাইন ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত ক্ষুদ্র উলন (Uln) নগরে এক জর্ম্মণ-ইহুদী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যকালে তাঁহার পিতামাতা দেশত্যাগ করিয়া ইটালীর অন্তর্গত মিলান্ (Milan) নামক স্থানে যাইয়া বসবাস করেন। তাঁহাদের সঙ্গে সেখানে কিছুকাল বাস করিয়া আইন্‌সটাইন্ বিদ্যালাভের জন্য সুইট্‌জারল্যাণ্ডে গমন করেন। সেখানে পলিটেক্‌নিক্ ইন্‌ষ্টিটিউটে তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা সমাপ্ত হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবেন ইহাই তাঁহার উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু তাঁহার ইহুদীবংশে জন্ম বলিয়াই হউক, অথবা তিনি কোনও রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিলেন না বলিয়াই হউক, তাঁহার চাকরীর জন্য সমস্ত আবেদনই অগ্রাহ্য হইতে লাগিল। ছাত্র পড়াইয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে করিতে অবশেষে গ্রস্‌মান্ (Grossmann) নামক তাঁহার এক জর্ম্মণ বন্ধুর চেষ্টায় তিনি এক পেটেণ্ট অফিসে কাজ পাইলেন। এখানে তিনি ছয় বৎসর কাজ করেন। আফিসের কাজ করিয়া যে টুকু অবসর পাইতেন, দুঃখদৈন্য সত্ত্বেও তাহা তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যয়নে কাটাইতেন। এই সময়কার অধ্যয়ন ও কঠোর পরিশ্রমের ফল তাঁহার থিওরি অফ রিলেটিভিটি।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পঁয়কারে (Poincare) ও মাদাম্ মারী কুরির (Madame Marie Curie) সুপারিশে আইন্‌সটাইন্ "সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাম্‌ব্রিজ" জুরিচ (Zurich) বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। এখন হইতে ১৯১৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন, মধ্যে একবার ছয়মাসকাল জেকোশ্লোভেকিয়ার রাজধানী প্রাগ (Prague) নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃঃ অব্দে প্রফেসর প্লাঙ্কের সুপারিশে বার্লিনের একাডেমী অফ সায়ান্সের বেতনভোগী সদস্য এবং কাইজার বিল্‌হেলম্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ সায়ান্সের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর

হইয়া তিনি বার্লিনে চলিয়া যান। সেই সময় হইতে তিনি বার্লিনে অনন্যকর্ম্মা হইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। কাইজার বিল্‌হেল্‌ম্ ইন্‌স্টিউট্ অফ্ সায়ান্স বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ভূতপূর্ব্ব কাইজারের উৎসাহে স্থাপিত হয়। ইহাতে বিজ্ঞানের আটটি বিভাগে গবেষণার জন্য আটটি পৃথক্ বাড়ী তুলিবার কথা ছিল। ১৯১৪ খৃঃ অব্দে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ফিজিক্যাল্ কেমিষ্ট্রি, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ কেমিষ্ট্রী এবং রেডিও কেমিষ্ট্রী এই তিন বিভাগের জন্য তিনটি বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে উক্ত ইন্‌স্টিটিউটের কার্য্য আর অগ্রসর হয় নাই। কাজেই আইন্‌সটাইন্ যে বিভাগের ডিরেক্টর, তাহা কেবল ভাবজগতে বর্ত্তমান। উহা আর বাস্তব আকার ধারণ করিতে পারে নাই।

আইন্‌সটাইনের প্রতিভা কেবল থিওরি অফ্ রিলেটিভিটি আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম্ তত্ত্ব আইন্‌সটাইন্ পুনর্জ্জীবিত করেন। পদার্থবিজ্ঞানের অনেক অন্ধকারময় প্রদেশ তাঁহার প্রতিভার রশ্মিজালে উদ্ভাসিত হইয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করিতেন যে আলোকের তেজ (Energy) তরঙ্গের মত আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯০০ খৃঃঅব্দে প্লাঙ্ক্ বলেন যে আলোকের তেজ ছড়াইয়া পড়ে না, উহা পারমাণবিক মাত্রায় কোষবদ্ধ হইয়া আকাশে ধাবিত হয়। ইহাকেই কোয়ান্টাম্ তত্ত্ব বলে।

এই তত্ত্ব প্রথম বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু আইন্‌সটাইন্ দেখাইলেন যে এই তত্ত্ব গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। তিনি প্লাঙ্কের উপপত্তিকে পুনর্জ্জীবিত করেন। বহুদিন হইতে জানা ছিল যে ধাতুর পাতের উপর আলোক পড়িলে উক্ত ধাতু হইতে তড়িৎকণা (Electrons) বাহির হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে আলোক তরঙ্গ যত ছোট হয় তড়িৎকণা তত বেগে ধাতুর পাত হইতে ফুটিয়া বাহির হয়। আইন্‌সটাইন্ দেখাইলেন যে যদি ধরা যায় যে আলোকের তেজ অবিশ্রান্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা হয় না। ধরিতে হইবে যে আলোক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কোষবদ্ধ হইয়া বিস্তৃত হয়।

বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্রকণা নিরন্তর চঞ্চলনৃত্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের গতিভঙ্গী (Brownian Movement) সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, বিজ্ঞানজগতে তাহাতে নূতন চিন্তা ও গবেষণার পথ বাহির হইয়াছে। প্রাচীনদের বিশ্বাস ছিল কোনো জিনিষের ওজনের কখনো পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। আইন্‌সটাইন প্রমাণ করিলেন যে জিনিষের ওজন ঠিক থাকে না। কোনো জিনিষের তড়িতরেণু যদি খুব বেগে ধাবিত হয় তবে তাহার ওজন খুব বাড়িয়া যায়। অবশ্য এ ব্যাপার কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কাউফ্‌ম্যান পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আইন্‌স্টাইন ইহার প্রকৃত নিয়ম তাঁহার আপেক্ষিক তত্ত্ব হইতে প্রমাণ করেন।

আইন্‌সটাইনের জীবনের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—রিলেটিভিটির সাধারণ বা অবিশেষ সত্য (Generalised Theory),—সে সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলে দেখা যায় যে লৌকিক ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা সহজসাধ্য নহে। গল্প আছে, আলেকজাণ্ডার যখন বালক ছিলেন, তখন জ্যামিতিশাস্ত্র তাঁহার বিশেষ বোধগম্য হইত না। তিনি তাঁহার

শিক্ষাগুরু আরিষ্টট্‌ল্‌কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইউক্লিডের পঞ্চমপ্রতিজ্ঞা আয়ত্ত করিবার কোনও সহজ উপায় আছে কিনা। আরিষ্টট্‌ল্ তাহার উত্তর দেন যে জ্যামিতিশাস্ত্রে কোনও প্রশস্ত রাজপথ নাই। আমাদেরও তাই মনে হয়, জটিল অঙ্কশাস্ত্রের সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত রিলেটিভিটি তত্ত্ব সাধারণের পক্ষে বোধগম্য করা অসম্ভব। আর শুধু অঙ্কশাস্ত্র নহে পদার্থবিদ্যাতেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

আইন্‌সটাইন্ পদার্থবিজ্ঞানের প্রাচীন গৃহটীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার উপর নূতন সৌধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার প্রভাবে পদার্থবিদ্যা, বিশেষতঃ পরমাণুতত্ত্ব ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করিবে তাহা নির্দ্ধারণ করা এখন সম্ভবপর নহে।

আইন্‌সটাইন্ অতি অমায়িক ও শিশুর মত সরলপ্রকৃতি। একসময়ে তাঁহাকে জর্ম্মনীর শ্রেষ্ঠ পট্‌স্‌ড্যাম্ মানমন্দিরের (Potsdam Observatory) অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন যে তিনি শাসনকার্য্যে সময় নষ্ট করিতে পারিবেন না। অথচ এই পদ পাইলে জর্ম্মনীর যে কোনও বৈজ্ঞানিক আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন সন্দেহ নাই।

আইন্‌সটাইন্ একজন গোঁড়া বল্‌শেভিক্ মতের লোক। কতবার তিনি ও তাঁহার স্ত্রী বার্লিনের রাজপথে বল্‌শেভিক্ শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়াছেন। এইজন্য জর্ম্মণীর রাজনৈতিকদের মধ্যে যাঁহারা রাজ্যবিস্তার প্রয়াসী "জিঙ্গো" দল তাঁহারা আইন্‌সটাইন্‌কে একেবারেই দেখিতে পারেন না।

পদার্থবিজ্ঞানের দুইটী চক্ষু। একটী গণিত, অপরটী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক সার জে, জে, টম্‌সন ছাড়া অতি অল্প সংখ্যক বৈজ্ঞানিকই এই দুইটি চক্ষু দিয়া দেখিতে পারেন। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে পরীক্ষামূলক গবেষণা করিয়াছেন, এতদিন নোবেল্ প্রাইজ্ তাঁহাদেরই একচেটিয়া ছিল। পদার্থবিজ্ঞানে, পরীক্ষামূলক গবেষণার ন্যায়, গণিতসিদ্ধ গবেষণাও যে অতি প্রয়োজনীয়, আইন্‌সটাইন্ ও বর্‌কে পুরস্কৃত করিয়া নোবেল্ কমিটি এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন। কথিত আছে বৈজ্ঞানিক বুন্‌সেন্ বলিয়াছিলেন "এক আউন্স্ পরীক্ষালব্ধ তথ্য এক টন্ থিওরি অপেক্ষা শ্রেয়"। কিন্তু আমার মনে হয় বর্ অথবা আইন্‌সটাইনের মতবাদের ন্যায় একছটাক্ থিওরি অনেক জাহাজ বোঝাই পরীক্ষিত তথ্যসংগ্রহ অপেক্ষা ওজনে ভারী।

(২)

১৯২২ খৃঃ অব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল্ প্রাইজ্ পাইয়াছেন নীল্‌স্ বর। (Neils Bohr) তিনি জাতিতে দিনেমার, বর্ত্তমানে কোপেনহাগেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। সাধারণের নিকট তিনি প্রফেসর আইন্‌সটাইনের ন্যায় সুপরিচিত না হইলেও তাঁহার আণবিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি বাস্তবিকই জ্ঞানরাজ্যে নবযুগের সূচনা করিয়াছে।

গত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল, যে পদার্থনিচয়ের মূল উপাদান পরমাণু। সমস্ত পদার্থ ৯২টী Elements অর্থাৎ বিভিন্ন মূলপদার্থ হইতে উৎপন্ন। পরমাণু অবিভাজ্য। অনুমান করিতে পারি যে, এক টুকরা সোণাকে ভাগ করিতে করিতে এমন এক

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যাইবে যে এই অংশকে আর ভাগ করিতে পারা যাইবে না। উহাই সোণার পরমাণু। একটু জলকে ভাগ করিতে করিতে চরম অবস্থায় পাওয়া যাইবে দুই অংশ হাইড্রোজেন এবং এক অংশ অক্সিজেন অর্থাৎ দুইটী হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটী অক্সিজেন পরমাণু। ফলকথা এই পরমাণু কোনও ক্ষুদ্রতর পদার্থের সমষ্টি নহে। অবশ্য ইহার বিপরীত মতও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পোষণ করিতেন। ইহাদের মধ্যে প্রাউট লক্‌ইয়ার, রোল্যাণ্ড্ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রফেসর রোল্যাণ্ড্ সৌর বর্ণচ্ছত্রের (Solar Spectrum) সমাবেশ নির্দ্দেশের জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, বহুসংখ্যক ধ্বনি-উৎপাদনকারী পিয়ানো যন্ত্রটী যেরূপ জটিল, একটী পরমাণুর নির্ম্মাণ কৌশল তদপেক্ষা অধিকতর জটিল। পরীক্ষামূলক প্রমাণ না থাকাতে এই মতগুলি অনুমান বলিয়াই গণ্য হইত বটে কিন্তু আজ প্রমাণ হইতেছে যে সেই ভবিষ্যৎ বাণীর মধ্যে সত্য নিহিত ছিল। ১৮৯৭ খৃঃ অঃ ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার জে, জে, টম্‌সন্ অবিভাজ্য পরমাণুকে বিভক্ত করিয়া তাহা হইতে এমন একটি সূক্ষ্ম উপাদান বাহির করিয়াছেন যাহার দুই সহস্রটি একত্র করিলে একটি পরমাণুর সমান ওজনবিশিষ্ট হয়। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থের নাম দেওয়া হইয়াছে "ইলেক্ট্রণ" ইহাকে বিয়োগতড়িতের পরমাণু অথবা সংক্ষেপতঃ তড়িৎরেণু বলা যাইতে পারে। জগতের যাবতীয় পদার্থই ইহা হইতে উৎপন্ন। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন মতের সৃষ্টি হইল জড় পদার্থের পরমাণু সকল নির্দ্দিষ্টপরিমাণ বিয়োগতড়িৎ ও যোগতড়িতের সমষ্টি মাত্র। বিয়োগতড়িতের পরমাণু ইলেক্ট্রণকে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু যোগতড়িতের পরমাণুর আবিষ্কার হইতে অনেক বিলম্ব হইল। আবিষ্কারের ফলে জানা গেল যে উহাতে ইলেক্ট্রণের সমপরিমাণ বিদ্যুৎ বর্ত্তমান। ইহার ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান। প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাউট নামক এক বৈজ্ঞানিক যোগতড়িতের পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মানার্থ এই নবাবিষ্কৃত পরমাণুর নাম রাখা হইল প্রোটন।

প্রফেসর রাদারফোর্ড এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন এই যে ৯২টি মূলপদার্থের সংযোগে এই জড়জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মূল পদার্থগুলি প্রত্যেকে আবার বিভিন্ন পরিমাণ ইলেক্ট্রণ ও প্রোটনের সংযোগে গঠিত। উহারা প্রোটন ও ইলেক্ট্রণের যৌগিক পদার্থ। যৌগিক পরমাণুগুলির মধ্যে হাইড্রোজেনের পরমাণুই একটি মাত্র ইলেক্ট্রণ ও একটি মাত্র প্রোটনের সমষ্টি বলিয়া ইহার মধ্যে জটিলতা সর্ব্বাপেক্ষা কম।

এখন দেখা যাউক প্রফেসার বর (Bohr) কি আবিষ্কার করিয়াছেন। কোনও মূল পদার্থকে যদি খুব উত্তপ্ত করা যায় অথবা উহার ভিতর দিয়া যদি বিদ্যুৎপ্রবাহ চালান যায় তাহা হইলে ঐ পদার্থ হইতে আলোকরশ্মি বাহির হইয়া থাকে। স্পেক্‌ট্রোস্কোপ যন্ত্রে আলোকরশ্মি মূল বর্ণগুলিতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। ইহাকে বর্ণচ্ছত্র বা Spectrum বলে। মূল পদার্থের বর্ণচ্ছত্রে কতকগুলি বিভিন্ন বর্ণের রেখা দেখা যায়। লৌহের বর্ণচ্ছত্রে লাল ও বেগুনি। এই বর্ণের মধ্যে সাত হাজারের অধিক রেখা আছে। একজন লোকের হাতের টিপ যেমন অন্য লোকের হাতের টিপ হইতে স্বতন্ত্র তেমনি এক মূল পদার্থের বর্ণচ্ছত্র

অন্য মূল পদার্থের বর্ণচ্ছত্র হইতে পৃথক। টিপ সইয়ের দ্বারা যেমন লোককে সনাক্ত করা যায় সেইরূপ বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিয়া যে কোনও মূল পদার্থকে চিনিয়া লওয়া যায়। বর দেখাইয়াছেন যে রাদারফোর্ডের আবিষ্কৃত পরমাণুর গঠন হইতে সেই পরমাণু কি প্রকার আলোক বিতরণ করিবে তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করা যায়। জলের তরঙ্গ আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি, বায়ুতেও তরঙ্গ উত্থিত হয়, এবং উহাই আমাদের নিকট শব্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ আলোকও এক প্রকার তরঙ্গ—বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। এই তরঙ্গে জল কিংবা বায়ু আলোড়িত হয় না, আলোড়িত হয় ইথার। বায়ুপূর্ণ পাত্র হইতে যদি সমস্ত বায়ু নিষ্কাসিত করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলেও পাত্রের মধ্যে ইথার অবশিষ্ট থাকে। ইথারে অনেক গুণের আরোপ করা হইয়াছে, তথাপি ইথার যে কি, ইহা বাস্তবিকই আছে কি না তাহা কেহও জানে না। ইথার সকল বস্তুতেই অনুপ্রবিষ্ট এবং ইহা গ্রহ নক্ষত্র আকাশে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আলোক গ্রহ-নক্ষত্র হইতে আমাদের নিকট পৌঁছে। বাদ্য-যন্ত্র বায়ুমণ্ডলে নানা প্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি করে, ঐ গুলিই নানাপ্রকার ধ্বনি। পরমাণুকে বাদ্য-যন্ত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কারণ, উহাও ইথারসমুদ্রে যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপন্ন করে তাহাকেই আমরা আলোক বলি। একটা বাদ্য-যন্ত্র হইতে পঁচিশ ত্রিশটার অধিক ধ্বনি পাওয়া যায় না, কিন্তু লৌহের একটি পরমাণু—রাসায়ণিকের দৃষ্টিতে যাহা নির্দ্দিষ্ট ওজন ও নির্দ্দিষ্ট সংযোগ-শক্তি-সম্পন্ন একটি সামান্য পদার্থ—সাত হাজারের অধিক বিভিন্ন প্রকারের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উৎপাদন করিতে পারে, তাহার প্রত্যেকটি আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত হয়। এই জন্যই প্রফেসর রোল্যাণ্ড বলিয়াছিলেন যে একটি পরমাণু পিয়ানো অপেক্ষাও জটিল।

পরমাণুরূপ পিয়ানোর তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রফেসর বর চিরযশস্বী হইয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সরল হাইড্রোজেন পরমাণু লইয়াই তিনি প্রথম গবেষণা করেন। হাইড্রোজেনের বর্ণচ্ছত্রে যে আলোকরেখাগুলি পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে একটা সহজ সম্বন্ধ আছে; ইহার আবিষ্কারক বামার (Balmer) নামক একজন অখ্যাতনামা স্কুল মাষ্টার। প্রফেসর রাদারফোর্ড পরমাণুর যে গঠন নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পরমাণুর এইরূপ গঠন সত্য হইলে উহার উপাদান প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণগুলির গতি ও পরস্পরের আপেক্ষিক অবস্থান কিরূপ হইবে প্রফেসর বর্ তাহা হাইড্রোজেন লইয়া গবেষণা করিয়া নিরূপণ করিলেন এবং দেখাইলেন যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যেমন গ্রহগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ঘুরিয়া বেড়ায় তেমনি প্রোটনটিকে ঘেরিয়া তাহার ওজনের তুলনায় অতি লঘু ইলেক্‌ট্রণগুলি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ঘুরিয়া থাকে। পরমাণুটি যেন একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎ। এই জগতে প্রলয় উপস্থিত হইলে যখন কোনও একটি ইলেক্‌ট্রণ নিজ কক্ষাচ্যুত হইয়া অন্য কক্ষা গ্রহণ করে তখন ইহা হইতে আলোক নির্গত হয়।

এখন আলোক কি? বহুকাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপার সমাধানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। গত শতাব্দীতে প্রমাণ হয় যে আলোক আকাশে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ মাত্র। এই রকম ধরিয়া লওয়া হইত যে আলোক যখন সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে

কোনও নির্দ্দিষ্ট বিন্দু হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তখন ইহা ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হইতে থাকে ; এই ভাগের আর শেষ নাই। কিন্তু ১৯০০ খৃঃ অব্দে বার্লিনের অধ্যাপক ম্যাক্স্প্লাঙ্ক্ বলেন যে এই মত মোটের উপর সত্য হইতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে ; তিনি প্রমাণ করেন যে আলোকও এক প্রকার তেজপরমাণুর সমষ্টি ; আলোকের পরমাণুগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে এক নির্দ্দিষ্ট কোষে আবদ্ধ হইয়া আকাশে বিকীর্ণ হয়। ১৯০৫ সনে আইন্স্টাইন এই মতটি একটু সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন, তিনি বলেন আলোকের পরমাণু কি বিকীরণ কি শোষণ (absorption) সমস্ত ব্যাপারেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কোষবদ্ধ হইয়া আকাশে বিস্তৃত হয়।

প্রফেসর বর্ আলোক সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রচলিত কতকগুলি মত পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্লান্ক ও আইনষ্টাইনের নূতন মতগুলি গ্রহণ করিলেন ও নিজেও এই মতের পরিপোষক কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করিলেন। ইহাদের সহায়তায় প্রমাণ করিলেন যে প্রোটন্ ও ইলেক্ট্রণগুলির আপেক্ষিক অবস্থানের বিপর্য্যয় হইতে আলোক উৎপন্ন হয়। এবং ইলেক্ট্রণগুলি নিয়মবদ্ধ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কক্ষাতেই ভ্রমণ করিতে পারে।

বর্ অত্যন্ত ভাগ্যবান্। তিনি প্রোটন এবং ইলেক্ট্রণের সমষ্টিতে গঠিত পরমাণু অবলম্বনে অঙ্ক করিয়া পরমাণুর বর্ণচ্ছত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম বাহির করেন তাহা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী খুব অল্প বৈজ্ঞানিকই হইতে পারিয়াছেন। নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে গ্রহ উপগ্রহের কক্ষা এবং স্থান গণনা করেন তখন তিনি প্রায় এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। আর এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন আইনষ্টাইন যখন তিনি তাঁহার আপেক্ষিক তত্ব হইতে প্রমাণ করেন যে আলোক রশ্মি যখন সৌরমণ্ডলের খুব নিকট দিয়া গমন করে তখন উহার পথ খানিকটা বাঁকিয়া যায় এবং এই বক্রতার পরিমাণ পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্থানচ্যুতির সঙ্গে অদ্ভুত রকমে মিলিয়া যায়। খুব অল্প বৈজ্ঞানিকই এইরূপ সৌভাগ্যবান হইতে পারিয়াছেন। বরের কাজটিও এই শ্রেণীভুক্ত। পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই তিনটি ব্যতীত ইহাদের জুড়িদার আর একটি চতুর্থ ঘটনা কেহ খুঁজিয়া পাইবেন কিনা সন্দেহ। বরের অবিষ্কার প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২ খৃঃ অব্দে লণ্ডন ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে। ইহাতে পরমাণু সম্বন্ধে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ কালে পরমাণুর সম্বন্ধে অনেক গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিবেন। তখনই এই আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইলেক্ট্রণ ও প্রোটন এই দুইটি হইতে যে কত নূতন পরমাণুর জন্ম হইবে বর্ নিজেই সম্প্রতি তাহার পূর্ব্বাভাষ দিয়াছেন।

যে আবিষ্কারের জন্য বর্ ১৯২২ সালে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। এই আবিষ্কারের সময় তিনি ম্যানচেষ্টারের গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। তখন এই অখ্যাতনামা যুবককে কয়জন লোকেই বা চিনিত! এই প্রবন্ধ লেখককে তাঁহার এক জার্ম্মাণবন্ধু বলিয়াছিলেন যে ক্ষুদ্র ডেনমার্ক তাহার বরপুত্রকে উপযুক্ত কাজ দিতে পারে নাই।

প্রথম হইতেই যে সমস্ত বিদ্যায়তন বরের আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে ও তাঁহার গুণগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের অন্যতম। এখানে ১৯১৭ সাল হইতে এই আবিষ্কার সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির অধ্যাপনা করা হইতেছে।

শ্রীমেঘনাদ সাহা।

যৌবনের সাধন

১

যৌবন মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম কাল। এই যৌবন সময়েই মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শের ছবিটা ফুটিয়া উঠে। যার যৌবন বিফলে যায়, সে এ জীবনে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। আর যৌবনের সম্যক সফলতা লাভ করিতে হইলে যৌবনের সাধন করিতে হয়।

সাধনের প্রথম, সাধ্য-নির্ণয়। সাধনের দ্বারা কি লাভ হইবে কিম্বা কি লাভ করিতে চাই, তাহার পরিষ্কার ধারণা হওয়া আবশ্যক। ইহা-ই সাধ্য-নির্ণয়ের অর্থ।

যৌবনের প্রকাশ তিন দিক হইতে আরম্ভ করে; অথবা চারিদিকেই আরম্ভ হয়, একথাও বলা যাইতে পারে। প্রথম—শরীর; দ্বিতীয় মন; তৃতীয়—রঞ্জিনী বৃত্তি; চতুর্থ—আত্মা। এই চারি কলাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর এই চারি দিকেই যৌবনের সাড়া পড়িয়া, এই মনুষ্যত্ব বস্তুকে ফুটাইতে আরম্ভ করে। সুতরাং যৌবনের সাধনও এই চারি কলাতেই পরিপূর্ণ হয়। অথবা যৌবনের সম্যক্ সফলতা লাভ করিতে হইলে শারীরিক, মানসিক, রসের বা রঞ্জিনীবৃত্তির এবং আত্মার এই সাধন-চতুষ্টয় অবলম্বন করিতে হয়। শরীর, মন, রঞ্জিনীবৃত্তি এবং আত্মা, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের এই চার অঙ্গের প্রত্যেক অঙ্গের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সকলের আগে ইহাদের বিশিষ্ট-লক্ষ্য বা আদর্শের পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক হয়। এই সকল বিশিষ্ট লক্ষ্য বা আদর্শই যৌবন-সাধনার সাধ্য। এই চারিদিক দিয়াই যৌবনের নিজস্ব প্রকৃতিকে ফুটাইয়া তুলিয়া ও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া যৌবনের সফলতালাভ করিতে হয়। বিষয়টা ক্রমে যথাসাধ্য খুলিয়া বলিতে চেষ্টা করিব।

২

প্রথম, শরীরের কথা। জীবদেহের একটা গঠন, একটা প্রকৃতি, একটা বিধি-ব্যবস্থা, এবং এই বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। গঠন বলিলেই কোনও বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝায়। জীবদেহের এসকল বিভিন্ন অংশকে আমরা অঙ্গ বলিয়া থাকি। দেহের এসকল অঙ্গের পরস্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবার প্রত্যেক অঙ্গের পরস্পরের মধ্যে ব্যষ্টিভাবে এবং সকল অঙ্গের সঙ্গে সমষ্টিভাবে সাকুল্য জীবত্বের একটা সম্বন্ধ আছে। গোটা জীব অঙ্গী। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ এই অঙ্গীতে সমাবিষ্ট। প্রত্যেক অঙ্গের এক একটা নিজস্ব লক্ষ্য বা সাধ্য আছে। যেমন চক্ষুর লক্ষ্য দর্শন, কানের লক্ষ্য শ্রবণ ইত্যাদি। প্রত্যেক অঙ্গের এই সকল বিশিষ্ট লক্ষ্য বা সাধ্যের ভিতর দিয়া এসকল অঙ্গ জীবের সমষ্টিগত জীবনের যে বিশিষ্ট লক্ষ্য বা সাধ্য তাহাকেই ফুটাইয়া তুলে। অঙ্গের সার্থকতা অঙ্গীতে। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের বিশিষ্ট উদ্দেশ্য কতটা সফল হইল বা না হইল তাহার বিচার ও মীমাংসা হইবে অঙ্গীর লক্ষ্যের বা সাধ্যের সফলতার পরিমাণ দিয়া। সুতরাং যৌবনের শারীরিক সাধনার আলোচনায় মানবের শারীরিক জীবনের মূল সাধ্যটা কি, ইহাই প্রথম প্রশ্ন।

শরীরী মাত্রেই প্রাণপণ করিয়া শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহে। এই শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখাই জীবনের প্রথম লক্ষ্য। এই সত্যটা বুঝিয়াই আমাদের প্রাচীনেরা কহিয়াছিলেন—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম। শরীরের সাধ্য জীবন রক্ষা করা। যত দিন সম্ভব বাঁচিয়া থাকা, অথবা দীর্ঘায়ু লাভ করা। আমাদের প্রাচীনেরা শতবর্ষকাল মানুষের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল বলিয়া গিয়াছেন। এই শত বর্ষ পরমায়ু লাভ করা শরীরের সাধনার প্রথম লক্ষ্য। আমাদের প্রাচীনেরা মানুষের পরমায়ু শতবর্ষ ধরিয়া—আষোড়শাৎ সপ্ততিপর্য্যন্তং ষোড়শ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত যৌবনকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ষোড়শ বৎসর হইতে মানুষ ফুটিতে আরম্ভ করে; সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত সে ফুটিতেই থাকে। সত্তর বৎসর বয়সে মানুষ তাহার প্রস্ফুট অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সত্তরের পর হইতে সে ঝরিতে আরম্ভ করে। আর জীবনের এই শেষ ত্রিশবৎসর কাল মানুষের ঝড়ুতিপড়ুতির সময়। মানুষ শতবর্ষকাল জীবিত থাকিতে পারে, ইহা কবিকল্পনা নহে। এখনও মাঝে মাঝে আমরা শত বৎসরের জীবিত স্ত্রীপুরুষের কথা শুনিতে পাই। আর সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত যে, মানুষের শরীরের শক্তি অটুট, মনের তেজ অক্ষুন্ন থাকিতে পারে, বহুতর জ্ঞানবৃদ্ধ ও কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ লোকদিগের মধ্যে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। সুতরাং শতবর্ষকাল জীবন রক্ষা করা আর সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত যৌবনকে বাঁচাইয়া রাখা ইহা বর্ত্তমানের অবস্থাধীনে দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করাই শরীরের সাধনার প্রথম সাধ্য।

কিন্তু শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিতে হইলে শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তিও লাভ করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং স্বাস্থ্য, শক্তি এবং দীর্ঘায়ুলাভই শরীরের সাধনার সাধ্য হয়। এই লক্ষ্য ধরিয়াই যৌবনে শরীরের সাধনা করিতে হইবে।

৩

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের মূল লক্ষ্য ছিল। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর বিধিব্যবস্থাসকল শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্যই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ত্তমানে আমরা প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের সকল বিধিব্যবস্থাকে অবলম্বন করিতে পারি বা না পারি, তাহার মূল লক্ষ্যটিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

শরীরের সাধনার আলোচনাতে আমাদিগকে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। এ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নৈসর্গিক অবস্থাই প্রথমে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। বাহিরের আবহাওয়ার গতিবিধির উপরে আমরা নিজেদের অক্ষুন্ন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারি না। আমাদিগের আদেশে মাঘের কাঁপানো শীতও কমে না, বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তেজও হ্রাস হয় না। সুতরাং এগুলিকে আমরা ইচ্ছা করিয়া নিজের শরীরের স্বাস্থ্য, শক্তি এবং সুখসাধনের উপযোগী করিয়া লইতে পারি না। কিন্তু আমাদের নিজেদের শরীরটাকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারি, যাহাতে শীতগ্রীষ্মাদির বৈষম্যের দ্বারা আমাদের শরীরের সমতা কখনওই নষ্ট হইবে না। শরীরের এমন অবস্থা করা অসাধ্য নয় যে মাঘের দুরন্ত শীতেও ক্লিষ্ট হইব না আর বৈশাখ

ব্যবস্থাপক সভাকে ঝোঁড়ের অনন্ত তাপেও জর্জ্জরিত বা ক্লিন্ন হইব না। শরীরের এই অবস্থাকেই আমাদের প্রাচীনেরা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা কহিয়া গিয়াছেন। ইহারই আভাস পাইয়া ইংরাজেরাও মানুষের 'Powers of physical endurance'এর প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থালাভই শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তি লাভের মূল সঙ্কেত। আর এই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থালাভই প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল। শীত-গ্রীষ্ম, সোয়াস্তি অসোয়াস্তি, প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে দ্বন্দ্ব কহে। শরীর সম্বন্ধে এসকল দ্বন্দ্বের অতীত হওয়াই শারীর সাধনার প্রথম সাধ্য। এই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থালাভ করিতে পারিলে শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তিলাভ করিয়া মানুষ পরিপূর্ণ আয়ুষ্কাল লাভ করিতে পারে।

৪

যৌবনকালে শরীরের যাবতীয় বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ফুটিতে আরম্ভ করে। আর সুস্থ এবং সবল শিশু যেমন জন্মিয়াই আপনার ভিতরের নূতন প্রাণতার প্রেরণায় প্রাণপণ করিয়া চারিদিকে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন আরম্ভ করে; যৌবনও সেইরূপ ফুটিতে আরম্ভ করিয়াই আপনার ভিতরের নূতন যৌবনশক্তির প্রেরণায় নিজের নবোন্মেষিত বৃত্তি এবং প্রবৃত্তিগুলিকে সর্ব্বপ্রকারের ভয়-ভাবনা বিরহিত হইয়া চারিদিকে ছুটাইয়া দেয়, যৌবনের সাড়া পাইয়া ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে চায়, যৌবনের এই লক্ষণটা দেখিয়াই প্রাচীন নীতিবাদীরা ইহাকে বিষম কাল বলিয়া চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞানশূন্য শাসনের চাপে বহুযুগ ধরিয়া যৌবন নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার অবসর পায় নাই। সে শাসনও সর্ব্বথা সফল হয় নাই। বাহির হইতে কোনও জীবন্ত বস্তুকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া শাসন করিবার চেষ্টা করিলে সর্ব্বদাই এইরূপ নিস্ফলতা আহরণ করিতে হয়। এইরূপ শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াই অন্ধ মানুষ খোদার উপরে খোদ্‌গিরি করে; এবং পরিণামে চারিদিকে নিস্ফলতা আহরণ করিয়া হায়রান হইয়া কহে,

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ;

জীব সর্ব্বদাই আপনার প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় তাহার এই প্রকৃতিকে চাপিয়া রাখিয়া ফল কি ?

ফোটাই যৌবনের প্রকৃতি। যৌবনে ইন্দ্রিয়সকল নবচেতনা পাইয়া অভূতপূর্ব্ব শক্তি অনুভব করিয়া, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসের সন্ধান পাইয়া সকল প্রকারের বন্ধন ছিঁড়িয়া আপনার প্রকৃতির প্রেরণায় এই শোভাসুখপূর্ণ আনন্দময় বিশ্বের চারিদিকে ছুটিয়া যায়—"সে বারণ নিবারণ অঙ্কুশ না মানে।" এ হাতীকে বাঁধিবে কে ? যে শক্তিতে যৌবনকে প্রাচীনতন্ত্রের নীতিবাদীদিগের চক্ষে বিষম কাল করিয়া তুলিয়াছে, সেই শক্তির দ্বারাই যৌবনকে সংযত এবং সুশাসিত করিতে হইবে। ইহার আর অন্য পথ নাই। অন্য যে কোনও পথে যৌবনকে শাসন করিতে যাও না কেন, তাহার ফলে হয় যৌবন একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে; না হয় তোমার মনগড়া বেড়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রকৃতির প্রতিশোধ তুলিবে। এসংসারে সর্ব্বত্রই আত্মশাসন বা স্বায়ত্তশাসন একমাত্র বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট শাসন। রাষ্ট্র সম্বন্ধেও একথা যেমন সত্য,

সমাজ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য, ব্যক্তিগত সম্বন্ধেও সেইরূপই সত্য। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জীবনের সকল অবস্থাতেও ইহা সত্য। স্বাধীনতাই একমাত্র পরম পুরুষার্থ।

যৌবনই যৌবনকে নিজের প্রয়োজনে শাসিত এবং সংযত করিবে। বার্দ্ধক্যের এ অধিকার নাই, ইংরাজের যেমন অধিকার নাই ভারতকে শাসন করা; সে অধিকার কেবল ভারতবাসীরই আছে—ইংরাজের সুশাসনও ভারতের নিজের আত্মচরিতার্থতা লাভের হিসাবে সুশাসন নহে, কুশাসন; সেইরূপ বার্দ্ধক্যের জ্ঞানগরিমা প্রেরিত, কল্যাণকামনাপূর্ণ শাসনও যৌবনের নিজের আত্মচরিতার্থলাভের হিসাবে অনেক সময় নিতান্ত কুশাসন হইয়া উঠিতে পারে। এইজন্য যৌবনকে যৌবনের শাসনের ভার নিজের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

কিন্তু ইহার অর্থ এ নয় যে, বার্দ্ধক্য যৌবনকে নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যৌবন যে কি বস্তু, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিবে না। একটা চীনদেশীয় গল্প আছে যে সমুদ্রের মাছেরা একবার এক বৃদ্ধ মৎস্যের নিকটে যাইয়া কহিয়াছিল, "আমরা জন্মাবধি সমুদ্রের নাম শুনিয়াছি; কিন্তু সমুদ্র কখনও দেখি নাই। সমুদ্র কাকে বলে আপনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন।" মানুষ যখন যাহাতে মজিয়া যায়, তখন সে বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান অনেক সময়েই লাভ করিতে পারে না। সুতরাং যৌবনের প্রবল জলতরঙ্গে যাহারা স্রোতের শেওলার মতন ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহারা যে অনেক সময় এই যৌবনের প্রকৃতি ও স্বরূপ কি ধরিতে পারে না, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। আর এইখানেই যৌবনের শিক্ষাতে এবং সাধনায় বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এবং অধিকার। এই অধিকার গ্রহণ করিয়া বার্দ্ধক্য যৌবনকে আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ করিয়া আত্মশাসনের পথে পরিচালিত করিবে।

নূতন জলের মাছ যেমন সেই জলাভিষেকের আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করে, কোথায় ধীবরের জালপাতা আছে তাহা বুঝে না; যৌবনের নূতন জলের অভিষেকে মানুষের ইন্দ্রিয় সকলও সেইরূপ আপনার ভাবে মাতোয়ারা হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে, কোন্‌দিকে কোথায় যে কালের প্রচ্ছন্ন জাল পাতা আছে তাহার সর্ব্বনাশের জন্য, ইহা জানে না এবং বুঝে না। কোন্ পথে গেলে যে সুখ এবং আনন্দের সন্ধানে সে ছুটিয়াছে তাহা মিলিবে, কোন্ পথে মিলিবে না, এইটি বুঝাইয়া এবং দেখাইয়া দেওয়াই বার্দ্ধক্যের কর্ত্তব্য এবং অধিকার। আর এটী দেখিলে এবং বুঝিলে যৌবন নিজেই আপনার আইন-কানুন এবং শাসনতন্ত্র আপনি স্বচ্ছন্দে গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাবিরাটের ভার

বিরাট বিশাল আকাশ বারিধি হ্রদ নদনদী ধারা
ধরিতে পারে না তাঁহার ভূধর চন্দ্র সূর্য্য তারা
বিশ্বম্ভরে বিশ্বের রথ বহিতে কভু না পারে
মহাকাল মহাব্রহ্মাণ্ডও তাঁহারে ধরিতে নারে।
লঘু হয়ে দীন ভক্তের হৃদি করেছেন অধিকার
চির দিন তাই ভক্ত বহিছে মহাবিরাটের ভার।

শ্রীকালিদাস রায়।

পুস্তক সমালোচনা

ভজার বাঁশী—শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই, সি,এস প্রণীত মূল্য, ১৷০, শিশুপাঠ্য ছড়ার বই। ইহার অধিকাংশই বিলাতী Nursery Rhymes এর অনুকরণে লিখিত। শ্রীযুক্ত দত্তমহাশয় নানা গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও বাংলা দেশের শিশুদের মনোরঞ্জনে ও সেই সূত্রে মাতৃভাষার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমাদের আনন্দ হইয়াছে। তাঁহার আয়োজন সার্থক হউক, তাহার বাঁশীর সুরে, নিরানন্দ বাংলার শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠুক।

৺শ্রীনাথ দত্তের জীবন কথা—তদীয় পত্নী শ্রীহরসুন্দরী দত্ত কর্তৃক লিখিত মূল্য ১৷৷০ ; ৺শ্রীনাথ দত্তমহাশয় ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বদেশ-হিতৈষী, ধার্ম্মিক এবং সুলেখক ছিলেন। তাঁহার জীবন চরিতের অধিকাংশ স্থানের বর্ণনাই বেশ হইয়াছে। তাঁহার সত্য ও ধর্ম্মানুরাগ, তজ্জন্য নানা জীবন-সংগ্রাম প্রভৃতি পাঠ করিলে উপকৃত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকর্ত্রীর জীবনের অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জীবন-সংগ্রাম—শ্রীভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত। মূল্য ২৷৷০ গ্রন্থকার পুস্তক খানির ভিতরে জীবনের নানা সংগ্রামের বিষয় ও তাহা জয়ের উপায় চিন্তা করিয়া অনুরাগের সহিত তাহার দীর্ঘ জীবনের বহুদর্শিতার ফল চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা সফল হউক।

ভারত-বাণী—শ্রীজ্ঞানদাশঙ্কর সান্যাল প্রণীত। মূল্য এক টাকা। কাপড়ে বাঁধাই দেখিতে বেশ সুন্দর। কবির উদ্যমের সার্থক হউক।

মানব-মুকুট—মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত মূল্য ।০

ইসলাম ধর্ম্মের প্রচারক হজরত মহম্মদের আদর্শ কত উচ্চ ও গভীর তাহাই দেখাইতে গ্রন্থকার প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন এক মহাপুরুষকে বড় করিতে হইলে বা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইলে অন্য মহাপুরুষের সঙ্গে তুলনা আবশ্যক বা অন্য মহাপুরুষকে ছোট করিয়া দেখাইতে হইবে এ ধারণা সমীচীন নয়; ইহাতে প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন হয় না। সকল মহাপুরুষের জীবনেই বিধাতার ভিন্ন ভিন্ন বাণী ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত। গ্রন্থকার ইহা স্মরণ রাখিলে ভাল করিতেন। তাঁর উৎসাহ উদ্যম প্রশংসনীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার উন্নতি কামনা করি।

সঙ্গণিকা

এবার নবেম্বর অধিবেশন হইতে নূতন প্রেসিডেণ্ট মিঃ কটন আসন গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গের গবর্ণর মহোদয় কাউনসিলের প্রথম দিনে বক্তৃতা করিতে আসিলেন। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন যে উত্তরবঙ্গের বন্যা উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিবেন, কারণ, দেশে কোন অসাধারণ বিষয় উপস্থিত হইলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ উপলক্ষে সরকারের পলিসি ব্যক্ত করিয়া থাকেন; ইহাই প্রচলিত রীতি। লিটন্ সাহেবকে বন্যায় প্লাবিত করিতে পারে নাই, তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুরের হাতে এ কাজের ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। গবর্ণর বক্তৃতা করিলেন, কটন সাহেবের নিয়োগ সম্বন্ধে; ডিপুটিপ্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্তসুরেন রায়ের সুখ্যাতি করিতে গিয়া, তাঁহাকে যে প্রেসিডেণ্ট করা হয় নাই, একথা উল্লেখ করিয়া, কাটা ঘাঁয়ে নূনের ছিটা দিয়াছেন। গবর্ণর মহোদয়ের মোট কথা এই, ব্যবস্থাপক সভা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ছোট খাট সংস্করণ, এখানে পার্লামেণ্টের অনুরূপ নিয়মাবলী প্রচলন করিবার জন্য একজন পার্লমেণ্টের সভ্য আনা দরকার—ফল, কটন সাহেবের নিয়োগ। স্যার সৈয়দ সামসুল হুদা বা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় যে প্রেসিডেণ্টের কাজ উপযুক্ত রূপে করিতে পারেন নাই, তাহা অবশ্য বলিতে সাহস পান্ নাই, তবু বিলাতী পার্লামেণ্টের অনুরূপ করা দরকার ও তাহা করিতে হইলে পার্লামেণ্টের একজন সভ্য না হইলে চলেনা; চমৎকার লজিক! ইহাতে আপত্তির আর কি কথা থাকিতে পারে? কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাটা যে কিরূপে পার্লামেণ্টের অনুরূপ হইল তাহা আমরা এখন ও বুঝিতে পারি নাই। শুধু বাহিরের খোসার নকল করিলে কোন জিনিষের অনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়না। কাক ও ময়ূরপুচ্ছের গল্প বোধ হয় লিটন সাহেব জানেন। তবে আমাদের দেশে, যেখানে হ্যাট কোট পড়িলেই "ইংরেজ" হওয়া যায়, গেরুয়া পোষাক পড়িলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায়, সেখানে বাহিরের পোষাক দিয়া ব্যবস্থাপক সভাকে পার্লামেণ্টের অনুরূপ করিতে যাওয়া সমীচীন বটে। কটন সাহেব পার্লামেণ্টের speaker এর ন্যায় পরচুলা ও পোষাক পড়িয়া আসেন, তাঁহার পাশে সব সময় চোপদার রঙ্গিন পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এখন ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা করিতে হইলে পূর্ব্বের মত শুধু প্রেসিডেণ্টের নিকট নাম পাঠাইলে চলেনা, খোদ পার্লামেণ্টের ন্যায় সভ্যগণকে দাঁড়াইয়া প্রেসিডেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়। (you must catch the eye of president) এই catch the eye লইয়া প্রত্যহই চমৎকার অভিনয় হয়। এক সঙ্গে দশ বার জন দাঁড়াইয়া দৃষ্টি আকর্ষণের নিঃশব্দ ও সশব্দ বিফল চেষ্টা করেন, কেহ কেহ সময় মত catch the eye করিতে না পারিয়া সযত্ন-লিখিত বক্তৃতাখানা ক্ষুন্নমনে পকেটে করিয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হন। পার্লামেণ্টের চমৎকার অনুকরণ। কটন সাহেব Parliament এর ছয়শত-জনসভ্যের মধ্যে নগন্য একজন মাত্র ছিলেন সেখানে বিশেষ প্রতিপত্তি করিতে পারেন নাই। Parliamentএর ছয়শত সভ্যই যে পার্লামেণ্টের আদত spirit ধরিতে পারিবেন তার কোন মানে নাই। কেহ কেহ যদি বাহিরের আচরণটাকেই পার্লামেণ্টের বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ মনে করেন তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। বাহিরের চাল চলিতে শিখাইবার জন্য কটন সাহেবকে না আনিয়া, যদি লিটন্ সাহেব এই অন্তঃসার শূন্য পার্লামেণ্টের শতাংশের একাংশও ক্ষমতা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেন, তবে একটা কাজের কাজ হইত। তারপর, আরেক কথা, সামসুল হুদা সাহেব যে সব নিয়ম procedure

অবলম্বন করিয়াছিলেন, কটন সাহেব তাহা পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আবার দু বৎসর পরে যখন ব্যবস্থাপক সভা নূতন প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করিবে, তখন যদি নূতন president কটন সাহেবের প্রবর্ত্তিত নিয়ম পরিবর্ত্তন করেন, তবে কটন সাহেবের parliamentary procedureএর মূল্য কি থাকিবে?

নবেম্বর অধিবেশনে ব্যবস্থাপক সভাগৃহ উত্তর বঙ্গের বন্যার প্রসঙ্গে প্লাবিত হইয়াছিল। প্রথমেই বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর বন্যাপীড়িতের সাহায্যের জন্য ৩০,০০০ হাজার টাকা চাহিলেন। জনৈক সুরসিক সদস্য "কার্য্যকুশল" গবর্ণমেণ্টের "বদান্যতার" পরাকাষ্ঠা ও সময়োপযোগিতার পরিহাস করিয়া এই ত্রিশহাজার টাকা হইতে একটাকা কাটিয়া দিতে চাহিলেন। গবর্ণমেণ্টের কোন পলিসির আলোচনা করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের দাবী টাকা নাম মাত্র কমাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা পার্লামেণ্টের চিরন্তন নীতি সঙ্গত। লর্ড্ রোণাল্ডশে ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার প্রথম অধিবেশনে এই নীতি সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন; কিন্তু লর্ড লীটন্ কর্ত্তৃক আনীত পার্লামেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সভ্য কটন সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "আগামী কল্য এ বিষয়ে রিজলিউশন্ আছে, অতএব আজ এ বিষয়ে বিশদ্ আলোচনা হইতে পারে না।" চমৎকার পার্লামেণ্টেরী procedure;—বেসরকারী রিজলিউশন্ আনিয়া গবর্ণমেণ্টকে শতবার গালাগালি দিলে ও কিছু হয়না, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের বাজেটের টাকা কাটিতে পারিলে, গভর্ণমেণ্টের পলিসির যে তীব্র censure হয়, তাহা কি কটন সাহেব জানেন না? গবর্ণমেণ্টের Policy লইয়া বিশদ্‌ভাবে আলোচনা না করিলে সদস্যগণ কি বুঝিয়া ভোট্ দিবেন?

পরদিন, সারাদিন বক্তৃতার পর, একটী কমিটী নিয়োগ করা ঠিক হইল। জলপ্লাবনের কারণ কি এবং কি উপায়ে উহা দূর করা যাইতে পারে তাহাই এই কমিটি নির্দ্ধারণ করিবেন। বেসরকারী লোকের নাম ত কমিটিতে বড় দেখা যায় না। ফলাফল কিরূপ হইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ দেখা যায়।

কলিকাতা হইতে গুণ্ডার অত্যাচার দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। কলিকাতা পুলিশকে অপ্রতিহত ক্ষমতা দেওয়া হইবে। কলিকাতা পুলিশের উপর লোকের বড় বিশেষ আস্থা নাই; গুণ্ডার উপদ্রব দূর করা দরকার সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঘের কবল হইতে বাঁচাইতে গিয়া কুমীরের হাতে যেন ফেলিয়া না দেওয়া হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। বেতাল।

* * * *

কয়েক বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অর্থের অনাটন হইয়াছে। সেই অনাটন পাঁচ লক্ষ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় কয়েকটী সর্ত্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে, সর্ত্ত সমেত আড়াই লক্ষ টাকা দান গ্রহণ করা, সিনেটের অধিকাংশ সভ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানের ও সুব্যবস্থার হানিকর মনে করিয়াছেন এবং সেইজন্য তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

কাহার এবং কি কি দোষে বিদ্যালয়ের এই অভাব হইয়াছে তাহার সূক্ষ্ম আলোচনা এস্থলে নিস্প্রয়োজন। তবে মোটামুটি কয়েকটী কারণ দেখা যায়।

পাটনা, রেঙ্গুন ও ঢাকায় আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের ব্যয় বাহুল্য।

অসহযোগের জন্য অনেক ছাত্রের স্কুল ও কলেজ ত্যাগ ও সেইজন্য পোষ্টগ্রাজুয়েট ডিপার্টমেণ্টের আয়ের পথ কমিয়া যাওয়া।

গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত অর্থ সাহায্যে কৃপণতা।

এই সকল কারণে অথবা অন্যান্য কারণে স্বর্থের অনাটন হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ দেশবাসীগণের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া কাজ চালাইবেন বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছেন সেই সঙ্কল্পের তেজস্বিতার সমর্থন না করিয়া পারি না। এবং দেশবাসীগণকে প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত সাহায্য দিতে অনুরোধ করি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণেরও উচিত যাহাতে ইহার পরিচালনে ব্যয়াধিক্য না হয় সে বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি দেওয়া।

হইতে পারে—এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না ও ইহার নানারূপ ত্রুটি আছে। কিন্তু দেশে শিক্ষার আর কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই। এই একমাত্র প্রতিষ্ঠানটী যাহাতে অর্থাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বা গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়মুষ্টির ভিতর চলিয়া না যায় তাহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। গবর্ণমেণ্টেরও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে অর্থের এইরূপ অনাটন পড়িয়াছে। যে গবর্ণমেণ্ট নিজে দেউলিয়া সেই গবর্ণমেণ্ট কি করিয়া ঐরূপ আর একটী প্রতিষ্ঠানের ব্যয়াধিক্য বিষয়ে এইরূপ সমালোচনা করিতে পারেন তাহাই সকলের নিকট আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হইয়াছে।

* * * *

পঞ্জাবে শ্রীমতীপার্ব্বতী দেবীর রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। হাসিমুখে বীররমণী দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। রাজনৈতিক কারণে ইতিপূর্ব্বে আর কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মহিলা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন কিন্তু এই বিশেষ অপরাধে মহিলার কারাদণ্ড এই প্রথম বলিয়া তিনি নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে করিয়াছেন। অসহযোগিনী বলিয়া তিনি বিচারালয়ে নিজপক্ষ সমর্থন করেন নাই। তাঁহার দিক হইতে যাহা বলিবার, ওজস্বিনী ভাষায় লিখিয়া তিনি তাহা আদালতে দাখিল করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ও মান ওয়ালে নারীদের অত্যাচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া, তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর কাজ পরিত্যাগ করিয়া, আত্ম-নির্ভরতা, অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন। যে বক্তৃতায় তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছে, সেই বক্তৃতায় তিনি যাহা বলিয়াছেন বলিয়া পুলিশের উক্তিতে লেখা হইয়াছে, তাহা তিনি তাঁহার নিজের বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা দিয়া থাকেন। কিন্তু পুলিশের উদ্ধৃত বক্তৃতাতে এমন সব বড় বড় আরবী ও ফার্সী শব্দ আছে যাহা তিনি কখনও ব্যবহার করেন না এমন কি তিনি তাহার অর্থই জানেন না।

অবশ্য পুলিসের বিরুদ্ধে এঅভিযোগ নূতন নহে। অনেক জায়গায়ই দেখা যায়, যেখানে রাজনীতির অভিযোগে পুলিসের সংশ্রব, প্রায়ই সেখানে এক অভিযোগ—মিথ্যা-দোষারোপ—মিথ্যা মামলা সাজান। শান্তিরক্ষক পুলিশদের শান্তিরক্ষার চেষ্টা ও উপায় দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। অথচ সরকার বাহাদুরের ইহাদের পরিপোষণেই ব্যয়াধিক্য!

শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী তাঁহার ভারতীয়া ভগিনীগণকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে দেশের ভালমন্দ মেয়েদের হাতে। মেয়েরা যদি স্বরাজসাধনায় পুরুষদের সাহায্য করিয়া উৎসাহ দেন, তবে তাঁহারা সকল রকম দুঃখ কষ্ট বিপদ লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইতে পারেন।

নব্যভারত

চত্বারিংশ খণ্ড] মাঘ, ১৩২৯ ১০ম সংখ্যা

চিত্ত বিনিময়

প্রেমাস্পদের সম্বন্ধে মানুষের হৃদয়ে যতরূপ আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তার মধ্যে একটি এই যে আমি তুমি হ'য়ে যাই; তোমার চোখে জগৎকে দেখি; তোমার চৈতন্যে প্রবেশ ক'রে, তোমার সুখ দুঃখ, তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা আপনাতে সম্ভোগ করি; বিশেষতঃ যে ভালবাসায় তুমি আমায় ভালবাস্‌চ আমার অন্তরে আমি তার একটু আস্বাদন পাই।

মানুষ যে-সময় জ্ঞানরাজ্যে চিন্তারাজ্যে থাকে, তখনও তার অপরকে জান্‌বার বোঝ্‌বার দরকার হয়; সংসারের অধিকাংশ জানা ও বোঝা এই জাতীয়। দূরে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে, অনুসন্ধানের ভাবে, পরীক্ষার ভাবে, কখনও বা অকারণ অলস কুতূহলের ভাবে, মানুষ মানুষের সম্বন্ধে কত খবর লয়, কত সত্য কত তথ্য সাবধানে সংগ্রহ করে। এই রকম ক'রে বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ মানুষকে যতই তলিয়ে বুঝুক না কেন, তা দিয়ে প্রেমের কাজটি হয় না। প্রেমের জানা, প্রেমের বোঝা আর এক রকমের। বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে যখন বুঝতে যাই তখন আমার দৃষ্টি আমার পরীক্ষার চক্ষুই প্রধান হয়। কিন্তু প্রেমের জানা বোঝাতে অনুভূতি-বিনিময় চিত্ত-বিনিময়ই প্রধান।

আমি ঠিক তার মনটি পেয়ে, তার চেতনাটি পেয়ে সে যেমন ক'রে অনুভব ক'র্‌চে, তেম্‌নি ক'রে অনুভব ক'র্‌ব, এই হ'ল অনুভূতি-বিনিময়ের, চিত্ত-বিনিময়ের পথ। আমি, আমার অনুভব, আমার চক্ষু, আমার দৃষ্টি,—এ সকলকে বাদ দিয়ে এ পথে চল্‌তে হয়।

এই চিত্ত-বিনিময় প্রেমের জীবনের একটি বিশেষ সাধনা। এর চর্চ্চা না থাক্‌লে খুব উচ্চ জীবন, জ্ঞানের জীবন, কর্ম্মীর জীবন, এমন কি ভাবুকের জীবনও প্রেমের সরসতায় বঞ্চিত হ'তে পারে।

মানুষকে বুঝতে গিয়ে যাঁরা অনুভূতি-বিনিময়ের চর্চ্চা না ক'রে শুধু বুদ্ধির চর্চ্চা করাটাই যথেষ্ট মনে করেন, তাঁরা সুদক্ষ পরিচালক পরিদর্শক অভিভাবক হ'তে পারেন, কিন্তু হৃদয়রাজ্যের গভীরতর প্রদেশসকলে তাঁরা বিদেশী।

মানুষে মানুষে সকল সম্বন্ধের স্বাভাবিক পরিণতি বন্ধুতায়। এই স্বাভাবিক পরিণতি চিত্তবিনিময় বিনা লাভ হয় না। যেখানে চিত্তবিনিময় নাই সেখানে পিতা মাতা সারাজীবন সন্তানের পিতা মাতাই থেকে যান, বন্ধু হবার সৌভাগ্য তাঁদের আর হয় না। স্বামী স্বামী-মাত্র থাকেন, বন্ধু হন না। স্ত্রী গৃহিণী হন, হয়তো সহধর্ম্মচারিণীও হন, কিন্তু বন্ধু হন না।

(২)

যেখানে সত্য প্রেম, সেখানেই অনুভূতি-বিনিময়, চিত্ত-বিনিময়। আমাদের ঘরের শিশুদের প্রাণে প্রবেশ করতে তাদের প্রাণটি নিজ প্রানে পেতে, আমাদের কি ইচ্ছা হয় না? আমার বাছার কচি চোখে তার চারিদিককার এই জগৎটা কেমন লাগ্‌চে; ঈশ্বরের রচিত আকাশ পৃথিবী আর আমার হাতের গোছানো ঘর দুয়ার বাড়ী বাগান এই দুই মিশিয়ে তার যে এই আবেষ্টনটুকু তৈরী হ'য়েছে, এটুকু তার চোখে কেমন লাগ্‌চে; সে যখন নেচে নেচে খেলে বেড়ায়, কোমল দুর্ব্বাদলের স্পর্শ তার পায়ের তলায় কেমন লাগে; যে সব আনন্দে যে-সব দুঃখে তার ছোট্ট বুকটুকু তোল-পাড় হয়, সেগুলি কি কি, সেগুলি কেমন; আমাকে সে যে-ভালবাসা দিয়ে ভালবাসে, তার নিজের প্রাণে তার অনুভবটি কেমন; আমাকে সবল রক্ষক মনে করে সে আমার উপরে যে নির্ভর রাখে, সে নির্ভরটি কি রকম;—এ-সব, শিশুর প্রাণটি পেয়ে, তার সঙ্গে চিত্ত-বিনিময় ক'রে, জান্‌তে বুঝ্‌তে অনুভব কর্‌তে পিতা মাতার প্রাণ কতই আকুল হয়!

পিতামাতার প্রাণ চায়, সন্তানের সঙ্গে চিত্ত-বিনিময় ক'রে, নিজে সন্তান হতে। নীরবে প্রতিদিনের প্রেম, হৃদয়ের গোপনে, অতি গোপনে, বুঝি এই চিত্ত-বিনিময়ের মধুময় আস্বাদনটুকু যাচ্ঞা করে। এই গোপন যাচ্ঞার ফলে, সন্তান মা বলে ডাক্‌লে মা গলে গিয়ে উত্তর দেন 'মা!', বাবা ব'লে ডাক্‌লে বাবা উল্টে উত্তর দেন 'বাবা!'।

সন্তানের কাছে পিতা মাতা "তোমারই সন্তান আমি" ব'লে শত সহস্র ছলনা করেন, খেলা করেন। তার সবটাই কি ছলনা, সবটাই কি খেলা? তা নয়। এই খেলা খেল্‌তে গিয়ে পিতা মাতা শিশুর আধ আধ ভাষার অনুকরণ করেন বটে, সন্তানের ভাব ভঙ্গীর অনুকরণ করেন বটে, তবু তা শুধু অনুকরণে শুধু ছলনায় প্রতিষ্ঠিত নয়। ঐ অনুকরণটুকু ছাড়াও হৃদয়ের একটি সত্য ব্যাপার এর মধ্যে নিহিত থাকে। সত্য সত্যই পিতা মাতার প্রাণ সন্তানের সন্তান হ'য়ে যাওয়ার আস্বাদটুকু পায়; সন্তানের নির্ভরপূর্ণ ভালবাসাটুকু আস্বাদন ক'রে সুখী হয়। আমরা সন্তানের পিতা মাতা হওয়ার পর আমাদের নিজেদের পিতা মাতার সঙ্গে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ, অধিক সত্য হ'য়ে ওঠে। পিতা মাতা হ'য়েই আমারা ঠিক সন্তান হতে শিখি। কেবল যে বুড় বয়সেই আমরা সন্তানের সন্তান হই, তা নয়; সারা জীবনেই প্রাণে এই ব্যাপার চলে।

সন্তানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাতে আমরা একবার পিতা মাতা হই, একবার সন্তান হই। একটি সম্বন্ধের দুই কোটি, তার মধ্যে আমাদের আত্মা যেন দোল খায়। শুধু অপত্য স্নেহে নয়, প্রত্যেক প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'য়েই আমাদের জীবনে এই ব্যাপার ঘটে। স্বয়ং হৃদয়েশ্বরেরই এই বিধি। স্বয়ং তিনি এই দোলায় দোল দিয়ে, একবার 'তুমিতে' একবার 'আমিতে' প্রাণকে পাঠিয়ে, প্রাণকে সুস্থ রাখেন। যেন সুস্থ রক্ত আত্মার শিরায় উপশিরায় চন্ চন্ ক'রে বেগে চালিয়ে দিয়ে হৃদয়ের যৌবন হৃদয়ের elasticity রক্ষা করেন।

হৃদয়েরও স্বাস্থ্য বলে একটা জিনিষ আছে। সকলের ভালবাসাই যে সুস্থ ভালবাসা

তা নয়। এমন মানুষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যার ভালবাসাটা যেন প্রেমাস্পদকে একটা বিষম চাপের মধ্যে রাখে, যেন গ্রাস ক'রে ফেলে। যে চিত্তবিনিময় জানে না, প্রেমাস্পদের চিত্তে প্রবেশ কর্‌তে যে শেখেনি, তারই এই দশা হয়।

পুরুষ ও নারী পরস্পরকে ভালবাস্‌তে গিয়ে কতবার মনে মনে পরস্পরের সঙ্গে চিত্তবিনিময় করেন। পুরুষের ইচ্ছা হয়, নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করে, নারী হয়ে গিয়ে, নারীর যে-ভালবাসা তিনি পাচ্চেন, সেটুকু আপনাতে জাগান, আপনার চেতনায় আস্বাদন করেন। তেমনি নারীরও, পুরুষ হ'য়ে গিয়ে. পুরুষের আত্মা আপনার মধ্যে পেয়ে, পুরুষের প্রাণ যে তাঁকে কি-ভালবাসায় চায় সেটুকু বুঝ্‌তে ইচ্ছা হয়। বিবাহের মন্ত্রে পুরুষ ও নারী পরস্পরকে বলেন, "আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক।" এ কামনার সফলতা দম্পতী সারা জীবনে নানা আকারে সম্ভোগ করেন; সে সফলতার একটি বিশেষ আকার, পরস্পরের এই চিত্ত-বিনিময়।

(৩)

চিত্ত-বিনিময়ের অভ্যাস মানবপ্রাণকে স্থানের দূরতা, অবস্থার পার্থক্য, মৃত্যুর ব্যবধান, সব ভেদ ক'রে প্রিয়জনের সঙ্গে যোগ রক্ষা কর্‌বার শক্তি দেয়। বিরহী প্রেম সহজেই চিত্তবিনিময়ের পথটি দেখ্‌তে পায়, সে পথে প্রবাহিত হ'তে চায়। শৈশবে পিতামাতার বুক খালি ক'রে দিয়ে যে-সন্তান চ'লে গিয়েছে, সেই হারানো রতনের সঙ্গে যোগ রক্ষা কর্‌তে পিতা মাতার প্রাণ কতই ব্যাকুল হয়! তার প্রাণটিকে নিজ চেতনার মধ্যে ডেকে এনে, আকাশের পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকৃতে কত বার প্রাণ চায়। মনে হয়, তার সেই কচি চোখের দৃষ্টির আভা, তার সেই কচি-চোখের-দেখা অপরূপ মাধুরী, গাছের পাতায় ফুলে ফলে আকাশের ঊষায় সন্ধ্যায় নক্ষত্রে ঐ তো এখনও মাখানো রয়েছে। মন ব'লে ওঠে, "আয় রে বাছা, তোর প্রাণ নিয়ে তোর চোখ নিয়ে আমার বিরহী এ প্রাণ আজ জগৎকে আবার দেখুক। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই অনুভবে প্রাণটা ভ'রে উঠুক যে, আমি আজ আর শুধু একা দেখ্‌চি না, আমার সঙ্গে তুইও আজ দেখ্‌চিস্।"—যখন এই ভাবে হারানো সন্তানের প্রাণ নিজ প্রাণের মধ্যে নিয়ে এই পৃথিবীর দিকে তাকাই, তখন মনে হয়, এ পৃথিবী যেন এখনও তাকে হারায় নি, যেন আকাশে বাতাসে তাকে মিশিয়ে রেখেছে।

বৈধব্যের অবস্থায় বিরহী প্রাণ বার বার এই ভাবে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গ অন্বেষণ করে। জীবনের কোনও বিশেষ কাজে যাবার সময় মন বুঝ্‌তে চায় যে পর্দার আড়ালে থেকে আমার প্রেমাস্পদ আমার এ কাজ কি চক্ষে দেখ্‌চেন। জীবনের বিশেষ সুখে দুঃখে মন চায় যে সে-সুখদুঃখ তাঁর আত্মাকে গিয়ে কি ভাবে স্পর্শ কর্‌ছে, তা নিজ অন্তরে অনুভব করি। নির্জ্জন প্রকৃতির সঙ্গ পেয়ে প্রাণ চায় যে শুধু আমার জড়চক্ষে আমি দেখ্‌চি এ অনুভব টুকু নিয়ে থাকব না; আমার সঙ্গে তাঁর চিন্ময় চোখে তিনিও দেখ্‌চেন, এ অনুভবও যেন প্রাণে পাই।

শোকার্ত্ত তাপিত রুগ্ন জরাজীর্ণ মুমূর্ষু, এদের চিত্তে কি করে প্রবেশ লাভ কর্‌ব? নিজ জীবনের অনাগত অন্ধকার দিন, নিজের অসহায় জরা, নিজের অন্তিম মুহূর্ত্ত,—এ সকলের

অপ্রেম আস্বাদ কি রকম ক'রে পাব? এ সকলের জন্য কি ক'রে প্রস্তুত হব?—চিত্ত-বিনিময়ের পথে চলে এ সকলেরও পথ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

শুধু মানুষে মানুষে নয়, যেখানে ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধ জন্মে, সেখানেই চিত্ত-বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষা কোনও না কোনও আকারে জাগে। পাট্‌না শহরে একবার আমরা কয়েকজনে মিলে নৌকা ক'রে গঙ্গার চড়ায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাড়ীর কুকুরটিকে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা ছিল না, যাবার সময় তাই তাকে লুকিয়ে বেরিয়েছিলাম। মাঝগঙ্গা থেকে দেখ্‌তে পেলাম, সে জলে ঝাঁপ দিয়েছে, আমাদের নৌকার দিকে আস্‌বার চেষ্টা কর্‌চে। কি জানি কি ক'রে সে জান্‌তে পেরেছে যে আমরা নৌকায় যাচ্চি। প্রবল স্রোত, সে স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নৌকা ধরা তার সাধ্য নয়, তবু সে আস্‌বেই; বার বার সে স্রোতে ভেসে যেতে লাগ্‌ল, মারা পড়বার উপক্রম হ'ল, তবু সে আস্‌বেই। শেষে আমরা নৌকা ফিরিয়ে এনে তাকে তুলে নিলাম; তখন তার কি আনন্দ! যখন গঙ্গার চড়ায় গিয়ে আমরা বস্‌লাম, তখন সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌চে। বিশাল নদীর মাঝখানে ছোট চড়া, সেখানে জনপ্রাণী নাই, চারিদিক যেন সাঁ সাঁ কর্‌চে, মাঝে মাঝে দূর হ'তে দু একটি জলচর পাখীর অস্পষ্ট শব্দ জলস্রোতের মৃদু কল্লোলের সঙ্গে মিশে কাণে এসে লাগ্‌ছে। এই জলবেষ্টিত অন্ধকার ভয়াবহ স্থানে কুকুরটি কেমন নিশ্চিন্ত নির্ভরের সঙ্গে আমাদের কাছে ব'সে রইল। আমার কেবলি মনে হ'তে লাগ্‌ল, হায়, এই মহাপ্রাণ জন্তুটির অপদার্থ প্রভু আমি, আমার উপর কেন ও'র এত নির্ভর? আমাদের জন্য ও কেন প্রাণ দিতে যাচ্চিল? মানুষ ও'র স্বজাতি নয়, মানুষের ভাষা ও'র ভাষা নয়, তবু মানুষ-প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারে! আমি এমন অজানা ভয়াবহ স্থানে ও'কে নিয়ে এলাম, তবু আমার প্রতি ও'র কি নির্ভর! আমার কাজ, আমার অভিপ্রায়, ঐ মূক প্রাণীর স্থূল অস্বচ্ছ অবিকশিত আত্মার কাছে কত দুর্ব্বোধ্য কত দুর্জ্ঞের। কিন্তু আমার প্রভু পরমেশ্বর, তাঁকে বোঝ্‌বার জন্য আমাকে কত বিমল জ্ঞান দিয়েছেন, আমার আত্মাকে কত স্বচ্ছ ক'রে দিয়েছেন। তবু কেন আমার প্রাণে ঈশ্বরের প্রতি সেই নিশ্চিন্ত নির্ভরের ভাব আসে না, যা এই কুকুরটির প্রাণে আমার প্রতি আছে?—সেই সন্ধ্যাকালে সেই নদীর চড়ায় ব'সে ব'সে, সেই কুকুরের নির্ভরপূর্ণ প্রাণটি আমার হৃদয়ে ধর্‌বার জন্য আমার প্রাণ কাতর হ'য়ে অধীর হ'য়ে উঠ্‌তে লাগল। মন বল্‌তে লাগ্‌ল, "ওরে আমার কুকুর, তুই কি-চোখে এই অজানা অন্ধকার জল-স্থল অন্তরীক্ষ দেখ্‌চিস, তুই কি-চোখে আমাকে দেখ্‌চিস, কি-করে তা একবার আমি বুঝ্‌তে পার্‌ব! তো'র অন্তরে আমার উপর ঐ নির্ভরটি যে কি-রকম, আমি কি ক'রে নিজ অন্তরে একবার তা বুঝ্‌তে পার্‌ব!"

(৪)

প্রেম চায় প্রেমাস্পদের চিত্তে প্রবেশ কর্‌তে। একথা কেবল যে ক্ষুদ্র মানবীয় ক্ষেত্রেই সত্য, তা নয়। যে-ভক্তজনের প্রেম অসীমে আবদ্ধ, যিনি অনন্তসুন্দর প্রেমিক, তাঁর মনে এ আকাঙ্ক্ষা হয় যে অসীমের চিত্তে প্রবেশ কর্‌ব, অসীমের মন বুঝ্‌ব। সসীমের প্রেমিকেরই মত, অসীমের প্রেমিকও নিজ প্রেমের কুতূহলে, অনন্তকে আপনার প্রাণ

দিয়ে বুঝে নিতে চায়; অনন্তের অনির্ব্বচনীয় লীলা, অনন্তের নিগূঢ় অভিপ্রায়ের মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে চায়; যে প্রেমধারা জ্ঞানধারা সৃষ্টিধারা-রূপে যুগে যুগে লোকে লোকে প্রবাহিত, অনন্তের বুকে যেখানে এই ধারার মূল উৎস, সেখানে সে পৌঁছাতে চায়। প্রেমের গর্ব্বে সে ভুলে যায় যে সে ক্ষুদ্র, তার সব শক্তি পরিমিত। প্রেমের কুতূহলে সে ব'লে ওঠে, "হে অনন্ত, আমি তোমার অন্তর বুঝ্‌তে চাই; তুমি কি-ভালবাসায় আমাকে ভালবাস তা বুঝ্‌তে চাই; তুমি কেমন ক'রে আমার জন্য যুগে যুগে নিমেষে নিমেষে জল স্থল আকাশ এত সুন্দর ক'রে তোল, কেমন ক'রে নব নব রূপে আমার মন হরণ কর, তার নিগূঢ় মর্ম্মকথাটি আমি বুঝ্‌তে চাই। তোমার যে-প্রেমসুধায় প্রতি বসন্তে ধরণীকে মাতাও, তা কি-রকম? তোমার যে-প্রেমলীলা শিখিয়ে শিখিয়ে তুমি জীবকুলকে মাতাও তার স্বরূপটি কি? তোমার সেই মূল ইচ্ছাটি কি, যা মাধ্যাকর্ষণে, পরমাণুর আবর্ত্তনে, আলোকতরঙ্গে, তাড়িত-প্রবাহে ও আরও কত অযুত অযুত অজানা মহানিয়মে মহাশৃঙ্খলায় যুগে যুগে লোকে লোকে ফুটে উঠ্‌চে? বল, আমায় সেসব বল! তোমার রহস্যময় নীরব নিগূঢ় চিত্তে আমায় একটিবার প্রবেশ কর্‌তে দাও।"

প্রত্যুত্তরে নীরব অসীম যেন মানবজ্ঞানকে ইঙ্গিতে বলেন, "খুঁজে দেখ দেখি!" তাই সে কত যুগ যুগান্তর ধ'রে কত জ্ঞান বিজ্ঞানের পথে ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চে।

কিন্তু মানব প্রাণকে যেন তিনি হেসে বলেন, "অনন্ত দেশে কালে আমার যত লীলা যত ইচ্ছা যত শক্তি যত নিয়ম যত ছন্দ যত সৌন্দর্য্য, সকলের নিগূঢ় মর্ম্মকথা এইটুকু যে, আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে চাই, তুমি আমার।"

অসীমের চিত্তে প্রবেশ কর্‌বার জন্য, সসীমের এই যে প্রেম রঞ্জিত প্রেম-প্রণোদিত প্রেম-স্পর্দ্ধিত কুতূহল, ইহা রূপকের আকারে বাংলার বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের 'মুরলী শিক্ষা'র গানে কেমন সুন্দর ফুটে উঠেছে! কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধা রাধা ভাবাবেশে একদিন কৃষ্ণের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌লেন যে তিনি নিজে কৃষ্ণ সাজ্‌তে চান। তাঁকে কৃষ্ণের পীতবাস কুণ্ডল বনমালা পরিয়ে, চুলে চূড়া বেঁধে দেওয়া হ'ল; কৃষ্ণের বাঁশীটি তাঁর হাতে দেওয়া হ'ল। তখন রাধা কৃষ্ণকে বল্‌লেন, "কেমন ক'রে বাঁশী বাজিয়ে তুমি কাননে সুধাধারা বহিয়ে দাও? কেমন ক'রে বাঁশী বাজিয়ে তুমি আমার মন হরণ কর? কি ক'রে বাঁশী তেমন বাজে, আমায় শেখাও দেখি!"

"ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে,
নিজ দাসী বলে বাঁশী শিখাহ আমারে।
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান?
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান?
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত?
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরি লয় চিত?
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে?
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার প্রেম লুটে?

ভাল হইল, আইলা রাই মুরলী শিখব,
জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব।"

"মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে, জানহ বিশেষ।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম?
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার না ?
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি?
কোন্ রন্ধ্রে কেকারবে নাচে ময়ুরিণী?
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত?
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ?
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এক কালে?
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে?
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়?
একে একে শিখাইয়া দেহ, শ্যামরায়।
জ্ঞানদাস কহে হাসি,
'রাধে মোর' বোল বাজিবেক বাঁশী।"

"তোমার কি সে অপূর্ব্ব প্রেমলীলা, যাতে বনে বনে ফুল ফুটে ওঠে, পাখীরা গানে মেতে ওঠে, মানবপ্রাণ পাগল হয়, বল, আমায় বল,"—মানবপ্রাণের এই আকুল প্রশ্ন, আকুল কুতূহল, এই ছুটি গানে রাধার উক্তিতে কেমন ফুটে উঠেছে!

আবার অনন্ত প্রেমময় প্রেমিকের হৃদয়ের কাণে কাণে এই প্রশ্নের যে উত্তর ব'লে দেন, তাও দ্বিতীয় গানটীতে রয়েছে,—

জ্ঞানদাস কহে হাসি,
'রাধে মোর' বোল বাজিবেক বাঁশী।

অর্থাৎ, "তুমি আমার, আমি তোমাকে ভালবাসি," এ ছাড়া আর কিছু আমার বাঁশীতে বাজে না।

চমৎকার কথা! সৃষ্টি-তত্ত্বের শেষ কথা এই যে, অনন্ত বিশ্বের মধ্যবিন্দুটিতে এই সুর এই মন্ত্র নিরন্তর বাজ্‌চে যে অসীম সসীমকে ভালবাসেন। অনন্ত প্রেমময়ের যত সৃষ্টি-লীলা যত জ্ঞান যত শক্তি, চরাচরে যা কিছু তিনি প্রকাশ ক'রেছেন সকলের মূল কথা আদি কথা মর্ম্মকথা এইটুকু মাত্র যে, অসীম সসীমকে ভালবাসেন। সসীমের জন্য অসীমের চিত্তে যে স্পন্দন, যাকে ভাষায় ফোটালে হয় 'তুমি আমার,' তাই অনন্ত দেশে কালে সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে।

(৫)

কেবল কি জীবাত্মাই পরমাত্মার চিত্তে প্রবেশ কর্‌তে চান? প্রেমের বশে পরমাত্মাও কি জীবাত্মার চেতনায় প্রবেশ কর্‌তে ব্যাকুল হন না? হন বই কি? তিনি পরমাত্মা,

তিনি পরম-'আমি'। তাঁর 'তুমি' কে? জীবাত্মাই তাঁর 'তুমি'। এই 'তুমি'র মধ্যে তিনি আপনাকে বিলিয়ে দিচ্চেন, এই 'তুমি'র সঙ্গে তাঁর চিত্ত-বিনিময় প্রতি জীবাত্মার জীবনধারার মধ্য দিয়ে নিরন্তর চল্‌চে। ক্ষুদ্র এই জীবাত্মা, নিজ শৈশবে যৌবনে জরায়, নিজ দৃষ্টির নিজ শক্তির নিজ হৃদয়ের বিকাশের নানা অবস্থায়, সকল দৃশ্যে শব্দে স্বাদে গন্ধে স্পর্শে, সকল সুখে দুঃখে, সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেম-লীলাই আস্বাদন করে। কিন্তু সে আস্বাদন তার কেমন লাগ্‌চে, ক্ষুদ্র জীবাত্মার অনন্ত প্রেমিক কি প্রেমের কুতূহলে তা জান্‌তে বুঝ্‌তে, নিজ চিত্ত দিয়ে অনুভব কর্‌তে চান না? চান বই কি? নইলে যে প্রেমের নিয়ম পূর্ণ হয় না!

এই যে আমি একটি জীবাত্মা, আমার 'আমি'তে শুধু কি আমিই আছি? আমার চেতনা দিয়ে আমার চক্ষু কর্ণ দিয়ে শুধু কি একা-আমিই এই জগতের ও আমার এই জীবনের স্বাদ গ্রহণ কর্‌চি? তা তো নয়। আমারই মধ্যে অসীম ও সসীমের চেতনাধারা একসঙ্গে প্রবাহিত; আমার সকল দেখা শোনায় সকল সুখে দুঃখে সকল বিকাশে প্রেমের ঐ চিরন্তন চিত্ত-বিনিময়ের নিয়মটি অনুসরণ ক'রে, অসীম তাঁর সসীম-'তুমি'র সব চেতনা সব বেদনা সব অনুভূতি আপনাতে আস্বাদন ক'র্‌চেন। তাই কবি গেয়েছেন—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান!
আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি!
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান!
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বেদান্তে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও পুরুষকার

(৪)

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায়, বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান চিত্তের * যে "কাম" (Ideas of Reason) গুলির উল্লেখ করিয়াছি, উহাই বিচ্ছিন্নভাবে জগতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান "কাম"গুলি, রজ ও তমের মলিনতা দ্বারা অভিভূত হইয়া, বিশেষাকারে—খণ্ড-খণ্ডরূপে—জগতের 'নাম-রূপে' অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই "কাম"গুলি সত্য; কিন্তু উহার অভিব্যক্তি এই বিশেষ আকারগুলি মিথ্যা। পূর্ব্ব সংখ্যায় এই তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

আবার, আত্মার মধ্যে নিহিত এই "কাম"গুলি, বাহ্য-বিষয়ের নিমিত্ত যে জীবের অভিলাষ এবং বিষয় প্রাপ্তির জন্য যে ক্রিয়া,—তদ্দ্বারা মলিন ও অভিভূত হইয়া থাকে। রজঃ- ও তমের প্রভাব দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়াতেই জগতে এই 'কাম'গুলি, অসম্পূর্ণরূপে ও পরিচ্ছিন্নভাবে বিকাশিত হইয়া থাকে।

"স্বাত্মস্থা ইমে সত্যাঃ কামাঃ, অনৃতাপিধানাঃ।
আত্মস্থানামেব সতাং, বাহ্যবিষয়েষু
স্ত্র্যন্নভোজনাচ্ছাদনাদিষু তৃষ্ণা, তন্নিমিত্তং
স্বেচ্ছা-প্রচারত্বং...'অনৃত' মিত্যুচ্যতে"।

—ছাঃ ভাঃ ৮ অঃ।

চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, এই সকল কামও বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে। এখন আমাদের চিত্ত মলিন বলিয়া, আমাদের কামও বিষয়-প্রবণ।

আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত বিশুদ্ধ হইলে রজঃ ও তমের মালিন্য দূর হইয়া গেলে, আত্মার মধ্যে যে সকল বিশুদ্ধ, সত্য, "কাম" জাগিয়া উঠে,—সেগুলি গীতায় বর্ণিত রহিয়াছে। এই গুলিকে বুদ্ধির ধর্ম্ম বা গুণ বা Regulative Principles বলা যাইতে পারে। গীতায় "দৈবীসম্পদ" নামে এগুলি উল্লিখিত হইয়াছে।

অহিংসা, সত্য-কথন, অক্রোধ, কপটতাত্যাগ, সর্ব্বভূতে দয়া, পরপীড়াবর্জ্জন, অভিমান-শূন্যতা, সত্ত্ব-শুদ্ধি—প্রভৃতিকে চিত্তের ধর্ম্ম বলিয়া গীতাকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল বিশুদ্ধ চিত্ত-ধর্ম্ম দ্বারা, আমাদের কর্ম্মকে নিয়মিত ও শাসিত করিতে পারিলে, ক্রমে আমাদের চিত্তও বিশুদ্ধ হইতে থাকে। রজঃও তমোগুণের প্রভাবে, আমাদের চিত্ত সর্ব্বদা কলুষিত। ঐসকল আত্মনিহিত ধর্ম্ম বা Ideas of Reason দ্বারা শাসিত ও চালিত করিতে পারিলে, চিত্তের এই মলিনতা দূরীভূত হইবে। ঐ গুলিই ধর্ম্ম-জীবন লাভের সাধন বা উপায়।

---

* পাঠক তৃতীয় প্রস্তাবে দেখিয়াছেন যে, ঈশ্বরের চিত্তকে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান 'মায়াশক্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই চিত্তেই জগৎ-সৃষ্টির সংকল্প বা 'কাম' উদিত হয়। এই সংকল্প বা কাম—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। ইহা ব্রহ্ম হইতে 'অনন্য'।

শঙ্কর তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে বলিয়াছেন—

"ন হি অগ্নিহোত্রাদ্যেব কর্ম্মাণি। ব্রহ্মচর্য্যং, তপঃ,
সত্যবদনং, শমঃ, দমঃ, অহিংসা—ইত্যেবমাদীনি
বিদ্যোৎপত্তৌ সাধকতমানি। ধ্যানধারণালক্ষণানি চ—
বক্ষ্যতি"।

অতএব আমরা দেখিতেছি, অহিংসা, সত্য-কথন, ক্ষুদ্রস্বার্থের জন্য ফল-কামনা ত্যাগ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতিই ধর্ম্মজীবন লাভের 'সাধন'। ধর্ম্ম-জীবনের লক্ষ্যই হইতেছে—সত্ত্ব-শুদ্ধি। এই সকল সাধন অবলম্বন করিলেই সত্ত্ব-শুদ্ধি হইবে।

আমাদের বুদ্ধির দোষেই, আমরা ক্ষুদ্র বিষয়-রাগে সমাচ্ছন্ন, তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির জন্য লালায়িত। রজঃ ও তমের প্রভাব বশতঃই, বুদ্ধির এই দোষ ঘটিয়াছে। এই দোষ দূর করিতে পারিলেই সত্ত্ব-শুদ্ধি বা 'মনঃ-প্রসাদ' উপস্থিত হইবে। অতএব সর্ব্বতোভাবে সত্ত্বশুদ্ধি* কর্ত্তব্য।

"রজস্তমোভ্যাঞ্চ তদীয় কার্য্যৈঃ, বিযোজ্য চিত্তং পরিশুদ্ধ সত্ত্বং"
সদৈব কুর্য্যাৎ"। —সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার।

"চিত্ত-গ্রন্থি বিমোচনায়......সত্ত্বং সমালম্বাতাং"।

সত্ত্ব-শুদ্ধি করিতে পারিলেই, আমাদের 'চিত্ত-গ্রন্থি'† বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া, দেহেন্দ্রিয়াদিকেই আত্মা বলিয়া ধরিয়া লওয়াকেই শঙ্কর 'হৃদয়-গ্রন্থি' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধন-বলে সত্ত্বশুদ্ধি করিতে পারিলে, এই হৃদয়-গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তখন আত্মার স্বাতন্ত্র্য-বোধও পরিস্ফুট হইয়া পড়িবে।

যিনি সর্ব্বভূতে একই আত্মবস্তুর অনুভব করিতে পারেন, তিনি কাহাকেও পীড়া দিতে পারেন না, কাহারও অনিষ্ট সম্পাদন করিতে পারেন না। তাদৃশ ব্যক্তি পরদুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা উদ্যুক্ত থাকেন।

"সমং পশ্যন্......ভূতেষু......ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং"
(ন পীড়য়তি, সর্ব্বত্র, দয়ালুর্ভবতি) —গীতা, ১৩।২৯

সত্ত্ব-শুদ্ধি বা চিত্তের প্রসন্নতালাভ এইপ্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে—

আসুরীং সম্পদংহিত্বা ভজেৎ যো দৈবসম্পদং‡।
মোক্ষৈক-কাঙ্ক্ষয়া নিত্যং তস্য চিত্তং প্রসীদতি॥

* অত্রৈব সত্ত্বাত্মনি ধীগুহায়াং। অব্যাকৃতাকাশ উরুপ্রকাশঃ।...বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং।"—বিবেক চূড়ামণি।

"চিত্তপ্রসাদেন বিনাবগন্তুং, বন্ধং ন শক্নোতি পরাত্মতত্ত্বং।
মনোঽপ্রসাদঃ পুরুষস্য বন্ধঃ, মনঃ-প্রসাদো ভববন্ধ মুক্তিঃ"।
"বন্ধশ্চ মোক্ষো 'মনসৈব' পুংসাং।......শুদ্ধেন মোক্ষো, মলিনেন বন্ধঃ"—শঙ্কর।

† কঠভাষ্যে অবিদ্যা, বিষয় কামনা ও বিষয় লাভার্থ ক্রিয়াকে—'চিত্ত গ্রন্থি' বলা হইয়াছে।

‡ আসুরীসম্পদ ও দৈবীসম্পদ্ গীতায় বর্ণিত আছে। ৯ম অধ্যায়, ১২।১৩ শ্লোক ও ১৬শ অধ্যায় দেখুন।

পরদ্রোহ পরদ্রব্য পরনিন্দা পরস্ত্রিয়ঃ।
নালম্বতে মনোযস্ত—তস্যচিত্তং প্রসীদতি ॥
আত্মানং সর্ব্বভূতেষু যঃ সমত্বেন পশ্যতি।
সুখং বা যদি বা দুঃখং—তস্যচিত্তং প্রসীদতি ॥
তস্য মিত্রং জগৎ সর্ব্বং মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
অহিংসা বাঙ্মনঃকায়ৈঃ, প্রাণিমাত্রাপ্রপীড়নং ॥
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কায়েন মনসা গিরা।
অনুকম্পা দয়া চৈব প্রোক্তা বেদান্ত বেদিভিঃ ॥ ইত্যাদি।

সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্তসার।

পরোপকার, সর্ব্বভূতে দয়া, কাহারও হিংসা না করা—এইগুলিকেই সত্ত্ব-শুদ্ধির প্রধান বলা হইয়াছে। গীতাতেও আমরা এই গুলির বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই (১৩ অঃ, ৭-১১ এবং ১৭ অঃ, ১—৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। এতদ্ব্যতীত, ক্ষুদ্রস্বার্থ ত্যাগ করিয়া, কাম ক্রোধাদি বৃত্তির দমন, সর্ব্বদা প্রাণ-শক্তির মূলে আত্ম-বস্তুর চিন্তা—এগুলিকে ও সাধন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। *

এই সকল সাধন-অবলম্বনে যখন চিত্ত একেবারে বিশুদ্ধ হইয়া গেল, কেবল তখনই সর্ব্ব-প্রকার কর্ম্মত্যাগের কথা শঙ্করাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন। এ অবস্থায় কোন বিষয়ে বা কর্ম্মে 'অভিমান' বা 'আমি' বা 'আমার' বোধ থাকে না। ইহা জীবন্মুক্তাবস্থা।

সমগ্র গীতাগ্রন্থে কর্ম্ম, অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সত্ত্বশুদ্ধি করিতে হইলে, অন্যান্য সাধনের ন্যায় কর্ম্মও একটী প্রধান সাধন। গীতাকার কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছেন।

"এতান্যপিতু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং" ॥

অজ্ঞানাচ্ছন্ন, সাধারণ লোকেরা যেমন আত্মার স্বতন্ত্রতার কথা ভুলিয়া, কেবল প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া কর্ম্ম করে; যাঁহারা চিত্তশুদ্ধি করিতে ইচ্ছুক এবং দৃঢ়সংকল্পবিশিষ্ট, তাঁহাদের কর্ম্ম সেরূপ কখনই হইতে পারে না। ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়-সুখাশা ত্যাগ করিয়া, চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশে, আপন কর্ত্তব্য-বোধে, পরমেশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ করতঃ, তাঁহারা কর্ম্মাচরণ করিবেন। এইরূপ হইলেই, ক্রমে 'হৃদয়গ্রন্থি' বিনষ্ট হইতে থাকিবে।

গীতাকার, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি কোন বর্ণেরই আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিবার বিধি দেন নাই। বলিয়াছেন যে,—আপন আপন কর্ত্তব্যকার্য্য, ঈশ্বর-প্রাপ্তির উদ্দেশে, নিষ্ঠার সহিত করিতে পারিলেই, কৃতার্থ হইতে পারা যায় (গীতা, ১৮অঃ, ৪৫)।

* বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, সর্ব্বভূতে দয়া, কাহারও হিংসা না করা প্রভৃতি সাধন গুলি "মুক্ত" পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইয়া উঠে। কিন্তু যাহারা "মুমুক্ষু", যাহারা চিত্ত-শুদ্ধি করিতে উদ্যত, তাহারা এই সকল সাধন যত্ন করিয়া অনুষ্ঠান করিবে। "মুক্তলক্ষণান্যেব মুমুক্ষোঃ সাধনত্বেন বিধত্তে, ইদং 'অদ্বেষ্টা সর্ব্ব ভূতানাং' ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতং ধর্ম্মজাতং বার্ত্তিকে"।

দেহাত্মবোধই (Egoism) আমাদিগকে আত্মার স্বতন্ত্রতার কথাটা ভুলাইয়া দিয়াছে। এই দেহাত্মবোধের উচ্ছেদ সাধনই সকল সাধনের প্রধান লক্ষ্য। এইজন্যই, ক্ষুদ্র ফলাকাঙ্ক্ষা—আপন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশা বর্জ্জন করিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে।

"অন্তর্য্যামিন ঈশ্বরাৎ প্রবৃত্তিঃ চেষ্টা ভূতানাং।
...স্বকর্ম্মণা তং আরাধ্য সিদ্ধিং বিন্দতি।...
ন স্বকর্ম্মানুষ্ঠানাদেব সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিংলভতে"(১৮অঃ, ৫৫)।

আত্মার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব আছে। প্রাণীর যত কিছু প্রবৃত্তি ও চেষ্টা, তাহার মূলে এই অন্তর্য্যামীর প্রেরণা অনুভব করিয়া, আপন কর্ত্তব্য করিতে হইবে। এই প্রকারেই ক্রমে, সত্ত্ব-শুদ্ধি জন্মিয়া, মানুষ কৃতার্থ হইতে পারে, অন্যপ্রকারে নহে।

কেবল যখন সম্পূর্ণরূপে সত্ত্ব-শুদ্ধি হইয়া গিয়াছে, কেবল সেই অবস্থায় বেদান্তে, সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসের বা কর্ম্মত্যাগের বিধি আছে। কিন্তু সে অবস্থাতেও, গীতাকার একস্থলে বলিয়াছেন যে, জনকাদি জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের, নিজের প্রয়োজনে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল না। তাঁহারা সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু, তথাপি, তাদৃশ সিদ্ধ পুরুষেরাও, জগতের কল্যাণার্থ কর্ম্ম করিতেন।

"কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ"।

ক্ষুদ্র কামনা এবং ক্ষুদ্রফল ত্যাগই এ সকল কথার প্রকৃত লক্ষ্য। কেন না, স্বার্থসুখের সংকল্প ও বিষয়বাসনার তৃপ্তি থাকিলে, আত্মার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বের প্রেরণা চিত্তে স্থান পায় না; তখন দেহাত্মবোধই প্রবল থাকে। এই দেহাত্মবোধ বা 'হৃদয়-গ্রন্থি' সর্ব্বনাশের মূল। কেন না, যদি আত্মার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বের ধারণা ও প্রেরণা লোপ পাইল, তবে ত মানুষ প্রায় পশুর ন্যায় হইয়া পড়িল; কাম-ক্রোধাদি দমনের সম্ভাবনাও লোপ পাইল, ক্ষুদ্র রাগ-দ্বেষের প্রভাব হইতে পরিত্রাণলাভের সম্ভাবনাও দূর হইল; অপরের কল্যাণার্থ কর্ম্ম করার সদিচ্ছা একান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিল। আত্মা যদি, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ও কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তিবর্গ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না হন, তাহা হইলে ইহাদিগকে একটি উদ্দেশ্য-সাধনার্থ কে পরিচালিত করিবে? কে ইহাদিগকে বিষয়াভিমুখ হইতে ঘুরাইয়া লইয়া আত্মাভিমুখী করিয়া লইবে?

অনেকের মুখেই এই কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, অদ্বৈতব্রহ্ম-জ্ঞানে শঙ্করাচার্য্য, ধর্ম্মাচরণও উপাসনাদির কোনও স্থানই রাখেন নাই, কোন ব্যবস্থা করেন নাই। কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করিয়া আসিলাম, এতদ্দ্বারা, এই প্রকার ধারণার ভ্রান্তি দূর হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

মাণ্ডুক্য-কারিকার ভাষ্য করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য বড়ই সুস্পষ্ট-ভাবে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। আমরা সেইটী বলিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সেই স্থলটীতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদের সহিত ধর্ম্মাচরণ ও উপাসনার কোন প্রকার 'বিরোধ' নাই।

"অদ্বৈতদর্শনস্য উপাসনাবিধি বিরোধাভাবঃ"।

যে ব্যক্তি সত্ত্বশুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে ; যে ব্যক্তি চিত্তের একান্ত বিশুদ্ধতালাভের জন্য একান্ত ব্যগ্র ; সে ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ, ধর্ম্মাচরণ ও উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। ধর্ম্ম-জীবন লাভের উপযোগী যে সকল 'সাধন' পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই গুলির আচরণ ব্যতীত, চিত্তের বিশুদ্ধতা লাভের অন্য উপায় নাই। এবং ঐ সকল সাধন দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে, স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে পরার্থপরতা না জন্মিলে, কদাপি অদ্বৈত-বোধ উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং এ প্রকার ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে অদ্বৈতবাদীর বিরোধ উপস্থিত হইবে কিরূপে? কেন না, ঐ সকল সাধন দ্বারা চিত্ত যখন সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইল, তাদৃশ সত্ত্ব-প্রধান চিত্তে, সর্ব্বত্র অভেদ-দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হয়, পর তখন আপন হয়। সুতরাং ধর্ম্মাচরণের সহিত অভেদদৃষ্টির বিরোধ হইবে কিরূপে? মাণ্ডুক্য-ভাষ্যে এই সিদ্ধান্তই প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা চিত্তের স্বভাব-সিদ্ধ রাগ-দ্বেষাদি মলিনতা দূর করিবার জন্য ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে "মধ্যম-দৃষ্টি" সম্পন্ন ব্যক্তি বলা যায়। এই সকল ব্যক্তির চিত্ত যখন সাধন-প্রভাবে,—ধর্ম্মাচরণ ও উপাসনার বলে,—পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা "অভেদ-দৃষ্টি" সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। এই অভেদ-দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে শঙ্করাচার্য্য "উত্তম-দৃষ্টি" সম্পন্ন লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পাঠক, সিদ্ধান্তটী মূল ভাষায় শুনুন্—

"আত্মা এক এব অদ্বিতীয় ইতি নিশ্চিতোত্তম দৃষ্টার্থং,
দয়ালুনা বেদেন অনুকম্পয়া, কথং মন্দমধ্যমদৃষ্টয়ঃ
ইমামুত্তমা মেকত্ব-দৃষ্টিং প্রাপ্নুয়ুরিত, উপাসনা উপদিষ্টা...কর্ম্মানিচ"।

পাঠক এখনও কি বলিতে চান যে, বেদান্তে ধর্ম্মাচরণ ও সাধনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই?

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

এক লক্ষ্য

সব জলধারা মিশে প্রণালীতে, সব পয়োনালী হ্রদে
ক্ষুদ্র বড় নদী দেয় হ্রদে যোগ, নদ মিলে মহানদে।
যত মহানদ, উপনদী সহ সিন্ধুতে একাকার
সিন্ধুরা সব বিশ্ব ভরিয়া রচে মহা পারাবার
সব উপাসনা, সব নিবেদন, একে গিয়ে মিশে শেষে,
মহাসিন্ধুতে একই মহাবাণ বিঘোষিত দেশে দেশে।

শ্রীকালিদাস রায়

ভারতীয় অব্দরীতি

সপ্তর্ষি সংবৎ *

আমরা সাধারণতঃ যাহাকে সপ্তর্ষিসংবৎ বলিয়া থাকি তাহা আরও কয়েকটী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লৌকিককাল, লোককাল, লৌকিক সংবৎ, শাস্ত্র সংবৎ, পাহাড়ী বা কচ্চা সংবৎ, সপ্তর্ষিকাল, সাতঋষিকাল, হপ্তঋখেসর সপ্তর্ষি সংবতের নামান্তর। Great Bearএর সপ্ত নক্ষত্রের নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণমতে ভারত-যুদ্ধকালে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন। † একথার অর্থ বুঝিতে হইলে সপ্তর্ষিশব্দের অর্থ নিরূপণ করিতে হইবে। কোন কোন জ্যোতিষী পণ্ডিত ‡ অনুমান করিয়াছেন যে, সপ্তর্ষিরেখা শব্দের পরিবর্ত্তে সম্ভবতঃ সপ্তর্ষি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্যোতিষগ্রন্থে এরূপ শব্দ-সংক্ষেপের বহু উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতিষ-গণনা করিবার সময় গতিশীল দুইটী রেখা বা বৃহদ্বৃত্ত কল্পনা করা যায়। তাহার মধ্যে একটী ক্রান্তিপাত বিন্দু (Equinoctial Colure) দিয়া এবং অপরটী অয়নান্তবিন্দু (Solisitial Colure) দিয়া গমন করে। সুতরাং সপ্তর্ষিরেখা বলিলে আমরা অয়নান্তবৃত্ত বুঝিব। অধিকন্তু, এই সপ্তর্ষির একটা গতি ছিল —তাহা অয়নচলন। এক্ষণে, যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষির মঘা নক্ষত্রে থাকার অর্থে আমরা বুঝিব যে, যুধিষ্ঠিরের সময়ে রবির দক্ষিণায়ন সঙ্ঘটন মঘানক্ষত্রেই হইত। পূর্ব্বে রবির দক্ষিণায়ন যে অশ্লেষা নক্ষত্রের অর্দ্ধে হইত তাহা বৃহৎসংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকাতে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে।

আবুরিহান্ অলবিরুণী বলেন, এই সংবতের নাম "লোককাল" অর্থাৎ লৌকিক (Popular) সংবৎ। এই জ্যোতিষী পণ্ডিতের মতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বর্ষারম্ভ বিভিন্ন সময়ে আরম্ভ হয়। তিনি বলেন, যে সমস্ত লোকেরা বরদরী (Bardari) এবং মারিগলের (তক্ষশীলা) মধ্যে বাস করে তাহারা কার্ত্তিক মাসে বর্ষারম্ভ করে, কাশ্মীর-ও মুলতানবাসিগণ এবং জ্যোতিষিবৃন্দ শক সংবৎ (৭৮খৃঃ) ব্যবহার কালে চৈত্রের অমবস্যায় বর্ষারম্ভ

* "সংবৎ"—সংবৎসর শব্দের সংক্ষিপ্তাকার মাত্র। ইহার অর্থ বর্ষ। সপ্তর্ষি, বিক্রম, গুপ্ত, শক, ইত্যাদি প্রত্যেক সংবৎসরের পূর্ব্বে এই শব্দ ব্যবহৃত। কখনও কখনও বিক্রম, শক, বল্লভী ইত্যাদি সংবৎসরের পরেও ইহা লিখিত থাকিতে দেখা যায়, যথা—বিক্রমসংবৎ, বল্লভী সংবৎ ইত্যাদি। অনেকে "সংবৎ" বলিলে বিক্রম সংবৎই বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহা ঠিক নয়। কেননা, এই শব্দের প্রয়োগ আমরা শকাদি অব্দে দেখিতে পাই। সাধারণতঃ, সংবৎ বা তাহারও সংক্ষিপ্ত রূপ "সং"-এর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু বর্ষ, অব্দ, শক ইত্যাদি বর্ষ-শব্দার্থক শব্দের বহুল প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।—প্রাচীন লিপিমালা।

† বৃহৎসংহিতার বরাহ মিহির একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বৃদ্ধগর্গ (পূঃ খৃঃ ১৬৫) হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তাহার অর্থ, যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে ছিল এবং সেই রাজার রাজ্যকাল শককালের ২৯২৬ বর্ষ পূর্ব্বে। ১০০ বৎ ধরিয়া তাহারা এক একটি নক্ষত্রে থাকে এবং সর্ব্বদা অরুন্ধতীর সঙ্গে উত্তরপূর্ব্বে উঠে। টীকাকার ভট্টোৎপল এই কথাই বলিয়াছেন।

‡ "জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

করিতেন। বিরুণীর প্রদেশের অধিবাসীরা ভাদ্রে বর্ষারম্ভ করিত। মারিগলের পার্শ্ববর্ত্তী নিরহর (Nirahara) প্রদেশ-বাসীরা অগ্রহায়ণ (মার্গশীর্ষ) মাস হইতে বৎসর গণনা করিয়া থাকে।* Lanbage অর্থাৎ লম্বাকের লোকেরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া থাকে। ভিন্সেণ্টস্মিথ বলেন যে, তিনি মুলতানের অধিবাসীদিগের নিকট শুনিয়াছেন যে এই রীতি সিন্ধু ও কনোজ প্রদেশের অধিবাসীরা অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু মুলতানের লোকেরা মাত্র সেদিন এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছে; ইহারা কাশ্মীরবাসীদিগের পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। + অতঃপর অলবিরুণী মুলতানের জ্যোতিষী দুর্লভের গণনানুযায়ী শক ও লৌকিক সংবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে বোধ হয় যে, এই সপ্তর্ষি সংবৎ উত্তর-পশ্চিম ভারতে ১০০০ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। ইহার ব্যবহার বর্ত্তমান প্রচলনের সীমান্তবর্ত্তী ছিল না। মুলতান ও সিন্ধু পর্য্যন্ত ইহার প্রচলন ছিল।

লৌকিক এই শব্দ হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহার প্রচলন বহু বিস্তৃত ছিল। সপ্তর্ষি সংবৎ ২৭০০ বৎসরের একটী চক্র। ইহার বিষয় এইরূপ কথিত আছে যে, সপ্তর্ষি নামক ৭টী তারা অশ্বিনী হইতে আরম্ভ করিয়া রেবতী পর্য্যন্ত ২৭টী নক্ষত্রে ক্রমান্বয়ে শতবর্ষ করিয়া অবস্থিত থাকে। ‡ এই প্রকারে ২৭০০ বর্ষে এক একটী চক্রপূর্ণ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন চক্রের আরম্ভ হয়। যেখানে যেখানে এই চক্র প্রচলিত আছে সেই স্থানেই নক্ষত্রের নাম লিখিত হয় না। শুধু এক হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০ পর্য্যন্ত লেখা হয়। ১০০ বর্ষ পূর্ণ হইলে শতাব্দীর অঙ্ক ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় ১ হইতে আরম্ভ করা হয়। লৌকিক সংবৎ একক ও দশকের অঙ্ক দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে। শত ও সহস্রের ঘর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। একটা উদাহরণ দিয়া কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাক্। রাজতরঙ্গিণীতে প্রথম যে লৌকিক সংবৎ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ৮৯ বর্ষ। ইহা দ্বারা কলহণ ৩৮৯৯ বর্ষ বুঝিতেছেন। এই বর্ষ

* "The people living in the country Nirahara behind Marigala, as far as the utmost frontiers of Takeshar and Lohenar [that begin the year with the month of "Margashirsha"—Alberuni's India, translated by Sachau Vol. I]

\+ V. A. Smith's—History of the Kushan Period in J. R. A. S.

‡ একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তে (মুনয়ঃ) চরন্তি বর্ষাণাম্,

বারাহী-সংহিতা, অধ্যায় ১৩. শ্লোক ৪।

সপ্তর্ষীণাং তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।

তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎসমং নিশি॥

তেনৈত ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।

শ্রীমদ্ভাগবতম্, স্কন্ধ, ১২, অ ২, শ্লোক ২৭-২৮;

বিষ্ণুপুরাণ, অংশ ৪, অধ্যায় ২৪, শ্লোক ৫৩—৫৪।

পুরাণ ও জ্যোতিষের গ্রন্থে এই প্রকার গতি লিখিত আছে। পরন্তু কমলাকর ভট্ট একথা স্বীকার করেন না। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়া "প্রাচীন লিপিকার"কার ওঝা মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—

অদ্যাপি কৈরপি নরৈর্গতিরার্ষবর্ষৈ দৃষ্টা ন যাত্র কথিতা কিল সংহিতাসু। তৎকাব্যমেব হি পুরাণবদত্র তজ্জ্ঞাস্তেনৈব তত্ত্ববিষয়ং গদিতুং প্রবৃত্তাঃ। সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক, ভগ্রহাত্যুধিকার, শ্লোক ৩২।

৮১৩—৪১৪ খ্রীষ্টাব্দের সমান। ইহার পরে তিনি আর একটী বর্ষ লিখিয়াছেন, সেটী ২৬ বর্ষ। ইহা ৩৯২৬ বর্ষের সম। অলবিরুণী লিখিয়াছেন. "Common people in India date by the years of a Centennium... if a Centennium is finished, they drop it and simply begin to date by a new one" এই উক্তি দ্বারা বুঝাইতেছে যে শতকের অঙ্ক ছাড়িয়া দিয়া সপ্তর্ষি সংবত্ সাহায্যে ভারতে অব্দগণনা-পদ্ধতি ছিল। কিন্তু বরাবর এরূপ পদ্ধতির কখনই অস্তিত্ব ছিল না।

ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ বলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস সপ্তর্ষি সংবৎ কনিষ্কের রাজত্বকালে উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। অধিকন্তু, উত্তর ভারতে বা উত্তর ভারতের অধিবাসী দ্বারা শতবর্ষের নিম্নে যে বর্ষের উল্লেখ আছে তাহা লৌকিক সংবৎ বলিয়া গ্রহণ করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ঐ সময়ে অন্যান্য সংবৎও প্রচলিত ছিল। কনিষ্কবর্ষের অনেকগুলিই লৌকিক বর্ষ। কিন্তু ফ্লীট লিখিয়াছেন, "The idea that the Laukika reckoning of Kashmir or any system of reckoning by 'Omitted hundreds', can be used to fix any exact date for Kanishka is altogether illusory. No such system existed in India in any early times. It was devised in only the 9th or 10th century A. D." ফ্লীটসাহেব তাঁহার উক্তি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের মতে ইঁহার মতই সমীচীন। যাহা হউক কাশ্মীরের পঞ্জিকা এবং আরও কোনও কোনও পুস্তকে এই বর্ষ লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিযুগের ২৫ বর্ষ পূর্ণ হইলে অর্থাৎ ২৬ বৎসর হইতে কাশ্মীরে এই সংবতের প্রারম্ভ গণনা করা হয়।* কিন্তু, পুরাণ ও জ্যোতিষ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই সংবৎ কলিযুগের প্রারম্ভ হইতেই চলিতেছে। জেনরল ক্যানিংহাম বলেন, এই সংবৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৭৭৭ বর্ষ হইতে চলিতেছে।†

(১) রাজতরঙ্গিণীকার কল্হণের মত উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত ওঝা লিখিয়াছেন‡ যে§ এই সময় লৌকিক কালের ২৪শ বর্ষ প্রচলিত ছিল—আর শক সংবতের ১০৭০শ গতবর্ষ ছিল।

* কলের্গতৈঃ শায়কনেত্র (২৫) বর্ষৈ সপ্তর্ষিবর্য্যাস্ত্রিদিবং প্রয়াতাঃ।
লোকে হি সংবৎসরপত্রিকায়াং সপ্তর্ষিমানং প্রবদন্তি সন্তঃ॥ (পণ্ডিত ওঝা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বচন)
Dr. Buhler's Kashmir Report, pp. 60.

† Indian Eras—p. 4.

‡ লৌকিকাব্দে চতুর্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥
রাজতরঙ্গিণী ১ম তরঙ্গ—শ্লোক ৫২। (Bombay, Sanskrit Series), এই বচনটী পণ্ডিত ওঝা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।
ক্যানিংহাম সাহেব শ্লোকটীর একটু বিকৃত পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন—তিনি "চতুর্বিংশতে," "সপ্তত্যাভাধিকম্" এই দুই পদ লিখিয়াছেন।

‖. পণ্ডিত ওঝা বলেন, তারিখ ৭ই এপ্রিল, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর হিন্দুস্থানে যে বিক্রম সংবতের নববর্ষের প্রারম্ভ হইয়াছে তাহাকে সাধারণতঃ বিক্রম সংবৎ ১৯৫১ বর্ত্তমান, এবং ৬ই এপ্রিল তারিখে যে বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে

এই হিসাব অনুসারে লৌকিক সংবৎ শক সংবৎ (১০৭০—২৪ =) ১০৪৬ গতবর্ষের অনুযায়ী এবং এই সংবতের প্রত্যেক প্রথম বর্ত্তমান বর্ষ শক সংবতের প্রতি শতাব্দীর ৪৭শ গত বর্ষের তুল্য (৪৭, ১৪৭, ২৪৭ ৩৪৭ ইত্যাদি)। বিক্রম-সংবতের ১৩৫ বর্ষ পরে শক সংবতের প্রারম্ভ হইয়াছে। এইজন্য, এই সংবতের প্রত্যেক বর্ত্তমান বর্ষ বিক্রম-সংবতের প্রত্যেক শতাব্দীর (৪৭ + ১৩৫ = ১৮২) ৮২শ গত বর্ষের সমান (৮২, ১৮২, ২৮২, ৩৮২ ইত্যাদি)।

(২) ডক্টর হল্‌শ্‌ কর্ত্তৃক সংগৃহীত একখানি পুঁথিতে লিখিত আছে, * সংবৎ ২৪, পূর্ণিমান্ত কার্ত্তিক, ত্রয়োদশী বুধবার, শক ১৫৭০। এস্থলে ২৪ সপ্তর্ষি, শকের (২৪ + ৪৬ =) ৭০শ গত বর্ষের সমান।

(৩) দাক্ষিণাত্য কলেজে সংরক্ষিত "কাতন্ত্রবৃত্তিবালবোধিনী" নামক পুঁথিতে লিপিকাল ১৫৯১ শক, ৪৫ সংবৎসর শুক্রবার শুক্লা দ্বাদশী লিখিত আছে। † এখানেও দেখা যাইতেছে যে ৪৫ সপ্তর্ষি, শকের (৪৫ + ৪৬—) ৯১ শ গত বর্ষের সমান।

(৪) পুনার ডেকান কলেজের পুস্তকালয়ে শারদা (কাশ্মীরী) লিপির "কাশিকাবৃত্তি" নামক পুঁথি আছে। ‡ ইহাতে বিক্রম-সংবৎ ১৭১৭, সপ্তর্ষি সংবৎ ৩৬, পৌষ কৃষ্ণা তৃতীয়া,

উহাকে বিক্রম সংবৎ ১৯৫০ গত বলিয়া স্বীকার করা হয়। "সংবৎ ১৯৫১ চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ" লিখিত হইলে আমরা বুঝি যে ১৯৫১ সংবৎ গত হইয়াছে; আর ১৯৫২র ইহা প্রথম, কিন্তু জ্যোতিষের গণনানুসারে ইহার অর্থ এইরূপ হয় যে সংবৎ ১৯৫১ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ এইরূপ হওয়াই ঠিক। কেন না, ব্যবহারে কোন কর্ম্মের একবর্ষ পূর্ণ হইলে আমরা বলিয়া থাকি দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম দিন চলিতেছে—আর আমরা তখন এক বর্ষ একদিন লিখিয়া থাকি—দুই বর্ষ এক দিন লিখি না। যে অব্দ গত হইয়াছে তাহাই ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে—বর্ত্তমান বর্ষ বুঝাইতেছে না। নানা সংবতের সঙ্গে "গতেষু" "অতীতেষু" ইত্যাদি "গত" এই অর্থদ্যোতক শব্দ প্রাচীন সময়ে লিখিত হইত। কিন্তু এই সমস্ত শব্দ লেখা অপ্রলিত হইয়া পড়ায় এই গুলিকে লোকে বোধ হয় বর্ত্তমান বলিয়া মানিয়া থাকিবে। প্রাচীন লিপি ও দানপত্রাদিতে সংবতের যে অঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি গত বর্ষ। কিন্তু যেখানে বর্ত্তমান বর্ষ লেখা আছে সেখানে একবর্ষ অধিক রাখা হইয়াছে। মান্দ্রাজের দক্ষিণ বিভাগে আজও জ্যোতিষানুসারে বর্ত্তমান লিখিত হইয়া থাকে। সেইজন্য এই স্থানের সংবৎ রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের সংবৎ হইতে এক বর্ষ অগ্রগামী হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান উত্তর বিক্রম সংবৎ ১৯৫১তে রাজপুতানার শক সংবৎ ১৮১৬ লিখিত হয়—ইহা কিন্তু জ্যোতিষানুসারে ১৮১৬ গত, অতএব ঐ স্থানে ১৮১৭ বর্ত্তমান লিখিত হয়।—প্রাচীন লিপিমালা।

* সংবৎ ২৪ কার্ত্তিক বাতি ত্রয়োদশ্যাং বুধে শ্রীশকঃ ১৫৭০॥

Dr. Hultzsch in Zeitschrift Des Morg, Ges. Vol XL. P. 9.

শ্রীশকঃ ১৫৯১ সং বৎসরঃ ৪৫ ভাদ্রপদমাসঃ পক্ষাশ্মি ততরঃ তিথির্দ্বাদশী বারো (রঃ) কব্যস্যেতি।

† শ্রীনৃপবিক্রমাদিত্য রাজ্যস্য গতাব্দাঃ ১৭১৭ শ্রীসপ্তর্ষিমতে সংবৎ ৩৬ পৌ (ব) তি ৩ রবৌ তিষ্য নক্ষত্রে।—Indian Antiquary Vol. XX p. 152.

‡ শ্রীমন্নৃপতি বিক্রমাদিত্য সংবৎসরে ১৭১৭ শ্রীশালিবাহনশকে ১৫৮২ শ্রীশাস্ত্র সংবৎসরে ৩৬ বৈশাখ বদি ত্রয়োদশ্যাং বুধবাসরে মেষেৰ্কসংক্রান্তৌ।—Indian Antiquary Vol. XX. p. 152. ও প্রাচীন লিপিমালা।

Archæological Survey of India Vol. XXI. p. 136; also Indian Antiquary. VolXX.

রবিবার এবং তিষ্য নক্ষত্র লিখিত আছে। ইহাঁতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, বিক্রম-সংবৎ ১৭১৭ গত হইয়াছে; ইহা হইতেও এই সংবতের ১৭শ শতকের ৮২ বর্ষে আসিয়া পড়িতেছে।—প্রাচীন লিপিমালা।

(৫) চম্বা হইতে প্রাপ্ত একটী লিপিতে বিক্রম-সংবৎ ১৭১৭, শক সংবৎ ১৫৮২, শাস্ত্র সংবৎ ৩৬ বৈশাখ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী বুধবার লিখিত আছে। ইহা হইতে শাস্ত্রসংবৎ (= ১৭১৭—৩৬ ১৬৮১) বিক্রম সংবৎ (১৫৮২—৩৬ = ১৫৪৬) ১৫৪৭তে আসিয়া পড়িতেছে। ইহাই ঠিক (১) চিহ্নিত স্থানের লিখিত গণনার অনুযায়ী হইয়াছে। বিক্রম ও শক সংবৎ বর্ত্তমান আছে যদিও এই লিপিতে এরূপ কিছু স্পষ্ট লেখা নাই, তথাপি গণিত দ্বারা উভয় সংবৎ গত পাওয়া যাইতেছে।—প্রাচীন লিপিমালা।

(৬) মণ্ডী জেলার বৈজনাথের মন্দিরে একটী প্রশস্তিতে ৭২৬ শক, লোককাল ৮০ রবিবার শুক্ল প্রতিপদ উল্লিখিত আছে। * লৌকিক অব্দযুক্ত লিপির মধ্যে বৈজনাথের লিপিই সর্ব্ব প্রাচীন। "৮০"—ইহা যে কাশ্মীর ও পাহাড়ী প্রদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত কালকে বুঝাইতেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ক্যানিংহামও তাহাই বলিয়াছেন। প্রতি শতাব্দীর ৮০শ বৎসর ২৬শ শক সংবৎ ও ৪—: খৃষ্টাব্দের তুল্য। ক্যানিংহাম লিখিয়াছেন, এই প্রশস্তি সপ্তর্ষি সংবৎ ৮০, শকসংবৎ ৭২৬ অর্থাৎ ৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষোদিত হইয়াছে। কিন্তু এই আলোচ্য প্রশস্তিতে "রবিবার জ্যৈষ্ঠ, শুক্ল প্রতিপদ" অঙ্কিত থাকায় একটু গোল হইয়াছে। ডক্টার শ্রাম ও ফ্লীট এই দুই পাণ্ডিতের স্বাধীন গণনানুসারে উপযুক্ত ৭২৬ শকের চান্দ্র দিবস, ১৩ই যে ৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের তুল্য বটে, কিন্তু, প্রশস্তিতে যে রবিবার লিখিত আছে গণনানুসারে তাহা মঙ্গলবার হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, ঐ তিথিযুক্ত রবিবার ১০২৬ শক ব্যতীত ৬২৬ হইতে ১০২৫ শক পর্য্যন্ত আর কোন শকেই পাওয়া যায় না। অতএব বোধ হয় ১০২৬ শক অর্থাৎ ১১০৪ ২রা মে ঐ প্রশস্তির দিন স্থিরীকৃত হইতেছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় মূল গণনায় কোন ভুল নাই। যাহা হউক, ৭২৬ হইতে ৭৯ বাদ দিয়া ৬৪৭ শক পাওয়া যায়। ইহাই () লোককাল অথবা—৭২৫ খৃষ্টাব্দ লোককাল শতাব্দের ১ম বর্ষ।

(৭) অধ্যাপক বুলর বলেন, ভিয়েনা পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ক শারদালিপির শেষভাগে + বিক্রম সংবৎ ১৭৩২, শালিবাহন শক ১৫৯৭, ঔরঙ্গ সাহ শক ১৮, সপ্তর্ষি ৫১, বৈশাখ শুক্লা দশমী শনিবার লিখিত আছে। ইহা হইতেও সপ্তর্ষি ৫১— বিক্রম (৫১+৮১ = ১৩২) ৩২ = (৫১ + ৪৬) ৯৭ হইতেছে।

(৮) ক্যানিংহাম বলেন শতদ্রুর পার্শ্বস্থিত কোট্‌রা নামক স্থান হইতে Captain Patrick Gerard তাঁহার নিজ পত্রের তারিখ কচ্চাসংবতে লিখিয়াছেন "Kacha Sambat, or year 2 or 1826—27 Kotgarh June 25th 1826" ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ শতবর্ষব্যাপী কচচাসংবতের প্রথম বর্ষ।

---

* বৈজনাথের ১ম প্রশস্তির শেষভাগে এইরূপ লিখিত আছে :—

সংবৎসরে শীতিতমে [প্র] স [ন্নে] [জ্যৈষ্ঠ] স্য শুক্লপ্রতিপতিপত্তিথৌ চ। [শ্রী] ম [জ্জ] যচ্চন্দ্র নক্ষেত্র রাজ্যেরবের্দ্দিনে রামকৃতা প্রশস্তিঃ।—Epigraphia Indica Vol 1.

+ বুলরের শারদালিপির পাঠ যথা:—শ্রীবিক্রমাদি [ত্য] শাকাঃ ১৭৩২ শ্রীমচ্ছালিবাহন শাকাঃ ১৫১৭ শ্রীমদ্ ঔরঙ্গ শাহশাকঃ ১৮।—Indian Ant. Vol. XX p. 32.

শ্রীসপ্তর্ষিচারমতেন সংবৎ ৫১ বৈ শুতি ১০ শনৌ।

এ ছাড়া কৈয়টের দেবীশতকের টীকার শেষে যে শ্লোক আছে তাহাতেও কল্যাব্দ ও লৌকিকাব্দের উল্লেখ আছে। বাহুল্যভয়ে আমরা তাহার আর আলোচনা করিলাম না। আমরা সপ্তর্ষি সংবতের যথেষ্ট নিদর্শন দিয়াছি। ক্যানিংহামের উদ্ধৃত শিলালিপিতে শাস্ত্রসংবতের চারিবার উল্লেখ আছে। সে গুলির যাথার্থ্য নির্ণয়ের কোন প্রয়োজন নাই। তবে সপ্তর্ষি সংবৎ বলিয়া স্পষ্ট লেখা নাই অথচ অন্যান্য শকেরও উল্লেখ নাই, এইরূপ এক খানি শিলালিপি ও একখানি পুঁথি আছে। এগুলি যে সপ্তর্ষি সংবৎ তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। তাহা সপ্তর্ষি সংবৎ হইলেও হইতে পারে। তবে অপরাপর প্রমাণের দ্বারা ইহার বিদ্যমানতার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা বিচার করিতে হইবে।

অতঃপর আর দুই একটী কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সপ্তর্ষিসংবৎকে অন্যান্য সংবতে পরিণত করিবার নিয়ম—

বর্ত্তমান সপ্তর্ষিসংবৎকে কলিযুগ, শকাব্দ, উত্তর বিক্রমাব্দ ও খৃষ্টাব্দে পরিণত করিতে হইবে। তাহা হইলে শতবর্ষান্তর্গত কলিযুগের অতীত বৎসর, তথা শক, বিক্রম ও খৃষ্ট বৎসর বাহির হইবে।

এইরূপে বর্ত্তমান সপ্তর্ষি সংবৎ ২৫, শতকের অঙ্ক ছাড়িয়া দিয়া কল্যব্দের (২৫+২৫)= ৫০ অতীত বৎসর, শকাব্দের (২৫+৪৬)=৭১ অতীত বৎসর, উক্তর বিক্রমাব্দের (২৫+৮১=১০৬) ৬ ও খৃষ্টাব্দের ২৫+২৪।২৫ ৪৯।৫০ বৎসর হইবে।

এই সপ্তর্ষি সংবৎ বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ক্যানিংহাম বলেন, সপ্তর্ষিচক্রের কোন্ সময় আরম্ভ হয় ইহা জানা যতই কঠিন ব্যাপার হউক না কেন, ইহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; যে হেতু বৃদ্ধগর্গের বর্ণনার বিষয় বরাহমিহির ও ভট্টোৎপল উভয়েই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ক্যানিংহাম আলেকজান্দারের সময় ইহার প্রচলন সম্বন্ধে যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। পরাশর ও আর্য্যভট্ট স্বীকার করেন যে কল্পের ৪৩২০,০০০,০০০ বর্ষের আরম্ভ কালে সপ্তর্ষিচক্রের আরম্ভ হইয়াছিল। আর এই কল্পে তাহাদের চক্র (Revolution) সংখ্যা ১,৫৯৯,৯৯৮, হইয়াছিল। পরামর্শমতে কলিযুগের পূর্ব্বে ১৯৭২৯৪৪৫০৫ বৎসর অতীত হইয়াছিল। কাশ্মীর, কাঙ্গরা উপত্যকা ও কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন গ্রামে এই সংবৎ এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঙ্গরা জেলার লোকেরা ইহাকে সাত ঋষি- (খি) কাল বলে। এইখানকার অধিবাসীরা ইহাকে পাহাড়ী সংবৎ বলিয়া থাকে। প্রাচীন কালে এই সংবৎ কাশ্মীর হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, এক্ষণে ইহা কাশ্মীর, কাঙ্গরা, মুণ্ডী, কুল্লু, কোটগড়, রামপুর ও ইহাদের আশপাশের পাহাড়ী এলাকায় কোথাও কোথাও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সংবৎ চৈত্র শুক্ল প্রতিপদে আরম্ভ হয়। ইহাদের মাস পূর্ণিমান্ত।* +

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ।

---

* ভারতবর্ষে মাসের প্রারম্ভ দুই প্রকারে ধরা হয়। গুজরাট হইতে উত্তর দেশ পর্য্যন্ত লোকেরা আপনা-দের মাসের প্রারম্ভ কৃষ্ণ প্রতিপদে এবং অন্ত পূর্ণিমায় মানিয়া লয়। এইজন্য উহাদের মাস পূর্ণিমান্ত। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে মাসের প্রারম্ভ শুক্ল প্রতিপদে ও অমাবস্যায় এই কারণ ইহাদের মাস অমান্ত বলিয়া কথিত।

+ বর্ত্তমান প্রবন্ধ কোন মৌলিক রচনা নয়। সপ্তর্ষি সংবৎ সম্বন্ধে যে সকল পণ্ডিত বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

মাহিষ্য ও তৎপুরোহিত

ক্ষত্রিয়ের পরিণীতা বৈশ্যাভার্য্যার সন্তানের নাম মাহিষ্য। এইজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তুরাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌস্মৃতৌ।

যাজ্ঞ্য ।৯২

ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাভার্য্যাতে উগ্র এবং বৈশ্যাভার্য্যাতে মাহিষ্য জন্মে। বৃদ্ধহারিত সংহিতা, গৌতমসংহিতা প্রভৃতিতে মাহিষ্যের উৎপত্তি এইরূপ আছে। মাহিষ্যের উৎপত্তি সর্ব্বশাস্ত্রেই একরূপ। এই জাতি দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ দ্বিজাতির—সংস্কারার্হ। যথা—

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।

মনু ১০।৪১

সজাতীয়া ভার্য্যাজাত তিন সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং অনন্তর ভার্য্যাজাত—মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য এই ছয়জাতি দ্বিজধর্ম্মী। এই ছয়জাতির মধ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। কারণ, পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইলে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়কুল রক্ষা করা হইয়াছে। *

মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি ব্রাহ্মণের পরিণীতা ক্ষত্রিয়া পত্নীতে উৎপন্ন। উৎপত্তি সাদৃশ্যে মূর্দ্ধা জাতি নবসৃষ্ট ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অম্বষ্ঠ জাতি বৈদ্যরূপে বর্ত্তমান, মাহিষ্যজাতি কৃষি কৈবর্ত্তরূপে পরিচিত।

মাহিষ্য জাতি একই প্রকার। ইহার জন্মভেদে উচ্চনীচ নাই। কিন্তু বিশ্বকোষে মাহিষ্য জাতি তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন মাহিষ্য ত্রিবিধ, প্রথম ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত উচ্চ শ্রেণীর মাহিষ্য। দ্বিতীয় করণীর গর্ভজাত মধ্যম শ্রেণীর মাহিষ্য। তৃতীয় ব্যাভিচারিণীর গর্ভজাত অতি জঘন্য মাহিষ্য।

প্রথম শ্রেণীর মাহিষ্য ভিন্ন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর মাহিষ্য নাই। ঐ প্রকার মাহিষ্যের উচ্চ নীচ শ্রেণী বিভাগ সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের কল্পনা মাত্র। নগেন্দ্র বাবু দ্বিতীয় প্রকারের মাহিষ্যের উৎপত্তি লিখিয়াছেন—সুবর্ণ কর্ত্তৃক করণী রমণীতে। কিন্তু তিনি নিজেই বিশ্বকোষের ঐ স্থানে বলিয়াছেন ঐ মাহিষ্য তক্ষা, রথকার, শিল্পী, বার্দ্ধুষী, লৌহকার, কর্ম্মকার নামে বিদিত। †

সুতরাং দ্বিতীয় প্রকার মাহিষ্য নাই। বিশ্বকোষের লিখিত তৃতীয় প্রকার উৎপন্ন সন্তানকে মাহিষ্য বলে না। মাহিষিক বটে। সংস্কৃত বাঙ্গলা যাবতীয় অভিধান দ্রষ্টব্য।

* মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ—আদি পর্ব্ব। ১০৫ অধ্যায়।
† বিশ্বকোষের ধৃত মূল শ্লোক ও তাহার অনুবাদ দ্রষ্টব্য!

মাহিষিক কোন জাতি নহে। ব্যভিচারিণীর গর্ভজাত সন্তানকে মাহিষিক বলে। কুণ্ডগোলক মাহিষিক সর্ব্বজাতির মধ্যেই হইতে পারে সুতরাং তৃতীয় প্রকার মাহিষ্য টিকিলনা।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় যে আশ্বলায়ন স্মৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ঐরূপ আশ্বলায়ন স্মৃতি অপ্রসিদ্ধ। উহা হিন্দুর বিংশতি সংহিতার অন্তর্গত নহে। পণ্ডিতেরা উক্ত গ্রন্থকে জানেন না। উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও তৃতীয় প্রকার মাহিষ্য একটী জাতি নহে উহা ঐ স্থানে সূত শব্দের বিশেষনরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ মাহিষ্য শব্দ মাহিষিক শব্দের পর্য্যায় লিখিত। এইরূপ মাহিষিক যাজক চিরকালই পতিত। এখনও কেহ এইরূপ মাহিষিক যাজন করিলে পতিত হয়। সুতরাং আশ্বলায়নের উক্তি দ্বারা মাহিষ্য জাতির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

বাগতীত জাতির পিতা মাতা ক্ষত্রিয় বৈশ্যা হইলেও সে মাহিষ্য বা কৈবর্ত্ত হইতে পারে না। কারণ শাস্ত্রমতে সে ঋতুদোষে দুষ্ট হইয়া বাহ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন বর্ত্তমান কালে হালিক কৈবর্ত্তগণ জালিক (ধীবর) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন তজ্জন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য, পতিত ধীবর নহেন, কিন্তু আশ্বলায়ন এ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বলিয়াছেন যে "চৌর্য্যেন" অর্থাৎ চৌর্য্যক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাগর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে তাহারাই ধীবর বা কৈবর্ত্ত। এখানে বসুমহাশয় কৈবর্ত্তশব্দ স্বয়ং বসাইয়াছেন। তথাকথিত আশ্বলায়ন স্মৃতিতে কেবল ধীবর শব্দ আছে। ধীবর মাত্রই কৈবর্ত্ত নহে। নিষাদ জাতি মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ধীবর বলিয়া কথিত হইয়াছে। আবার গৌতম সংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে প্রতিলোমক্রমে ধীবর জাতি জন্মে লিখিত আছে। মালো, রাজবংশী জাতির নামও ধীবর। সুতরাং ধীবর মাত্রই কৈবর্ত্ত হইতে পারেনা। বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত ক্ষত্রিয়ের পরিণীতা বৈশ্যাভার্য্যার সন্তান। আশ্বলায়নের ধীবর ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কৈবর্ত্ত হইতে পারেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কৈবর্ত্ত যে অবৈধরূপে উৎপন্ন তাহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য। যে আশ্বলায়ন স্মৃতির বলে মাহিষ্য নির্য্যাতন করা হইতেছে ঐ আশ্বলায়ন স্মৃতি কৃত্রিম গ্রন্থ। কোন নিবন্ধকার বা আভিধানিক ঐ গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করেন নাই। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির হস্তলিপির ক্যাটালগে ঐ গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয় না।

এক পিতামাতার একইভাবে উৎপন্ন সন্তান বিভিন্ন নামধারী হইলেও একই জাতি বটে। সেই কারণে মাহিষ্য, কৈবর্ত্ত, দৌষ্মন্ত, যদু একই জাতির ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় ঔশনস্ ধর্ম্মশাস্ত্রকে অপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াছেন। ঔশনস্ ধর্ম্ম শাস্ত্র কেন অপ্রাচীন গ্রন্থ হইল প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় তারানাথ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় তদীয় বাচস্পত্যাভিধানে জাতিশব্দে উক্ত ঔশনস্ ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন—প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

নৃপাজ্জাতোঽথ বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনা সুতঃ।
বৈশ্যবৃত্ত্যাতু জীবেত ক্ষাত্র ধর্ম্মং নচাচরেৎ।
—ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্র।

নগেন্দ্র বাবু বিশ্বকোষে এই শ্লোকেরও অর্থান্তর করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন—

"ক্ষত্রিয় হইতে বিধি পূর্ব্বক গৃহীত বৈশ্যাতে যে পুত্র জন্মে সে সূত, সে বৈশ্যবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আচরণ করিবে না।" নগেন্দ্র বাবু "সে সূত" কোথায় পাইলেন ? এই "সুত" সূত জাতি নহে। সুত অর্থ পুত্র। ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্র ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা পত্নীর সন্তানকে কোন নামে নির্দ্দেশ করেন নাই। ঐ সুত বৈশ্য বৃত্তি অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য গোরক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আচরণ করিবেনা। ঐরূপ সন্তানের নাম ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দেশ না থাকায় উহাকে কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য বলা যাইতে পারে। প্রাচীন টীকাকার কুল্লুকভট্টের টীকায়ও "শস্যরক্ষা" মাহিষ্যের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব পিতা মাতা ও বৃত্তিসাম্যে কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য একই জাতি। নগেন্দ্র বাবু কুল্লুক ভট্টের টীকাকেও অগ্রাহ্য করিবার জন্য লিখিয়াছেন "কোন প্রাচীন স্মৃতি, পুরাণ বা নিবন্ধে মাহিষ্যের 'শস্যরক্ষা' বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।" কুল্লুকের ঐ টীকা স্বকপোলকল্পিত নহে। তিনি ঐ উক্তি উশনার বাক্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুল্লুকভট্টের মনু-সংহিতার টীকা সর্ব্বজন-প্রশংসিত, ঐ টীকাকে কেহই অপ্রামাণিক বলেন নাই।

যাহা হউক নগেন্দ্র বাবু নিজেই অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া শেষে লিখিয়াছেন "তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে কৈবর্ত্ত জাতি এক প্রকার নহে। এখন যেমন হালিক ও জালিক দুই প্রকার কৈবর্ত্ত দেখা যায় পূর্ব্বেও নানা প্রকার কৈবর্ত্ত ছিল।" একথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন নিষাদ আয়োগবী জাত কৈবর্ত্ত এদেশে মার্গব বা মালো নামে পরিচিত এবং বেদোক্ত আদি কৈবর্ত্ত বা ধীবর এখন জালিক কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত। আর ক্ষত্রিয় বৈশ্যাতে জাত কৈবর্ত্ত শস্যরক্ষা জীবিকা অবলম্বন করিয়া সম্ভবতঃ ইহারাই হালিক কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত। যদি এই মীমাংসাই সমীচীন হয় তবে অন্যান্য বিতণ্ডা উঠাইয়া হালিক কৈবর্ত্তকে ধীবর বলা হইল কেন ?

নগেন্দ্র বাবু মাহিষ্য পুরোহিতের প্রতি বড়ই বিরুদ্ধ লেখনী চালনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "এদেশীয় হালিক কৈবর্ত্ত গণকে এইরূপ জঘন্য মাহিষ্য (মাহিষিক) মনে করিয়া সম্ভবতঃ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পৌরহিত্য স্বীকার করেন নাই। সেই জন্যই হালিক কৈবর্ত্তগণ ধন সম্পদে ও পরাক্রমে বহুদিন হইতে দক্ষিণ বঙ্গে ও মেদিনীপুর জেলার প্রাধান্য লাভ করিলেও কোন অজ্ঞাত কারণে জালিক কৈবর্ত্তের পুরোহিত গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন।" সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের বিচার পদ্ধতি স্ব-বিরোধী। তিনি একবার বলিলেন এইরূপে জঘন্য মাহিষ্য মনে করিয়াই সম্ভবতঃ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তাহাদের পৌরহিত্য স্বীকার করেন নাই। আবার লিখিলেন কোন অজ্ঞাত কারণে জালিক কৈবর্ত্তের পুরোহিত গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। এরূপ লেখায় স্ববচন-বিরোধ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-সিদ্ধান্তবারিধি

মহাশয়ের পক্ষে অশোভণীয়। আর হালক কৈবর্ত্তগণ যে "বাধ্য হইয়া জালিকের পুরোহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন" একথা সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় কিরূপে লিখিয়াছেন? জালিকের পুরোহিতের সহিত হালিক কৈবর্ত্তের পুরোহিতের কোন সংস্রব নাই। যাহার যাহা জানা নাই তাহার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া অন্য জাতির মর্য্যাদা হানি করা অন্যায়। বঙ্গ দেশের যাবতীয় হালিক কৈবর্ত্ত সমাজ, ও তত্তৎ স্থানের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সামাজিক গণকে জানিয়া দেখিবেন হালিকের পুরোহিত জালিকের পুরোহিত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কিনা? ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার বহু মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের কন্যা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে পরিণীতা হইয়াছে। জালিক সংস্রব থাকিলে কখনও এরূপ হইতে পারিতনা। জালিকের পুরোহিত মাহিষ্যগণ গ্রহণ করিলে তাহাদের আনীত জল কি ব্রাহ্মণে পান করিতেন? যাঁহারা সমাজতত্বে এত অনভিজ্ঞ তাঁহারাই আমাদের সমাজের ইতিহাস লেখক!

এদেশের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মাহিষ্যের যাজন স্বীকার করেন নাই একথা সত্য নহে, মাহিষ্যগণই তাঁহাদিগকে পৌরহিত্যে বরণ করেন নাই। এদেশের উচ্চশ্রেনীর ব্রাহ্মণগণ আদিশূরের সময়ে বা তৎপরে আনীত। ইহাঁরা ইহাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী আদিশূরের আনীত এই নবাগত ব্রাহ্মণের যাজ্যত্ব স্বীকার করেন নাই। ইহাঁরা গৌড়ের আদি ব্রাহ্মণের যজমান। ইহাঁরা পূর্ব্বপুরোহিত ত্যাগ করেন নাই। এই প্রাচীন ব্রাহ্মণের বহুগোত্র মিল করিলেই জানা যাইবে। নবাগত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ মাত্র পঞ্চ গোত্রীয়, মাহিষ্য যাজীগণ বহু গোত্রীয়। এ দেশের বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখের পঞ্চ গোত্রীয় পুরোহিত, ইহাঁরা নবাগত ব্রাহ্মণের যাজ্য। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরোহিত কাহারা? হয় এই সকল জাতি পুরোহিত হীন ছিলেন নয় পূর্ব্বপুরোহিত ত্যাগ করিয়াছেন। মাহিষ্যগণ পুরোহিতহীনও ছিলেন না পূর্ব্বপুরোহিত ত্যাগও করেন নাই। নবাগত ব্রাহ্মণের সঙ্গে দলাদলি ও বিদ্বেষবশতঃই যাজীগণ সমাজে অপদস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।*

মাহিষ্যগণ নিরুপায় হইয়া বর্ত্তমান পুরোহিত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে উচ্চশ্রেণী হইতে অনায়াসে পুরোহিত লইতে পারিতেন। যেখানে মাহিষ্য যাজী ব্রাহ্মণ নাই সেইখানেই উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে মাহিষ্যগণ পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। অনুসন্ধানের জন্য লিখিতেছি নগেন বাবু ইচ্ছা করিলেই আমাদের উক্তির সত্যতার প্রমাণ পাইবেন।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর সব্ ডিভিসনের শেলাপটির মাহিষ্য চৌধুরীগণ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দ্বারা যাজন কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তুর্কা অঞ্চলের মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মাহিষ্যের যাজন করিতেছেন। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ঠাকুরগাঁ মহকুমার আটোয়ারী থানার নিকটে আটোয়ারী গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে মৈথিল ব্রাহ্মণগণ হালিক কৈবর্ত্তদিগের পৌরহিত্য কার্য্য আবহমান কাল হইতে করিয়া আসিতেছেন।

* সবিস্তার বিবরণ মৎপ্রণীত "বঙ্গীয় মাহিষ্য পুরোহিত" গ্রন্থে এবং পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ভ্রান্তি বিজয়" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

নগেন্দ্র বাবু আরও লিখিয়াছেন—"আশ্বলায়ন জঘন্য মাহিষ্যগণের পুরোহিতকে অদ্বিজ ও অনাচরণীয় বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ব্রাহ্মণই স্কন্দ পুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে 'শূদ্রপ্রায়' 'কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত পুরোহিতগণ 'পরাশর' 'ব্যাসোক্ত' 'দাক্ষিণাত্য' 'দ্রাবিড়' শ্রেণী বলিয়া পরিচিত।"

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি একপ্রকার বিশুদ্ধ মাহিষ্য ভিন্ন দ্বিতীয় মাহিষ্য নাই। ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে মহিষী বলে। তাহার গর্ভোৎপন্ন সন্তানকে মাহিষিক বলে। সেইরূপ সন্তান কোন জাতি নহে। ঐরূপ মাহিষিক সর্ব্বজাতির মধ্যেই জন্মে। আশ্বলায়ন তাহাদের যাজককেই অদ্বিজ ও অনাচরণীয় বলিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু মাহিষিককে মাহিষ্য লিখিয়া লোককে ভ্রান্তপথে চালিত করিয়াছেন।

আর মাহিষিক-যাজক পতিত ব্রাহ্মণকে স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডের "শূদ্রপ্রায়" "কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ" বলিয়া কে নির্দ্দেশ করিল? সহ্যাদ্রিখণ্ডের ব্রাহ্মণের মূল কৈবর্ত্ত জাতি। পরশুরামের কৃপায় কৈবর্ত্তই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। এই কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ কুমারিকার উত্তরে আছেন। (সহ্যাদ্রিখণ্ডে দ্রষ্টব্য)। বঙ্গের কৃষিকৈবর্ত্ত জাতির পুরোহিত কৈবর্ত্ত জাতিয় ব্রাহ্মণ নহেন। দাক্ষিণাত্যে যেমন চিৎপাবণ ব্রাহ্মণ আছেন সেইরূপ কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ আছেন। সহ্যাদ্রিখণ্ডের কৈবর্ত্তজাতীয় ব্রাহ্মণ যে বঙ্গদেশের মাহিষ্য জাতিয় ব্রাহ্মণের সজাতি তাহার প্রমাণাভাব। মাহিষ্য যাজী ব্রাহ্মণের "দ্রাবিড় শ্রেণী" "পরাশর" "ব্যাসোক্ত" নামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়নাগড়ের রাজার অভিষেকের সময় এবং জানুখণ্ডী রাজার দীঘি প্রতিষ্ঠার সময় দ্রাবিড় দেশ হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ দ্রাবিড় শ্রেণী নামে খ্যাত। পরাশর বঙ্গের প্রাচীন ব্রাহ্মণ। রাঢ়ীয় ঘটক মুলোপঞ্চাননের কারিকায় ব্যক্ত আছে যথা—

পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই,
তা ছাড়া বামণ নাই,
যদি থাকে দুই এক ঘর,
সাতশতী আর পরাশর।

—মুলোপঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা।

রাঢ়ীয় কুলজ্ঞ যখন বিদ্বেষ বশতঃ শতগ্রামী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করেন নাই সেই সময়েও সপ্তশতী ও পরাশর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (সম্বন্ধ নির্ণয় কর্ত্তা লিখিয়াছেন)। যাহা হউক ঐ কারিকাতেও বঙ্গের প্রাচীন পরাশর ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল।

ব্যাসোক্ত নাম এই ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞতার পরিচায়ক। অতএব দেখা গেল সহ্যাদ্রিখণ্ডের কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ যে পরাশর ব্যাসোক্ত দ্রাবিড় শ্রেণী নামে পরিচিত তাহা সত্য নহে। ইতিহাস ক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমানের কোন মূল্য নাই।

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় একবার সহ্যাদ্রিখণ্ডের কথা উঠাইয়া কৃষিকৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণের নীচত্ব আরোপ করিলেন। আবার আশ্বলায়নের বেশ্যা পুত্রের যাজনের কথা উঠাইয়া

কৃষিকৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণকে পতিত ও অপাংক্তেয় বলিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন ইহাঁরা জালিকের যাজক! ইহাঁর কোন্ কথা ঠিক? সমাজপ্রান্তে অতি দীনভাবে অবস্থিত নিরীহ জাতির প্রতি কি এইরূপ সাহিত্যিক অত্যাচার উচিত? নগেন বাবু গুলি চালাইয়া দুই দশজন মাহিষ্য ও তৎপুরোহিতকে হত্যা করিলে যত ক্ষতি না করিতেন এইরূপ লেখায় ততোধিক ক্ষতি করিয়াছেন।

এইরূপ ব্যবহারের জন্যই হিন্দু সমাজ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইতেছেন এবং পরপদ-দলিত হইতেছেন। আমরা আবার স্বরাজ প্রার্থী! আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? যাহারা অকারণে শত শত স্বধর্ম্মী ভ্রাতার মনে ক্লেশ দেয় পরের জুতা মাথায় বহন করাই তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম এবং বিধিনির্দ্দিষ্ট পুরস্কার।

উপসংহারে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ মাহিষ্য জাতির আর অস্তিত্ব নাই। সম্ভবতঃ এই জাতি অবস্থানুসারে রাজপুত সমাজে অথবা অপর কোন সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন।" বসু মহাশয় মাহিষ্য জাতিকে চিনিতে পারেন নাই বলিয়া যে সে জাতির অস্তিত্ব নাই একথা বলা যুক্তি সঙ্গত নহে। বৈদ্য আছেন বলিয়া অম্বষ্ঠের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। দেশভেদে একই জাতি নানা নামে পরিচিত। বঙ্গদেশের কায়স্থ জাতি উড়িষ্যায় করণ নামে পরিচিত। এখন উড়িয়া পণ্ডিত কায়স্থ নাই বলিতে পারেন না অথবা বাঙ্গালী পণ্ডিত করণ জাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না।

আশাকরি নগেন্দ্রবাবু এই বিষয়ে সহৃদয়তা প্রদর্শন করিবেন।

শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

কবীরের প্রেমসাধনা

প্রেমের যে সাধক তার খেলা যেমন সুন্দর তেমনই কঠিন। সতী যে আগুনে পুড়ে মরে বীর যে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাও এই প্রেম-সাধনার কাছে কিছুই নয়।

সাধকা খেলতো বিকট বেঁড়া মতী
সতী ঔর সূরকা চাল আগে।
সূর ঘমসান হৈ পলক দো চারকা
সতী ঘমসান পল এক লাগে।
সাধ সংগ্রাম হৈ রৈন দিন জুঝনা
দেহ পর্য্যন্তকা কাম ভাঈ॥

সাধকের খেলা তো ভীষণ ও রমণীয়, সতী আর সূরের খেলা এর কাছে কি? বীরের লড়াই তো দুইচার পলকের, সতীর প্রচণ্ড সাধনা তো একটি পলের মাত্র। হয় জয় হবে তাদের, নয় জয় হবে মৃত্যুর। কিন্তু সাধকের? রাত্রি দিন তার যুদ্ধ। সতীর মত আগুনের মধ্যে একবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই এক পলে তার খেলা শেষ হয়ে যায় না। কামনা তৃষ্ণা যা কত রমণীয়, যা একেবারে আপনার সঙ্গে এক হয়ে গেছে তাও তাকে ক্ষয় করতে হয়। প্রতিদিন

আপনাকে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত করবার এ বেদনা। এ যে সব আপনার অঙ্গের সামিল হয়ে গেছে। যতদিন একটি পরমাণুও থাকবে ততদিনই যুদ্ধ চলবে। বড় কঠিন এই লড়াই।

আপনাকে ক্ষয় করতে হবে অথচ সম্পূর্ণ ক্ষয় করলে চলবে না। তাহলে আর সাধনা হবে কাকে দিয়ে? সে তো সাধন নয় সে হলো নিধন।

"অমোয়া কোইলি ঘীসন রহলী
ঘীসত ঘীসত লাগা সুর"

শিশুরা আমের আঁটি যে বাজায় তারা ঘসে, আর বাজায়। ঘসতে ঘসতে যখন সুরটি বেজে উঠে তখন আর ঘসে না, আর ঘসলে বাজবে কি? সাধকও আপনার অসার কামনা প্রভৃতি ক্ষয় করে যখন প্রেমের সুরে বিশ্বের রাগিণীতে বেজে ওঠেন তখন তাঁর আর আত্মহত্যা করার দরকার হয় না।

এই কামকে ক্ষয় করে সেই প্রেমকে পেতে হবে বিশ্বের সুর যাতে বাজচে।

কামকে ক্ষয় করে প্রেমকে লাভ করা বড় কঠিন সাধনা। তাহোক, পৃথিবীতে এসে যদি সেই প্রেম না পেলাম তবে হোল কি? আনন্দের সাগরে এসে যদি পিপাসায় মরবো এমন হয়, তবে পেলে কি? প্রেমরস যে ভরে আছে প্রতি শ্বাসে শ্বাসে পান কর।

"সুখ সাগরমেঁ আয়কে মত্ত জায়ে প্যাসা।
নির্ম্মল নীর ভরের তেরে আগে পীলে শ্বাঁসো শ্বাঁসা॥
মৃগতৃষ্ণা জল ছাড় বাবরে করো সুধারস আশা।
ধ্রু পহ্লাদ সুকদেব পিয়া ঔর পিয়া রৈদাসা॥
প্রেম হি সংত সদা মতবালা এক প্রেমকী আসা।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো মিট গঈ ভয়কী বাসা॥

"অমৃতের সাগরে এসে পিপাসিত ফিরে যাস্ নে। নির্ম্মল সুধায় ভরে আছে এই সাগর। শ্বাসে শ্বাসে সেই পরমানন্দ রস পান কর্। পাগল হয়ে যে কামনার মৃগতৃষ্ণার পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছিস, তা ছাড়্। অমৃতরসের তৃষ্ণা তোর জীবনে জেগে উঠুক। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুকদেব, রবিদাস সবাই এই প্রেমরসই তো পান করেছেন। সাধকেরা এক এই প্রেমরসেরই পিয়াসী এতেই তাঁরা সদা মত্ত হয়ে আছেন।

কবীর বলছেন এই প্রেম-রস-সাগরের সন্ধান পেয়েছি বলে আমার সব ভয়ের বাসা ভেঙ্গে গেছে। এই প্রেমকে জেনে আমি এখন নির্ভয় হয়েছি।"

এই প্রেম না পেলে মানব জীবনের মূল্যই বা কি! ভর্ত্তৃহরি লিখেছেন "যে মানব-জন্ম পেয়ে তা শুধু খেয়ে দেয়েই শেষ করে তাকে কি বোলবো? সে সোণার লাঙল দিয়ে আকন্দমূলের চাষ করে গেল। সে বৈদূর্য্যরত্নভাণ্ডে চন্দনের কাঠ জালিয়ে তিল সিদ্ধ করলে। কর্পূর খণ্ড করে কুধান্যের ক্ষেতের বেড়া দিলে। মানবজন্ম পেয়ে শুধু এই ক্ষণ স্থায়ী সুখ মাত্র আদায় করলি আর কিছুই না?"

এত বড় আত্মা যে পেলে তাতে করলে কি? পরমাত্মাকে লাভ করবে না? যদি না লাভ করে থাক তবে বৃথা জন্ম তোমার। উপনিষদ বলেন "যে তাঁকে জেনে এই

পৃথিবী থেকে চলে গেল, সে ধন্য হয়ে গেল। যে তাঁকে না জেনেই চলে গেল, সে কৃপার পাত্র হয়ে গেল।"

সামান্য যশ, সামান্য মান, ধন, গৌরব এই সবের জন্য এমন অমূল্য জীবন ফুঁকে দিলাম! সেই পরম সত্যকে জানবার জন্য কিছুই কল্লাম না?

"যহ জীয়রা অনমোল হৈ
ভয়ো কৌড়ীকা ফেকা রে॥"

"হায়, অমূল্য এই জীবন, এক কড়ার দানের জন্য ইহা বাজি রেখেছি।"

আমি তোমার সঙ্গে প্রেমের খেলায় দান খেলতে বসেছি। আমি যদি হারি, আমি তোমার; তুমি যদি হার, তুমি আমার; কোনও দিকে হার নেই। আমি অন্তরের মধ্যে যে প্রেম এনেছি, সেই বরণ মালা যদি তাঁকে না দিই, তবে যে আমার সকল পবিত্রতাই নষ্ট হয়ে গেল। মনে কর দময়ন্তীর কথা। যে পরমাত্মার গলে মালা দিল, তার জীবাত্মা পবিত্র হল। তার মান রইল। যদি পরমাত্মাকে না চিনতে পেরে সংসারের গলে মালা দেয় তবে জীবাত্মার পবিত্রতা সতীত্ব সবই গেল। এই যে জীবনস্বামী বিশ্বনাথের ঘরে এলাম, তাঁকে না দেখেই যদি গেলাম তবে যে সবই বৃথা হল। যুগ যুগ তোমারই রাজত্ব; বিশ্ব তোমারই অধিকারে, কেননা জগন্নাথ যে স্বয়ংই তোমার। এই প্রেম জাগলে সব সার্থক হয়ে যাবে। তাঁর জন্যে যে বরণমালা তা তাঁকে দিলে সংসার ধর্ম্ম সবই সার্থক হবে। তা নৈলে ত সব বৃথা।

"সাঈঁ সব কুছ দিন্‌হ দেত কুছ না রহ্যো।
হমহী অভাগিন নার সুকৃখ ত্যজ দুকৃখ লহ্যো॥
গঈ পিয়াকে মহল পিয়া সঙ্গ ন রচী।
কহৈঁ কবীর সমঝায় সমঝ হিরদে ধরো।
জুগন জুগন করো রাজ ঐসী দুর্ম্মতি পরিহরো।"

"স্বামী সবই দিয়েছেন কিছুই বাকী রাখেন নি। আমিই যে অভাগিনী নারী সুখ ছেড়ে দুঃখই বেছে নিয়েছি। প্রিয়ের ধামে এসেও তাঁর সঙ্গে মিলন হলো না। কবীর বলেন হৃদয়ে সমঝে দেখ যুগ যুগ তোমারই তো রাজত্ব, এমন দুর্বুদ্ধি ছেড়ে দাও।" স্বামীকে এড়িয়ে আর সব পাবার চেষ্টাই তো যথার্থ দুর্বুদ্ধি!

প্রেমে জাগ্রত আমার যৌবন আজ আমাকে তাঁর খবর দিয়েছে। তাঁকেই বরণ মালা দিতে হবে, জ্ঞান আমাকে সে খবর দিয়েছে। তাই ত তাঁর পত্র পেয়েছি। আজ আমি ব্যাকুল; হে অবিনাশী, হে প্রিয়তম, তোমার ত কালেতে কিছু আসে যায় না। হে অনাদি, অনন্ত, তুমি ত অপেক্ষা করতে পার, আমি ত পারি না।

"সখিযোঁ হমহু ভঈ বলমাসী।
আয়ো জোবন বিরহ সতায়ো
অব মৈঁ জ্ঞান গলী অটিলাতি?
জ্ঞান গলীমেঁ খবর মিল গয়ে
হমেঁ মিলী পিয়াকী পাতী॥

রা পাতীমেঁ অজব সংদেসা
অব হম মরনেকো ন ডরাতী ॥
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো
বর পায়ো অবিনাসী ॥

"হে সখীগণ, আমিও বল্লভ-পিয়াসিনী হয়েছি। যৌবন যে এসেছে। যৌবন যে দুঃখ দিচ্ছে, এখন কিনা আমি জ্ঞানগলি ঘুরে ঘুরে মরবো! তবে জ্ঞানও ধন্য, সেখানেই তো খবর পেলাম, প্রিয়তমের পত্র মিলে গেল। সেই পত্রে অপরূপ সংদেশ। কেমন করে তা বুঝিয়ে বলি? তবে এটা ঠিক যে এখন আমি মরতেও ভয় করিনে। কবীর বলেন, এখন যে অবিনাশীকে বর পেয়েছি।"

হে অবিনাশী, তোমার হয়ত কালের অন্ত নাই, তাই তোমার কোন তাগিদ নাই। কিন্তু আমার যে কাল পরিমিত। এই জীবনটী আজ কমলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই যে অস্থায়ী সৌন্দর্য্য এ জীবনটিকে ধরে ফুটে উঠেছে, তাকে তুমি যদি ধন্য না কর, তবে তোমার কোন তাড়া না থাকতে পারে কিন্তু আমার তো আর উপায় নাই।

চল চলরে ভঁবরা কমল পাস।
তেরা কমল গাবৈ অতি উদাস ॥
খোজ করত বহ বার বার।
তন বন ফুল্যো ডার ডার ॥
দিবস চারকা সুরংগ ফুল।
রহিলগ মনমেঁ লাগল শূল ॥
পুহুপ পুরানে জৈবে সুখ।
তব ভেঁারা কহাঁ সমাবে দুখ ॥

"চল চল হে ভ্রমর, তোমার কমলের পাশে চল। তোমার কমল বড় উদাস সুরে গান কচ্চে। বারবার সে তোমার খোঁজ কচ্চে, তার তনুবন খানি যে ডালে ডালে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু হায় সে সুন্দর মনোহর ফুল যে দিন চারেকের জন্য, সেই জন্যই তো মনের মধ্যে বেদনা লেগেই আছে। এই ফুল পুরোনো হলেই শুকিয়ে যাবে। তখন হে ভ্রমর, এই দুঃখ মিটবে কিসে! কোথায় এই দুঃখ রাখ্‌বার জায়গা হবে!"

এই জীবনটী যে শাখায় শাখায় পুষ্পিত হয়েছে, কিন্তু জীবনের ভ্রমর কোথায়? এই জন্যেই তার মনের মধ্যে ব্যথা। এই যে সে আজ বিকশিত হয়েছে, কালই ত সে পুরাতন হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে, তখন হে ভ্রমর, আমি এদুঃখ কোথায় রাখ্‌ব? এইতো অসীমের জন্য সীমার কান্না। তিনি যদি বৈরাগী অনাসক্ত হয়ে থাক্‌তেন তবে তো আশাই ছিলনা। আমি সীমা, তিনি অসীম। কিন্তু এখানে তো ছোট বড়র কথা নয়, এযে প্রেম। আমি ছাড়া ও তো তাঁর চলেনা।

তিনি তাঁর বিশ্ব প্রকৃতিতে রাজা হলেও আমি না হলে তাঁর প্রেমস্বরূপ অসম্পূর্ণ,

এই যে আমাকে ছাড়া তাঁর চলেনা এই তত্ত্বটি মধ্যযুগের কবি জ্ঞানদাস বৈবেলি চমৎকার কবিত্বে প্রকাশ করেছেন।

এই লোকলোকান্তরের অধীশ্বর মহোৎসব-রত। এই প্রকৃতি তাঁর দূত। আমি তাঁর এক মাত্র অতিথি। অথচ দূত এত আড়ম্বরে আস্‌চে যে আমি তার ঐশ্বর্য্যই দেখ্‌চি। যে হিরণ্ময় পাত্রটি সত্যকে ঢেকে রেখেছে তাই দেখ্‌চি।

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্"

এই পাত্রখানি না সরালে দেখি কেমন করে? দূতের আড়ম্বরই যে বাধা হোলো।

"ফজরমেঁ জব আয়া চলচি
পুষাক সুনহলী তেরী।
গমক ভর জং শাঁস লগায়া
চিত জগায়া মেরী॥
ধূপমেঁ হমকো কিয়া উদাসা
ক্যা পীড় দূর সমায়া।
গায়া গেরুয়া সুর মধরবী
মরনসা রৈন আয়া॥
কাগজ কালা হরফ উজালা
ক্যা ভারী খত পায়া।
ইত্তী রৌনক কেঁ্যারে চলচী
তুহি যাদ ভুলায়া॥
ভারী জলসা আজম দারত
তূহী ইক মেহমান।
খল্ক খল্কমেঁ খত হৈ ফৈলী
মগরুর হম ফরমান॥"

প্রভাতে যখন এলে হে দূত, তখন তোমার সোনালী পোষাক। পুষ্পগন্ধে ভরা পবনের সুরভি নিশ্বাস লাগাইয়া আমার চিত্তকে জাগাইলে। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আমাকে উদাস করিলে। আকাশের দিগন্তের চক্রবালে কি এক ব্যথা যেন তুমি ভরে রেখেছ। (প্রভাতে তোমার সোনার পোষাকে, সুরভিগন্ধে মুগ্ধ হলাম, তোমার বার্ত্তা শুনবার অবসর আর হোল না। মধ্যাহ্নে তোমার উদাস আকাশই দেখতে লাগলাম। তাই আমার মন বৈরাগ্যে ভরে গেল)। সন্ধ্যার সময় গেরুয়া সান্ধ্য সুর পশ্চিমাকাশে গাইলে, মরণের মত রাত্রি এলো। তার পর একখানি পত্র দিলে—তার কাগজখানা কালো তার উপর আগুনের মত জ্যোতিষ্কের অক্ষরগুলো জ্বলচে। কি বিরাট পত্রখানি পেলাম। হে দূত! এত আড়ম্বর কেন তোমার? তোমাকে দেখেই তো আমার মন ভুলে গেলো। তুমি যাঁর দূত তাঁর বার্ত্তাটি আর বুঝতেই পেলাম না।

দূত (বিশ্ব প্রকৃতি) বল্লেন "বিরাট তাঁর সভা, মহামহোৎসব তিনি করচেন, তুমি

তাতে একমাত্র অতিথি। তাই লোকে লোকান্তরে পত্রখানি আমি ছড়িয়ে ধরেছি। যেন তোমার নজরে পড়ে। আর একমাত্র অতিথির দূত আমি গর্ব্বিত। তাই আমার এই আড়ম্বর। তোমার কাছে কি আমি দীন বেশে আসতে পারি?

তাই বুঝতে পারি আমি ছাড়াও তাঁর বিশ্ব মহোৎসব অচল হয়ে রয়েছে। আমার জন্যও তিনি ব্যগ্র। আমাকে পাবেন বলেই তিনি ভিখারী হয়ে বেরিয়েছেন।

"তোহি মোহি লগন লগায়ে রে ফকীরবা।
সোবত হি মৈঁ অপনে মন্দিরমেঁ
শব্দমার জগায়ে রে ফকীরবা॥
বূড়তহী মৈঁ ভবকে সাগরমেঁ
বহিয়া পকড় সমঝায়ে রে ফকীরবা॥
একৈ বচন দূজৈ বচন নহী
তুম মোসে বন্দ ছুড়ায়ে রে ফকীরবা॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
প্রাণন প্রাণ লগায়ে রে ফকীরবা॥

হে ফকীর, তোমাতে ও আমাতে যে প্রেমের বাঁধন বেঁধেছ! আপন মন্দিরে শুয়েছিলাম, সুরের আঘাতে জেগে উঠেছি। ভবসাগরে ডুবে যাচ্ছিলাম, হাতখানি ধরে আমাকে বাঁচিয়ে দিলে, হে ফকীর! একটি মাত্র কথা কইলে আর দ্বিতীয় কোনো কথাই নেই, আমার সব বাঁধন অমনি ছুটে গেল, হে ফকীর! কবীর বলেন, হে ফকীর, আমার প্রাণে তোমার প্রাণ লাগালে।"

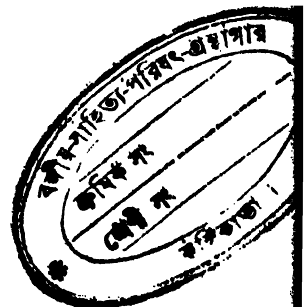
হয় তো তাঁকে দেখিনি, তবু তাঁর সুর শুনেই প্রাণ উদাসী। আমার ফকীর যিনি আমার জন্য ভিক্ষুক হয়ে বেরিয়েছেন তাঁকে কি আমি ফেলতে পারি? তাঁকে আমার অদেয় কি হতে পারে?

"মোর ফকীরবা মাংগি জায়
মৈঁ তো দেখহুঁ ন পোলৈঁয়া।
মংগনসে ক্যা মাংগিয়ে
　　　বিন মাংগে জো দেয়।
কহৈঁ কবীর মৈঁ হৌঁ রাহী কো
　　　হোনী হোয় সো হোয়॥"

আমার ফকীর ভিক্ষা করে চলেছেন, আমি তো দেখতেও পেলাম না। ভিক্ষুকের কাছে আবার কিসের ভিক্ষা, না চাহিতেই যে দেয়? কবীর বলেন, আমি তাঁরি, যা হবার হয় হোক না কেন।

তুমি আমার সব কেড়ে নিয়ে ভিখারী করে আজ আমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছ। আজ আর আমার তো কিছু নেই, আজ আমাকেই দিতে হবে। তিনি কত যুগ ধরে জীবন দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছেন। আজ এখন গোলমাল করবার সময় নয়।

"জীব মহলমেঁ শিব পহুনবা
　　　কহাঁ করত উনমাদরে।
পহুঁছা দেবা করিলে সেবা
　　　রৈন চলী আরতরে॥
জুগন জুগন করৈ পতীছন
　　　সাহবকা দিল লাগারে।
সূঝত নাহীঁ পরম সুখ সাগর
　　　বিনা প্রেম বৈরাগ রে॥



কহত কবীর সুনো ভাই সাধো
পায়া অচল সোহাগ রে ॥"

"জীবন মন্দিরে প্রিয় আজ অতিথি। আজ কোথায় গোলমাল কচ্চিস্? দেবতা আজ পৌঁছেছেন, আজ সেবা করে নে, রাত যে হয়ে চলে এলো। যুগ যুগ তিনি যে প্রতীক্ষা করেছেন। তাঁর চিত্ত আমাকে চেয়েছে বলেই তো। বিনা প্রেম-বৈরাগ্যে সেই পরম সুখ সাগরকে দেখাই যায় না। কবীর বলেন অচল সৌভাগ্য আজ মিলেছে।"

আজকে গোলমাল করবার সময় নয়। আজ তাঁকে সেবা কর। প্রেম-বৈরাগ্য বিনা সে পরমানন্দ সাগর দেখ্‌তে পাবে না আজ তাঁকে সব দিয়ে ধন্য হও। প্রদীপ, শিখাতে আত্মদান করে ধন্য। নদী, সমুদ্রে আপনাকে ডুবিয়ে ধন্য, ফুল বিকশিত হয়ে সৌরভ লুটিয়ে দিয়ে ধন্য, সূর্য্য জ্বলতে জ্বলতে জ্যোতি দান করে ধন্য। এই দান বিনা, এই জ্বালা বিনা জীবন ব্যর্থ। আজ সর্ব্বস্ব দিয়ে ধন্য হও।

"আজকে দিন মৈঁ জাঁউ বলিহারী।
পীতম সাহব আয়ে মেরে পহুনা।
ঘর আংগন লগৈ সুহৌনা ॥
সব প্যাস লগৈ মাংগল গাবন।
ভয়ে মগন লখি ছবি মন ভাবন ॥
চরন পখারুঁ বদন নিহারুঁ।
তন মন ধন সব সাঈঁ পর বারুঁ ॥
সুরত লগী সত্ত নামকী আসা।
কহৈঁ কবীর দাসনকে দাসা ॥"

"বলিহারী যাই আমি আজকের দিনের। আজ প্রিয়তম আমার ঘরে অতিথি এসেছেন। ঘর বাহির (অঙ্গন) আজ কি শোভাই পাচ্চে! সব তৃষ্ণা আজ তৃপ্ত হয়ে মঙ্গল গাইতে লেগেছে। মনোহর তাঁর রূপ দেখে মন কোথায় ডুবে গেছে! তাঁর চরণ ধোয়াবো, বদনখানি দেখবো, তনুমনধন সব তাঁকে উৎসর্গ করবো। প্রেম যে লেগেছে, সত্য নামের তৃষ্ণা জেগেছে। দাসের দাস কবীর এই কথা আজ বলছেন।"

এই তো সাধনা। আমার প্রেম তাঁর প্রেমে পূর্ণ। তাঁর প্রেমও আমার প্রেম ছাড়া অপূর্ণ। তাই তিনি অসীম ধৈর্য্যে আমার জীবন মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। এক বার সেই ভিখারীর করুণ নয়ন দুটি যদি চেয়ে দেখ তবে সব ছেড়ে দিয়ে ভিখারী হতে হবে। কত যুগ আর তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখবে? দেখ আমার ফকির আজ আমাকেই ভিক্ষা করে উদাস গান গাইতে গাইতে চলেছেন। আমার অন্তরের অন্তরে সে সুর গিয়ে বেজেছে।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

বন্দী বায়ুর জবানবন্দী।

হুজুর! কতকগুলি বিদ্রোহী মোপ্লা মরেছে ব'লে এত হৈ চৈ কেন জানি না। যারা বারো মাস মরে তারাই মরেছে। আমাকে মারতে গেলেই ত মৃত্যু অনিবার্য্য। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমার অযাচিত সাক্ষ্যটুকু টুকে রাখবেন; আমার কথাগুলি আসামী পক্ষের কাজে লাগবে। আসামীর ব্যারিষ্টারকে জেরা ক'রতে দিবেন না; আমি তাঁহারই সাহায্য ক'রব। খুনের দায়ী আর কেউ নয় আমি। সত্তর জন মাত্র মরেছে; আমার কথা যদি দেশ না শোনে, আমি দেশ জনশূন্য ক'রব।

শোষণজনিত দারিদ্র্য, বন্যাজনিত দুর্ভিক্ষ, এদের ভিতর আমার সমকক্ষ বীর কে? জর্ম্মনদের প্রধান অস্ত্র গ্যাস, কিন্তু সেই অস্ত্র রোধ করবার জন্য মুখোস প্রস্তুত হয়েছে। আমার প্রধান অস্ত্রের আকার এই—CO_2। নাম কার্বন্ ডায়ক্সাইড্। এই অস্ত্র থেকে রক্ষা ক'রতে পারে এমন মুখোস সৃষ্টি হয় নাই। বলতে পারেন, তুমি যদি এত বড় বীর, তোমাকে ঘরের বা মালগাড়ীর ভিতর বন্দী করে কেমন করে? এই কথার উত্তর এই, আমি আস্ত থাক্‌লে কারুর সাধ্য ছিল না আমাকে পরাস্ত করে। আপনি বিদেশী বিচারক, জানেন না ঐ হিংসুক কপট দেবরাজ ইন্দ্র আমার মায়ের পেটে ঢুকে আমাকে উনপঞ্চাশ টুকরো করেছে। প্রমাণ চাই? বামন পুরাণের ৬৮ অধ্যায় দাখিল করচি। আমার মা দৈত্যরাজপত্নী দিতি। আমি যখন তাঁর গর্ভে, ইন্দ্র জান্‌তে পারলে আমি বড় হ'য়ে সব দেবতাদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে স্বর্গ দখল করব। তাই বন্ধুত্বের ভাণ করে আমাদের বাড়ী এল। রাত্রিকালে একদিন মা ঘুমে অচেতন, এমন সময় তার পেটে ঢুকে বজ্র দিয়ে আমাকে সাতটুকরো ক'রে ফেল্‌লে। এই সাত টুকরো যখন একসঙ্গে কান্না জুড়ে দিলে ইন্দ্র ঘর্ঘর শব্দে বজ্র ঘুরিয়ে বল্‌লে "মা রুদস্ব।" এই ব'লে এক এক টুকরোকে আবার সাত সাত টুকরো করে ফেল্‌লে। তাই আমরা হলাম উনপঞ্চাশ ভাই। "মা রুদস্ব" ব'লে নাম হয় মারুৎ। আজ আস্ত থাক্‌লে সমস্ত পৃথিবীটা ওলট পালট ক'রে দিতে পারতুম টুকরো টুকরো হয়েছি বলেই সহজে ধরা পড়ি। তাই আপনাদের এন্দ্রুজ সাহেব আমাকে ১১৭৭ নং মালগাড়ীতে বন্দী ক'রেছিলেন। আচ্ছা উনি কি সেই ইন্দ্রের বংশজ, তাই নাম হয়েছে এন্দ্রুজ? যাহোক্, বন্দী হ'য়ে আমি চুপ ক'রে বসে থাকি না; বিষাক্ত অস্ত্র গড়ি। ইন্দ্রবংশজকে পেলাম না, পেলে তখনই মোপ্লাদের সহযাত্রী ক'রে দিতাম। বোকা ডাক্তারগুলোকে মিছি মিছি জেরা ক'রে ব্যতিব্যস্ত করবেন না। আমার অস্ত্রের বিক্রম আমার কাছে জেনে নিন। নবেম্বর মাসের ২২ তারিখে অমৃতবাজারে বেরিয়েছিল গাড়ীখানার মাপ ১৮ফুট × ৯ফুট × ৭।।০ ফুট। ১৬২ বর্গ ফুটে কেমন করে ১০০ জন সারজোয়ান মোপ্লা ব'সে গেল, সে বিষয়ের মীমাংসার ভার অঙ্কশাস্ত্রের হাতে। দেড় (১·৬২) বর্গফুটের ভিতর যে এক একজন মোপ্লাকে বসাতে পেরেছে সে একজন বড় ওস্তাদ সে বিষয় সন্দেহ নাই। যাহোক্ আমি প্রত্যেককে আমার ১২·১৫ ঘনফুট স্থান ছেড়ে দিয়েছি। প্রত্যেকে ২৪ ঘণ্টায় ফুস্‌ফুস্ ও চর্ম্মছিদ্র দিয়ে ১২ থেকে ১৬ ঘন ফুট কার্বন ডায়ক্সাইড্ গ্যাস নির্গত করে। এই হিসাবে এক ঘণ্টায় ১০০ জনের শরীর থেকে ৫০ থেকে ৬৫ ঘন ফুট ঐ বিষ নির্গত হয়। মালগাড়ীখানি টিরুর ষ্টেশন ছাড়ে সকাল ৬।৩৩ মিনিটে এবং পদামুর ষ্টেশনে পৌঁছেছে ১২.৩৫ মিনিটে। ইতিমধ্যে ৩০০ থেকে ৩৯০ ঘনফুট পরিমিত প্রকাণ্ড মারণাস্ত্র প্রস্তুত করেছি। আমার ১০০০ঘনফুট বিষ জমলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। হাজারে ১০৫ ঘনফুট বিষ জমলেই আমি মানুষের মাথা খেতে পারি, ০ ঘনফুট পেলেই হৃৎপিণ্ডের পিণ্ড চট্‌কান যায়। আধ ঘণ্টার পর যখন বিষের পরিমাণ হল শতকরা ২।।০, তখন আমার পাল্লায় যারা পড়েছিল তাদের অবস্থা বর্ণনাতীত। কাপড় নিংড়ে নিজেদের ঘাম খেয়েছিল, জীবিত ৩০ জনের জবানবন্দীতে তা জান্‌তে পেরেছেন।

আমাকে বন্দী ক'রলে জীব জন্তুর উপর আমি কি ভাবে অস্ত্র চালাই তা জেনেও মানুষ কাজের সময় কথাটা ভুলে যায়। ১৮০৫ সালে অষ্টার্লিজ্ যুদ্ধে (Austerlitz) ৩০০ রুষ ও অষ্ট্রীয় বন্দী ফরাশীশকর্ত্তৃক একটি ছোট ঘরে আবদ্ধ হয়েছিল; তার ভিতর ২৬০ জন ঐ বিষের দরুণ মারা যায়। কামাখ্যা বাবুর স্বাস্থ্যরক্ষায় আছে, ১৮৫৭ সালে ইংরেজেরা অনেকগুলি সিপাহীকে অমৃতসহরে একটি ক্ষুদ্র গোল ঘরে বদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন, তার ভিতর ঐ বিষাক্ত অস্ত্রে ৪৫ জন নিহত হয়। একদা হলণ্ড দেশ হ'তে ৬৪০ টী ভেড়া জাহাজের ভিতর কামরায় অন্ধি সন্ধি বন্ধ করে পাঠিয়েছিল;

তাদের একটাও বাঁচল না। অন্ধকূপ হত্যার কথা ত ছেড়েই দিলাম, কারণ আপনাদেরই একজন পাদ্রী বলেছেন ঘটনাটা কল্পনা মাত্র।

পিতামহ ব্রহ্মা বলেছেন—

"বুদ্ধ দেবা ভবিষ্যধ্বং
বায়বোঽম্বরচারিণঃ"

আমরা আকাশ বিহারী দেবতা। আপনি আজ থেকে বড় লাটকে ব'লে একটা হুকুম জারি করিয়ে নিন, আমাকে যেন কেউ অন্ধি সন্ধি বন্ধ ক'রে না রাখে। মা লক্ষ্মীগুলিকে বন্ধনদশাগ্রস্ত-আমার নিকট যখন ছেড়ে দেয়, সেই পরদানিশীদের অবস্থা আমি কি করি, তা আপনি বেশ জানেন। শিশুটী ভূমিষ্ঠ হ'লে, তার ঘরটীর দোর জানালা বন্ধ ক'রে যখন কাঠ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তখন কার্বন্ ডায়ক্সাইডের বড় ভাই কার্বন্ মনক্সাইড্ তার মা মাসীকে মুহূর্ত্তের মধ্যে যমালয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে, এরূপ ঘটনা অনেক হ'য়েছে। যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু যে এত বেড়ে চলেছে, আর স্ত্রীলোকেরা এতে যে বেশী মরে, তার কারণও আমাকে বন্দী করবার চেষ্টা। আহা! ভগবান মালী নানা ফুলের গাছে সাজিয়ে দিয়েছেন কুঞ্জটী; মানুষ তাকে ঘন বেড়া দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঘরের ভিতর বন্দী করেছে। কলি না ফুটতেই ফুল সব ঝরে পড়্ল। তাই কবি উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন:

ভাঙ্গ্ রে বেড়া ঘন ঢাকা
ভাঙ্গ্ রে বেড়া ঘন ঢাকা।
শোন না কি ডাকাডাকি
করে হাওয়া অরুণ-মাখা॥
মালী দিয়ে সাজাইয়ে
নানা ফুলের তরুপুঞ্জে।
উঠ্তে কলি ঢেকে দিলি,
ঘন বেড়ায় সে নিকুঞ্জে॥
আস্তে দেরে এমন ভোরে
মুক্ত বাতাস আকাশ ফাঁকা।
হাসি হাসি ফুলের রাশি
ভরাক্ রূপে তরু শাখা॥
বাস-সম্ভার মধু-ভাণ্ডার
লুটবে অলি ফুট্লে কলি।
হাসি হাসি দেখ্বে আসি
প্রেম বিলাসী কুঞ্জমালী॥ *

নানাবিধ কুপ্রথার ঘন অচলায়তনের ভিতর যখন মানুষের মন আবদ্ধ হয়েছিল, পুরুষ স্ত্রীলোককে এবং সবল দুর্ব্বলকে যখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কুপ্রথার বদ্ধ বায়ুর মধ্যে রুদ্ধ করেছিল, সে সময়কার অবস্থা ভেবে বোধ হয় কবি এই গানটী গেয়েছিলেন। কথাটা যদি কেহ খাটান, আমাকে বন্দী ক'রে রাখলে যে ফল-ফুল-কীট-পতঙ্গ-পশু-মানব সুশোভিত এই বিশ্বটী ধ্বংস হয়ে যাবে, এই কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে সরকারের তরফ থেকে ঘরে ঘরে যেন একটা কমিউনিক জারি করা হয়। মুক্ত অবস্থায় আমার সংসর্গে কুঞ্জের শোভা ও জীবের আয়ু যে শত গুণে বৃদ্ধি পাবে সে কথাটাও যেন বলা হয়।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস।

* মালকোষ মিশ্র—একতালা।

যৌবনের স্বারাজ্য

মানুষের জীবনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যেমন একটা নিগূঢ় ঐক্য আছে সেইরূপ এই জীবনের প্রত্যেক বিভাগেরও এক একটা বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য বা স্বারাজ্য আছে। জীবনের এক বিভাগের আইনকানুন আর এক বিভাগের উপরে চাপাইতে পারা যায় না, চাপাইতে গেলে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের এই স্বারাজ্য এবং স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া যায়। ইহার ফলে সমস্ত জীবনের সম্যক সার্থকতা লাভের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে।

যৌবনের একটা স্বারাজ্য আছে। যৌবনের একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্য লাভ করিতে গেলে যৌবনকে কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। স্বারাজ্য অর্থই এই যে যারা শাসিত হইবে তারাই নিজের স্বার্থকতা লাভের লোভে নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা করিয়া লইয়া সেই ব্যবস্থার অধীন হইয়া চলিবে, অপরে বাহির হইতে বা উপর হইতে তাহাদের উপরে কোনও আইনকানুন চাপাইবে না। যৌবনের স্বারাজ্যের অর্থ এই যে যৌবনের নিজের সার্থকতা লাভের জন্য যৌবন আপনি আপনার বিধিনিষেধ গড়িয়া তুলিবে।

যৌবন মানব জীবনের বসন্তকাল। বসন্ত সমাগমে উদ্ভিদ্ জগতে নূতনপ্রাণতা ফুটিয়া উঠে, যৌবনের সংস্পর্শে মানুষের মধ্যেও ইহাই ঘটে। মানুষ তখন নিজের ভিতরে জীবনের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গাভিঘাত অনুভব করিয়া অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তিতে অজ্ঞাত জীবনপথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। যৌবনের নিশ্বাসে মানুষের ইন্দ্রিয়সকল অভূতপূর্ব্ব তেজে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। শরীরে নূতন আভা, ইন্দ্রিয় সকলের নূতন চাঞ্চল্য, মনে নূতন মাদকতা, চিত্তে নূতন আশা ও উদ্যম জাগিয়া উঠে। মানুষ তখন আপনাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য ব্যাকুল হয়। বিশ্বের সমুদয় ভোগ্যকে অধিকার করিবার জন্য ইন্দ্রিয়সকল তখন চারিদিকে ছুটিয়া চলিতে চাহে। ইহাই যৌবনের লক্ষণ। এই লক্ষণ দেখিয়াই পুরাতন নীতিবাদিরা যৌবনকে বিষমকাল বলিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু যৌবনের এসকল চাঞ্চল্য চাপিয়া রাখিলে চলিবে না, চাপিয়া রাখাও সম্ভব নহে। এসকল চাঞ্চল্য যে লক্ষ্যের সাড়া পাইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে, সেই লক্ষ্যটিকে ভাল করিয়া ধরিয়া সেই লক্ষ্যলাভের জন্য যৌবনের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী যদি এসকল ব্যবস্থা করিতে পারা যায় তাহা হইলেই প্রকৃত পক্ষে যৌবনকে তাহার নিজের স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। যৌবন সাধনের ইহাই মূল সূত্র।

যৌবনের প্রধান লক্ষণ নবজাগ্রত ইন্দ্রিয়গ্রামের চাঞ্চল্য। এই চঞ্চল ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত রাখিবার জন্যই পুরাতন নীতিবাদিরা যৌবনের বিবিধ বিধিব্যবস্থার আয়োজন করিয়াছিলেন কিন্তু যৌবনের স্বারাজ্যের উপরে এসকল বিধিব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই বলিয়া অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের বাঁধন ছিঁড়িয়া যৌবন আপনার পথে চলিয়াছে এবং অজ্ঞতা ও অন্ধতা বশতঃ অনেক সময় পথ হারাইয়া নিজের বিফলতা [illegible] আহরণ করিয়াছে। যৌবনের সাধনার আলোচনাতে সকলের আগে আমাদিগকে এই কথাটা বুঝিয়া চলিতে হইবে।

যৌবনের ইঙ্গিতে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাম নূতনপ্রাণতাতে স্ফুরিত হইয়া উঠে। এই ইন্দ্রিয়-গ্রামের লক্ষ্য বিষয় ভোগ করা। যৌবনের সতেজ ইন্দ্রিয়সকল এই ভোগের লোভেই চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। এই ভোগটা কিছু নয় বলিলে সে শুনিবে না; কেন না তাহার ইন্দ্রিয়সকল ভোগে যে আনন্দ আছে তাহার সন্ধান পাইয়াছে। ভোগ্য বিষয়ের সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই নিজের ভিতরে সেই ভোগের আনন্দের ইঙ্গিত পাইয়াছে। সুতরাং যৌবন যাহা আপনার অনুভবে ধরিয়াছে, বাহিরের আদেশে বা উপদেশে সে সহজে ও স্বেচ্ছায় তাহা ছাড়িবে না, ছাড়িতে পারিবে না। যৌবনকে নিবৃত্তির পথে চালান সহজও নয়, ভালও নয়। প্রবৃত্তির পথে চালাইয়াই তাহাকে যতটা প্রয়োজন প্রবৃত্তির সার্থকতার জন্যই ততটা নিবৃত্তির সাধনে নিয়োগ করিতে হইবে। যৌবন চাহে ভোগ। কিন্তু ভোগের যে একটা আইনকানুন আছে; ইহা জানে না। এই আইন-কানুনটা যে কি, যৌবনের শিক্ষার ভার যাঁহারা হাতে লইবেন, তাঁহাদিগকে সকলের আগে ইহাই বুঝাইয়া দিতে হইবে।

ভোগের আইনের প্রথম ধারা, অসংযত ভোগে ভোগ হয় না, আনন্দ খুঁজিতে যাইয়া অসংযত ভোগী সর্ব্বদাই বিষাদ আহরণ করে। সংযম ব্যতিরেকে ভোগ আনন্দদান করিতে পারে না, আনন্দের মরীচিকার প্রকাশ করিয়া ভোগ্য বস্তু কেবল তৃষ্ণাই বাড়াইয়া দেয়।

ভোগের এই আইনের দ্বিতীয় ধারা এই, ভোগের জন্য বীর্য্যের প্রয়োজন। বীর্য্য অর্থ ইন্দ্রিয়ের তেজ ও শক্তি। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতিরেকে এই তেজ ও শক্তি রক্ষা হয় না। সংযমের দ্বারাই এই তেজ ও শক্তি বা বীর্য্য রক্ষিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ভোগের প্রয়োজনেই ইন্দ্রিয়ের সংযমসাধন প্রয়োজনীয়।

ভোগের আইনের তৃতীয় ধারা এই, ইন্দ্রিয় সকল যদিও পরিমিত বিষয়ের প্রতিই সর্ব্বদা ছুটিয়া যায়, কিন্তু এই সকল বিষয় ভোগের লালসামাত্রই বাড়াইয়া দেয়, এই লালসার সম্যক্ পরিতৃপ্তিদান করিতে পারে না। ভোগের লক্ষ্য আনন্দ। কিন্তু মন যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে যাইয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্যবস্তুকে গ্রহণ করিয়া যুগপৎ তাহাকে ছাড়াইয়া যাইয়া বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত যে ভাবরাজ্য তাহাতে না পৌঁছায় ততক্ষণ ইন্দ্রিয় ভোগে জীব ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই নিয়ত যে আনন্দ অন্বেষণ করে সে আনন্দ পায় না। ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া বিষয়কে গ্রহণ করিয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে পৌঁছিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় ভোগের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদিত হয়। সুতরাং কেবল ইন্দ্রিয়ের হাত ধরিয়া বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিলে, প্রকৃত বিষয় ভোগ হয় না। ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগের করণ বা যন্ত্র মাত্র। ইন্দ্রিয় বিষয়ের ভোক্তা নহে। অতীন্দ্রিয় যে আত্মা তাহাই একমাত্র ভোক্তা। আর আত্মা নিজের অধিকারে থাকিয়াই কেবল আপনার ভোগ্যকে গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং ভোগ্য বিষয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মার ভূমিতে যাইয়া না উঠিয়াছে, অর্থাৎ, আমরা যতক্ষণ তাহাকে idealise এবং spiritualise করিতে না পারিয়াছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের সত্য যে ভোগ তাহা হয় না। ভোগ্য বিষয়কে এইরূপে আত্মার ভূমিতে তুলিয়া লওয়া বা idealise এবং spiritualise করাকে আমাদের দেশের সাধকেরা ভাবাঙ্গগঠন কহিয়াছেন। বিষয়কে ভাবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই ভাবাঙ্গগঠনের উদ্দেশ্য। এই ভাব কথাটার একটা বিশিষ্ট অর্থ আছে। এই ভাব খেয়াল নহে; ইহা

কল্পনা নহে ; ভাব ইংরাজীতে যাহাকে idea কহে তাহা নহে ; emotion নহে, senitiment নহে। খেয়াল, কল্পনা, idea, emotion বা sentiment এর জন্য চিত্তের নির্ব্বিকার অবস্থালাভ আবশ্যক নহে। কিন্তু আমাদের প্রাচীনেরা কহিয়াছেন যে যতক্ষণ চিত্তের এই নির্ব্বিকার অবস্থা না লাভ হইয়াছে, ততক্ষণ ভাবের জন্ম হয় না।

নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিকারঃ।

চিত্ত নির্ব্বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরে তাহাতে যে প্রথম বিকারের প্রকাশ হয়, তাহাই ভাব। ইন্দ্রিয়ের বিষয় বিদ্যমানেও যখন চিত্ত কোনও প্রকারের বিকার প্রাপ্ত হয় না, তখনই তাহার এই নির্ব্বিকার অবস্থা লাভ হয়। এই অবস্থাতে মানুষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের গুণাগুণ গ্রহণ করে, কিন্তু ইহাতে তাহার চিত্তের সমতা নষ্ট হয় না। প্রত্যক্ষ বিষয় ভোগের লালসায় সে চঞ্চল হইয়া উঠে না। ভোগ্য বিষয় বিদ্যমানেও কোনও প্রকারের ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হয় না। এই অবস্থায় যখন সে ভোগ্য বিষয়কে idealise বা spiritualise করিতে পারে, তখন তাহার নির্ব্বিকার চিত্তে এই আধ্যাত্মিক ভোগের ভূমিতে ভাবাঙ্গগঠনের সাহায্যে যে প্রথম বিকার উপস্থিত হয় তাহাকেই ভাব কহে। এই ভাবের ভূমিতেই কেবল সত্য ভোগ হইয়া থাকে। এইখানে বিষয় সাক্ষাৎকারে ইন্দ্রিয় লালসার উদ্রেক হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ে এবং অতীন্দ্রিয়ে অপূর্ব্ব মাখামাখি হইয়া প্রকৃত রসের সৃষ্টি করিয়া মানুষের ভোগপিপাসাকে সার্থক করিয়া তুলে।

ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে চিত্তের এই নির্ব্বিকার অবস্থা লাভ সচরাচর সম্ভব হয় না ; আর এই ব্রহ্মচর্য্যের মূল সাধন—শুক্রধারণ। যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যৌন প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। আর এই প্রবৃত্তিকে অসংযত ভাবে অযথা পথে যাইতে দিলে যৌবন আপনার সার্থকতা কিছুতেই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এমন কি যে ভোগের জন্য দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে চাহে, সে ভোগ পর্য্যন্ত তাহার ভাগ্যে সম্ভব হয় না। আসক্তের ভোগে অধিকার নাই। সুতরাং অসংযত যৌন প্রবৃত্তির পরিচালনা শরীরের শক্তি নষ্ট করিয়া মানুষকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া তোলে। নির্ব্বীর্য্যের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের কোনওটা লাভই ভাগ্যে ঘটে না। কেবল ধর্ম্মের খাতিরে নহে, কিন্তু ভোগের খাতিরেও শুক্রধারণ এবং বীর্য্যসাধন অত্যাবশ্যক। শরীরের শক্তি লাভ এবং আয়ুষ্কালের পরিমাণ বৃদ্ধি যাহা শারীর সাধনের মূল সাধ্য শুক্ররক্ষা বা বীর্য্য ধারণ ব্যতীত তাহা অসাধ্য হইয়া পড়ে। এইটি বুঝিয়াই আমাদের প্রাচীনেরা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের উপরে মানুষের জীবনটাকে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলেন। বত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বাস করিয়া এবং এই আশ্রম বিহিত সাধন অবলম্বন করিয়া পরে স্নাতক হইয়া বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা ও সমাজধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, ইহাই প্রাচীনকালের আদর্শ ছিল। যৌবনের সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে দেশ, কাল, পাত্রের উপযোগী করিয়া আজিও এই আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে।

যৌবন চায় শরীরের শক্তি। যৌবন চায় শরীরের স্বাস্থ্য। আর যৌবন চায় শরীরের সৌন্দর্য্য। যৌবন নিজের মধ্যে এগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য লালায়িত। যৌবনের

এই স্বাভাবিকী লালসাকে নষ্ট করিলে চলিবে না, উপেক্ষা করিলেও চলিবে না। সয়তানের ছলাকলা বলিয়া যৌবনের এই সহজ প্রবৃত্তিকে বর্জ্জন করিবার উপদেশ দিলেও চলিবে না। এখানে যৌবনকে সেই পথ দেখাইয়া দিতে হইবে, যে পথে তাহার শক্তি, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য লাভ সম্ভব হইবে। সে পথই মোটের উপরে ব্রহ্মচর্য্যের পথ।

ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম দুই ভাগে পরিপূর্ণ হয়। এক শারীরিক, অপর মানসিক। শারীরিক ব্রহ্মচর্য্য সাধন প্রথমে। ইহারই উপরে মানুষের সৌর্য্য এবং সংযমের প্রতিষ্ঠা হয়। সংযম কেবল মনের ধর্ম্ম নহে, শরীরেরও ধর্ম্ম বটে। শরীরের 'ধাতু'র প্রসন্নতা না হইলে মনের সংযমলাভ সম্ভব হয় না। আবার দেহের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুসকল স্থির এবং স্নিগ্ধ না থাকিলে অকারণে বা অতি সামান্য কারণে যখন তখন স্নায়ুসকল চঞ্চল হইয়া উঠিলে মনের সংযমলাভ অসাধ্য হয়। সুতরাং স্নায়ুমণ্ডলের স্থৈর্য্য এবং স্নিগ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য সাধনায় অবলম্বন করিতে হয়। স্নায়ুমণ্ডলের স্থৈর্য্য ও স্নিগ্ধতা নষ্ট হয়, এক শারীরিক উত্তেজনায়, আর মানসিক উত্তেজনায়। শারীরিক উত্তেজনা আসে আহার বিহারের, শয্যাসনভোজনাদির অনাচার বা যথেচ্ছাচার হইতে। অতএব শয্যাসনভোজনাদি বিষয়ে আচার বিচার না মানিয়া চলিলে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মভঙ্গ হয়। এমন সকল খাদ্য আছে যাহা খাইলে স্নায়বীয় উত্তেজনা উৎপন্ন হয়। সে জাতীয় খাদ্য বর্জ্জন করা বিহিত। ইহা মুসার বা মনুর আদেশ নহে। ইহা প্রত্যেক মানুষের নিজের প্রকৃতিরই নিয়ম। তারপর যাহা খাইলে দ্রব্যগুণ নিবন্ধন কোনও প্রকারের স্নায়বীয় উত্তেজনার আশঙ্কা থাকে না, তাহাও অযথা পরিমাণে ভোজন করিলে স্নায়ুমণ্ডলকে চঞ্চল করিয়া তোলে। সুতরাং, কেবল খাদ্যাখাদ্য বিচার করিলেই চলিবে না; যাহা খাদ্য তাহার ব্যবহার এবং ভোগেও সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। শয্যাসনাদি সম্বন্ধেও অনুরূপ নিয়মই বিহিত। এই ভাবে আহার বিহারাদি সম্বন্ধে, এমন সাধন অবলম্বন করিতে হইবে, যাহার ফলে স্নায়ুমণ্ডল স্নিগ্ধ থাকে, শরীর প্রকৃতিস্থ রহে, বীর্য্য রক্ষিত হয়, স্বাস্থ্য এবং শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং সকলে মিলিয়া মানুষের আয়ুষ্কালকে বাড়াইয়া দেয়। ইহাই মোটামুটি ব্রহ্মচর্য্যের শারীর-সাধন।

ব্রহ্মচর্য্যের মানস সাধনও ঐ এক লক্ষ্য ধরিয়াই চলে। শরীরের উপরে যেমন মনের অবস্থা নির্ভর করে, সেইরূপ মনের অবস্থার দ্বারাও শরীরের অবস্থা স্বল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মনের প্রধান ধর্ম্ম চিন্তা এবং ধ্যান। যে সকল বিষয়ের চিন্তাতে এবং ধ্যানেতে স্নায়বীয় উত্তেজনার আশঙ্কা থাকে, যাহাতে বীর্য্যস্খলনের সম্ভাবনা রহে, যাহাতে ইন্দ্রিয়দিগকে শিথিল এবং শরীরকে অপটু করিয়া তুলে যৌবনসুলভ ভোগ এবং আনন্দ লাভের জন্যই সে সকল চিন্তা ও ধ্যানকে বর্জ্জন করা আবশ্যক। আর যে সঙ্গ করিলে, যে সকল দৃশ্য দেখিলে বা শব্দাদি শুনিলে মনের চিন্তা এবং কল্পনাকে এই আত্মঘাতী অসংযমের পথে লইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে সে সকল সঙ্গ, সে সকল দৃশ্য এবং শব্দাদি হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকা কর্ত্তব্য। এই সঙ্কেতগুলির অনুসরণ করিয়া যৌবন নিজের সার্থকতা লাভের জন্য আপনিই আপনার শাসন সংযমের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে। এই শরীর সাধনই যৌবন সাধনের প্রথম কথা। ইহার উপরেই যৌবনের অন্যান্য সাধন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শেষ কথা—বর্ত্তমান প্রসঙ্গে যৌবনের শারীরী সাধনার সম্বন্ধে সর্ব্বপেক্ষা বড় কথা ও সকলের গোড়ার কথা এই যে, যে যুবক নিজের যৌবনের সফলতা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকে নিজের দেহের প্রতি অচলা ভক্তি সাধন করিতে হইবে। প্রতিমার উপাসনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা যেভাবে প্রত্যক্ষ প্রতিমাতে অপ্রত্যক্ষ দেবতার অধিষ্ঠান ধ্যান করিয়া তাহাতে দেবতা-বুদ্ধি সাধন করিয়া থাকেন, ঠিক সেইভাবে যৌবনের সাধককে নিজের দেহের প্রতি ভক্তিমান হইতে হইবে। যার যাহাতে ভক্তি নাই, সে তাহাকে সাধন করিতে পারে না। এই দেহটাকে ক্ষণভঙ্গুর রক্তমাংসের পিণ্ড বলিয়া ভাবিলে চলিবে না। শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্ বলিয়া ইহাকে একটা আপদ বালাইয়ের মতন ভাবিলেও চলিবে না। এই দেহ দেবতার মন্দির। এই দেহপুরের পুরস্বামী বিশ্বের উপাস্য নারায়ণ। এইভাবে প্রতিদিন অন্ততঃ কিছুকালের জন্য নিজের দেহেরই ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যানের ফলে এই দেহেতে দেবতা-বুদ্ধি জন্মিবে। দেহেতে দেবতা-বুদ্ধি জন্মিলে এই দেহকে উপেক্ষা বা কোনওপ্রকারে অপবিত্র করা অসম্ভব হইবে। দেবপ্রতিমাকে স্পর্শ করিতে যেমন শঙ্কা হয়, শুচি না হইয়া যেমন পূজারী দেবতার বিগ্রহের ভোগরাগাদি সম্পাদন করিতে সাহস পায় না, সেইরূপ যৌবনের সাধক অন্তর্ব্বাহে শুচি না হইয়া নিজের অঙ্গ স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন। তখন স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম তাঁহার উপাসনার অঙ্গ হইয়া যাইবে। দেহের প্রসাধন করিতে যাইয়া তিনি ভোগবিলাসের প্রেরণা অনুভব করিবেন না, কিন্তু সত্য এবং পবিত্র ভক্তি দ্বারাই প্রেরিত হইবেন। ভোজন তখন তাঁহার ভজনেই পরিণত হইবে। শরীরের শক্তি, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যসাধন ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত হইয়া উঠিবে। নিজ দেহের প্রতি এই যে ভক্তিভাব, ইহারই উপরে যৌবনের শারীরী সাধনা ব্রহ্মচর্য্যাদিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই যে শরীরের প্রতি ভক্তিলাভ করা, ইহার প্রথম সাধনা, শরীরের জ্ঞানলাভ। এই শারীর যন্ত্র কি অপূর্ব্ব কৌশলে রচিত হইয়াছে, ইহা প্রথমে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এইজন্য শরীরের অস্থি, পেশী, শিরা ফুসফুসাদি যন্ত্র, অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডল, মস্তিষ্কের গঠন, এসকলের জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। যৌবনের প্রথমেই এই শারীর বিদ্যা বা দেহতত্ত্ব Anatomy এবং Physiology অধ্যয়ন করিতে হইবে। যাঁহারা ডাক্তারি করিবেন, তাঁহাদেরই যে কেবল এই বিদ্যা অর্জ্জন করা প্রয়োজন এমন নহে, যৌবনের সম্যক্ সফলতা লাভ করিবার জন্য যে সমুদয় শারীরী সাধনা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক সেই সাধনার প্রয়োজনেও মোটামুটি শরীর যন্ত্রের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এই শরীরের কথা যখন ভাবি; কি অদ্ভুত কলকারখানা এই দেহের মধ্যে আছে, একথা যখন মনে হয়; কি নিগূঢ় এবং দুজ্ঞেয় সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সূত্রে জীবনী শক্তির অদ্ভুত রহস্য এই শরীরের কলকারখানার ভিতরে লুকাইয়া আছে, ইহা যখন ভাবি, কে এই দেহাভ্যন্তরে বসিয়া হৃৎপিণ্ডকে স্পন্দিত করিতেছেন, ফুসফুসকে কামারের হাপরের মত চালাইতেছেন, সর্ব্বশরীরে চৈতন্যের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেহেন্দ্রিয়মনকে সচেতন রাখিতেছেন, এই অদ্ভুত এই জটিল যন্ত্রের যন্ত্রী কে, এ কথা যখন ভাবি, তখন বিস্ময়ে চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন দেহের মাহাত্ম্য বুঝিয়া স্তম্ভিত হই; তখন এই দেহকে মাটির ঢেলা বলিয়া পায়ে ঠেলিতে সাহস হয় না, ইহাকে যথেচ্ছভাবে

নিকৃষ্ট সুখের লোভে ব্যবহার করিতেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। তখন নিজের পদধূলি ভক্তিভরে দেবতার মন্দির প্রাঙ্গনের পবিত্র রজরূপে সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে সাধ যায়। এইরূপে শারীর-বিদ্যার সাহায্যে দেহের মাহাত্ম্যের জ্ঞানলাভ করিয়া দেহের প্রতি অচলা ভক্তিলাভ করিতে হয়। দেহের প্রতি এই যে ভক্তি তাহার উপরেই যৌবনের শারীরীসাধন, ব্রহ্মচর্য্যাদিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। নতুবা শরীরের শক্তি স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যলাভের জন্য যাহাই কিছু করি না কেন, সকলই বিফলে যাইবে।

উপরে সাধারণভাবে idealisation বা spiritualisation বা ভাবাঙ্গগঠনের কথা কহিয়াছি, যৌবনের সাধনার আদিতে নিজ দেহ সম্বন্ধেই তাহা করিতে হইবে। নিজের এই শরীরটাকে idealise এবং spirituualise করিয়া যৌবনের এই শরীরী সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বৌদ্ধযুগের নারী

'অপদান' নামক গ্রন্থে সাতজন নারীকে অতি শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদিগের নাম ক্ষেমা, ধর্ম্মদিন্না, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, কৃশা গৌতমী, ভদ্রা এবং বিশাখা। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা তিনজন ভিক্ষুণীর বিষয় আলোচনা করিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে ক্ষেমা একজন। অদ্য ধর্ম্মদিন্না, উৎপলবর্ণা পটাচারা এবং কৃশা গৌতমীর বিষয়ে আলোচনা করিব।

ধর্ম্মদিন্না

ধর্ম্মদিন্না একজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষুণী ছিলেন। নরনারী নির্ব্বিশেষে ইনি সকলের মধ্যেই ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। 'মজ্‌ঝিমনিকায়' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের একটী সুত্তে (৪৪) লিখিত আছে যে 'বিসাখ' (বিশাখ) নামক একজন উপাসক এক সময়ে ধর্ম্মদিন্নার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলেন এবং তদনন্তর তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয়ে ৩৭টী প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নের বিষয় দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত। ধর্ম্মদিন্না প্রথম ৩৬টী প্রশ্নের সন্তোষদায়ক উত্তর দিয়াছিলেন। শেষ প্রশ্নটী এই :—

"নির্ব্বাণের প্রতিভাগ কি?" 'প্রতিভাগ' শব্দের অর্থ 'তুল্য' বা 'সমকক্ষ' ইহা শুনিয়া ধর্ম্মদিন্না বলিলেন "আবুষ বিশাখ! এ প্রশ্ন 'অত্যসর' (পালি অচ্চসর)"—অর্থাৎ এ প্রশ্ন সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আমি এ প্রশ্নের শেষ সীমায় গমন করিতে অসমর্থ। "হে আবুষ বিশাখ! ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাণে নিমজ্জিত, নির্ব্বাণই ইহার পরায়ণ এবং নির্ব্বাণেই ইহার

পর্য্যবসান। হে আবুষ বিশাখ! যদি আকাঙ্ক্ষা হয় তাহা হইলে তুমি ভগবানের (অর্থাৎ বুদ্ধের) নিকট গমন করিয়া এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পার। ভগবান্ তোমার নিকট ইহা ব্যক্ত করিবেন।"

বিশাখের প্রশ্নে গার্গীর কথা মনে হয়। গার্গী ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোক প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ব্রহ্মলোক, সমূহ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়া ছিলেন "গার্গি! মাতি প্রাক্ষীঃ"—হে গার্গি 'অতি প্রশ্ন' করিও না। বিশাখের 'অত্যসর' প্রশ্ন এবং গার্গীর 'অতিপ্রশ্ন' একই শ্রেণীর। যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরও ধর্ম্মদিন্নার উত্তরের ন্যায়।

মজ্ঝিমনিকায়ে (৪৪) লিখিত আছে যে, ভিক্ষুণী ধর্ম্মদিন্নার উপদেশ শ্রবণ করিয়া, বিশাখ তাহা অভিনন্দন করিতে লাগিলেন এবং তাহা অনুমোদন করিলেন। তদনন্তর আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার পরে তিনি ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ধর্ম্মদিন্নাকে যে সমুদায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মদিন্না সেই সমুদায় প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন—সমুদায়ই ভগবানের নিকট বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—

"হে বিশাখ! ভিক্ষুণী ধর্ম্মদিন্না পণ্ডিতা, ভিক্ষুণী ধর্ম্মদিন্না মহাপ্রাজ্ঞা। তুমি যদি আমাকে এই সমুদায় প্রশ্ন করিতে, তাহা হইলে ধর্ম্মদিন্না যে ভাবে এই সমুদায় ব্যাকৃত করিয়াছে। আমিও ঠিক সেই ভাবেই ব্যাকৃত করিতাম। ইহাই ইহার অর্থ; ইহাই ধারণা করিও।"

বুদ্ধদেব স্বয়ং যাঁহাকে 'পণ্ডিতা' ও 'মহাপ্রাজ্ঞা' বলিতেন তিনি সাধারণ নারী ছিলেন না।

থেরীগাথার একটী গাথা (১২) ধর্ম্মদিন্নার রচনা। ইঁহার অনেক শিষ্যাও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অন্যতমা শিষ্যা থেরী শুক্লা প্রকাশ্য ভাবে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ৫০০ ভিক্ষুণী ইঁহার অনুগমন করিত।

উৎপলবর্ণা

উৎপলবর্ণাও একজন প্রসিদ্ধা ভিক্ষুণী। ইঁহার পালি নাম "উপ্পল বন্না"। বুদ্ধদেব ইঁহাকে আদর্শ ভিক্ষুণী বলিয়া মনে করিতেন। সংযুক্তনিকায় নামক গ্রন্থে (১৭।২৪) লিখিত আছে যে বুদ্ধদেব এক সময়ে ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন:—

"হে ভিক্ষুগণ! যখন উপাসিকা নিজের একমাত্র প্রিয় ও 'মনাপ' কন্যাকে সম্যক্ উপদেশ প্রদান করে, তখন বলিয়া থাকে, 'যদি তুমি গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর, তবে ভিক্ষুণী ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণার ন্যায় হইও।' হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা যে প্রকার তাহাই ধর্ম্মজীবনের তুলা ও পরিমাপ।" (সং নিঃ ১৭।২৪)।

উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে জনসাধারণও উৎপলবর্ণাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

ইঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা থেরীগাথাতে বর্ণিত আছে। ইনি সপত্নীর সহিত বাস

করিতেন। কিন্তু এই সপত্নী তাঁহারই দুহিতা। কি ঘটনায় মাতা ও কন্যা একই লোকের জায়া হইয়াছিল তাহার প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপাল 'পরমার্থ দীপনী'তে ইহার এক কাহিনী লিখিয়াছেন কিন্তু তাহা কতটুকু বিশ্বাস যোগ্য, তাহা বলা যায় না। থেরী গাথাতে লিখিত আছে যে উৎপলবর্ণার মনে এই প্রকার চিন্তা আসিয়াছিল :—

"মাতা ও দুহিতা—উভয়ে সপত্নী ছিলাম; বিষম লোমহর্ষণ ব্যাপার! আমার কি সম্বেগ। ধিক্ বাসনায়! অশুচি! কি দুর্গন্ধ! কি কণ্টক মন! যেখানে মাতা ও দুহিতা একেরই ভার্য্যা ছিল! (২২৪—২২৫)।

ভোগ সুখের দুর্গতি দেখিয়া ইনি ইহার পরে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। উৎপলবর্ণা ধ্যান পরায়ণা ছিলেন এবং যোগে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 'অঙ্গুত্তর নিকায়' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যেসমুদায় ভিক্ষুণী ধ্যান পরায়ণা হইয়া ইদ্ধি (ঋদ্ধি) লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে উৎপলবর্ণার স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে এবং যোগিগণও বলিয়া থাকেন যে যাঁহারা যোগে সিদ্ধ হন, তাঁহাদের ছয়টী অভিজ্ঞা লাভ হয়। দেশের লোকে এখনও এ সমুদায়ে বিশ্বাস করে এবং বুদ্ধদেবের সময়েও বিশ্বাস করিত। ষড়ভিজ্ঞা লাভ বিষয়ে উৎপলবর্ণার উক্তিরূপে থেরীগাথাতে (২২৭—২২৮) এই অংশ পাওয়া যায় :—

"আমি আমার পূর্ব্বনিবাস (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কথা) জানিতেছি। আমার দিব্যচক্ষু বিশোধিত। অপরের যে অন্তরের ভাব, তাহাও আমি জানিতেছি। আমার শ্রুতিও বিশোধিত। আমি ঋদ্ধিলাভ করিয়াছি। আমার আশ্রবক্ষয় হইয়াছে। আমি ছয়টী অভিজ্ঞা লাভ করিয়াছি।" (২২৭—২২৮)।

এই ষড়ভিজ্ঞার মধ্যে কতটুকু সত্য, আর, কতটুকু কল্পনা এস্থলে তাহার বিচার অনাবশ্যক। যদি কল্পনা করিয়া লওয়া যায় যে ইহার অধিকাংশই কল্পনা, তাহা হইলেও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—'নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন লোকের বিষয়েই এই ষড়ভিজ্ঞা লাভের কথা বলা হয়, আর সকলের বিষয়ে বলা হয় না কেন?' ইহার ভিতরের কথা এই যে যাঁহারা মহাযোগী বা মহাযোগিনী, তাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই প্রকার বর্ণনা করা হয়। ইহা যোগস্তুতি এবং যোগি-স্তুতি। পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইতেছে যে উৎপলবর্ণা মহা যোগিনী ছিলেন।

থেরীগাথাতে (৩৬৩) জানা যায় যে 'শুভা কর্ম্মার ধীতা' নাম্নী থেরী ইহাকে দীক্ষিতা করিয়াছিলেন।

থেরীগাথার একটী গাথা (৬৪) উৎপলবর্ণার রচনা।

পটাচারা

পটাচারাও একজন খ্যাত্যাপন্না ভিক্ষুণী। ত্রিপিটকে ইহার জীবন চরিত বিষয়ে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপাল পরমার্থ দীপনীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই নিম্ন

লিখিত অংশ গৃহীত হইল। কিন্তু ইহার মূলে কতটুকু সত্য আছে, তাহা বলা কঠিন। ঘটনা যাহা পাওয়া যায়, তাহাই দেওয়া যাইতেছে।

পটাচারা শ্রাবস্তী নগরে এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতাপিতা স্থির করিয়াছিলেন যে এক ধনী বনিকের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। কিন্তু পটাচারা অপর এক যুবকের প্রেমে মুগ্ধা হইয়াছিলেন। এদিকে মাতাপিতা বিবাহের দিনস্থির করিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই পটাচারা গৃহত্যাগ করিয়া সেই যুবকের সহিত দূরদেশে গমন করিলেন। পটাচারার দুইটী সন্তান হইয়াছিল। এই দুইটী সন্তান লইয়া তিনি একসময়ে পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে পথিমধ্যে সন্তানদ্বয় এবং স্বামীর অপমৃত্যু হয়। তখন পটাচারা রোদন করিতে করিতে পিতৃগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে শ্রাবস্তী নিবাসী একব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহার নিকট পিতৃকুলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ আরও অধীর হইয়া গেল। জানিতে পারিলেন বিষম বর্ষায় তাঁহার পিতার বাসগৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে, এবং মাতা পিতা ভ্রাতা সকলেই গৃহের নিম্নে প্রোথিত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তখন পটাচারা উন্মাদিনী হইয়া ইতস্তত: বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ করেন। তঁহারই শান্তনা বাক্যে এবং মধুর উপদেশে পটাচারা প্রকৃতিস্থা হইলেন। তাঁহার শোক বিদূরীত হইল, তিনি নির্ব্বাণ লাভের জন্ম ব্যগ্র হইলেন এবং অবশেষে ভিক্ষুনী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন। সাধনবলে তিনি অর্হৎ হইয়াছিলেন।

কথিত আছে পুত্রশোকসন্তপ্তা ৫০০ জন নারী পটাচারার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় উপদেষ্ট্রী আর কে হইতে পারিত? শোক কি তাহা তিনি পূর্ণমাত্রাতেই জানিতেন। মাতা, পিতা ভ্রাতা, স্বামী পুত্র,—সবই তিনি হারাইয়াছিলেন এবং বিষম শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। এত বিপদের পরও যখন তিনি চিত্তকে প্রশান্ত করিতে পারিলেন এবং দু:খকষ্টের অতীত হইলেন, তখন শান্তির জন্য লোকে তাঁহার নিকটে যাইবে না, যাইবে কাহার নিকটে? তিনি শোক সন্তপ্তা নারীদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই :—

"মানুষ কোন্ পথে আসে, কোন্ পথে যায়, তাহা জাননা। একজন এই ভাবেই পুত্ররূপ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। 'আমার পুত্র' এই বলিয়া কাহার জন্য রোদন করিতেছ? এ কোন্ পথে আসিয়াছিল, কোন্ পথে চলিয়া গিয়াছে তাহার কিছুই জান না। তাহার জন্ম অনুশোচনা করিও না। প্রাণিগণের ইহাই ধর্ম্ম। অযাচিত ভাবে আসিয়াছিল, বিনা অনুমতিতে এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে। কোথা হইতে আসিয়া কয়েকটা দিন এখানে কাটাইয়া গেল। একপথে আসিল আর এক পথে গেল। মানুষরূপে আসিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইল। যেমন আসিল তেমনি গেল। ইহার জন্ম আর পরিদেবনা কেন? (থেরীগাথা ১২৭—১৩০)

এ উপদেশ নিতান্ত নির্ম্মম। তবে ইহার মূলে সত্য যে কিছুই নাই, তাহা নহে। জন্মমৃত্যুর কথা কেহই জানে না এবং কিছুই জানে। এখন ও আমরা বলিয়া আসিতেছি— "বিধাতা সন্তানটী কয়েকদিনের জন্ম দিয়াছিলেন, আবার তিনিই লইয়া গেলেন। তাঁহারই সম্পত্তি, তিনিই লইলেন। কুতু সম্পত্তি চলিয়া গেল, এজন্য আর শোক কেন?" উভয় কথাই

এক। পটাচারা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সেই সময়ের উপযোগীই হইয়াছিল। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাঁহার শিষ্যাগণ বিগতশোক হইয়াছিলেন এবং পরে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

আরও অনেক নারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ৩০ শিষ্যা থেরী যে গাথা গান করিতেন, তাহা 'থেরী গাথা'র একটী গাথা (৪৮)। চন্দ্রা নাম্নী একজন দরিদ্রা অপুত্রিকা বিধবা তাঁহারই আর একজন শিষ্যা। ইনিও একজন থেরী। থেরীগাথাতে ইঁহারও একগাথা (৪৯) আছে। উত্তরা নামিকা একজন নারী পটাচারা কর্ত্তৃক দীক্ষিতা থেরী হইয়াছিলেন। ৫৮ সংখ্যক গাথা ইহারই উক্তি।

কৃশা গৌতমী

কৃশা গৌতমীর পালি নাম "কিসা গোতমী"। ইহার ইতিহাস বৌদ্ধজগতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'পরমার্থদীপনী'তে তাঁহার এই বিবরণ পাওয়া যায়:—

শ্রাবস্তী নগরে কৃশা গৌতমীর জন্ম। গৌতমী ইহার নাম; কৃশা ছিল বলিয়া লোকে বলিত কৃশা গৌতমী (কিসা গোতমী)। ইহার মাতাপিতা দরিদ্র ছিলেন, এইজন্য কেহ ইহাকে গ্রাহ্য করিত না। বিবাহের পর ইহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে কিন্তু অল্পবয়সেই তাহার মৃত্যু হয়। তখন কৃশা গৌতমী ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। দ্বারে দ্বারে সন্তানকে লইয়া বলিতে লাগিলেন—"ওগো আমার ছেলের জন্য ঔষধ দাও না।" লোকে বলিতে লাগিল "ঔষধে কি হবে?" একজন দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন "বুদ্ধের নিকট যাও, ঔষধ মিলিবে।" তখন তিনি বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়া ঔষধ ভিক্ষা করিলেন। বুদ্ধদেব সমুদায় ঘটনা বুঝিয়া লইলেন। তিনি গৌতমকে বলিলেন—"তুমি কয়েকটা শরিষা লইয়া আইস, যে বাড়ীতে কেহ মরে নাই, সেই বাড়ীর শরিষা চাই।" কৃশা গৌতমী কিছু শান্ত হইয়া দ্বারে দ্বারে গমন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"ও গো! আমাকে কয়েকটা শরিষা দাও না। যে বাড়ীতে কেহ মরে নাই, সেই বাড়ীর শরিষা চাই।" তিনি প্রত্যেক গৃহেই গমন করিলেন। কিন্তু কেহ মরে নাই এমন বাড়ীও পাইলেন না এবং তাঁহার শরিষা আনাও হইল না। তাঁহার কথা শুনিয়া হয়ত কত গৃহে সুপ্ত দুঃখ জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছিল, কত গৃহে হয়ত ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। এমন গৃহ নাই যেখানে কেহ মরে নাই। সংসারে যে কেবল তিনিই সন্তান হারাইইাছেন তাহা নহে। সর্ব্বত্রই মৃত্যু, সর্ব্বত্রই শোক। ইহাই সংসারের নিয়ম। যদি দেখি সংসারে সকলেই সুখী, দুঃখী কেবল আমি, তখন দুঃখের মাত্রা বাড়িয়া যায়, তাহা বহন করা যেন অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি দেখি দশা সকলেরই এক, দুঃখ যে কেবল আমিই ভোগ করিতেছি তাহা নহে, দুঃখ সকলেরই তখন দুঃখের বিশেষত্ব চলিয়া যায়, দুঃখের ভার আপনা আপনি লঘু হইয়া পড়ে এবং প্রাণ প্রশমিত হয়। কৃশা গৌতমীর জীবনেও ইহাই ঘটিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন সংসারের ধর্ম্মই এই প্রকার। সর্ব্বত্রই মৃত্যু, দুঃখ, শোক; সবই অনিত্য। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন মহাত্মা বুদ্ধ কেন তাঁহাকে শরিষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এইরূপে প্রকৃতিস্থ হইবার পর গৌতমী সন্তানকে শ্মশানে রাখিয়া বুদ্ধদেবের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। মহাত্মা বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৌতমি! শরিষা পাইলে

কি ?" গোতমী বলিলেন "ভগবন্। পরিষার কার্য্য হইয়া গিয়াছে, এখন আমাকে দীক্ষিতা হইবার অনুমতি দিন।"

এইরূপে গোতমী নবজীবন লাভ করিলেন। ভিক্ষুণী সম্পদায়ে প্রবেশ করিয়া তিনি থেরী হইলেন এবং সাধন বলে অর্হত্ব লাভ করিলেন।

থেরীগাথার একটী গাথা (৬৩) ইহার রচনা। ইহার প্রথম অংশে তিনি বলিতেছেন—

"মুনি জন বলেন সাধুগণের সহিত মিত্রতাই কল্যাণকর। মূর্খ ব্যক্তিও সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া পণ্ডিত হইয়া যায়। সৎপুরুষকেই ভজনা কর, ভজনা করিলে প্রজ্ঞালাভ হয়। সৎপুরুষকে ভজনা করিলে সমুদায় দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়"। (২১৩—২১৪)।

ইহা তিনি নিজজীবনে অনুভব করিয়াই বলিয়াছিলেন। বুদ্ধ এবং ধার্ম্মিকী ভিক্ষুণীদিগের সঙ্গলাভ করিয়া তিনি প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেম এবং দুঃখের অতীত হইয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—সাধুসঙ্গের কি মহিমা।

স্ত্রীলোকদিগের জীবন বিষয়ে তিনি এই প্রকার বলিয়াছেন :—

"স্ত্রীলোকের জীবন কি দুঃখময়! সপত্নীর সহিত বাসে দুঃখ! সন্তান প্রসবে দুঃখ। কোন সুকুমারী গলদেশ কর্ত্তন করিয়া আত্মহত্যা করিতেছে, কেহ বা বিষ ভক্ষণ করিতেছে। সন্তান প্রসব না হইয়া কতস্থলে ভ্রূণসহই মাতার মৃত্যু হইতেছে (২১৬—৩১৭)।

ইহার পরের দুইটী শ্লোকে অপর এক নারীর উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"সন্তান প্রসবের জন্য গৃহে ফিরিবার সময় পথেই স্বামীকে মৃত অবস্থায় দেখিলাম, প্রসবের পূর্ব্বে গৃহেত উপস্থিত হইতে পারিলাম না। আমার দুই পুত্র কাল প্রাপ্ত হইল, পথে পতির ও মৃত্যু হইল, মাতাপিতা ভ্রাতা একই চিতায় ভস্মীভূত হইল" (২১৮—২১৯)।

'পরমথ্‌থ দীপনী'তে লিখিত আছে যে উদ্ধৃত অংশ 'পটাচার'র উক্তি। নারীর যে কি দুঃখ, তাহা বর্ণনা করিবার জন্যই কৃশা গোতমী এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার পরে শোকসন্তপ্তা নারীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন :—

"হে কৃপণে! আত্মজন হারা হইয়া তুমি অপরিমিত দুঃখ অনুভব করিয়াছ, বহু সহস্র বৎসর অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছ। শ্মশানে পশু পক্ষী আমার পুত্রমাংস ভক্ষণ করিয়াছে আমাকে ইহাও দেখিতে হইয়াছে। আমার স্বজন হত হইয়াছে, লোকে আমাকে নিন্দা করে, আমার পতির মৃত্যু হইয়াছে—কিন্তু এখন আমি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছি। অষ্ট অঙ্গ বিশিষ্ট অমৃতগামী আর্য্য পথে আমি বিচরণ করিতেছি। নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ধর্ম্মাদর্শ দেখিয়াছি। আমার (হৃদয়ের) মল্য বিদূরিত হইয়াছে, আমার ভার অপগত হইয়াছে, আমার যাহা করণীয় ছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে।" (২২০—২২৩)

গাথার শেষ অংশে লিখিত আছে—

"সুবিমুক্তচিত্তা কৃশা গোতমী এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন" (২২৩)।

পরী প্রবন্ধে আরও কয়েকজন ভিক্ষুণীর বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

লুই পাস্তর*

আজ যে মহাপুরুষের শতবার্ষিক জন্মদিন স্মরণার্থ আমরা সমবেত হইয়াছি তিনি বিশ্বমানবের পরমাত্মীয়। এরূপ মহাজনের জন্মক্ষেত্র ভূগোলের বিন্দুতে শেষ হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্র মানচিত্রের জটিল রেখাপাতে নির্দ্দেশ করা যায় না। নগনদীর তুচ্ছ সীমা বিলীন হইয়া যায় কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম্মস্রোতের শিকর ধারার পবিত্র স্পর্শে দেশদেশান্তরের দুইকূলে মরুভূমি পর্য্যন্ত কুসুম সম্পদে বিচিত্র শোভা ধারণ করে। তাই আজ সুদূর শতবর্ষ কাল পরে ভৌগলিক সহস্রাধিক যোজন অন্তরে রংবেরংএর এহেন পার্থক্যের যুগে মহামতি লুই পাস্তরকে বাঙ্গালী আমরা অতি আপনার জন বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি।

লুই পাস্তর ১৮২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর Franche Comteএর Dole নামক পল্লীতে বণিক চর্ম্মকার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি আরবোবার দৈনিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। এই তরুণ বয়সেই তাঁহার গুরুদেব উত্তরকালের পুরুষসিংহের প্রতিভার আভাস পাইয়াছিলেন এবং প্রায়ই বলিতেন Ecole normale (নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে) তাঁহার কি সৌভাগ্যের বিকাশ হইবে। তাই শিশুহৃদয় আলোড়িত হইয়াছিল কবে তিনি Ecole normaleএ ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। বেসানসনের Royal College (রয়াল কলেজ)এ ভর্ত্তি হইয়া—en attendant l'heureax jour ou je serai admit a l'ecole normale—সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

অতি ধীর পদবিক্ষেপে তিনি তাঁহার লক্ষ্যে পৌছিয়াছিলেন। ১৮৪০ সালে bachelier es Letters ডিপ্লোমা পাইয়া তিনি উক্ত কলেজে গণিতের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং দুই বৎসর পর যখন baccalaureat es Sciences নামক বিজ্ঞানের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সনদ পান, তখন সেই সনদে জনৈক পরীক্ষক মহাশয় লিখিয়া দিয়াছিলেন যে রসায়নে ইনি একজন অতি দুর্ব্বল অধিকারী। যিনি সমগ্র রসায়ন সাগরে অতি নিকট ভবিষ্যতে পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গ তুলিয়া সমগ্র সুধী সমাজকে চকিত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রাণে পরীক্ষক মহাশয়ের এরূপ খামখেয়ালী কটাক্ষপাত কি যে তীব্র বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় লাগিয়াছিল তাহা তাঁহার জীবনচরিতকার বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

অথবা, মহাপুরুষের বিরোধী হওয়াতেও লাভ আছে, কেননা, এই প্রসঙ্গে পরীক্ষক মহাশয়ও পাস্তরের সঙ্গে অমরতা লাভ করিয়াছেন।

কবি ভারবি বলিয়াছেন :—

সমুন্নয়ন্ ভূতিমনার্য্যসঙ্গমাৎ
বরং বিরোধোঽপি সমং মহাত্মভিঃ। ৮ম শ্লোক, ১ম সর্গ, কিরাত।

এই কথাটিতে পুরুষসিংহ আঘাত পাইয়াছিলেন সত্য কিন্তু দমিয়া যান নাই বরং তাঁর ভগ্নিকে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

Ces trois choses, la volonte, le travail, la succes, se partagents toute l'existence humaine, la volonte ouvre la porte aux carriers brillantes

* শতবার্ষিক জন্মদিনে কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবে পঠিত প্রবন্ধ।

et labourieuses, le travail les franchit et une fois arrive au terme du voyage, le succes vient couronner l' ocuvre.

অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি, কর্ম্মযোগ এবং কৃতকার্য্যতা এই ত্রয়ী মানবের সমগ্র জীবন নাট্যে কুশীলবের কার্য্য করিয়া থাকে।

সুখসম্পদপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের বিশালতোরণ ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে উন্মুক্ত হইলে, কর্ম্মযোগ তাহা আয়ত্ত করিয়া গন্তব্যনির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়। তখন কৃতকার্য্যতা বিজয়মাল্যে তাহার উচ্চশির মহিমামণ্ডিত করে।

রসায়ন শাস্ত্রে তাঁহার দীক্ষা হয় প্রকৃত প্রস্তাবে Sorbonneএ J. B. A. Dumaর প্রথম রাসায়নিক আলোচনায়। A.T. Ballad তাঁহাকে এই সময় যন্ত্রাগারের সহচর নিযুক্ত করেন।

কোন্ দৈব শক্তি প্রভাবে তিনি ব্যাধির জটিল রহস্য ভেদ করিয়া তাহার কারণতত্ত্ব বিজ্ঞানের কঠিন নিগড়ে বন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? পদার্থবিজ্ঞানের ও রসায়নের গভীর প্রশ্নের মিমাংসায় অক্লান্তকর্ম্মী বিশালধৈর্য্যশীল নিয়ত কর্ম্মযোগ-নিরত অথচ ধ্যানী মহামতি পাস্তুর মাতৃবক্ষের সমগ্র সাধনা প্রয়োগে সকল বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া গোপনে অতি সন্তর্পণে হৃদয়শোণিতমোক্ষণে দিনের পর দিন গুণিয়া বহুবর্ষ ধরিয়া স্বীয় সুচিন্তাপ্রসূত ভাবরাশিকে নিটোল সুঠাম কলেবরে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

"Travailes, travailes tou jours"—ছিল তাঁহার জীবনের মন্ত্র। ইহা যে আমাদের গীতারই অমর প্রতিধ্বনি—নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং কর্ম্মজ্যায়োহকর্ম্মণঃ।

নবীন রসায়নের যুগান্তর আনিল Isomerism। দুই জিনিষের সমান উপাদান হইলেও অণুপরমাণুর গঠন বিপর্য্যয়ে তাহারা যে ভিন্ন গুণাক্রান্ত হয় তাহা বীয় প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীর অবিদিত ছিল না। কিন্তু সেই রহস্যের পূর্ণ তথ্য তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যেদিন তরুণকিশোর পাস্তুরের অসামান্য প্রতিভা মদিরাভাণ্ডপ্রাপ্ত টার্টারিক এসিডের স্ফটিকখণ্ডে আলোক রেখাপাত করিয়া অজ্ঞানের কুহেলিকা সরাইয়া নূতন পথ দেখাইল সেদিন অধীর গুরুদেব বীয় মহোদয় বলিয়া উঠিলেন—Mon cher enfant, j'ai tant aime les sciences dans ma vie que cela me fait battre le cour.

প্রিয় বৎস, আমার জীবন দিয়া বিজ্ঞানকে এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়াছি যে "তোমার গরব কণ্ঠে আমার হৃদয় টেনে আনে।"

এই এক ব্যাপারেই তিনি তদানিন্তন সমগ্র পৃথিবীর রাসায়নিক সমাজে অগ্রণি হইয়া উঠিলেন এবং ১৮৫৪ সালে লাইলির (Lille) Faculte des Scienceএর অধ্যাপক এবং Dean নিযুক্ত হইলেন।

এই পদগ্রহণের প্রথম অভিভাষণকালে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পর্য্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে দৈব মাত্র তাঁহারই অনুকূল হ'ন যিনি সেজন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। এর কিছুকাল পরেই তিনি Mille Laureant (লরিয়াঁ) নামক বিদুষী ও গুণবতী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন।

বিবাহার্থি হইয়া ভাবি শ্বশুরকে, স্বীয় কঠোর দারিদ্র্য এবং নিজের কর্ম্মকুশল দেহ ও মনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি অতি সরল ভাবে যে পত্র লিখিয়াছিলেন বর্ত্তমান যুগের সমাজ

নন্দনের প্রজাপতি ত দূরের কথা, যে কোনও প্রতীচ্য কুমারী নাকি তাহা অবজ্ঞার ধূলিতলে নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না।

কিন্তু এই পতিসোহাগিনী রমণী দারিদ্র্যের ভীষণ পাথারতলে যে মাণিকের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহাতেই মুগ্ধা হইয়া নিবিড় ভাবে ডুবিয়াছিলেন এবং চিরকাল ছায়ার মতন অনুগমন করিয়া পতির অনুষ্ঠিত সমগ্র প্রয়াসে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ এরূপ পত্নীর সাহচার্য্য ব্যতীত বিশ্বমানব, মহামতি লুই পাস্তরের বহুল দান হইতে বঞ্চিত থাকিত। যাঁহারা তাঁহার বিস্তৃত জীবন চরিত পাঠ এবং আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা যুগপৎ বিস্মিত ও বিহ্বল হইবেন যে, তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের শেষ ৩০। ৩৫ বৎসরের মধ্যে অত্যধিক মানসিক শ্রমের জন্ত বহুবার তাঁহাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইতে হয়, অথচ এই সময়ের দুর্ব্বল দেহের সতেজ শক্তি বিশ্বমানবের সেবায় অনুদিন নিযুক্ত থাকিয়া জগতের যে কি উপকার সাধন করিয়াছে তাহা মানবেতিহাসে দৃষ্টান্তবিহীন।

পতিপরায়ণা সতীর অনলস সেবা ও সাধনা সেই রোগদীর্ণ দেহে সঞ্জীবনী স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। তিনি তাঁর দৈনন্দিন কর্ত্তব্য স্মরণ পথে আনিতেন, রাশি রাশি লিখিত প্রবন্ধ-নিচয়ের পরিষ্কার নকল তৈয়ার করিতেন এবং যাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। মহামতি পাস্তরের পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বর, সরল ও সহজ। সে ক্ষেত্রে তাহার পত্নীই ছিলেন অদ্বিতীয়া সাম্রাজ্ঞী। তাঁহার শাসন তিনি বর্ণে বর্ণে মানিয়া চলিতেন।

একদা ভাটিখানার অণুবীক্ষণ সাহায্যে তিনি নির্দ্দোষ ও সদোষ মদিরার পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহা সমগ্র রসায়ন শাস্ত্রে ও জীববিজ্ঞানে ভীষণ বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া এমন এক শ্রেণীর অনুসন্ধান চালাইল যাহার ফলে জীবের জন্ম যে স্বয়ম্ভূ নয় ইহাই প্রতিপন্ন হইল।

তিনি দেখাইলেন যে অক্ষত দ্রাক্ষা মধ্যে অথবা সুস্থ জীবশরীরে কোনও জীবাণু নাই। কিন্তু নিপীড়িত দ্রাক্ষাগুচ্ছ বা কর্ত্তিত জীবদেহ বাতাসে রাখিলে উচ্ছলন ও গলন সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন প্রকাশ পায়। অপর পক্ষে এই জিনিষগুলিতে জীবাণু না আসিতে পারে এমন অবস্থায় রাখিলে দেখা যায় যে আঙুর ফলটি ও ক্ষত স্থান সমান ভাবে অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে।

এর পর তিনি তুলনামূলক ভাবপ্রভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ক্ষত স্থানের প্রদাহ ও বিভিন্ন প্রকারের জরপ্রমুক ব্যাধি, জীবন্ত প্রাণিদেহে, এই রক্ত বীজের বংশধর, গণনাতীত বীজাণু বিশেষের প্রকাশমান সংহার লীলা। অর্থাৎ পচ্যমান-মাংস মদিরার পরিবর্ত্তন নিচয়ের রূপান্তর মাত্র।

কি সামান্ত তথ্য হইতে তিনি কি গভীর সত্যের উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়বিহ্বল না হইয়া পারা যায় না।

এই বীজমন্ত্রে নিজে নিজেই দীক্ষিত হইয়া ইংলণ্ডে মহামতি লর্ড লিস্টার বিজাণু নাশক প্রণালীর অস্ত্র চিকিৎসার (Antiseptic Surgery) প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া বিশ্বমানবের মনো-

মন্দিরে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ১৮৭৪ সালে বিশ্বমানবের উক্ত বান্ধব লর্ড লিস্টার মন্ত্রদ্রষ্টা লুই পাস্তরকে স্বীয় অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন।

১৮৬৫ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সের আলে (Alais) নামক জনপদে রেশমের আবাদে পেব্রীন (Pebrine) নামক ভীষণ ব্যাধিতে গুটিপোকার সর্ব্বনাশ করিতেছিল। বিপন্ন কৃষক সম্প্রদায় পাস্তরের শরণাপন্ন হইলে জুন মাসে তিনি সেখানে গিয়া অযোগ্য ঘটনাবলি ক্রমান্বয়ে বহিস্কার করিয়া সেপ্টেম্বরের শেষে সেই ভীষণ উপদ্রবের প্রকৃত কারণের তথ্য নিরূপণ করিয়া তাহাকে কবলিত করিলেন। তাহার পর্য্যবেক্ষণের ফল—Etude sur la maladie des vers a soie —তাঁর এক অমূল্য গ্রন্থ, ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে বৈজ্ঞানিকের জীবনে নূতন অবিষ্কারের মত আনন্দদায়ক আর কিছুই নাই কিন্তু সেই আবিষ্কারের সদ্যপ্রসূত ফল যখন মানবের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করে, তখন সেই আনন্দ সহস্রগুণে বর্দ্ধিত কলেবর ধারণ করে। মহামতি পাস্তর জীবদ্দশায় সেই আনন্দের ভূমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র সভ্যজগৎকে সুবৃহৎ ঋণ জালে আবদ্ধ করিয়াছেন যেহেতু তাঁহার প্রদর্শিত প্রতিষেধক পন্থা অবলম্বন করিয়া মানুষ সংক্রামক রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতেছে।

ধীরভাবে চিন্তাকরিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে তিনি সমগ্র জগতের ক্ষুধার খাদ্য তৃষ্ণার জল, পরিধানের পরিচ্ছদ ও রোগের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

কুসুমশিল্পি স্বীয় মালঞ্চে যেমন ইচ্ছামত কুসুম স্তবকের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কবি-কল্পিত কিন্তু অধুনা-বাস্তব এই অণুমালঞ্চের মালি (Bacteriologist) ও তেমনি অবান্তর জিনিষ বাদ দিয়া অনুরূপ সার সলিল দ্বারা (Media of Water of Condensation) বিভিন্ন রোগের বীজাণুর চাষ করিতেছেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে এই অণুমালঞ্চের অপূর্ব্ব নির্য্যাসে (Vaccines and Sera) জীবদেহ স্বাস্থ্য সুষমায় মণ্ডিত হইয়া মহাপ্রাণ পাস্তরের বিজয় গাথার ঘোষণা করিতেছে।

পাস্তরের আলোচিত প্রথম ব্যাধি কিন্তু মুরগীর উদরাময়। এরপরে তিনি গোমেষাদি গৃহপালিত পশুর স্ফোটকাকারে করালব্যাধি য়্যান্‌থ্রাক্‌স্ (Anthrax)এর স্বরূপ নির্ণয় করেন, এবং এই বিপদের প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়া ফরাসী জাতিকে বহুল অর্থক্ষতি হইতে রক্ষা করেন। টি, এইচ, হাক্‌স্‌লী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, পাস্তরের অবিষ্কারের ফল স্বর্ণ রৌপ্যের মানদণ্ডে তৌলিত হইলে তাহা ১৮৭০ সালে ফ্রান্স, নতমস্তকে, বিজয়ী জার্ম্মানিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে বিপুল অর্থসম্ভার দিয়াছিল তাহাকে অতিক্রম করিবে।

পাস্তরের সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ আবিষ্কার জলাতঙ্করোগের প্রতিষেধক ও প্রতিকারক ঔষধ। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই রোগের কারণের স্বরূপ পাস্তরের পরও এতাবৎকাল সমস্ত পৃথিবীর অসংখ্য বৈজ্ঞানিকের সতর্ক চক্ষু এড়াইয়া চলিয়াছে।

আজ সমগ্র পৃথিবীর অগণ্য নগরীতে পাস্তরের মন্দির স্থাপিত হইয়া তৎপ্রদর্শিত চিকিৎসা প্রণালীর মাহাত্ম্যে ব্যাধি প্রপীড়িত লক্ষ লক্ষ নরনারীর দগ্ধহৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে পাস্তর নিজে চিকিৎসক ছিলেন না কখন চিকিৎসা বিদ্যালয়ে পড়েনও নাই। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ রাসায়নিক। মাত্র স্বীয় বহুমুখী প্রতিভায়

সাহায্যে তিনি বর্ত্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল দৃঢ়তর ভূমির উপর স্থাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর, Instiut Pasteur ভূস্বর্গ প্যারি নগরীতে স্থাপিত হয়। তিনি সেই উৎসর্গ সভায় রোগদুর্ব্বল দেহে নিজ মুখে কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার লিখিত যে প্রবন্ধটি তাঁহার সুযোগ্য জামাতা সেই সভায় পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার এক অংশের ভাবার্থ এই—"দুইটি প্রবল ধারা পরস্পর ভীমবেগে আঘাত করিয়া আমার সম্মুখে ভীষণ আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে। একটি রণচণ্ডীর দুর্দ্দমনীয় পিপাসা মিটাইবার জন্য জাতীসঙ্ঘকে রুধিরের খরস্রোতে প্রতিদিন রণাঙ্গণে তীরবেগে টানিয়া চলিতেছে আর অপরটি শান্তি, স্বাস্থ্য ও কর্ম্মের ত্রিবেণী সঙ্গমে বিশ্বমানবের ব্যাধি বিপদের জ্বালা ঘুচাইয়া তাহাকে নির্ম্মল ও শীতল করিতেছে। তাই একটি ব্যক্তিবিশেষের উচ্চাভিলাষ সম্পাদনের জন্য লক্ষ প্রাণের বলি প্রদান করিতে দ্বিধা বোধ করে না। অপরটি একটি মাত্র প্রাণকে তার বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারিলে শত উচ্চাভিলাষে জলাঞ্জলি দিয়া চির চরিতার্থতা বোধ করে। এদের মধ্যে কে চিরস্থায়ী হইবে ভগবান জানেন। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই ধ্রুব সত্য যে আমাদের বিজ্ঞান করুণার অমৃত নির্ঝরে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া মরণের গণ্ডীকে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিয়া জীবনের সীমান্ত দিন দিন প্রসস্ত হইতে প্রসস্ততর করিবে।"

সুদীর্ঘ কর্ম্ম জীবনের অন্তে তিনি জ্ঞানে ও বয়সে মহাস্থবির হইয়াছিলেন। পৃথিবীর সমগ্র নরনারীর বিপুল সম্মানে মহিমামণ্ডিত হইয়াও তিনি কিন্তু হৃদয়টিকে রাখিয়াছিলেন কুসুম সুকুমার শিশুর মত করুণ, পেলব ও তরল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যখন সমগ্র পৃথিবীর অগণ্য জনপদ হইতে অসংখ্য মূল্যবান অর্ঘ্য তাঁহার চরণোপান্তে পৌঁছিয়াছিল, তখন স্পেনের এক দরিদ্র সুধীসমাজ ছোট একটি তাম্রফলক তাঁহাকে উপহার দিয়া অর্থের দারিদ্র্যের সঙ্গে হৃদয়ের বিপুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই তাম্র ফলকের একপিঠে ছিল পাস্তুরের আলেখ্য এবং অপর পিঠে ছিল একটি প্রিয়দর্শন শিশুর প্রতিমূর্ত্তি যে, হাসিমুখে, আসন্ন দংশনোন্মুখ, মাত্র পশ্চাৎ দুইপদে দণ্ডায়মান, মত্ত সারমেয়কে গাঢ় আলিঙ্গন দিতে উদ্‌গ্রীব। সমগ্র চিত্রের ইঙ্গিত যেন পাস্তুরে স্থাপিত অটল বিশ্বাস আসন্ন মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিতেছে।

মহাপ্রাণ পাস্তুর সবার আগে এই অর্ঘ্যটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন।

ইহা যে অবদান শতকে বর্ণিত অনাথ পিণ্ডদের মণিকাঞ্চন উপেক্ষা করিয়া দরিদ্রের হৃদয় রাগরঞ্জিত, বুদ্ধচরণে অর্পিত, জীর্ণ-চীর মস্তকে ধারণের পুনরাবৃত্তি।

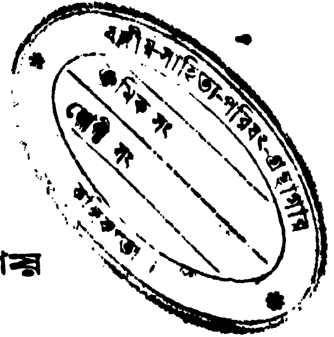
১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর বিশ্বমানবের এই প্রকৃত বন্ধু St. Cloudএর নিকটে দেহত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু সমগ্র পৃথিবী শোকে অধীর হইয়া তাহার বিরাট অশ্রুরাশি জমাট করিয়া প্যারির বিশাল রাজপথে, তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তির স্থাপনা করিয়াছে। (Marble statue of Louis Pasteur built on International Subscription at Boulvard Pasteur, Paris),

মৃত্যুশয্যায় তিনি প্রিয়শিষ্যমণ্ডলীর দিকে মুখ ফিরিইয়া বলিয়াছিলেন—Ou en etes vous ? Qui faites vous ? il faut travailes.—বৎসগণ তোমরা কোথায় কি করিতেছ, সর্ব্বদা কাজ কর।

আজ এই দিনে আমাদের দেবভাষার দৈববানি বলিতেছে তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনম্-তদুপাসনম্।

যদি ভগবানের কৃপায় মহামতি পাস্তুয়ের প্রতি আমাদের যথার্থ প্রীতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে তবে তাঁহার প্রবর্ত্তিত তাঁহার প্রিয় যে করুণার ধারা তাহা অনলসভাবে বহমান রাখিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির প্রকৃত পরিচয় দিব।

শ্রীব্রজবল্লভ সাহা।



মহাভারত-মঞ্জরী

বনপর্ব্ব—অষ্টম অধ্যায়

কলিযুগ বর্ণন।

মার্কণ্ডেয় ঋষি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন অনুসারে বলিতে লাগিলেন :—

চতুর্ব্বর্ণ—কলিযুগের শেষে সমাজে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবে। তখন সকলেই পরলোকে সন্দেহ করিবে। (১) অধর্ম্মের অতিশয় বৃদ্ধি হইবে। একমাত্র উপবীতই ব্রাহ্মণত্বের কারণ হইবে (২)। ব্রাহ্মণেরা মিথ্যা ধর্ম্ম-চিহ্ন ধারণ করিবে, মিথ্যা বলিবে, বেদের নিন্দা করিবে, কার্য্যকারণ তত্ত্ব লইয়া বৃথা বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে। কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য করিবে। শূদ্রের ভৃত্য হইবে, শূদ্রেরা ধর্ম্মের উপদেশ দিবে, আর ব্রাহ্মণেরা তাহাদের শিষ্য হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—শূদ্রের উপজীবিকা অবলম্বন করিবে, আর শূদ্রেরা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কার্য্য করিবে। ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক, সত্য মিথ্যা কর্ত্তৃক, রাজা ভৃত্য কর্ত্তৃক ও পুরুষ স্ত্রী কর্ত্তৃক পরাজিত হইবে (৩)।

অবস্থা—মনুষ্য অল্প দেহ, অল্প বল, অল্প আয়ু, অল্প জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। তাহারা পরস্পরের নিন্দা, পরস্পরের ঈর্ষা করিবে, সতত আত্মকলহে নিমগ্ন থাকিবে ও ব্যভিচারী হইবে। পুরুষ দশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়সেই সন্তানের জনক হইবে, ষোড়শ বর্ষ বয়সেই বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হইবে। বৃদ্ধেরা বালকের মতি ও বালকেরা বৃদ্ধের মতি পাইবে। যৌবন-বিবাহ রহিত হইবে। কন্যাগণ স্বয়ং পতি মনোনীত করিবে। রমণীগণ সপ্তম বা অষ্টম বর্ষেই সন্তানের জননী হইবে। বহু সন্তানের মাতা হইবে। ভার্য্যা ভর্ত্তার সেবা

(১) হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব ৩—২৭। (২) শ্রীমদ্ভাগবত ১২—২—৩। (৩) পরাশর-সংহিতা ১—৩০।

করিবে না, তাহারা কর্কশভাষিণী ও অসচ্চরিত্রা হইবে (৪)। বাচালতাই সভ্যতাসূচক হইবে। উৎকৃষ্ট বর্ণের লোকেরাও গচ্ছিত ধন অস্বীকার করিবে, অনাথা বিধবার ধনও অপহরণ করিবে। পুরুষের অঙ্গীকার ও শপথ স্থির থাকিবে না। লোকে ঋণ পরিশোধ করিবে না। (৫) কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। কাহারও অভাব মোচন হইবে না। লোকসকল নির্দ্ধন হইবে (৬)। লোভী, নির্দ্দয় ও দস্যুতুল্য রাজারা প্রজার স্ত্রী ও ধন হরণ করিবে। প্রজাগণকে ফল, মূল, মধু, পুষ্প, আমিষ, শাক ও আঁটি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইবে। অনাবৃষ্টি হইয়া দুর্ভিক্ষে অনেকেই বিনষ্ট হইবে। শীত, বাত, রৌদ্র, বর্ষা, হিম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি, বিবাদ দুশ্চিন্তায় সকলকেই অতিশয় কষ্ট পাইতে হইবে। অন্ন, বস্ত্র, পান, শয্যা, ব্যবহার, স্নান ও ভূষণ বিহীন হইয়া লোকে পিশাচের আকার ধারণ করিবে, শেষে পর্ব্বত ও বনে আশ্রয় লইবে। (৭)

প্রজা—যাহার ধন থাকিবে, তাহাকেই লোকে মহাবংশে জন্ম, মহাগুণী ও আচার সম্পন্ন বলিয়া সম্মান করিবে। দারিদ্র্য অসাধুতার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইবে (৮)।

বল—বলই ধর্ম্ম ও ন্যায় বলিয়া গণ্য হইবে। (৯)

আত্মীয়গণ—পিতা মাতা অভুক্ত থাকিবে, আর পুত্র সুখে অন্ন ভোজন করিবে। পিতামাতা বর্ত্তমানে পুত্র ও পুত্রবধু কর্ত্তৃত্ব করিবে। পুত্র পিতাকে ও বধু শ্বাশুরীকে কর্ম্ম করিতে আদেশ দিবে। (১০) পিতাপুত্রে নিত্য কলহ হইবে। সহোদর সহোদরকে বঞ্চনা করিবে। কেহ কাহারও মিত্র থাকিবে না। সকলেই সকলের অনিষ্ট করিবে। কেহ অর্থ না পাইলে মিত্রেরও হিতসাধন করিবে না। মিত্রতা শুধু কথাতেই আবদ্ধ থাকিবে। গুরু শিষ্যের সখা হইবে না, শিষ্যও গুরু-সেবা করিবে না।

কৃষি—লোকে নিম্ন ভূমিতে কৃষিকার্য্য করিবে, কোরদূষক ধান্যকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিবে। উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি হইবে না, বীজ সকল সম্যকরূপে অঙ্কুরিত হইবে না। শস্য জন্মিবে না। বৃক্ষ উপযুক্ত পরিমাণে ফল উৎপন্ন করিবে না। গো-জাতি বিনষ্ট হইবে। যাহা থাকিবে তাহা অল্প দুগ্ধ দিবে। লোকে ছাগ ও মেষ দোহন করিবে। গাভী ও এক বর্ষীয় বৎস দ্বারা জমি কর্ষণ করিবে, তাহাদের দ্বারা গুরু ভার বহন করাইবে। এক বাহনেই শকটাদি টানিবে। লোকে পাটের বস্ত্র ব্যবহার করিবে, গন্ধ সৌরভবিহীন ও রস সুস্বাদ বর্জ্জিত হইবে। বহু বায়স উৎপন্ন হইবে।

বণিক—বণিকেরা মিথ্যা ওজনে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবে, নানারূপে লোককে ঠকাইবে।

পল্লীগ্রাম—পল্লীবাসী অন্নকষ্টে পীড়িত হইবে। পল্লী সকল জনশূন্য হইবে, হিংস্র পশু ও সর্পাদির আবাস হইবে। দেবালয় সকল ও নগরের বিহার উদ্যান হিংস্র

(৪) শ্রীমদ্ভাগবত ১২—২—৪। (৫) হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব ৩—৩০। (৬) হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব ৪—২৪।
(৭) শ্রীমদ্ভাগবত ১২ স্কন্ধ ২।৩ অধ্যায়। (৮) শ্রীমদ্ভাগবত ১২ স্কন্ধ ২ অধ্যায়। (৯) শ্রীমদ্ভাগবত ১২—২—২।
(১০) হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব্ব ৩—৩৯।

পশুতে পূর্ণ হইবে। রাজপথে লম্পট ও বেশ্যা বিরাজ করিবে। পথিকেরা অন্ন, পানীয় ও আশ্রয় না পাইয়া পথেই শয়ন করিয়া থাকিবে।

পণ্ডিত—পণ্ডিতেরা সত্য গোপন করিবে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ সকলেরই অজ্ঞাত থাকিবে। পণ্ডিতাভিমানী পুরুষ সকল নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া শাস্ত্রে অর্থ প্রকাশ করিবে। (১১) বাচালতাই পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইবে। (১২) লোকে ধর্ম্মের জাল পাতিয়া সকলকে ঠকাইবে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম—লোকে দেবতার পূজা না করিয়া, মন্দিরে অস্থি গাড়িয়া রাখিয়া তাহার পূজা করিবে। তপোবনে, ব্রাহ্মণের গ্রামে, দেবস্থানে ও চৈত্যে অস্থিগর্ভ মন্দির সকল দৃষ্ট হইবে। দেব-মন্দির আর সে সকলকে অলঙ্কৃত করিবে না। (১৩)

বিদেশ ভ্রমণ—সকল লোকেই দেশ দেশান্তরে গমন করিবে, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিবে। বিভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার এক হইবে। সকলে স্বেচ্ছাচারী ও সর্ব্বভক্ষ্য হইবে, এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিবে। (১৪)

ম্লেচ্ছ—ম্লেচ্ছগণে পৃথিবী পূর্ণ হইবে। সকলেই ম্লেচ্ছভাবে অভিভূত হইবে। বহু ম্লেচ্ছ রাজা হইবে। তাহারা মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও অন্যায় অনুশাসন দ্বারা নানা প্রকারে প্রজার ধন অপহরণ করিবে। শেষে তাহারা পরস্পরকে আহ্বান করিয়া পরস্পরের বধ সাধন করিবে। তখন মহাযুদ্ধ, মহানাদ, মহাভয় উপস্থিত হইবে। (১৫)

কল্কী অবতার—যখন চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতি পুষ্যানক্ষত্রে এক রাশিগত হইবে তখন ভারতে আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। তখন যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষিত হইবে, শস্য প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হইবে, দেশ ব্যাধিশূন্য হইবে, নক্ষত্র ও গ্রহগণ শুভকর হইবে। দেশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হইবে। সেই সময় জগতের হিতের নিমিত্ত এক অসাধারণ পুরুষের প্রাদুর্ভাব হইবে। সম্ভল গ্রামে ব্রাহ্মণগৃহে বিষ্ণুযশা বংশে কল্কী নামে দ্বিজ কালপ্রেরিত রূপে উৎপন্ন হইবেন। তিনি মহাবুদ্ধিমান, মহাবলবান, মহাপরাক্রম, উদার-বুদ্ধি, ধর্ম্ম-বিজয়ী মহারাজচক্রবর্ত্তী হইবেন। তাঁহার সম্বন্ধমাত্রে বহু বাহন, অস্ত্রশস্ত্র, কবচ ও সৈন্য সংগৃহীত হইবে। তিনি ম্লেচ্ছগণকে বিনষ্ট করিবেন, মনুষ্য সমাজের উপকার সাধন করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণ রূপে উদিত হইয়া নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিবেন। তখন বিমল জ্যোতিতে ভারত আবার আলোকিত হইবে। সমুদয় বিশ্ব বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিবে, ভারতে নব আলোক, নবজীবন, নব যুগ আরম্ভ হইয়াছে। (১৬)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

(১১) হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব ৩—৩২।৩৩। (১২) শ্রীমদ্‌ভাগবত ১২ স্কন্ধ ২ অধ্যায়।

(১৩) বনপর্ব্ব ১৯০—৩৫।৬৬।৬৭। বুদ্ধদেবের অস্থি নানা মন্দিরে গড়িয়া রাখিয়া তাহার পূজার কথা এখানে লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'দর্শন' নামক প্রবন্ধে 'বৌদ্ধদর্শন' দ্রষ্টব্য।

(১৪) হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব্ব ৩—৭। (১৫) হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব ৪—১৫।

(১৬) বনপর্ব্ব ১৮৮। ১৯০ অধ্যায় ও শান্তিপর্ব্ব ২৮৮ অধ্যায়। হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব ৪১—১৬৪।

সত্য

সত্যের খাতিরে প্রাণ উৎসর্গ করার কথা শুনিয়া বিজ্ঞ পাইলেট স্বগত বলিয়াছিলেন,—সত্য কি? লোকে যাহা করিতে চায় বা পাইতে চায়, তাহার সার্থকতা ও প্রয়োজন বুঝাইতে না পারায়, অনেক সময়ে গেরুয়া পোষাকে মন ভুলাইবার মত অনেকে সত্যের দোহাই দিয়া অজানা মাহাত্ম্যের চমকে পশার জমাইতে চায়। কাঠে কাঠে ঠেকার মত প্রতি নিয়তই বহু সম্প্রদায়ের কঠোর সত্যগুলির সঙ্গে ঠেকাঠেকি হইতেছে ও আগুন জ্বলিতেছে। অনির্দ্দিষ্ট রকমে একটা অবর্ণনীয় সত্যের দোহাই না দিয়া লোকে যদি বলিত তাহারা নিজে যেমন বুঝিয়াছে তাহাকেই সত্য নাম দিয়াছে, তবে সংসারে জিদের মাত্রা অনেকটা কমিত ও সত্যের নামে বেজায় চুলাচুলি হইত না।

যে যাহা করে, তাহাই সে করণীয় ভাবে, অর্থাৎ তাহাই ঠিক্ বা সত্য মনে করে; এ হিসাবে আলাদা আলাদা চেহারার সত্যগুলির সংখ্যা অসীম। যে লোক মিথ্যা কথা কহিয়া কাজ হাঁসিল করিতে চায়, সে নিশ্চয়ই মনে করে যে তাহার পদ্ধতিটি কাজের পদ্ধতি,—সত্য পদ্ধতি। কোন ব্যক্তির ছল চাতুরীর কাজকে অন্যায় পদ্ধতি বলিলে সে যখন উপদেষ্টার কথাকে কেতাবি নীতি বলিয়া উড়াইয়া দেয়, তখন সে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয় যে, যাহা তাহার কাছে সত্য বলিয়া প্রচারিত হয়, তাহাকে সে অকেজো ও অফলন্ত নীতি মনে করে, অর্থাৎ তাহাকে অবলম্বনীয় বা সত্য মনে করে না, এবং নিজের পন্থাকেই কার্য্যকরী পন্থা বা সত্য পন্থা মনে করে। যাহা সত্য তাহাকে ফলন্ত হইতেই হইবে; যাহা কেতাবি নীতি বলিয়া উপহসিত হয়, তাহাতেই যে কাজ ঠিক হয় ও স্থায়ী হয়, তাহা বুঝিলেই লোকে তাহাকে সত্য বলিয়া ধরিবে; অবর্ণিত সত্য নামটার চমকে কিছু হইবে না;

গৌরবব্যঞ্জক শব্দের অপব্যবহার হয়, বড় অধিক; কথায় কথায় বিজ্ঞান ও সত্য শব্দ দুইটির অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। দোকানে দোকানে বৈজ্ঞানিক চা বিকায়, আর বিশেষ প্রয়োজনে অনেক দেশের প্রান্তে বৈজ্ঞানিক সীমান্ত (Scientific Frontier) সৃষ্ট হয়।

যেখানে এমন হয় যে, যে কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ধরিতে পারিবে যে অতখানি তাপে অমুক ধাতু গলিয়া যায়, শরীরের অমুক যন্ত্রের ক্রিয়ায় অমুক শক্তি বাড়ে, অথবা অমুক শ্রেণীর প্রবৃত্তির চঞ্চলতায় মানুষ ক্ষয়ের পথে ঝুঁকিয়া পড়ে, তবে অপরিবর্ত্তনীয় ও অপরিহার্য্য অবস্থার প্রত্যক্ষ সাক্ষীতে সত্যকে পাইতে পারে। যেখানেই সত্য বলিয়া আদৃত পদার্থের প্রকৃতি ও ক্রিয়া বুঝিতে পারা যায় না ও বুঝাইতে পারা যায় না, সেখানে তাহাকে সত্য বলিয়া মানিলে বুদ্ধি নিস্তেজ হয়,—জ্ঞানের চোখে ছানি পড়ে। বহু সম্প্রদায়ের পূজার দালানে এমন অনেক কঠোর সত্যের নুড়ি আছে, যাহা মাথার ঠোকার কাজে লাগা ছাড়া অন্য কাজে লাগে না। তবে বেশির ভাগ ধর্ম্মই নাকি পরলোকের জন্য, তাই ব্যবহারিক জীবনে অনেক সাধকেরাও নুড়ির আঘাত বাঁচাইয়া চলেন; সংসারে তেমন অনিষ্ট ঘটেনা। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির রেশারেশির আসরে যখন "সত্য" আসিয়া দেখা দেন, তখন সত্য হইয়া দাঁড়ায় কেবল হাতাহাতি।

যে ধীরতায়, স্থির বুদ্ধিতে, ও একাগ্র কৌতুহলে মানব সমাজের জীবনী শক্তির প্রকৃতি মতি, ও ক্রিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহা ছাড়িয়া দিয়া ভাব প্রবলতায় কোমর বাঁধিয়া দশের ভোট লইলে অবলম্বনীয় পন্থা পাওয়া যায় না। সত্য আবিষ্কারের ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যে কখনও কেহ উত্তেজিত আন্দোলনে, ঐ পদার্থটিকে পাইয়াছে। কোন একটা দুরবস্থা দেখিয়া উত্তেজিত হওয়া সহজ, আর সেই উত্তেজনায় মার্কস্ হইতে লেনিন্ পর্য্যন্ত ভাব-প্রধান উৎসাহী কর্ম্মীদের পথে চলিবার প্রবৃত্তির জন্ম হওয়াও স্বাভাবিক, কিন্তু জীবন বিজ্ঞানের (Biology) তথ্য ধরিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা কঠিন। যাহাতে সহজেই খানিকটা কোলাহল জাগে বলিয়া দ্রুত গতিতে কাজ চলিতেছে মনে হয়, তাহাকে নিজের নিজের বুদ্ধিতে কেহ কেহ অবলম্বনীয় করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে অপরিহার্য্য সত্য বলিয়া প্রচার করিলে ভিন্ন রকমের বুদ্ধির লোকদের প্রতি কেবল রাগ ও বিদ্বেষ জন্মে এবং পরবাদ সহিষ্ণুতা উড়িয়া গিয়া দলাদলির সৃষ্টি হয়। সত্যের নামের জিদে পড়িলে মানুষেরা নিয়তই অপরকে ভীরু, কপট ও স্বার্থপর বলিয়া গালি দিতে থাকে, এবং সে-গালি খাইয়া অপর পক্ষের লোকেদের মনে নিরুপদ্রব শান্তিরক্ষার প্রবৃত্তি জাগেনা। লোকে যদি সত্য সাধনার জাঁক ছাড়িত,—অর্থাৎ কি যুক্তিতে কি বুঝিয়াছে বলিত,—বড় বড় নামের দোহাই দিয়া মানুষকে ভড়্কাইতে চেষ্টা না করিত. তবে সত্য লাভ না হইলে ও মিথ্যা দ্বন্দের উৎপাত বাড়িতনা।

জীবন-বিজ্ঞানের তথ্য ধরিয়াই আমরা বনের গাছকে বাগানের গাছ করিয়া পুষ্টতর করিয়াছি, আর বনের পশুকে গৃহ পালিত করিয়া তাহাদের কার্য্যকারীতা বাড়াইয়াছি। মানুষের সমাজ যে অপরিহার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বাড়িয়াছে ও বাড়িতে পারে, তাহা না ধরিতে পারিলে, আমাদের ছট্‌ফটানির আবেগে কোন দুঃখ দূর হইবে না। ইতিহাসে দূর দেশের সামাজিক বিপ্লবের ফলের কথা পড়িয়া সকল সময়েই নিজের দেশের গতি নির্দ্দেশ করা চলে না; দোকানের সম্মুখে ষাঁড় দেখিয়াই ময়রার দোকান ঠিক করা চলে না। যাঁহারা নানা আন্দোলনের নেতা তাঁহারা হিতৈষণার প্ররোচনাতেই কাজ করিতেছেন, বিশ্বাস করি। হিতৈষণার প্রেরণা থাকিলেই যে কেহ যে কোন দুরবস্থার প্রতীকার করিতে পারে না; রোগচিকিৎসার উপায় জানা না থাকিলে, স্বয়ং মা. তাঁহার পীড়িত সন্তানের কোন উপকার করিতে পারেন না। আমরা যদি চাষের কাজ না জানি শ্রম-শিল্পের কাজে যদি অনভিজ্ঞ হই, স্বাস্থ্যরক্ষার পদ্ধতিতে যদি না শিখিয়া থাকি, তবে অকৃত্রিম উৎসাহে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া গ্রামে গ্রামে ছুটাছুটি করিলে, কাহারও একবিন্দু উপকার করিতে পারিব না; হিতৈষণার মত ভাল প্রবৃত্তির উত্তেজনাতেও কেবল পুড়িয়া মরিব। এদেশে ও বিদেশে যে অনেক আন্দোলন কেনই ব্যর্থ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বুঝিবার দিকে আন্দোলনের নেতাদের দৃষ্টি পড়ে না; নিজেদের পরাজিত অনুষ্ঠান যে যথার্থ পরাজিত হয় নাই, তাহাই তাঁহারা জোড়াতাড়া দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন। ইহার কারণ এই যে, নেতারা আপনাদের পন্থাকে ধ্রুব পন্থা বা অটুট সত্য বলিয়া ধরিয়াছিলেন, এবং পরাজয়ের সময়ে "সত্য" অপরাজিত থাকে মনে করিয়া মনের ধাঁধাঁয় সুপথ না খুঁজিয়া পরাজিত অবস্থাকে অপরাজিত বলিয়া কীর্ত্তন করিতে বসেন। আপনার বুদ্ধির চমককে সত্যের আলোক মনে করিয়া স্পর্দ্ধা করিলে—সত্যকে একটা কথার ধুয়ায় দাঁড় করাইলে, পুরাতনের পরাজয়ে নূতন জয় আসে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সঙ্গণিকা

গয়া কংগ্রেস

এবারকার কংগ্রেস গয়ায় সুসম্পন্ন হল। আতিথ্যের আয়োজন সম্বন্ধে এবার লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে শিখ আকালীরা শ্রদ্ধা এবং আদরের সঙ্গে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অতিথিদের সেবা সুসম্পন্ন করেছেন। অর্থের বিনিময়ে আহারের ব্যবস্থায় অর্থের প্রয়োজন সিদ্ধ হলেও, এই অতিথিসেবা আমাদের কাছে ভালই লেগেছে; কংগ্রেসকে সভার 'সভ্যতা' থেকে ভারতের জাতীয় উৎসবের আনন্দের মধ্যে কিছু পরিমাণে মুক্তি দিয়েছে।

অভিভাষণ

সভাপতির অভিভাষণে নানা কথার অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু রচনার বিস্তৃতি, ভাষার শক্তি, ভাবের স্পষ্টতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে তিনটী আলোচনার মধ্যে (১) কাউন্সিল প্রবেশ (২) শান্তি ও শৃঙ্খলা (৩) ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের বিস্তৃত বিচার। এই তিনটীতেই অভিভাষণের অর্দ্ধাঙ্গ পূর্ণ। সুতরাং স্বভাবতই মনে হতে পারে যে এই গুলিই অভিভাষণের প্রধান লক্ষ্য।

অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণের অধিকাংশই কাউন্সিল প্রবেশের বিষয় অবলম্বন করেই রচিত। বিষয়নির্ব্বাচন সংসদের কার্য্যাবলী থেকেও তাই মনে হয়।

অতএব গয়া কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য মনে হয় কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে মীমাংসা।

কাউনন্সিল ও অসহযোগ

কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে অন্যান্য নানা যুক্তির মধ্যে অসহযোগনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন যে কাউন্সিলে যে যাবে সে সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করবার জন্যই যাবে। সরকারের প্রত্যেক কার্য্যে বাধা দেওয়াই তার কাজ। উদ্দেশ্য কাউন্সিলকে অচল করা কিম্বা মনোমতভাবে তাকে গড়া। সুতরাং অসহযোগনীতির সঙ্গে এর কোনও বিরোধ নাই। আর সরকারের সহিত সম্পর্করহিত হয়ে যে অসহযোগ করা, অর্থাৎ সরকারের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বাইরে দাঁড়িয়ে যে বাধা সৃষ্টি করে তাকে অচল করে তোলা, সেটা হল পূর্ণ-অসহযোগের অবস্থা। বর্ত্তমানে অনুসৃত যাবতীয় অসহযোগানুষ্ঠান তারই অগ্রবর্ত্তী পন্থামাত্র, কাউন্সিল প্রবেশ তাদেরই অন্যতম। এখানেও মূলনীতির সঙ্গে বিরোধ নাই।

বিরোধ থাকুক বা না থাকুক, একটু পার্থক্য আছে।

অ-সহযোগ শব্দের দুটী অর্থ হয়, একটী সহযোগের অভাব-**মাত্র** ও দ্বিতীয়টী সহযোগের বিরুদ্ধাচরণ। প্রথমটীতে আমি যার সঙ্গে অসহযোগ করি, তার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত বা indifferent থাকি। তার কাজে আমার লাভ কিম্বা ক্ষতি দুইই হতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি ভাবি না এই জন্য যে সে ব্যক্তিটিই আমার চিন্তারাজ্যের বা interest এর বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার শিক্ষা, দীক্ষা, নীতি, চরিত্র সমস্তই আমার কাছে, তখন alien। তখন যে বিরোধের সৃষ্টি হয় সেটা আমি বাধা বলে নয়, আমার সহযোগের অভাবের জন্য বা তার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাই। রিফর্মড্ কাউন্সিল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল লাহোরে যে অসহযোগ মন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করেন, আগাগোড়া ব্রিটিশশাসন সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যে-অসহযোগব্রত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষ কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে যাকে স্বীকার করেছেন ও সাধনা করছেন এ হল সেই অসহযোগ।

কিন্তু অসহযোগের আর একটী মূর্ত্তি আছে। সেটা বাধা **দেওয়া**; কিন্তু সেই

বাধা দেবার পূর্ব্বে যাকে বাধা দিই তাকে স্বীকার করে নেই। ক্রোধের দ্বারা হোক, অভিমানের দ্বারা হোক, ঘৃণার দ্বারা হোক্‌, ভালবাসার দ্বারা হোক্‌, তাকে,—সুতরাং তার কার্য্য, প্রণালী, রীতি সমস্তকেই নিজের মনের মধ্যে স্বীকার করে নিই। চিত্তরঞ্জনের যে—কাউন্সিলে—অসহযোগ সে হল এই। ইংরাজের প্রবর্ত্তিত নিয়মতন্ত্রতাকে যদি আইনের ব্যভিচারের (Rule of *bad* laws) উপর প্রতিষ্ঠিত ধরে নিয়ে তাকে লুপ্ত বা পরিবর্ত্তিত করবার উদ্দেশ্যে বাধা দিতে অগ্রসর হই, তবে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে তার কাছে আইনের সঙ্গতি (Rule of law) আশা করি অথবা দাবী করি। সুতরাং সুনিয়মই চাই কিম্বা কুনিয়মকেই ভাঙি তার অন্তরালে এই সত্য জাগ্রত থাকে যে নিয়ামক ইংরাজকে নিয়ন্তা বলেই স্বীকার করলাম।

এই দুইএর মধ্যে একটি স্থানে একটুখানি সামঞ্জস্য আছে। অসহযোগের মধ্যে সহযোগের কথা যেখানে, সেখানে সে অভাবাত্মক। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে একটি মস্ত বড় হাঁ বা স্বীকারোক্তি আছে। **তাকে** মন থেকে দূর করে দিচ্ছি বা বাধা দিচ্ছি কেন? **আমাকে** পাবার জন্য। আমার জানার পথে সে জাগ্রত মায়ারূপে, বাধারূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে৷ তাই মহাত্মা গান্ধী এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সেই **আমিকে** স্বীকার করেছেন,—জাতীয় আদর্শের মধ্যে যাকে কল্পনা করা যায় স্বরাজ বলে, বাস্তবক্ষেত্রে যাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায় ব্যক্তি বা individualএর মধ্যে। সুতরাং এই ব্যক্তি বা স্বরাজকে জীবনে সত্যভাবে স্বীকার ও সাধনা করবার পর তখন মানুষ তার জন্য স্বীকার-না-করেও অন্যকে বাধা দিতে অগ্রসর হতে পারে। কারণ তখন তার বাণী বাধামাত্র নয়, তার স্বীকৃত সত্যে মিলবার জন্য আমার প্রতি আহ্বান।

সুতরাং আজ কোনও অসহযোগীর কাউন্সিলে যাবার আগে বোঝা প্রয়োজন যে ইংরাজের-নিয়মতন্ত্রের-অতিরিক্ত জাতীয়-জীবনে-অধিষ্ঠিত কোনও স্বাধীন-সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি, না শুধুই বাধা দিতে যাচ্ছি। যদি বাধা দেওয়াই উদ্দেশ্য হয় তবে একথা যেন সঙ্গে সঙ্গে না ভুলি যে প্রবর্ত্তিত নিয়ম সুনিয়ম হউক, নিয়ামক ইংরাজকে আমার চেয়ে বড়, আমার প্রভু, কর্ত্তা বলে স্বীকার করেই যাচ্ছি। স্বরাজ্য ও গোষ্ঠী সাধনে (village integration) দেশ যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে কিনা, নিজেদের জীবনে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিশ্বাস যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে কি না এবং স্বাধীন বিশ্বাসকে যত বড় পরীক্ষার এবং দায়ীত্বের মধ্যে নিয়ে চলেছি তার উপযুক্ত গুরুত্ব উপলব্ধি হয়েছে কিনা, যাঁরা কাউন্সিলে যেতে চান, এ কথার শ্রেষ্ঠ বিচারক তাঁরাই। দেশ এ বিষয়ে বাধা দিতে পারেন না, সম্মতি দেওয়ারও কোন অর্থ নেই। দেশের কাছে তাঁদের এবং পৃথিবীর কাছে দায়িত্ব বোধটুকুই তাঁদের মধ্যে আশা করা যায়। তাঁদের আচরণের সত্য, সাধনার দ্বারা প্রতিষ্ঠা হবার পূর্ব্বে কংগ্রেস তাকে স্বীকার করলে দেশের কাছে তার দায়িত্ব খর্ব্ব হয়। অসহযোগ ব্রত সত্যাগ্রহ মন্ত্র দ্বারা পূত হবার পর দেশ তাকে জাতীয় সাধনা বলে গ্রহণ করেছে। গয়ার নিখিল-ভারত জাতীয়-মহাসভা কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাবকে বর্জ্জন করে **তাঁদের** কর্ত্তব্য করেছেন।

চরকা ও খদ্দর

সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ যাকে তাঁর "আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" মনে করেন সেই "খদ্দর দ্বারা স্বরাজ লাভ কিরূপে সম্ভব হইবে" এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন কেবল এক অর্থে ইহা সত্য হতে পারে। যদি খদ্দরকে স্বাজের বাহিরের চিহ্ন (Symbol) বলে গ্রহণ করি।

ইহারি মধ্যে সত্য আছে। সভাপতি যা বলেছেন তার চেয়ে গভীরতর অর্থ এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। অহযোগ প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধী চরকা ও স্বরাজে অধিক প্রভেদ বুঝিতেন না। কেন? আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি জীবনের নানা একান্ত প্রয়োজনগুলির

(bare necessities) মধ্যে কোনও একটা বৃহৎ জাতীয়-বিভাগে (department) আত্মনির্ভরশীলতাকে জাগ্রত করে, এইটুকুতেই চরকার সার্থকতা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী মূলগত অর্থ (Fundamental Significance) এই চরকা প্রচারের মধ্যে নিহিত আছে।

যুক্তির দ্বারা হোক্ বা বঙ্গদেশের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস আলোচনার জ্ঞানপ্রসূতই হোক্, অথবা প্রত্যক্ষভাবে এদেশের অবস্থার সঙ্গে পরিচয়ের জন্যই হোক্, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ কর্ম্মীরা স্বরাজের ভিত্তিস্বরূপ যে ব্যক্তিতত্ত্বে এসে পৌঁছেছেন, তার ভৌতিক-সত্তার অর্থাৎ ৩৬ কোটি ভারতবাসীর প্রত্যকটী দেহধারী মানুষের কাছে (শুধু শিক্ষিত বা ভদ্র সম্প্রদায় নয়) যে কোনও বাণী বা উদ্দেশ্য নিয়ে পৌঁছিবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় ও উপলক্ষ্য—চরকা। পুস্তক, সংবাদপত্র, সচিত্র বক্তৃতা কোনটীই এদেশে উপযুক্ত বা যথেষ্ট নয়। মহাত্মা গান্ধী সেই জন্যই individual এর উপর অতখানি জোর দিয়াছিলেন। এই চরকা শুধু 'বাইরের চিহ্নমাত্র' নয়। ব্যক্তি সাধনার মূল্য ছাড়িয়া দিলেও, ইহা paractical *Indian* politics এর ভিত্তি।

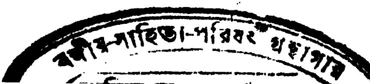
অর্থনীতির দিক থেকেও চরকা-ও-খদ্দরকে অসম্ভাব্য বলে হাল ছাড়বার পূর্ব্বে একবার বর্ত্তমান জাপানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ভাল। তারা কুটিরশিল্প বা Cottage Industry গুলিকে সমবায়নিয়মে চালাবার দিকে চলেছে। পৃথিবীর অন্যত্রও, কৃষি হতে আরম্ভ করে নানা শিল্পকেই বৃহতের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিত্তির উপর স্থাপিত করার দিকে মানসগতি চলেছে। এই দেশও সে বিষয়ে সজাগ হলে গোষ্ঠী বা village integration এর বাস্তব ও স্বাধীন সহায়ত্বার 'ব্যবসা' না করেও খদ্দর বাঁচতে পারে, 'বিদেশী বণিকগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মধ্যে না গিয়েও চরকা অর্থনীতির হিসাবে টিকতে পারে, এবং তার চেয়েও বড় কথা যা, অর্থাৎ স্বরাজ,—তথা—গোষ্ঠীচৈতন্যের মূলকেন্দ্র বা nucleus গঠনের প্রধানতম সহায় হতে পারে।

মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য রাজনীতিতে নয়। রাষ্ট্রনীতিতে আসবার পূর্ব্বে তিনি Servant of India Societyর কর্ম্মী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের শিক্ষক ও সবরমতী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। আজ তাঁর অনুপস্থিতে ভারতবর্ষের মধ্যে কোন্ ভৌগলিক বিন্দুতে দেশের কাজ আরম্ভ করা স্বরাজকামীর পক্ষে শ্রেয়ঃতম—কাউন্সিলে কিম্বা অন্যত্র—সে কথা যিনি সাধু তিনিই সন্ধান বলতে পারবেন।

* * * * * *

১৯২১এর আমেদাবাদ কংগ্রেসে ভলান্টিয়ার সংগঠনপ্রস্তাব উপস্থিত করার প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী এক জায়গায় বলছেন,—"and if there is any authority in this country that wants to curb the freedom of speech and freedom of association, I want to be able to say in your name, from this paltform that that authority will perish, unless it repents before an India that is steeled with courage, noble purpose and determination, even if every one of the men and women who chose to call themselves Indians is blotted out of the earth." বাইরের কর্ত্তাকে বাধা দিয়ে নয় তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে যে সোজা হয়ে নিজের পায়ে নিজে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে, এ রকম কথা শুধু তখনই তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হওয়া সম্ভব হয়।

সেই সময়ে জনশ্রুত Round-Table Conference সম্বন্ধে বলছেন "there is evry chance for him (বড়লাট) to hold a Round Table Conference, but it must be a real conference. If he wants a conference at a table, where only equals are to sit and where there is not to be a single *beggar* then there is an open door and that door will always remain open." কাউন্সিল-কামীরা Reformed Councilকে কি এমনিতর Round-Table বলে ভাবতে পারেন? যে করজোড়ে যাজ্ঞা করে সে *beggar* আর যে ঝগড়া করে সে নয় কি?





নব্যভারত

চত্বারিংশ খণ্ড] ফাল্গুন, ১৩২৯ ১১শ সংখ্যা

দুঃখ কে চায় ?

মানব মাত্রেই দুঃখ শোক দারিদ্র্য বিপদ অভাব অভিযোগের তাড়নায় অধীর। এ পৃথিবীতে আসিয়া এ সকলের একটা না একটা যে জীবনের সঙ্গী হইবে ইহা সুনিশ্চিত। দেহী হইয়া যে এ সকলের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে একথা কেহ আশাও করে না। দুঃখ, শোক, দারিদ্র্য, বিপদ মানুষের নিত্য সহচর। বিধাতা মানুষকে এমন আশ্চর্য্য প্রকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যে জীবনে শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও মানুষ জীবনের প্রতি মমতাহীন হয় না, এবং দীন দুঃখীর প্রাণেও অন্তঃসলিলা নদীর মত একটী প্রচ্ছন্ন সুখের ধারা বহিতে থাকে। ইহা এক গভীর রহস্য। কিন্তু একান্তে বসিয়া মানব জীবনের দুঃখ কষ্টের বিষয় চিন্তা করিলে প্রাণ একেবারে আকুল হইয়া উঠে। তখন এ সংসারকে কি ভীষণ স্থান বলিয়া মনে হয়। যেন অভাগা মানবজাতিকে ভস্ম করিবার জন্য ভীষণ অগ্নি দিবানিশি জ্বলিতেছে। তখন ব্যাকুল হইয়া চিত্ত একথা বলিয়া উঠে, ভগবানের অসীম করুণার কথা বলিয়া ভক্ত যে বিগলিত হন, এই কি বিশ্বস্রষ্টার দয়া! তিনি ক্ষুদ্র মানুষের দুর্ব্বল স্কন্ধে যে ভীষণ দুঃখ কষ্টের বোঝা চাপাইয়াছেন, মানুষের প্রাণ তাহাতে যে নিষ্পেষিত হইয়া গেল।

মানবজাতির দুঃখ কষ্টের চিন্তায় ভগবান বুদ্ধ সুখের সংসার, রাজ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। মানবের দুঃখ কষ্টের প্রতিকার কি, এই চিন্তায় তিনি দেহ মন প্রাণ দিয়া কি কঠোর তপস্যাই না করিয়াছিলেন। এত বড় প্রাণ লইয়া ত কেহ জগতে আসে নাই, আর মানুষের জন্য এত কষ্টও কেহ কখন স্বীকার করে নাই। দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনার পর বুদ্ধের প্রাণে এ প্রশ্নের কি উত্তর আসিল? না—বাসনা বিলয়—। মানব চিত্তের বাসনা বলিয়া যে সামগ্রীটী আছে তাহাই জীবনের সকল দুঃখ কষ্টের মূল কারণ। যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে বাসনাই যে তাহার মূল সে সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। মানুষ যাহা চায় তাহা না পাইলেই তাহার দুঃখ। আমরা এ সংসারে চাই কি? প্রথমেই শরীর রক্ষার জন্য আহার চাই, জীবন ধারণের নানা উপকরণ চাই, এ সম্বন্ধে যার মনের বাসনা যেরূপ, অভাবে তার দুঃখেরও পরিমাণও সেইরূপ। যে দিনান্তে শাকান্নে তুষ্ট, সে তাহা পাইলেই সুখী, রাজভোগ সে পায় না বলিয়া তাহার কোন ক্ষোভ নাই। এ সম্বন্ধে যার আশা উচ্চ তার দুঃখ ভোগও

সেইরূপ তীব্র হইয়া উঠে। রাজ ভোগে যাহার আকাঙ্ক্ষা তাহাকে বাধ্য হইয়া শাকান্ন খাইতে হইলে তাহার কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না। আহার বিহারের লালসার উপর প্রেমের পিপাসা, ইহাও মানবের আজন্মের বাসনা। ভালবাসা না পাইলে মানুষ অসুখী। যাদের উন্নত প্রকৃতি তাঁদের জ্ঞান লাভের বাসনা প্রাণে প্রবল। ধর্ম্মও অনেকের নিকট অভীপ্সিত বস্তু। বলিতে কি বাসনাই আমাদের জীবনের রাজা হইয়া বসিয়া আছে। বাসনার রাক্ষসী ক্ষুধার কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। প্রাণ কেবল চায়। এমন করিয়া চায় যেন ইহাই আমাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি বলিয়া মনে হয়। যেন চাহিতেই হইবে, না চাহিয়া উপায় নাই। ভগবান বুদ্ধ অন্তরের গভীর প্রদেশে নিমগ্ন হইয়া মানবের দুঃখ কষ্টের কারণ এই রাক্ষসী বাসনাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। বুদ্ধ দৌড়িয়া মানব সমাজে গিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "মূঢ় মানব! তোমরা বাসনার অধীন হইয়া জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছ, একবার বাসনা বিলয়ের সাধনায় প্রবৃত্ত হও, দেখিবে আর কোন দুঃখ থাকিবে না"। মানুষদের বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমরা পার্থিব সকল বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বিহীন হও, যে ধন চায় না, দারিদ্র্যে তাহার কিসের ভয়? না চাহিলেই সুখ শান্তি স্ববশ হয়"। কথাটা গভীর সত্য তাহাতে আর সংশয় নাই। এই বাসনা বিলয় হইতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা স্তব স্তুতির কথাও বুদ্ধের মতে স্থান পাইল না, এমন কি বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতর কঠোর বৈরাগ্য সাধনেরও ব্যবস্থা রহিল না। বুধশ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেব অযৌক্তিক কথা বলেন নাই। তিনি বাসনা বিলয়-রূপ শূন্যতা প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। শূন্যতা, নিষ্ক্রিয় ভাব মানুষের প্রাণকে পূর্ণ করিতে পারে না, সুখ শান্তি দিতে পারে না—সুতরাং শূন্যতাকে পূর্ণ করিবার জন্য বুদ্ধদেব বাসনা বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বভূতে মৈত্রী প্রচার করিলেন। এ ত শূন্যতা নয়, এ যে পূর্ণতা। কিছুই চাহিব না ত করিব কি? কিছুই করিব না ত রহিল কি? মানব প্রকৃতির পক্ষে এমন অবস্থা সম্ভবপর নয়। বুদ্ধদেব শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা দিলেন—সকল জীবকে ভালবাস, সকলের সেবায় প্রবৃত্ত হও। "সর্ব্বভূতে মৈত্রী"—ইহা বড় উচ্চ কথা, এই ভূতের ভিতর কেবল মানব জাতি নয় সকল প্রকার প্রাণই বুদ্ধের প্রেমে ধরা পড়িল। মানব হৃদয়ের প্রেমের প্রসারে, জগত ছাইয়া গেল। ভালবাসা বলিলে লঘু ভাবে বলা হয়—ভালবাসার উপর মৈত্রীর স্থান। ভালবাসার ভিতর সুখেচ্ছা প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া আছে কিন্তু মৈত্রী স্বার্থশূন্য নিষ্কামপ্রেম। এ ভাবকে মানবীয় না বলিয়া দেবোচিত বলিতে ইচ্ছা হয়। বুদ্ধ নিখিলের প্রতি এই মৈত্রী প্রচার করিলেন, ইহার বড় কথা জগতে আর নাই। এখন প্রশ্ন এই নিখিলের প্রতি মৈত্রী কাহার পক্ষে সম্ভব?

বুদ্ধ অতি বড় কথা বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু দুঃখ শোকের প্রকৃত মহৌষধির গূঢ় সঙ্কেতটী বলিয়া দিয়া যান নাই। শোকের ভিতর শান্তির নির্ঝর যে প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া আছে সে সন্ধান কয়জন পাইয়াছে? যে বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন আপনার প্রাণে অনুভব করে, যে আপনাকে বিশ্বপিতার প্রেমালিঙ্গন পাশে বদ্ধ বলিয়া মনে করে, তাহার নিকট দুঃখ শোক আর এক রূপ ধারণ করিয়াছে। সে জানে দুঃখ কষ্ট কিছুই অর্থহীন নহে। দুঃখ শোক, মোহ মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, যাহা আছে তাহা নাই বলিয়া লাভ কি? কিন্তু প্রকৃত

পন্থা কি ? দুঃখ শোককে মোহ মায়া না বলিয়া আমাদেরই জন্য বিশ্বজননীর বিধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। সন্তান যেমন মায়ের ভালবাসার উপর কখন সন্দিহান হয় না—সে হস্ত যখন প্রহার করে তখন সন্তান কাঁদিতে কাঁদিতে মার কোলেই ছুটিয়া যায় এবং সেই বুকেই মুখ লুকাইয়া কাঁদে, কারণ সান্ত্বনা আর কেহই দিতে পারে না, সন্তানের জুড়াইবার স্থান জগতে আর কোথায়ও নাই। তেমনি আমাদের ন্যায় ত্রিতাপদগ্ধ জীবেরও জুড়াইবার স্থান আর নাই। মা ভালবাসেন বলিয়া শাসন করেন। বিশ্বাসী যখন সংসারের দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া মার প্রেমস্পর্শ অনুভব করেন তখন শান্তিতে তাঁর প্রাণ পূর্ণ হয় এবং এই দেখি—ভক্ত দুঃখ কষ্টকে পরম কল্যাণকর বলিয়া, তাহাকে দূরে নিক্ষেপ না করিয়া, আদর করিয়া গ্রহণ করেন। দুঃখ কষ্টের ভিতরই মানব প্রকৃতির যথার্থ পরীক্ষা হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনের যথার্থ পরিণতির অবস্থায় এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অতি আশ্চর্য্য অবস্থা।

ভক্ত কবি গাহিয়াছেন :—

দুখের বেশে এসেছ বলে' তোমায় নাহি ডরিব হে
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরব হে।

আবার গাহিয়াছেন গান,

এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো,
এম্‌নি করে' হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।

কবি শিবনাথ বলিয়াছেন,

জীবন আকাশ বিপদ দুর্দ্দিনে
ঘেরিয়া আমার হোক অন্ধকার ;
সব কষ্ট সয়ে রব স্থির হয়ে
কে পায় পৌরুষ দুঃখ কষ্ট বিনা
ঘুমায়ে মানুষ কে হয়েছে কোথা।

ভক্ত ভিন্ন এমন করিয়া দুঃখকে আহ্বান কে করিতে পারে ? প্রাণ দুঃখের দহনে জ্বলিয়া সুগন্ধ বিস্তার করে কার ? ভক্তের সুন্দর উপাদানে গঠিত যে হৃদয় তাহা জ্বলিলে সৌরভ বিস্তার করে। সামান্য কাঠ পুড়িলে ছাই হয়। সোণা পোড়াইলে উজ্জ্বল হয়, কয়লা পুড়িলে ছাই হয়। জীবনে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি যে পায় নাই, তার নিকট দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য, রোগশোকের বিভীষিকা বড় ভয়ানক ; তাহার প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে—শান্তি

কোথায়ও নাই, সান্ত্বনা কেহই দিতে পারে না। দুঃখ শোকের তীব্রতা ব্যক্তিবিশেষের জীবনে কিরূপ ভাবে কার্য্য করে তাহা আমরা কখন কখন দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি। ইংলণ্ডের রাজা পুত্রের জলমগ্ন হইবার কথা শুনিয়া এরূপ গভীর শোকে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন যে জীবনে কেহ তাঁহাকে আর হাসিতে দেখে নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্ম এ জীবনে আর সে তীব্র যাতনা ভুলিতে পারেন নই। শোকে কত লোক প্রাণ দিয়াছে তাহার গণনা হয় না, কত লোক ক্ষিপ্ত হইয় গিয়াছে, যাহা জীবনে অহরহঃ দেখিতে পাই তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

দুঃখ শোকে মানুষ বিচলিত হবে না একথা বলি না, কিন্তু বিশ্বাসীর জীবনে দুঃখ শোক কি ভাবে কার্য্য করে তাহা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ বড় দুর্লভ। এবং বিশ্বাসীর ন্যায় দুঃখ শোককে শান্তভাবে গ্রহণ করা কত কঠিন সাধন। যে ভক্ত কবি দুঃখ কষ্ট শোককে আকাঙ্খা করিয়াছেন, আদর করিয়া ডাকিয়াছেন তাঁর আধ্যাত্মিক গভীরতা কতখানি তাহা আমাদের চিন্তার বিষয়।

আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে,

বলিয়া আনন্দ ও আশার সঙ্গে গান গাহিয়া উঠা কি বড় সহজ ব্যাপার! গাহিলেই চিত্তের এ অবস্থা লাভ করা যায় না। ইহা গভীর সাধন সাপেক্ষ। দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া প্রেমের গাঢ় আলিঙ্গন লাভ করিবার লোভে ইঁহারা লোলুপ। এই প্রেমের স্পর্শ এমন স্পৃহনীয় যে দুঃখ কষ্ট তার নিকট তুচ্ছ, কেবল তুচ্ছ নয়, একটা প্রলোভনের সামগ্রী। কেন না, সন্তান জানে প্রহারের পরেই মার বুকে মাথা রাখিবার দুর্লভ সুযোগ মিলিবে। এ যে কি যোগ—তাহা বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম। প্রাণ খুলে যিনি বলতে পারেন "বজ্রে তোল আগুন করে আমার যত কালো" তাঁর আধ্যাত্মিক গভীরতার কথা ভাবিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ শোকের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তাঁহার হাতে পড়িয়া আর তাহাদের আঘাত করিবার ক্ষমতা নাই এবং তিনি তাহাদের পরম বন্ধু বলিয়া আদর করিয়া ডাকিয়াছেন। বেদনা তাঁরই দান, বেদনা আর কিছু নয়, তাঁরই স্পর্শ,—তাইত কবি গাহিয়াছেন—

আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া
এলে তোমার সুর মেলিয়া
এলে আমার জীবনে।

তাইত ব্যথা আর ব্যথা নয়। ব্যথার ভিতরই কবি তাঁহার প্রেমাস্পদের স্পর্শ পাইয়াছেন।

দিয়ে দুঃখসুখের বেদনা
আমায় তোমার সাধনা।

ভগবান যে এমনি করিয়াই সুখ দুঃখ দিয়া, আমাদের চাহিতেছেন তাহা কবি নিজের অভিজ্ঞতায় বলিয়াছেন। ভক্ত কবি না হইলে এমন করিয়া জীবনের সুখ দুঃখ দিয়া গান কে করিতে পারে?

মানব জীবনের দুঃখ শোককে মায়াবাদী মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলেন—তাঁহাদের মুখে শুনিলাম—

কাতবকান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারয়োহয়মতীববিচিত্রঃ

তপোবনে বুদ্ধ নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন বাসনা বিলয়, সর্ব্বভূতে মৈত্রী, হইল মানব জীবনের সকল প্রকার দুঃখ শোকের মহৌষধি। আর ভক্ত কবি বলিলেন—দুঃখ শোকে যাতনায় মানুষ তুমি ক্রন্দন করিও না, ওযে তোমার প্রেমাস্পদের স্পর্শ। ওযে কল্যাণের পথ, তোমায় ব্যথা দিয়া জননী তোমায় তাঁর মনের মত করিয়া লইতেছেন। তুমি যে এবার সুন্দর হবে, তুমি যে কমনীয় হবে, তুমি যে পবিত্র হবে, তুমি যে শুভ্র হবে, তোমার জীবন যে প্রসাদী ফুলের ন্যায় দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত হবে, তুমি এ দান প্রত্যাহার কোরো না—এই বার প্রেমাস্পদের সঙ্গে যুক্ত হও। জীবনের দুঃখ শোকের এমন সমন্বয় যিনি করিয়াছেন, তিনি আমার নমস্য।

শ্রীহেমলতা সরকার।

অ্যাস্‌টন্‌

১৯২১ খৃঃ অঃ রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল্‌ প্রাইজ্‌ পাইয়াছেন, ই, এফ্‌ অ্যাস্‌টন্‌।

ইঁহার এবং ইঁহার কাযের পরিচয় দেওয়ার পূর্ব্বে দুই একটী অবান্তর কথার অবতারণা করিতে হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সম্ভবতঃ আরও অনেক ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই একটি অদ্ভুত নিয়ম আছে। তাহার মধ্যে একটি নিয়ম হইতেছে এই যে, যে সমস্ত বিদ্যার্থিগণ দুর্ভাগ্যক্রমে এম্‌-এ পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হন তাঁহারা তখন হইতেই মার্কামারা হইয়া যান। তাঁহাদের পক্ষে "ডাক্তার" উপাধির জন্য প্রস্তুত হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাঁহারা স্থান লাভ করেন তাঁহারা শুধু মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করিলেই এবং গবেষণা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেই "ডাক্তার" উপাধি পাইতে পারেন। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর এম্‌-এর মৌলিক গবেষণা খুব ভাল হইলেও তাঁহাদিগকে, সাধারণ পরীক্ষার্থীদের ন্যায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষার বিভীষিকাবশতঃ অনেক তৃতীয় শ্রেণীর এম্‌-এ কেই "ডাক্তার" উপাধিলাভের আশা বিসর্জ্জন দিতে হয়। অথচ, নাম করার দরকার নাই, এইরকম দুই একজন তৃতীয় শ্রেণীর এম্‌-এ, পরে এত অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছেন যে অনেক প্রথম শ্রেণীর এম্‌-এ, তাঁহাদের পেন্সিল্‌ কাটিয়া দিবারও যোগ্য নন্‌।

এখন অ্যাস্‌টন্‌ এর কথা বলিতেছি। ইঁহার ছাত্রাবস্থার সময় কেহ কোন দিন বোধ হয় কল্পনাও করিতে পারিতেন না যে ইনি একদিন নোবেল্‌ প্রাইজের অধিকারী হইবেন। ক্যাম্‌ব্রিজের বি-এ, পরীক্ষায় পদার্থ বিদ্যায় ইনি তিন চারি বার অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

পরে সেফিল্ড্ বা বার্মিংহাম, এইরূপ, ছোট খাট কোন বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কোন মতে পাশ করেন। পাশ করিয়া ১৯০৫ সন হইতে ক্যাম্‌ব্রিজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক জে, জে, টম্‌সনের অধীনে পদার্থবিদ্যায় কাজ করিতে আরম্ভ করেন। যাঁহারা ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজন বর্ত্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন Aston has no brains he works with the brains of J. J. Thompson. He is only a fine mechanic. অর্থাৎ অ্যাস্টনের মাথা নাই, তিনি কেবল জে, জে টমসনের বুদ্ধিতে চলেন। এস্টন্ একজন নিপুণ কারিগর মাত্র।

কথাটা অতিরঞ্জিত নহে। কারণ ঐ রকম কথাই বর্ত্তমান লেখক আরও তিন চারি জায়গা হইতে শুনিয়াছেন। দেখা যাউক্ কি করিয়া এই রকম অতি সাধারণ শ্রেণীর লোক বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইয়াছেন।

পরমাণুবাদের কথা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে জানেন। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক্ ও হিন্দু দার্শনিকগণ মত প্রচার করেন যে পদার্থকে যদি ক্রমাগত ভাগ করা যায় তাহা হইলে পরিশেষে তাহারা এমন সূক্ষ্মভাগে উপনীত হয় যে তাহার পরে আর ভাগ চলেনা। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকেই পরমাণু বলে।

উনবিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ড্যালটন্ (Dalton) প্রমাণ করেন যে সমস্ত জড় জগৎ কতকগুলি (৯২) বিভিন্ন প্রকারের পরমাণুর সংগঠনে নির্ম্মিত। এই ৯২টী পরমাণুর প্রত্যেক পরমাণুর এক একটি নির্দ্দিষ্ট ওজন আছে। হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজন সব চেয়ে কম। ইহার ওজনকে যদি ১ ধরা হয় তাহা হইলে কার্ব্বনের পরমাণুর ওজন ১২, সোডিয়ামের পরমাণুর ওজন ২৩। তাম্র পরমাণুর ওজন ৬৩। সুবর্ণের পরমাণুর ওজন ১৯৭ এবং ইউরেনিয়ামের পরমাণুর ওজন ২৩৮। ইহার চেয়ে বেশী ওজনের পরমাণু আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পাঠক মনে রাখিবেন, এই যে পরমাণুর ওজন উপরে বলা হইল ইহা কাহারও মস্তিষ্ক কল্পিত নহে। যন্ত্রশালায় অকাট্য পরীক্ষা দ্বারা এই সমস্ত ওজন নিরূপিত হইয়াছে। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস ছিল যে পরমাণুর ওজন কখনও পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যেমন সোডিয়ম্ পরমাণু,—সাধারণ লবণে পাওয়া যায়, অনেক রকম খনিজ প্রস্তরেও পাওয়া যায় এবং জীবদেহেও পাওয়া যায়, জলজ উদ্ভিদেও পাওয়া যায়, যেখান হইতে আমি সোডিয়াম্ আহরণ করি না কেন, উহার পরমাণুর ওজন সর্ব্বত্রই ঠিক মিলিয়া যাইবে। খনিজ প্রস্তর হইতে প্রাপ্ত সোডিয়াম্ পরমাণু এবং জীবদেহ হইতে প্রাপ্ত সোডিয়াম পরমাণু ওজনে ঠিক সমান। একলক্ষ ভাগের এক ভাগও এদিক ওদিক নয়।

ড্যালটনের সমসাময়িক প্রাউট্ (Prout) নামক এক বৈজ্ঞানিক একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে মানিয়া লইলাম এই রকম বিভিন্ন পরমাণু আছে। কিন্তু খুব সম্ভবত এই সমস্ত পরমাণু এক বা দুই রকম আদিম বা মূল পরমাণুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন। তিনি প্রথমত বলিলেন হাইড্রোজেনের পরমাণুই মূল পরমাণু। কতকগুলি হাইড্রোজেনের পরমাণু ঘনীভূত হইলে অন্যবিধ পরমাণুর সৃষ্টি হয়। যেমন কার্ব্বন্ পরমাণুর গুরুত্ব ১২। প্রাউট্ বলেন ১২টি হাইড্রোজেনের পরমাণু ঘনীভূত হইলে একটি কার্ব্বনের পরমাণুর উৎপত্তি

হয়। সোডিয়ামের পরমাণুর ওজন ২৩। ২৩টি হাইড্রোজেনের পরমাণু ঘনীভূত হইলে একটি সোডিয়ামের পরমাণু উৎপন্ন হয়।

প্রাউটের মতবাদ ঠিক হইলে সমস্ত পরমাণুর ওজনই অখণ্ডরাশি হইবে। এই অনুমান ঠিক কিনা সহজেই মীমাংসা করা যাইতে পারে। যদি পরীক্ষা প্রমাণে দেখা যায় যে কোনও পরমাণুর ওজন অখণ্ডরাশি নয় তাহা হইলে প্রাউটের উপপত্তিকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক ডুমা (Dumas) এবং বেলজিয়ামের ষ্টাস্‌ (Stas), এই দুইজন সমস্ত পরমাণুর ওজন মাপিতে বসিলেন। দেখা গেল ক্লোরিণের পরমাণুর ওজন ৩৫.৫। সুতরাং প্রাউটের উপপত্তি আর টিঁকিতে পারে না। প্রাউট্‌ বলিলেন যে তাহা হইলে হাইড্রোজেন পরমাণুই মূলপরমাণু নয়। ইহা দুইটী অর্দ্ধ হাইড্রোজেন পরমাণুর মিশ্রণে উৎপন্ন। অর্দ্ধ হাইড্রোজেন পরমাণুই মূল পরমাণু। বেশ কথা। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ নাছোড়বান্দা। তাঁহারা দেখাইলেন যে অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ঠিক ১৬ নয়,—১৫.৯৮ এবং অধিকাংশ পরমাণুর ওজনই অখণ্ডরাশি মোটেই নয় বা অখণ্ডরাশি + .৫ও নয়। সুতরাং প্রাউটের উপপত্তি মোটেই খাটিতে পারে না।

পঞ্চাশ বৎসরের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রাউটের উপপত্তিকে কবর দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। পরমাণুর ওজন নির্দ্দিষ্ট এবং অপরিবর্ত্তনীয়। সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের পরমাণুর ওজন বাহির করা বৈজ্ঞানিকদের একটা মস্ত কাজ হইয়া উঠিল। এ জন্য মস্ত আন্তর্জাতিক সভা বসিল। আমেরিকা, জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, ইটালী, ইংলণ্ড প্রভৃতি সমস্ত দেশের বৈজ্ঞানিকগণ মিলিত হইয়া সমবেতভাবে বিভিন্ন প্রকারের পরমাণুর ওজন বাহির করিতে যত্নবান হইলেন। কেহ পরীক্ষা করিয়া দুই দশমিক পর্য্যন্ত ওজন ঠিক করিলেন। তাহার পরবর্ত্তীরা উহা তিন দশমিক স্থান পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া বাহির করিতে চেষ্টিত হইলেন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য রকম। এখন দেখা যাইতেছে যে এই যে এত সূক্ষ্ম কাজ,—তিন দশমিক স্থান পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া পরমাণুর ওজন ঠিক করা, এ সমস্তই প্রায় নিষ্ফল শ্রম; কেন, বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক পরমাণুর একটা বিশিষ্ট ওজন আছে। সেই ওজন উল্লেখ করিলেই পরমাণুটীকে চেনা যায়। যেমন কোনও খনিজ দ্রব্য হইতে একটি গ্যাস্‌ পাইলাম যাহার পারমাণবিক ওজন ১৬, আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করিতে পারি এই গ্যাস্‌ অক্সিজেন (Oxygen) ব্যতীত আর কিছুই নয়। মনে করিয়া লই, আর এক রকম পরমাণু পাইলাম যাহার ওজন ৩৫.৫, আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে এই গ্যাস্‌ ক্লোরিন্‌ (Chlorin) ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে জে, জে, টম্‌সন্‌ এবং রাদারফোর্ড্‌ প্রমাণ করিয়াছেন যে পরমাণুই পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ নয়। সমস্ত পরমাণুই যোগতড়িতের পরমাণু, "প্রোটন্‌" এবং বিয়োগতড়িতের পরমাণু "ইলেক্‌ট্রন", ইহাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইলেক্‌ট্রনের ওজন ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু প্রোটনের ওজন্‌ হাইড্রোজেনের পরমাণুর সমান। এখন সমস্ত পরমাণু যদি কতকগুলি প্রোটন্‌ ও ইলেক্‌ট্রনের সংমিশ্রনে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পরমাণুর ওজন অবশ্যই অখণ্ড সংখ্যা হইবে। অর্থাৎ প্রাউট্‌ শতাব্দী খানেক পূর্ব্বে যাহা বলিয়া গিয়াছেন সেই কথাই প্রমাণিত হইতে চলিল।

কিন্তু তাহা হইলে আমরা সাধারণতঃ পরমাণুর ওজন অখণ্ড রাশি পাই না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন অ্যাস্টন্।

বায়ুমণ্ডলে নিয়ন (Neon) নামে একটা গ্যাস আছে। ইহার পারমাণবিক ওজন ২০·২। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে জে, জে টমসন্ অনুমান করেন যে এই গ্যাসে দুই প্রকারের পরমাণু মিশ্রিত আছে—এক প্রকারের পরমাণুর ওজন ২০ এবং অন্য প্রকারের পরমাণুর ওজন ২২। কি করিয়া টমসন্ ঐ ব্যাপার ধরিতে পারিলেন তাহা বলিতেছি।

কাঁচের নলের ভিতর কোনও গ্যাস্ পুরিয়া যদি তাহার ভিতর খুব জোরে বিদ্যুৎ চালনা করা যায়, তাহা হইলে অনেক পরমাণু হইতে তড়িৎকণা (ইলেকট্রন) খসিয়া পড়ে। পরমাণুগুলি এখন এক বা দুই সংখ্যক যোগতড়িৎ বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। যদি এই যোগতড়িৎ বিশিষ্ট পরমাণুগুলিকে চৌম্বকক্ষেত্র ও তড়িৎক্ষেত্রের ভিতর দিয়া পরিচালনা করা যায়, তাহারা অপর পার্শ্বস্থ ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর কতকগুলি বক্র রেখাপাত করে। এই রেখার বক্রতা হইতে পরমাণুর ওজন নিরূপন করা যাইতে পারে। ব্যাপারটা এখানে বোধহয় বোঝান গেল না। ইহাকে ইংরাজিতে বলে positive ray analysis (যোগ-তড়িত-রেখা বিশ্লেষণ)। ইহা ক্যাম্ব্রিজের বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক টমসনের মস্তিষ্ক প্রসূত।

যাহা হউক, টমসন্ দেখিতে পাইলেন যে নিয়ন (Neon) গ্যাস, যাহার ওজন ২০·২ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, positive ray method এ (যোগতড়িত-রেখা বিশ্লেষণক্রমে) তাহার ওজন অন্যরূপ দাঁড়ায়। ইহাতে পাওয়া যায় যে শতকরা ৯০ ভাগ পরমাণুর ওজন ২০, ১০ ভাগ পরমাণুর ওজন ২২। এখন দেখা যাউক যে এই উভয়বিধ পরমাণুকে কোন প্রকারে পৃথক করা যায় কিনা? এবং এই উভয় প্রকার পরমাণুর রাসায়নিক গুণ পৃথক কিনা?

পরমাণু চিনিবার আর একটা উপায় আছে। যেমন প্রত্যেক মানুষকেই তাহার স্বর বা আঙ্গুলের টিপ্ সই দ্বারা চেনা যায়, তেমনি প্রত্যেক পরমাণুকে তাহার বর্ণছত্র দিয়া চেনা যায়। যেমন, সোডিয়ামের বর্ণছত্রে সর্ব্বদা দুইটি পীতবর্ণের রেখামণ্ডল পাওয়া যায়। যে স্থলে এই দুইটী রেখা পাওয়া যায় আমরা জানি সেই স্থলেই সোডিয়াম্ আছে। এইরূপ প্রত্যেক পরমাণুরই বিশেষ বিশেষ বর্ণছত্র আছে। এখন দেখা যাউক, এই যে দুই প্রকার নিয়ন (Neon) পরমাণু, ইহাদের বর্ণছত্রে কোনও প্রভেদ আছে কিনা?

কথাটা অত্যন্তই গুরুতর। বৈজ্ঞানিকেরা বরাবরই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন যে কোন বিশিষ্ট পরমাণুর এক ভিন্ন দুই রকম ওজন হইতে পারে না। যদি ওজন বিভিন্ন হয় তাহা হইলে তাহাদের রাসায়নিক ধর্ম্মও আলাদা হইবে, বর্ণছত্রও আলাদা হইবে। রাসায়নিক ধর্ম্ম আলাদা হইলেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা দুইটি জিনিষকে পৃথক করা যাইতে পারে। যেমন, যদি একই পাত্রে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন রাখা যায় তাহা হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উভয়কে পৃথক করা যাইতে পারে। এখন ধরুন আমাদের নিয়ন

(Neon) গ্যাস্—টম্‌সন্ বলিলেন যে ইহাতে দুই প্রকার পরমাণু আছে। এক প্রকারের ওজন ২০ এবং অন্য প্রকারের ওজন ২২। পুরাতন পন্থী বৈজ্ঞানিকদের মত ঠিক হইলে এই দুই প্রকার পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণ তফাৎ হইবে।

যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনকে আলাদা করিতে পারি, তেমন এমন কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইতে পারে যাহা দ্বারা ২০ ওজনের পরমাণু ও ২২ ওজনের পরমাণুকে পৃথক করা যাইতে পারে। ২০ ওজনের পরমাণুর বর্ণছত্রও ২২ ওজনের পরমাণুর বর্ণছত্র হইতে তফাৎ হইবে। কিন্তু ফলে তাহা হইল না। বৈজ্ঞানিকেরা শত চেষ্টা করিয়াও ২০ ওজনের পরমাণুকে ২২ ওজনের পরমাণু হইতে পৃথক করিতে পারিলেন না। বর্ণছত্র লইয়াও দেখা গেল যে সম্ভবতঃ এই দুই প্রকারের বর্ণছত্রের মধ্যে কোন তফাৎ নাই, তবে কি প্রকারে এই দুই প্রকারের পরমাণুকে তফাৎ করা যাইতে পারে। টম্‌সন্ এই ভার দিলেন তাঁহার ছাত্র অ্যাস্‌টনের উপর। অবশ্য তখন ব্যাপারটা এত বিশদ ভাবে বুঝা যায় নাই। সমস্তই গোলমেলে ছিল। অ্যাস্‌টন্ প্রথম্ চেষ্টা করিলেন method of diffusion (বিক্ষেপন)। যাঁহারা বিজ্ঞান পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে যদি কোনও পাত্রে সমান পরিমাণ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থাকে এবং যদি ঐ পাত্র হইতে একটি নল লাগাইয়া নিসৃত গ্যাস্‌কে অন্য কোন দ্বিতীয় নির্বাত (evacuated) পাত্রে প্রবাহিত হইতে দেওয়া যায় (মনে করুন অর্দ্ধেক পরিমাণ) তাহা হইলে এই দ্বিতীয় পাত্রে প্রায় ১২ আনা হাইড্রোজেন থাকিবে—কারণ হাইড্রোজেন পরমাণু অধিকতর হাল্‌কা বলিয়া ইহার বেগ বেশী এবং ইহা বেশী পরিমাণে দ্বিতীয় পাত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। এইরূপে দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়, তৃতীয় হইতে চতুর্থ পাত্রে গ্যাস্ ছাড়িয়া দিলে অবশেষে আমরা যে গ্যাস্ পাইব তাহাতে অক্সিজেন মোটেই থাকিবে না—শুধু হাইড্রোজেন থাকিবে। অ্যাস্‌টন্ প্রথমে এই উপায়ে Neon (নিয়ন্) গ্যাসে ২০ ওজনের পরমাণু ও ২২ ওজনের পরমাণু পৃথক করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু ইহাতে মোটেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি হটিবার ছেলে নন্। তিনি এই কাজে প্রায় ১৬ বৎসর কাল নিয়োগ করিয়াছেন এবং অবশেষে অন্য উপায়ে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন যে কোনও বিশেষ রাসায়নিক ধর্ম্ম বিশিষ্ট পরমাণুর ওজনের বিশেষ একটা স্থির নিশ্চয় নাই। যেমন ক্লোরিন্ গ্যাস্। সাধারণতঃ ইহার ওজন ৩৫·৫। অ্যাস্‌টন্ দেখাইয়াছেন যে ইহাতে তিন রকমের পরমাণুর মিশ্রণ আছে। উহাদের ওজন ৩৫, ৩৬ ও ৩৭। যদিও ওজন তফাৎ তথাপি সমস্ত রকম পরমাণুর বর্ণছত্রও এক—রাসায়নিক ধর্ম্মও এক। এইরূপে অ্যাস্‌টন্ দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেক রকম পরমাণুরই যে একটা বিশিষ্ট ওজন আছে বলিয়া বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাস ভ্রান্ত। সকল পরমাণুই দুই বা তিন বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন। টম্‌সনের positive ray (যোগতড়িত রেখা) বিশ্লেষণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অ্যাস্‌টন্ নিজের চেষ্টা ও যত্নে এই প্রণালীর এতটা উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন যে, তিনি এখন অনায়াসেই যে কোনও রকমের যৌগিক গ্যাস্ লইয়া তাহার মধ্যে যত রকম বিভিন্ন ওজনের পরমাণু আছে সমস্ত বাহির করিতে পারেন। এই কাজের জন্য তিনি ১৯২১ খৃঃ অব্দে নোবেল্ প্রাইজ্ পাইয়াছেন।

পাঠক দেখিতে পাইলেন যে এখন আর তিন চারি দশমিক স্থল পর্য্যন্ত পরমাণুবিশেষের ওজন স্থির করিয়া লাভ নাই। প্রায় বৎসর দুই পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যখন বিলাতে ছিলেন তখন তিনি International Atomic Weights Commission (পরমাণুর ওজন নির্ণয়ের জন্য অন্তর্জাতিক সভা) এর অন্যতম সভ্য অধ্যাপক সডিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আপনারা যে এত খাটিয়া তিন চার দশমিক স্থান পর্য্যন্ত পরমাণুর ওজন ঠিক করিলেন, যদি অ্যাস্টনের মত ঠিক হয় তাহা হইলে আপনাদের সমস্ত পরিশ্রমইতো বিফল হইয়াছে? প্রফেসার সডি উত্তর দিলেন যে তাহা আর বলাই বাহুল্য। It is one of the most tragic chapters of scientific activity।

এই প্রবন্ধের লেখক ক্যাম্ব্রিজে অবস্থান কালে অ্যাস্টনের যন্ত্রশালায় গিয়াছিলেন। একটি মাঝারি রকমের কোঠা, তাহার মাঝখানে positive ray (যোগতড়িত রেখা) বিশ্লেষণের যন্ত্র, চারি ধারে আনুষঙ্গিক সাজ সরঞ্জাম, শিশি, বোতল ইত্যাদি। এই ঘরটিতেই অ্যাস্টন ১৬ বৎসর একটি কাজের পিছনে লাগিয়া আছেন এবং তাঁহার একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের পুরস্কারস্বরূপ বৈজ্ঞানিক জগতে অক্ষয় নাম লাভ করিয়াছেন। ইহাকেই বলে, ধারে না কাটিয়া ভারে কাটা। অ্যাস্টনের বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর। এতাবৎকাল কোথাও অধ্যাপক হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হন নাই। শুনা গিয়াছে শীঘ্রই তাঁহাকে কোথায়ও কোনও সহকারী অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করা যাইবে।

আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে রাজপ্রাসাদতুল্য যন্ত্রশালা এবং ইউরোপের খুব ভাল ভাল কোম্পানীর তৈয়ারী যন্ত্রপাতি, খুব মোটা মাহিনা, চার পাঁচ জন সহকারী, এবং খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি না থাকিলে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা যায় না। অ্যাস্টনের যন্ত্রশালা এবং কার্য্যপ্রণালী দেখিলে তাঁহাদের মাথা অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। অ্যাস্টন্ প্রায় ১৬ বৎসর কাল বেগার খাটিয়াছেন। যন্ত্রপাতির প্রায় সমস্তই তাঁহার নিজের হাতের তৈয়ারী। প্রত্যেকটী অংশ তিনি সাধারণ মিস্ত্রীর মত খাটিয়া নিজ হাতে তৈয়ারী করিয়াছেন। তাঁহার খুব প্রখর বুদ্ধি বা প্রতিভা নাই। কিন্তু আছে অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় ও চেষ্টা। তাহারই ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইয়াছেন, এবং যাহা আর্থিক পুরস্কার হইতেও শ্রেষ্ঠ,—বৈজ্ঞানিক জগতে অক্ষয়নাম লাভ করিয়াছেন। আমাদের দেশে অধ্যাপকগণকে, যাঁহারা নিজেদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য হয় গভর্ণমেণ্ট নয় ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করেন, অ্যাস্টনের দৃষ্টান্ত একবার অনুসরণ করিলে তাঁহাদের অজ্ঞান অন্ধকার অনেকটা ঘুচিয়া যাইবে।

শ্রীমেঘনাদ সাহা।

পল্লীশাসনের ব্যবস্থা ও স্বরাজ

(১)

স্বদেশে রাজনীতি ও অর্থনীতি অর্থাৎ শাসনব্যবস্থা ও আর্থিক অবস্থার বিষয়ে ঔদাসীন্য ও অবহেলা ভারতের অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ঔদাসীন্য ও অবনতি স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সৌভাগ্যক্রমে আজকাল এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছে এবং শাসনব্যবস্থা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য নানাজনে নানাভাবে চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল প্রয়াসেরই মূল লক্ষ্য স্বরাজ অর্থাৎ আত্মশক্তির বিকাশ ও আত্ম প্রতিষ্ঠা।

শাসনবিভাগে দেশবাসীর শক্তি বিকাশের ও কর্তৃত্বলাভের চেষ্টা যুগপৎ দুইটি বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইতে পারে ও হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি পন্থা হইতেছে ব্যবস্থাপক সভা ও শাসন পরিষৎ, কংগ্রেস্, কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি মহাসভার সাহায্যে লোকমত গঠন ও লোকমত প্রচার ও সমগ্র দেশে স্বজাতীয় প্রভাব বিস্তার। সিপাহীবিদ্রোহের সময় হইতেই উচ্চশিক্ষিত রাজনীতিজ্ঞ ভারতবাসী সকলেই প্রায় এই পথের পথিক হইয়া রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। সার্ সুরেন্দ্রনাথ, দাদাভাই নৌরোজী, গোখেল্ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কার্য্য প্রণালী এইরূপই ছিল।

আর একটি পন্থা হইতেছে—শাসনবিভাগের নিম্নতম সোপান অর্থাৎ পল্লীগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে থানা, মহকুমা, জেলা প্রভৃতির শাসনকার্য্যে অধিকার ও পারদর্শিতা লাভ করা। অসহযোগ আন্দোলনের কল্যাণে আজকাল অসংখ্য কর্ম্মী ও কর্ম্মীদলের সাধনা এইভাবেই চলিতেছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে রাণাড়ে, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি কয়েকজন চিন্তাশীল মনীষী ব্যতীত আর কেহই এই প্রকার চিন্তা বা চেষ্টা করেন নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজপুরুষগণের মধ্যে দূরদর্শী ও উদারহৃদয় লর্ড রিপণই স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইনব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতে এই প্রকার কার্য্যধারার প্রবর্ত্তন করেন। তাহারই ফলে নগরে নগরে মিউনিসিপালিটি, প্রতি মহকুমায় লোকাল বোর্ড, ও প্রতি জেলায় জেলা বোর্ডের সৃষ্টি হয় ও নির্ব্বাচিত দেশীয় সভ্যগণ নিজ নিজ গ্রাম, মহকুমা বা জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পথঘাট প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধনের সুযোগ ও ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু বিদেশী ভাবে নির্ব্বাচনের প্রথা অবলম্বিত হওয়ায় এবং আয়ের পন্থা সঙ্কুচিত থাকায় ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য এই সকল স্থানীয় সভা বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, এবং দেশের উৎসাহী কর্ম্মীগণও এই কার্য্যে আকৃষ্ট হন নাই।

(২)

দেশে স্বাধীনতার ভাব ও আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইলে এবং শাসনক্ষমতা লাভ করিতে হইলে নিজ নিজ গ্রাম হইতে কার্য্যারম্ভ করাই সহজ, সঙ্গত ও নিতান্ত আবশ্যক, ইহা সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য এইরূপ ক্ষুদ্র কার্য্যে উৎসাহ সঞ্চার হওয়া সহজ নহে, কিন্তু ক্ষুদ্র কার্য্যে শক্তি পরীক্ষা ও সাফল্যলাভ না হইলে দেশশাসন রূপ বিরাট কার্য্যে সফলতা লাভের সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে এই কথাই বুঝাইয়াছেন। অভিজ্ঞ ইংরাজ লেখকেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে ইংরাজজাতির অসাধারণ রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও স্বাধীন ভাবের মূল কারণ—তাহাদের অতি প্রাচীন স্বাধীন পল্লীশাসন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা হইতেই ইংরাজ জাতির চরিত্রে স্বাধীনতার ও স্বাবলম্বনের ভাব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের আর কোন দেশেই এমন ঘটে নাই, তাই ফ্রান্স্ প্রভৃতি দেশে পল্লীশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়।

এইরূপে পশ্চাত্য দেশে পল্লীশাসনের দুইপ্রকার আদর্শ ও ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার পল্লীশাসক মণ্ডলী স্বাধীন অর্থাৎ পার্লিয়ামেন্টের বা জাতীয় মহাসভার আজ্ঞাধীন নহেন, কিন্তু ফ্রান্সের পল্লীশাসক মণ্ডলী কেন্দ্রাধীন অর্থাৎ জাতীয় মহাসভার নির্দ্দেশেই পরিচালিত হন। বর্ত্তমান ভারতের ব্যবস্থা ইংলণ্ডের ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এদেশের স্থানীয় শাসকবর্গ সম্পূর্ণরূপেই কেন্দ্রাধীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এইখানেই ভারতের রাষ্ট্রীয় অবনতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পল্লীসমাজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে যেমন ছিল তেমন বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় না। গ্রামের শাসন, বিচার, রাজস্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই গ্রাম্য পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইত। দেশের রাজা সাক্ষাৎ ভাবে এই সকল বিষয়ে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তিনি কেবল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রাপ্তির অধিকারী ছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ কালক্রমে ভারতীয় পল্লীর পূর্ণ স্বাধীনতা এক্ষণে পূর্ণ অধীনতায় পরিণত হইয়াছে। আরও দুঃখের বিষয় দেশের অধিকাংশ ভাবুক ও কর্ম্মী এই বিষয়ে একান্ত উদাসীন।

(৩)

আজকাল দুইদল পল্লী সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন। প্রথম, কংগ্রেসের দল ও দ্বিতীয় কাউন্সিলের দল বা গভর্ণমেণ্ট, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন দলের নেতৃবৃন্দই বোধ হয় ভারতীয় পল্লীশাসনের মূলনীতি, ভবিষ্যৎ আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দিতে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই।

ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা এবং বিদেশীয় প্রণালীর সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন পঞ্চায়েতের স্বরূপ ও তাহার অবনতির কারণ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কয়েকজন ঐতিহাসিক কিছু কিছু গবেষণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য, তথাপি এই প্রসঙ্গে অনেক জটিল প্রশ্নই উপস্থিত হয়। বহুগবেষণা ও পরীক্ষা ব্যতীত সেসকলের সুমীমাংসা হওয়া সম্ভব হয় না।

এই স্থলে সংক্ষেপে এরূপ কয়েকটি গুরুতর প্রশ্নের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন পঞ্চায়েতের মূলনীতি ও আদর্শ, বর্ত্তমান কালেও স্বীকৃত ও প্রচলিত হইতে পারে কিনা? কি কি কারণে প্রাচীন প্রথার বিলোপ ঘটিয়াছে? সে সকল কারণ এখনও বর্ত্তমান আছে কিনা? আর যদি থাকে তাহা দূর করা বাঞ্ছনীয় ও সম্ভব কিনা? আর যদি প্রাচীন আদর্শ ও প্রথা বর্ত্তমান কালের উপযোগী না হয় তবে কি সম্পূর্ণরূপেই পাশ্চাত্য প্রণালীর অনুকরণ করিতে হইবে না দেশকালের উপযোগী নূতন ব্যবস্থা সৃষ্টি করাই সঙ্গত ও আবশ্যক?

প্রাচীন পঞ্চায়েতের স্বরূপ, কার্য্যপ্রণালী ও ক্রমিক অবনতি সম্বন্ধে এখনও এইরূপ অনেক কথাই অজ্ঞাত রহিয়াছে। তথাপি এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের যেরূপ ধারণা জন্মিয়াছে এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রাচীন পঞ্চায়েতের সভাপতি ('গ্রামনী' বা 'মণ্ডল') ও সভ্যগণ স্বাভাবিকভাবে গ্রামবাসিগণের সম্মতিক্রমেই শাসনক্ষমতা লাভ করিতেন, বর্ত্তমানকালের ন্যায় 'ভোটভিক্ষার' প্রয়োজন হইত না। ক্ষুদ্রায়তন সমাজে জীবন থাকিলে সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে অতি সহজেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে; ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসেও এইরূপই দেখা যায়। গ্রামের গণ্য মান্য বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে শাসন সভায় আসনলাভ করিতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনিই রাজার নিয়োগে গ্রামের রাজস্ব প্রেরণ ও সুশাসনের জন্য দায়ী হইতেন।

বোধ হয়, বহুকাল শান্তি ও সম্পদের সুখভোগ করিয়া পল্লীসমাজগুলি ক্রমে নির্বীর্য্য ও গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চায়েতের সভ্য ও সভাপতির পদও কুলক্রমাগত হইয়া পড়িল। এইরূপে সামাজিক জীবনে বৈচিত্র্য, পরিবর্ত্তন ও উন্নতিস্পৃহার অভাবেই ভাবী অবনতির সূচনা হইয়াছিল, মনে করা যাইতে পারে।

তার পর মুসলমানবিজয়ের ফলে ভারতসমাজে নানাদিকে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির আবির্ভাব হইল। কৃষককুলের প্রদেয় রাজস্ব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, বিজাতীয় নূতন ভূস্বামিগণ নানাভাবে প্রজার বিত্ত অপহরণ ও যথেচ্ছ দণ্ডপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মোগল আমলে বাঙ্গালায় ও উত্তরাপথের অন্যান্য প্রদেশে প্রভূত ক্ষমতাশালী পুরুষানুক্রমিক জমিদার শ্রেণীর অভ্যুদয় হওয়ায় ক্রমে পঞ্চায়েতের ক্ষমতাহ্রাস ও অবনতি ঘটিতে থাকে।

অবশেষে পলাসীর যুদ্ধের পর ইংরাজাধিকারের প্রথমাবস্থায় দেশ মধ্যে ঘোরতর অত্যাচার অবিচার বিশৃঙ্খলা ও উপদ্রবের একশেষ হয়। রমেশচন্দ্রের ইকনমিক হিষ্ট্রীর প্রথমভাগে তাহার সবিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। এই সময়ে বাঙ্গালায় প্রজা জমিদার শিল্পী বণিক সকলেই

ধনে প্রাণে সারা হইয়াছিল। সোণার বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী—এককোটিরও অধিক স্ত্রীপুরুষ বালবৃদ্ধযুবা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সেই সময়েই বাঙ্গালার জরাজীর্ণ পঞ্চায়েতের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া থাকিবে।

তার পর ইংরাজের আইন আদালত পুলিশ পাহারা রেল জাহাজ আর শিক্ষা দীক্ষার গুণে ভারতের সে সনাতন পঞ্চায়েৎ প্রথার সমাধি হইয়া গিয়াছে। লর্ড রিপণের বিলাতী মন্ত্র তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই। নূতন কাউন্সিলের ইউনিয়ন বোর্ড ও পারিবে না। গ্রামের কংগ্রেস কমিটি পারিবে কি?

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

আহোম রাজ্যের খনিজ সম্পদ্ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা*

মান্যবর সার এডোয়ার্ড গেইট্ মহোদয় ও পরলোকগত রায় গুনাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর মহাশয় এই দুই জন ঐতিহাসিক লিখিত পুস্তকই আসাম দেশের ইতিহাস বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—অন্ততঃ উহার সমকক্ষ হইতে পারে এরূপ আসাম ইতিহাস প্রণীত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। কিন্তু এ উভয় পুস্তকের কোন খনিতেই আসামের খনিজ সম্পদ্ সম্বন্ধে যথাযথ উল্লেখ নাই। গেইট্ সাহেবের পুস্তকে ১৪৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—"Gold was found in the rivers and about 10,000 persons were engaged in washnig for it. Gold mohars and rupees were coined by the Raja, but there was no Copper Coinage. Cowries being used instead. Silver, Copper and Tin were obtained from the hills". এতদ্ব্যতীত গেইট্ সাহেবের পুস্তকে আহোমদিগের খনিজ সম্পদের কথার উল্লেখ পাই নাই। রায় বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের পুস্তকের পরিশেষে (২৫৫ পৃঃ) লেখা আছে; "এই দেশৰ কোন কোন নদীৰ পৰা স্বৰ্ণ পোৱা গইছিল"। এই সামান্য উল্লেখ ব্যতীত রায় বাহাদুরের পুস্তকে আর কোথাও আহোম রাজ্যে খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব বা ব্যবহার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য আমার চক্ষে পড়ে নাই।

Mr. Moffat Mills (মোফাট্ মিল্‌স্) মহাশয়ের বিস্তৃত রিপোর্টেও এ বিষয় কোন উল্লেখ দেখিলাম না। তবে ঐ রিপোর্টে কোন কোন স্থানে উহার যৎসামান্য আভাষ মাত্র আছে।

১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় "উষা" নামক পত্রিকায় "অসমীয়া লো" শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখেন। একৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রমুখাৎ আসামে লৌহ সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই প্রবন্ধাকারে "উষায়" প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের পরিশেষে গোস্বামী মহাশয় বলেন—"কোনোবাই এই বিষয়ে আৰু কিবা কথা জানিলে 'উষা'ত প্রকাশ কৰি যেন সকলোৰে ধন্যবাদৰ পাত্র হৰ"।

"উষা" সন্ধ্যার তিমিরে মিশিয়াছে, কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আসামের খনিজ সম্বন্ধে কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কয়েকখানা প্রাচীন পুস্তকে যাহা দেখিয়াছি উহা জ্ঞাপন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানীর সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালপাড়া জিলাও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গৌহাটি শাখার নবম বর্ষের পৌষ অধিবেশনে পঠিত।

হস্তগলীভূত হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত আহোম শাসিত আসাম ও কোম্পানী শাসিত বঙ্গদেশের মধ্যস্থিত সীমানা ছিল গোয়ালপাড়া জিলা। অর্থাৎ গোয়ালপাড়া ছিল ইংরেজ অধিকৃত ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত। বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া সহরের তখন খুব সমৃদ্ধি ছিল। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন ইংরেজ লিখিত পুস্তকে গোয়ালপাড়া শহরের একখানি মানচিত্র সংলগ্ন আছে। ঐ ইংরেজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ইউরোপ পরিত্যাগ করার পরে গোয়ালপাড়ার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী শহর তিনি অল্পই দেখিয়াছেন। ঐ শহরের অপর পারে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে ইংরেজ কোম্পানীর একটি Customs House ছিল। উহার নাম হাদিরা চৌকি। ঐ স্থানকেই আসামে বঙ্গালহাট বলিত—অর্থাৎ বঙ্গদেশের সহিত আসামের বাণিজ্য ব্যবসায় ঐ চৌকি ও ঐ হাটের সংস্রবেই সম্পন্ন হইত। এই বঙ্গালহাটে খৃঃ ১৮০৮-৯ অব্দে আসাম হইতে ১৫০৯০০ টাকার দ্রব্যাদি বঙ্গদেশে রপ্তানি হইয়াছে, এবং বঙ্গদেশ হইতে ঐ বৎসরই ঐ বঙ্গালহাটে ২২৮৩০০ টাকার দ্রব্যাদি আসামে আমদানি হইয়াছিল। এই আমদানি হইতে রপ্তানি বাদ দিয়া যে ৭৭৪০০ টাকা থাকিল উহা কোথা হইতে আসিত? অর্থাৎ ঐ পরিমাণ টাকার উপযোগী সোনা রূপা আহোম রাজ কোথা হইতে সংগ্রহ করিতেন?

Captain Pennberton's Report on the Eastern Frontier – Cal. 1835; Dr. Buchanan's Survey of Ronggpur এবং Montgomery Martin's History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India—এই তিন খানা পুস্তকেই ১৮০৮—৯ খৃঃ অব্দের বাঙ্গালা আসামের বাণিজ্যের একই অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে—সুতরাং উহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। এই তিনজন গ্রন্থকারের মধ্যে Buchanan (বাকেনন্) সাহেব নিজে বহুকাল আসামে থাকিয়া তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং Mr. Martin (মিঃ মার্টিন) তদীয় গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে বিলাতে East India Houseএ রক্ষিত মূল পুস্তক খাতা পত্রাদি হইতে তিনি তাঁহার পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

আসামে কোথায় সোনা পাওয়া যাইত এবং কোন কোন লোকের দ্বারা কি প্রকারে কখন ঐ সোনা রাজকোষে নীত হইত—এ সম্বন্ধে এ তিন পুস্তকের বিবরণ অবিকল এক। তজ্জন্য এই তিন খানা পুস্তক অবলম্বন করিয়া নিম্ন লিখিত কয়েকটি কথা আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিব।

ব্রহ্মপুত্র নদ ও ধানশিরী নদীর মোহনায় বালুকার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণধূলি পাওয়া যাইত। ইহার নাম ছিল পাকেরগুড়ি খনি। একজন অসমীয়া কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে এই খনিসমূহ পরিচালিত হইত। এই কর্ম্মচারী কি নামে অভিহিত হইতেন তাহা বলিতে পারি না। গেইট সাহেব উল্লিখিত সোনাধর বড়ুয়া নামক কর্ম্মচারীর সহিত এই কর্ম্মচারীর কোন সংস্রব ছিল বলিয়া বোধ হয় না; কারণ সোনাধর বড়ুয়া ছিলেন Chief Mint Officer অথবা Chief Jeweller.

এই কর্ম্মচারী রাজ দরবারের হুকুম ব্যতীত আর কাহারও হুকুমাধীন ছিলেন না। ইহার অধীনে এক সহস্র শ্রমজীবি ঐ খনিসমূহে কার্য্য করিত। উহাদিগকে সোঁধনি বা সোনধনি বলা হইত। এই সহস্র শ্রমজীবিগণের ১০ বা ২০ জন লইয়া দল করা হইত, এবং প্রতি সংঘের জন্য একজন কর্ম্মচারী ছিল এবং সর্ব্বোপরি ছিলেন পূর্ব্বোল্লিখিত পরিদর্শক। ইহারা প্রত্যেকেই নগদ মাহিয়ানার পরিবর্ত্তে জমি পাইত। যে স্থানে এই খনিজ পদার্থসমূহ উৎপন্ন হইত ঐ স্থানের শান্তিরক্ষক ও প্রধান বিচারপতি ছিলেন ঐ পরিদর্শক।

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে এই সোনধনিগণের কার্য্য আরম্ভ হইত। প্রতি সোনধনিকে দেড় তরি সোনা যোগাইতে হইত। ঐ সোনধনি যদি ততোধিক সোনা আদায় করিতে পারিত তবে উহা তাহার নিজস্ব এবং যদি দেড় ভরির কম আদায় হয় তবে তজ্জন্য সোনধনি দায়ী এবং

ঐ ক্ষতি পূরণ তাহাকেই করিতে হইবে। ব্যক্তিগত অলসতা দূর করিবার এবং ব্যক্তিগত সামর্থ্যের যথাযথ প্রয়োগ করিবার এটি একটি অতি আশ্চর্য্য বিধান ইহা কেবল profit sharing নয়—loss sharingও বটে। এই পাকেরগুড়ি খনি হইতে প্রতিবৎসর ১৫০০ ভরি সোনা উদ্ধৃত হইত। গোয়ালপাড়া শহরে ও বাগানহাটে ইহার প্রতি ভরির মূল্য ছিল কোম্পানীর টাকার ১২ টাকা; কিন্তু ইহার সহিত অন্য ধাতুর খাদ মিশান হইত বলিয়া উহার মূল্য ১২ টাকা স্থলে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১১ সিক্কারূপেয়া নির্দ্ধারিত হইত। সুতরাং এই কেম্পানীর টাকার অনুপাতে প্রতি বৎসর আহোম রাজকোষে এই পাকেরগুড়ি খনি হইতে ১৫০০ × ১২ = ১৮০০০ সিক্কারূপেয়া আদায় হইত। এই হইল পাকেরগুড়ি স্বর্ণ খনির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক স্থানে স্বর্ণ সংগৃহীত হইত।

এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান যোরহাটের দক্ষিনদিক অবস্থিত দরাং নামক স্থানে একটি লৌহ খনি ছিল। এই খনি হইতে পাকেরগুড়ির স্বর্ণখনির অনুযায়ী লৌহ উদ্ধৃত হইত। ঠিক্ কি পরিমাণে লৌহ দরাং খনি হইতে পাওয়া যাইত কোথাও তাহার উল্লেখ দেখি নাই। ইহার দ্বারা রাজকোষের কিপ্রকার লাভ হইত তাহাও জানিতে পারিনাই, তবে উহা যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত ইহার উল্লেখ আছে। তৎকালীন আহোম রাজগণের সৈন্য সামন্তের অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ সংগ্রহ করিতে না পারিলে এত যুদ্ধই বা করিল কি প্রকারে।

এই লৌহখনির সম্বন্ধে আমি এতধিক আর কিছু জানিতে পারি নাই। এ বিষয় শ্রীযুত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের প্রবন্ধে লৌহপাক ও খনি হইতে লৌহ উদ্ধার সম্বন্ধে কিছু প্রচলিত কিম্বদন্তি জানা যাইতে পারে। উহা "উষা" পত্রিকার ১ম ভাগের ১৬৫।৬ পৃষ্ঠায় আছে।

এই সোনা ও লোহার খনি ব্যতীত সদিয়া প্রদেশে লবণের খনির উল্লেখ পাইয়াছি। ইহাতে লবণ খুব অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইত না, তথাপি ১৮০৮-৯ খৃঃ অব্দের আসাম বাঙ্গলার বাণিজ্য ব্যবসায়ের হিসাবে দেখা গেল যে এই লবণ খনি হইতে বার্ষিকলাভ হইত ৪০ সহস্র টাকা। সদিয়া অঞ্চলে ছোট ছোট পুকুর কাঠা হইত; উহারি জলে লবণ পাওয়া যাইত। ঐ জল হইতে নিষ্কাশিত লবণ বাঁশের চোঙায় যোরহাটে আনীত হইত। মার্টিন ও বাকেনান সাহেব উভয় বলেন যে বঙ্গদেশে প্রাপ্য লবণের চেয়ে এই লবণ পরিষ্কার এবং মূল্যও ইহারি অধিক। এই লবণমহাল ইজারা দেওয়া হইত—রাজকোষে বার্ষিক চুক্তিমত অর্থ বুঝাইয়া দিলেই ইজারাদারের কার্য্য সমাধা হইত। বাকেনান সাহেব বলেন যে বঙ্গ দেশের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা হইলে এই সদিয়ার লবণখনির উপরে সমগ্র দেশ নির্ভর করিত।

মিঃ মোফাট্ মিল মহাশয়ের রিপোর্ট পড়িলে বুঝা যায় যে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে হয় এই লবণখনি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, আর না হয় অন্তর্বিদ্রোহে এবং রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনে উহার কোন প্রকার সদ্ব্যবহার হয় নাই; কারণ ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে লিখিত মিল সাহেবের রিপোর্টে ২৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "The supply of salt is in the hands of Marwari merchants who are located at the principal sudder stations and principal marts in the interior. The salt supplied is mostly Liverpool salt. Salt is also imported from Bootan and the Naga hills" ইত্যাদি।

সদিয়া প্রদেশে ও তৎসংলগ্ন দেশে লবণ খনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে মোফাট্ মিল মহাশয়ের রিপোর্টে একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রদেশ সমূহের জঙ্গলে বহু হাতী পাওয়া যায়। আহোম রাজাদের সময় এই হাতী ধরিবার জন্য যে সমস্ত ফাঁদ পাতা হইত উহা

সাধারণতঃ কোন না কোন লবণ পুকুরের চতুষ্পার্শ্বে নির্ম্মিত হইত। ইহার কারণ এই যে এই লবণ জলে নাকি হস্তীগণের ব্যাধি নিরাকরণের উপযুক্ত ঔষধির উপকরণ থাকিত; সুতরাং একটা সহজ সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই বন্য হস্তী সমূহ ঐ সমস্ত লবণ পুকুরের জল আস্বাদন করিতে আসিত।

স্বর্ণ, লৌহ ও লবণ এই তিন পদার্থের অস্তিত্ব, ব্যবহার ও ব্যবসায়ের কথা সামান্য ভাবে উল্লেখ করিলাম। ইহার যথাযথ বিবরণ দিতে হইলে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক, অন্ততঃ বুরুঞ্জী সমূহের বিবরণের সহিত তুলনা করিয়া এ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

উপরোক্ত তিন পদার্থ ব্যতীত চুণ, কয়লা প্রভৃতির আকর আহোম দিনে বিদ্যমান ছিল এবং তাহার যথাযথ ব্যবহার হইত ইহারও উল্লেখ কোন কোন পুস্তকে পাওয়া যায়। কয়লার খনির বিষয় মিল সাহেবের রিপোর্টে একটু বিশেষ বিবরণই আছে তবে সে আহোম আসামের নয়; ব্রিটিশ আসামের।

এই খনিজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে আহোম আসামের নানা প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের বিবরণ পাইয়াছি। বঙ্গালহাট বা হাদিরা চৌকির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি বাঙ্গালহাট ছিল বঙ্গ ও আসামের বাণিজ্যদ্বার। এতদ্ব্যতীত আহোম আসামে আরও কয়েকটি বাণিজ্যদ্বার ছিল।

ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে সোলালফাটে একটি চৌকি ছিল। উহারি নাম উড্ সাহেবের মতে সিউলাল চৌকি। কামরূপে ও আসামের অন্যান্য প্রদেশে যখন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা ছিল তখন কামরূপ হইতে খাস্ আসামে নীত দ্রব্যাদির উপর এই সোলালফাটে শুল্ক আদায় হইত। জনৈক বড়ুয়াকে এই চৌকি বার্ষিক ৫০০০ টাকার জন্য ইজারা দেওয়া হইত। কলং নদীর তীরবর্ত্তী রোহা নামক স্থানে এইরূপ আর একটি চৌকি বা Customs House ছিল।

ভোট ও আহোম রাজ্যের মধ্যে বিস্তৃতরূপে আদান প্রদান চলিত। এই ভোট আসাম বাণিজ্য সুচারু পরিচালনের নিমিত্ত সিম্‌লিয়াবাড়ী নামক স্থানে উজির বড়ুয়া নামক একজন অসমীয়া কর্ম্মচারী ও তাহার আফিস ছিল। ভুটান ও আসামের বাণিজ্যে বার্ষিক ২ লক্ষ টাকার আদান প্রদান হইত। এতদ্ব্যতীত ভুটিয়াগণ পশ্চিমদিক হইতে বিনাশুল্কে হাজো নামক স্থানে তাহাদের দ্রব্যাদি রপ্তানি করিত ও আসামের বিশেষতঃ কামরূপের দ্রব্যাদি ঐ হাজো বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে ভোটরাজ্যে সরবরাহ করিত। গালা, মুগা, এণ্ডি, মৎস্য, উল, সোনা, কস্তুরি, লবণ, ঘোড়া, হস্তী এবং চীন দেশীয় পশম—ইত্যাদি ইত্যাদি দ্রব্যে ভোট আসামের বাণিজ্য চলিত।

মোট কথা কলিকাতা ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত কয়েকখানা গ্রন্থে আহোম আসামের বিস্তৃত ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা অবগত হইয়াছি। একদিকে ইংরেজ শাসিত ভারতের সহিত অপর দিকে ভুটিয়া, নাগা, আবর প্রভৃতি জাতির সহিত এবং তাহাদেরি সাহায্যে তিব্বত ও চীন দেশের সহিত প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্য চলিত। এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া এবং বুরুঞ্জী লিখিত বিবরণের সহিত উহা তুলনা করিয়া আহোম রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। এই Economic History of Ahom Times লিখিত হইলে আসামের প্রাচীন গৌরব এবং আসামবাসীগণের আত্মমর্য্যাদা নিশ্চয়ই বাড়িবে।

শ্রীভুবনমোহন সেন।

মার্কিনী কথা

আজ প্রায় ১৪ বৎসর যাবৎ একটী মার্কিনী মহিলার সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য। আমি যুক্তরাজ্যে আসিতেছি শুনিয়া তাঁহার স্বদেশপ্রীতি তাঁহাকে একটু ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি জানেন যে আমি স্বল্পে তুষ্ট হইবার লোক নই। যাহাতে যুক্তরাজ্যের লোকেদের যাহা কিছু ভাল তাহা দেখিয়া তাঁহার স্বদেশসম্বন্ধে আমার মনে সদ্ভাব হয় সেজন্য তিনি যথাসাধ্য করিয়াছিলেন। যুক্তরাজ্যের লোকেদের যেটুকু খারাপ তাহা আমার নজরে না পড়িলেই তিনি খুসী হন। তাঁহার স্বদেশকে তিনি এতটা ভাল বাসেন। আর তাঁহার স্বদেশ সম্বন্ধে আমার মতেরও দাম তাঁহার নিকট কিছুটা আছে। নতুবা আমার মনে যাহাতে তাঁহার স্বদেশকে ভাল লাগে তাহার জন্য এত ব্যস্ত হইবেন কেন? মহিলাটী উচ্চশিক্ষিতা ও ভদ্র ঘরের। তাঁহার বাড়ী যুক্তরাজ্যের মাঝামাঝি ওহায়ো প্রদেশে।

সান্‌ফ্রান্সিস্কো—এদেশে উহার সংক্ষিপ্ত নাম "ফ্রিস্কো"—নগরে আমার বন্ধুর পরিচিত কেহ ছিল না। কালিফর্ণিয়ার লস্ এঞ্জেলেস্—সংক্ষেপে "লস্"—নগরে তাঁহার পরিচিত কয়েকজন আছেন। তাঁহাদিগকে লিখিয়া দিলেন যে এই গাঢ় শ্যামবর্ণ হিন্দুর যেন অনাদর না হয়। কালিফর্ণিয়ার লোকেরা যুক্তরাজ্যের "বাঙ্গাল"। মনে মুখে এক, আতিথেয়তা জানে, স্পষ্ট বক্তা, মিহি সৌজন্যের ধার ধারে না, হৃদ্যতায় পরিপূর্ণ। লস্ ও ফ্রিস্কোতে আড়া-আড়ি। উত্তর কালিফর্ণিয়ার প্রধান নগর ফ্রিস্কো। দক্ষিণ কালিফর্ণিয়ার প্রধান নগর লস্। লস্ সিনেমার ছবির কারখানার আড্ডা। সিনেমার ছবি তুলিবার এত বড় আড্ডা পৃথিবীতে নাই বলিয়া লসের লোকেরা গর্ব্ব করিয়া থাকে। ফ্রিস্কোতে আমাকে এত যত্ন করিয়াছে, লসে তার চেয়ে কম হইলে লসের হার মানিতে হইবে। সুতরাং আমার বন্ধুর বন্ধু আমাকে নিয়া ১২৫ মাইল মোটর গাড়ীতে বেড়াইতে চলিলেন। সহর ছাড়িয়াই ৩৫ মাইল ঘণ্টায় মোটর ছুটাইয়া চলিলেন। মোটর চালক আমার বন্ধুর বন্ধু। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, আমি, তাঁহার এক ডাক্তর বন্ধু ও তাঁহার স্ত্রী। এক পাহাড়ে উঠিয়া বনে এক বাঙ্গালায় রাত্রি কাটাইলাম। তার পরদিন বিশ্রাম, আহার ও পরে আবার ১৩০ মাইল মোটর গাড়ীতে অন্য পথে বেড়াইয়া লস্ সহরে রাত্রি ১১টার সময় ফিরিলাম। বলা বাহুল্য যে আমাকে এক ডলারও খরচ করিতে দেন নাই। আমি যে তাঁহাদের অতিথি।

যেখানে মোটর থামাইয়া সরবৎ খাইতেছি বা মোটরের তেল নিতে হইতেছে, সেখানেই আমার বন্ধুর কালিফর্ণিয় বন্ধুটি দোকানদারকে বলিয়া দিতেছেন—"এ ভদ্রলোক ব্রিটিশ নহেন, ইনি আমেরিকান"। আমি যে কি করিয়া আমেরিকান হইলাম তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আমেরিকান বলাতেই সরবৎওয়ালী একগাল

হাসিয়া সৌজন্যের সহিত আমাকে পরিবেশন করিল। ইহাদের স্বদেশপ্রীতির কিছুটা পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়। কালিফর্ণিয়ার লোকেরা ইংরাজদের দেখিতে পারে না।

আমার বন্ধুর বন্ধু পাহাড়ে বেড়াইতে নিয়া গেলেন, বিউইক্ গাড়ীতে। তার পরদিন লস্ সহরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে আবার নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলাম। তখন আমাকে হোটেলে পৌছাইয়া দিলেন তাঁহার ফোর্ড্ গাড়ীতে। তাঁহারা কাজে যান রোজ ফোর্ড্ গাড়ীতে। তাঁহার দুইটি মোটর গাড়ী আছে। বাড়ীতে বাগান আছে। একটিও কিন্তু চাকর নাই। আমাকে বলিলেন প্রতিদিন তিন ডলার (প্রায় ১১৲ এগার টাকা) না দিলে একটি চাকর রাখা চলে না। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীতে ঘর-কন্নার সব কাজ চালাইয়া লন। বাড়ীটি পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে, আসবাব বেশী নাই। তবে যা আছে তাহা কলিকাতায় লাটবেলাটের বাড়ীতেও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাকে তাঁহাদের রান্না ঘর, খাবার ঘর, শুইবার ঘর, পোষাক পরিবার ঘর ইত্যাদি সব দেখাইলেন। আসিবার সময় বলিয়া দিলেন "আবার কালিফর্ণিয়াতে আসিও ও পূর্ব্বে আমাদের জানাইও"।

এক কালিফর্ণিয়া প্রদেশে আমার চোখে পড়িয়াছে ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার মোটর গাড়ী। আমার বন্ধুর বন্ধু বলিলেন যে তার চেয়েও বেশী মোটর গাড়ী এক কালিফর্ণিয়া প্রদেশেই আছে। সমস্ত কলিকাতায় হয় ত মোট দশ কি এগার হাজার মোটর গাড়ী। রেলের মালগাড়ীর এক একটীর বোঝা বহিবার ক্ষমতা একলক্ষ পাউণ্ড। আমাদের দেশে একটি গাড়ীর বোঝা বহিবার ক্ষমতা পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বেশী নয়। তড়িতশক্তি ও বাষ্পশক্তি মানুষের জন্য যতটা করিতে পারে তাহা ইহারা আদায় করিয়াছে। আরও আদায় করিবার জন্য ব্যস্ত।

সিয়েরা নেভাডা পাহাড়ে য়োজেমিটে (Yosemite National Park) পার্ক দেখিতে গিয়াছিলাম। চারিদিকে পাহাড়। উপত্যকায় বনে তাঁবু খাটান হইয়াছে। কোথায়ও বা বাঙ্গালা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। গ্রীষ্মকালে যুক্তরাজ্যের সকল প্রদেশ হইতে উন্মুক্ত বাতাসে রাতদিন থাকিবার জন্য হাজার হাজার পুরুষ ও স্ত্রী এই পার্ক ও ইহার ন্যায় অপর পার্কে বেড়াইতে আসিতেছে। প্রতি বৎসর এই ক্যাম্প বা তাঁবুর সহর গ্রীষ্মকালে পাতা হয়। শীতকালে তাঁবু উঠাইয়া নেওয়া হয়, শুধু বাঙ্গালাগুলি থাকে। আমি যে তাঁবুর সহরে গিয়াছিলাম তাহার নাম Camp Curry বা কারি মেমের তাঁবুর সহর। আমি সেখানে থাকিতে এক রাত্রিতে ১২০০ লোক অতিথি ছিল। এই বৃহৎ ব্যাপার চালাইবার জন্য ৩৬০ জন পুরুষ ও স্ত্রী দিন রাত্রি খাটিতেছে। সুনিয়ন্ত্রিত সমবেত উদ্যোগে (Organisation) কলের মত সব নিঃশব্দে চলিতেছে।

প্রকাণ্ড ভোজনশালায় একত্র ৪০০।৪৫০ লোক খাইতে বসিতেছে। কার্ড হাতে করিয়া ভোজনশালায় প্রবেশ করিতেই একটী মেয়ে আমার হাত হইতে কার্ডটী নিয়া তাহার এক কোন ছেঁদা করিয়া দিবে। তাহা হইতে বুঝা যায় যে আমি সকালে, না দুপুরে, না

রাত্রিতে খাইলাম ও কয়দিন খাইলাম। সেই অনুসারে আপিসে হিসাব হইবে। কার্ড হাতে না করিয়া ভোজনশালায় প্রবেশের নিয়ম নাই। কেহ যায়ও না। আমি আসিতেই মেয়েটি হাসিয়া "স্বাগত" বলিয়া আমাকে আর একটি মেয়ের হাতে জিম্মা করিয়া দিল। সেই দ্বিতীয় মেয়েটী ইঙ্গিত করিল, আমাকে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে হইবে। কোন্ টেবিলে যায়গা আছে, কোথায় কয়জনকে বসাইলে সব চেয়ে বেশীসংখ্যক লোক একসঙ্গে ভোজনশালায় বসিয়া খাইতে পারে তাহার দিকে নজর রাখিয়া অতিথিকে টেবিল দেখাইয়া দেওয়া ইহার কাজ। সে মেয়েটী ত হাঁটে না, দৌড়ায়। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। আমাকে টেবিল দেখাইয়া দিয়াই সে আবার ছুটিয়া প্রবেশদ্বারের দিকে চলিল, আর একদল অতিথিকে টেবিল দেখাইয়া দিবে। আমি একদিন সকালে একটু অবসর পাইয়া একটী মেয়েকে বলিলাম—"তোমরা ছুটিয়া চল কেন? আমি ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছি। এতদূর হইতে আসিয়া, তোমার সঙ্গে ছুটিয়া, প্রায় হাঁপাইয়া পড়িয়াছি"। সে ত হাসিতে লাগিল। বলিল, "করি কি? দেখনা আজ সকালে কতলোক ভোজন-শালায় খাইতে আসিতেছে?" টেবিলে যাই বসিয়াছি, আর একটী মেয়ে আসিয়া পরিবেশন করিতে লাগিল। সেও ছুটিয়া গিয়া খাবার আনিতেছে। কেহই হাঁটে না। ওরই মধ্যে অপর একটী মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গেল, "কাল দুপুর বেলা বাহিরে বেড়াইতে যদি যাও, তবে তোমার জন্য কি দুপুরের খাবার (Luncheon) তৈয়ার রাখিব?" একদিন আমি ঐরকম দুপুরের খাবার নিয়াছিলাম। তাহা কাগজের থলিয়াতে অতি পরিপাটি করিয়া সাজান। পাহাড়ের ঝরণার জল পান করিবার জন্য কাগজের গেলাস, হাত মুছিবার জন্য কাগজের রুমাল, মাখন লাগান রুটী তেলা কাগজে মোড়া, ইত্যাদি পরিষ্কার, পরিপাটী বন্দোবস্ত। অবশ্য মূল্যও সেই আন্দাজ। কিন্তু কাগজের থলিয়াতে খাবার নিয়া যাইতেছি। খাবারও খারাপ হইবে না, থলিয়াতেও মাখনের দাগ লাগিবে না। আর আহার, পান, আচমন সকলের আয়োজন ঐ থলিয়ার মধ্যে। পাহাড়ে বনে হাজার লোক প্রতিদিন বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। একটু অসাবধান হইলে বন দুই দিনেই নোংরা হইবে। কাগজের টুক্‌রা বনময় ছড়াইয়া থাকিবে। থলিয়ার গায়ে লেখা আছে "Hide or carefully burn my remains. By request of Yosemite National Park Authorities and the Curry Camping Company." "যোজেমিটের জাতীয় উপবনের কর্তৃপক্ষগণ ও কারি মেমের তাঁবুর সহরের স্বত্বাধিকারিগণ অনুরোধ করিতেছেন—ভোজন শেষ হইলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সব মাটিতে পুতিয়া ফেলিবেন বা অতি সাবধানে পোড়াইয়া ফেলিবেন।" পোড়াইবার বেলা অতি সাবধান হইতে বলা হইয়াছে। সাবধান না হইলে বনে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা। এই যে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন গ্রীষ্মকালে সিয়েরা নেভাডা পাহাড়ে এই মনোরম উপবনে বেড়াইতেছে ইহারা সকলেই উপবনটীর যত্ন করিতেছে। যাহাতে উপবনটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার জন্য প্রত্যেকে যত্নবান্। যোজেমিটে জাতীয় উপবন ৪৮ মাইল লম্বা ও ৩৬ মাইল চওড়া। তার মধ্যে পাহাড়ের সারি, জলপ্রপাত, ছোট হ্রদ, ছোট

নদী, বন, উপবন ইত্যাদি। যে দেশে একটী চাকর রাখিতে হইলে তিন ডলার রোজ বেতন দিতে হয়, সে দেশে অতিথিরা নিজে সাবধান না হইলে, নিজেরা যত্ন না করিলে উপবনটী পরিষ্কার রাখা কিরূপ ব্যয়সাধ্য হইত? দেখিয়া মনে আনন্দ হয়, প্রত্যেকে নিজের বাড়ী মনে করিয়া অতি সাবধানে চলিতেছে। ইহাকে বলে আত্মসংযম। আমরা কবে সে পরিচ্ছন্নতা, সে আত্মসংযম শিখিব?

একটী মহিলার সহিত আমার পরিচয় হইল। দেখিতে যেমন সুন্দরী, তেমনি তাঁর মিষ্ট ব্যবহার। চুল ছোট করিয়া হাল মার্কিনী ফ্যাসানে ছাঁটা। পরিধানে ছোট ঝুল স্কার্ট বা ঘাঘ্‌রা। তাহা হাঁটুর একটু নীচে পর্য্যন্ত ঝোলান। লম্বা ঝুল স্কার্ট্ বা ঘাঘ্‌রা যুক্তরাজ্য হইতে বিদায় হইয়াছে। যেখানে সকলের ছুটোছুটি চলিতেছে সেখানে প্রকাশ্যে গাছতলায়, দুই গাছের মাঝখানে জালের দোল্‌নায় (Hammock) সারাদিন শুইয়া বিশ্রাম করিতেছে যে মেয়ে তাহার নৈতিক বল আছে স্বীকার করিতেই হইবে। কথায় কথায় আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম "ছুটীতে বিশ্রম করিতে আসিয়া দৌড়াইব কেন? আমি সত্য সত্য বলিতেছি, নিতান্ত বিপদে না পড়িলে আমাদের দেশে ভদ্রলোকে দৌড়ায় না"। তিনি হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—"আমার নিয়ম, শুইতে পারিলে বসিনা, বসিতে পারিলে দাঁড়াই না, দাঁড়াইতে পারিলে হাঁটিনা। আর যদি নিতান্তই হাঁটিতে হয় হাঁটিব, বিপদে না পড়িলে দৌড়াইবনা"। তিনি বলিলেন—"যাহোক্, অন্ততঃ একজন লোকও আমার দোল্‌নায় শুইয়া থাকার অনুমোদন করিয়াছে। আমার বন্ধুরা বলে আমি অলস। ছুটীতে বিশ্রাম করিতে আসিয়াছি। কেন ছুটোছুটী করিব?" চলিয়া আসিবার দিন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম—"আপনি যথাসময়ে 'নির্ব্বাণ' লাভ করুন। আর ৭০ বৎসর পরে যখন এই নশ্বরদেহ ছাড়িয়া দিব্যধামে যাইতে হইবে, তখন গ্রীক্ কবিদের বর্ণিত Euthanasia যেন আপনার অদৃষ্টে জোটে"।

যাহারা বিশ্রাম করিতে আসিয়া অকারণ ছুটোছুটি করিতেছিল তাহাদিগকে আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। যতই ঠাট্টা করি, এক একটী লোকে যে কাজ করিতেছে তাহা আমাদের দেশের দেড়জনের নিশ্চয়ই, হয়ত দুইজনের কাজের সমান।

১২ই জুলাই রাত্রিতে আপিসে গিয়া হিসাব শোধ করিলাম। আপিসে বলিয়া আসিলাম যে ১৩ই জুলাই ভোর বেলা ৭টার সময় কারি মেসের শিবির ছাড়িয়া ওয়াওনা (Wawona) হইয়া ঘোড়ার পায়ের নালের মত বাঁকান পথে (Horse-shoe Route) মিয়ামী কুটীর (Miami Lodge) হইয়া মারিপোজাস্থিত বিশাল-পাদপ-কুঞ্জ (Mariposa Grove of Big Trees) দেখিয়া মার্সেড্ (Merced) ফিরিব। আমার দুইটী ভারী মাল আছে। আমার তাঁবুর নম্বর বলিয়া দিলাম। মাল দুইটী যেন আমার তাঁবু হইতে আপিস ঘরের নিকট যেখানে ভোর বেলা গাড়ীতে চড়িব সেখানে আনা হয়। আরও জিজ্ঞাসা করিলাম যে আপিসের খাজাঞ্চীর (Cashier) নিকট নিরাপদে রাখিবার জন্ম আমার যে অর্থ গচ্ছিত আছে তাহা কি ভোর বেলা ফেরৎ চাহিলে পাইব, না আজ রাত্রিতেই ফেরৎ লইতে হইবে। উত্তর পাইলাম, দিন রাত্রি, ২৪ ঘণ্টা, যখন

আমার প্রয়োজন, আপিসে আসিলেই খাজাঞ্চীর নিকট এক মিনিটে গচ্ছিত অর্থ ফেরৎ পাইব। একজন না একজন আপিসে ২৪ ঘণ্টা থাকে। রাত্রিতে ফেরৎ লইবার প্রয়োজন নাই। বন্দোবস্ত শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম। আমাদের শিবিরের ঠিক পশ্চাতে সোজা খাড়া গ্রাণাইট (Granite) পাথরের পাহাড় উঠিয়াছে। আমাদের শিবির সমুদ্র হইতে প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চ। ঐ যে খাড়া প্রহরী পাহাড়, যার গায়ে একটীও ঘাস বা লতাপাতা নাই, তিনি আবার তার উপরে আরও ৪০০০ ফুট উচ্চ। একজন লোক সারাদিন কাঠ বহিয়া ঐ পাহাড়ের উপরে লইয়া যায়। কারি মেমসাহেবের তাঁবুর সহরের অতিথিদের আনন্দের জন্য প্রতি রাত্রিতে সেই পাহাড়ের উপর কাঠের আগুন জালান হয়। নীচ হইতে চীৎকার করিয়া ইঙ্গিত করিলেই উপরের লোকেরা সেই জলন্ত আগুন পাহাড়ের গা দিয়া নীচে ফেলিয়া দেয়। দেখিতে অতি সুন্দর হয়। ইহার নাম অগ্নি-প্রপাত (Fire Fall)। দিনের বেলা সুন্দর সুন্দর জলপ্রপাত দেখিয়া আসিয়াছি। রাত্রিতে অগ্নিপ্রপাত দেখিতে লাগিলাম।

১৩ই জুলাই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতঃকৃত্য ও ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ করিলাম। তার পরে আমার জিনিষ গুছাইবার পালা। আমার সঙ্গে ছিল ছোট একটি চামড়ার ব্যাগ্। সুহৃদ্বরের কলিকাতার কারখানায় তৈয়ারী খাঁটী স্বদেশী সুশোভন একটী ব্যাগ্। এটী ছোট হাল্কা মাল। ভারী মাল দুইটি। একটী চরকায় কাটা তিব্বতীয় পশমে হাতে, তাঁতে বোনা সিকিমী কম্বল। সেই কম্বলটী সুকৌশলে পাট করিয়া, কপটতা প্রণোদিত হইয়া ও মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম এড়াইবার মৎলবে, তাহার মধ্যে অতি সাবধানে ও সঙ্গোপনে রাখিলাম কলিকাতা হইতে প্রকাশিত প্রায় এক মাসের দৈনিক সংবাদপত্র ও কতকগুলি বই, আর পরিহিত অপরিষ্কার কয়েকটী কামিজ, স্বদেশী লংক্লথের তৈয়ারী। চামড়ার ছাঁদন দড়ি বাঁধন দড়ি দিয়া সিকিমিকম্বলের পুটুলিটীকে এমন করিয়া বাঁধিলাম যে ময়লা কামিজ বাহির হইতে কিছুতেই দেখা যাইবে না ও বই ও কাগজ ছাঁদন দড়ি বাঁধন দড়ির ভিতর দিয়া কিছুতেই পড়িবে না। দ্বিতীয় ভারী মাল একটী চামড়ার বিলাতী সুটকেস্ (Suit Case) বইয়ে ও কাপড়ে তাহা অন্ততঃ ৩৫ সের ভারী হইয়াছে। বহিয়া বহিয়া আমার হাতের বজ্র, কাঁধের জোড়া ও বাহুর মাংসপেশী ইতিমধ্যেই মজবুৎ হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম কয়েকদিন হাত ও কাঁধ ব্যথা করিত। প্রায়ই মুটে পাইতাম না সময় মত। অথচ রেলগাড়ী ছাড়িয়া যায়। তার পরে কর্দ্দ্দম পথ বহিয়া নিবার পর হয়ত এক নিগ্রো মুটে আসিয়া আমাকে সাহায্য করিল। পয়সাও দিলাম, হাত ও কাঁধও শক্ত হইল। তাহারও লাভ, আমারও উপকার। একাধিক বার মুটেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "তোমার সুটকেস্ এত ভারি কেন?" আমি উত্তরে বলিয়াছি—'বৃটিশ বুষের (Jonn Bull) আস্ত চামড়ার তৈয়ারী জিনিষ। জানতো জন বুলের চামড়া ভারী পুরু You know John Bull has a very thick hide."। জিনিষ পত্র গুছাইয়া ভারী মাল দুইটী আমার তাঁবুর ঠিক বাহিরে রাখিয়া দিলাম। টিকিটে লিখিয়া গেলাম কোথা হইতে কোথা যাইবে।

১৩ই জুলাই আর আমার সে নিয়মে চলিতেছে না। "শুইতে পারিলে বসিবে না" ইত্যাদি নিয়ম আজ আর খাটিতেছে না। সেই মার্কিনী সুন্দরীর তাঁবু আমার তাঁবু হইতে ৪।৫ তাঁবু ব্যবধানে ছিল। এত ভোরে তিনি উঠেন নাই নতুবা আমার দ্রুত পদবিক্ষেপ দেখিয়া তিনি একটু আমোদ পাইতেন। করি কি? ৬।০টার সময় ভোজন-শালার দরজা খুলিবে। ম্লেচ্ছদেশে সভ্য আর্য্যসন্তানের এই দুর্দ্দশা। ঠিক ৬।০টায় গিয়া খাইতে বসিলাম। খাওয়া শেষ করিয়া মাল সমেত অন্ততঃ ৭টা বাজিবার ৫ মিনিট পূর্ব্বে আপিস ঘরের নিকট গাড়ীতে উঠিবার জন্য তৈয়ার থাকিতে হইবে। পূর্ব্ব রাত্রির তালিকা দেখিয়া নাম ডাকিবে। নাম ডাকিবা মাত্র মোটর গাড়ীতে উঠিয়া বসিতে হইবে।

খাওয়া শেষ করিয়া পৌণে ৭টার সময় আপিস্ ঘরে আসিয়া দেখি তখনও আমার ভারী মাল দুইটী আসিয়া পৌছে নাই। আপিসে একবার জানাইলাম। তাহারা বলিল—"গতকল্য রাত্রিতে মালের কথা আপিসে লিখাইয়া গিয়াছিলে ত?" আমি বলিলাম "হুঁ"। তাহারা বলিল, "তাহা হইলে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এখনও ১৫ মিনিট সময় আছে। যথা সময়ে মাল আসিয়া পৌছিবে"। গচ্ছিত টাকা খাজাঞ্চীর নিকট হইতে ফেরৎ লইলাম। ঠিক সময়ে ভারী মাল আসিয়া মালের মোটর গাড়ীতে উঠিয়া রওনা হইয়া গেল। ৭টার সময় আমাদের নাম ডাকা হইল। কারি মেমসাহেবের শিবির হইতে অতিথি চলিয়া যাইবার সময় চীৎকার করিয়া এক ভঙ্গীতে শিবিরের কয়েকজন পুরুষ বিদায় বিজ্ঞাপন দেয়। বিদায় পাইয়া আমরা মোটরে চড়িয়া রওনা হইলাম।

শ্রী ইন্দুভূষণ সেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুণী

পুন্নিকা।

পুন্নিকা একজন দাসীকন্যা। তাঁহার প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি কি প্রকারে এক স্নাতক ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন, থেরীগাথাতে তাহার বিবরণ পাওয়াযায়। পুন্নিকা ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—

"আমি জল আনিতাম, গৃহকর্ত্রীদিগের তিরস্কার এবং দণ্ড ভয়ে ভীত হইয়া শীতকালেও আমাকে জলে অবতরণ করিতে হইত। কিন্তু হে ব্রাহ্মণ! তুমি কাহার ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বদাই জলে অবতরণ কর? কেন কম্পমান দেহে এত শীত অনুভব কর?

ব্রাহ্মণ বলিলেন—

হে পুন্নিকে! তুমি জানিয়াও কেন আবার প্রশ্ন করিতেছ? ইহা কুশলকর্ম্ম, ইহাতে

পাপের নিরোধ হয়। বৃদ্ধ বা বালক, যে কেহই পাপকর্ম্ম করুক না কেন, উদকাভিষেচন দ্বারা সে সেই পাপকর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করে।

পুণ্ণিকা। কোন্ মূর্খের মূর্খ তোমাকে বলিয়াছে যে উদকাভিষেক দ্বারা পাপ চলিয়া যায়? তাহা হইলে সমুদায় মণ্ডুক, কচ্ছপ, নাগ, সুসুমার এবং অপরাপর জলচর জন্তুও স্বর্গে গমন করিবে। মেষঘাতক, শূকরঘাতক, মৎস্যঘাতক, মৃগঘাতক, চোর, নরঘাতক, এবং অপর পাপকর্ম্মিগণও উদকাভিষেক দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

যদি নদী সমূহ পূর্ব্বকৃত পাপ বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, তবে তাহারা পুণ্যও বহন করিয়া লইয়া যাইবে; তখন তোমার সবই চলিয়া গেল।

হে ব্রাহ্মণ! ভয়ে ভীত হইয়া জলে অবগাহন করিতেছ, এরূপ আর করিওনা, শীতে তোমার ত্বক্‌কে আর কষ্ট দিওনা।

ব্রাহ্মণ। হে ভবতি! আমাকে কুমার্গ পরিত্যাগ করাইয়া আর্য্যমার্গে আনয়ন করাইলে। তোমাকে এই স্নানের বস্ত্রখানা দিতেছি।

পুণ্ণিকা। হে ব্রাহ্মণ! বস্ত্র তোমারই থাকুক, আমি বস্ত্র চাহিনা। যদি অকল্যাণকে ভয় কর, যদি অকল্যাণকে অপ্রিয় বলিয়া মনে কর, তবে প্রকাশ্যে বা গোপনে পাপকর্ম্ম করিও না। যদি কোন পাপকর্ম্ম করিয়া থাক, বা ভবিষ্যতে পাপকর্ম্ম কর, দুঃখ হইতে অব্যাহতি নাই। যদি দুঃখকে ভয় কর, যদি দুঃখকে অপ্রিয় বলিয়া মনে কর তবে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের শরণ গ্রহন কর; শীলধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহাতে তোমার কল্যাণ হইবে।

ব্রাহ্মণ। আমি বুদ্ধের, ধর্ম্মের ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। আমি শীলধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি, ইহাতে আমার কল্যাণ হইবে।

আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মবন্ধু ছিলাম, অদ্য প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইলাম; আমি ত্রিবিদ্যা ও বেদসম্পন্ন, শ্রোত্রিয় এবং স্নাতক হইলাম।

পুণ্ণিকা স্বয়ং শীলধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভিক্ষুনী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া অর্হৎ হইয়াছিলেন।

ইসিদাসী-(ঋষিদাসী)-।

থেরীগাথাতে ইসিদাসী নাম্নিকা এক থেরীর বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ হইতে আমরা নিম্নলিখিত অংশ গ্রহণ করিলাম।

পাটলীপুত্র নামক নগরে শাক্যবংশীয়া দুই গুণবতী ভিক্ষুণী বাস করিতেন। একজনের নাম ইসিদাসী, আর একজনের নাম বোধী। ইঁহারা শীলসম্পন্না ধ্যানপরায়ণা এবং বহুশ্রুতা ছিলেন। এক দিন ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবার পরে পাত্র ধৌত করিয়া দুইজনে শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন স্থানে এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

বোধী বলিলেন—

আর্য্যে ইসিদাসী! প্রমোদিণী তোমার মূর্ত্তি, যৌবন কালও তোমার অতীত হয় নাই; তবে সংসারে কি দেখিয়া তুমি নৈষ্কর্ম্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে?

এই প্রশ্ন শুনিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যাকুশলা ইসিদাসী তাঁহাকে বলিলেন—

বোধি ! শুন, আমি কি প্রকারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি। আমার পিতা একজন শীলবান্ শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি উজ্জয়িনী নামক শ্রেষ্ঠ নগরে বাস করিতেন। আমি তাঁহার প্রাণপ্রিয় এবং অতি আদরের সন্তান ছিলাম। সাকেত নগর হইতে একজন উচ্চকুলসম্ভূত ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী আমাদিগের গৃহে আগমন করিয়া পিতাকে বলিলেন—"আপনার কন্যাকে আমি পুত্রবধূ করিতে ইচ্ছা করিতেছি"। পিতা ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া আমাকে তাঁহার পুত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। শ্বশুর শাশুড়ীকে কি প্রকারে সম্মান করিতে হয়, মাতাপিতা আমাকে সে বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই অনুসারে আমি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করিতাম, মস্তক অবনত করিতাম এবং তাঁহাদিগের পাদবন্দনা করিতাম। স্বামীর ভগিনী ভ্রাতা ও পরিজনকে দেখিবামাত্রই আগ্রহের সহিত তাঁহাদিগকে আসন প্রদান করিতাম। অন্ন, পান এবং খাদ্যাদি যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্যক, তাহা একস্থলে রাখিয়া দিতাম এবং যাহাকে যাহা দেওয়া আবশ্যক তাহাকে তাহা দিতাম। যথাসময়ে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া গৃহকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতাম এবং হস্তপদ প্রক্ষালণ করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া স্বামীকে সম্ভাষণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। চিরুনি, অঞ্জন, আয়না প্রভৃতি লইয়া পরিচারিকার ন্যায় তাঁহাকে বিভূষিত করিতাম। স্বয়ং রন্ধন করিতাম, স্বয়ং ভোজন পাত্র ধৌত করিতাম। মাতা যেমন একমাত্র পুত্রের পরিচর্য্যা করে, আমিও তেমনি ভর্ত্তার পরিচর্য্যা করিতাম। এমন করিয়া স্বামীর পরিচর্য্যা করিতাম, তবুও স্বামী আমাকে ভালবাসিতেন না। একদিন তিনি তাঁহার মাতাপিতাকে বলিলেন "আমাকে অনুমতি দাও, আমি অন্যত্র চলিয়া যাই, ইসিদাসীর সহিত বাস করিব না, তাহার সহিত এক গৃহে থাকিব না"। তাঁহারা বলিলেন,—"পুত্র! এপ্রকার বলিওনা, ইসিদাসী পণ্ডিতা ও বুদ্ধিমতী; সে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে এবং অনলস হইয়া কার্য্য করে। তবুও কেন সে তোমার প্রিয় হইল না" ? ইহা শুনিয়া স্বামী বলিলেন—"সে আমার কোন হিংসা করে নাই। কিন্তু আমি ইসিদাসীর সহিত বাস করিব না, আমি তাহাকে ভালবাসি না"।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমার শ্বশুর এবং শাশুড়ী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি অপরাধ করিয়াছ, বিশ্বাস করিয়া যথাভূত বল"।

আমি বলিলাম,—"আমি কোন অপরাধ করি নাই, হিংসাও করি নাই, এবং দুর্ব্বচনু শুনিয়াও কখন তাহা গ্রাহ্য করি নাই। আমি এমন কিছু করি নাই, যে জন্য তিনি আমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন"।

তাঁহাদিগের ইচ্ছা, পুত্র গৃহে থাকে; এইজন্য অতি দুঃখিত মনেই তাঁহারা আমাকে আমার পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন।

পিতা আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিলেন। প্রথম বিবাহে যে শুল্ক পাইয়াছিলেন, এবার লইলেন তাহার অর্দ্ধাংশ; আমি স্বামীগৃহে গমন করিলাম এবং সেখানে বাস করিলাম এক মাস। যদিও দোষবিরহিতা এবং শীলসম্পন্না হইয়া দাসীর ন্যায় সকলের পরিচর্য্যা করিতাম, তবুও তাঁহারা আমাকে সেখানে থাকিতে দিলেন না, তাঁহারা আমাকে পিতৃগৃহে

রাখিয়া গেলেন। ইহার পরে একদিন দান্তপ্রকৃতি একজন ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য আমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন—"তোমার কৌপীন এবং ঘটি ফেলিয়া দাও; তুমি জামাতা হইয়া এই গৃহে বাস কর"। তিনি সম্মত হইয়া আমাদিগের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক পক্ষ পরে তিনি পিতাকে বলিলেন—"আমাকে কৌপীন ও পাত্রাদি ফিরাইয়া দাও; আমি পুনরায় ভিক্ষুরূপে বিচরণ করিব"।

আমার পিতা ও জ্ঞাতিবর্গ সকলেই তাঁহাকে বলিলেন, "বল, তোমার কি অসুবিধা হইতেছে, যাহা করিলে তোমার সুবিধা হয়, তাহাই করিব"।

ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"আমি নিজের জন্য যাহা করিতে পারি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; আমি ইসিদাসীর সহিত ঘর করিব না"।

তিনিও চলিয়া গেলেন এবং আমি একাকিনী আত্মচিন্তা করিতে লাগিলাম। তাহার পরে মাতাপিতাকে বলিলাম—"অনুমতি দিন, আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব! না হয় আমি মরিয়া যাইব"। এই সময়ে বহুশ্রুতা, শীলসম্পন্না, ভিক্ষুণী জিনদত্তা ভিক্ষার জন্য আমাদিগের গৃহে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা উত্থিত হইলাম, তাঁহাকে বসিবার আসন দিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলাম এবং অন্নপানাদি দ্বারা তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। তাহার পরে আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আর্য্যে! আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব"। মাতাপিতা আমাকে বলিলেন,—"হে পুত্রিকে! গৃহে থাকিয়াই তুমি ধর্ম্মচর্য্যা কর এবং অন্নপানদ্বারা শ্রমণ ও দ্বিজাতির সেবা কর"।

আমি রোদন করিতে লাগিলাম এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম —"আমি পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম করিয়াছি, এখন আমি তাহার বিনাশ করিব"। তখন মাতা পিতা বলিলেন—"যাও, তুমি অগ্রধর্ম্ম ও বুদ্ধত্ব লাভ কর। দ্বিপদশ্রেষ্ঠ গোতম যে নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা তুমিও প্রত্যক্ষ কর"।

ইহার পরে মাতাপিতা ও জ্ঞাতিগণকে অভিবাদন করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলাম।

ইহার পরে ইসিদাসী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেন। ইনি একজন থেরী। থেরীগাথার পঞ্চদশ অধ্যায় ইঁহার রচনা। লিখিত আছে সমুদায় কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া ইনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

* পর প্রবন্ধে আরও কয়েকজন ভিক্ষুণীর বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

মিশরের কৃষি

বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি আমার জন্মভূমি পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট, অভাব অনাটন লাগিয়াই আছে। অকালবন্যা, আকস্মিকবন্যা, অতিবন্যা, অতিবৃষ্টি, এবং অনাবৃষ্টি অথবা জলাভাব জনিত শস্যহানি ইহাদের প্রধান কারণ। যে বৎসর অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টির অত্যাচার হয়, সে বৎসর প্রথমবারের বীজ নষ্ট হইয়া গেলেও তৎপরিবর্ত্তে দুইবার কিংবা তিনবার অকালে বীজ বপন করিয়া পূর্ণ ফসল না হউক অর্দ্ধ কিম্বা একতৃতীয়াংশ

ফসল জমি হইতে উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। কিন্তু হায়, নিদারুণ আকস্মিক বন্যা কিংবা অতিবন্যায় সে সুবিধাটুকুও ঘটিয়া উঠে না। প্রত্যহ দুইগজ তিনগজ পরিমাণ জল বর্দ্ধিত হইয়া তিন চারিদিনের মধ্যেই "সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং," লক্ষ্মীনিকেতন, ভারতের শস্য ভাণ্ডার, সাধের বঙ্গভূমি বুকভরা পক্ক অপক্ক শস্য লইয়া কৃত্রিম জলধির আকার ধারণ করে। তৎপর দরিদ্র প্রজার যে দশা উপস্থিত হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহাই হইল কৃষি সর্ব্বস্ব বঙ্গদেশের কৃষিচিত্র।

যে দেশের বুকের উপর দিয়া পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, হাউরা, গোমতী, দামোদর, বরাকরের ন্যায় উন্মত্ত নদী সকল প্রবাহিত হইয়া যায়, সে দেশে অতিবৃষ্টিহেতু অতিবন্যা বা আকস্মিক বন্যা স্বাভাবিক। পর্ব্বতোপরি জল প্রপাতের বারিধারার ন্যায় বৃষ্টিধারা পতিত হইয়া এবং শীত ঋতুর জমাট তুষাররাশি বিগলিত হইয়া যখন প্রলয়ঙ্কর জল স্রোতের সৃষ্টি করিয়া দেয়, আর সেই জলস্রোত গ্রাম, ঘর, মাঠ, শস্য এবং কোথা ও কোথাও বা মনুষ্য পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া তড়িৎবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন তাহার গতিরোধ মানব শক্তির সাধ্যাতীত।

প্রবল বেগবতী নদী অন্যদেশেও আছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অন্যদেশেও সম্ভব। কিন্তু জলের অভাবে অথবা আকস্মিক বন্যায় অথবা অতিবন্যায় বৎসরের পর বৎসর শস্য নাশ করিয়া দুর্ভিক্ষ অন্য কোথাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লয় নাই।

মহাসমরের সময় কার্য্যোপলক্ষে তিনবৎসর মিশর দেশে বাস করিয়াছি। মিশরে যে কখনও বৃষ্টি হয় না তাহা নহে। কিন্তু সে বৃষ্টির পরিমাণ এমন হয় না যাহাতে সমগ্র দেশকে বৎসরাবধি চাষের উপযোগী সিক্ত করিয়া রাখিতে পারে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আদমের কালের লাঙ্গল দ্বারা হাল চাষ করিয়াও মিসরবাসিগণ তাহাদের কৃষিসম্পদ ও ঐশ্বর্য্য অতুলনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

দক্ষিণ পর্ব্বতে যেটুকু বারিধারা শীতঋতুতে তুষার হইয়া জমিয়া থাকে গ্রীষ্মের উত্তাপে তাহা বিগলিত হইলে তড়িৎবেগের ন্যায় দ্রুতগামী নীল নদের প্রবল জলস্রোত সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়া যাইতে চায়। কিন্তু প্রাচীন মিশরের আশ্চর্য্য উদ্যম এবং প্রতিভাবলে এই ভীষণ নদীর সংরুদ্ধ এবং সংযত জলরাশি মিশরের কৃষিপ্রাণকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। যুগ যুগান্তর হইতে বৎসরের পর বৎসর আষাঢ় মাসে নদীর জল বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং আশ্বিন মাসে নদী পূর্ণ হইয়া সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িতে চায়। বর্ত্তমান মিশরবাসীদের পূর্ব্ব পুরুষেরা নীল প্রদেশে অদ্ভুত কৌশলে যে সকল খাল এবং জলাশয় কাটিয়া গিয়াছেন, নদীর জল তাহাতেই প্রবাহিত হইয়া বৎসরাবধি সঞ্চিত থাকে, কখনও দেশব্যাপী জলপ্লাবনের সৃষ্টি করিয়া কৃষকের সর্ব্বনাশের হেতু হয় না। এই খাল এবং বিলের সঞ্চিত জল প্রয়োজন মত শস্যক্ষেত্রে নীত হইয়া কৃষির জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। বৃষ্টির অল্পতা এবং ভূমির প্রাকৃতিক উচ্চতার জন্য অল্পকাল পরেই এই সঞ্চিত জল নামিয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও মিশর-কৃষক বিপন্ন হয় না। তখন সে তাহারই পূর্ব্ব পুরুষের আবিষ্কৃত সহজ, অনাড়ম্বর উত্তোলন ও সেচন যন্ত্র সুকৌশলে ব্যবহার করিয়া ক্ষেত্রের প্রয়োজনানুসারে তাহাকে সিক্ত করিয়া লয়।

গত তিন বৎসরের ভিতর আমি মিশর রাজ্যে কোথাও জলপ্লাবন দেখি নাই। জলাভাবে চাষের কাজ দিনেকের তরেও বন্ধ থাকিতে দেখি নাই। ফসলের পর ফসল বুনা হইতেছে ও কাটা হইতেছে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। যেন একটী মহান যন্ত্রবলে চালিত হইয়া অবিরাম ধারায় শস্য ঢালিয়া দিতেছে। এমন ভূমি নাই যাহা হইতে মিশরীয় কৃষক প্রতি বৎসর চারিটীর কম ফসল উৎপন্ন করিয়া থাকে। কৃষকদের মুখে শুনিয়াছি কোন কোন ফসল নাকি বৎসরে ছয়টীও উৎপন্ন করা যায়।

বন্যাজলে দেশ আর পূর্ব্বের ন্যায় প্লাবিত হয় না বলিয়া সারাবৎসরই সমগ্র দেশ শুষ্ক থাকে, সুতরাং মাঠের মধ্যে কূপ অথবা খাল কাটিয়া প্রতি ভূমিখণ্ডে জলসেচনের স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পাঠক মনে করিতে পারেন কেবলমাত্র সিঞ্চিত জলে শস্যোৎপাদন করা না জানি কতই কষ্টকর, কিন্তু বাস্তবিক তাহা অতি অনায়াস-সাধ্য এবং অল্প ব্যয়সম্পন্ন। এই প্রণালীতে মানুষকে একবিন্দু জলও হস্তদ্বারা সেচন করিতে হয় না। অথচ যখন যে পরিমাণ জলের দরকার একটী মাত্র বলদের সাহায্যে একটী মাত্র চক্র ঘুরাইয়া ঠিক সেই সময় সেই পরিমাণ জল সরবরাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মিশরে বৃষ্টিপাত নাই বলিলেই হয়। সুতরাং মিশরীয় কৃষক ফসলের জন্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরও করেনা এবং তাহার অবসানের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াও থাকে না। একটী ফসল কাটা হইয়া যাওয়া মাত্রই তৎপরদিন জল সেচিয়া অন্য ফসলের বীজ বুনিয়া দেয়। শীতেরও বিচার নাই বর্ষারও বিচার নাই, সর্ব্বদাই বুনাও হইতেছে কাটাও হইতেছে। মিশর রাজ্যে বীজ বুনার এবং শস্য কাটার বঙ্গদেশের ন্যায় একটি নির্দ্দিষ্ট মৌসুম নাই। মিশরীয় কৃষক যে কোন ফসলের বীজ যে দিন ইচ্ছা বপন করিতে পারে। বীজের অঙ্কুর হইতে ফসল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অতিবন্যা, আকস্মিক বন্যা কিংবা জলাভাব প্রভৃতি কৃষিশত্রু মিশরীয় কৃষকদের কোন প্রকার শত্রুতাই সাধন করিতে পারে না। মিশরীয় কৃষক বীজ বুনিলেই শপথ করিয়া বলিতে পারে তাহার জমিতে ফসল জন্মিবেই। ইহাই মিশরীয় কৃষির সৌন্দর্য্য, ইহাই মিশরীয় কৃষির গৌরব। মিশরাধিপতি ফেরাউন্ বোধ হয় ইহারই গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া "খোদাই দাবী" করিয়াছিলেন।

মিশরের সে অতীত গৌরব লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার কৃষিসম্পদ হইতে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। এখনও নীল নদী এবং কৃষিই মিশরের প্রাণ। সেই অতি পুরাতন প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বর্ত্তমানযুগের পূর্ত্তকারগণ যে আয়োজন করিয়াছেন, মিশরবাসকালে যাহা স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, নীলবন্ধ তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

নীলবন্ধ

নীলবন্ধ নামে বোধ হয় সকলেই নীলনদীর বাঁধই বুঝিবেন। কিন্তু, তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে ইহা আমাদের দামোদর এবং গোমতী প্রভৃতি নদী সমূহের তীরবৎ ক্ষণস্থায়ী মৃন্ময় বাঁধ। ইহা নীল নদীর এক তীর হইতে অপর তীর পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে লৌহ এবং প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় জলবন্ধ। নীল নদীর উপরে এরূপ কতিপয় বাঁধ আছে।

তন্মধ্যে একটি মিশর রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় আসুয়ান নামক জনপদের নিকটবর্ত্তী। আর একটি কায়রো নগরের পঁচিশ মাইল উত্তরে নীল নদীর ডেমটা এবং রসেটা নামক শাখাদ্বয়ের উপর অবস্থিত। আসুয়ান সহরের নিকট নীল নদী একটি শৈলময় পার্ব্বত্যগুহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত। নীল নদীর প্রবেশ এবং বহির্গমনের পথ ব্যতীত ঐ পার্ব্বত্যগুহার আর কোন প্রবেশদ্বার নাই। বিস্তার এবং গভীরতায় গুহাটি একটি ছোট খাট উপসাগর সদৃশ হইবে। গুহা হইতে নীল নদীর বহির্গমনের পথের উপর প্রথম বাঁধটি নির্ম্মিত হইয়াছে। বাঁধের উচ্চতা নদীর পার্শ্বস্থ শৈলমালার উচ্চতার সমান। সুতরাং বাঁধটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিলে উর্দ্ধদেশ (উজান) হইতে আগত যে জলধারা মিশররাজ্যকে আধুনিক বঙ্গদেশের ন্যায় প্লাবিত করিয়া দিত তাহা উক্ত গুহা মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যায়। এই আবদ্ধ জল অল্প অল্প করিয়া মুক্ত করিয়া দিয়া সারাবৎসর নদীর স্রোতকে সজীব এবং পুষ্ট রাখা হয় এবং পারস্য চক্রের সাহায্যে প্রয়োজন অনুসারে এই জল প্রতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই গুহাটি আসুয়ান নামক সহরের নিকট অবস্থিত বলিয়া এবং ইহা একটি জল ভাণ্ডারের (reservoir) কাজ করিতেছে বলিয়া ইংরাজীতে ইহাকে Assouan Reservoir, আসুয়ান জলভাণ্ডার, বলা হইয়া থাকে।

নীল নদীর উভয়তীর হইতে কতকগুলি খাল কাটিয়া দেশের অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে জল পৌঁছান হইয়াছে। তৎপর তথা হইতে শাখা প্রশাখা কাটিয়া প্রতি ভূমিখণ্ডে জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে। শীত কালে যখন নদীর স্রোত স্বভাবতঃই ক্ষীণ হইয়া আসে, এবং নদীর জলের গভীরতা কমিয়া যায় তখন খালে আর জল স্বতঃ প্রবাহিত হইতে পারে না। পূর্ব্বে ভাণ্ডারের জল ছাড়িয়া দিয়া নদীর স্রোতকে পুষ্ট রাখা হইত, কিন্তু তাহাতে জলের অল্প ভাগই কাজে লাগিত এবং বেশীর ভাগ তীব্রগতিতে সাগরে চলিয়া যাইত। কাজেই জলের অপব্যয় হইয়া বৎসরের শেষভাগে দেশে জলের অভাব পড়িয়া যাইত। জলের এই অপব্যয় নিবারণের জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত বাঁধদ্বয় ব্যতীত দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও কয়েকটি বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাঁধগুলি দ্বারা বহুপরিমাণ জল স্থায়ীভাবে দেশমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সংবৎসর সেইজল কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাই জনৈক ইংরাজলেখক বলিয়াছেন * "Not a drop reaches the sea without having done its duty"—অর্থাৎ নীল নদীর একবিন্দু জলও স্বীয় কাজ সমাধা না করিয়া (অর্থাৎ কৃষিকর্ম্মে ব্যবহৃত না হইয়া) সমুদ্র পর্য্যন্ত যাইতে পারে না।

ডেমটা ও রসেটা নামক শাখাদ্বয়ের উপর যে বাঁধ নির্ম্মিত, তাহা উক্ত শাখাদ্বয় যে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া নিম্নমিশরের বদ্বীপ (Delta) সৃষ্টি করিয়াছে, সেই স্থানের অর্থাৎ বদ্বীপের শীর্ষভাগের উপর অবস্থিত বলিয়া তাহাকে ইংরাজেরা Delta Barrage বা বদ্বীপ বাঁধ বলিয়া থাকে। আমি নীল নদীর উপরিস্থ সমুদায় বাঁধগুলিকেই নীলবন্ধ নাম দিলাম। এই বাঁধ দেখিয়া তাহার নির্ম্মাণ কৌশল যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি তাহারই বর্ণনা করিতেছি।

* Binding of the Nile by Hon. Sidney Peel.

প্রথমতঃ নদীর একতীর হইতে তীরান্তর পর্য্যন্ত নদীগর্ভে পরস্পর সাড়ে তিনগজ অন্তর একসারি প্রস্তরস্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছে। এই স্তম্ভগুলি রেলপথের সেতুস্তম্ভের অবিকল অনুরূপ। স্তম্ভরাজির উজানের দিকে প্রত্যেক স্তম্ভের উভয় পার্শ্বে উপরে এবং নীচে খাঁচ কাটিয়া সেই খাঁচে অন্ততঃ অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরু লৌহপাত বসাইয়া দিয়া স্তম্ভমধ্যস্থ ফাঁকগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চতুষ্কোণ লণ্ঠনের আয়নার ন্যায় এই লৌহপাতগুলিকে টানিয়া উপরে উঠাইতে এবং পুনরায় দরকার মত বসাইয়া দিতে পারা যায়। সুতরাং আবশ্যকমত যতইচ্ছা জল নদী মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে এবং দরকার পড়িলে যতইচ্ছা জল বহির্গত করিয়াও দিতে পারা যায়। ছোট একটি লৌহ নির্ম্মিত হস্তচালিত উত্তোলক যন্ত্রের সাহায্যে এই পাতগুলি উঠান এবং বসান হইয়া থাকে।

উত্তোলক যন্ত্রটি যখন যে পাতে ইচ্ছা সেই পাতের উপর সহজে আনিবার জন্য পাতগুলির উপরে উপরে স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সরু সরু লৌহশিক স্থাপন করিয়া রেলপথের ন্যায় একটি লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যন্ত্রটি নদীর এক ধারে সেই লৌহপথের উপরে সর্ব্বদাই ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকে।

প্রত্যেক পাতের সহিত একটি লৌহ শিকল দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। যে কোনও একটি পাত টানিয়া উঠাইতে হইলে উত্তোলক যন্ত্রটি সেই পাতের উপর আনিয়া শিকলের উন্মুক্ত মুখ যন্ত্রস্থ একটি লৌহদণ্ডে আবদ্ধ করিয়া যন্ত্রের হাতা ঘুরাইলেই শিকলটি তাহাতে পাক খাইতে থাকে। নিকটস্থ অর্গলে শিকলটাকে জড়াইয়া দিলেই পাতটি আর নীচে নামিতে পারেনা। তখন উত্তোলক যন্ত্রটি অন্যত্র ব্যবহারের জন্য মুক্ত হয়। এইরূপে যতইচ্ছা পাত উঠান এবং বসান যাইতে পারে। পাতের তলদেশ দিয়া জল বহিয়া গিয়া বাঁধের ভাটির দিকের স্রোতকে পুষ্ট রাখে।

উত্তোলক যন্ত্রের লৌহ পথটি স্তম্ভগুলির উপরিভাগে এক পাশ দিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, বাকী অংশের উপরে খিলান ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া লৌহপথের সহিত সমান্তরালভাবে অতি মনোরম একটি সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতুটি প্রস্থে প্রায় পোনর গজের কম হইবে না। তাহার উপর দিয়া মনুষ্য, গোযান, অশ্বযান প্রভৃতি অনায়াসে গমনাগমন করিয়া থাকে। লৌহবর্ত্ম বসাইয়া লইলে উহার উপর দিয়া বাষ্পীয় শকটও নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতে পারিবে।

স্তম্ভের যে পার্শ্বে লৌহপাত বসান হইয়াছে সেই পার্শ্বে জলের কিঞ্চিৎ নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উপর পর্য্যন্ত স্তম্ভের গায়ে কতকগুলি থাক্ কাটিয়া রাখা হইয়াছে। এই থাকের উপর তক্তা পাতিয়া প্রথমোক্ত সেতুর নীচে অল্প পরিসর আর একটি সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। থাকের সংখ্যা একাধিক হওয়াতে সেতুটিকে জলের উচ্চতার হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকমত নীচে নামাইতে এবং উপরে উঠাইতে পারা যায়। এই শেষোক্ত সেতুতে অবতরণ করিবার জন্য প্রথমোক্ত সেতু হইতে তিন স্থানে তিনটি সিঁড়ি লাগান থাকে। ইঞ্জিনীয়ারগণ এই সেতুতে যাতায়াত করিয়া প্রত্যহ বাঁধটি পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

নৌকা এবং জাহাজ এই অসমতল জলস্রোত, দুইটি সেতু, এবং একটি বাঁধ অদ্ভুত উপায়ে অতিক্রম করিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। স্তম্ভনির্ম্মাণ কালে নদীর একধারে

একটু স্থান ছাড়িয়া দিয়া স্তম্ভনির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে ছাদশূন্য এমন একটি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে যাহার ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারের সরিৎগামী জাহাজের সংকুলান হইতে পারে। সর্ব্বপ্রথম স্তম্ভটি অন্যান্য স্তম্ভ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রশস্ত এবং তাহাই এই প্রকোষ্ঠের একটি দেওয়াল হইয়াছে, ইহারই সহিত সমান্তরাল ভাবে নদীর তীর ঘেঁসিয়া অপর একটি দেওয়াল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দেওয়ালদ্বয়ের উভয় প্রান্তে দুই জোড়া লৌহ কবাট প্রকোষ্ঠের অপর দুইটি দেওয়ালের কাজ করিতেছে। কবাটদ্বয়ের যে কোনও একটি বন্ধ করিয়া দিলেই উহা পূর্ব্বোক্ত লৌহপাতের ন্যায় বাঁধের কাজ করিয়া থাকে। এই প্রকোষ্ঠের উপর দিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ সেতুর সমান একটি ছাদ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই ছাদটি কব্জাদ্বারা সেতুর সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া সুন্দররূপে সেতুর কাজ পূর্ণ করিতেছে। জলযানাদি যাতায়াত করিবার সময় ছাদটি উঠাইয়া লওয়া হয়। একটি লৌহস্তম্ভের উপরে একটি দীর্ঘ লৌহদণ্ড আড়াআড়ি ভাবে স্থাপন করিয়া তাহার একপ্রান্ত শিকলদ্বারা ছাদের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া অপর প্রান্তে একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একজন মাত্র লোক এই দোদুল্যমান শিলাখণ্ড ধরিয়া ঈষৎ টানিলেই ছাদটি বাক্সের ঢাক্‌নার মত উঠিয়া আসে।

উজানের দিক হইতে নৌকা আসিলে প্রথমতঃ উজানের কবাটটি খুলিয়া দিয়া ভাটির দিকের কবাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে প্রকোষ্ঠের বাহিরের এবং ভিতরের জলের উচ্চতা সমান হইয়া যায়। তখন নৌকা অনায়াসে প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তৎপর উজানের কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া ভাটির কবাট সামান্য একটু ফাঁক করিয়া দিলেই প্রকোষ্ঠের জল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যায় এবং প্রকোষ্ঠের জলের উচ্চতা ভাটির জলের উচ্চতার সমান হইয়া যায়। তখন কবাটটি সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া দিলে নৌকা প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া নিরাপদে চলিয়া যাইতে পারে।

বারান্তরে মিশরের সেচন প্রণালী, পারস্য চক্র এবং মিশরীয় প্রথায় বঙ্গদেশের কৃষিকর্ম্ম করা যায় কিনা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসৈয়দ্ মনিরুজ্জমান।

শিক্ষার কথা

শিক্ষা সম্বন্ধে আজকাল আলোচনার একটা ঢেউ উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু এ আলোচনার নিবৃত্তি হইবার তখনি আশা করা যাইতে পারে, যখন শিক্ষার স্বরূপ আমাদের মনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। শিক্ষা বলিতে আমাদের *সাধারণ ধারণা রাশিকৃত পুস্তকে-অধীত বিদ্যা;* সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান পাইলেই শিক্ষার চূড়ান্ত হইল বলিয়া আমরা স্থির করিয়া বসি।

কিন্তু শিক্ষা কেবল মাত্র পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বা কখনো হইতেও পারে না; শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবের শক্তিসমূহকে প্রবুদ্ধ করা। বই পড়িয়া মানুষের বুদ্ধির

বিকাশ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলেই শিক্ষা যে সম্পূর্ণ হইল তাহা নয়,—পুস্তক শিক্ষা দানের বহুবিধ উপায়ের মধ্যে একটী উপায় মাত্র। দৈহিক ব্যায়াম, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা সঙ্গীত, সমস্তই শিক্ষার অঙ্গীভূত, কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না, তাহা হইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মানও আমাদের জ্ঞানের পথে খানিকটা অগ্রসর করাইয়া দেয় মাত্র, হয়তো বা জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয়। পুস্তক হইতে যে শিক্ষা পাইতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয় তাহার সূত্রটুকু মাত্র ধরাইয়া দেয়; তখন আমরা বুঝিতে পারি কি বই পড়িলে কোন্ পথে চলিলে আমাদের বুদ্ধির সব চেয়ে বেশী খোরাক যোগানো হইবে।

এইখানে এই কথা ওঠার সম্ভাবনা যে, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত প্রভৃতিকে যে শিক্ষার অঙ্গ বলা হইয়াছে, তাহাতে জগতের কাজ কতটুকু হইবে, এবং তেমন শিক্ষালাভের অবসর বা সামর্থ্যই বা কয় জনের আছে। যে কয়জনেরই সামর্থ্য বা অবকাশ হোক না কেন, কেহ যদি শিক্ষাকে সর্ব্বাঙ্গীণ করিয়া তুলিতে চায়, তবে তাহাকে এ-সমস্তই শিক্ষা করিতে হইবে। জ্ঞান অর্জ্জনই যদি মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মানুষকে সব দিক হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে; কেবলমাত্র একটী সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে একজন বিদ্বান্ হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে শিক্ষিত বলা যায় কিনা, বিবেচনার বিষয়; কেন না, শিক্ষার যে সর্ব্বতোমুখিতার দরকার, বিদ্যায় তাহার ততটা দরকার নাই। কোন এক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে বিদ্বান হওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত অর্থে তাহাকে 'শিক্ষিত' হওয়া বলা যায় না।

প্রথমেই বলা হইয়াছে, যে, শিক্ষা যে কেবল পুস্তকগত বিদ্যাই হইবে, একথা অমূলক। প্রমাণ খুঁজিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না, আকবর নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তিনি অশিক্ষিত একথা কি কেহ বলিতে পারেন? ইতিহাসের পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিলে এমন প্রমাণ বোধ করি আরো পাওয়া যাইবে। এমন কি সাধারণ লোকের মধ্যেও এমন লোক চোখে পড়ে যাহারা এমন অনেক বিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছে এবং অন্যকে দিতে পারে, যাহা বিশ্ববিদ্যালয় হাজার চেষ্টাতে পারে না। এ-সমস্ত ভূয়োদর্শিতার ফল, সুতরাং পুঁথি পড়িয়া এ শিক্ষা কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে?

বস্তুতঃ বিদ্যালাভের উপায় হয়তো মাত্র তিনটী, গুরুশুশ্রূষা, অর্থব্যয় অথবা বিদ্যাবিনিময়, —কিন্তু শিক্ষার উপায় অফুরন্ত। মানুষ দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি হইতেই প্রচুর শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া থাকে-ও। অবশ্য, পুস্তকেও মানুষের অভিজ্ঞতার বিষয় অনেক লেখা আছে, কিন্তু তাহা হইলেও একের অভিজ্ঞতা অন্যকে কখনই অভিজ্ঞ করিয়া তুলিতে পারে না, বাস্তব জীবনের প্রকৃত সত্যের সঙ্ঘর্ষে না আসিলে মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না। তেমনি একের চিন্তাশীলতার ফল অন্যকে চিন্তা হইতে রেহাই দিতে পারে না; কেননা, যতদিন প্রত্যেক মানুষের চিন্তাশক্তি আছে, ততদিন প্রত্যেকে নিজের মতানুযায়ী চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না, তবে অন্যের চিন্তার ফল পড়িয়া আমরা হয়তো ধারা-

বাহিক বা নিয়মবদ্ধভাবে চিন্তা করিতে শিখি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কেবল পুস্তক পাঠের শিক্ষা অসম্পূর্ণ।

কিন্তু কেন জানি না, আমাদের মনে এই এক বদ্ধমূল ধারণা হইয়া গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হইলেই সে শিক্ষিত হইয়া গেল। একটা সাধারণ জিনিষ আমরা বুঝি না, বুঝিবা বুঝিতে চেষ্টাও করি না যে, পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার প্রভেদ কতখানি। তাই রাশি রাশি শিক্ষার্থী প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ছাপ লইয়া বাহির হইতেছে এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাতও হইতেছে, কিন্তু সামান্য একদিনের বাজারের হিসাব লিখিতে গেলে ও প্রথমতঃ লিখিতেই পারে না, তারপর হিসাবেও গোল হইয়া যায়।

একতো শিক্ষার গোড়াতেই এই গলদ, তাহা ছাড়া মিথ্যা অভিমান প্রভৃতি উপসর্গ আছে। লেখা পড়া শিখিয়া কলেজের বাবু হইয়া শিক্ষার অভিমানে কোনো কাজেই মন লাগে না, কেবল অনুকরণস্পৃহাই বাড়িয়া যায়। পুস্তকে কত কথা পড়া হয় কিন্তু বাস্তব জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার সার্থকতার কোনো উপায় থাকে না; অথচ, সেই সমস্ত ধারণা এত বদ্ধমূল হইয়া যায় যে তাহাদের দূরীকরণের ক্ষমতাও অতি অল্প লোকের থাকে; সুতরাং অবস্থাটা না এদিক, না ওদিক হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য এই সমস্তেরই ব্যতিক্রম আছে।

সুতরাং আমাদের এখন যে-শিক্ষা দেওয়া হয়, অথবা যাহা শিক্ষা নামে চলিতেছে, তাহা দেশ, কাল, পাত্রের মোটেই উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। যখন প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা অর্থাৎ ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকগত বিদ্যা, এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল এই হিসাবে যে, ইংরাজী ভাষা নানা ভাবসম্পদে সম্পৎশালী, সুতরাং ইংরাজী ভাষা অনুশীলনে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে; এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ফল যে খুবই চমৎকার, তাহা নিশ্চই স্বীকার করি। কিন্তু তখন হইতে সেই যে এক ধারা রহিয়া গেছে, এবং এদেশে শিক্ষা বলিতে কি কুক্ষণেই যে লোকে তাহাকে পুঁথির বিদ্যা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, এ ধারণা আর যাইতে চায় না।

কেবল মাত্র মস্তিষ্কের খোরাক যোগানোর যে কি ফল, তাহা আমরা হাতে-হাতে দেখিতে পাই। আমাদের দেশের যাঁহারা বিদ্যায় মুখ-উজ্জল করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্যের যদি একবার খোঁজ করা যায়, তাহা হইলে এক শোচনীয় বিবরণ আমরা পাইব। ইহার একমাত্র কারণ, দৈহিক ব্যায়ামকে আমরা শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া মনে করি না, বরং তাহাকে আমরা সময়ের অপব্যবহার বলিয়াই মনে করি। ছেলের বয়স বছর পাঁচ হইলেই তাহার মাথায় পুস্তকের বোঝা চাপাইয়া তখন হইতেই তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়, এবং তখন হইতেই নজর রাখা হয় সে প্রতি পরীক্ষায় কত স্থান অধিকার করে; কিন্তু মস্তিষ্কের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখাও যে একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে একথা কাহারো মনে হয় না। তাই আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ছত্রিশ জন ক্ষীণ দৃষ্টি এবং একচল্লিশ জন কুব্জ পৃষ্ঠ!—একথা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

এইরূপ কোনো একটী ছেলেকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, সে পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখেনা কেন, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলেই উত্তর পাওয়া যাইবে,—সময় নাই। বাস্তবিক, আমাদের শিক্ষা এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, লেখা পড়ায় ভালো নাম করা এবং তৎসঙ্গে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা এই দুইটি কাজ একসঙ্গে হওয়া প্রায় অসম্ভবের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। অথচ এরূপে প্রাণপাত করিয়া দৃষ্টি হারাইয়া শরীর নষ্ট করিয়া যে পাশ করিয়া বাহির হইলাম, তাহাতে পাইলাম কি? বেশীর ভাগ স্থলেই একটী পুস্তকের বোঝায় অবনত জীববিশেষ ইহরা নয় কি? যতকিছু বিদ্যা, সমস্তই ওই অধীত পুস্তক কয়খানির মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া গেল, জগতে আর যাহা কিছু শিক্ষণীয়, যাহা আমাদের মানুষ করিয়া দিতে পারে সবই সময়ে পিছনে পড়িয়া রহিল, নিতান্ত সৌভাগ্য না-থাকিলে আর তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসর বা ইচ্ছা থাকে না। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ" একথা তখনি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, যখন অধ্যয়নের বিষয় এমন হয় যে, তাহা আমাদের বাস্তবিক শিক্ষা দিয়া যায় এবং এখনকার অধ্যয়নকে তপঃ বলিয়া ভাবিব কিনা ইহার উত্তর অতি সহজে পাওয়া যাইবে যদি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্র হইতে মুক্তি পাইয়া আপনাকে আপনি প্রশ্ন করি—আমরা শিখিলাম কি?

উপরে যে ছোট ছেলেটীর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহারি সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যাক্। আমাদের পিতা মাতার ধারণা যে, যত ছোট বেলায় লেখা পড়ার বেষ্টনীতে ছেলেকে আবদ্ধ করা যায়, ততই ভাল; কেননা ছেলে-বয়স, পতিত জমী, যত শীঘ্র কাজে লাগাইবে, তত শীঘ্র সোণা ফলিবে। ছেলে পড়িতে তো সুরু করিল, কিন্তু তখন হইতেই "শিক্ষার" ব্যবস্থা-অনুসারে তাহার মনের স্বাধীনতা সমস্তই নষ্ট হইতে বসিল। আমাদের শিক্ষা-প্রণালী একথা মোটেই মানিতে চায় না যে, প্রত্যেক মানুষ নিজ-নিজ কিছু বিশিষ্টতা লইয়া জন্মায়; তাই আমাদের প্রত্যেকেরই জন্য এক-ছাঁচে ঢালা শিক্ষার ব্যবস্থা। পরিণত বয়স্ক, যাহারা আপনার পছন্দ অনুযায়ী নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, তাহাদের কথা এখানে বাদ দেওয়া গেল; কিন্তু যাহারা এখানো নিজেদের চিনিয়া লইতে শিখে নাই, তাহাদের পক্ষে যদি এইরূপ ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য, যাহা লইয়া এই সব ছেলেরা জন্মিয়াছে, তাহা কি কোনকালে বাড়িয়া ওঠার সুযোগ পাইবে? এমন কেহ এ-পর্য্যন্ত জন্মায় নাই যাহার মধ্যে লক্ষ্য করিলে কিছু না কিছু বিশিষ্টতা দেখা যাইত না, এবং সেই সমস্ত বিশিষ্টতাকে বিকশিত হইতে দিলে আমাদের তথা জগতের কতখানি উপকার হইত, তাহা ভাবিলে লোকসানের মাত্রা অনুমান করিয়া মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারি না।

একটী ছোট ছেলের সঙ্গে একটী ছোট মেয়ের তুলনা দিলে এ-বিষয়টী আরো পরিস্ফুট হইবে। আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষা তেমন বিস্তৃতভাবে এখনো আরম্ভ হয় নাই; ইহা ভালো কি মন্দ পরে আলোচনা করা যাইবে; কিন্তু আমরা সমান বয়সের একটী ছেলে এবং একটী মেয়ের চলাফেরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, মেয়েটী ছেলের অপেক্ষা প্রতি পদেই কতখানি স্বাবলম্বনের পরিচয় দেয়। ইহা তাহার নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশের ফল;

ছেলেকে কিন্তু এ অবসর মোটেই দেওয়া হয় না, ফলে তাহার কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু এইখানে আবার সেই গোড়ায় যাহা বলা হইয়াছে সেই কথা উঠিবে,—আমাদের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই "অন্নচিন্তা চমৎকারা," সুতরাং Speculative শিক্ষায় আমাদের কাজ কি? কিন্তু জানিয়া রাখা উচিৎ, প্রকৃত শিক্ষা যাহা, তাহা কখনই বিফলে যায় না। তাহা ছাড়া সকল জিনিষকে কেবল প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিচার করা অন্যায়। শিক্ষাকে কেবল অর্থকরী বলিয়া ভাবিয়া লইলে "কাল্‌চার" কথাটী নিরর্থক হইয়া পড়ে, এবং কাল্‌চারের জন্যই কাল্‌চারের যে মূল্য তাহা আর থাকে না। তাহা ছাড়া, বি-এ, এম-এ প্রভৃতি ডিগ্রীর চাপে ক্ষীণদেহ হইয়াই বা আমরা এমন কি করিতেছি?

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্ষেপ করিতেছেন, "আমাদের দেশে যে শিল্পের আবহাওয়া হাজার হাজার বছর ধরে' বইছিল, হঠাৎ সেই আনন্দের স্রোত কেন বন্ধ হ'ল, তার কারণ কোন্‌খানে সন্ধান করতে হবে?" (প্রবর্ত্তক, মাঘ)। আমরা মনেকরি, আর যে কারণেই হোক, শিক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ইহার একটা মস্ত কারণ। সুকুমার শিল্পের সাধনা যে আমাদের শিক্ষারই অঙ্গবিশেষ, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এখানে অবনীন্দ্রনাথ মূলতঃ চিত্র এবং ভাস্কর্য্য অর্থেই "শিল্প" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু অর্থকে আরো ব্যাপক করিয়া আমরা যদি সমগ্র সুকুমার শিল্পকে ইহার মধ্যে ধরিয়া লই, তাহা হইলেও কোনো দোষ হয় না, কেন না, আমাদের দেশে সকল সুকুমার শিল্পেরই অবস্থা একরূপ।

আমাদের শাস্ত্রে নাকি আছে বিদ্যাশিক্ষার সময় নৃত্য, গীত সমস্তই সযত্নে বাদ দিতে হইবে। তাহা না-হয় দেওয়া গেল, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের একেবারে "নিষিদ্ধফলের" কোঠায় ফেলিয়া দিলে চলিবে কেন? আমাদের অভিভাবকদের প্রায়ই এই ধারণা বদ্ধমূল যে, যে-ছেলে গান গাহিতে শিখিয়াছে, তাহার আর কিছু হইবার আশা নাই, সে একেবারে অধঃপাতে গেছে! এখন অবশ্য এই ধারণা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে, তথাপি সঙ্গীতকে শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইতে বোধ-করি খুব কম অভিভাবকই রাজী হইবেন। বাদ্য শিক্ষার অবস্থাও তেমনি। ইউরোপে একজন ওস্তাদ বাজনদার যে-সম্মান পাইয়া থাকেন, এদেশে কোন রাজা-মহারাজা তেমন স্বেচ্ছা প্রণোদিত সম্মান পান কিনা সন্দেহ। আমাদের কাছে বাজনা-বাজানো কেবল অলস প্রহর যাপনের উপায় মাত্র, আর কোনই মূল্য নাই।

আজকাল মেয়েদের গান-বাজনা শিখাইবার একটা ইচ্ছা আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যে শিক্ষার উদ্দেশ্যে, তাহা বলা যায় না। গান-বাজনা জানা মেয়ের শীঘ্র বিবাহ হইবে, এই আশায় অনেকে শিখাইয়া থাকেন, অন্য যাঁহারা শিক্ষা করেন, তাহাও সখের খাতিরে চর্চ্চা করা মাত্র। বাস্তবিক, যথার্থ শিক্ষার্থে কয়জন আপনাদের এ বিষয়ে নিয়োজিত করেন, তাহা নিরূপণ করিতে বসিলে বোধ-করি অতি অল্প সংখ্যকই পাওয়া যাইবে।

নৃত্যের কথা না বলাই সঙ্গত মনে হয়। যাত্রা অথবা থিয়েটারের বাহিরে এক গণিকালয়ে ব্যতীত আর কোথাও যে-নাচ হওয়া সম্ভব, তাহা আমরা ভাবিতেও পারি না। অবশ্য

এখনকার বিলাতী অনুকরণে যে-নাচ, তাহা অধিকাংশ স্থলেই কস্‌রতে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্য অল্পই আছে। কিন্তু আমাদের দেশেও এককালে নর্ত্তনের প্রথা ছিল;—আমরা বোধহয় এখন অতি-মাত্রায় সভ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাহাকে বর্ব্বর জনোচিত বলিয়া বাদ দিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার নেতা ইউরোপ কিন্তু তাহাকে বাদ দেয় নাই, এখনো ইউরোপীয় মহিলারা,—সাধারণ ঘর হইতে সম্ভ্রান্ত ঘরের পর্য্যন্ত—নৃত্য শেখা একটা গুণের পরিচায়ক (accomplishment) বলিয়া মনে করেন। শুধু মহিলারা কেন পুরুষরাও ইহাকে সুকুমার কলা হিসাবে চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

আগেই বলা হইয়াছে, মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা এখনো এদেশে তেমন ভাল করিয়া করা হয় নাই। অবশ্য পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন মেয়েদের লেখা পড়ার ব্যবস্থা অনেক হইয়াছে সত্য এবং নিতান্ত রক্ষণশীল ব্যক্তি ছাড়া বেশীর ভাগই মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেছেন ইহাও ঠিক কিন্তু ছেলেদের যে-গলদ, মেয়েদের শিক্ষায় ঠিক, সেই সমস্ত গলদই রহিয়াগেছে। এখানেও তেমনি চশমা পরিহিতা ক্ষীনকায়া বিদুষীদের সাক্ষাৎ পাইতেছি,—সমস্তই পূর্ব্বে ছেলেদের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহারি পুনরভিনয়। সুতরাং এখানেও যে শিক্ষা হইতেছে একথা আমরা বলিতে পারি না।

শুনিয়া হয় তো অনেকে চমকিয়া উঠিবেন যে জাপানেও মেয়েদের রীতিমত দৈহিক ব্যায়ামের বন্দোবস্ত আছে, পুরুষদের যে আছে তাহা না বলিলেও বোধ হয় ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা একেবারেই অভাবনীয় ব্যাপার! সমাজ-পতিরা এখানে স্বেচ্ছাচার বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, এবং এই কথার উচ্চারণকারীকে একঘরে করিবার বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করিবেন। অভিভাবকেরাও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবেন, যে, তাহা হইলে তাঁহাদের মেয়েরা যে amazon হইয়া উঠিবে, এবং একথাও বলিবেন, মেয়েরা কি লড়াই করিতে যাইবে যে, তাহাদের দৈহিক ব্যায়ামের আবশ্যক? অবশ্য নারীর যখন সকল বিষয়েই পুরুষের সমকক্ষ হওয়া উচিৎ তখন ইহাতেই বা হইবেনা কেন, এই অভিমত ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদীদের হইতে পারে, কিন্তু আমরা সে কথা বলিতে চাহিনা কেননা তাহা হয় তো এদেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়; তবে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একটু ব্যায়াম করিলে ক্ষতি কি? আমাদের শাস্ত্রেই তো আছে, "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমম্"—সুতরাং অরোগ হইতে হইলে যতটুকুর আবশ্যক, তাহাও কি হইতে দেওয়া হইবে না? শিক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা আর কতদূর হইতে পারে? তাহা ছাড়া, আমাদের মাতৃজাতি যাহারা, যাহাদের উপর আমাদের দেশের মঙ্গল খুব বেশীর ভাগ নির্ভর করে, তাহাদের শিক্ষার (কেবলমাত্র লেখাপড়া নয়) বন্দোবস্ত হয় না কেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা।

সুতরাং মোটামুটি দেখা যাইতেছে, প্রকৃত শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়, আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যাদান প্রণালীতে তাহার কিছুই হইতেছে না।

এতক্ষণ শিক্ষা সম্বন্ধে যে ভাবে বলা হইল, তাহাকে অনেকেই অলীক, অসার কল্পনা (Utopian) নিশ্চয়ই মনে করিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষাকে যদি অন্য সকল প্রকার অঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া কেবল মাত্র অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সেদিক দিয়াও দেখিতে

পাইব, শিক্ষা কিছুই হইতেছে না। বস্তুতঃ আমরা শিক্ষা শব্দটা এখন যে-অর্থে ব্যবহার করি, বা "শিক্ষিত" বলিতে যাহা বুঝি, তাহা প্রকৃত শিক্ষাও নয়, অর্থকরী বিদ্যাও নয়, অর্থাৎ ইহা দু'য়ের বাহির, ইহাতে কোনো কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে এমন অনেক জিনিষ জানাইয়া দেওয়া হয়, যাহা বাস্তব জীবনে বেশীর ভাগ লোকেরই কোনো কাজে আসেনা, অথচ তাহাও আবার শিক্ষার একটী মাত্র দিক লইয়া আলোচনা করা হয়; আবার অন্যদিকে এমন কোনো বিদ্যা দেওয়া হয় না, যাহাকে অর্থকরী বিদ্যা বলা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পথে-ঘাটে পাওয়া যাইবে, বেশী বলার কোনো প্রয়োজন নাই।

এখন জগতের সর্ব্বত্রই পংস্কারের একটা ধুম পড়িয়া গেছে; সকলেই পুনর্গঠনের জন্য, নূতনতর সুনিয়ম আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতেও যাহা কিছু অভাব, সবই পূরণের চেষ্টা হওয়া উচিৎ; বিশেষতঃ আমরা জীবন-যুদ্ধে দিন দিন যেরূপ পিছাইয়া পড়িতেছি, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার হওয়ার নিতান্ত আবশ্যক। হয়তো অন্য অনেক স্থানের শিক্ষাদানের নিয়ম অপেক্ষা এখানকার নিয়ম ভালো, কিন্তু তাই বলিয়া দোষগুলির দিকে অন্ধ হইয়া রহিলে তো চলিবেনা; কাজেই এখানে তুলনায় সমালোচনার কোনো প্রয়োজন নাই কেবল কেমন করিয়া আমাদের নিজের দোষ, ত্রুটির অপসারণ করা যায়, তাহাই দেখিতে হইবে।

শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত।

প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য-সমিতি

প্রাচীনভারতে রাজশক্তি যথেচ্ছাচারের পোষণ করিতে পারিত না। রাজশক্তির পার্শ্বে জনসাধারণের মতের একটা প্রতিষ্ঠা ছিল। তাহার নাম ছিল 'সভা' ও 'সমিতি'। সভা ছিল সামাজিকভাবে মেলামেশার কেন্দ্র—আর সমিতি ছিল সমগ্র জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ বাণী। সমিতিতে রাজাকে উপস্থিত হইতে হইত। প্রয়োজন হইলে সমিতি রাজা নির্ব্বাচন করিয়াও দিত। পরবর্ত্তীকালে রাজশক্তি সঙ্কুচিত করিবার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায়, ৭-১২ শ্লোক) পাই। রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য অমাত্য-সভা ছিল। এই অমাত্যদিগের পরামর্শ না লইয়া রাজার কোন কিছু করিবার অধিকার ছিলনা। অবশ্য এই সভায় রাজা নেতৃত্ব করিতেন। এই সভায় চারিজন ব্রাহ্মণ, আটজন ক্ষত্রিয়, ২১ জন বৈশ্য, ৩ জন শূদ্র ও ১ জন সূত থাকিত। এই সাঁইত্রিশ জনের মধ্যে আটজন আইন-কানুন গঠনে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। যাহা হউক, ইহার পূর্ব্বে বৈদিক যুগে রাজশক্তি যে যদৃচ্ছাক্রমে কার্য্য করিতে পারিত না তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পরবর্ত্তী সংহিতা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সময়েও সভা, সমিতির প্রতাপ প্রবল ছিল। প্রয়োজন হইলে ইহারাই রাজাদিগকে রাজ্যচ্যুত পর্য্যন্ত করিতে পারিত। আপস্তম্বে লিখিত আছে রাজা 'পুর' (নগর) নির্ম্মাণ করিবেন, পুরের অভ্যন্তরে তাঁহার 'বেশ্ম' (প্রাসাদ)

থাকিবে। বেশ্মের দ্বার হইবে পূর্ব্বমুখ। পুরের দক্ষিণে 'সভা' সংস্থিত থাকিবে। সভার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। মহাভারতযুগে কিন্তু এই সভা মাত্র যোদ্ধ্‌সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাজা ও তাঁহার অন্তরঙ্গ মিত্রগণ কর্ত্তব্য মীমাংসা করিয়া লইতেন। কেবল পরামর্শ হিসাবে সভার মত লইতেন।

একই বংশের বিভিন্নশাখার পাশাপাশি ছোট ছোট অনেকগুলি বাড়ী লইয়া 'গ্রাম' তৈয়ারি হইত। গ্রামের চারিদিকে বেষ্টনীদিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে শত্রু বা বন্যজন্তুর আক্রমণ হইতে গ্রামকে সুরক্ষিত রাখা হইত। পুর্‌ ছিল গ্রামের একটী অংশ। মাটীর গড় দিয়া পুর্‌ ঘেরা থাকিত। পুরের চারিদিকে বৃত্তাকারে এক বা ততোধিক প্রস্তরাদি নির্ম্মিত দুর্গও থাকিত। গ্রামের চেয়ে বড় ছিল 'বিশ্‌'। কয়েকটী 'বিশ্‌' একত্র করিলে যাহা হইত তাহার নাম ছিল 'জন'। জনকেও কখন কখন গ্রাম ও বলা হইত। 'ভরত'রা কোথাও 'জন' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, কোথাও আবার 'গ্রাম' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বিশ্‌ আকারে গ্রামের চেয়ে বড় ছিল বটে, কিন্তু গ্রাম যে বিশের অধীন ছিল একথা বলা যায় না। গ্রাম বলিলে যে সম্পূর্ণ বিশ্‌ বা কতগুলি বিশের অংশ বুঝাইত ইহাও বলা যায় না।

প্রাচীন ভারতে গ্রামের চারিটী বিভাগ ছিল বলিয়া বোধ হয়। মানসার নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, গ্রামের ব্রাহ্ম্য, দিব্য, মনুষ্য ও পৈশাচ এই চারিটি বিভাগ। ব্রাহ্ম্য বিভাগে ১/৬ ব্রাহ্মণ, দিব্য বিভাগে ১/৬ ক্ষত্রিয়, মনুষ্য বিভাগে ১/৬ বৈশ্য ও পৈশাচবিভাগে ১/৬ শূদ্র থাকিবে। যে গ্রাম বা পুর্‌ সম্পূর্ণ ছিলনা তাহার এইরূপ বিভাগও থাকিত না। শুক্রনীতির (১ম অধ্যায়, ৫৬-৫৭ শ্লোক) নির্দ্দেশ আছে যে, গ্রামে বা নগরে এক এক জাতির বাড়ী শ্রেণীবদ্ধ আকারে থাকিবে আর সে পঙ্‌ক্তির নাম হইবে 'সমুদায়'। বাজারে এক এক রকমের দোকান (আপনি) পৃথক্‌ পৃথক্‌ পঙ্‌ক্তিতে সাজান থাকিবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও (২।৪) নির্দ্দেশ আছে যে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ সম্প্রদায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যব্যবসায়ীরা স্বতন্ত্র স্থানে থাকিবে। কেবল চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নতম জাতিরা তাহাদের কৃত ঘৃণ্য কর্ম্মের জন্য গ্রামের বাহিরে থাকিবে (অর্থশাস্ত্র ৪।২)। বৌদ্ধযুগে গ্রামগুলি ধান ক্ষেতের ধারে ধারে কতকগুলি কুটীর লইয়া সংস্থিত থাকিত। দুইখানি গ্রামের মধ্যে একটী মহাবনের ব্যবধান থাকিত।

গ্রামে ছোট ছোট মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে 'গ্রামবাদী'রা বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করিতেন। গ্রামে একজন যোদ্ধ্‌কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কিছু সেনা থাকিত। ইহাদের কাজ ছিল গ্রাম রক্ষা করা। প্রত্যেক গ্রামের একজন অধিপতি থাকিত। অধিপতিকে 'গ্রামণী' বলিত। গ্রামণীর military ও civil উভয় ক্ষমতাই ছিল। এছাড়া একটী গ্রামের যিনি অধ্যক্ষ তাঁহার নাম হইত 'গ্রামিক'। দশটী গ্রামের অধ্যক্ষ 'দশপ' নামে পরিচিত হইত। একটী পরিবারের উপযোগী শস্য গ্রামিক ভোগ করিত। 'গ্রামভোজক' শস্যের কর নির্দ্ধারণ করিয়া দিত।

গ্রামের সমুদায়গুলি পাড়া বা মহল্লার অনুরূপ। এক একটী সমুদায়ে যতগুলি পরিবার বাস করিত তাহাদের সামাজিক ও ব্যবসায়িক ঐক্য ছিল। সমস্ত সমুদায় বা পাড়া একটী পরিবারের মত ছিল। সমস্ত পাড়া যেন একটী পরিবার। পাড়ার লোকেরা সারাদিনের কাজের শেষে এক জায়গায় মিলিত হইত। তাদের সামাজিক ও ব্যবসায়িক জীবন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত। আর সেই নিয়মগুলি সকলেই ধর্ম্মজ্ঞানে পালন করিত। পাড়ার সকলে পরস্পর বিবাহ, পান, ভোজন প্রভৃতি বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত। সামাজিক আইন কানুন সকলেই শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া চলিত। কাহারও অবস্থা হীন হইলে সাহায্য পাইত। পরস্পরের সাহায্য ও স্বার্থসংরক্ষণের জন্য তাহারা বার্ত্তিক নিয়ম মানিয়া চলিত। এ সকলের জন্য সমিতি বসিত। মন্দির, পুণ্যশালা, ধর্ম্মশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি পরিচালনের জন্য তাহাদের সভা, সমিতিতে রীতিমত বৈঠক চলিত।

তখন গ্রাম ও নগর একই নিয়মে চলিত। গ্রামের লোক সহরে আসিয়া ফাঁপরে পড়িত না। সেখানে সে নিজের জাতির, সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ের লোক পাইত। সেখানে সে দেখিত নাগরিক জীবন তার গ্রাম্য জীবনেরই অনুরূপ। এখন লোক নাগরিক জীবনে সামাজিক নিয়ম, সম্পর্ক ও দায়িত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত মনে করে; কিন্তু পূর্ব্বে তাহা করিত না। সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য সকল সময় তার মধ্যে উদ্বুদ্ধ থাকিত। সমাজ তাহাকে ভুলিত না, সেও সমাজকে ভুলিতে পারিত না। যদিও জাতি ও ব্যবসায়ের ভিত্তির উপর গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রত্যেক গ্রাম নিজের নিজের বন্দোবস্ত করিত; নিজেদের পরিচালনভার নিজেদের উপর রাখিত। গ্রামগুলি পরস্পরের প্রতি অথবা নগরের প্রতি কর্ত্তব্য কখনও ভুলিত না।

প্রাচীনভারতে রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্ম ও বিধিব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য স্বীকৃত হইত না এবং সেই সকল বিধি-ব্যবস্থার মধ্যদিয়া ব্যক্তিত্বকেই বাড়াইয়া তোলা হইত না। পূর্ব্বে বলিয়াছি রাজা শাসন করিতেন, ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার বিধিসঙ্গত গণ্ডির মধ্যে যাহাতে প্রজা সকল আবদ্ধ থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিতেন, কিন্তু সেগুলি কেবল তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিত না। সে সকল বিধিব্যবস্থার যথার্থ নিয়ন্তা ছিল শাস্ত্র আর সে সকল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মের বিনিয়োগ বা প্রবর্ত্তন ব্যাপারের কর্ত্তা ছিল এক একটী সঙ্ঘ। রাজা তাহার প্রধান ব্যক্তি হইলেও তিনি সে সকল বিষয়ে স্বেচ্ছাচার করিতে পারিতেন না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির মধ্য হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া যে একটী সঙ্ঘ বা মন্ত্রণাসভা থাকিত, রাজা তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া সমবেতভাবে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে বাধ্য থাকিতেন। রাজা রাজকীয় কার্য্যে যে কেবল মন্ত্রণাসভারই নির্দ্দেশ মানিতেন তাহা নয়, কোথাও কোথাও দেখা যায় রাজ্যশাসন সম্বন্ধে অতি গুরুতর বিষয়েও তিনি সাধারণ প্রজাবর্গেরও মতামতের অপেক্ষা করিতেন; রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেকের সময়ে রাজা দশরথের সে বিষয়ে প্রজাবর্গের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাহাদের আহ্বানই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর প্রাচীন বিধিব্যবস্থার মধ্যদিয়া যে কোনও একটি বিশেষ জাতি বা কোনও একটী বিশেষ ব্যক্তিকে বাড়াইয়া তোলা হইত না, ইহা তাহার একটি

প্রণিধান যোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থাপকেরা মানিতেন—সমগ্র সমাজ একটী অখণ্ড বস্তু। সমাজের প্রত্যেক জাতি বা প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই এক একটী অঙ্গস্বরূপ। বাড়াইতে হইলে সমগ্র সমাজকেই বাড়াইতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি সমাজের কোনও একটি অঙ্গ, কোন বিশেষ জাতি বা ব্যক্তিকে বাড়ান যায়, আর সমাজের অন্য অংশ পূর্ব্ববৎ অবর্দ্ধিতই থাকে তাহা হইলে সে সমাজে তাহার স্থান নাই। তাহার বর্দ্ধিতায়তন রক্ষা করিতে হইলে তাহার যতটুকু অবকাশের প্রয়োজন অপর অংশ হইতে তাহা লাভ করা তাহার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়; সমাজের অন্যান্য অংশ বা অঙ্গের সহিত তাহার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ অপরিহার্য্য। তাহার ফলে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট এমন কি অবস্থা বিশেষে সত্তালোপ পর্য্যন্ত হওয়া অসম্ভব নয়। এই জন্যই প্রাচীনভারতের ব্যবস্থাপকেরা সর্ব্বদাই এবিষয়ে সাবধান থাকিতেন; যাহাতে সমাজে ব্যক্তি অসম্ভবরূপে আস্পদ্ লাভ করিয়া স্ফীত হইয়া না ওঠে তাহার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের বিধিব্যবস্থার ফলে সমগ্র সমাজটাই বাড়িয়া উঠিত। সমগ্র সমাজ বাড়িয়া ওঠার অর্থ সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাড়িয়া ওঠা। সমাজ ব্যক্তিরই সমষ্টিরূপ। এইরূপে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যথানিয়মে থাকিলে সমগ্র সমাজের আয়তন বৃদ্ধি পাইত। তাহার ফলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় স্বীয় বর্দ্ধিতায়তন রক্ষা করিতে যথাযোগ্য অবকাশ লাভ করিত। কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ বাধিত না। সমাজের সর্ব্বত্রই একটা নিয়ম বা শৃঙ্খলা বিরাজ করিত; সমাজের সর্ব্বত্র একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত। প্রাচীন ভারতের গ্রাম্যসমিতি হইতেই সমাজ তথা দেশ শাসিত হইত।

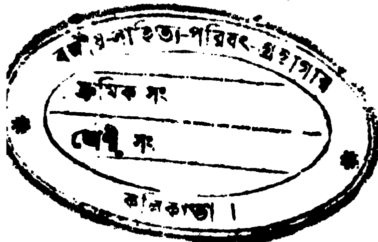
প্রাচীন ভারতে নগর সম্পূর্ণরূপে গ্রামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল। গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিতে নগরের শ্রীবৃদ্ধি ও নগরের শ্রীবৃদ্ধিতে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হইত। গ্রামগুলি বাহির হইতে দেখিতে যেন স্বতন্ত্র ছিল, যেন গ্রাম গ্রামেরই কার্য্য করিত। আচার, ব্যবহার ও সামাজিকতায় গ্রামগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিত। কিন্তু নগর ছিল কেন্দ্র স্বরূপ; এই কেন্দ্র হইতে সকল সরলরেখায়ই সাম্রাজ্যরূপ বৃত্তরেখার সকল অংশের সহিত সমান সম্বন্ধ ছিল। গ্রাম সকলের সমষ্টিভূত শক্তি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ নগরে সঞ্চিত হইয়া সেই সঞ্চিত শক্তি সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিত। সুতরাং গ্রামের ধ্বংসের সহিত নগরের এবং সেই অনুপাতে সাম্রাজ্যের ক্ষতি হইত। এক অতি বিচিত্র কৌশলে সেকালে সাম্রাজ্য একতাবন্ধনে আবদ্ধ থাকিত। তখন নগরবাসী আপনাকে নিজ গ্রাম ও সমাজের অধীন বলিয়াই জানিত—নগরের সহিত কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সমাজকে দূরে ঠেলিতে পারিত না। নগরেও সে তাহার সামাজিকতা রক্ষা করিতে বাধ্য হইত। এখন আমরা নগরে থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলি, তখন কিন্তু এত সহজে স্বাতন্ত্র্য হারাইতে পারিত না। ইহার ফলে তখন একতার বন্ধন দৃঢ় ছিল এবং সকল গ্রামকে প্রত্যক্ষভাবে নগরের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে গিয়া গৌণভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইত। সুপ্রাচীন কালের না হইলেও দৃষ্টান্তস্বরূপ পাটলিপুত্র নগরের কথা বলা যাইতে পারে। আমরা মেগাস্থেনিসের বিবরণ অবলম্বনে বলিতে পারি যে, উক্ত নগরের ত্রিশজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনর সকল গ্রাম হইতেই নির্ব্বাচিত হইত। গ্রামের যাহারা মণ্ডল তাঁহারা ঐ পদে অভিষিক্ত হইতেন। কমিশনরেরা বিভিন্ন গ্রাম ও বিভিন্ন

সমাজের নেতা হইলেও নগরের কার্য্য পরিচালন করিতে গিয়া সাধারণ ভাবেও সাম্রাজ্যের সাধারণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের শ্রমশিল্প, বাণিজ্য ও করসংগ্রহ প্রভৃতি সাধারণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। একদিকে তাঁহাদের যেমন স্বগ্রাম ও স্বসমাজের প্রতি লক্ষ্য ছিল, অপরদিকে তেমনই তাহাদের জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য ছিল। এত বড় বড় কার্য্যের খুঁটিনাটি সভা, সমিতির ভিতর দিয়াই সূচিত হইত। সভা, সমিতি প্রজার কল্যাণপ্রদ বলিয়া সর্ব্বমঙ্গল বিধান প্রজাপতির কন্যা বলিয়া অথর্ব্ববেদে বর্ণিত হইয়াছে।—

"সভা চমা সমিতিশ্চবতাং প্রজাপতের্দ্দুহিতরৌ সংবিদানে।" ৭।১২।১

প্রাচীন ভারতের সকলকেই প্রত্যহ অপরাহ্নে সভা সমিতিতে যাইতে হইত। সেখানে সাধারণতঃ আমোদ, প্রমোদ, ক্রীড়া, তর্ক, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি হইত। এ ছিল নিত্য-ব্যাপার। ইহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে নৈমিত্তিক ব্যাপারও হইত। এই নৈমিত্তিক ব্যাপারে ধর্ম্ম, সমাজ বা রাজনীতি সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইত। এই নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের নাম ছিল "সমিতি-সমবায়"। পরে ইহা "গোষ্ঠী-সমবায়" নামে অভিহিতও হইয়াছিল। শাসনব্যাপারেও সভা, সমিতি যথেষ্ট কার্য্য করিত। তখনকার নিয়ম ছিল যে, নগর বা গ্রামের মধ্যভাগ দিয়া একটী উত্তর-দক্ষিণ ও আর একটি পূর্ব্ব-পশ্চিমমুখে দুইটি বড় রাস্তা যাইবে। দুইটী রাস্তার যেখানে সংঘর্ষ সেইখানে ব্রহ্মার মন্দির বা সাধারণ মিলনের স্থান "মণ্ডপ" তৈয়ার করা হইবে। এই মণ্ডপে সভার অধিবেশন হইত। শুক্রনীতি বলে নগরের মধ্যভাগে 'সভা' সংস্থিত থাকিবে। বস্তুতঃ, গ্রামে ও নগরে সভার স্থান। সভা, সমিতির মঙ্গলপ্রদ কেন্দ্র যে প্রাচীন ভারতে দেশের ও দশের ক্ষেমাস্পদ হইয়া প্রভূত উপকার করিয়াছিল তাহা কে না স্বীকার করিবে?

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।



ব্যর্থ

সংসার অরণ্য মাঝে কেহ দেয় ফল
কেহ দেয় ফুল, কেহ পল্লব কেবল,
কেহ দেয় ছায়া, কেহ পাখীরে আশ্রয়
কেহ দেয় সবি, কেহ সর্ব্বগুণময়।
যার কিছু নাই, নাই ফুলের সৌরভ
স্নিগ্ধছায়া, মিষ্ট ফল, পল্লব গৌরব
সেও হেথা ব্যর্থ নয়, নিজ অঙ্গ দিয়া
বিশ্বের জীবন যজ্ঞ রাখে সঞ্জীবিয়া।

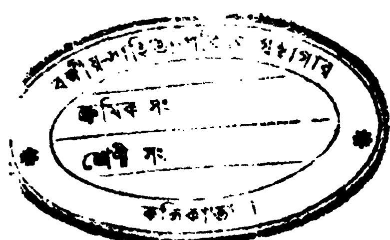
শ্রীকালিদাস রায়।

পাঠ সংস্কার

৫৬৪ পৃষ্ঠার ৯-১০এর লাইনে not conforming to the usages. এর পরিবর্ত্তে পড়িতে হইবে not conforming to the procedure prescribed by law or to the usages.

৫৭১	,, ১৩-১৮	,,	হিন্দ	,,	হিন্দু
,,	,, ২৯	,,	কল্যাণভাব যেখানেই পূঞ্জিত	,,	কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত
৫৭৩	,, ১৭	,,	ব্রাহ্মসমাজের	,,	আদি ব্রাহ্মসমাজের
৫৭৪	,, ৩	,,	১২৮ খৃঃ	,,	৫২৮ পৃঃ
,,	,, ১১	,,	in that is requires	,,	is that it requires
৫৭৭	,, ২০	,,	ব্রাহ্মোপসনা	,,	ব্রহ্মোপাসনা
৫৭৮	,, ৪১	,,	২।১টি	,,	২১টি ।

স. ন ।


ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি

নিবেদন

ষাট বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিন আইন (Special Marriage Act, 1872) পাশ হইল বটে, কিন্তু এই আইন সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ রহিয়া গিয়াছে। বস্তুত তিন আইন সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কেহই সন্তুষ্ট নহেন। তিন আইন সংশোধন করিবার প্রস্তাব বারংবার উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এযাবৎ ফল কিছুই হয় নাই। তিন আইন সংশোধনের অপেক্ষা ব্রাহ্মবিবাহ লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়া লওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ; এখন সেই চেষ্টা করাই আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা এ সম্বন্ধে একমত হইলে কার্য্যটি অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। প্রস্তাবিত ব্রাহ্ম বিবাহবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সংক্ষেপে ব্রাহ্ম বিবাহের ইতিহাস বর্ণনা ও তিন আইন সম্বন্ধে আপত্তির কথা আলোচনা করিয়া লওয়া আবশ্যক।

পুরাণ কথা

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই প্রথম ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পন্ন হয়। মহর্ষিদেবের দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারী দেবীর সহিত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহে পৌত্তলিক প্রথাসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা হইল। অর্ঘ্যপ্রদান, বরণ ও স্ত্রী-আচারের পরে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া কন্যা-সম্প্রদান করা হয়। সম্প্রদানের পরে বর ও কন্যার প্রতি উপদেশ ও প্রার্থনা দ্বারা বিবাহ পদ্ধতি শেষ হইল। ইহার তিন বৎসর পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ২ রা আগষ্ট পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত প্রথম অসবর্ণ বিবাহ করিলেন। অসবর্ণ বিবাহ লইয়া আন্দোলন ও অন্যান্য কারণে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত মহর্ষিদেবের বিচ্ছেদ ঘটিল। (১)। ফলে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্ব্বেই নূতন দলের বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল; "কন্যাকে সম্প্রদান করিতেছি" ভাষা বদলাইয়া "কন্যার ভার অর্পণ করিতেছি" এইরূপ দাঁড়াইল। এবং বর ও কন্যার একটি উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা যোগ করিয়া দেওয়া হইল যে "পরমেশ্বর ও সমবেত ধর্ম্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে পতিত্বে (বা পত্নীত্বে) বরণ করিতেছি"। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ চলিতে আরম্ভ করায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মধ্যেও তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল।

(১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে যে অসবর্ণ বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন তাহা নহে। "আবহমান প্রচলিত পদবী থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাই বলিয়া জাতিভেদ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই; ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইতে পারে। তাহা বলিয়া সমান জাতির মধ্যে আদান প্রদান হইলে যে তাহা ব্রাহ্ম বিবাহ হইল না, ইহা স্বীকার করা যায় না। তোমার যদি অভিপ্রায় থাকে যে ভিন্ন জাতিতে তোমার কন্যাকে বিবাহ দিবে, তবে এ প্রস্তাবে সকল ব্রাহ্মই আহ্লাদিত হইবেন এবং এমত পাত্রও আছে যে সে কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারে।" (১৩ই মাঘ, ১৭৮৪ শক, মহর্ষির পত্রাবলী, ৩৮ পৃঃ)

ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ

অনেকে বলিতে লাগিলেন যে অসবর্ণ বিবাহ বৈধ নহে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই তৎকালীন Advocate General Cowie সাহেবের নিকট ব্রাহ্ম বিবাহ রাজবিধি-সম্মত কিনা এতৎসম্বন্ধে চারিটি প্রশ্ন উপস্থিত করা হয়। ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহার প্রদত্ত উত্তর প্রকাশিত হয়। (১)

কাউই সাহেবের বিরুদ্ধ মত

"Mr Cowie replied in effect, that the Brahmo marriages not having been celebrated with Hindu or Mahometan rites of orthodox regularity, and not conforming to the usages of any recognised religion were invalid and the offspring of them were accordingly illegitimate." (২)

কাউই সাহেব কি কারণে ব্রাহ্ম বিবাহ অসিদ্ধ বলিলেন তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করা আবশ্যক—"not conforming to the usages of any recognised religion"—এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। কাউই সাহেব যে সময়ে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তখন আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; ব্রাহ্মধর্ম্ম তখনও "recognised religion" রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই।

আইন করিবার প্রস্তাব

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২০ এ অক্টোবর তারিখে ব্রাহ্মসমাজের এক অধিবেশনে ব্রাহ্ম বিবাহ লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা এবং কয়েকটি ব্যাক্তির উপর ব্রাহ্মবিবাহ কি তাহা বিচার ও ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার ভার অর্পিত হইল। (৩)

আইনকে প্রাধান্য দেওয়া সম্বন্ধে আপত্তি

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিলেন

"আইন না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার হইতে পারে না, এ কথা স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ উভয়ের উপরে কলঙ্ক আইসে। এই অভিপ্রায়ে যদি এ প্রস্তাব উপস্থিত থাকে, তবে আমি ইহার প্রতিবাদ করিতেছি।.........পৃথিবীর আইন আদালত বিবেকের প্রতিদ্বন্দী হইতে পারে না, যদি পৃথিবীর আইন আদালত অনীতির প্রবর্ত্তক হয় তবে আমরা তাহা পদদ্বারা দলন করি। রাজ বিধি না থাকাতে আইনের চক্ষে ব্রাহ্মবিবাহের যে অসিদ্ধতা উপস্থিত হইবে তৎপ্রতি ভয়বশতঃ যেন কেহ বিবেকের উল্লঙ্ঘন না করেন।"

(১) আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ, ১ম খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

(২) Gazette of India, Supplement, Sept. 19, 1868.

(৩) শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবীশ প্রস্তাব করিলেন এবং নিম্নলিখিত আকারে প্রস্তাবটি নির্দ্ধারিত হইল:—"ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে যে সমুদায় বিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সম্পাদক তাহার অতিরিক্ত "রেজিষ্ট্রার" নিযুক্ত হয়েন, এবং প্রতি বিবাহ কি প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইল তাহাও তৎসহ লিপিবদ্ধ থাকে।"

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী পোষকতা করিলেন:—

হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে যে সকল রাজনিয়ম প্রচলিত আছে তাহা ব্রাহ্মবিবাহে বর্ত্তিতে পারে কি না? যদি না পারে, তবে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করিবার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি অর্পিত হয়। শ্রীযুক্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেন, ব্রজসুন্দর মিত্র, রামশঙ্কর সেন, দুর্গামোহন দাস, গুরুপ্রসাদ সেন, দীননাথ সেন।" (আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্য বিবরণ, ১৬৯ পৃষ্ঠা)

সভাপতি (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র) বলিলেন

"আজ যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় করেন নাই। কোন ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া সকল বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বিবেকের অনুরোধে অনুষ্ঠান করিয়াছেন। উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য কেবল বাধা প্রতিবন্ধক অপনয়ন করা। ধর্ম্মতঃ যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি সম্ভব হয়, সামাজিক ভাবে তাহা সিদ্ধ হয় তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যতদূর সামর্থ্য, যত্ন করা উচিত।

ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা

ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা বিধেয় কিনা তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এক অধিবেশন হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিলেন :—

"ব্রাহ্ম ধর্ম্মে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এক সত্য ঈশ্বরের অর্চ্চনা পূর্ব্বক অপৌত্তলিক পদ্ধতিতে যে বিবাহ করেন—তাহাই ব্রাহ্ম বিবাহ। হিন্দু শাস্ত্রমতে ব্রাহ্ম বিবাহ সিদ্ধ কি না এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কেননা এ সম্বন্ধে আডভোকেট জেনারেলের যে মত লওয়া হয়, তাহাতে তিনি তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চয় মত দিতে না পারিয়া কেবল এই কথা বলিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে কোন একটি স্পষ্ট বিধি করিয়া লওয়া শ্রেয়স্কর।...... ......ব্রাহ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতে তিনি অনুরোধ করেন।......কেহ কেহ বলেন, কেবল ব্রাহ্মগণের বিবাহই আইনসিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত, কেহ কেহ বলেন, কেবল ব্রাহ্মগণের কেন, শিক্ষিতগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না—সংশয়ী হউন, বুদ্ধিবাদী হউন, ফলাফলবাদী হউন বা অদ্বৈতবাদী হউন, কি যে কোন বাদী হউন—সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি রাজ বিধি (অর্থাৎ সিভিল বিবাহ বিধি) করিবার জন্য যত্ন করা উচিত। শেষোক্ত মতে তিনি অনেকগুলি কারণে মত দিতে পারেন না। ...... আজ পর্য্যন্ত প্রায় বিশটির অধিক ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহিতগণ সকলেই বিবেকের অনুরোধে সর্ব্বথা পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। ... ব্রাহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য লোক কোথায় যাঁহারা রাজবিধির আশ্রয় চান? কৈ কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগের কাহাকেও ত দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল ব্রাহ্মগণই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত। ... এরূপ লোক থাকিলেও তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের আবেদন দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে ; কেন না এরূপ করিতে গেলে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের ভূমি পরিহার করিয়া সামাজিক ভূমি আশ্রয় করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি ব্রাহ্মগণের অভিলাষ পূর্ণ করেন, তবে তাহাদিগের ধর্ম্মের জন্য যে প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে তাহারই জন্য করিবেন। অপিচ বিবিধ ভাবের লোক লইয়া কার্য্য করিতে গেলে কি প্রকার সংস্করণের প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে একমত হওয়া দুর্ঘট। অধিকন্তু ব্রাহ্মগণ এরূপ কার্য্য করিলে সংশয় ও অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দান করিবেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া কেবল ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করা হয়, সভাপতি এই অনুরোধ করিলেন।" *

স্পষ্টই দেখা যায় যে ব্রহ্মানন্দ প্রথম হইতেই সিবিল বিবাহবিধির বিরোধী ছিলেন, তিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিই চাহিয়াছিলেন।

যাহা হউক এই অধিবেশনে স্থির হইল "ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা অভিলষণীয়।"

ব্রহ্মানন্দ সিমলায় গমন পূর্ব্বক রাজ প্রতিনিধির নিকট ব্রাহ্মদিগের আবেদন জানাইলেন। এই আবেদন উপলক্ষ করিয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর মাননীয় মেইন্ সাহেব (Sir H. S. Maine) ব্যবস্থাপক সভায়

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭-২১৯।

সিবিল বিবাহ বিল (১৮৬৮)

উপস্থিত করেন।

Sir H. S. Maine ব্রাহ্ম বিবাহের পরিবর্তে সিবিল বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন কেন তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

"......after much conversation with Mr. Sen," Sir H. S. Maine "had convinced himself that the creed of the Brahmos lacked stability. The process by which the sect was formed might be increasing in activity, but there seemed also to be a growing disinclination to accept any set of common tenets. It would be difficult for legal purposes to define a Brahmo, and if no definition were given, there might shortly be petitions for relief by persons who were in the same legal position as the present applicants, but who declared that they could not conscientiously call themselves Brahmos." (১)

মেইন সাহেব স্থির করিলেন যে সিবিল বিবাহ আইন করিতে হইবে।

"It would be in substance a Civil Marriage Bill......With religious ceremonials it would not be concerned. The Brahmos could add to the requirements of the law whatever ritual they preferred, and the result would be that, there would be first a civil, and afterwards a religious marriage."

এস্থলে বলা আবশ্যক যে

"প্রথমাবস্থায় পাণ্ডুলিপির সকলপ্রকার ধর্ম্মহীনতা দোষ এই কয়েকটি কথায় অপনীত হইয়াছিল 'আমি (অমুক) সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্নিধানে এই কথা জ্ঞাপন করিতেছি যে (অমুক) তোমায় আমি বৈধ পত্নীত্বে (পতিত্বে) গ্রহণ করিতেছি।" (২)

সিবিল বিবাহের বর ও কন্যার নিম্নতম বয়স ১৮ ও ১৪ নির্দ্দিষ্ট হইল; বহু বিবাহ বারিত হইল ও বিবাহ রেজিষ্ট্রি করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজিষ্ট্রার নিয়োগের ব্যবস্থা হইল।

ব্রহ্মানন্দ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কি কারণে সিবিল বিবাহ বিধিতে সম্মতি দিলেন তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

"ধর্ম্মের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ বিবাহই নয়, সুতরাং ব্রাহ্মগণ কখন তাদৃশ বিধি অনুসরণ করিয়া বিবাহ করিতে পারেন না, তবে বিবাহানুষ্ঠানের অবান্তর অঙ্গরূপে এই বিধির অনুসরণ পূর্ব্বক রেজেষ্ট্রারী করাতে কোন দোষসংস্রব হইতে পারে না, এই বিবেচনায় পাণ্ডুলিপির প্রতি আপত্তি উত্থাপিত হয় না।" (৩)

সিবিল বিবাহ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন

মেইন সাহেব কর্ত্তৃক সিবিল বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপি উত্থাপিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। সিবিল বিবাহ আইনের মধ্যে যে পরিচয় উক্তিটি ছিল তাহা এইরূপ:—

---

(১) Supplement to the Gazette of India, September 19, 1868. Quoted by Miss Collet, Brahmo Yaar Book 1879, p. 14.

(২) আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ, পৃঃ ২২৩।

(৩) আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ, পৃঃ ২২৩।

"I do not profess the Christian religion, and I object to be married in accordance with the rites of the Hindu, Mahomedan, Buddhist, Parsi or Jewish religion." (১)

এই পরিচয়-উক্তি সম্বন্ধে আপত্তি হইল এই যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, পার্শী অথবা ইহুদী ধর্ম্মসমাজস্থ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সমাজ পরিত্যাগ না করিয়াও এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে, ফলে সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। কিন্তু মেইন সাহেব দেখাইলেন যে

Act XXI of 1850

এই আইনে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে—

"So much of any law or usage now in force......as inflicts on any person forfeiture of rights or property, or may be held in any way to impair or affect any right of inheritance, by reason of his or her renouncing or having been excluded from the communion of any religion, or being deprived of caste, shall cease to be enforced as law."

Sir H. S. Maine said,—"That is the *Lex Loci* Act of Lord Dalhousie's Government, which is still the charter of religious liberty in India. I myself do not entertain a particle of doubt, that it was the intention of the framers of the Act to make it complete, and to relieve from all civil disabilities all dissidents from native religions. It was meant to condone all offences against religious rule, whether they were acts of omission or of commission. But probably from mistake, probably from attending too exclusively to the immediate question before them which affected only the first generation of dissidents, they left standing the greatest of all disabilities the disability to contract a lawful marriage. It is incredible to me, that, except by an oversight, they should have expressly provided for the protection of the right of inheritance, but should have omitted to provide for the right of contracting marriage, without which inheritance cannot arise." (২)

(১) "It was evident that it [*i. e.* the declaration] might be made by other than professed dissidents, and thus many marriages might be legally ratified in disregard of caste rules by persons who still desired to retain their position in Hindu Society." (Br. Y. B. 1879 p. 16).

যাঁহারা মনে করেন যে তিন আইনের অভাবাত্মক পরিচয় উক্তির (negatives declaration) অর্থ এই যে 'প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহি' তাঁহারা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের উপরোক্ত স্বীকারোক্তির ইতিহাস ভাল করিয়া স্মরণ রাখেন না।

বস্তুত ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের declaration এর সহিত তিন আইনের declaration এর তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে যাহারা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, পার্শী, খ্রীশ্চান অথবা ইহুদি নহে শুধু তাহাদের জন্যই তিন আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল।

(২) Supplement to the Gazatte of India, December 5, 1868 Quoted in Brahmo Year Book 1879 p. 16.

আন্দোলনের ফলে

সিবিল বিবাহ আইন স্থগিত রহিল

কিন্তু ব্রাহ্মেরা কি অসবর্ণ বিবাহ বন্ধ করিয়া দিলেন ? কাউই সাহেবের মতে ব্রাহ্ম বিবাহ মাত্রই অসিদ্ধ। তবে কি ব্রাহ্ম বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল ? কখনই নহে।

"Meanwhile those Brahmes whose courage kept pace with their faith, went on marrying and giving in marriage, without waiting for the law." (১)

কাউই সাহেব অসিদ্ধ বলা সত্ত্বেও ব্রাহ্ম বিবাহ চলিতে লাগিল

কাউই সাহেব বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিবার পরে ও তিন আইন পাশ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় ২১টি ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পন্ন হইল। আইনের চক্ষে এই সকল বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে এই আশঙ্কায় ব্রাহ্ম বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল না।

ব্রাহ্ম বিবাহ বিল (১৮৭১)

নানা প্রকার আলোচনা ও আন্দোলনের ফলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে Mr. Fitzjames Stephen. (২) সিবিল বিবাহ আইন পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্ম বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের negative declaration এর পরিবর্ত্তে এখন পরিচয়োক্তি দাঁড়াইল এইরূপ :— "I am a member of the Brahmo Samaj." । বলা বাহুল্য এই পরিচয়োক্তিতে অন্যান্য সমাজের কোন আপত্তি হইবার কারণ রহিল না।

আদি ব্রাহ্মসমাজের আপত্তি

৩১শে মার্চ, যেদিন আইন পাশ হইবার কথা, সেইদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে আপত্তি জানাইয়া আবেদন দাখিল হইল।

আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রধানত তিনটি কারণে এই আইন পাশ হওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন। রাষ্ট্রপতি ইংরাজ সরকারের নিযুক্ত রেজিষ্ট্রারের দ্বারা সম্পন্ন সিবিল বিবাহ অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে ব্রাহ্ম বিবাহের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। ইহাতে— "imposing a civil form of marriage quite inconsistent with its religious spirit." (৩)—ব্রাহ্মবিবাহের আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হইবে। দ্বিতীয়ত আদি ব্রাহ্ম সমাজের মতে এইরূপ আইন পাশ করিবার আদৌ কোন আবশ্যকতা ছিল না। আদি ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহ সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ বলিয়াই গণ্য হইয়া আসিতেছে। এইরূপ আইন পাশ হইলে হয় রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে নয়ত পৌত্তলিক প্রথাসমূহ পুনর্গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ সংস্কারের কার্য্যে বিদেশী রাজার আইনের সাহায্য লওয়া আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় নহে। "That legislative interference is not needed in regard to the regulation of social customs." (৪)

১) Miss Collet, Brahmo Year Book, 1879, p, 17,

(২) Sir H. S. Maine চলিয়া যাইবার পর, ইনি আইন-সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন।

(৩) Friend of India, Aug. 12,1871

(৪) Quoted by Miss Collet, Brahmo Year Book, 1879. p. 26.

তৃতীয়ত আদি ব্রাহ্ম সমাজের মতে ব্রাহ্মেরা হিন্দু সমাজেরই অন্তর্গত—"in fact the Brahmos form an integral part of that [Hindu] community". । এই আইন পাশ হইলে—"this will naturally check the course of healthy and spontaneous reformation which it is the aim of the Samaj to bring about."

যাহা হউক আদি ব্রাহ্মসমাজের আপত্তির ফলে বিবাহ আইন পুনরায় স্থগিত হইল।

তিন আইন [Special Marriage Act III, 1872]

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম বিবাহ আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় সিবিল বিবাহ আইন আকার ধারণ করিল। তবে এইবার negative declarationটি আরও পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল —"I do not profess the Christian, Jewish, Hindu, Mahomedan, Parsi, Budhist, Sikh or Jaina Religion."—যাহাতে হিন্দুসমাজ বা অন্য কোন সমাজের কেহ কোনমতেই তিন আইন অনুসারে বিবাহ করিতে না পারে। বর ও কন্যার নিম্নতম বয়স, বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ও সরকার কর্ত্তৃক রেজিষ্ট্রার নিয়োগ ব্যবস্থা একই প্রকার রহিল। তবে যাহাতে তিন আইন বর্জ্জিত বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য না হয় সেইজন্য স্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইল— "Section 19. Nothing in this Act contained shall affect the validity of any marriage not solemnized under its provisions ; nor shall this Act be deemed directly or indirectly to affect the validity of any mode of contracting marriage ; but if the validity of any such mode shall hereafter come into quesstion before any Court, such question shall be decided as if this Act had not been passed." ইহা ব্যতীত তিন আইন অনুসারে সম্পন্ন বিবাহে Indian Divorce Act of 1869 খাটিবে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২২শে মার্চ্চ

তিন আইন পাশ হইয়া গেল

অধিকাংশ ব্রাহ্ম এই আইন গ্রহণ করিলেও সকলে ইহা স্বীকার করিলেন না। Miss Collet তাঁহার Brahmo Year Book for 1880 র ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :

"But although there can be no doubt that the Act has greatly encouraged and promoted Brahmo marriage, it will be seen that many Brahmos have not taken advantage of it............of the 39 marriages before this Act, only 21 were retrospectively registered............after the Act, 12 marriages out of 54 were celebrated independently of it, and of course remain unregistered."

সংখ্যায় অল্প হইলেও ব্রাহ্মবিবাহের সূত্রপাত হইতেই

তিন আইন বর্জ্জিত ব্রাহ্মবিবাহ চলিতে লাগিল

আজ পর্য্যন্ত তিন আইন সম্বন্ধে আপত্তি দূর হয় নাই। বরঞ্চ ব্রাহ্ম যুবকদিগের মধ্যে আপত্তি বাড়িয়াই চলিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিন আইনের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, যুবকদিগের খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

তিন আইন সম্বন্ধে আপত্তি

একক্ষণে আমরা তিন আইন সম্বন্ধে আপত্তিগুলি আলোচনা করিব।

সামাজিক স্বাধীনতা বজায় রাখা আবশ্যক

আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে রাষ্ট্রশক্তি (Government) ও দেশীয় সমাজের মধ্যে

প্রভেদ এখনও এরূপ সুস্পষ্ট যে সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও ধর্ম্মপদ্ধতি দ্বারা বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার উপায় থাকা একান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও (১) State registration এবং (২) বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার সামাজিক প্রথা ও ধর্ম্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী বিবাহ, এই দুই প্রকার বিবাহই প্রচলিত আছে। সমাজ সংস্কারের কার্য্যে সর্ব্বদাই Governmentএর সাহায্য পাওয়া যাইবে এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। দেশীয় সমাজের উন্নতির জন্য Government এর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও চলিবে না। এই জন্য আইন-নিরপেক্ষ ভাবেও দেশীয় সমাজের উন্নতি যাহাতে হইতে পারে সেই পথ খোলা রাখিতে হইবে। স্বাধীন ভাবে দেশীয় সমাজের উন্নতিসাধন করিবার একমাত্র উপায় সামাজিক বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিজেদের হস্তে রক্ষা করা। ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে যতদূর সম্ভব নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলাই বাঞ্ছনীয়।

রাজনারায়ণ বসু

তিন আইন সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "আত্ম জীবনীতে" লিখিয়াছেন (১৮৩ পৃঃ)

"ব্রাহ্ম বিবাহ বৈধ বিবাহ, তাহার জন্য বিশেষ আইন করিবার আবশ্যক ছিল না। যখন চৈতন্য মতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠীবদল বিবাহ এবং অন্যান্য আধুনিক সম্প্রদায় লোকদিগের বিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গণ্য হয়, তখন বিশেষ আইন না হইলেও ব্রাহ্মবিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

তিন আইন সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবু যে উদ্দীপনা পত্র প্রকাশ করেন তাহাতে আছে (আত্ম জীবনী, ১৮৮-১৮৯ পৃঃ) :—

"There is another point to be taken into consideration in connection with the Bill and that the most important one. For the first time in the history of India, the Government is going to interfere with the religion of a class of his Majesty's subjects, by rendering a civil ceremony indispensably necessary for the validity of a religious one. Who is to be blamed for this ? Not Government, but we ourselves who are going to surrender our religious rights into its hands of our own accord. The former Mahomedan Government as well as the present English Government have all along allowed Mahomedans or Hindoos differing from the orthodox faith to determine their own rites, manners and customs, and never questioned the legal validity of these rites and customs. The Sikhs, the Nanak-panthees, the Kabeer-panthis, the Sadhs, the Chaitanya Vaishnavas, the Feragees, the newly sprung up Kokas of the Punjab as well as numerous other bodies of heterodox Hindoos or Mahomedans have all along enjoyed this privilege, as a spiritual patrimonial right handed down from generation to generation. Why should we only, the Brahmos be deprived of it ? Never before this time did the Government interfere with this privilege ... ... Now for the first time it is going to take away from us the right which all heterodox Hindoos and Mahomedans have all along enjoyed. If Government take away from us this privilege from our hands, we shall be obliged at every

step in future to solicit government interference in our social and religious concerns. Just consider the calamitous consequences that will flow from the same. Better that our sons be deprived of their patrimonial inheritance than part with our religious independence. Never before in the history of India did any such instance occur of a body of religious men surrendering their religious rights into the hands of the Government of their own accord in the way we are doing. Even in its pages will this stain remain over our memory."

ব্রজসুন্দর মিত্র

পূর্ব্ববঙ্গের প্রবীন ব্রাহ্ম-নেতা সূক্ষ্মদর্শী আইনজ্ঞ ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ও এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

"হিন্দু ধর্ম্মের সাধারণ অবস্থা এবং ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে হিন্দধর্ম্ম হইতে বহু সংখ্যক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে এবং এইক্ষণও হইতেছে। তাহাদিগের মত প্রচলিত হিন্দধর্ম্ম হইতে অনেক পরিমাণে বিভিন্ন, তাহাদিগের রীতিনীতিও হিন্দশাস্ত্র হইতে অনেক পরিমাণে বিপরীত, তথাপি সে সম্বন্ধে কখনও কোন আপত্তি কিংবা সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। ব্রাহ্মগণের সম্বন্ধেও ত সেইরূপ হইতে পারে। বিশেষত হিন্দধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত এই সকল সম্প্রদায়ের বিবাহ পদ্ধতি হিন্দশাস্ত্র হইতে যত বিভিন্ন ব্রাহ্মদিগের বিবাহ পদ্ধতি হিন্দশাস্ত্র হইতে তত দূর বিভিন্ন নহে তাহাতে অগ্নিসাক্ষী পদ্ধতি পরিত্যাগ করিলেও বিবাহ অসিদ্ধ হইতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্ম্মরূপে আমাদের সমাজে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই জন্যই এতকাল ধর্ম্মকে, সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। এই জন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।" (১)

"য়ুরোপের যেখানে বল, আমাদের সেখানে বল নহে। য়ুরোপ আত্মরক্ষার জন্য যেখানে উদ্যম প্রয়োগ করে, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সেখানে উদ্যম প্রয়োগ বৃথা। য়ুরোপের শক্তির ভাণ্ডার, ষ্টেট অর্থাৎ সরকার। সেই ষ্টেট্ দেশের সমস্ত হিতকর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে—ষ্টেটই ভিক্ষাদান করে, ষ্টেটই বিদ্যাদান করে, ধর্ম্মরক্ষার ভারও ষ্টেটের উপর।" (২)

"ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেই খানেই দেশের মর্ম্মস্থান। সেই খানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্য্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়—এই জন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদর দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থ ভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।" (৩)

"এতকাল নানা দুর্ব্বিপাকেও এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এখন ইহা আমরা অচেতন ভাবে, মূঢ় ভাবে পরের হাতে প্রতিদিন তুলিয়া দিতেছি। ইংরাজ আমাদের রাজত্ব চাহিয়াছিল, রাজত্ব পাইয়াছে, সমাজটাকে নিতান্ত উপরিপাওনার মত লইতেছে—'ফাউ' বলিয়া ইহা আমরা তাহার হাতে বিনমূল্যে তুলিয়া দিতেছি।" (৪)

"আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন্, সরকার সমাজের বাহির। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া করিতে হইবে। যে কর্ম্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে। ... আজ আমরা

(১) রবীন্দ্রনাথঠাকুর, "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট—সমূহ, ২৯ পৃঃ।
(২) "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট, সমূহ, পৃঃ ২৯
(৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্বদেশী সমাজ" পৃঃ ৩—৪।
(৪) পরিশিষ্ট, সমূহ পৃঃ ৩০।

সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজ বহির্ভূত ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্ম উদ্যত হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচার বিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছে; হিন্দু সমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরাজের আইনে বাঁধিয়া গেছে,—পরিবর্ত্তন মাত্রেই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্ম্মস্থান—যে মর্ম্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই আমাদের অন্তরতম মর্ম্মস্থান আজ অনাবৃত অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিফলতা আক্রমণ করিয়াছে।" (১)

তিন আইন সম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তি ইহার Negative Declaration.

আমি "ইহা বিশ্বাস করি না, আমি উহা বিশ্বাস করি না" ইত্যাদি প্রকার অভাবাত্মক স্বীকারোক্তি অনেকের নিকট নিতান্ত আপত্তিজনক বলিয়া মনে হয়। মিস্ কলেট লিখিয়াছেন:—

"An esteemed Brahmo correspondent sending me word of several marriages in the North of India, wrote thus on the subject:—'None of these marriages was registerd under Act III of 1872, though these were strictly performed aecording to Brahmic rites,...the reasons why these marriages were not registered under Act III of 1872 were...parties had conscientious scruples to make the declaration required by the act to the effect that the parties do not profess Hinduism, Christianity, Mahomedanism etc. etc. For my part I would rather declare that I profess all these religions than that I do none of them.'—" (২)

তিন আইনের হিন্দুত্ব-বিরোধী ভাব

আবার এমন লোকও অনেক আছেন যাঁহাদের হয়ত সাধারণ ভাবে negative declaration এ আপত্তি নাই, কিন্তু "I do not profess the Hindu religion" বলিতে আপত্তি আছে। ব্রাহ্মেরা হিন্দু কি না সে তর্কে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই, আমি শুধু এই কথা বলিতে চাহি যে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে অনেক ব্রাহ্ম নিজেদের হিন্দু বলিয়া মনে করেন। যাহার এরূপ বিশ্বাস তাহাকে অন্য কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না যে "তুমি হিন্দু নও" অথবা তাহাকে "আমি হিন্দু নহি" এরূপ কথা বলিতে জোর করিয়া বাধ্য করিতেও পারেন না। বস্তুত নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে negative declaration স্বীকার করা মিথ্যা ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেনা। (৩)

হিন্দুশব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না

কেহ কেহ বলেন যে এক্ষেত্রে negative declaration এর অর্থ:—"বিবাহ-বিধি সম্বন্ধে আমি প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম বিশ্বাস করিনা"। কিন্তু তিন আইনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে এরূপ অর্থ করা সঙ্গত নহে।

(১) "স্বদেশী সমাজ" সমূহ, পৃঃ ৫।

(২) Brahmo Year Book, 1879, p. 65.

(৩) বলা বাহুল্য, negative declaration স্বীকার করিলেই মিথ্যা ব্যবহার করা হয় আমি এরূপ কথা বলিতেছি না। আমি জানি অনেক ব্রাহ্ম নিজেদের হিন্দু বলিয়া মনে করেন না, তাঁহাদের পক্ষে negative declaration এ কোন প্রকার বাধা না থাকিতে পারে; আমি শুধু তাঁহাদের কথাই বলিতেছি যাঁহারা নিজেদের হিন্দু বলিয়া মনে করেন।

Sir H. S. Maine এর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পাণ্ডুলিপিতে ছিল :—"I object to be married in accordance with the rites of the Hindu,...etc., religion"। ইহাতে আপত্তি হয় যে "it might be made by other than professed dissidents, and thus many marriages may be legally ratified in disregard of caste rites by persons who still desired to retain their position in Hindu Society". মিস্ কলেট আরও লিখিয়াছেন—"Of course, if a Brahmo does not feel that he has absolutely broken with Hinduism (and such may no doubt be the case with brave men who, the correspondent just quoted, are quite above the weakness of forsaking an unpopular standand once adopted)...it would be untrue in him to make...the declarations in Act III". এবং স্পষ্ট করিয়া ইহাও বলিয়াছেন :—"And the history of the movement shows that such renunciation of Hinduism was the only condition of the Act which could save it from the serious opposition of the genuine Hindus on one hand and the conservative Brahmos on the other." (১)*

Negative declaration এর দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে ইহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আপত্তি ছিল।

আদি ব্রাহ্ম-সমাজ

"The Brahmos form an integral part of that [i. e. Hindu] community. The law, therefore, if passed will dissociate the former from the latter—a contingency to be highly dreaded, as it will injure the cause of religious reformation in India."

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন চরিতে ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

"হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয় এই দিকেই তাঁহাদের প্রাণগত একান্ত যত্ন ছিল" (৫২১ পৃঃ)।

ব্রজসুন্দর মিত্র

"ব্রজসুন্দর ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সংস্কৃত সংস্করণ মনে করিতেন। তাই ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া যায়, তিনি ইহা আদৌ পছন্দ করিতেন না।" (২) ব্রজসুন্দর নিজে লিখিয়াছেন :—"আইন বিধিবদ্ধ হইলে ব্রাহ্মগণ হিন্দুদিগ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িবেন। একে ব্রাহ্মগণ সংখ্যায় অতি অল্প তাহাতে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে তাহাদিগের শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে ও অবনতিসম্পাদন করা হইবে।...ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য সমগ্র হিন্দুসমাজকে ক্রমে উন্নতির পথে চালিত করা; ইহার এই তরুণ অবস্থায়ই ইহা হিন্দুসমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে হিন্দুসমাজের উন্নতিসাধন করা আর ব্রাহ্মদিগের সাধ্যায়ত্ত থাকিবে না, তাঁহারা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইবেন।"

ব্রজসুন্দরের জীবনচরিত লেখিকা হেমলতা দেবী মন্তব্য করিয়াছেন :— "এতদিন পরে আমরা তিন আইনের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়াই পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। ব্রজসুন্দরের ভয় যে অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক ছিল না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" (৩)

রাজনারায়ণ বসু

আত্মজীবনীতে (১৮৬ পৃঃ) দুঃখ করিয়াছেন :—ব্রাহ্মেরা যেদিন বলিলেন আমি হিন্দু নই "সেদিন কি শোচনীয় দিবস, সেদিন দুই ভাইএর ছাড়াছাড়ি হইল। এক ভাই পৈতৃক নিবাস স্বরূপ হিন্দু সমাজে রহিলেন, আর এক ভাই তথা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।"

---

(১)* Brahmo Year Book, 1879. p. 65.

(২) জীবনচরিত, ৩৬৪ পৃঃ

(৩) জীবনচরিত, ৩৬৫ পৃঃ

অজিতকুমার এই সময়কার ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন (১২৮ খৃঃ) যে তিন আইন পাশ হইবার পর হইতেই "দেশের স্রোত অন্য খাত কাটিয়া বহিয়া চলিল এবং ব্রাহ্মসমাজের নদী ক্রমশঃ মরা নদী হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্ম সমাজের যুগ অবসান হইল।"

শিবনাথ শাস্ত্রী

"চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্প অল্প হ্রাস পাইতে লাগিল—যুবকদলের উপর হইতে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি চলিয়া গেল।"

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

"The most important exception taken to the Act in that is requires the parties marrying under it to virtually renounce the Hindu name. The intense feeling of nationalty that has been growing in the country during the past thirty years or so makes this reunuciation repugnant even to many of those who care little for orthodox Hindusim. A growing number of Brahmos share in this repugnance." (১)

তিন আইন ব্রাহ্ম বিবাহের অবান্তর অঙ্গ মাত্র

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাঁহার একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেনঃ—

"সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাতে কন্যাসম্প্রদান করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, আর কীটাবাস শিলাকে পূজা করিয়া বিবাহ দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে ইহা হইতে বিপরীত কথা আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত জন্য রাজনিয়মের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি সে প্রার্থনা সিদ্ধ না হয়, তাহাতেই বা কি? (৩১ ভাদ্র, ১৭৮৩ শক, পত্রাবলী, পৃঃ ৩৫।)

রাজনিয়মের সহায়তা লাভে আপত্তি নাই, কিন্তু রাজনিয়মকে প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে না।

ব্রজসুন্দর মিত্র

জীবন চরিতে (পৃঃ ৩৬২) হেমলতা দেবী লিখিয়াছেনঃ—

"ব্রজসুন্দরের পুরাতন চিঠি পত্র হইতে স্পষ্ট দেখা যায় তিনি আইনের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না; বলিতেন সর্ব্বদর্শী পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বর ও ধর্ম্মবন্ধুদিগকে সাক্ষী করিয়া যে বিবাহ হয় তাহাই ধর্ম্মানুমোদিত এবং যথার্থ বিবাহ; ইহার জন্য আবার আইনের আবশ্যকতা কি? ব্রাহ্মবিবাহে ধর্ম্ম অপেক্ষা আইনকে প্রাধান্য দেওয়া তিনি সঙ্গত মনে করিতেন না।"

আচার্য্য কেশবচন্দ্র

"ধর্ম্মের সংস্রব পরিহার করিয়া বিবাহ বিবাহই নয়, সুতরাং ব্রাহ্মগণ কখন তাদৃশ বিধি অনুসরণ করিয়া বিবাহ করিতে পারেন না, তবে বিবাহানুষ্ঠানের অবান্তর অঙ্গরূপে এই বিধির অনুসরণ পূর্ব্বক রেজেষ্টারী করাতে কোন দোষসংস্রব হইতে পারে না, এই বিবেচনায় পাণ্ডুলিপির প্রতি আপত্তি উত্থাপিত হয় না।" (২)

তিন আইনকে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিলে

ধর্ম্ম সমাজের মূল আশ্রয়কে বিনষ্ট করা হয়

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

"আইন না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার হইতে পারে না, এ কথা স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ উভয়ের উপর কলঙ্ক আইসে।.........রাজা যদি আমাদের ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া না লন,

(১) Phil. of. Br. pp. 352-353.

(২) আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্য বিবরণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৩।

আমাদের তাহাতে আধ্যাত্মিক কোন ক্ষতি হইতেছে না। পৃথিবীর আইন আদালত বিবেকের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না।...রাজবিধি না থাকাতে আইনের চক্ষে ব্রাহ্মবিবাহের যে অসিদ্ধতা উপস্থিত হইবে তৎপ্রতি ভয় বশতঃ যেন কেহ বিবেককে উল্লঙ্ঘন না করেন।"

রাজনারায়ণ বসু

"সিভিল বিবাহ আইনের প্রতি আমার প্রধান আপত্তি এই যে ব্রহ্মের সম্মুখে ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মের সম্মুখে যে বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদিত হইল সে বিবাহের সন্তান সুজাত বলিয়া গণ্য হইবে না, যে পর্য্যন্ত না এমন এক ব্যক্তি, যাহার সহিত ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই অর্থাৎ Registrar, বলেন ঐ বিবাহ বৈধ। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এই বিবাহ পদ্ধতির কি প্রকারে অনুমোদন করেন তাহা বুঝিতে পারি না।" (আত্মজীবনী, ১৮৭ পৃঃ)

তাঁহার উদ্দীপনা পত্রীতে আছে :—It is therefore plain that the Bill considers the solemnisation of Brahmo marriages according to Brahmic rites a non-essential point. What! Are Brahmic nuptial rites nothing, and the form of the legislature everything? Is not this a plain insult to our religion?............Had the bill ordained the simple registration of marriages previously solemnized according to Brahmic rites only, it would have been a different thing, but when the Legislature is going to impose a civil form of marriage contrary to the spirit of the Brahmic form, how can you, I ask, being true Brahmos submit to the same? You must have lost every sense of respect towards our holy religion if you can do so. You deceive yourselves with the thought that the civil form is a mere super-addition to the religious. How can this be, when the religious rites are non-essential, and the civil form the essential thing in the matter? Moreover how can a Brahmo say before a registrar "he *takes* a woman as his wedded wife when *he has already done so (or will do so)* in the solemn presence of God and the minister of religion? Will not this be a plain lie?"

বস্তুত বিবাহ পদ্ধতি ও রেজেষ্ট্রি এই দুইকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা আবশ্যক। জন্মদিন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে যেরূপ উপাসনা হইয়া থাকে বিবাহ উপলক্ষেও সেইরূপ উপাসনা হইতে পারে, কিন্তু রেজেষ্ট্রি করিয়া সিভিল বিবাহের পরে পুনরায় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি চলিতে পারে না। রেজেষ্ট্রি যদি পরে হয় তবেও ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিয়া পুনরায় "আমি অবিবাহিত" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা অসম্ভব। ধর্ম্মপদ্ধতি ও রেজেষ্ট্রি একত্র হইলেও যথার্থত উহা দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ, এইজন্য অনেকের নিকট উহা নিতান্ত বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

ব্রাহ্ম বিবাহপদ্ধতির পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

কারণ এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে রেজেষ্ট্রি হইবার একদিন দুইদিন অথবা এক সপ্তাহ পরেও পুনরায় ব্রাহ্ম বিবাহ হইল। অপর পক্ষে ব্রাহ্ম বিবাহ পদ্ধতি সম্পূর্ণ হইবার একদিন দুইদিন এমন কি এক সপ্তাহ পরে রেজেষ্ট্রি হইল এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে।

ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা

সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব। এ স্থলে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। রেজিষ্ট্রি না করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ আইনের চক্ষে বৈধ হয় না, এরূপ কথা বলা অসম্ভব। এক কাউই সাহেব ভিন্ন আর একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তিও ব্রাহ্ম বিবাহের বিরুদ্ধে মত লিপিবদ্ধ করেন নাই। বরঞ্চ Sir James Stephen (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতায়), Sir Gurudrs Banerji (Hindu Law of Marriage and Stridhan নামক বিখ্যাত Tagore Law Lectures এর মধ্যে), Mr. Justice Russell (১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হাইকোর্টের একটি মকদ্দমায়), Sir Sankaran Nair (১৯০৯ খৃষ্টাব্দে

মাদ্রাজ হাইকোর্টের একটি মকদ্দমায়) ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা সমর্থন করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের আডভোকেট Mr. S. C. Basu এবং Mr. N. Sircar এসম্বন্ধে ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা সমর্থন করিয়া মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তিন আইন বৰ্জ্জিত ব্রাহ্ম বিবাহের উদাহরণ

ব্রাহ্ম সমাজে বিরল নহে। এই প্রসঙ্গে উমেশচন্দ্র দত্ত, গুরুচরণ মহলানবিশ, নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ সেন, নবীনচন্দ্র রায়, বিপিনবিহারি রায়, কুঞ্জলাল ঘোষ, নীলকান্ত সিদ্ধান্ত, মন্মথ নাথ দাশগুপ্তের নাম উল্লেখ করা যায়। আদি ব্রাহ্ম সমাজের বিবাহ বাদ দিয়া পঞ্চাশটির উপর বিবাহের তালিকা পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ এ সকল বিবাহ অস্বীকার করেন নাই; এইরূপ বিবাহের respectability, অনিন্দনীয়তা অথবা লোকপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম অথবা নীতির দিক হইতেও ব্রাহ্ম বিবাহকে কোনমতেই দূষণীয় বলা চলে না। অথচ আজকাল এরূপ কথা উঠিয়াছে শুনিয়াছি যে

তিন আইন বৰ্জ্জিত বিবাহ বিবাহই নয়?

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিন আইন আন্দোলনের সময় রাজনারায়ণ বসু এই প্রশ্নই উত্থাপন করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহকে যথার্থ বিবাহ বলিয়া গণ্য করেন কি না? বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে এ প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা হয় নাই। রেজিষ্ট্রি ও উপাসনা একত্র মিশাইয়া প্রশ্নটিকে এক প্রকার ধামা চাপা দিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু আজ যখন শুনিতেছি এরূপ কথাও উঠিয়াছে যে যদি উপাসনা নাই হয় "শুধু রেজিষ্ট্রিকরিয়া বিবাহ হইয়া যাউক" তখন আর এই প্রশ্নটিকে চাপা দিয়া রাখা যাইতে পারে না।

ব্রাহ্ম সমাজের অনেক লোক ব্রাহ্মপদ্ধতি ও রেজিষ্ট্রি দুই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। এখন প্রশ্ন এই যে,

ব্রাহ্মপদ্ধতি না তিন আইন?

উপাসনা বর্জ্জন পূর্ব্বক শুধু রেজিষ্ট্রিকে অধিক সন্তোষজনক মনে করিলে ব্রাহ্ম সমাজের মূল আশ্রয়কে বিনষ্ট করা হইবে। এই প্রকার বিবাহকেই রাজনারায়ণ বাবু "নিরীশ্বর বিবাহ" আখ্যা দিয়াছিলেন। তিন আইন বৰ্জ্জিত ব্রাহ্ম বিবাহ অপেক্ষা উপাসনা বৰ্জ্জিত নিরীশ্বর বিবাহকে কোন ব্রাহ্ম কি প্রকারে অধিক সন্তোষজনক মনে করিতে পারেন তাহা বুঝি না।

প্রশ্নটি সামান্য নহে, ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে ইহা vital issue—এ প্রশ্নের সমাধান করিতেই হইবে। রেজিষ্ট্রেশনকেই অবশ্যকর্ত্তব্য অর্থাৎ মুখ্য অনুষ্ঠান বলিলে ব্রাহ্মপদ্ধতি যে একটি গৌণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মপদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন বলিয়াই বর্ত্তমান কালে অনেক যুবক এইরূপ গৌণভাবে ব্রাহ্মপদ্ধতিকে টানিয়া আনিতে আপত্তি করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে যদি আইনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে তাহার সহিত অবান্তর অঙ্গরূপে হেলায় ব্রাহ্মপদ্ধতিকে মিশাইতে দিতে পারিব না।

বলা বাহুল্য তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে তিন আইন বাতিল করিয়া দেওয়া হউক অথবা সকলকেই জোর করিয়া তিন আইন অস্বীকার করিতে বাধ্য করা হউক। তাঁহারা বলেন "নানা কারণে লোকে তিন আইন গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি যে কারণে তিন আইন গ্রহণ করেন তাঁহার পক্ষে সেই কারণই যথেষ্ট। অতএব তিন আইন স্বীকার করাই অন্যায়

এরূপ কথা আমরা অন্য কাহারও সম্বন্ধে বলিতে পারি না। তিন আইন যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনও প্রকার সমালোচনা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সকলকেই তিন আইন বর্জ্জন করিতে হইবে এরূপ কথাও আমরা বলি না।

এ সম্বন্ধে আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতারই পক্ষপাতী। তিন আইন গ্রহণ করিবেন কি না সে বিষয়ে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির করুন। আমরা শুধু ইহাই বলিতেছি যে, তিন আইন ব্রাহ্ম বিবাহের অবান্তর অঙ্গমাত্র বলিয়া এ সম্বন্ধে আমাদিগকেও স্বাধীনতা দেওয়া হউক, ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন ব্রাহ্ম বিবাহকে আপনারা স্বীকার করুন।"

আমরা, যাহারা তিন-আইন বিরোধী, তাহারাও বলি যে

ব্রাহ্ম বিবাহ লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়

তবে তিন আইনে আমাদের আপত্তি আছে। কিন্তু আমরা অতি সহজেই আমাদের সমাজে ব্রাহ্ম বিবাহ লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত করিতে পারি। ইহার জন্য ব্রাহ্ম বিবাহের কয়েকটি মূল নিয়ম প্রণয়ন করা আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজ ইচ্ছা করিলেই তাহা করিতে পারেন।

(১) পাত্র ও পাত্রী উভয়ই অথবা তাহাদের অভিভাবকগণের ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হওয়া চাই। (২) স্বামী অথবা স্ত্রী বর্ত্তমান নাই। (৩) রক্তের নিকট সম্পর্ক (consanguinity) জনিত বাধা নাই। (৪) বরের বয়স ১৮ বৎসরের অধিক ও কন্যার বয়স ১৪ বৎসরের অধিক হওয়া আবশ্যক। (৫) ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা নিযুক্ত আচার্য্যের নিকট নোটিস্ দিতে হইবে। নোটিস্ দিবার ১৫ দিনের মধ্যে কোন আপত্তি না হইলে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইতে পারিবে।

ব্রহ্মোপাসনা এবং ঈশ্বর ও ধর্ম্মবন্ধুগণের সমক্ষে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে বর ও কন্যা উভয়ের উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা—এই দুইটি অনুষ্ঠান ব্রাহ্ম বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এইরূপভাবে সম্পন্ন বিবাহের বিবরণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম অনুসারে লিপিবদ্ধ হইতে পারিবে।

এইরূপ প্রথা প্রচলিত হইলে আমরা তিন আইনের সুবিধাগুলি পাইতে পারি অথচ ব্রাহ্মবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজের গৌরবহানি করিতে হয় না। বস্তুত আমরা ইহাই চাহিতেছি—রেজিষ্ট্রি উঠাইয়া দেওয়া আমাদের আসল উদ্দেশ্য নহে—

ব্রাহ্ম বিবাহের স্বতন্ত্র মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা

(independent status) প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

ব্রাহ্মবিবাহ লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত হইলেও তিন আইন উঠিয়া যাইবে না। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই তিন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন, সে পথ বন্ধ হইয়া যাইবে না।* কিন্তু যাঁহারা তিন আইন গ্রহণ করিতে অসমর্থ তাঁহাদিগের জন্য একটা পথ খুলিয়া যাইবে।

অপরদিকে এরূপ প্রথা প্রচলিত হইলে সমাজের পক্ষে নানারূপে কল্যাণকর হইবে। তিন

* পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা তিন আইন উঠাইয়া দিতে চাহি না। যেস্থলে পাত্র ও পাত্রী বিভিন্ন ধর্ম্ম মতাবলম্বী অথবা যেস্থলে পাত্র অথবা পাত্রী কোন ধর্ম্মেতেই বিশ্বাস করেন না সেরূপ ক্ষেত্রে সিভিল বিবাহ ভিন্ন উপায় নাই। কেবল তাহাই নহে বিবাহের শুধু সামাজিক প্রথামাত্র প্রচলিত থাকিলে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সামাজিক অবিচার ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। অর্থাৎ অবান্তর কারণে সমাজ ব্যক্তিবিশেষকে বিবাহ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতে পারে। এইরূপ সামাজিক অত্যাচারের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য সমাজ-নিরপেক্ষ ভাবে সিভিল বিবাহ করিবার বিধি প্রচলিত থাকা আবশ্যক। আমরা চাহি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সামাজিক প্রথা অনুযায়ী বিবাহ এবং সিভিল বিবাহ দুই প্রকার ব্যবস্থাই প্রচলিত থাকুক।

আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রি হইলে ব্রাহ্মবিবাহে Indian Succession Act খাটে না। (১) হিন্দু দায়াধিকারের নিয়মই বর্ত্তায়। হিন্দুদায়াধিকার অনুসারে মেয়েদের প্রতি নানা প্রকার অবিচার ঘটিবার সম্ভাবনা আছে; এবং কার্য্যক্ষেত্রে অবিচার ঘটিয়াও থাকে। বিধবা পত্নী অথবা অবিবাহিতা কন্যারা মৃত স্বামী অথবা মৃত পিতার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। অনেকেই মনে করেন যে

ব্রাহ্ম দায়াধিকারের নূতন ব্যবস্থা আবশ্যক

ব্রাহ্ম সমাজ চিরদিনই মেয়েদের ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন। ব্রাহ্ম বিবাহ লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত করিতে পারিলে সম্পত্তির উপর মেয়েদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার পথ খুলিয়া যাইতে পারে। এইরূপ প্রথা প্রচলিত করার স্বপক্ষে ইহাও একটি প্রধান যুক্তি।

কেহ কেহ বলিবেন নূতন আইন পাশ করিয়া এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা হউক। নূতন আইন পাশ করা সম্বন্ধে চেষ্টা করা যে কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই; পরে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। (২) কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত এরূপ আইন পাশ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কি তিন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে? এরূপ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

ব্রাহ্মসমাজও এরূপ কথা কখনই বলিতে পারেন না। ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত কার্য্যে আইনের সাহায্য যে সর্ব্বদাই পাওয়া যাইবে এরূপ বলা যায় না।

যদি আইনের সাহায্য না পাওয়া যায় তবে কি ধর্ম্মবুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া
আইনকেই গ্রহণ করিতে হইবে?

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অন্যরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি একদিন যখন কাউই সাহেব ব্রাহ্ম বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন, তখনও ব্রাহ্মেরা "went on marrying and giving in marriage *without waiting for the law*" কারণ, তাঁহাদের "courage kept pace with their faith." (৩)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "রাজনিয়মের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি সে প্রার্থনা সিদ্ধ না হয়, তাহাতেই বা কি?" আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন "আজ পর্য্যন্ত যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় করেন নাই। কোন ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সকল বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বিবেকের অনুরোধে অনুষ্ঠান করিয়াছেন।" বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন "রাজবিধি না থাকাতে ভয়বশতঃ যেন কেহ বিবেককে উল্লঙ্ঘন না করেন।"

ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া কেহ কেহ তিন আইন গ্রহণ করিতে অসমর্থ। ব্রাহ্মসমাজ এত দিন ধর্ম্ম বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছেন। আজ কি ব্রাহ্মসমাজের এমন দুর্দ্দিন উপস্থিত যে ধর্ম্মবুদ্ধিকে লঙ্ঘন করিয়া আজ আইনকেই মান্য করিতে হইবে?

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

(১) Mr. J. N. Rayএর সম্পত্তি সম্বন্ধে কলিকাতা হাই কোর্টের এই প্রকার নিষ্পত্তিই হইয়াছে।

(২) অবশ্য নূতন আইন এইরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং যাহাতে ধর্ম্মসমাজ ও ধর্ম্মপদ্ধতিরও গৌরব রক্ষা হয়। সামাজিক স্বাধীনতা ও ব্রাহ্মসমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আইন পাশ করিতে পারিলে তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই এবং সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহ আপত্তিও করেন নাই।

(৩) Miss Collet, Brahmo Year Book, 1879. p. 17. কাউই সাহেব বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিবার পরেও তিন আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে ২১৩টি ব্রাহ্ম বিবাহ হয়। ব্রাহ্মসমাজ রাজনিয়মের প্রার্থী হইয়াও আইনের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন নাই।

মহাভারত-মঞ্জরী

বনপর্ব্ব—নবম অধ্যায়

ধর্ম্মব্যাধ

মার্কণ্ডেয় ঋষি যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে বলিতে লাগিলেন :—

স্ত্রীজাতি সতত সম্মানের পাত্রী। পতিসেবাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। একদা এক ব্রাহ্মণ এক গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। গৃহিণীর ভিক্ষা দিতে বিলম্ব হইল। তাহাতে ব্রাহ্মণ তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রোধ করিল। রমণী বলিলেন, "ঠাকুর, আমি পতি-সেবা করিতেছিলাম বলিয়া বিলম্ব হইয়াছে, ক্ষমা করুন"। ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও তোমার পতি বড় ?" স্ত্রীলোক বলিলেন, "নিশ্চয়ই। স্ত্রীলোকের নিকট তাহার পতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পতিই সর্ব্বপ্রধান"। ব্রাহ্মণ বলিল, "আমি ক্রোধ করিয়া এখনই তোমার পতিকে ভস্ম করিতে পারি।" তাহাতে রমণী বলিলেন, "ক্রোধ মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। যিনি জিতেন্দ্রিয়, একমাত্র তিনিই ব্রাহ্মণ, সকলেই ব্রাহ্মণ নহে। আপনি ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই জানেন না। মিথিলায় ধর্ম্ম-ব্যাধ আছে, তাহার নিকট গমন করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন"।

গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ মস্তক অবনত করিয়া প্রস্থান করিল, আর ভাবিতে লাগিল, কি! ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ব্যাধ শ্রেষ্ঠ! সংশয় নিবারণে উৎসুক হইয়া জনকের রাজ্যে গমন করিল। দেখিল বিদেহরাজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। তথায় কত অন্ন, জল ও ভোজন সামগ্রী পরিপূর্ণ সুসমৃদ্ধ গ্রাম, কত গাভী-বহুল ঘোষ পল্লী, কত যব ধান্যাদি শোভিত প্রান্তর, কত কোলাহলময় রাজপথ, কত হংস সারস সেবিত জলাশয়। (১) ব্রাহ্মণ সে সকল দেখিতে দেখিতে মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইল। দেখিল, তাহাও অতি মনোহর। নগরী প্রাকার পরিবেষ্টিত, সুরক্ষিত। প্রবেশ দ্বার সকল অতি প্রশস্ত। রাজপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তথায় বহু হর্ম্ম্য-মালা শোভা পাইতেছে। বিবিধ দোকানে বিবিধ পণ্যদ্রব্য বিরাজ করিতেছে। প্রজাগণ হৃষ্ট, পুষ্ট, ও বলিষ্ঠ। তাহারা কত প্রকার আমোদ উৎসবে নিমগ্ন রহিয়াছে। কত অশ্ব, গজ ও সৈনিক ইতস্তত গমনাগমন করিতেছে। (২)

ব্রাহ্মণ ব্যাধের দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সে নানাবিধ পশুর মাংস বিক্রয় করিতেছে। ব্যাধ তাহাকে লইয়া গৃহে গমন করিল। তথায় তাহাকে পাদ্য, আসন ও আচমনীয় দিল। সেই দ্বিজোত্তম তাহা গ্রহণ করিল। (৩) ব্যাধ বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা করিয়া শেষে ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া বসিল। তখন ব্রাহ্মণকে বলিতে লাগিল, "পিতামাতার সেবা করিবেন। সত্য বলিবেন। কাহারও কোন অনিষ্ট করিবেন না। কেহ আপনার অনিষ্ট

(১) শান্তি পর্ব্ব ৩২৫—১৯ লাং ২৩। (২) বনপর্ব্ব ২০৬—৬ লাং ৯। (৩) বনপর্ব্ব ২০৬—১৮।

করিলেও আপনি তাহার অনিষ্ট করিবেন না। যাহা কিছু দেখিতেছেন, সকলই ঈশ্বরময়। অতএব সর্ব্বভূতে দয়া করিবেন। সকলের হিতসাধন করিবেন। যথাশক্তি দান করিবেন। পরনিন্দা করিবেন না। সর্ব্বপ্রকারে জিতেন্দ্রিয় হইবেন। কখনও কামক্রোধের বশীভূত হইবেন না। শম দমই তপস্যা, তাহাই যোগ, ইহা ভুলিবেন না। কোন অন্যায় কর্ম্ম করিলে অনুতপ্ত হইবেন, আর কখনও ঐরূপ কর্ম্ম করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবেন। মনুষ্য যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুরূপ ফলভোগ করে। মনুষ্যের কর্ম্ম-ফলেই ব্যাধি উৎপন্ন হয়। আবার চিকিৎসক চিকিৎসাদি কর্ম্মের দ্বারা ব্যাধির শান্তিরূপ ফল উৎপন্ন করে। যাহাদ্বারা মনুষ্যসমাজের অত্যন্তহিত সাধিত হয়, তাহাই সত্য, তাহাই ধর্ম্ম, ইহা কখনও ভুলিবেন না"। (৪)

ব্রাহ্মণ বলিল, "তুমি এমন ধার্ম্মিক, তবে মাংস বিক্রয় কর কেন?" ব্যাধ হাসিয়া উত্তর করিল, "আমার পিতা, পিতামহ যে আচরণ করিয়াছেন, আমিও তাহাই করি। ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, 'চক্ষু বুজিয়া পিতৃ-পিতামহের আচরণ প্রতিপালন করাই ধর্ম্ম'। তবে আপনি কেন অসন্তুষ্ট হইতেছেন?" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি কখনও জীবহত্যা করিনা, অন্য ব্যাধেরা করে। আমি শুধু মাংস বিক্রয় করি।"

দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিল, মাংস বিক্রেতা, নীচ জাতীয় ব্যাধও এমন জ্ঞানী, এমন ধার্ম্মিক! জন্মহেতু উচ্চ ও নীচ—এপার্থক্য অলীক।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

সঙ্গণিকা

ব্যবস্থাপক সভা বনাম্ বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখের অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভা, তাঁহাদের পূর্ব্বের এক অধিবেশনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের জন্য যে আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন তাহা বিনাসর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করা হইবে, না, বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন সর্ত্ত মানিতে হইবে এবং তাহা হইলে কি কি সর্ত্ত মানিতে হইবে সে বিষয়ে অনেক যুক্তি তর্ক ব্যক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধে এবং বিরোধ আপোষে মিটাইবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিজন পারিষদকে আহ্বান করিয়া ব্যবস্থাপকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু, প্রায় একমাস হইয়া গেল তবুও বিরোধ অবসানের কোনও সংবাদ প্রকাশিত হইল না এবং নিকট ভবিষ্যতে যে কোন মীমাংসা হইবে সেরূপ কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। ইহার কারণ কি?

(৪) বনপর্ব্ব ২০৮—৪। ব্যাধের অন্যান্য ধর্ম্মোপদেশ এই গ্রন্থের নানা স্থানে লিখিত হইয়াছে। পুনরুক্তি নিবারণের জন্য তাহা আর এখানে লিখিত হইল না।

এই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় একটি আপত্তি তুলিয়াছেন যে ব্যবস্থাপক সভাপ্রদত্ত অর্থ সভার ব্যবস্থা অনুসারে ব্যয় করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়া যাইবে। এই স্বাধীনতা বিলোপের কথা শুনিয়া দেশবাসীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার স্বতঃসিদ্ধ এবং নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ক স্বাধীনতায় রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ সহ্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সাধারণের সম্পত্তির হিসাব পরিদর্শন এবং সংশোধন করিবার অধিকার ব্যবস্থাপক সভার থাকিবে কিনা, সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা স্বাভাবিক এবং ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মধ্যেও তাহা বর্ত্তমান আছে। যে সকল সভ্য তাঁহাদের অধিকার আছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন তাঁহারাই বিনাসর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশময় স্বাধীনতালোপের রব শুনিয়া তাঁহারা সন্ত্রস্ত হইয়াছেন এবং লোক অপবাদের ভীতিই সম্ভবতঃ তাঁহাদের আপোষ করিবার প্রয়াসের মূল কারণ, প্রকৃত শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা কি-না সন্দেহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারাও এই দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া আপোষ করিবার পথে অগ্রসর হইতেছেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়াধিকার তাহার পারিষদ্‌গণের কতটুকু আছে এবং তাহা ব্যবস্থাপক সভার কতটুকু আয়ত্ত তাহা প্রচলিত আইনে সুনির্দ্দিষ্ট নাই। শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধক আইন ব্যবস্থাপক সভার নিকট উপস্থাপিত হইবে, আশা করি, তখন, স্বাধিকার-রক্ষণপ্রয়াসী সভ্যগণ তাঁহাদের বুদ্ধি এবং বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিবার সাহস প্রদর্শন করিবেন।

ব্রিটিশ্ এম্পায়ার্ এক্‌জিবিশন্

লণ্ডন নগরে আগামী ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ সমূহের শিল্প দ্রব্যের একটি প্রদর্শনী বসিবে। প্রস্তাব হইয়াছে যে ভারত-সরকারও সেই প্রদর্শনীর কার্য্যে যোগ-দান করিবেন। এ জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট্ পাঁচিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কাছে নবাব সৈয়দ্ নবাব আলী চৌধুরী এই উপলক্ষে তিন লক্ষ টাকা খরচ করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন এবং পাইয়াছেন-ও।

যে গভর্ণমেণ্ট্ বৎসরের পর বৎসর দেশের মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও অর্থের অভাব দেখাইয়া অসহায় রোগীর নিকট মূল্যগ্রহণ না করিয়া ঔষধ দান করেন না, ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রস্তাব করেন এবং দারিদ্র্য হেতু কৃষকেরা ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না বলিয়া পূর্ত্ত বিভাগ তুলিয়া দিতে চান্ সেই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং সঙ্গতি কি আছে?

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সকল সভ্যেরা গভর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া-ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাতীয়-শিল্পকলা-বিদ্যামন্দিরের অধিনায়ক। তাঁহারা নাকি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল কুটীরজাত শিল্পদ্রব্যের দেশমধ্যে আশানুরূপ আদর হইতেছে না, তাহা বিদেশে প্রদর্শিত হইলে সেখানে সুপ্রচলিত হইয়া যাইবে। এই

মত কোন্ "জাতীয়" অর্থনীতি সমর্থিত তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু, এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা এবং কর্মাধিপতি লর্ড সাউথবারো যাহা ভাবিতেছেন তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইংলণ্ডজাত দ্রব্য এখন আর বিদেশে পূর্ব্বের ন্যায় গৃহীত হইতেছে না, সেই হেতু কলকারখানা প্রায়ই বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডের ধনী মহাজন এবং শ্রমজীবিগণের বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। কি প্রকারে ইংলণ্ডজাত দ্রব্যের বিদেশে, বিশেষতঃ ভারতে বহুল প্রচার হইতে পারে লর্ড সাউথবারো এখন সেই উপায়ই চিন্তা করিতেছেন। আমাদের দেশজাত দ্রব্য আমাদেরই পছন্দ এবং দেশ কাল উপযোগী হওয়াই স্বাভাবিক। তাহার নির্মাণকৌশল এবং রচনাভঙ্গী উদ্যোগী বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাহা সঙ্ঘবদ্ধ যন্ত্রপালগণের দ্বারা সহজে এবং সস্তায় নকল হইয়া আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য এদেশে ফিরিয়া আসিবে কি? ইতিহাস এ বিষয়ে কি সাক্ষ্য দেয় তাহাই দেশবাসীর বিবেচ্য।

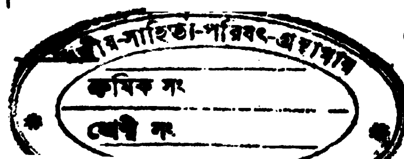
সাম্প্রদায়িক বিরোধ

স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ একদল মুসলমানের মনে হিন্দুবিরোধী মুসলমান-স্বাতন্ত্র্য জাগিয়া উঠে। তাহা অনেক সময়ে রাজকর্ম্মচারিগণের উৎসাহ পাইয়া ভারতীয় জাতীয় সাধনার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গত কয়েকবৎসরের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে ব্যবস্থাপক সভা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের যাবতীয় অনুষ্ঠান এমন কি কংগ্রেস পর্য্যন্ত এই স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় নানা কারণে মুসলমানদের মধ্যে এই স্বতন্ত্র স্বার্থরক্ষার স্পৃহা এবং চেষ্টা কমিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সংশোধন বিধির মধ্যে সভ্য নির্ব্বাচনের যে প্রণালী প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহাতে সেই-বিচ্ছেদের ভাব এবং কলহ পুনর্জীবিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। নূতন নিয়মে মুসলমানদের বিশিষ্ট স্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকজন মুসলমান প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, এবং তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন ও মুসলমান ভোটদাতাগণ দ্বারা। দেশের কাজে এরূপ হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ প্রথম হইতেই সৃষ্টি করা হইলে, মিলন যে কবে হইবে তাহা কে জানে? নয় বৎসরের জন্য মুসলমানগণ Communal Representation পাইলেন। কিন্তু নয় বৎসর পরে যে আবার একথা না উঠিবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

বাড়ীভাড়া আইন

এবার ব্যবস্থাপক সভার কাছে আর একটি বিচারের বিষয় ছিল কলিকাতার বাড়ীভাড়া সংক্রান্ত আইন। সভ্যগণ বাড়ীওয়ালাদের সন্তুষ্ট করিবেন, না, ভাড়াটিয়াদের সুবিধা করিয়া দিবেন সে বিষয়ে কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া প্রচলিত আইনের আরও একবৎসরের আয়ু বৃদ্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এক বৎসর পরে নূতন ব্যবস্থাপক সভা সংগঠিত হইবে, তখন আশা করি এমন সভ্যই নির্ব্বাচিত হইয়া আসিবেন যাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত বিষয়ের বিচার করিয়া কার্য্য করিবার শক্তি দেখা যাইবে।

বেতাল





নব্যভারত

চত্বারিংশ খণ্ড চৈত্র, ১৩২৯ [১২শ সংখ্যা

সমাজতন্ত্রের ঋষি

কার্ল্ মার্কস্ (১৮১৮—১৮৮৩)

কার্ল্ মার্কস্ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীতে রাইন প্রদেশের অন্তর্পাতী ট্রিভস্ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। আইন ব্যবসায়ে তাঁহার পিতার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল—তিনি প্রথমে ইহুদী ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন—পরে ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পুত্রগণের মধ্যে কার্লই পিতার প্রিয়তম ছিলেন—পুত্র যে ভবিষ্যতে প্রতিভাগুণে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিবে এ বিষয়ে তাঁহার অনেকটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; কার্ল জার্ম্মানীর নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাস, আইন প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। অল্প বয়সেই বালকের কল্পনাপ্রবণ চিত্ত কবিত্ব ও উপন্যাসের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠে—কিশোর বয়সেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন—অবশেষে দর্শন শাস্ত্রই তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে—তিনি হেগেলের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন—সেই সময়ে হেগেলই ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। হেগেলের মত তিনিও বিশ্বের ঘটনাস্রোতের মধ্যে এক ভাবের অভিব্যক্তি দেখিয়াছিলেন; তিনি বিশ্বাস করিতেন জগতের সমস্ত ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বর্ত্তমান—বিশ্বের সকল পরিবর্ত্তনের মূলে একটা হেতু আছে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল জগতের ইতিহাসে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঘটে না এই সকল পরিবর্ত্তন বিদ্রোহের বেশে আসিয়া ঘটনার ধারা একেবারে উল্টাইয়া দেয়। হেগেলের চিন্তার ছাপ তাঁহার জীবনে চিরদিন অঙ্কিত ছিল, কিন্তু তাঁহার ভাবুকতায় কার্ল বড় বিশ্বাস করিতেন না। অর্থ-চিন্তার অপেক্ষা দর্শন-চিন্তার প্রতি পুত্রের অধিকতর অনুরাগ দেখিয়া কার্লের পিতামাতা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, পুত্র যাহাতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সংসারের প্রতি আসক্ত হয় তাহার জন্য পিতা মাতা চেষ্টার কোন ত্রুটী করিলেন না, কিন্তু কার্লের স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি দর্শনের জটিল চিন্তা লইয়া ব্যাপৃত রহিলেন, সাধারণ লোকের মত সংসারের সুগম পথে না চলিয়া রাজনীতির কণ্টকময় পথে যাত্রা করিলেন। কার্লের চিন্তাধারার ভিতরে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন, তিনি অধ্যাপকের পদ পাইলেন না। পুত্রের মনের গতি লক্ষ্য করিয়া পিতা মাতার সকল আশা ফুরাইল। জননী কত আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্ল্ বড় হইয়া

প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিবে, তাঁহার যশঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত হইবে—স্বদেশ হইতে বহুদূরে, আত্মীয় বন্ধুগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া,—তাঁহার পুত্র যে সমুদ্রপারে দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে সমাধিলাভ করিবে, একথা জননীর মনে একবারও উদিত হয় নাই।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এক সুন্দরী রমণীর সহিত কার্লের বিবাহ হয়, এই রমণী তাঁহার বাল্যের সঙ্গিনী ছিলেন। সুখে-দুঃখে স্বদেশে-বিদেশে তিনি ছায়ার মত স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন, দীর্ঘ ৩৮ বৎসরকাল স্বামীর পাশেপাশে থাকিয়া এই সতীসাধ্বী পতিব্রতা নারী সহধর্ম্মিনীর সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। নির্ব্বাসিত স্বামী যখন দারিদ্র্যের কঠোর তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠিতেন তখন এই মধুরচরিত্রা রমণী সান্ত্বনাবাক্যে স্বামীর চিন্তার লাঘব করিতেন, তাঁহার নৈরাশ্যকাতর হৃদয়ে উৎসাহের অগ্নিশিখা জ্বালিয়া দিতেন। স্বামীর জীবনের ব্রতকে সুফল করিবার জন্য এই বীররমণী আপনার পুত্রকে পর্য্যন্ত বলি দিয়াছিলেন। কার্ল্ চিরদিনই নির্ভীক, তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু কার্লের পত্নী স্বামীর অপেক্ষাও তেজস্বিনী ও নির্ভীক ছিলেন।

দারিদ্র্যের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, শ্রমজীবিগণ ও কৃষকসম্প্রদায়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার করুণ-হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। বিজ্ঞানের এত উন্নতি এবং কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যের বিস্তার সত্বেও, জগতের অধিকাংশ লোকে কেন যে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় অর্দ্ধাশনে দিনপাত করে, এই চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কৃষক সারাদিন মাঠে পরিশ্রম করিয়াও কেন যে একমুষ্টি অন্নের ভিখারী, শ্রমজীবী সারাদিন কারখানায় প্রাণপণে খাটিয়াও কেন যে কঠিন মৃত্তিকায় ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে, কার্ল্ দিবানিশি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই চিন্তার ফলে ধনিসম্প্রদায়ের বীভৎস অত্যাচার দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দারিদ্র্যের প্রতি এই অমানুষিক অত্যাচারের যাহাতে অবসান হয় তাহার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি একখানি সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক হয়েন। এই সময়ে স্বেচ্ছাচারী আমলাতন্ত্রের শাসনে জার্ম্মানীর অধিবাসিগণ পরাধীনতার দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল, জনসাধারণ গভর্ণমেন্টের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতেছিল, কার্ল্ তীব্র ভাষায় নির্ভীকভাবে এই নিষ্ঠুর শাসনপ্রথার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই প্রতিবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া গবর্ণমেন্ট ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে তাঁহার সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দিল।

কার্ল্ দেখিলেন, দেশের ভিতর থাকিয়া তিনি এ অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না—তিনি প্যারিসে চলিয়া গেলেন—প্যারিসে আসিয়া তিনি বিশিষ্ট ফরাসী লেখকগণের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইলেন—তিনি এখানে আসিয়া জীবনের এক নূতন রাজ্যে প্রবেশকরিলেন। ফ্রান্সে আসিয়া তিনি একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকের ভার লইলেন—কার্ল্ ইহাতে তীব্রভাবে প্রুশিয়ান্ গভর্ণমেন্টের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই তীব্র প্রতিবাদে ভীত হইয়া প্রুশিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ কার্লের সংবাদপত্রখানি বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ফরাসী গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিলেন। চোরে চোরে চিরদিনই মাসতুতো ভাই। জার্ম্মান

গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফরাসী মন্ত্রী গুইজট্ (Guizot) কার্লকে প্যারিস্ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। প্যারিস্ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি চিরজীবনের বন্ধু এঞ্জেল্সের সহিত ব্রাসেল্সে প্রস্থান করিলেন—প্যারিসে অবস্থানকালেই তিনি এঞ্জেল্সের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েন—এ বন্ধুত্ব মরণ পর্য্যন্ত অটুট ছিল। ব্রাসেল্সে আসিয়া তিনি একটি জার্ম্মান শ্রমজীবিসম্প্রদায় গঠন করিলেন এবং একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া উহার সাহায্যে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়াইতে লাগিলেন। এই অক্লান্তকর্ম্মা শক্তিমান্ পুরুষের জীবন শীঘ্রই প্যারিসের "জর্ম্মণ কমিউনিষ্ট্ লীগের" (German Communist League) দৃষ্টিগোচর হইল—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষে এই লীগের সভ্যগণ তাঁহাদের পক্ষ হইতে একটি "ম্যানিফেষ্টো" (Manifesto) লিখিয়া দিবার জন্য কার্ল ও তাঁহার সঙ্গী এঞ্জেল্সকে অনুরোধ করিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীমাসে এই "ম্যানিফেষ্টো" প্রকাশিত হইল—এই বিখ্যাত ম্যানিফেষ্টোর ভিতর দিয়া কার্লের চিন্তাধারা সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ঠিক উপযুক্ত সময়েই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল—পরের মাসেই, ফেব্রুয়ারিতে, প্যারিসে বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল—দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহের লেলিহান অগ্নিশিখা জার্ম্মানীতে ছড়াইয়া পড়িল। পাছে বেলজিয়ামেও আগুন জ্বলিয়া উঠে—এই ভয়ে বেল্জিয়ান্ গবর্ণমেণ্ট কার্লকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন। এবারে কার্লকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না—বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়া উঠায় জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল—স্বদেশে ফিরিবার পথে যাহা কিছু বাধা বিঘ্ন ছিল এই বিদ্রোহের ফলে সমস্তই অপসারিত হইয়াছিল—ব্রাসেল্স্ হইতে বিতাড়িত হইয়া কার্ল স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। এখানে তিনি পুনরায় একখানি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদ্রোহীর সুরে দারিদ্র্যের প্রতি ঘোর অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। দারিদ্র্যের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া তাঁহার অন্তরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—গবর্ণমেণ্টের শত নির্য্যাতন তাহা নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইল না—নির্ব্বাসনের ফলে নির্ব্বাপিত হওয়া দূরের কথা বরং এই ক্রোধাগ্নি আরও ভীষণ আকারে জ্বলিয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সংবাদপত্র আবার বন্ধ করিয়া দিল—কার্ল স্বদেশ হইতে দ্বিতীয়বার বিতাড়িত হইলেন। নির্ব্বাসিত বীর প্যারিসে গিয়া আশ্রয় লইলেন, কিন্তু এখানেও তিনি অধিক দিন শান্তিতে বাস করিতে পারিলেন না—সংসারে যাঁহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া থাকে—বিধাতা তাঁহাদের ভাগ্যে "মানের আসন আরাম শয়ন" লিখেন নাই—তাঁহাদের ভাগ্যে তিনি লিখিয়াছেন—নির্ব্বাসন—কারাগার, ফাঁসী অনাহার, অনিদ্রা—দারিদ্র্য, ঘরের সমস্ত সুখে আগুন জ্বালিয়া দুর্ব্বল ও দরিদ্রের জন্য দুঃখ যাতনা সহ্য করা তাঁহার জীবনের ব্রত। জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের মত এই মহাপুরুষ পাছে ফ্রান্সে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বালিয়া দেয় এই ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে প্যারিস্ ত্যাগ করিয়া যাইবার হুকুম দিলেন। এবার কার্ল ইংলণ্ডে যাইয়া আশ্রয় লইলেন—তখনকার ইংলণ্ড এখনকার ইংলণ্ডের মত স্বাধীনতার শত্রু ছিল না—দেশে দেশে যে সমস্ত স্বাধীনচেতা মহাপুরুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত বা

রাজরোষে পতিত হইতেন—ইংলণ্ড একদিন স্বাধীনতার সেই সকল বন্ধুকে সাদরে আশ্রয় দিত। ইটালির মহাপুরুষ ম্যাজিনিও একদিন ইংলণ্ডের ক্রোড়েই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডেই কার্ল্ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন—মাঝে মাঝে কখন আন্দোলনের জন্য তিনি বাহিরে যাইতেন--১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তাঁহার পঞ্চভৌতিক দেহের অবসান হয়। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় "ক্যাপিটাল্" নামক তাঁহার বিশাল একখানি গ্রন্থ লিখায় অতিবাহিত হয়। তাঁহার শেষ জীবনের আর একটি গৌরবজনক কার্য্য আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্রিটিশ মিউজিয়মে ধনীসম্প্রদায়ের উচ্ছেদের জন্য তিনি যে সমস্ত অগ্নিময়ী রচনা লিখিতেন তাহারই উপাদান সংগ্রহে অতিবাহিত হইত।

কার্ল্ যে সমস্ত মত প্রচার করিয়াছেন তাহার মধ্যে তিনটি মতই প্রধান। তাঁহার প্রথম মত হইতেছে—এ পর্য্যন্ত মানব সমাজে যত কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে—সে গুলির জন্য তাঁহার সাংসারিক অবস্থাই অধিকাংশ পরিমাণে দায়ী; মানুষের ইতিহাসের সহিত তাঁহার আর্থিক অবস্থা ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি জগতের দুইটি বিদ্রোহের কথার উল্লেখ করিয়াছেন—এই বিদ্রোহ দুইটির একটি অতীত ঘটনা—আর একটি এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে ধূমায়িত হইতেছে। অতীতের যে বিদ্রোহ উহা ধনীসম্প্রদায়ের (Feudalism) বিরুদ্ধে মধ্যবৃত্তি সম্প্রদায়ের (Bourgeoisie) অভ্যুত্থান—ফরাসী বিদ্রোহের লেলিহান অগ্নিশিখা ও রক্তবন্যার মাঝে উহার চরম প্রকাশ। ভবিষ্যতে যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, উহা হইবে মধ্যবৃত্তি সম্প্রদায়ের (Bourgeoisie) বিরুদ্ধে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের (Wage-Earners or Proletariat) অভ্যুত্থান। মানুষের জীবনের উপরে তাহার আর্থিক অবস্থার প্রভাব যে কত অধিক ইহাই তিনি ইতিহাসের সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার "materialistic interpretation of history" বলিয়া অভিহিত হয়।

তাঁহার দ্বিতীয় মত হইতেছে—The law of the concentration of capital—তাঁহার মতে জমিদার প্রভৃতি ধনবান সম্প্রদায়ের সম্পত্তির ও ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে—জমিদারের সংখ্যা হ্রাস হইবে। ধন ও সম্পত্তি দিন দিন ব্যক্তিবিশেষে কেন্দ্রীভূত হইবে—শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে—ধনীসম্প্রদায়ের অমানুষিক অত্যাচার আরও নগ্নমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে।

তাঁহার তৃতীয় মত—ধনী ও শ্রমজীবী, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরীভাব দিন দিন তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে—সমাজ দিন দিন মধ্যবৃত্তি (Bourgeoisie) ও শ্রমজীবী (Proletariat) এই দুইটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হইতেছে—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দিন দিন বাড়িতে থাকিবে এবং এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যে দিন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধিবে। এই বিরোধ অনিবার্য্য, কেননা এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী। বহু দিন ধরিয়া শ্রমজীবী সম্প্রদায় ধনীদের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে কিন্তু সকল অবিচারের শীঘ্রই

অবসান হইবে। শ্রমজীবিসম্প্রদায় ক্রমশঃ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিতে শিখিবে—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহারা প্রথমে একটি কোন স্থানে ধনী সম্প্রদায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে—ক্রমে সমগ্র জাতির মধ্যে মুক্তির বাসনা ছড়াইয়া পড়িবে—তখন জাতিগতভাবে এই যুদ্ধ চলিতে থাকিবে—অবশেষে একদিন শ্রমজীবিগণের এই জাতিগতভাবে যুদ্ধ আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পরিণত হইবে—জগতের বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবিসম্প্রদায় একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একই সঙ্গে বহু দিনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিবে। এই আন্তর্জাতিক মিলন যখন সম্ভব হইবে তখনই ধনীসম্প্রদায়ের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। শ্রমজীবী ও কৃষক সম্প্রদায়ের হুকুমে তখন দেশের সমস্ত ধন-সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণের অধিকারভুক্ত হইবে, কোন ব্যক্তিবিশেষের অর্থশোষণ বন্ধ হইবে, ধনমদে মত্ত ঐশ্বর্য্যশালিদের তাণ্ডব নৃত্য থামিয়া যাইবে—সমাজে উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্দ্ধন বলিয়া বিশিষ্ট কোন শ্রেণী আর থাকবে না, সকল মানুষ তখন মুক্ত হইবে।

মার্ক্‌সের জীবনকাহিনী কিছু কিছু আলোচিত হইল, এক্ষণে আমরা তাঁহার পত্নীর পত্র উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবনী শেষ করিব। কি ভীষণ দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া মার্ক্‌স্‌কে আপনার জীবনব্রত পালন করিতে হইয়াছিল আমরা এই পত্র কয়খানিতে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইব। মার্ক্‌সের পত্নীর অসাধারণ ধৈর্য্য ও ত্যাগ এই পত্র কয়খানির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিম্নলিখিত পত্রখানি কার্লদম্পতীর লণ্ডন প্রবাস কালে লিখিত। লণ্ডনে তাঁহাদের দিনগুলি কি ভাবে কাটিয়াছিল নিম্নের পত্রে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

"আমরা যে কত দুঃখ পাইয়াছি, আমাদের দিনগুলি যে কি কষ্টে কাটিয়াছে বাহিরের লোককে আমরা তাহার কিছুই জানিতে দেই নাই। তাঁহার সংবাদপত্রখানি যখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানি হইতে তিনি যখন বিতাড়িত হইলেন তখন তাঁহার বন্ধুবর্গের ও সংবাদপত্রখানির সম্মান রাখিবার জন্য তিনি সমস্ত বিপদ আপনার ঘাড়ে তুলিয়া লইলেন। যাহা কিছু অর্থ ছিল তদ্দ্বারা তিনি সম্পাদকগণের বেতনাদি চুকাইয়া দিলেন। তুমি জান, আমরা কিছুই সঞ্চয় করি নাই। আমাদের রূপার বাসনাদি যাহা অবশিষ্ট ছিল সেগুলি বন্ধক দিবার জন্য আমি ফ্রাঙ্কফোর্টে (Francfort) যাত্রা করিলাম। কলোঁতে আমার জিনিসগুলি বিক্রয় করিলাম। লণ্ডনে বাস যে কি কষ্টসাধ্য তাহা তোমার জানা আছে। ইহার উপর তিনটি পুত্র কন্যা, এবং নূতন একটি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। শুধু ঘরভাড়াই ২৪ থেলার (Thaler) লাগিত। আমাদের সামান্য যাহা কিছু পুঁজিপাটা ছিল শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল যে শিশুটির লালনপালনের জন্য একটি ধাত্রী পর্য্যন্ত নিযুক্ত করা আমাদের সাধ্যে কুলাইল না। বুকে ও পিঠে অসহ্য বেদনা সত্ত্বেও উপায়ান্তর না দেখিয়া শিশুটিকে মানুষ করিবার ভার নিজেই গ্রহণ করিলাম। কিন্তু দারুণ দুশ্চিন্তায় আমার দুগ্ধ বিষে পরিণত হইয়াছিল; হতভাগ্য ক্ষুদ্র দেবশিশুটি সেই দুগ্ধ পান করিয়া প্রথম দিনই পীড়িত হইল, যন্ত্রণায় সে দিবারাত্র চীৎকার করিতে লাগিল। একদিন সাংসারিক দুঃখ যাতনায়

কথা ভাবিয়া ভাবিতেছি এমন সময় গৃহস্বামিনী হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ী ভাড়ার দরুণ শীতকালে আমরা তাঁহাকে ২৫০ থেলার (Thaler) দিয়াছিলাম, তাঁহার সহিত আমাদের চুক্তি হয় যে বাকী ভাড়া আমরা পরে মিটাইয়া দিব, কিন্তু তিনি তখন উহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন—বাড়ীভাড়ার দরুণ প্রাপ্য অবশিষ্ট পাঁচ পাউণ্ড এখনই আমাকে মিটাইয়া দিতে হইবে। আমরা তখনই উহা দিতে অসমর্থ হওয়ায় দুইজন প্রহরী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আমাদের পরিচ্ছদ, বিছানা, আসবাবপত্র, এমন কি, আমাদের শিশুকন্যা দুইটির খেলনা ও দোলনা পর্য্যন্ত ক্রোক করিল। খেলনাগুলি কাড়িয়া লওয়ায় হতভাগ্য শিশুগুলি কাঁদিতে লাগিল। আমি রোরুদ্যমান শীতার্ত্ত শিশুগুলিকে লইয়া খালি মেজেতে পড়িয়া রহিলাম। পরদিন আমাদিগকে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য হুকুম দেওয়া হইল। সেদিন ভীষণ ঠাণ্ডা, আকাশ মেঘে আবৃত, ইহার উপর বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমার স্বামী বাড়ীর অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চারিটি শিশুর কথা শুনিয়া কেহই তাঁহাকে বাড়ী দিতে সম্মত হইল না। অবশেষে আমরা এক বন্ধুর সাহায্য পাইলাম। বিছানা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইলাম তাহার দ্বারা ঔষধ, রুটী, মাংস, দুধ প্রভৃতির দরুণ যে দেনা ছিল—তাহা মিটাইয়া দিলাম—আমরা চলিয়া যাইব শুনিয়া সকলেই আমাদের চাপিয়া ধরিয়াছিল। আমাদের বিছানাগুলি বিক্রয় করিবার জন্য গরুর গাড়ীতে চাপাইয়া সেগুলিকে পথিপার্শ্বে আনিতে হইয়াছিল। এমন করিয়া আমাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সকলের দেনা পরিশোধ করিলাম। তাহার পরে ছেলেমেয়েগুলির হাত ধরিয়া রিক্তহস্তে লিসষ্টার ষ্ট্রীটে ১নং জার্ম্মাণ হোটেলে চলিলাম। এক্ষণে আমরা সেখানে দুইটি ছোট্ট ছোট্ট কক্ষ লইয়া বাস করিতেছি। মনে করিও না, এই সকল সামান্য কষ্টে আমরা বিচলিত হইয়াছি। আমি শুধু ইহাই জানি, জগতে আমাদের ন্যায় অনেকেই দুঃখ ভোগ করিতেছে, আমরাই একমাত্র দুঃখী নহি। জগতে যাহারা দুঃখধনে ধনী আমি সেই ভাগ্যবানদের একজন ভাবিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করি, কেননা আমার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীদেবতা এখনও আমার পার্শ্বে বিদ্যমান।"

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে এই হতভাগ্য দম্পতী তাঁহাদের শিশুকন্যাটিকে হারাইলেন। মাতার ডায়েরী হইতে আমরা এই স্থানে তাঁহাদের সেই সময়কার যাতনা ও দুঃখের কথা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

"এই বৎসরেই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইষ্টারের সময়ে আমাদের হতভাগিনী শিশুকন্যা ফ্রান্‌কিস্‌কা ব্রন্‌কাইটিস্‌ রোগে ভুগিয়া মারা গেল। তিন দিন ধরিয়া মৃত্যুর সহিত তাহার সংগ্রাম চলিতেছিল। তাহার ক্ষুদ্র মৃতদেহটি পিছনের সঙ্কীর্ণ কক্ষে পড়িয়া রহিল—আমরা সকলে সম্মুখের কক্ষটিতে আশ্রয় লইলাম। ক্রমে রাত্রি ঘনাইয়া আসিল—আমরা মেজেতে শয্যা পাতিয়া—যে শিশু তিনটী বাঁচিয়া ছিল তাহাদের লইয়া শয়ন করিলাম। শিশুটির মৃত্যুকালে আমরা ঘোর দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম—আমরা তখন দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলাম। আমাদের জার্ম্মাণ বন্ধুগণ আমাদিগকে কিছুই সাহায্য করিতে পারে নাই। অসহ্য হৃদয়যাতনায় অস্থির হইয়া আমি নিকটস্থ

জনৈক ফরাসী বন্ধুর নিকট গিয়া আমাদের শোচনীয় দুরবস্থা ও দারিদ্র্যের কথা বলিলাম। ঐ ফরাসী ভদ্রলোকটী ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। আমাদের দুরবস্থার কথা শুনিবামাত্র তিনি পরমাগ্রহের সহিত আমাকে দুই পাউণ্ড দিলেন। ঐ অর্থে মৃতদেহের সমাধির জন্য একটি কফিন ক্রয় করা হইল—ক্ষুদ্র শিশুটি তাহার মধ্যে শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছে।"

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ কার্ল্-পত্নী মিসেস্ ওয়েডমেবারকে লণ্ডন হইতে লিখিতেছেন—

"এখানে আসিয়া আমাদের প্রথম কয়েক বৎসর বড় দুঃখকষ্টের মধ্যে কাটিয়াছিল। আমাদের প্রিয়তম শিশু দুইটীকে আমরা চিরতরে হারাইলাম—তাহাদের চিত্র অন্তর হইতে কোনদিনই মুছিবে না—চিরদিন হৃদয় তাহাদের জন্য জ্বলিতে থাকিবে। কিন্তু আজ আর অতীতের সেই সব দুঃখময় স্মৃতিগুলিকে জাগাইয়া লাভ নাই।......................তাহার পর আমেরিকান সমস্যার সময়ে আমাদের আয় (নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন হইতে) অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় খরচগুলি পুনরায় কমাইতে হইল; শেষে দেনা করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলাম। এক্ষণে আমাদের দিনগুলি পরমানন্দের ক্রোড়ে কাটিতেছে। আমাদের কন্যাগুলির দিকে চাহিয়া সর্ব্বদাই আনন্দ অনুভব করি—তাহাদের চরিত্র স্বার্থগন্ধহীন অতিকোমল—তাহাদের কনিষ্ঠ কন্যাটি গৃহের প্রতিমাস্বরূপ।.......................আমার সাংঘাতিক পীড়া হওয়ায় চিকিৎসক ডাকা হইল। ২০শে নবেম্বর তিনি আসিয়া আমায় মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিলেন—রোগ দেখিয়া কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া চিকিৎসক বলিলেন আমার বসন্ত হইয়াছে—শিশুগুলিকে আমার নিকট হইতে দূরে রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। চিকিৎসকের কথা শুনিয়া সকলের মনের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা তুমি কল্পনা করিতে পার। আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার পূর্ব্বে আমার স্বামী পীড়িত হইলেন। অত্যধিক ভয়, দুশ্চিন্তা ও বিরক্তি, এইগুলিই তাঁহার পীড়ার হেতু। ভগবানের দয়ায় চারি সপ্তাহ কাল শয্যাগত থাকিয়া কার্ল্ আরোগ্যলাভ করিলেন। হে বন্ধু, তোমাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইতেছি। এই পরীক্ষার দিনে তুমি যেন নির্ভীক অটল থাকিতে পার। নির্ভীক যাহারা তাহারাই ধরণীর অধীশ্বর। দৃঢ়তার সহিত বিশ্বস্তভাবে তোমার স্বামীর সহায়তা করিতে থাক, হৃদয় মন প্রফুল্ল কর।—তোমার চিরদিনের বন্ধু জেনি মার্ক্স্।"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

সৃষ্টি-কমল

আমার দুয়ারে আজ হে মধুপ ভিখারী সুন্দর,
মায়া মন্ত্রে মর্ম্মে মোর সঞ্চারিলে জাগরণ গান,
নিবিড় সুপ্তির ছায়ে পশি তব মধুর গুঞ্জর
মুঞ্জরি উঠিল আজি আমার বেদনা রাজি
আলোকের সুধা করি পান।

নিবিড় নিকষ কালো মরণের সুশীতল কোলে,
আদিম অনাদি যুগে কবে ছিনু কেহ নাহি জানে ;
সহসা উঠিল দুলি সুপ্তি মোর স্বপনের দোলে,
শব্দহীন বস্তুহীন আঁধারে হইয়া লীন,
ভাসিয়া চলিনু কার সুবিপুল টানে।

আঁধার পাথার তলে সেই কোন আদিম সন্ধ্যায়
কোন অজানার পানে যাত্রা মোর হয়েছিল সুরু,
আচ্ছন্ন আবেশে মগ্ন জ্যোতিহীন মরণ তন্দ্রায়
খরস্রোতে ভেসে যাই অন্ত নাই কূল নাই
প্রাণের স্পন্দনে সুধু হিয়া দুরুদুরু।

তারপর সে কি কালো অন্তহীন গভীর আঁধার
সে কি ব্যথা সুনিবিড় প্রকাশের নীরন্ধ্র বেদনা,
অসহায় ভেসে চলা নিরন্তর সুধু চলা তার—
বেদন-বিদ্যুতে বিদ্ধ আকুল চেতনা।

* * * *

তারপর ধীরে ধীরে অতিদূর বাঁশরীর মত
পরশিল মর্ম্মে মোর বিরহীর ব্যাকুল আহ্বান
কাঁপিয়া উঠিল দুলি অন্ধ মূক অন্ধকার যত
জীবন প্রবাহ বেগে চরাচর যেন কম্পমান।

মহাকাল স্তব্ধ নিশি একদা কখন হোলো শেষ,
বিদীর্ণ করিয়া মোর অন্ধকারা কঠিন অটল,
পশিল অন্তর মাঝে তোমার গুঞ্জন গীত রেশ ;
মধুতে ভরিল হিয়া আলোকের সুধা পিয়া
আনন্দে উঠিল ফুটি চিত্ত শতদল।

শ্রীজীবনময় রায়।

গয়ার ইতিহাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গয়ালী

অতি প্রাচীনকালে ব্রহ্মা যজ্ঞ শেষে পূর্ণাহুতি দিয়া স্বকল্পিত চতুর্দ্দশ গোত্রীয় ঋত্বিকগণকে দুগ্ধপ্রবাহ, মহানদী, সুবর্ণ দীর্ঘিকা (বর্ত্তমান দীঘি পুষ্করিণী) মধুনদী, মধুশ্রবা, বিশালা (বর্ত্তমান বিশার পুষ্করিণী) ও বহুবিধ অন্ন পর্ব্বত দান করিয়া বলিয়াছিলেন যে তোমরা কখনও অন্যত্র যাইয়া শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিও না। কিন্তু কালক্রমে ইহারা ধর্ম্মারণ্য নামক স্থানে গিয়া ধর্ম্মরাজকে যজ্ঞ করাইয়া লোভহেতু দান গ্রহণ করেন, ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দেন। অভিশাপের ফলে স্বর্ণাদির পর্ব্বত ও অন্নাদির স্তূপগুলি পাষাণময় এবং দুগ্ধমধ্বাদিপূর্ণ নদীগুলি জলপূর্ণ হইয়া পড়ে। গয়াপালগণ অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া কৃপাভিক্ষা করায় তিনি দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন —"যদিও তোমরা দুগ্ধ প্রবাহ নদী ও অন্নের পর্ব্বত হারাইয়াছ, তথাপি আমার বরে তোমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোনই অসুবিধা হইবে না। নিয়ত গয়াশ্রাদ্ধে পুণ্যবান লোকেরা তোমাদিগকে পূজাভক্তি এবং অর্থ দান করিবে ; এই অর্থে তোমাদিগের জীবিকা হইবে।"

গয়ালী ব্যতীত হিন্দুর গয়াশ্রাদ্ধকার্য্য শেষ হইতে পারে না ; গয়ালী ভিন্ন অপর কেহ অক্ষয় বটমূলে "সুফল" দিতে পারে না, অক্ষয় বটমূলে গয়ালীর নিকট হইতে "সুফলদান" না পাইলে হিন্দুর বিশ্বাস যে পিণ্ডদাতার পিতৃগণের মুক্তিলাভ এবং অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় না ; গয়াতীর্থে গয়ালীগণের অত্যন্ত সম্মান — ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে গয়ালী স্ত্রীগণ বর্ত্তমান সময়েরমত এতটা অবরোধবাসিনী ছিলেন না। এখন তাঁহারা কেবলমাত্র স্ত্রী যাত্রীদের নিকট হইতে নিজ গৃহে পাদপূজা লইয়া থাকেন। তাঁহারা স্ত্রীলোক এবং অবরোধবাসিনী বলিয়া অক্ষয় বট মূলে গিয়া "সুফল" দিতে পারেন না ; সেইজন্য তাঁহারা দত্তক গ্রহণ বা "কর্ত্তা পুত্র"লইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বহু মকর্দ্দমা ইংরাজ আদালতে হইয়া গিয়াছে। বৃত্তি ও যজমান সম্বন্ধেও মকর্দ্দমা হইয়া সে বিষয় স্থির হইয়া গিয়াছে।

গয়ালীগণ যজুর্ব্বেদী। পুত্রসন্তান জন্মিলে যজুর্ব্বেদানুযায়ী নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা হয় ; এই শ্রাদ্ধের যাবতীয় উপকরণ মাতামহ সংগ্রহ করিয়া দেন। ভূমিষ্ঠের ষষ্ঠ রাত্রীতে ষষ্ঠী পূজা হইয়া থাকে ; পুত্র জন্মিলে বিংশ দিবসে এবং কন্যা জন্মিলে দ্বাদশ দিবসে প্রসূতির অশৌচান্ত স্নান করান বিধি ব্যবস্থিত আছে। দেওনগরের প্রাচীন সূর্য্য মন্দিরে অথবা কোলাহল পর্ব্বতে শিশুর চূড়াকরণ অথবা "মুণ্ডন" সংস্কার সম্পন্ন হয় ; যজ্ঞোপবীত সংস্কার সাধারণতঃ বৈদ্যনাথ মন্দিরে অথবা কোন শিবমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের মত রাজা বল্লালসেন প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য প্রথা এ দেশে প্রচলিত না থাকিলেও, বিবাহাদি

শুভ কার্য্যে পাত্রী নির্ব্বাচন স্মৃতির নিয়মানুসারে হইয়া থাকে ; সগোত্রে ও সমান প্রবরে বিবাহ বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। পুরুষদের সপ্তদশ হইতে উনবিংশ বৎসর বয়সে এবং কন্যার তিন হইতে নবম বর্ষ বয়স মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। গয়ালীগণের বিবাহ ক্রিয়ায় কতকগুলি স্ত্রীজনোচিত বংশ আচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; কিন্তু নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেখাউনী ; –বরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি শুভদিন নির্দ্দিষ্ট করা হয়। পাত্রীর গৃহ হইতে কয়েকটি বালকবালিকা বরের গৃহে গিয়া "বরণের" তারিখ বলিয়া আইসে। এই সংবাদ পাইয়া বরপক্ষীয়গণ বাদ্যাদিসহ শোভা যাত্রা করিয়া কন্যার গৃহে গমন করিয়া সেখানে তাঁহারা পুষ্পশয্যায় প্রথানুসারে অভ্যর্থিত হন। কন্যার আত্মীয়স্বজন বরকে চিনির মঠ ও মিষ্টান্ন এবং কন্যার পিতা (পিতার অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) নারিকেলের উপর একটি সুবর্ণমুদ্রা স্থাপন করিয়া পাগড়ী, শাল, জামা, গয়দের ধুতি পট্ট বস্ত্র ও চাদর এবং পুরুষদের ব্যবহারযোগ্য অলঙ্কার, নির্ব্বাচিত বরকে উপহার দিয়া থাকেন। বর ও বরযাত্রীর অভ্যর্থনা শেষ হইলে বরপক্ষের লোকগণ নববধূকে ক্রোড়ে করিয়া কতকগুলি চিনির মঠ ও মিষ্টান্ন উপহার দিয়া থাকেন। ইহার পর বরপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা দলবলসহ কন্যার গৃহে গমন করিয়া তথায় নির্ব্বাচিত কন্যার অঞ্চলে পাঁচ সের আন্দাজ মিষ্টান্ন ঢালিয়া আবাহন গীতি গাইতে থাকেন। অবশেষে কন্যার মাতা অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সহ বরের মাতা ও পিতামহীকে রেশমের শাড়ী উপহার দেন এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া এই ক্রিয়ার শেষ হয়। যে শোভা যাত্রার কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি তাহা খুব ব্যয়সাধ্য এবং চলিত ভাষায় তাহাকে "চড়াওয়া" বলে। কন্যার প্রথম অভ্যর্থনা দিনে বরপক্ষের আত্মীয়স্বজন শোভাযাত্রা (চড়াওয়া) বাহির করিয়া জাঁকজমকের সহিত নিম্নলিখিত জিনিষগুলি সঙ্গে লইয়া কন্যার গৃহে গমন করেন। কাগজ ও কাচের নানাবিধ খেলানা, পিতলের বাসন পত্র, উড়ানি, জামা, পট্ট ও কৌষের বস্ত্র, পীতাম্বরী ও বেনারসী শাড়ী, শাঁখা, বালা, চুড়ী, গহনা, দধি, মাছ, মিষ্টান্ন, খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি। বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলঙ্কারাদি কন্যার গায়ে পরাইয়া দিয়া তাহাকে পূজা করিয়া "লক্ষ্মী" সম্বোধনে প্রণাম করেন। অল্প কিছু পরে বরপক্ষ কন্যার পিতা পিতামহ ও মাতামহকে রেশমের পাগড়ী, চাপকান, কিংখাপের পাজামা পাদুকা প্রভৃতি উপহার দিয়া বরগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বর ও কন্যা পক্ষ উভয়েই নিজ নিজ গৃহে গৃহ দেবতা পূজা করিয়া থাকেন। এই সময়ে একটি খুঁটি পুতিয়া অধিবাসের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। তাহার পর "দুয়ারলাগা" বিধি অনুসৃত হয়। বরের আত্মীয়গণ বরকে কন্যার গৃহের দরজায় লইয়া যাওয়াকে "দুয়ারলাগা" হয় ; তথায় বালকেরা কন্যার আত্মীয়স্বজনের প্রতি পরিহাসও কৌতুক করিয়া গান করিয়া থাকে এবং কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করে। ইহার অনুরূপ ক্রিয়া কন্যাপক্ষের স্ত্রীলোকেরাও বরগৃহে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উভয় পক্ষীয় স্ত্রীগণ সূর্য্যকুণ্ডে সমবেত হয় এবং বর কন্যাকে স্নান করায় এবং পরিহাসের কৌতুক করে ; ইহার পর বন্ধুবান্ধব

(খিউটারী) ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের বিধি হইয়া থাকে। বিবাহের শেষের ক্রিয়া "কঙ্কন বন্ধন।" বিষ্ণু-পাদ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী "সূর্য্য কুণ্ডে" কোনও এক মেছনীকে এই উপলক্ষে উৎকৃষ্ট কতকগুলি উপহার, বসন, ভূষণ, শাঁখা, সিন্দূরাদি উপহার দেওয়া হয়। এই সময়ে উভয় পক্ষীয় স্ত্রীগণ সূর্য্যকুণ্ডে সমবেত হইয়া উপহাস পরিহাসচ্ছলে পরস্পরের মধ্যে অশ্লীল অশ্রাব্য গালাগালী করে। আমার মনে আছে কিছু বৎসর পূর্ব্বে যখন গয়ায় বাবু শ্যামাচরণ মিত্র সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি গয়ার কোন বিশিষ্ট গয়ালী বংশের বিবাহোপলক্ষে উপস্থিত হইয়া এই কুরীতি দেখিয়া নিন্দাবাদ ও সমগ্র গয়ালী সমাজকে লজ্জিত করিতে ক্রটী করেন নাই। ইহার ফলে গয়ালী স্ত্রীগণ আ কাল প্রকাশ্য স্থলে গিয়া পরস্পর নীচ জনোচিত পরিহাসে প্রবৃত্ত হন না। এই ক্রিয়া শেষে বরের আত্মীয় স্বজন কন্যা গৃহে গমন করিয়া খাদ্য দ্রব্য ছড়াইয়া দিয়া আইসেন এবং পরিশেষে মঙ্গল সূচক কতকগুলি জিনিষ কন্যাকে পাঠাইয়া দেন। উপরোক্ত প্রাথমিক ক্রিয়াগুলি শেষ হইলে, পাল্কীতে চড়িয়া বর শোভাযাত্রা করিয়া বাদ্যাদির অনুগমন করিয়া থাকেন। গৃহ প্রাঙ্গণস্থিত সদর দরজায় পঁহুছিতেই বরের ভগ্নী, খুড়ী, পিসি মাসী প্রভৃতি স্ত্রীবর্গ পাল্কীর গমন পথে বাধা দিলে বর স্বয়ং স্বর্ণমুদ্রা দিয়া অব্যাহতি পাইয়া থাকেন। ইহার পর কন্যা গৃহে পঁহুছিলে, পুণ্যজল অর্ঘ্য প্রভৃতির দ্বারা অভ্যর্থিত হন; এবং তথায় তাঁহাকে কলাতলায় গমন করিয়া পঞ্চ দেবতা, দশদিকপাল নবগ্রহ, গণেশ ও গৃহ দেবতার পূজা করিতে হয়। এই কার্য্যান্তে ব্রাহ্মণগণ স্বস্তি বাচন, মঙ্গল স্তোত্রপাঠ ও বরের মাতামহ বংশের কুলজী আবৃত্তি করেন; তাহার পর কন্যাদান ও কুশণ্ডিকা সম্পাদিত হয়। বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও নব বর-বধূ হোমানলে লাজবর্ষণ করিলে বর ও বধূর হস্তে সূত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অবশেষে পরস্পরের অঞ্চলের কোণ বাঁধিয়া বর ও বধূ সাতবার হোমানল প্রদক্ষিণ করেন। হোমানল প্রদক্ষিণ ক্রিয়া শেষ হইয়া যাইলে পর বরের পিতা কুশাসনে বসিয়া নববধূ ও কন্যার ভগ্নী বা তাহার অপর কোন সাত বা আট বৎসর বয়স্কা আত্মীয়কে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া বরের হাতে একটি রৌপ্য মুদ্রা, শণপাট ও সিন্দূর পূর্ণ একখানি কাঠের থালা দেন এবং এই সময়ে বরের হাতের নীচে কন্যার হস্ত তাহার নিম্নে আত্মীয়া কন্যার হস্তখানি স্থাপন করেন এবং বর নববধূর কপালে পাঁচ বা সাতবার সিন্দূরের টিপ পরাইয়া দেন। তাহার উপর সকল স্ত্রীগণ বসিয়া কৌতুকাবহ নর্ম্মালাপ ও খেলায় প্রবৃত্ত হন; এই খেলায় প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে বরকে ঠকান। খেলান্তে কন্যা বরের ঘাড়ে একটী লাঙ্গল চাপাইয়া দিয়া বলেন তোমাকে আমায় ভরণ পোষণ এবং যাবতীয় ভার বহন করিতে হইবে। আমি কোন অপরাধ করিলেও তোমাকে আমার গৃহেই আসিতে হইবে ইত্যাদি। এই সকল ক্রিয়া শেষে বর-বধূ এবং অপর সকল লোকজনকে দধি চিঁড়া ভোজন করান হয়। এদেশে বিবাহ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গৃহে স্ত্রীলোকেরা গান গাহিয়া থাকে। তাহার পর যৌতুক (খোইচা) দান ক্রিয়া সমাধা হয়। এই উপলক্ষে ঘোড়া গাড়ী, পাল্কী, চতুর্দ্দোলা, গোরু, মহিষ, মোটর, গ্রাম জমীদারী, অলঙ্কার, দাসী,

প্রভৃতি ভিন্ন বরকে সাধারণতঃ একটী স্বর্ণমুদ্রা, একটি রৌপ্যমুদ্রা যৌতুক স্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিদায়ের পূর্ব্বে কন্যার পিতা মেয়ের অঞ্চলে ধান ও অন্যান্য জিনিষ পূর্ণ করিয়া তাহাকে বৈবাহিকের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলেন, আমি আপনাকে হাতী ঘোড়া প্রভৃতি প্রভুত ধন দিতে অক্ষম, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে একটী কর্ম্মপটু বালিকা দান করিতেছি। অবশেষে বর বধূ অপরাপর লোকজন সহ বিষ্ণুপাদ মন্দিরে গমন করিয়া তথায় দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন এবং তথা হইতে নিজ গৃহে চলিয়া যান।

বিবাহ সংস্কারের অব্যবহিত পরেই অন্যান্য কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধি আছে। তন্মধ্যে "বৌধারী" ক্রিয়া প্রথমে করিতে হয়। এই সময়ে বরের পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বালিকার মুখে হরিদ্রা লেপন করিয়া নিজ নিজ অবস্থানুসারে কিছু কিছু অর্থ দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এই ক্রিয়ার পর নববধূকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বধূর পিতৃগৃহে গমনের চারি দিবস পর, বর শ্বশুর গৃহে গিয়া হাতের সূতা ছিন্ন করেন এবং স্নানান্তরে স্বগৃহে ফিরিয়া আইসেন। বিবাহের একাদশ দিবসে বর বধূ সহ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অল্প কিছুকাল পরে বধূকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং বয়স্থা না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যা পিতৃগৃহে থাকেন। নবোঢ়াবধূ ঋতুমতী হইলে তাঁহার শ্বশুর বধূর জন্য অলঙ্কার গায়ের জামা ও অন্যান্য দ্রব্য উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।

গয়ালীগণের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। রাত্রি বারটার পর মৃত্যু হইলে, শবদেহ পরবর্ত্তী দিবসে উষাগমের পূর্ব্বে দাহ করিবার জন্য শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয় না বরং পরেই লইয়া যাইবার বিধি ব্যবস্থিত আছে, কিন্তু রাত্রি বারটার পূর্ব্বে মরিলে, সেই রাত্রেই দাহের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে মরণাশৌচ গ্রহণ মৃত্যু সময় হইতে গণনা না করিয়া দাহ সময় হইতে, ধরা হয়। সংকার সময়ে কণ্টাহা (মড়ুইপোড়া) ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য ভদ্র সমাজে "কণ্টাহা" ব্রাহ্মণদের স্থান বঙ্গদেশের "মহা-ব্রাহ্মণ" বা অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ন্যায়। চতুর্থ দিবসে বিষ্ণু পাদপদ্মের পুণ্যোদক, দধি ও গঙ্গাজল একত্র মিশাইয়া শ্মশানাগ্নি নির্ব্বাপিত করা হয়। চিতা হইতে পাঁচখানা হাড় তুলিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ "বাচস্পতি মিশ্রের" মতে উহা হরিদ্বার, বারানসী, প্রয়াগ বা যমুনার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন। অসমর্থ পক্ষে পুনঃপুন নদীতেই মৃতের অস্থি বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়া থাকে। শবদাহ দিন হইতে দশদিন পর্য্যন্ত চিতার উপর একটি অশ্বত্থ গাছে একটি জলপূর্ণ মাটীর ঘট ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। দশমদিনে স্নান ও ক্ষৌরকর্ম্ম হইলেই অশৌচান্ত হয়। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ সমাজের অনুকরণে একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া শ্রাদ্ধের সময়ে কণ্টাহা ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিতে হয়; মৃত্যুর দ্বাদশ দিনে চিতাভূমির অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় ৩৬০ ঘট জল ঢালা হয়। ইহার পর দান। দানের জিনিষগুলি আমাদের দেশের মত সাধারণতঃ রৌপ্য ও পিত্তল নির্ম্মিত দিতে হয়। আত্মার সদগতির জন্য নগদ টাকা সহ থাল, ঘটি, গ্লাস, রূপার আংটী, প্রদীপ, একখানা ধুতি, পাদুকা, ছত্র, আসন

ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির জামাতা, দৌহিত্র এবং ভগ্নিপতিকে দান করা হয়। দানের পর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। মৃত্যুর পর এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে বিষ্ণুপাদ মন্দিরে মৃতব্যক্তির আত্মার সদ্গতির ও মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধ করিতে হয় এবং বৎসরান্তে ধুমধামের সহিত বাৎসরিক শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে দানের যাবতীয় জিনিষগুলি আদ্যশ্রাদ্ধের মত জামাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকেই দিবার ব্যবস্থা আছে।

গয়ালীগণ বৈষ্ণব। পূর্ব্বে প্রাচীন গয়ার সীমার মধ্যে কেহই মদ্য বা মাংস খাইতে পারিত না, কিন্তু বর্ত্তমানে এই নিয়ম শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, এবং আজকাল গয়ালীগণ বড়ই বিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মদ্য মাংস প্রভৃতি যবন-ভক্ষ্য খাদ্যাদি আস্বাদ করিতে শিখিয়াছেন এবং তাঁহাদের চরিত্র দোষও খুব হইয়াছে। বঙ্গদেশের অজ্ঞ, নিঃস্ব চাষাভূষা অধিবাসীগণ এই সকল চরিত্রহীন গয়ালীগণদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করাইয়া কি মহাপাতক পাপে অজানিত ভাবে পতিত হন তাহা বলা যায় না। সেই জন্য খুব সাবধান হইয়া গয়ালী নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য!!! গয়ালীদের "মানীবৃত্তি" অর্থাৎ তীর্থস্থানে আসিয়া যে যাহাকে মান্য বা কল্পনা করিবে, তিনিই তাঁহার গয়ালী হইবেন; এমত স্থলে খুব বিবেচনা করিয়া গয়ালী নির্ব্বাচন না করিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা না করিলে শাস্ত্রানুসারে গয়াকাজই মিথ্যা এবং পণ্ড!!! আজকাল গয়ালীগণ সকল প্রকার অসৎ কাজে লিপ্ত হইয়া কলুষিত হইয়া থাকেন তাহা স্থানীয় লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে। কুলীধরা আড়কাটী যেমন দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ গয়ালীদের নাপিত, কাহার, কুর্ম্মী প্রভৃতি জাতীয় চাকরেরা পাণ্ডা সাজিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া যাত্রী আনিয়া থাকে এবং যাত্রীদত্ত অর্থ হইতে অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে প্রতারিত হইলে এবং মিথ্যা অপাত্রে অর্থ দান করিলে, পিণ্ড দাতার পিতৃ লোকের কি স্বর্গপ্রাপ্তি হয় তাহা ভগবানই জানেন। তাই বলি যে এই পুস্তকে লিখিত তালিকা দেখিয়া সৎ গয়ালী নির্ব্বাচন করিয়া পিতৃ লোকের গয়া শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা করাইলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল জনক হয়।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাকল্পিত গয়াপালগণই স্বয়ং গয়াশ্রাদ্ধে পৌরহিত্য করিতেন, কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা লোপ এবং ক্রিয়া কর্ম্মে নৈপুন্য হ্রাস হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা আচার্য্য নিযুক্ত করাইয়া তাঁহাদেরই দ্বারায় শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই শ্রোত্রিয় অথবা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। গয়ালীগণ নিজ সমাজের লোক ভিন্ন অপর কাহারও গৃহে ভোজন করেন না, কিন্তু যজমান নিমন্ত্রন করিলে অক্ষয় বট অথবা বিষ্ণুপাদ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী কোনও নির্দ্দিষ্ট পুণ্যস্থানে লুচি ও মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া থাকেন। স্ত্রী পুরুষ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন এবং সকলেই নির্ব্বিবাদে বিষ্ণুপাদ মন্দিরে দেবার্চ্চনার জন্য যাইতে পারেন। গয়ালীরা সাধারণতঃ কোন প্রকার চাকুরী করেন না। যাত্রীদের দ্বারা সুফল ও দানাদিতে যে অর্থ পান তাহাতেই তাঁহাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। আজকাল কয়েকটি গয়ালী বেশ ধনী হইয়া উঠিয়াছেন। গয়ালী-

গণ খুবই বিলাস প্রিয় এবং অধিকাংশ সময় গান বাদ্য ও কুস্তীতে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। গয়ালীদের মধ্যে ৺ কানাইলাল ঢেঁড়ি, ৺ চুনীলাল পাঠক, ৺ রামহরি ঢেঁড়ি প্রভৃতি গান-বাজনায় খুব ওস্তাদলোক ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গীত বিদ্যায় গুণ গরিমার সৌরভ ভারতের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই ওস্তাদ শ্রীহনুমানদাস সিংহজীর শিষ্য ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ ওস্তাদ শ্রীহনুমানদাসজীর সমকক্ষ লোক উত্তর ভারতবর্ষে এখন আর কেহ নাই। তাঁহার বহু শিষ্যের মধ্যে এখন বাবু শোনী সিংহ, বাবু যোগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ভেলুবাবু), বাবু মাধোলাল কাটারিয়া'র গয়ালী, বাবু বুল্লকলাল ভাইয়া প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। গয়ালীদের মধ্যে ভাইয়া, অগ্নিবার, বারিক, সিজুয়ার, সেন, মাহাতা, ঢেঁড়ী, আহীর, নাকফোঁকা, চৌধুরী, প্রভৃতির গৃহ বিশেষ ধনী এবং নির্ম্মল। সিজুয়ার বংশে হাইপুষ্ট বাবু ছোটেলাল সিজুয়ার সি, আই, ই, বিশেষ প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। ইনি খুব সরল প্রকৃতির বদান্য ও দানশীল লোক ছিলেন। তাঁহার গদীতে এখন বাবু গোবিন্দ লাল সিজুয়ার প্রতিষ্ঠিত আছেন। গোবিন্দলালজি খুব ভাল ও সদাশয় লোক। গয়ালীদের মধ্যে অধিকাংশই মূর্খ হইলেও অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও আছেন। ৺ ছোটেলাল সিজুয়ার খুব পণ্ডিত লোক না হইলেও সৎকর্ম্মে, জন হিতকর কর্য্যে এবং দানে তাঁহার বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হইত। তাঁহার কৃত কল্পঘাট এবং তাঁহার বদান্যতা তাঁহাকে গয়া জিলার মধ্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

একাকী

এ জগতে মানুষ তো একেলাই চলে,
একা আসে একা যায়, একা সুখ দুঃখ পায়,
বিপদেতে পায় কূল নিজেরি কৌশলে।
কেহ না তরায় কারে, তরে নিজ বলে।

বাহিরেতে নানা স্থানে নানা বেশ পরে
দশের মাঝারে রয়, হাসে খেলে কথা কয়,
উপরে উপরে মিশে। ভিতরের ঘরে,
একাকী মানুষ থাকে আপন অন্তরে।

রোগ শোক পাপ তাপে মানব একাকী,
নির্জ্জন হৃদিকন্দরে, কেহ না প্রবেশ করে,
মরমের ব্যথা রাখে সঙ্গোপনে ঢাকি,
জেনেও না জানে লোক, প্রাণে যায় থাকি।

৺ শিবনাথ শাস্ত্রী।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা বড়ই কম, তাহার যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, অনেকে তাহাও উপলব্ধি করিতে পারেন না। সাধারণ লোকের ধারণা যে শিক্ষা পাওয়া আর শিক্ষা দেওয়া এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ রকম কোন ব্যবস্থা নাই। আর শিক্ষা দেওয়ার অর্থও তাঁহারা কেবল কতকগুলি অক্ষরের সহিত শিশুগণের পরিচয় করাইয়া দেওয়া এবং তাহাদের সমবায়ে গঠিত কতকগুলি বাক্য ও পদাবলী শিখাইয়া দেওয়াই বুঝেন; তা যে কোন উপায়েই হউক না কেন; সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞানের আবশ্যকতা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না; তার পর শিক্ষকের পক্ষে যে মনোবিজ্ঞান এবং শরীরবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় তাহাও তাঁহাদের ধারণার অতীত। সংসারের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানলাভের জন্যই গুরুকরণের আবশ্যকতা স্বীকার করা হয়; উকীল হইতে গেলে আইনের জ্ঞান এবং তার পর আদালতের কাজকর্ম্ম হাতে কলমে শিক্ষা করা প্রয়োজন, চিকিৎসক হইতে হইলে চিকিৎসা-বিদ্যা-সংক্রান্ত পাঠ্যাদি অধ্যয়ন এবং হাতে কলমে রোগ পরীক্ষা, রোগীর পরিচর্য্যা ইত্যাদিও দরকার; দোকান পাট করিতে হইলেও তৎসংক্রান্ত জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য কিছুকাল কোন ভাল দোকানদারের অধীনে কাজ শিক্ষা দরকার, কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেও ভাল কৃষকের সঙ্গে থাকিয়া জমির পাইট করা, বীজ বপন, জলসেচন, পর্য্যায় রোপণাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ প্রয়োজন; এইরূপ যেদিকেই দেখা যাউক, আগে শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কেহ বড় অগ্রসর হয় না; কেবল শিক্ষকতা কার্য্য সম্বন্ধেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্কুল বা কলেজ হইতে বাহির হইলেই সে ব্যক্তি শিক্ষাদানের উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সকলে মনে করেন এবং সে ব্যক্তিও সেইরূপ মনে

করেন। "যেষামন্যা গতি নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।" অন্য কোন কাজ যাহার জুটিল না, তাহার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার দরজা খোলাই আছে, প্রবেশ করিলেই হইল। সেইরূপ যাঁহারা অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন যেমন উকীল, বা ডাক্তার, বা মুন্সেফ, বা জজ, কি ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কি ইঞ্জিনিয়ার—তাঁহারাও বিদ্যালয় পরিদর্শনাদি উপলক্ষে শিক্ষকের কার্য্য পদ্ধতির আলোচনা করিতে এবং শিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেও কুণ্ঠিত হন না; কারণ তাঁহারাও মনে করেন যে, যখন তাঁহারা বি, এ, কি এম, এ, পাশ করিয়াছেন, তখন শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহারা সম্পূর্ণ পারদর্শী। সুতরাং, কৃপার পাত্র শিক্ষককে বিনামূল্যে উপদেশ দিয়া স্বীয় গুরুত্ব খ্যাপন করিতে দ্বিধা করিবেন কেন?

এ স্থলে একথাও বলা কর্ত্তব্য যে এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ থাকিতে পারেন, যাঁহারা অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ উপদেশ দান অশোভন না হইতে পারে, কিন্তু অন্যের কার্য্যে সেটা অনধিকার চর্চ্চা ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়?

এইরূপ ঘটিবার প্রধান কারণ এই যে, শিক্ষকতা কার্য্যের জন্যও যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে সাধারণতঃ সে বিষয়ে লোকের ভাল ধারণা নাই।

আজকাল এইদিকে কতক কতক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে দেখা যায়। তাহার ফলে মাসিক ও সাময়িক পত্রাদিতে এবিষয়ে একটু আধটু আলোচনাও চলিতেছে এটা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

আটাশ উনত্রিশ বৎসর বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানাস্থানে বিদ্যালয়ে কার্য্য করিতেছি। তাই অক্ষমতা সত্বেও এবিষয়ে আলোচনার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। সুতরাং ভ্রমপ্রমাদ ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক ঘটিবার সম্ভাবনা আছে; সে জন্য যেন সকলে আমাকে মার্জ্জনা করেন। বলাবাহুল্য যে আমিও "দা হাতে লইলেই ঘরামি" এই প্রবাদের দলেই ছিলাম। কলেজ হইতে বাহির হইয়াই শিক্ষকতা অবলম্বন করি; তৎপূর্ব্বে শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে কোন শিক্ষা পাই নাই অথবা কোন পুস্তকও পড়ি নাই। তাহপর এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে শিক্ষকতা সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি বটে এবং তাহা হইতেই বুঝিয়াছি যে এই কার্য্যটা কত কঠিন এবং ইহাতে সফলতা লাভ করিতে হইলে কতদিকে কত বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগ দিতে হয়। যতই দিন যাইতেছে, যতই বৃদ্ধ হইতেছি ততই মনে হইতেছে আমি এই কার্য্যের পক্ষে কত অনুপযুক্ত। নানারূপ বয়স ও প্রকৃতির বালকগণকে লইয়া বিদ্যালয় গঠিত, তাহাতে নানা বয়সের ও নানা প্রকৃতির শিক্ষকগণ নিযুক্ত থাকেন, এই সমুদয় লোক ও শিক্ষকগণের উপযুক্ত ভাবে পরিচালনের দায়িত্ব প্রধান অধ্যাপকের স্কন্ধে সমর্পিত। তাঁহাকে সব দিক দেখিতে হইবে, ঋজু কুটিল পথাবলম্বী নানা প্রকৃতির সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে; পান থেকে চুণ খসিলেই মুস্কিল! যাঁহারা ভুক্তভোগী নহেন তাঁহারা এ কার্য্যের গুরুত্ব ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন না বোধ হয়।

আজকাল শিক্ষকদিগের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান, বিদ্যালয় পরিচালন প্রভৃতির শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষকতাকার্য্যে পটুতার নিদর্শন উপাধি লাভ করিয়া যাঁহারা বাহির হইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকের আত্মগরিমার ভাবটাই বেশী পরিস্ফুট দেখিতেপাইয়া ব্যথিত হইতে হয়। কোন বিষয়ে পঠনার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট বক্তৃতাদানে অথবা প্রবন্ধ লিখনে যেরূপ পটুতা, কার্য্যক্ষেত্রে অনেকের সেরূপ পটুতা দেখিতে পাওয়া যায় না। কতকগুলি ম্যাপ, চার্ট, পুস্তক আদি আনাইয়া বাহিরের ঠাট দুরস্ত করিতে যেরূপ উৎসুক, সেগুলির উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা ছাত্রগণের জ্ঞান লিপ্সার উদ্দীপন করিতে সেরূপ ব্যগ্রতা অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

আর একটি বিষয়ও অনেকের দ্বারা উপেক্ষিত হয়। শিক্ষাদান প্রণালী সংক্রান্ত পুস্তকাবলী সকলই পাশ্চাত্য দেশীয় অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক লিখিত; তাঁহারা তদ্দেশীয় বিদ্যালয়, ছাত্রবর্গ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সে সব পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, আমাদের দেশের বিদ্যালয়, ছাত্রবর্গ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যক্তিগত কোনই অভিজ্ঞতা নাই; সুতরাং নির্ব্বিচারে তাঁহাদের সেই সব পরামর্শ অনুসারে আমাদের বিদ্যালয় সমূহে কাজ করিতে গেলে সেরূপ সুফল পাওয়া যাইবে না বরং অনেক স্থলে তাহার বিপরীত ফল হইবে একথাতে বোধহয় মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সেগুলির পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন এবং পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক আমাদের বিদ্যালয় ও ছাত্রগণের অবস্থা ও প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া তাহাদের প্রয়োগ করা আবশ্যক। একটা ধরা বাঁধা নিয়ম প্রণালীর মধ্য দিয়া এ কার্য্য করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। কিন্তু অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত অনেক শিক্ষকও নির্ব্বিচারেই সেইসব চালাইতে গিয়া বৃথা সময়ের অপব্যয় করেন এবং নিজ উৎসাহ উদ্যমকে নিষ্ফলতার অবসাদে খর্ব্ব করিয়া ফেলেন।

কতক কতক শিক্ষক আবার এরূপ আছেন যে তাঁহারা মনে করেন যে কোন ক্লাসে পড়ান আর ছেলেদের কৃত অনুবাদাদি লিখিত বিষয় সংশোধন করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। বালকগণের সৎ প্রবৃত্তির উন্মেষে সাহায্য, অসদভ্যাস দমনে চেষ্টা, তাহাদিগকে সময়ানুবর্ত্তী এবং নিয়মানুবর্ত্তী করা ইত্যাদির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক মনে করেন না। পরীক্ষা পাস করান অপেক্ষা ছাত্রচরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা করাই শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য।

বিদ্যালয়ে যেসব শিশু ও বালক পাঠ করিতে যায় তাহারা সকলেই যে লেখা পড়াতে কৃতী হইয়া বাহির হয় তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না, সকলের শক্তি সামর্থ্য এক নহে- সুতরাং সকলেই যদি পরীক্ষায় পাশ হইতে না পারে সে জন্য বিদ্যালয়ের বা তৎসংসৃষ্ট শিক্ষকগণের সেরূপ অপযশের আশঙ্কা নাই। কিন্তু বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষিত গুরুর অধীনে থাকিয়া যদি তাহাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করিবার অভ্যাস, ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, বিদ্যালয়ের নিয়ম প্রণালী পালন করা, সরল, সত্যপ্রিয়, পবিত্র চরিত্র, ছোটদের প্রতি স্নেহশীল এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া, স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি

প্রকৃত মমত্ব বোধ ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা না হয় এবং শিক্ষকগণের আন্তরিক চেষ্টা সে দিকে প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে বড়ই কষ্টের কথা। যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ ঐ সমুদয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং বালকগণের চরিত্র গঠনের বিষয়ে অবহিত হন সে সমুদয় বিদ্যালয়ে পাশ ফেলের সংখ্যার অনুপাত যাহাই হউক, জন সাধারণ তাহাদের প্রতি স্বতঃই অনুরক্ত হয় এবং তাহার প্রশংসা করিতে মুখর হইয়া উঠে। এইরূপ শিক্ষার অধীন বালকগণও উত্তরকালে সেই সেই বিদ্যালয় এবং শিক্ষকগণ সম্বন্ধে একটা গর্ব্ব অনুভব করে।

অতএব শিক্ষকগণের পক্ষে বালকের চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে "পড়ুক বা না পড়ুক পো, সভায় নিয়ে থো" এই প্রবাদটীর মধ্যে যে কতখানি সত্য নিহিত আছে তাহা বোধ হয় বলিয়া বুঝাইতে দরকার নাই। এখানে সভা বলিতে সুশিক্ষিত, সাধু ভদ্রগণের সম্মিলনই বুঝিতে হইবে। এইরূপ সভাতে সর্ব্বদা বালকগণ থাকিতে পাইলে স্বতঃই তাহারা সভ্যগণের সদ্বৃত্তি সমূহের অনুকরণ করিবে এবং তাহাতে তাহাদের চরিত্র গঠিত হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে বহুবিধ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিবে। সুতরাং এবিষয়ে শিক্ষকগণের সকলেরই দৃষ্টি থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

দুঃখের বিষয় অনেক শিক্ষক এরূপ আছেন যাঁহাদের শিক্ষাকার্য্যে প্রবিষ্ট হওয়াই উচিত ছিলনা। তাঁহাদের স্বীয় কার্য্যের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব বোধ অত্যন্ত কম, অনেকস্থলে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। অনেকে অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বনের উদ্দেশ্যে দুই চারি বৎসরের জন্য শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন এবং কোনরূপে রোজ শোধ করিয়া চলিয়া যান; যখন কার্য্যটি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে তখন তাহা নিজ জ্ঞান বিশ্বাস মত যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা না করিলে যে নিজ বিবেকের নিকট দায়ী হইতে হয়, ধর্ম্মে পতিত হইতে হয় এজ্ঞানটা যেন একেবারেই নাই।

আমাদের দেশে শিক্ষা কার্য্যে যাঁহারা সফলতা লাভ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা স্বীয় কৃতকার্য্যের কোনরূপ বিবরণই পরবর্ত্তীগণের শিক্ষা-সৌকর্য্যের জন্য রাখিয়া যান নাই, এটাও আমাদের একটা দুর্ভাগ্য। যদি তাঁহারা কিরূপ অবস্থাতে কিরূপ কার্য্য করিয়া কিরূপ ফল লাভ করিলেন, কিরূপ প্রকৃতির বালককে কিরূপ ভাবে শিক্ষা দিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাইলেন, অবিনয়ী এবং অসংযত বালকগণকে কিরূপ শাসনের অধীনে রাখিয়া তাহাদের চরিত্র সংশোধন করিলেন, কোন বিষয়ের শিক্ষা প্রণালী কিরূপ ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়িনী হইয়াছে ইত্যাদি অভিজ্ঞতার বিবরণ কোন পুস্তকে অথবা পত্রিকাতে প্রকাশিত করিতেন তাহা হইলেও অনেক সুবিধা হইত কিন্তু তাঁহারা তাহা কিছুই করেন নাই। সেরূপ করিবার ব্যবস্থাই আমাদের দেশে ছিলনা এবং এখনও নাই। নতুবা ঐরূপ বিশ্রুতনামা শিক্ষকগণের লিখিত শিক্ষাপ্রণালীবিবরণপুস্তক নূতন শিক্ষকগণের অনেক উপকার করিতে পারিত। কিন্তু তাহা না হওয়াতে তাঁহাদের প্রণালী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া গিয়াছে, কেবল আমরা তাঁহাদের নাম ও খ্যাতি শুনিয়াই পরিতৃপ্ত হই।

যাহা হউক এখন অবস্থার পরিবর্ত্তনে দেশের মধ্যে যখন শিক্ষা বিষয়ে আন্দোলন

চলিতেছে তখন অভিজ্ঞ খ্যাতনামা শিক্ষকগণ সময় সময় সংবদ্ধ হইয়া এই সব বিষয় আলোচনা করিলেও শিক্ষা কার্য্যের সৌকর্য্য সম্পাদিত হইতে পারে এবং এইরূপ আলোচনার ফলে আমাদের দেশের এবং অবস্থার উপযোগী কল্যাণকর অনেক নূতন জিনিষের উদ্ভব হইতে পারে। শিক্ষার বিধি ব্যবস্থা আলোচনার জন্য দুই একখানি মাসিক পত্রেরও প্রচার হইয়াছে। তাহাতেও এসমুদয় বিষয় আলোচিত হইতে পারে। ইহা আমাদের আশা ও সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন

খ্রীষ্টীয় দর্শন শাস্ত্রের দ্বিতীয় বিভাগ বা "পেরিপ্যাটেটিক্"

স্কলাষ্টিসিজমের আধিপত্যকাল।*

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে ইউরোপ খণ্ডে জ্ঞানচর্চ্চার যে এক প্রবল বন্যা ছুটিয়াছিল এবং যাহা উক্ত যুগের ইতিহাসে দার্শনিক তত্ত্বের নব জাগরণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহার মূলে তিনটি প্রধান কারণ লক্ষিত হয়। এই কারণত্রয় যথাক্রমে (১) পাশ্চাত্য জ্ঞানজগতের সহিত আপাততঃ অপরিজ্ঞাত এক অফুরন্ত দার্শনিক সাহিত্যের পরিচয়, (২) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ, বিশেষতঃ প্যারী এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের প্রতিষ্ঠা এবং (৩) চার্চ্চের অধীনে ভিক্ষু সম্প্রদায় সমূহের অভ্যুদয়। এই তিন বাহ্যিক কারণের সহিত আর একটি আভ্যন্তরিক কারণেরও যোগ ছিল, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দার্শনিকগণের মনীষা।

মধ্যযুগীয় চিন্তার ইতিহাসের এই অংশটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়; একারণ ইহার একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

১। পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে দর্শন শাস্ত্রের নব জাগরণ।

(ক) নব লাটীন্ ভাষায় অনূদিত ভাষ্য সমূহের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।

এইবার লইয়া সম্ভবতঃ তৃতীয় বারের জন্য পশ্চিম ইউরোপ প্রাচীন গ্রীসের পুঞ্জীভূত জ্ঞানভাণ্ডারের অংশ মাত্রের সন্ধান পাইয়াছিল। কেবল তাহাই নয়, এই সময়ে আর এক আশ্চর্য্য জাতীয় লোকের প্রতিভার সহিত পশ্চিম ইউরোপের পরিচয় হয়। এই জ্ঞান ভাণ্ডার লাটীন্ অনুবাদ সমূহের ভিতর দিয়াই পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের হস্তগত হইয়াছিল। অনুবাদগুলি মোটের উপর তিন অংশে বিভাজ্য।

১ম। গ্রীক গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ,—এই অনুবাদ আবার দুই প্রকারে সাধিত হইয়াছিল, যথা (১) গ্রীক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সমূহের প্রত্যক্ষ অনুবাদ; (২) আরবী অনুবাদের লাটীন্ অনুবাদ।

* প্রবন্ধের এই অংশ Prof. M. De Wulf কৃত History of Medieval Philosophy (translated by P. Coffey) গ্রন্থের অবলম্বনে রচিত।

(১) ইহাদের মধ্যে গ্রীক-লাটীন্, অর্থাৎ গ্রীক হইতে প্রত্যক্ষভাবে অনুবাদিত গ্রন্থমালাই উৎকৃষ্ট। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দিতে ফরাসী পণ্ডিতগণ গ্রীস্, সিসিলী এবং অপরাপর প্রাচ্যদেশ সমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পরে, ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলের অবরোধ উপলক্ষে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে ঘনিষ্টতা আরও বাড়িয়াছিল, কিন্তু এই সকল সুবিধা সত্বেও প্রত্যক্ষ অনুবাদ গ্রন্থ সমূহ সংখ্যায় অনেক হয় নাই, অধিকন্তু সেগুলি আরবদিগের নিকট প্রাপ্ত গ্রন্থাবলীর তুলনায় কম পরিচিত হইয়াছিল।

এ স্থলে কয়েকজন প্রধান গ্রীক অনুবাদক ও তাঁহাদের কৃত অনুবাদ গ্রন্থের নাম দেওয়া যাইতেছে।

রবর্ট গ্রসেতেত (Robert Grossetete),—(১১৭৫—১২৫৩ খ্রীঃ অঃ) ইনি প্যারী এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে লিঙ্কনের বিশপ পদ প্রাপ্ত হন। ইনি Breve Compendium Physicorum নামক গ্রন্থ, Analytica Posteriora গ্রন্থের একখানি ভাষ্য এবং Summa Philosophiae নামে একখানি মূল গ্রন্থের রচয়িতা।

Summa Philosophiae গ্রন্থ ভুল ক্রমে গুণ্ডিসেলিনাসের (Gundissalinus) কৃত De Divisione Philosophiae পুস্তকের সহিত এক বলিয়া উক্ত হয়। হর্ম্মানের (Herman the German) মতে তিনি Nichomachaean Ethicsএরও একখানি ভাষ্য লিখিয়াছিলেন।

Cantimpreর জন্ ব্যাসিংষ্টক্ এবং টমাস্ গ্রীকগ্রন্থ সমূহের কতকগুলি অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইহাদের অল্পাংশ আজও পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ অ্যালবার্ট (Albert the Great) "ফীডো" (Phoedo) এবং "মিনো" (Meno) গ্রন্থের লাটীন্ অনুবাদ ব্যবহার করিতেন। আর এক অজ্ঞাত লেখক ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষভাগে সেক্স্টাস্ এম্পিরিকাস্ কৃত "পিরহোণিক হাইপে টেপোসেস্" গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অনুবাদ অতি সামান্যই ব্যবহৃত হইত।

ডোমিনিক্যান্ ভিক্ষু সম্প্রদায়ভুক্ত মোয়েরবেকের উইলিয়ম্ (William of Moerbeke) এই সময়ে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ সেণ্ট্ টমাস্ (St. Thomas) কর্ত্তৃক অ্যারিষ্টটলের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর বিশুদ্ধ অনুবাদ, এমন কি, প্রচলিত অনুবাদগুলিরও নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশের নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। সূক্ষ্মবুদ্ধি সুপণ্ডিত উইলিয়ম্ আরবী অনুবাদ গুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করত মূল গ্রন্থগুলিরই অনুবাদ করিয়াছিলেন। উইলিয়ম্ একজন প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ দার্শনিক, শেষ বয়সে করিন্থের প্রধান বিশপ (Arch Bishop of Corinth) হইয়াছিলেন। ১২৮৬ খ্রীঃ অঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। উইলিয়ম্ অ্যারিষ্টটলের সমস্ত গ্রন্থ গুলিরই উদ্ধার করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ তিনিই Politics বা রাষ্ট্রনীতি গ্রন্থের প্রথম অনুবাদক। তৎকৃত প্রোক্লাসের "লিবার্ ডি কজিস্" (Liber de Causis) এবং "এলিমেণ্টা থিওলজিকা" (Elementa Theologica) এবং প্রাথমিক ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ হইতেই ত্রয়োদশ শতাব্দির নব-আদর্শবাদিগণ প্রধানতঃ তাঁহাদের বক্তব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উইলিয়মের অনুবাদে ভাষার পারিপাট্য না থাকিলেও অনুবাদগুলি মূলানুকারী এবং নির্ভুল; সে কারণ অদ্যাপি ঐ সকল অনুবাদে উপকার দর্শিতেছে।

এতদ্ব্যতীত মেসিনার বার্থোলোমিউ (Bartholomew of Messina) রাজা ম্যানফ্রেড কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া "ম্যাগনোরাম্ মোরেলিয়ম" (Magnorum Moralium), "প্রব্লেমেটা" (Problemata), "লিবার্ ডি প্রিন্সিপিস্" (Liber de Principiis), "ডি মিরাবিলিবাস্"

"অডিশিওনিবাস্" (De Mirabilibus Auditionibus), "ফিজিওনোমিয়া" (the Physionomia) এবং "ডি সিগ্‌নিস্" (De Signis) গ্রন্থের অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছেন। সিসিলীর নিকোলাস্ (Nicholas of Cicily) এবং অভার্ণের ডুরেণ্ডাস্ (Durandus of Auvergne) এর নাম উল্লেখযোগ্য। নিকোলাস্ Liber de Mundo গ্রন্থের অনুবাদক। আরও কতকগুলি ইটালীয় পাণ্ডুলিপি হইতে Physics, De Anima এবং De Coelo et Mundo গ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যায়। অনুবাদগুলিতে লেখকের নাম নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দির খৃষ্টীয় দার্শনিকগণ বৈজান্টী দর্শনশাস্ত্রের (Byzantine Philosophy) সহিতও পরিচিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ আল্‌বার্ট্ এবং সেণ্ট্ বনাভেন্টিওর (St. Bonaventure) দুইজনেই ইউষ্টেট্রিয়াস্ (Eustatrius) কৃত অ্যারিষ্টটলের "নীতিবিজ্ঞান" ব্যবহার করিতেন। আবার, বৈজান্টীয়রাও পাশ্চত্য সংস্পর্শে আসিয়া কতকগুলি লাটীন গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় অনুদিত করিয়াছিলেন। প্রথম বৈজান্টী অনুবাদকের নাম ম্যাক্সিমাস্ প্লেনুডিস্ (Maximus Planudes)। ইনি ১২৬০ হইতে ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং ইঁহাকেই দ্বিতীয় এণ্ডোনিকাস্ (Andronicus) ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক বিজ্ঞানপরিষতের প্রতিনিধিরূপে ভেনিসে পাঠান। প্লেনুডিস্ সিসিরো ম্যাক্রোবিয়াস্ (Macrobius) এবং বোয়েথিয়াসের গ্রন্থগুলির অনুবাদ করেন। তৎকৃত "ডি কন্‌সোলেশিওনি ফিলজফী (De Consolatione Phelosophiæ) গ্রন্থের অনুবাদ আজিও রক্ষিত হইয়া থাকে।

(২) গ্রীক গ্রন্থাবলীর আরবী অনুবাদের লাটীন্ অনুবাদ,—প্রাচীন গ্রীকদর্শন শাস্ত্র প্রধানতঃ আরবদিগের দ্বারা পশ্চিম ভূখণ্ডে নীত হইয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে উক্ত দর্শন শাস্ত্রের আরবী-লাটীন্ তরজমাই প্রত্যক্ষ গ্রীক-লাটীন্ অনুবাদের পূর্ব্বে পরিচিত ও ব্যবহৃত হইয়াছিল। অ্যারিষ্টটলের প্রতিভা গ্রীক হইতে সিরীয়, আরবী, হিব্রু, এমন কি কোন কোন স্থানীয় ভাষার ভিতর দিয়া লাটীন্ ভাষায় প্রবেশ করায়, মূল গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলির রূপান্তর ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা ছিল; একারণ স্কলাষ্টিকগণ আরবী-লাটীন্ অপেক্ষা গ্রীক-লাটীন্ অনুবাদেরই অধিক আদর করিতেন। আরবী-লাটীন্ অনুবাদ অনেকটা দাবাখেলার ছকে'র মত অর্থাৎ প্রত্যেক আরবী শব্দের পরিবর্ত্তে ঠিক তদ্রূপ একটী লাটীন্ প্রতিশব্দ না বসাইলে অনুবাদই হইত না। এইরূপ শব্দগত বা stereotyped অনুবাদে অর্থব্যতিক্রম না হইয়া পারে না।

অনুবাদিত গ্রন্থাবলীর পরিচয়,—যে সকল গ্রন্থ ভাষান্তরিত হইতেছিল, তাহার অধিকাংশই অ্যারিষ্টটলকৃত এবং ইহাদের মধ্যে তাঁহার জড়বিজ্ঞান বা Physics, অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা Metaphysics এবং প্রাণীবিদ্যা বা De Anima, এই তিনখানি সর্ব্ব প্রধান। এই সকল গ্রন্থের পর আরও বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ হয় এবং তৎসহ টোলেমী ও গ্যালেনের গ্রন্থগুলিও স্থান পাইয়াছিল। এই পুস্তক গুলির অধিকাংশই গণিত বিষয়ক। গণিত সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ জীবিকানির্ব্বাহের পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয় বিধায় দর্শন শাস্ত্রের পূর্ব্বেই সেগুলির লাটীন্ অনুবাদ সম্পন্ন হইয়া যায়।

অ্যারিষ্টটলের সমগ্র গ্রন্থভাণ্ডার যে এক সঙ্গেই পাশ্চাত্য বুধগণের গোচর হইয়াছিল, তাহা নয়। সেগুলি এক এক করিয়াই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দির শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দির প্রথম পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। অক্সফোর্ডের উইলিয়ম্ ১২২৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকতা করিতেন। তিনি অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর সহিত অধিকতর ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন। আর মহামতি আল্‌বার্ট্ (Albert the Great) অ্যারিষ্টটলের সমগ্র গ্রন্থাবলীরই ভাষ্য লিখিয়াছিলেন।

প্রধান প্রধান অনুবাদক ও অনুবাদকেন্দ্রের পরিচয়,—আফ্রিকার কনস্টান্টাইন্, বাথের অ্যাডিলার্ড্ (Adelard of Bath), ডাল্‌মেটীয় হর্ম্মান্ (Herman the Dalmatian) প্রভৃতির কৃত দ্বাদশশতাব্দির আরবী-লাটীন অনুবাদগুলি যেন কোনঘেষা হইয়া পড়িয়াছিল। উহাদের ভিতর শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়োজন হয় এবং তজ্জন্য স্পেনের টোলেডো নগরকে একটি কেন্দ্রে পরিণত করা হইয়াছিল। টোলেডোর প্রধান যাজক রেমণ্ড্ (Raymond) উক্ত নগরে অনুবাদক দিগের সুবিধার জন্য যে শিক্ষামন্দির বা কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন, তদ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। ডমিনিকাস্ গুণ্ডিসেলিনাস্, জোহানেস্ ডেভিড্ নামক একজন ইহুদী, ইঁহাকে জোহানেস্ হিস্পেনাস্ এবং এভেণ্ডিথ্ (John Avendeath)ও বলা হইয়া থাকে,—ডেভিড্ (David) এবং যিহুদা বেন্ টীবন্ (Jehuda Ben Tibbon) নামক আর দুইজন ইহুদী, অ্যালফ্রেড্ (Alfied of Morlay) নামক একজন ইংরাজ, (ইনি Meteors নামে গ্রন্থের প্রথম তিন খণ্ড এবং De Vegetalebus গ্রন্থের অনুবাদক) এবং ক্রেমোনার জারার্ড্ (Gerard of Cremona) প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই কলেজের সভ্য ছিলেন। কিছুকাল পরে মাইকেল্ স্কট্ (Michael Scot) এবং হর্ম্মাণ্ (Herman the German) এই টোলেডো কলেজ হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)।

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী।

মিশরের কৃষি

জল বিনা কৃষিকার্য্য চলিতে পারে না। বাংলা দেশে কৃষকেরা বৃষ্টির জল কিংবা বর্ষাকালে নদীবক্ষ স্ফীত হইলে যে জল উচ্ছলিত হইয়া তট অতিক্রম করিয়া অথবা খাল বিলের মধ্য দিয়া তাহার ক্ষেতে আসিয়া পড়ে তাহারই সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতি বিচিত্রতাময়ী। বর্ষা সকল বৎসর সমান হয় না এই জন্যই বাংলার কৃষক কখনও অতিবর্ষায় কখনও বা জলাভাবে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়ে। মিশরবাসী নীল নদকে এমন করিয়া সংযত করিয়া লইয়াছে যে তাহার জল এখন আর কৃষকের ক্ষেতগুলিকে অনর্থক প্লাবিত করিয়া দিতে পারে না অথচ পূর্ব্বপ্রণালীর মধ্যে সে জল প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। কৃষির প্রয়োজন অনুসারে কৃষকেরা তাহার ব্যবহার

করিয়া থাকে। বৃষ্টির অভাবও তাহাদের বিপন্ন করে না। যখনই জলের দরকার হয় খাল বিল অথবা কূপ হইতে অতি সহজ উপায়ে তাহারা জল তুলিয়া তাহাদের ক্ষেত সিক্ত করিয়া লয়। বাংলা দেশের কৃষকেরাও কখন ও কখন খাল পুষ্করিণী প্রভৃতি অগভীর জলাশয় হইতে ডোঙ্গার সাহায্যে কিংবা কূপ প্রভৃতি গভীর জলাশয় হইতে বালতি বা ডোল টানিয়া জল তুলিয়া তাহাদের ক্ষেত সিক্ত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহাতে তাহাদের উদাসীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। মিশর কৃষকের জলাশয়ে জল যত নীচেই থাকুক না কেন একটি মানুষ একটিমাত্র বলদ খাটাইয়া একটি প্রস্রবণের সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে এবং জলাশয়ের চারিদিকে অসংখ্য নালা কাটিয়া প্রায় দুই দ্রোণ জমিতে সেই জল সরবরাহ করিতে পারে। যে যন্ত্রের সাহায্যে মিশর কৃষক জলাশয় হইতে জল উত্তোলন করিয়া থাকে তাহাকে স্থানীয় আরবী ভাষায় 'তুসাব' এবং ইংরাজীতে পারসিয়ান্ হুইল (Persian Wheel) বলা হইয়া থাকে। আমি তাহার নাম দিলাম 'পারস্য চক্র'। হিন্দুস্থানের কোন ও কোন স্থানে পারস্যচক্রের ব্যবহার থাকিলেও বাংলা দেশে তাহা সুপরিচিত নহে, সেই জন্য আশা করি তাহার নির্ম্মাণকৌশল এবং ব্যবহার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বর্ণনা নিস্ফল হইবে না।

পারস্য-চক্র

পারস্যচক্র নির্ম্মাণ করিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের কলকারখানায় প্রস্তুত কোনও দুর্ম্মূল্য পদার্থের আবশ্যক হয় না। যে কোনও প্রকারের শক্ত কাঠ এবং সাধারণ পেরেক হইলেই আমাদের সেকেলে সূত্রধরেরাও তাহা অনায়াসে প্রস্তুত করিতে পারিবে। এই চক্রের প্রধান উপকরণ তিনটী।

(১) চরকার দাঁড়ার মত ঘুরিতে পারে এরূপ একটি আল বা আবর্ত্তন কাঠ।

(২) বালতি, ডোল কিংবা যে কোন প্রকারের, ধাতু অথবা কাঠ নির্ম্মিত কতকগুলি প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট জলপাত্রের একটি মালা।

(৩) কাঠের দুইটি চক্র।

আবর্ত্তন কাঠটি নানাবিধ আকারের হইতে পারে। অবিকল চরকার দাঁড়ার আকার বিশিষ্টও হইতে পারে কিংবা একটা গোটা বৃক্ষের রোলা হইলেও কাজ চলিতে পারে।

চক্রদুইটি গরুর গাড়ীর চাকার মত হইবে কিন্তু তাহাদের নির্ম্মাণ প্রণালীতে একটু বিভিন্নতা আছে। অন্ততঃ চার আঙ্গুল পুরু এবং ছয় আঙ্গুল চৌড়া কাঠ দিয়া সমান আকারের দুইটি চক্রনেমি অথবা বেড় মাত্র প্রথমে প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বেড়ের ভিতরে চারটি অরকাঠ বা পাখী এমন করিয়া বসাইতে হইবে যেন চক্রের নাভিস্থিত ছিদ্রটি সমচতুর্ভুজ হয়। তৎপর উভয় চক্রের বেড়ের বাহিরের দিকে কতকগুলি বিঁধ করিয়া তাহাতে কোঁড়ানির দাঁতের মত কতকগুলি কাঠের দাঁত বসাইয়া দিতে হইবে। উভয় চক্রের দাঁতগুলি সমসংখ্যক এবং সমদূরবর্ত্তী হইবে।

মালাটি স্থানান্তরে নির্ম্মাণ করিয়া কূপে স্থাপন করা নিরাপদ নহে, উহা কূপের উপরেই নির্ম্মাণ করা বিধেয়। আবর্ত্তন কাঠটি প্রথমতঃ কূপের উপর আড়াআড়ি ভাবে দুইটি খুঁটির উপর স্থাপন করিতে হইবে। দুইটি শক্তদড়ি আধ হাত পরিমাণ ব্যবধানে সমান্তরাল ভাবে রাখিয়া তাহার মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে কতকগুলি ছোট কাঠের টুকরা বাঁধিয়া একটি দড়ির মই তৈয়ারী করিতে হইবে। তৎপর ঐ মইটি মালার আকারে আবর্ত্তন কাঠটির উপর হইতে কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিতে হইবে। একটি বালতি বা ডোলের মুখ মইএর এক ধাপে এবং তলা তার নীচের ধাপের সঙ্গে দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে হইবে। এইরূপে প্রথম জলপাত্রটি বাঁধা হইয়া গেলে আবর্ত্তন কাঠটিকে তাহার মেরুদণ্ড বেষ্টন করিয়া একটু ঘুরাইলেই পাত্রটি সম্মুখদিকে অগ্রসর হইবে এবং মালার পাত্রহীন স্থান তৎস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তখন তথায় আবার একটী পাত্র বাঁধিতে হইবে। এইভাবে পাত্রের পর পাত্র বাঁধিয়া মালাটি প্রস্তুত হইবে। বলা বাহুল্য, পাত্রগুলির মুখ একইদিকে থাকিবে এবং সর্ব্বনিম্নের দুইটি কি তিনটী পাত্র যাহাতে কূপের জলে ডুবিতে পারে মালা দুইগাছি সেই পরিমাণে দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আবর্ত্তন কাঠটির মেরুদণ্ডের এক প্রান্ত চৌপলিয়া করিয়া একটি চক্রের কেন্দ্রস্থিত চতুষ্কোণ ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। বিঁধ এবং খিল উভয়ই চতুষ্কোণ বলিয়া বন্ধনের দৃঢ়তার জন্ত পেরেকের বেশী দরকার হইবে না।

দ্বিতীয় চক্রের নাভিছিদ্রের মধ্যে একটী কাষ্ঠদণ্ড প্রবিষ্ট করিয়া চক্রটীকে এরূপভাবে পেরেক মারিয়া সংযুক্ত করিতে হইবে যাহাতে দণ্ডটি ঋজুভাবে মাটিতে দাঁড় করাইলে তাহার উপরে স্থিত চক্রটি পিছলাইয়া নীচে নামিতে না পারে। একখণ্ড প্রস্তরের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে চক্রবাহী দণ্ডটিকে এতদূরে স্থাপিত করিতে হইবে যেখান হইতে চক্রটির দুই তিনটী দাঁত প্রথম চক্রটীর দাঁতের মধ্যস্থ ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। চক্রবাহী দণ্ডটিকে ঋজুভাবে রাখিবার জন্ত তাহার উপরে একখণ্ড গুরুভার কাঠ দিয়া চাপা দিতে হইবে। চাপান কাঠটির দুই প্রান্ত দুইটি খুঁটির উপর সংরক্ষিত হইবে। খুঁটি দুইটি পরস্পর এতদূর সংস্থাপিত হইবে যাহাতে তাহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানের মধ্যে চক্রবাহী দণ্ডটিকে বেষ্টন করিয়া কলুর বলদের মত একটি বলদ কূপের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। যোয়ালটি দ্বিতীয় চক্রের ঊর্দ্ধে, কিন্তু চাপান কাঠের নীচে চক্রবাহী দণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকিবে।

বলদ ঘুরিতে আরম্ভ করিলেই দ্বিতীয় চক্রটি ঘুরিবে এবং তাহার দাঁতগুলি প্রথম চক্রের দাঁতগুলিকে ক্রমান্বয়ে ঠেলিয়া দিবে, তাহার ফলে প্রথম চক্রটিও ঘুরিতে থাকিবে এবং প্রথম চক্রটি কূপের উপরের আবর্ত্তন কাঠের সহিত সংযুক্ত থাকায় সেই চক্রটি ঘুরিলেই আবর্ত্তন কাঠটিও ঘুরিয়া জলপাত্রের মালাটিকে ঘুরাইতে থাকিবে। মালাটী আবর্ত্তিত হইতে থাকিলে একদিক দিয়া জলশূন্য পাত্রগুলি অধোমুখে নিম্নগামী হইবে এবং জলপূর্ণ হইয়া অপরদিক দিয়া ঊর্দ্ধমুখে আবর্ত্তন কাঠের উপর আসিয়া উপস্থিত হইবে। আবর্ত্তনের ফলে জলপূর্ণ পাত্রটি যখন আবার অধোমুখ হইবে তখন পাত্রস্থ জল আপনা হইতেই পড়িয়া যাইবে। সেই জলকে কূপের মধ্যে পড়িতে না দিয়া তন্নিম্নে একটি দীর্ঘাকার টিন কিংবা

একটি বেত্রনির্মিত পাত্র ধরিয়া দিলে তাহার উপর দিয়া গড়াইয়া জল কূপের বাহিরে চলিয়া আসিবে। এইরূপে ভাণ্ডের পর ভাণ্ড আসিয়া একটি প্রস্রবণের সৃষ্টি করিয়া দিবে। এই প্রস্রবণের জল কূপের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষেতময় অসংখ্য সরু সরু নালা বহিয়া প্রায় দুই দ্রোণ জমিকে সিক্ত করিতে পারে।

পারস্য-চক্র যে কেবল কূপেই ব্যবহার্য্য এরূপ নহে। পুষ্করিণী, খাল, নদী, নালা প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জলাশয়ে তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কূপ ব্যতীত নদী, পুষ্করিণী খাল, নালা, প্রভৃতি অন্য প্রকারের জলাশয় হইতে জল উঠাইতে হইলে তাহার তীরের অবস্থা বুঝিয়া দ্বিবিধ উপায়ে চক্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। জলাশয়ের অনতিদূরে কূপের আকারে একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া মাটির তল দিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া কিংবা নল বসাইয়া জলাশয়ের জলের সহিত গর্ত্তের সংযোগ করিয়া দিলে সেই গর্ত্তের উপর চক্র বসাইয়া তাহা হইতে যত ইচ্ছা জল উঠাইতে পারা যাইবে। জলাশয়ের তীর অযুচ্চ এবং খাড়া না হইলে এবং ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা না থাকিলে তীরের গাত্র পাকা করিয়া গাঁথিয়া এবং তাহার সম্মুখে জলের মধ্যে একটি স্তম্ভ পুতিয়া তাহার উপর চক্র বসান যাইতে পারে। এখানে আবর্ত্তন কাঠটি অপেক্ষাকৃত লম্বা করিতে হইবে। প্রথম (কূপ) প্রণালীতে বলদ কূপের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া থাকে কিন্তু এখানে আবর্ত্তন কাঠটিকে ভূমি হইতে ঈষৎ উচ্চে স্থাপন করিয়া প্রথম চক্রটির প্রায় অর্দ্ধাংশ গর্ত্তের মধ্যে ঘুরিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে, বলদ কেবলমাত্র চক্র দুইটির চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে। যেখানে বর্ষাকালে জলের গভীরতা অধিক হয় সেখানে পুষ্করিণী কাটিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ, কিন্তু যেখানে জলের গভীরতা দুই এক গজের বেশী হয় না সেখানে স্থায়ীভাবে কূপ খনন করিয়া কূপের চারিধারে মাটি ফেলিয়া উচ্চ করিয়া লওয়াই সুবিধাজনক।

পারস্যচক্রের সাহায্যে জল সেচন করিয়া মিশর দেশে একই ভূমি হইতে প্রতি বৎসর তিন চারিটি ফসল উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। বাংলাদেশে এরূপ শুভদিনের আগমন কখনও হইবে কি? রাঢ়বর্জ্জিত বাংলাদেশ নদীবহুল। বাংলার নদীগুলিকে সংযত করা ব্যয়সাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ হইতে পারে। পারস্যচক্রের ন্যায় দেশকাল উপযোগী কোন সেচনযন্ত্র ব্যবহার করিয়া বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে কৃষিকার্য্য একেবারেই অসম্ভব কি?

শ্রীসৈয়দ্ মনিরুজ্জমান।

প্রেম-সেতু

আমি যে বাড়ীতে থাকি, তার বাগানে অনেকগুলো গাছ আছে। কতকগুলো ফুল গাছ, কতকগুলো ফল গাছ, কতকগুলো তরিতরকারীর গাছ। মালীর সেবায় ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে তারা নানা ঋতুতে নানা ফুল, নানা ফল, নানা তরকারী দিচ্ছে। বিবাদ নাই, বিসম্বাদ নাই, শীত গ্রীষ্ম মাথায় ক'রে তারা বৎসরের পর বৎসর এ বাগানের প্রজা হ'য়ে

আছে। কেহ জন্মাচ্ছে, কেহ বাড়ছে, কেহ মরেও যাচ্ছে। আমি তাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে শিখে তাদের কাছে অনেক শিক্ষা পেয়েছি। কত সৌন্দর্য্য, কত প্রেম, কত পবিত্রতা, কত সহিষ্ণুতা তারাই শেখাচ্ছে। বুক খুলে, মুখ খুলে অরূপের রূপ দেখাচ্ছে—অরূপের সৌন্দর্য্যে মোহিত কচ্ছে।

ভাবছিলাম, আমরা মানুষ, আমরা হা হুতাশ ক'রে মরি, আমাদের মনে মনে মিলন নাই, প্রাণে প্রাণে বাঁধন নাই, কেবল ঈর্ষা, দ্বেষ, কাটাকাটি ও মারামারি। কিন্তু এরা তো মিলে জুলে বেশ আছে। গোলাপ ও গুল্‌দোদি (Chrysanthemum) এক সঙ্গে ফুটে রয়েছে। উঁচু আমগাছগুলো গর্ব্ব ক'রে নীচু লিচুগাছগুলোর উপর উপেক্ষার নয়নে চায় না। ফুলকপিগুলো বেগুনের ক্ষেতের দিকে চেয়ে সাদা দাঁতে অট্টহাস হাসে না। ছোট, বড়, সাদা, কালো, মিষ্টি, টক্‌, সব নিজ নিজ বিচিত্রতা নিয়ে বেশ বাস কচ্ছে। আমরা মানুষ, আমাদেরও নানা রং, নানা প্রকৃতি, নানা চিন্তা, নানাভাবে—আমরা কেন আমাদের বিচিত্রতা নিয়ে একসঙ্গে মিলে মিশে থাক্‌তে পারি না?

পার্থিব জগতে শত সহস্র অমিল আছে। জগতের জাতিরা ধরাখানিকে ভাগ করিতে গিয়ে ধরাখানিকে নরশোণিতে ডুবিয়ে দিচ্ছে। জাতি বিদ্বেষ প্রাণে প্রাণে গরল উদ্গারণ কচ্ছে। স্বার্থদেবের পূজায় শান্তি জিনিসটা বলিদান করা হয়েছে। জগৎকে জগৎ বল্‌বো, কি নরক বল্‌বো, জানি না। প্রাণে প্রাণে নরক—বুকে বুকে নরক—এক অপরকে ভাল চোখে দেখতেই পারে না। প্রেমও নাই—পুণ্যও নাই—আছে শুধু একটা বিরাট বীভৎসতা।

ধর্ম্ম জগতের অবস্থা তদধিক শোচনীয়। তুমি ব্রাহ্ম, আমি খৃষ্টান, অমুক লোকটা হিন্দু, অমুক লোকটা মুসলমান; অতএব পরস্পর যুদ্ধ না করলে জগতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। অতএব এস, আমরাও রণাঙ্গনে দাঁড়াই—এক অপরের রক্তে তর্পণ করি। হায় রে! ভাবতে প্রাণ ফেটে যায়!

ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ; মানুষ তাঁর সন্তান। কথাটা আজকাল সকলেই বলে। কিন্তু কথাটা কথামাত্র। নানা ধর্ম্ম ও নানা সম্প্রদায়ের কথা তো দূরে, একই সম্প্রদায়ের দুজন মানুষ একসঙ্গে উপাসনা কত্তে পারে না। কেননা ওর মত আলাদা, এর মত আলাদা। মতে মেলে না, কেমন ক'রে আমরা একসঙ্গে উপাসনা কত্তে পারি? তোমার সঙ্গে তবেই আমার ধর্ম্ম-বন্ধুত্ব হ'তে পারে, যখন তুমি আমার মতে আসবে। ভাই রে! ইহা কি সম্ভব? যদি জগতের একটা শেষ দিন থাকে, তবে ঐ শেষ দিন পর্য্যন্ত মানুষ কখনও একমত হবে না। মানুষ যেসকল উপাদানে নির্ম্মিত, তার মধ্যে এক উপাদানের নাম "বিচিত্রতা"।

গোলাপের বিশেষত্ব আছে, বৈচিত্র্য আছে। গুল্‌দোদিরও বিশেষত্ব আছে, বৈচিত্র্য আছে। তবু দুটো গাছ পাশে পাশে ফুলের ডালা মাথায় ক'রে বসে আছে। বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য অনৈক্যের হেতু নহে। অনৈক্য পাপ। মানুষকে বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য দিয়ে ঈশ্বর পাপের স্রষ্টা হন নাই। অনৈক্যের হেতু অহমিকা—আমি—আমি—আমি। তুমি হেরে যাও, আমি জিতে যাই। এই জিগীষাই অনৈক্যের হেতু।

প্রাণে প্রেমের ফোয়ারা উথলে উঠলে আমি আমার বৈচিত্র্য নিয়েই বিশ্বজনীন হতে পারি। মহাপ্রচারক মহর্ষি পল বলেন, আমি ইহুদিদের মধ্যে ইহুদি, গ্রীকদের মধ্যে গ্রীক্। এটা প্রেমের লীলা। বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মকে সূত্রাত্মা বলা হয়েছে। যেমন নানা মণিমুক্তা এক সূতোয় গাঁথা, সেইরূপ এই বিশ্ব জগতের সমগ্র পদার্থ সূত্রাত্মায় গাঁথা। কি সুন্দর ভাব! হে সূত্রাত্মার উপাসকগণ! তোমরাও কি সূত্রাত্মা হয়ে এই বিশ্বটাকে আপনাদের আত্মায় গেঁথে নিতে পার না?

Unity in diversity, বৈচিত্র্যে একত্ব, এই মহা সত্য বুঝলে প্রাণে প্রাণে ব্যবধান থাকতে পারে না। জগতের দেশগুলো বড় বড় নোনা জলের সাগরের এপারে ও ওপারে। জগতের আত্মাগুলোও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গরল ভরা অনৈক্যের সাগরের এপারে ও ওপারে। প্রেম সেতুস্বরূপ। এই সেতু দিয়ে একদেশ হইতে অন্য দেশে যাও—এই সেতু দিয়ে এক আত্মা থেকে অপর আত্মায় প্রবেশ কর। এই সেতু স্বর্গ ও মর্ত্তের মাঝখানে। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে এপার ও ওপার এক হয়ে গেছে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

মহাভারত-মঞ্জরী

বনপর্ব্ব—দশম অধ্যায়

স্বামী বশীকরণের মন্ত্র ও ঔষধি

কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে দেখিয়া উৎসুক হইয়া প্রিয় মহিষী সত্যভামাকে সঙ্গে করিয়া কাম্যক বনে আসিয়াছেন। একদিন সত্যভামা দ্রৌপদীকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন, "সখি, তুমি যে মন্ত্র ও ঔষধি দ্বারা পঞ্চ স্বামীকে এমন বশীভূত করিয়া রাখিয়াছ, তাহাই আমাকে শিখাইতে হইবে।"

দ্রৌপদী মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "হায়! সখি তোমার এই বিশ্বাস যে আমি স্বামীগণের উপর মন্ত্র ও ঔষধি প্রয়োগ করিয়া থাকি! গৃহে সাপ থাকিলে গৃহস্থের যেমন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার অবধি থাকে না, স্বামীর উপর স্ত্রী মন্ত্র ও ঔষধি প্রয়োগ করে, ইহা জানিতে পারিলে, সেই স্বামী কি তদপেক্ষাও অধিক উদ্বিগ্ন, অধিক উৎকণ্ঠিত হয় না? উদ্বিগ্ন ব্যক্তি কি কখনও শান্তি পায়? শান্তিহীন ব্যক্তি কি কখনও সুখ পায়? আর মন্ত্র ও ঔষধি দ্বারা কি কখনও স্বামীকে বশীভূত করা যায়? যে স্ত্রী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধি দেয়, সে বিষ বা বিষবৎ কোন দ্রব্য পতিকে ভক্ষণ করায়। তাহাতে স্বামী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবন হারায়।"

তখন সত্যভামা ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "তবে সখি, তুমি যে উপায়ে স্বামীগণকে বশীভূত

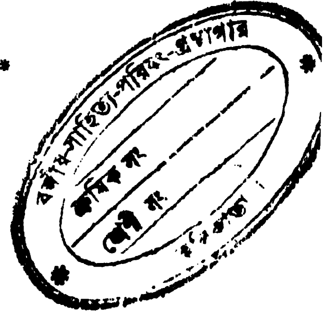
করিয়াছ, তাহাই আমাকে শিখাইয়া দাও।" তখন দ্রৌপদী হাসিয়া বলিলেন, "আমার পতিসেবাই পতি বশীকরণের মন্ত্র ও ঔষধি। আমি সর্ব্বদা অহঙ্কারশূন্য মনে স্বামীসেবা করি। কখনও মিথ্যা কথা বলি না, মিথ্যা আচরণ করি না, স্বামীগণের উপর ক্রুদ্ধ হই না। তাঁহারা যে দ্রব্য ভক্ষণ করেন না, তাহা আমিও গ্রহণ করি না। তাঁহারা যাহা পান করেন না, তাহা আমিও স্পর্শ করি না। পতির মুখ ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখ দেখি না। পতির অপ্রিয় আচরণ কখনও করি না। বনে বা গৃহে যেখানেই থাকি, গৃহ-সামগ্রী ও আহারীয় দ্রব্য পরিষ্কার করিয়া সুশৃঙ্খলায় সাজাইয়া রাখি। স্বামীগণ আমার উপর কদাচ অসন্তুষ্ট হইতে না পারেন, এজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি ও রুচি পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছি। যখন যাহা করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন, তখন তাহাই করিয়া থাকি। যে কার্য্য যখন করা প্রয়োজন, আমি তখন তাহাই করি। তাঁহারা তিরস্কার করিলেও সেই অপ্রিয় ঘটনা মনে করিয়া রাখি না। আমি স্বামীগণের বিমর্ষভাব দেখিলে আনন্দের হিল্লোল তুলিয়া তাহা দূর করি। তাঁহারা আমার নিকট না থাকিলে, আমি কখনও পুষ্প চন্দন ধারণ করি না, কেশে কবরী বাঁধি না, নয়নে অঞ্জন দেই না, উত্তম বেশ ভূষা করি না। আমার স্বামীগণের অন্য যে সব পত্নী আছে, তাহাদিগকে আমি সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করি। আমি নিজে অসুখী হইয়াও, তাহাদিগকে সুখী করি। যখন আমাদের দাস দাসীর অভাব ছিল না, তখনও আমি স্বয়ং শাশুরীর পরিচর্য্যা করিতাম, স্বহস্তে তাঁহার ভোজন সামগ্রী, পানীয় ও বস্ত্র দিতাম। রাজ্য থাকা কালে শত শত ব্রাহ্মণ আমাদের বাটীতে প্রত্যহ আহার করিতেন। আমিই তাঁহাদিগকে আহারীয়, পানীয় ও বস্ত্র প্রদান করিতাম। তখন পাণ্ডবদের শত শত দাস দাসী ছিল। তাহাদের নাম, আকৃতি, যে ব্যক্তি যে কার্য্য করিত, সকলি আমি জানিতাম। তাহাদের অভিযোগ অনুযোগ আমিই শুনিতাম, আমিই মীমাংসা করিতাম। আমি একাকিনী এত বড় রাজ্যের আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিতাম। ধনাগার ও ভাণ্ডারসকল পরিদর্শন করিতাম। আমি চিরদিন সকলের অগ্রে জাগরিত হই, সকলের পরে আহার করি, সকলের শেষে শয়ন করি। আমি ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিয়া দিবানিশি স্বামীসেবা করি, এইজন্য আমার স্বামীগণ আমার প্রতি এত অনুরক্ত।"

সত্যভামা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "প্রিয় সখি, আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না কৃষ্ণকে বশ করিবার সহজ উপায় বলিয়া দাও।"

দ্রৌপদী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "রমণীরাই পুরুষের সহস্র সুখের উৎস। তুমি উত্তম বেশ ভূষা করিয়া, অঙ্গরাগ ও সুগন্ধ ধারণ করিয়া, প্রেম ও ভক্তিদ্বারা সতত কৃষ্ণের আরাধনা করিবে। কদাচ অপ্রিয় বাক্য বলিবে না, কদাচ অপ্রিয় আচরণ করিবে না। যাহাতে কৃষ্ণ সুখী হন, তাহাতে তুমিও সুখী হইবে। সতত তাঁহাকে মধুমাখা কথায়, মধুর ব্যবহারে মধুদান করিবে। পুরুষকে মধুর দৃষ্টিতে, মধুর বচনে, মধুর ব্যবহারে, যত বশীভূত করা যায়, তত আর কিছুতেই নহে। কৃষ্ণ তোমার গৃহে প্রবেশ করিলে, নিত্য নূতন মধুমাখা কথায় তাঁহার সম্ভাষণ করিবে। তুমি সুন্দর ও সুকোমল আসন, সুগন্ধ পুষ্প, সুরচিত পুষ্পমালা চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য সমাদরে দান করিবে। তুমি তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তিনী হইয়া

চলিবে। কখনও কোনও কারণে কায় মন ও বাক্যদ্বারা তাঁহাকে অতিক্রম করিবে না। এইরূপ কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিলে, তুমি নিশ্চয়ই পতির অতিপ্রিয় হইতে পারিবে। তাহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কি বাঞ্ছনীয় আছে। মনে রাখিবে,

সুখং সুখেনেহ ন জাতু লভ্যং
দুঃখেন সাধ্বী লভতে সুখানি।" *



বনপর্ব্ব—একাদশ অধ্যায়

ঘোষ যাত্রা

পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লইয়া আবার দ্বৈতবনে আসিয়াছেন। তথায় সরোবর তীরে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া দীন হীন ভাবে, অতি দুঃখে দিনপাত করিতেছেন। সে সংবাদ হস্তিনায় উপস্থিত হইল। অমনি দুর্য্যোধন আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। শকুনি বলিলেন, "চল, একদিন দ্বৈতবনে যাই। তথায় আমরা সকলে সস্ত্রীক জলক্রীড়া করিব, আর আমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য, অপার সুখ সম্পদ, আর আমাদের রমণীগণের বসন ভূষণের পারিপাট্য দীন হীন পাণ্ডব ও পাঞ্চালীকে দেখাইব। তাহারাই বা কিরূপ দুঃখ দুর্দ্দশায় দিনপাত করিতেছে, তাহাও স্বচক্ষে দেখিব। তাহা হইলেই আমাদের সকলের প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে। শত্রুর দুঃখ দেখিলে যত সুখ হয়, এত সুখ আর কিছুতেই হয় না।" কর্ণও "ইহা সৎ পরামর্শ" বলিয়া সায় দিলেন। অমনি দুর্য্যোধন নাচিয়া উঠিলেন।

দ্বৈতবনে কৌরবগণের শত সহস্র গোধনের বাথান। তাহা পরিদর্শন করিবেন বলিয়া দুষ্ট দুর্য্যোধন অন্ধরাজের অনুমতি লইলেন। পরে সকলে বহু সৈন্য সঙ্গে করিয়া, বহু পুরস্ত্রী লইয়া, মহা ধূমধামে, মহোল্লাসে তথায় উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন গো-ধন পরিদর্শন ও গণনা করিলেন, তাহাদের শরীরে চিহ্ন প্রদান করিলেন। পরে গোপালক ঘোষগণ আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল। দুর্য্যোধনেরাও মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদয় দ্বৈতবন তাঁহাদের আনন্দ-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া উঠিল, তাঁহাদের আনন্দ কোলাহলে শব্দায়মান হইল।

শেষে কৌরবগণ জলক্রীড়ার জন্য সেই জলাশয়ে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের অকৃত্রিম বন্ধু গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন সসৈন্যে এই বনে পূর্ব্বেই আগমন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই এই সরোবরে সপরিবারে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ কৌরবগণকে বাধা প্রদান করিল। মদগর্ব্বিত দুর্য্যোধন কর্ণের বাহুবল স্মরণ করিয়া

---

* এ জগতে সুখের দ্বারা সুখ, কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সতী স্ত্রী দুঃখের দ্বারা সমস্ত সুখ আয়ত্ত করিয়া লন। বনপর্ব্ব ২৩৩—৪। ইহা যে কেবল শুধু সতীস্ত্রীর পক্ষে সত্য, তাহা নহে। নরনারী সকলের পক্ষেই সত্য।

গন্ধর্ব্বগণকে উপেক্ষা ও উপহাস করিলেন। অচিরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্য্যোধনেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন, যত শক্তি সামর্থ্য ছিল, সকলই প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। মহাবীর কর্ণ সর্ব্বাগ্রে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিলেন। চিত্রসেন—দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি সমুদয় বীরগণকে ও তাঁহাদের পুরস্ত্রীদিগকে বন্ধন করিয়া, বন্দী করিয়া স্বদেশে লইয়া চলিলেন।

এখন উপায়? কতিপয় অমাত্য আর উপায় না পাইয়া দ্রুতপদে গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে দুঃখের কথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া ভীম বলিলেন. "ভালই হইয়াছে। পাপাত্মারা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছে, প্রবঞ্চনা দ্বারা আমাদের যথা সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছে, আজ তাহার প্রতিফল পাইল।"

তাহা শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, "শত্রুগণ বিপদে পড়িলে আনন্দিত হইতে নাই। বিশেষ দুর্য্যোধনের সহিত আমাদের বিবাদে তাহারা শত ভাই এক দিকে, আর আমরা পাঁচ ভাই অন্যদিকে। কিন্তু অপরের সহিত বিরোধে আমরা একশত পাঁচ ভাই একইদিকে। জ্ঞাতিগণের মধ্যে পরস্পর বহুতর কলহ হয়। কিন্তু অপরের সহিত জ্ঞাতিগণের বিরোধে সমুদয় জ্ঞাতিগণেরই একতায় আবদ্ধ হইয়া অপরের সহিত সংগ্রাম করা উচিত। আবার, বর, রাজ্য ও পুত্র প্রাপ্তি, এই তিনটী সমকালে প্রাপ্ত হইলে যত সুখ হয়, শত্রুকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিতে পারিলেও সেই সুখ হয়। পুনশ্চ কেহ বিপদে পড়িয়া সাহায্য চাহিলে, সেই সাহায্যদানে কাহারও বিমুখ হওয়া উচিত নহে। অতএব তোমরা চারি ভ্রাতায় গমন কর। চিত্রসেন অর্জ্জুনের বন্ধু, আমাদেরই আত্মীয়। তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া সকলকে মুক্ত করিয়া দিবে। তিনি না শুনিলে, অবশ্যই যুদ্ধ করিবে। দুর্য্যোধনাদির পরিত্রাণের জন্য বন্ধুবিচ্ছেদ হয়, আত্মীয় শত্রু হয় সেও স্বীকার, তথাপি কোনমতে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইতে দিও না। আমি যজ্ঞ করিতেছি, নতুবা আমিও যাইতাম।"

পাণ্ডবেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গমন করিলেন। বন্ধুবর চিত্রসেনকে অনেক বুঝাইলেন। তিনি কাহাকেও মুক্তি দিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পাণ্ডবেরা ভীষণ যুদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন চিত্রসেনকে পরাস্ত করিলেন। সমুদয় গন্ধর্ব্ব সৈন্য বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইল। তখন রাজা চিত্রসেন যুধিষ্ঠিরকে সকল কথা বলিবার জন্য, তাঁহাকে বুঝাইয়া বন্দীগণকে স্বদেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধনকে, দুঃশাসন, শকুনী প্রভৃতিকে ও তাঁহাদের পুরনারীদিগকে বন্ধন করিয়া বন্দী ভাবে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাঁহারা সকলে সেই দশায় মস্তক অবনত করিয়া পাণ্ডবগণের পর্ণকুটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে দৃশ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

চিত্রসেন তাঁহাকে বলিলেন. "আপনারা বনে অশেষ কষ্ট পাইতেছেন জানিয়া দুর্য্যোধনেরা তাহাদের অপার সুখৈশ্বর্য্য দেখাইয়া আপনাদিগকে মর্ম্মপীড়িত করিতে আসিয়াছিল। আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া আপনাদের মঙ্গলের জন্য সসৈন্যে

এখানে আসিয়াছিলাম। আমি ইহাদিগকে বন্দী করিয়াছি, চিরদিন বন্দী করিয়া রাখিব। এখন আপনারা হস্তিনায় গমন করিয়া পৈত্রিক ও স্বরাজ্য উভয়ই উপভোগ করুন।” :

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, “সখে, সকলই স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার ভ্রাতৃগণকে আমার পুরনারীদিগকে তুমি বন্দী করিয়া লইয়া গেলে, আমার কুলে যে কলঙ্ক হইবে, তাহার তুমি কি করিবে? জানি, দুর্য্যোধন চিরদিনই বালক। তাই বলিয়া আমরাও বালক হইতে পারি না। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি সকলকে ছাড়িয়া দাও।”

তখন চিত্রসেন অতি অনিচ্ছায় সকলকে মুক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির চিত্রসেনকে বলিলেন, “তোমরা যে বলিষ্ঠ ও সমর্থ হইয়াও দুর্য্যোধনদিগকে নিহত কর নাই, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।” তখন রাজা দুর্য্যোধন মস্তক অবনত করিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন। আর তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্য? তাহারা পাণ্ডবগণের নামে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তাহাদের মুখনিঃসৃত পাণ্ডব-প্রশংসায় সমুদয় দ্বৈতবন মুখরিত হইয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধনের মনস্তাপের অবধি রহিল না। একে ত পাণ্ডবগণ উপকার করিয়াছেন, শত্রুতা পাইয়া মিত্রতা নাদ করিয়াছেন, তাহাতেই দুর্য্যোধন যারপরনাই মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন। তাহার উপর আবার স্বীয় সৈন্যগণের মুখে পাণ্ডব-প্রশংসা! এত দুঃখ কি সহ্য হয়? তিনি এখন পথিমধ্যে শিবির স্থাপন করিয়া কুশাসনে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতে বসিলেন। দুঃশাসন ও শকুনি কত বুঝাইলেন, কিছুতেই তিনি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না।

কর্ণ পলায়ন করিতে করিতে পথি মধ্যে কৌরব শিবির দেখিলেন। ভাবিলেন, কৌরবেরা বাহুবলেই বিজয়ী হইয়া গৌরবে গৃহে গমন করিতেছেন। তাই তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতে দুর্য্যোধনের শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু যেই দুর্য্যোধনের দশা দেখিলেন, সেই বিস্ময়ে পূর্ণ হইলেন। তখন সকল কথা জানিতে পারিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন, “রাজন্, পাণ্ডবেরা তোমারই রাজ্যে, তোমারই আশ্রয়ে বাস করে। তাহারা তোমারই প্রজা, তোমারই অধীন সৈনিক মাত্র। তোমাকে সাহায্য করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম। তবে কেন দুঃখিত হইতেছ? অপমান বোধ করিতেছ? উঠ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই অর্জ্জুনকে নিহত করিব।”

তখন দুর্য্যোধন ভাবিলেন, এ ত সত্য কথা। বিশেষ কর্ণ অর্জ্জুনকে নিহত করিলে, আজকার অপমানের প্রতিকার হইবে। তখন তিনি উঠিলেন। হস্তিনায় গমন করিলেন, গর্ব্ব সহকারে সভায় প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু তাঁহাদের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই হস্তিনায় প্রচারিত হইয়াছিল। এখন দুর্য্যোধনের অহঙ্কারদৃপ্ত মুখ দেখিয়া ভীষ্মদেব বিরক্ত হইলেন। দুর্য্যোধন ও কর্ণকে খুব তিরস্কার করিলেন। কর্ণ যে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল; সে জন্য তাঁহাকে খুব ধিক্কার দিলেন। পাণ্ডবেরা যে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, সে জন্য পাণ্ডবদের খুব প্রশংসা করিলেন। শেষে দুর্য্যোধনকে বলিলেন, “এই কর্ণের বাহুবলে অর্জ্জুন-পরাজয়ের স্বপ্ন দেখিতেছ! তোমার মত অবোধ আর কে?

তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি সকল সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ণ বলিলেন, "কি! আমি কাপুরুষ! পাণ্ডবেরা চারি ভ্রাতায় দিগ্বিজয় করিয়াছিল, আমি একাই দিগ্বিজয় করিব. আর সমুদয় ধনরত্ন দুর্য্যোধনকে দিব।" দুর্য্যোধন তাহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বহু সৈন্য কর্ণকে দিলেন। তিনি নানাদেশ জয় করিয়া, বহুধনরত্ন আনিয়া অঙ্গরাজকে উপহার দিলেন। তখন পিতাপুত্রে ভাবিতে লাগিলেন, এহেন মহাবীর সভায় থাকিতে পাণ্ডব- পরাজয় অতি তুচ্ছ কথা।

এখন দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের রাজসূয় যজ্ঞের যশ অপহরণ করিবার মানসে মহাধুমধামে বৈষ্ণব যজ্ঞ করিলেন। দুষ্ট দুশাসন পাণ্ডবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে দূত পাঠাইলেন। ভীম উত্তর করিলেন, "আমরা একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবগণকে দেখিব।" যজ্ঞে সমাগত সকলেই সমস্বরে বলিতে লাগিল "পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞের তুলনায় ইহা বালকের খেলামাত্র।" আর রাজা দুর্য্যোধনের বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন, "পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এপর্য্যন্ত আর কেহই এরূপ যজ্ঞ করেন নাই, করিতে পারিবেন না।" তাহাতে অহঙ্কারী দুর্য্যোধন আরও অধিক অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন, ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

সাধে কি পণ্ডিতেরা বলেন, "মূর্খ মিত্র অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুও ভাল?"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

উত্তর চরিত

সপ্তম অঙ্ক

নাটকের মধ্যে নাটক। এ এক অপূর্ব্ব কৌশল। বাল্মীকিরামায়ণের কিয়দংশ লইয়া এই গর্ভনাটক বিরচিত। ভাগীরথীর তীরে নাটকের স্থান সন্নিবেশিত। রাম লক্ষ্মণ লবকুশ চন্দ্রকেতু এবং জনক কৌশল্যাদি সকলেই শ্রোতার আসনে উপবিষ্ট, স্বর্গের অপ্সর অপ্সরার পাত্র পাত্রীর অভিনয় করণে তৎপর। সে নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য দেবদৈত্য নরনারী সকলেই ব্যগ্র।

নেপথ্য হইতে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ভাগীরথী তীরে বিসর্জ্জিতা সীতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সীতা বলিতেছেন—"হা আর্য্যপুত্র, কুমার লক্ষ্মণ, বনের মধ্যে আসন্ন প্রসব-বেদনা একাকিনী অশরণা মন্দভাগিনীকে পাপাচার শ্বাপদের অভিলাষ করিতেছে। সেই হতভাগিনী আমি এখন ভাগীরথীর কাছে আপনাকে নিবেদন করিতেছি।"

সূত্রধার জানাইল—প্রাপ্ত প্রসববেদনা সীতা আপনাকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। অভিনয় দর্শনে রাম এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছেন, অভিনয়কে প্রকৃত ব্যাপার বলিয়াই মনে করিলেন।

উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দর্শনে সহৃদয় রসজ্ঞ শ্রোতার ও মধ্যে মধ্যে ভ্রম ঘটিয়া থাকে। রামের পক্ষে এ ভ্রান্তি স্বাভাবিক। গাঢ় তন্ময়তায় নাটক কখনও কখন নাটক বলিয়াই বোধ হয় না। গাঢ় ভাবনা-প্রকর্ষে স্মৃতিও প্রত্যক্ষ দর্শনাকারে পরিণতি লাভ করে। রাম উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেবি, ক্ষণেক অপেক্ষা কর। লক্ষ্মণ তুমি দেখ।" রামের হস্তপদ তখন অসাড়, ইন্দ্রিয় বিভ্রান্ত, চিত্ত বিমূঢ় তাই লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন।

লক্ষ্মণ তখন অশ্রুভার কোনমতে স্তম্ভিত করিয়া রামকে ধরিয়া বলিলেন—"আর্য্য এযে নাটক।" প্রথমাঙ্কে চিত্রদর্শন প্রস্তাবে সূর্পনখার চিত্র দেখিয়া সীতারও প্রকৃত সূর্পনখা বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তখন রামই বুঝাইয়া দেন,—"অয়ি বিরহভীতে। এযে চিত্র!"

তারপরই পৃথ্বী ভাগীরথী কর্ত্তৃক অবলম্বিতা সীতার করুণ ছবিখানি রঙ্গমঞ্চে ফুটিয়া উঠিল। পৃথ্বী ও ভাগীরথীর ক্রোড়ে সীতার দুইটী পুত্র পদ্ম কোরকের মত ভাসিয়া উঠিল। পৃথ্বী ও ভাগীরথী সীতাকে জানাইলেন—"জলের মধ্যে তাহার এই দুইটী দীর্ঘায়ু পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" সীতা ক্ষণেকের জন্য পুত্রদ্বয়ের মুখদর্শনে আশ্বস্তা হইয়াই "হা আর্য্যপুত্র" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। যাঁহার পুত্র তাঁহার ক্রোড়ে দিতে না পারায় সীতার যে কি দুঃখ, তাহা সীতাই তখন সুস্পষ্ট অনুভব করিলেন। ধরিত্রীর পরিচয় পাইয়া "মা" বলিয়া সীতা তাঁহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মা ভিন্ন সন্তানের দুঃখ কে বুঝিবে? পতিহারার অবলম্বন আর কে? অত বড় দুঃখেও মায়ের কোল পাইয়া কন্যা মুহূর্ত্তের জন্য আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন। জননী কন্যার কথা তুলিলেন। সীতার মনে আর্য্যপুত্রের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। "হা আর্য্যপুত্র তোমাকে মনে পড়িল" মায়ের সম্মুখেই এইকথা বলিয়া ফেলিলেন। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীরও কন্যার এ নিরভিমানতা এ আত্মসম্মানহীনতা এ তেজশূন্যতা সহ্য হইল না। "আঃ কে তোর আর্য্যপুত্র" বলিয়া বিরক্তিমিশ্রিত ব্যথা প্রকাশ করা জননীর পক্ষে স্বাভাবিক। সীতা মায়ের কাছে ভয়েই কাঁটা, লজ্জায় জড়সড়।

পুত্রমুখ দেখিয়া সীতা আনন্দিতা হইয়াও ঠিক উপভোগ করিতে পারিলেন না। অনাথার বাছাদের কে মানুষ করিবে? রঘুকুলকুমারদের ক্ষত্রিয় সংস্কারই বা কে করিবে—ভাবিয়া সীতা বড়ই আকুল হইয়া পড়িলেন, তখন করুণাদ্রবিতা ভাগীরথী সীতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "বৎসে তজ্জন্য ভাবনা নাই। স্তন্য ত্যাগের পর তোমার সুতদের ভার আমি বাল্মীকির করে সমর্পণ করিব। তিনিই এই শিশুদের যথোচিত ক্ষত্রিয় সংস্কার করিবেন। ভাগীরথী রঘুবংশের আমি জননী। রামচন্দ্রও তাই "রঘুকুল দেবতা" বলিয়া গঙ্গাদেবীকে অনুরোধ করেন,—শ্বশ্রূরিবাবমরুন্ধতীব সীতায়াং শিবানুষ্ঠান্ পরাং ভব।

জননী ধরিত্রীদেবীও সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে কহিলেন—"আমার পাতালগৃহ পবিত্র করিবে।" সীতাও তাই চাহে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তোমার অঙ্গে কেন আমায় বিলীন করিয়া নাওনা মা? আমি যে জীবলোক পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারিতেছি না। মাতার নিকট সীতার বড় দুঃখে মর্ম্মান্তিক লজ্জায় একথা কহিলেন। জীবনের পরিবর্ত্তন হইলেই জীবলোকের পরিবর্ত্তন বোধ হয়। মনের আনন্দ থাকিলেই জীবলোক আনন্দময় বলিয়া বোধ হয়, মনে দুঃখ থাকিলেই জীবলোক দুঃখময় হইয়া উঠে।

রামময় জীবিতা, বনযাত্রীর সঙ্গিনী সেই সীতা, আর নিন্দিত নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিতা এই অভাগিনী সীতা! ভাগীরথী সীতাকে লইয়া ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া গেলেন। গর্ভনাটকও শেষ হইল। সীতা বিসর্জ্জন কালে রামচন্দ্র অসহায়া সীতাকে দেখিবার ভার লইবার জন্য জননী ধরিত্রীদেবীকে অনুরোধ করেন—"সাত্বমবেক্ষস্ব জানকীমিতি ধরিত্রীদেবীও রামের সে অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

সীতা লোকান্তরে (পাতালও লোকান্তর) চলিয়া গেলেন—রাম এ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ তখন মর্ম্ম বেদনাবিস্ফুরে বাল্মীকিকে কহিলেন, "ভগবন্ রক্ষা করুন্। এই কি আপনার নাটকের উদ্দেশ্য? এই কি কাব্যকলার ফল? মহাপুরুষের আরব্ধ অনুষ্ঠানের ফল শুভ ব্যতীত অশুভ হয় না। রামের জীবনই যদি সংশয়িত হইল—তবে এ অপেক্ষা মন্দ ফল আর কি?

'সহসা গঙ্গাসলিল ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, তাহার মধ্য হইতে পৃথ্বী ভাগীরথী সহিতা সীতাদেবী উত্থিতা হইলেন। মূর্ত্তিমতী করুণা অসিয়া রঙ্গভূমি আলো করিলেন।

পৃথ্বী ভাগীরথী অরুন্ধতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন——"অরুন্ধতি জগদ্বন্দ্যো গঙ্গা পৃথ্বৌপৃষ্ঠে ভজবনৌ। অর্পিতেয়ং তবাভ্যাসে সীতা পুণ্যব্রতা বধূঃ।" জগতের বন্দনীয়া অরুন্ধতি,—"আমাদের অনুগ্রহ কর, পুণ্যব্রতা বধূ সীতাকে আমরা তোমার নিকট অর্পণ করিলাম।

রাম এখনও মূর্চ্ছিত। অরুন্ধতী সীতাকে অনুরোধ করিলেন—"বৎসে;—ত্বরা কর লজ্জা করিওনা, তোমার পানি স্পর্শদ্বারা আমার বৎস রামকে বাঁচাও"। সীতা সসম্ভ্রমে রামের নিকট গিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, 'আর্য্য পুত্র আশ্বস্ত হও'। তৃতীয়াঙ্কে তমসার অনুরোধেও ছায়ারূপিনী সীতাও একদিন এইরূপ পাণি স্পর্শে রামকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। অরুন্ধতী সীতাকে যে কি প্রকার ভাল বাসিতেন, তাঁহার চরিত্রগুণে যে কি প্রকার মুগ্ধা ছিলেন তাহা "বিশুদ্ধেরুৎকর্ষস্তুয়িতু মমভক্তিং জনয়তু" ইত্যাদি কথাতে পরিস্ফুট করিয়াছেন (৪র্থ অঙ্কে)।

তখন পৌরজনেরা সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। পৃথ্বী ভাগীরথী কর্ত্তৃক মৃদু মধুর ভর্ৎসনা প্রাপ্ত হইয়া পৌরজনেরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া গেল। অরুন্ধতীদেবী সকলকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ওহে পৌরজনগণ, গঙ্গা পৃথ্বী যাঁহাকে হাতে ধরিয়া আনিয়া দিলেন, অগ্নি যাঁহার পুণ্য চরিত্রের সাক্ষী রহিয়াছেন, প্রজাপতি সহিত দেববৃন্দ যাঁহার বিশুদ্ধতা খ্যাপন করিতেন, সেই দেবযোনিসম্ভবা সূর্য্যকুলবধূ সীতা পরিগৃহীতা হইবেন এবিষয়ে তোমরা কি মনে কর?

পৌরজনেরা আর কি মনে করিবে। তাঁহারা কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আর্য্যা সীতাদেবীকে বারংবার নমস্কার করিলেন।

কুশ লব জানিতে পারিল রামচন্দ্র তাহাদের পিতা, লক্ষণ কনিষ্ঠতাত; সীতাদেবী মাতা, রাজর্ষি জনক মাতামহ। বালকদিগের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি আর ধরে না। এই মিলনের সুখাবেশে—সকলের প্রাণে প্রীতির এবং শান্তির হিল্লোল খেলিতে লাগিল। মিলনের

নিবিড় আনন্দে উত্তর রামচরিত নাটকটি সার্থক হইয়া উঠিল। রামায়ণের এত বড় বিয়োগান্ত ব্যাপারটি মিলনান্ত করিয়া কবি আমাদের চক্ষুর উপর এক অভিনব সুন্দর দৃশ্য ফুটাইয়া দিলেন। সংস্কৃত নাটক বিয়োগান্ত করিবার বিধি নাই—বলিয়াই কবি ইহাকে মিলনান্ত নাটকে পরিণত করিয়াছেন—ইহা বলিলে কবি প্রতিভার অসম্মান করা হয়। সীতার মত সাধ্বী পতিগত প্রাণার সেই মর্ম্মান্তিক যাতনাই যদি না দূর হইল, হৃদয়ের সেই দৃঢ় নিখাত শল্য যদি না উন্মোচিত হইল তাহা হইলে সীতার সেই ভালবাসার কি মর্য্যাদা রক্ষা হইল? মহাপ্রাণ প্রজাবৎসল রামচন্দ্র যে এই দীর্ঘদ্বাদশবর্ষ দহ্যমান বনস্পতির মত অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন তাহারই বা কি পুরস্কার হইল? সেই সীতার চোখের জল শুকাইল না। রামের সেই পুট পাক প্রতীকাশ শোকের ব্যথা দূর হইল না ভাবিতে ও যে হৃদয়ে অনাস্থা জাগে, সংশয় ফুটিয়া উঠে! সংসারে পুণ্যের জয়, পুণ্যেই সুখ। ইহা না দেখাইলে লোকের মন আদর্শকে বরণীয় ভাবিবে কেন? এই সকল ভাবিয়াই ভবভূতি রাম সীতার মিলন দেখানই ভাল বলিয়া বুঝিলেন। লক্ষ্মণের মুখ দিয়াই কবি যেন তাঁহার হৃদয়ের ভাবটি প্রকাশ করিয়া দিলেন। "ভগবন্ এই কি আপনার কাব্যের অর্থ (প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য)।"

রাম সীতার মিলন কে না চাহে? সকলেই যাহা চাহে, কবি সকলের প্রতিনিধি স্বরূপে তাহা চাহিয়াছেন মাত্র এবং সেই রাম সীতার মিলনটি সমাধা করিবার পথও পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। পরিণামে রামসীতার মিলন দেখানই কবির উদ্দেশ্য বলিয়া তৃতীয়াঙ্কে ছায়াসীতার পরিকল্পনা আরও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়াঙ্কে রামের সে করুণ দুর্ব্বল অবস্থা দেখিয়া সীতার নিন্দিত নির্ব্বাসনজনিত কঠিন হৃদয়—কোমল হইয়া আসিয়াছিল। "হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি দেখিয়া আমার বাষ্প-দিগ্ধ চক্ষু অভিনন্দিত করিব।" রামের এই কথায় সীতার হৃদয় হইতে দৃঢ়-নিখাত শল্যটি উন্মোচিত হইয়াছিল বলিয়াই সীতা অচেতন রামকে স্পর্শ করিবামাত্র বলিতে পারিয়াছিলেন—"আশ্বাসিত হউন" আর্য্যপুত্র (সমাশ্বসতু আর্য্যপুত্র)। সতীত্বতেজে উদ্দীপ্তা সীতার আত্মসম্মানটি অক্ষুন্ন রাখিয়া সতীচরিত্রের বিশিষ্টতা এবং মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া কবি যেভাবে মিলনটি সম্পন্ন করিলেন, তাহা তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী,
কাঁটালপাড়া চতুষ্পাঠী।

আগমনী

শান্তি! শান্তি! শান্তি!
অমৃত পরশে প্রাণে আকাশের শ্যামকান্তি!
আকাশের শান্তিনীরে ডুবি' কারা স্থিরদেশে
আনন্দের ফোটা' মুখে চেয়ে রয় অনিমেষে!
নীল-নীল-স্থিরতার শান্ত নীলজল
ছায়ামেঘ-পুরী আছে নিত্য সেই নীল অন্তরল!

কবি, আজি স্থির বস' আপন মন্দিরে
সকল দরজা দিয়ে কিবা আসে, ধর তারে স্থিরে
আসিছে দৃষ্টির পথ ধরি'
নীলাম্বর গলি' যেন শুভ্ররঙ্গে আসিছে উত্তরি'।
আসিছে শ্রুতির পথে পুনঃ
কোলাহল থামাইয়া যুক্তমনে শুন' ওরে শুন'
আসিছে পরশ পথে স্থিরে
জামাজোড়া ছাড়ি আজ ধর' তারে নগন শরীরে!

সে যে আসে, অভিমুখে নিত্য কাল আসে!
শুধু ওই নিত্য ঢেউ নিত্যরসে পশে হিয়া বাসে!
হৃদয় কলসী লহ ভরি
জীবনে নবীন জন্ম নবীন মরণে লহ বরি'
ব্যক্তগুপ্ত আগমেরে ধর বক্ষে, ধর স্থির পথে—
ঢাকার অন্তরে ঢাকা' আগমনী মহাকাশ হতে!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।



ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা।

তিন আইন বর্জ্জিত ব্রাহ্ম বিবাহের কথা উঠিলেই কেহ কেহ বলেন যে আমরা ত তিন আইনের গোঁড়া নহি; আমরা চাহি যে বিবাহ বৈধ হয়। রেজেষ্ট্রি না করিলে বিবাহ বৈধ হইবে না, আমরা ত অবৈধ বিবাহ প্রশ্রয় দিতে পারি না। বিবাহ বৈধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তিন আইন স্বীকার করিতে হয়; ব্রাহ্মবিবাহবিধি পাশ হইলে তিন আইন বর্জ্জন করিতে আমাদের কোন আপত্তি হইবে না। কিন্তু যতদিন ব্রাহ্মবিবাহবিধি পাশ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তিন-আইন বর্জ্জন করায়. সম্মতি দিতে পারি না।

ইঁহারা অবশ্য সমাজের মঙ্গলের জন্যই এরূপ কথা বলেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই, কিন্তু ইঁহাদের আশঙ্কা যে অমূলক তাহা অল্প আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধর্ম্মবিধি ও আইনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মবিধিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যথার্থই সেরূপ কোন বিরোধ উপস্থিত হইতেছে না। রেজিষ্ট্রী করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ বৈধ হয়, কিন্তু তিন আইন বর্জ্জন করিলেই ব্রাহ্ম বিবাহ অবৈধ হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই।

ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ মূলসূত্র আবৃত্তি করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

(১) প্রথম সূত্র:—নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সামাজিক শাখার উৎপত্তি হিন্দু সমাজের একটি প্রধান লক্ষণ।

Sir James Stephen (ভারত গবর্ণমেণ্টের আইন সদস্য) বলিয়াছেন:—

"......The facility with which new sects form themselves, establish customs of their own adapted to the varying requirements of the time and the country, and yet continue in some sense or other to be, and to be considered as Hindus, is one of the most characteristic features of Hinduism. English law is the very antithesis to this." (১)

অনুবাদ:—"সহজে নূতন নূতন সম্প্রদায় ও শাখার সৃষ্টি হয়, কাল ও স্থানোপযোগী নূতন নূতন প্রথার উৎপত্তি ঘটে, অথচ এ সমস্তই কোন না কোন অর্থে হিন্দু নামে অভিহিত হইতে থাকে—ইহা হিন্দু সভ্যতার একটি নিজস্ব লক্ষণ। ইংলণ্ডের আইন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

বিখ্যাত আইনজ্ঞ পণ্ডিত Sir Sankaran Nair মাদ্রাজ হাইকোর্টের একটি রায়ের মধ্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন:—

"This tendency to divide into sects or divisions to form new sects with their own religious and social observances is a characteristic feature of Hinduism and in my opinion it is not for the Courts to interfere with it.

(১) Speech on the Special Marriage Bill, Gazette of India, Jan. 27. 1872 pp. 79-80.

If a community have consciously accepted different religious ideas and rites, it is not for the Courts to insist upon their adherance to their abandoned ideas." * * * "Most of these sects arose within a recent date, some of them within the last century. The Brahmo Samaj became a definite sect only about 1830." (২)

অনুবাদ :—"নূতন নূতন দলে বিভক্ত হইয়া নূতন নূতন সামাজিক আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মবিধি দ্বারা নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি হওয়া হিন্দুসমাজের একটি বিশেষ লক্ষণ। আমার মতে ইহাতে বাধা দেওয়া আদালতের পক্ষে সমীচীন নহে। যদি কোনও নূতন সমাজ ইচ্ছা করিয়া নূতন ধর্ম্মমত ও আচার গ্রহণ করে তবে আদালত হইতে তাহাকে পুরাতন পরিত্যক্ত আদর্শ স্বীকার করিতে বাধ্য করা উচিত হইবে না। * * * এইরূপ নূতন সমাজগুলি অধিকাংশই সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব মাত্র ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি হইয়া থাকিবে।"

Census Report হইতেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের Census Reportএর পাতা উলটাইয়া দেখিতে পাই,—

"It is reported that a new sect called Satima······has recently sprung up in Murshidabad." (p. 241).

"A small Vaishnava sect has recently appeared in Nadia, which is known as Kalachandi." (p. 241).

"The sect······known as Radhaswami, the founder of which was Siva Dayal Singh of Agra who died in 1878" (p. 237).

"One sect···was established by Shivnarayan Paramhamsa of Ghazipur who came to Bengal about 20 or 25 years ago." (p. 237).

"A new sect called Shains is said to have sprung up in Bankura within the last few years." (p. 242).

"The Satnami sect of Sambalpur was founded betweed 1820 & 1833 A. D." (p. 243).

"A recent Oriya sect, only 10 or 15 years old" (p. 244) (৩)

ভাবার্থ :—"মুর্শিদাবাদে "সতিমা" ও নদীয়ার "কালাচাঁদি" সম্প্রদায় সম্প্রতি দেখা দিয়াছে। ···"রাধাশ্যামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শিবদয়াল সিংহ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।......২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে শিব নারায়ণ পরমহংস একটী নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঁকুড়ার "সাঁই" নামে একটী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।···"সৎনামী" সম্প্রদায় ১৮২০—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।···উড়িষ্যায় ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে একটী নূতন সম্প্রদায় দেখা দিয়াছে।" ইত্যাদি।

আর উদাহরণ দিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা সকলেই জানি যে ভারতবর্ষে এখনও নূতন নূতন সম্প্রদায় ও নূতন নূতন সমাজ স্থাপিত হইতেছে। (৪)

(২) 33 Madras (1909) p. 352.

(৩) Census of India. 1911, Vol. V. Part I, Ch. IX.

(৪) ব্রজসুন্দর মিত্র ও রাজনারায়ণ বসুও একথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে সে কথা বলিয়াছি।

(২) দ্বিতীয় সূত্র :—এই সকল নূতন সমাজ সম্বন্ধে সনাতন হিন্দুবিধি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।

Sir Sankaran Nair বলিতেছেন :—

"To these communities it is impossible to apply a marriage law which is based on the immutability of castes and on ordinances which proscribe many of their most cherished practices,...and if according to the usages of the community a marriage is valid, then in the absence of any statutory prohibition, I fail to see why it should not be recognised as valid, even without the requisites of a valid custom in derogation of what may be styled the ordinary Hindu Law unless it offends against rules which would render any other marriage invalid." (৫)

ভাবার্থ :—"এই ধরণের নূতন সমাজগুলি সম্বন্ধে তাহাদের আদর্শ বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানাদি এবং জাতিভেদ প্রভৃতি সনাতন বিবাহ বিধি প্রয়োগ করা অসম্ভব। যদি কোনও সমাজে নিজেদের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহ বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত হয়, এবং এরূপ বিবাহ যদি লিপিবদ্ধ কোন আইনবিরুদ্ধ না হয় অথবা এরূপ নীতিবিরুদ্ধ না হয়, যাহাতে অন্য যে কোন বিবাহই নিষিদ্ধ হইতে পারে, তবে সনাতন বিধি অথবা সনাতন প্রথা ব্যতিরেকেও এই সকল বিবাহ কেন বৈধ বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে না তাহা আমি জানি না।"

Sir James Stephen ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"It is possible to affirm in general, that the mere fact that a Hindu sect is of recent origin and the fact that it has adopted forms of celebrating marriages differing from those commonly in use, are not sufficient to prevent such marriages from being held valid by Hindu Law as interpreted and administered by our Courts." (৬)

ভাবার্থ :—"সাধারণ ভাবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে, কোনও নূতন সমাজ অল্পদিন হইল গঠিত হইয়াছে অথবা প্রচলিত প্রথা হইতে বিভিন্ন বিবাহ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে, আদালতের দ্বারা এই প্রকার বিবাহকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট বাধা নহে।"

Sir James আরও লিখিয়াছেন :—

"......I hope that any Court in India would hesitate long, and look cautiously at the possible consequences of their decision, before they decided that a marriage was void, merely because it was celebrated according to the rites of a Hindu sect of recent origin. Surely it would be monstrous to deprive the Hindu religion, by judicial decisions, of what has hitherto been its most characteristic feature—its power of adapting itself to circumstances".

ভাবার্থ :—"আমি আশা করি, কোন নূতন সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই কোন বিবাহকে অসিদ্ধ বলিবার পূর্ব্বে যে কোন আদালত যথেষ্ট চিন্তা করিবেন ও এরূপ নিষ্পত্তির ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ

(৫) 33 Madras (1909 p.) 350.

(৬) Gazette of India, Supplement, Jan. 27, 1872 p. 79.

সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া দেখিবেন। নূতন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার যে শক্তি হিন্দু সমাজের মধ্যে আছে, আদালতের নিষ্পত্তি দ্বারা তাহার সে শক্তি অপহরণ করা অতীব অন্যায় হইবে।"

Sir Gurudas Banerji লিখিয়াছেন :—

"There is nothing in justice, equity and good conscience, which should necessarily invalidate a form of marriage, merely because it is new, and differs from the old and ordinary form, when such new form is recognised *by a considerable body of persons*" (৭)

অনুবাদ :—"যদি কোন নূতন বিবাহ পদ্ধতি বহু সংখ্যক লোকের দ্বারা স্বীকৃত হয় তবে এই পদ্ধতি নূতন বলিয়াই এবং পুরাতন পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই অবৈধ হইবে বিচারবুদ্ধি ন্যায়বুদ্ধি বা বিবেকবুদ্ধিতে এরূপ কথা বলে না।"

(৩) তৃতীয় সূত্র :—নূতন সমাজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য বিধি।

নূতন সমাজগুলি সম্বন্ধে যে পুরাতন বিধি খাটিতে পারে না, তাহা আমরা দেখিলাম। নূতন সমাজগুলি সম্বন্ধে কি তবে কোন বিধিই খাটিবে না? তাহা নহে। নূতন সমাজ-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা বিচার করিবার জন্য কয়েকটি সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে।

Sir James Stephen বলিয়াছেন :—

"If a considerable body of men, bound together by a common name, appeared in the habit of celebrating marriages according to forms and on terms unobjectionable in themselves, the Courts ought to hold such marriages as valid·· ······the fixity of the sect, the propriety of its forms, and the propriety of its term, would all have to be considered by the courts." (৮)

ভাবার্থ :—"যদি অনেক লোক এক নামে সমাজবদ্ধভাবে নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে আপত্তিজনক নহে এরূপ সর্ত্তে বিবাহ করিতে থাকে তবে এ সকল বিবাহকে আদালতের পক্ষে বৈধ বলিয়া গণ্য করা উচিত। অবশ্য নূতন সমাজের স্থিরতা, বিবাহ পদ্ধতির শোভনীয়তা ও বিবাহ সর্ত্তের আপত্তিশূন্যতা এ সমস্তই আদালতের দ্বারা বিচারিত হইবে।"

Sir Sankaran Nair বলিয়াছেন :—

"......If according to the usages of a community a marriage is valid, then in the absence of statutory prohibitions, I fail to see why it should not be recognised as valid—unless it offends against rules which would render any other marriage invalid." (৯)

Sir Gurudas Banerji লিখিয়াছেন :—

"Cases involving questions as to the validity of the form of

---

(৭) Hindu Law of Marriage and Stridhan 4th Edition, p. 104.

(৮) Gazette of India. Supplement Jan, 27. 1872.

(৯) 33 Madras (1909) p. 350 (পূর্ব্বে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে)

marriage among Progressive Brahmos, not being expressly provided for, must be determined according to justice, equity and good conscience,··· the form must be a definite and well-recognised one, to prevent all chance of confusion between marriage and concubinage; and it must be such as to prevent the contracting of hasty and inconsiderate unions. If these conditions are fulfilled and the terms of the contract are unobjectionable it would seem that the requirements of justice, equity and good conscience would be satisfied." (১০)

ভাবার্থ:—"উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিধি না থাকায়, ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা, বিচারবুদ্ধি ন্যায়বুদ্ধি ও বিবেকবুদ্ধি অনুসারে স্থির করিতে হইবে।......যথার্থ বিবাহ ও রক্ষিতা-অবস্থার মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করিবার জন্য বিবাহ পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট ও সুপরিচিত হওয়া আবশ্যক; সব দিক বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ যাহাতে বিবাহ না হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা থাকাও আবশ্যক। এই প্রকার বিবাহের সর্ত্তগুলি যদি আপত্তিজনক না হয় তবে বিচারবুদ্ধি ন্যায়বুদ্ধি ও বিবেকবুদ্ধি সন্তুষ্ট হইবে বলা যাইতে পারে।"

Sir Charles Trevelyan তাঁহার Hindu Law নামক পুস্তকেও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন সদাচার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন:—

"The conclusion, therefore, is that such customs or usages wherever they exist must be tolerated and recognised in the administration of justice ......Their Lordships of the Privy Council have laid down in the case of Collector of Madura vs. Mootoo Ramalinga that under the Hindu systen of law, clear proof of usage will outweigh the written text of law. (১১)

(৪) ভাবার্থ:—"সিদ্ধান্ত হইল যে, যে কোন প্রথা প্রচলিত থাকে তাহা বিচার ও আইন সম্বন্ধে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।...প্রিভিকাউন্সিলের মাননীয় বিচারকগণ একটি রায়ের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—হিন্দুবিধি অনুসারে প্রচলিত প্রথা লিখিত শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বিবেচিত হইবে।"

যাহা হউক পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে আমরা বিবাহের বৈধতা বিচারের জন্য নিম্নলিখিত আটটি মূল নিয়ম পাইতেছি।

বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে আটটি মূল নিয়ম।

(১) "*Fixity of the sect* :—নূতন সমাজ বা সম্প্রদায়ের স্থিরতা।

(২) *Stability of the marriage ceremony* :—বিবাহ পদ্ধতির স্থিরতা; হঠাৎ কোন একটি নূতন পদ্ধতিকে সুপরিচিত পদ্ধতি বলা যায় না।

(৩) "*Definite character of the marriage ceremony—to prevent confusion between marriage and concubinage* : বিবাহ-পদ্ধতির সুনির্দ্দিষ্টতা যাহাতে বিবাহ এবং রক্ষিতা-অবস্থার মধ্যে প্রভেদ স্পষ্টরূপে নির্ণয় হইতে পারে অর্থাৎ বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে এমন কিছু থাকা আবশ্যক যাহাতে বুঝা যায় যে ইহা যথার্থ বিবাহ।

---

(১০) Hindu Law of Marriage and Stridhan, P. 276.

(১১) Tagore Law Lectures on Hindu Jurisprudence p. 19.

(৪) *Propriety of the form of marriage* :—বিবাহ-পদ্ধতির শোভনীয়তা।

(৫) *Propriety of the terms of marriage—not offending against rules which would render any other marriage invalid—in accordance with justice equity and good conscience* :—বিবাহ সর্ত্তগুলির অনিন্দনীয়তা। এমন কোন সর্ত্ত থাকিবে না যাহা নীতিবিরুদ্ধ অথবা বিচার-বুদ্ধি, ন্যায়-বুদ্ধি ও বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত।

(৬) *Absence of statutory prohibitions* :—রাজ-নিয়ম বিরোধী হইবে না। আইন দ্বারা স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ বিবাহ সামাজিক প্রথা দ্বারা বৈধ হইতে পারে না।

(৭) *Recognition of validity by the sect or community* সমাজ অথবা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিবাহ বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ নূতন পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহকে সমাজের পক্ষে গ্রহণ করা আবশ্যক।

(৮) *Recognition of validity by society at large* :— দেশীয় সমাজ কর্ত্তৃক বিবাহ বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে ইহা সর্ব্বত্র একান্ত আবশ্যক নহে।

উপরোক্ত আটটি নিয়ম বজায় থাকিলে বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আইনজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ নাই।

কাউই সাহেব যখন বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করেন তখন ব্রাহ্ম বিবাহে ঐ আটটি নিয়ম বজায় ছিল বলা যায় না।

(১) *Fixity of the sect* : ব্রাহ্মসমাজের স্থিরতা :—

কাউই সাহেবের নিকট অভিমত চাওয়া হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষে; কাউই সাহেব তাঁহার অভিমত প্রকাশ করেন ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। (১২)

এই সময়কার কার্য্য বিবরণীতে দেখিতে পাই, "গত বৎসর বৈশাখ মাসে সভ্য সংখ্যা ৫৯ জন ছিল বর্ত্তমান বৈশাখে (১৭৮৮ শক, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) তাহা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া ৯৮ হইয়াছে। গত বর্ষে যাঁহারা সভ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থাননিবাসী। এ বৎসর যাঁহারা সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, তাঁহারা বিবিধ স্থানে বাস করেন।" (১৩)

ইহার দুই বৎসর পরে মেইন্ সাহেবও ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন "had convinced himself that the creed of the Brahmos lacked stability" (১৪)

এই সময় ব্রাহ্ম সমাজে ধর্ম্ম ও সমাজবিষয়ক মতভেদ লইয়া প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল, ফলে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু যে সময় কাউই সাহেব স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন (অর্থাৎ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাবে) ভারতবর্ষীয়

(১২) আচার্য্য কেশবচন্দ্র মধ্য বিবরণ, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

(১৩) আচার্য্য কেশবচন্দ্র মধ্য বিবরণ ৬৩ পৃষ্ঠা।

(১৪) Gazette of India, Supplement, Sept. 19, 1868.

"তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থিরতা নাই।"

ব্রাহ্মসমাজ তখনও যথাবিধি স্থাপিত হয় নাই। এইরূপ আন্দোলন ও বিচ্ছেদের সময় ব্রাহ্ম সমাজের স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এই সময়কার Census Reportএও ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইত না। অতএব সে সময়কার অবস্থা আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে তখনও ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটী recognised religion বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই, অর্থাৎ প্রথম মূলনিয়মটি তখনও ব্রাহ্ম বিবাহ সম্বন্ধে খাটে নাই।

(২) *Stability of the marriage ceremony* : বিবাহ পদ্ধতির স্থিরতা :—

কাউই সাহেব যে সময় মত প্রকাশ করেন অর্থাৎ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় মাত্র নয়টি ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে চারটি বিবাহ ঠাকুর পরিবারের মধ্যে; অর্থাৎ ঠাকুরপরিবার বাদ দিলে মাত্র পাঁচটি বিবাহ তখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং তাহার মধ্যে মাত্র দুইটি অসবর্ণ বিবাহ। (১৫)

এই সময়ে বিবাহপদ্ধতির মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্রাহ্ম বিবাহ হয়। মিস কলেট লিখিয়াছেন :—"But in 1864 two more Brahmo marriages were celebrated; in which some slight modernizations of the service were introduced, and the second of these marriages was a daring innovation upon the rules of Hindu caste and precedent." (১৬)

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আবার দেখি "another intermarriage was celebrated with greatly improved ritual" (১৬)

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম বিবাহ পদ্ধতির সম্পূর্ণ স্থিরতা ঘটে নাই; অতএব দ্বিতীয় নিয়মটিও ব্রাহ্ম বিবাহ সম্বন্ধে খাটিল না।

(৩) (৪) (৫) ও (৬) সম্বন্ধে অবশ্য কিছু বলিবার নাই। ব্রাহ্ম বিবাহপদ্ধতির সুনির্দ্দিষ্টতা ও শোভনীয়তা এবং বিবাহসর্ত্তের অনিন্দনীয়তা পূর্ব্বাপর সমান অক্ষুন্ন আছে। আইনের কোন নিষিদ্ধিও এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই।

(৭) ব্রাহ্ম বিবাহ তখন ব্রাহ্ম-সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ তখন এতই ক্ষুদ্র পরিসর ছিল যে এই স্বীকৃতির গুরুত্ব খুব অধিক ছিল না।

(৮) বিশেষতঃ সনাতন হিন্দুসমাজ তখন ব্রাহ্ম বিবাহকে কোন মতেই গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রমাণ উপস্থিত করিবার আবশ্যকতা নাই, সকলেই তাহা জানেন। মিস্ কলেটের Brahmo Year Book 1879 ১২—১৩ ও ২৪ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

যাহা হউক এইরূপ অবস্থার মধ্যে কাউই সাহেবের বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়া থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কাউই সাহেব বলিলেন ব্রাহ্মবিবাহ "not conforming to the usages

(১৫) Miss Collet, Brahmo Year Book 1879 pp. 40--41.

(১৬) Brahmo Year Book, 1879 p. 11.

of any recognised religion were invalid"—recognised religion (প্রচলিত ধর্ম্ম) কথাটির ব্যবহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে ১ম, ২য় ও ৮ম নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায় কাউই সাহেব ব্রাহ্মধর্ম্মকে "recognised religion" আখ্যা দিতে পারেন নাই। অতএব কাউই সাহেবের বিরুদ্ধমত পূর্ব্বোক্ত মূলনিয়ম অনুযায়ী হয় অর্থাৎ কাউই সাহেবের বিরুদ্ধমতের সহিত পূর্ব্বোক্তনিয়মের কোন বিরোধ নাই। এই আলোচনার দ্বারা আমরা মূল নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে অধিকতর নিশ্চিত হইতে পারিতেছি।

এইবার আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রাহ্ম-বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মূলনিয়ম গুলির আলোচনা করিব। আলোচনার ফলে দেখা যাইবে যে

বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মবিবাহে আটটি নিয়মই বজায় আছে।

(১) *Fixity of the sect* :—১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে উপর্য্যুপরি পাঁচটি Census Reportএ ব্রাহ্মেরা স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যাও এক্ষণে অনেক সহস্রের উপর। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ ও ব্যবসা বিভাগের একখানি পত্র দ্বারা ব্রাহ্মদিগের জন্য মাঘোৎসব উপলক্ষে স্বতন্ত্র ছুটির ব্যবস্থা হইয়াছে। (১৭)

বস্তুত গবর্ণমেণ্ট নিজেই এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজকে স্বতন্ত্র সমাজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; ব্রাহ্মসমাজের স্থিরতা সম্বন্ধে এক্ষণে আর কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না।

(2) *Stability of the marriage ceremony* : বিবাহ পদ্ধতির স্থিরতা :—

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত ৫০ বৎসরের উপর ব্রাহ্ম বিবাহপদ্ধতির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিবাহপদ্ধতির স্থিরতা সম্বন্ধেও আজ আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

(৩) ও (৪) বিবাহপদ্ধতির শোভনীয়তা ও সুনির্দ্দিষ্টতা সর্ব্ববাদীসম্মত, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

(৫) বিবাহ সর্ত্তের অনিন্দনীয়তা আদালতের দ্বারাও গ্রাহ্য হইয়াছে। Mr. Justice Russell বোম্বাই হাইকোর্টের একটি রায়ের মধ্যে বলিয়াছেন:—"there can be no question that the tenets of the Progressive Brahmos are in favour of monogamy for the purposes of marriage * * * * the essentials necessary for a valid marriage according to the tenets of this sect are that 'no man shall have more than one wife and no woman shall have more than one husband' and further polygamy and polyandry are strictly interdicted and monogamy enjoined * * * this sect holds marriage to be more than a civil contract; it holds it to be a sacred and indissoluble tie" (১৮)

(১৭) Govt. of India, Dept. of Finance and Commerce No. 607 dated 30th April. 1880......"allow Brahmo officials to absent themselves from their duties on the 11th day of Magh...'

(১৮) 33 Bom. 579 (1903).

(৬) *Absence of statutory prohibitions*—ব্রাহ্মবিবাহের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা আইনবিরুদ্ধ।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তিন আইন পাশ হইবার পর হইতে তিন আইন অনুসারে রেজিষ্টি করা কি ব্রাহ্মবিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায় নাই? কিন্তু আমরা দেখাইব যে

তিন আইন ব্রাহ্মবিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গ নহে

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আচার্য্য কেশবচন্দ্র তিন আইনকে মাত্র "অবান্তর অঙ্গরূপে" স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিন আইন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে পুস্তিকা প্রকাশিত করেন তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে:—

"The Bill is entirely of a permissive character. It seeks to legalise marriages between Brahmos when solemnized in accordance with the provisions of this act, but it does not say that such marriages would be illegal if otherwise solemnized".

ভাবার্থ:—"এই আইন গ্রহণ করা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়ত্ত। এই আইন গ্রহণ করিলে বিবাহ কি প্রকারে বৈধ হইবে তাহাই ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই আইন গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ অসিদ্ধ হইবে এরূপ কোন কথা ইহার মধ্যে নাই"।

সাধারণতঃ বিবাহবিধিগুলি অবশ্যকর্ত্তব্য (compulsory) বিধিরূপেই পাশ হইয়া থাকে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে "পার্শী বিবাহ-বিধি" (১৯) ও ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের "ক্রিশ্চান বিবাহ-বিধির" (২০) মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে এই সকল বিধি অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু তিন আইনের মধ্যে শুধু যে এরূপ কিছু উল্লেখ নাই তাহাই নহে, বরঞ্চ ১৯ সংখ্যক ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে তিন আইন সর্ব্বত্র অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবার আবশ্যকতা নাই। এই ধারাটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

"Section 19. Nothing in this act contained shall affect the validity of any marriage not solemnized under its provisions; nor shall this act be deemed directly or indirectly to affect the validity of any mode of contracting marriage; but, if the validity of any such mode shall hereafter come into question before any Court, such question shall be decided as if this act had not been passed."

---

(১৯) Act XV of 1865 (Parsee Marriage and Divorce) Sections 2, 4......"and every marriage contrary to the provisions of this section shall be void."

(২০) Act XV of 1872 (the Indian Christian Marriage Act) Section 4:—.

"Every marriage between persons, one or both of whom is or are a Christian, or Christians shall be solemnised in accordance with the provisions of the next following section; and any such marriage solemnised otherwise than in accordance with such provisions shall be void."

তিন আইনের ১৭শ ধারা

"এই আইনের কোন ব্যবস্থা দ্বারা এই আইন অনুসারে সম্পন্ন হয় নাই এইরূপ কোন বিবাহের বৈধতা কোন মতেই বাধা প্রাপ্ত হইবে না। এই আইনের দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ-ভাবে অন্য কোনও পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে বাধা ঘটিবে না; পরন্তু, ভবিষ্যতে অন্য পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে আদালতে যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তবে সেই প্রশ্ন বিচার করিবার সময় আদালতকে ধরিয়া লইতে হইবে যে এই আইন আদৌ কখনও পাশ হয় নাই।"

ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে?

তিন আইন পাশ হইবার পরেও ব্রাহ্মেরা ইহাকে কখনো অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠাকুর পরিবারের বিবাহগুলি বাদ দিলেও তিন আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রি হয় নাই এইরূপ বিবাহের সংখ্যা পঞ্চাশটির উপর হইবে। পরিশিষ্টে এই সকল বিবাহের একটি তালিকা দিয়াছি। বলা বাহুল্য এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে; সম্ভবত আরও অনেক ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াছে যাহাতে রেজিষ্ট্রি হয় নাই, কিন্তু তাহার খবর আমি পাই নাই।

(৭) ব্রাহ্ম সমাজ যে এই সকল বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কয়েকটি উদাহরণ দিলেই কথাটি স্পষ্ট বুঝা যাইবে। নিম্নলিখিত ব্রাহ্ম বিবাহের কোনটিতেই রেজিষ্ট্রি হয় নাই।

(১) গুরুচরণ মহলানবিশ:—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক (২ বৎসর) ধনাধ্যক্ষ (২৭ বৎসর) সভাপতি (২ বৎসর) ট্রাষ্টি ও আচার্য্যের কাজ করিয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্র; প্রথম পুত্র সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ধনাধ্যক্ষ (৫ বৎসর) ও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন; এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম ট্রাষ্টিও আছেন। দ্বিতীয় পুত্র প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশ কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদকরূপে ৫ বৎসর কার্য্য করিয়াছেন এবং এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ধনাধ্যক্ষরূপে কার্য্য করিতেছেন।

(২) উমেশচন্দ্র দত্ত:—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক (৫ বৎসর), সভাপতি (২ বৎসর) ট্রাষ্টি ও আচার্য্য এবং সিটি কলেজের প্রিন্সিপালের কার্য্য ২৬ বৎসর ধরিয়া করিয়াছেন। ইঁহার পুত্র ও কন্যাগণ সকলেই ব্রাহ্ম সমাজের গণ্যমান্য সভ্যরূপে বিবেচিত হইয়াছেন।

(৩) নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জি:—ভাগলপুরের ব্রাহ্ম সমাজের নেতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার পুত্র ও কন্যারা ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাবান সভ্য।

(৪) রামপ্রসাদ সেন:—ইঁহার পুত্র অতুলপ্রসাদ সেন লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রধান নেতা।

(৫) বিপিনবিহারী রায়:—ইঁহার পুত্র বিনোদবিহারী রায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত সাধনাশ্রমের অন্যতম কর্ম্মী।

(৬) নবীনচন্দ্র রায়:—পঞ্জাব ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ছিলেন। ইঁহার কন্যা হেমন্তকুমারী দেবী ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রথিতনামা কর্ম্মী।

(৭) কুঞ্জলাল ঘোষ:—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদকরূপে (২ বৎসর) কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে সাধনাশ্রমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন।

(৮) নীলকান্ত সিদ্ধান্ত:—ইঁহার পুত্র নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্যরূপে কার্য্য করিয়াছেন।

(৯) ভবসিন্ধু দত্ত :—ইনি সম্প্রতি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে কার্য্য করিতেছেন।

(১০) মন্মথনাথ দাশগুপ্ত :—সাধনাশ্রমের অন্যতম কর্ম্মী ; খাসিয়া মিশনের ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত ছিল।

(১১) প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ :—ইনি দুই বৎসর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছেন।

এ স্থলে একটি কথা পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। তিন আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে যে সকল বিবাহ হইয়াছিল তিন আইনে সে সকল বিবাহও রেজিষ্ট্রি করিবার ব্যবস্থা করা হয়। তিন আইনের ২০শ ধারায় ছিল :—

Section 20. All persons who have heretofore contracted marriages in the presence of at least two witnesses, according to any form whatever, may at any time, previous to the first day of January, 1873, have such marriages registered under this act, and such marriages shall thereupon be deemed to be and to have been as valid as if they had been contracted and solemnized under this act."

কিন্তু অনেক ব্রাহ্মই পরে রেজিষ্ট্রি করিতে সম্মত হইলেন না। মিস্ কলেট্ লিখিয়াছেন :—"Of 39 marriages before the act, only 21 were retrospectively registered (according to section 20)." (২১)

যাঁহারা মনে করেন রেজিষ্ট্রি না হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ অসিদ্ধ তাঁহাদের মতে বিবাহ তিন আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে হইয়াছে কি না তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কারণ পূর্ব্বে হইয়া থাকিলেও ২০শ ধারা অনুসারে তাহা রেজিষ্ট্রি করা যাইতে পারিত এবং রেজেষ্ট্রি করা না হইয়া থাকিলে, তাঁহাদের মতে তাহা অসিদ্ধ।

সার গুরুদাস ব্যানার্জি

লিখিয়াছেন যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের জন্য বিশেষ কোন বিধি নাই ; অর্থাৎ তিনি তিন আইনকে ব্রাহ্মদিগের জন্য অবশ্যকর্ত্তব্য বিধি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। (২২)

ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইবার একদিন দুইদিন অথবা এমন কি এক সপ্তাহ পরে তিন আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রি হইল এরূপ দেখা গিয়াছে। আবার রেজিষ্ট্রি করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইবার একসপ্তাহ পরে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইল এরূপও দেখা গিয়াছে। ব্রাহ্মপদ্ধতির মধ্যে তিন আইনের কোন উল্লেখমাত্র নাই। তিন আইনের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মপদ্ধতির কোন উল্লেখ নাই। অতএব তিন আইনকে কোনমতেই ব্রাহ্মপদ্ধতির অঙ্গ বলা যাইতে পারে না। বস্তুত তিন আইনের

(২১) Brahmo Year Book, 1879, p. 64.

(২২) "...the validity of the form of marriage among Progressive Brahmos, not being expressly provided for... (Hindu Law of Marriage and Stridhan. p. 276).

সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের তথা কোন ধর্ম্মের আদৌ কোন সম্বন্ধ নাই; তিন আইন সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত সিভিল বিবাহ বিধি মাত্র।*

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মসমাজ কখনও তিন আইনকে বিবাহ অনুষ্ঠানের অবশ্য কর্ত্তব্য অঙ্গ বলিয়া মনে করেন নাই বা অন্য কেহও করে নাই।

(৮) *Recognition by Society at large* : দেশীয় সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃতি :—

আজকাল দেশের অবস্থার সম্যক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে সনাতন সমাজের বিরুদ্ধভাব লোপ পাইয়াছে; ব্রাহ্মদিগের সহিত সকলেরই সহজ সামাজিক আদান প্রদান চলিতেছে। দেশীয় সমাজ ব্রাহ্ম বিবাহকে আজকাল সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করিয়া থাকেন।†

আমরা দেখিতেছি যে বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্ম বিবাহ সম্বন্ধে আটটি মূল নিয়মের একটিরও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না, অতএব

আটটি মূল নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

আইন সম্বন্ধে আরও দু একটি কথা।

আমাদের দেশে প্রচলিত প্রথাই যে বিবাহের বৈধতার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তিন আইন আন্দোলনের সময় ব্রজসুন্দর মিত্র ও রাজনারায়ণ বসু এ কথা বারংবার বলিয়াছিলেন। সত্যসত্যই আমাদের দেশে যাহা শিষ্ট-জন-অনুমোদিত তাহাই সিদ্ধ।

Ratanlal and Thakore তাঁহাদের "The Law of Crimes" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিয়াছেন (১৯১০এর সংস্করণ, ১০১৪ পৃষ্ঠা) :—

* কিছুদিন যাবৎ ব্রাহ্মপদ্ধতি ও তিন আইন এক সঙ্গে হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমরা এই দুইটিকে একই অনুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া ভুল করিতেছি। অনেক স্থলে রেজিষ্ট্রার নিজেই ব্রাহ্ম, তিনিও ধর্ম্মবন্ধুগণের মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন; বস্তুত রেজিষ্ট্রার হিসাবে ব্রাহ্মপদ্ধতির সহিত তাঁহার যে কোন সম্পর্ক নাই সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই। কিন্তু অল্প চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে ব্রাহ্মপদ্ধতি ও তিন আইন দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, স্থান ও কালে একত্র সন্নিবিষ্ট হওয়াতে এক বলিয়া ভুল হইতেছে। রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে বিবাহপত্রে স্বাক্ষর দ্বারা ব্রাহ্ম বিবাহের (অথবা অন্য কোন বিবাহের) বৈধতা সম্পাদন করা হয় না (হইতেও পারে না), তাহাতে হয় শুধু তিন আইন অনুযায়ী সিভিল বিবাহকে সম্পূর্ণ করা।

†১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের Census Report দেখিতে পাই..." the actual number of Brahmos gives no idea of the extent to which Brahmo doctrines have spread. Though they have not permeated, they have profoundly influenced the intellectual Hindus of Bengal, and many thousands are Brahmos at heart, but not in name......there is now a considerable body of persons, calling themselves or called by others neo-Hindus, among whom there is a place for a monotheist who desires to throw off the trammels of caste and to put his views of social reform into practice. There is greater toleration towards the heterodoxy and among the latter the spirit of revolt is dying out, which had led to the establishment of the Brahmo Samaj. (Vol. V. Part 1 Ch. V. p. 210.)

"There is no statutory marriage law among the Hindus, and the validity of any particular marriage depends chiefly on the usage of the caste to which the parties belong. [Subbarayan (1885) 9 Mad. 9.]"

ঐ পুস্তকের ১০১২ পৃষ্ঠায় আছে :—"A marriage may be established by a preponderating repute and by conduct, even though the repute may be divided."*

Sir Sankaran Nair মান্দ্রাজে Muthusami Mudaliar v. Musatimani (1909, 33 Mad. p. 350.) মকদ্দমায় নূতন সমাজের প্রথা অনুসারে সম্পন্ন বিবাহকে বৈধ বলিয়া রায় দিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণ উপস্থিত করিবার আবশ্যকতা নাই।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

---

* সম্প্রতি দুইটি মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে ; এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

(i) "In the case of Bai Gulab vs. Jivanlal Harilal it has been held by Justice Lalubhai Shah with the concurrence of Chief Justice Sir Norman McLeod that the marriage of a man of higher Hindu caste with a woman of lower Hindu caste is valid according to Hindu Law…Justice Shah holds that such marriages are not rare in the Bombay Presidency, *they are sanctioned by usage.*" Indian Messenger, June 4. 1922 p. 175.

(ii) "Rai Bahadur Radhanath Phukan, Sub-Judge, Assam Valley District, has delivered judgment in the appeal in which Ghanasyam Nadial was the defendant appellant and Virs Labya Haidiani the plaintiff respondent. The question raised in this appeal was whether marriage by service was valid marriage"............

"Plaintiff took a husband without formal marriage, as most women of her class do in Assam. It was a matter of common knowledge that they always took a *chapaniya* in that manner and were regaıded amongst their people as legally marriod coupled. They live as men and wives, without formal marriages, and their children were allowed to inherit. They could not take a second *chapaniya* in the life time of the first..........................the custom was too well-known. To hold that the plaintiff in this case was not a married woman and that her children were not legitimate children would be to bastardise almost one half of the lower class Assamese. By no stretch of imagination could it be said that the plaintiff was unchaste because she had taken a *chapaniya.* He had no doubt that she would inherit. The appeal was dismissed with costs." (Statesman June 17, 1922.)